

ଅଙ୍କ- ୧ - ୬

ମାନସୀ

ସାହିତ୍ୟ ମାସିକ ପତ୍ରିକା

ସମ୍ପଦ ବର୍ଷ--ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡ

(୧୯୧୧-୧୨)

ନାଟୋରାସିପତି

ମାନନୀୟ ମହାରାଜ ଶ୍ରୀଜଗଦିନ୍ଦ୍ର ନାଥ ରାୟ

ସମ୍ପାଦିତ

ପ୍ରକାଶକ

ଶ୍ରୀଶ୍ରୀତନୁଜ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ

କୋଲକାତା

ବାର୍ଷିକ ମୂଲ୍ୟ (ସଡ଼ାକ) ୨।୯୦

ପ୍ରତି ସଂଖ୍ୟା ।୦

৭ম বর্ষ—১ম খণ্ড

কাল্পনিক—শ্রাবণ, ১৩২১-২২

/ সাম্মান্যিক স্মৃতি

[লেখকগণের নামানুক্রমে]

শ্রীমহাকুমা দেবী

উষা (উপজ্ঞান)

১৩৬, ৪০৮, ৪২২

শ্রীমপূর্ণরূক্ষ মুখোপাধ্যায় এম, এ

বকিতা (গল্প)

শ্রীমম্বাচরণ বিজ্ঞানভূষণ

নববর্ষে

শ্রীঅরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

মন-বুলবুল

শ্রীআবুল করিম

তারকেশ্বরের পালা

শ্রীকরণানিধান মুখোপাধ্যায়

ছায়া (কবিতা)

শ্রীকাকনমালা দেবী

মোলি (গল্প)

শ্রীকপিলদাস রায় বি, এ,

ভ্রম সংশোধন (কবিতা)

গৃহ কল্যাণী (ঐ)

কিশোরী (ঐ)

শ্রীধনেন্দ্রনাথ মিত্র এম, এ

প্রাণসা প্রসঙ্গ

শ্রীগিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়

অন্নপূর্ণা রূপি (কবিতা)

শ্রীকগদিক্সনাথ রায়

অভিধান .

অভিভাষণ

স্মরণ

সাহিত্য ও মানব জগৎ

কবিতা-কৃতি

তপস্বিনী (কবিতা)

৬ বিক্রমশাল

ডায়েরি

শ্রীচলধর সেন

ছোট গল্প

লেড্‌কী মন্‌গেয়ী (গল্প)

শ্রীভীষ্মদেবী

কবিতা-কৃতি

শ্রীদেবকানন রায় চৌধুরী

অল্প অবেগ কবিতা)

নাগর থেলা (ঐ)

অচলঙ্গ (ঐ)

কীৰ্ত্তা (ঐ)

শ্রীদেবকানন সেন এম এ, বি এল,

ভদ্র (কবিতা)

নির্দল (ঐ)

শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টাচার্য এম, এ

সাহিত্যিক-সম্মিলনে

শ্রীনিরুপমা দেবী

বাস্তবিক (কবিতা)

সঙ্গী - (ঐ)

শ্রীপঞ্চানন নিরোগী এম, এ, পি, আর, এন্,

তিন

শ্রীশীলকর তর্কালঙ্কার

বাইপ্পত্যাদর্শন বা নাস্তিবাদ

১৩৮

৪৪১

... ৬১৫

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বি, এ, বার-এটু-প •

বহ্নিমচন্দ্র জীবনপঞ্জী

জীবনের মূলা (গল্প)

শ্রীপ্রমথনাথ রায় চৌধুরী

নববর্ষ (কবিতা)

শ্রীপ্রসন্নদেবী দেবী

বিশ্বরূপ (কবিতা)

শ্রীপ্রিয়দর্শিনী দেবী বি, এ

মধুনাসে (কবিতা)

সঙ্গী (ঐ)

চাক্ষুঃ

সুদূর (কবিতা)

চৈত্র (ঐ)

অগো হু, মায়া হু, মতিভ্রমো হু ? (গল্প)

আগমন (কবিতা)

কণমিলন (ঐ)

কর্ণ (ঐ)

ফুলের কথা

ব্যাগ্ধি (কবিতা)

শ্রীককিচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বার্তা (গল্প)

বর্ধমান-সম্মিলনে

শ্রীকমলকাম তর্কবাগীশ

ছাত্রকুসুমজলিকার উদয়নাচার্যের পরিচয়

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

বিরহে (কবিতা)

ভাই (গল্প)

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার বি, এল

নববর্ষ (কবিতা)

নগ্ন (ঐ)

১০০

১০০

৪১১

১০

৫০

৮১

২৪০

২৮৩

শ্রীমদীজনাথ বাগ বি, এ

উদ্দেশ্যে (কবিতা)

২৮। শ্রীমানকুমারী, বীরকুমার-বদ রচয়িতা

কথন না (কবিতা) .

মানসী .

স্বগত .

১৫৯, ৩৫২, ৫১৪

শ্রীমুকুন্দপ্রসাদ সিংহ

সার্থক দান (কবিতা)

৩ শ্রীমদীজনাথ ঘোষ

আশাঢ়ে (কবিতা)

শ্রীমদ্যমী দেবী

চিত্রপট (কবিতা)

শ্রীমদীজনাথ সেনগুপ্ত

মাহুষ (কবিতা)

শ্রীমদীজনাথ বাগচী বি, এ

উৎসবে (কবিতা) .

৬১

ফাল্গুন-স্মৃতি (ঐ)

১৮৯

প্রণাম (ঐ)

৪৯২

সন্ধান (ঐ)

৬১৩

শ্রীমদ্যমী চক্রবর্তী

সামাজিক সমস্যা

২৬

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ শ্রীধরবেঙ্গল তর্করত্ন

কাব্যে অলঙ্কার শাস্ত্রের নিয়মের প্রয়োজনীয়তা

২৬১

শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী এম, এ, বি, এল

সমস্যা ও সমাধান (কবিতা) .

৫১২

৩৬। হার রবীজনাথ ঠাকুর, ডি, লিট, কে টি,

প্রেমের পরশ (কবিতা) .

৪৮৫

শ্রীমদীমোচন ঘোষ, বি, এল .

আশ্বাস (কবিতা) .

৪১২

মেঘের প্রতি (ঐ)

৫৯২

মিলন ও বিদায় (ঐ)

৬৭২

ঐরমা প্রসাদ চন্দ্র এম, এ,
 রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যুশব
 বাক্সালার ইতিহাস (সমালোচনা)
 ঐরমেশচন্দ্র মহুমদার এম, এ, পি, আর, এস
 প্রাচীন যৌগের জাতি
 ঐরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য বি, এ
 রামপাল
 শেন হিন্দু-সাম্রাজ্য
 ঐরাধাগোবিন্দ বসাক
 গুপ্ত-সুগে বঙ্গদেশ
 ঐরোগাতুর শর্ম্মা
 রোগ-শস্যার প্রলাপ
 ঐমতী লীলা দেবী
 উৎসর্গিত পুস্ত (কবিতা)
 পর পার (ঐ)
 ঐ—
 অর্জুন (কবিতা)
 প্রার্থনা (ঐ)
 ঐশ্বরচন্দ্র মহুমদার
 স্বচ্-বাটুপাড় (গল্প)
 ঐশিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য, এম, এ, কাবাতীর্থ
 সংস্কৃত নাটকের ইতিহাস-কথা
 ঐশিবরতন মিত্র
 সত্যকায় জাবাল (চিত্র)
 পদাবলী সাহিত্য
 সুল্পাদকীয়
 মাসিক-সাহিত্য সমালোচনা
 শোক-সংবাদ
 সাহিত্য-সমাচার
 গৃহ-সমালোচনা

৬৫৭

৩৫, ১৫৩,
৫০৩
৫০৩

শ্রীমতীশচন্দ্র গুটিক এন, এ, বি, এল
সম্পাদক (কবিতা)

অনুবাদ
অভিযান্তর
শ্রীমতীশচন্দ্র
সাহিত্য
শ্রীমতীশচন্দ্র

শ্রীমতীশচন্দ্র দত্ত
নিবেদন

শ্রীমতীশচন্দ্র দত্ত
প্রথম পর্ব (কবিতা)

শ্রীমতীশচন্দ্র দত্ত
দ্বিতীয় পর্ব (কবিতা)

শ্রীমতীশচন্দ্র দত্ত
তৃতীয় পর্ব (কবিতা)

শ্রীমতীশচন্দ্র দত্ত
চতুর্থ পর্ব (কবিতা)

শ্রীমতীশচন্দ্র দত্ত
পঞ্চম পর্ব (কবিতা)

চিত্র সৃষ্টি

বার্গ জীবন (চিত্র)

স্বর্গীয় গোপালকৃষ্ণ গোপাল

স্বর্গীয় ডাক্তার

অনুবাদিত গোপালকৃষ্ণ

১১৭

৪। চিত্রকর (চিত্র)

১১৮

৫। উত্তর বঙ্গ সাহিত্য সমিতি

১৪৪

৬। নিবৃত্ত দিল্লী (চিত্র)

২৪১

৭। পাগলিনী (চিত্র)

৩৬৯

৮। বর্ধমান অষ্টম সাহিত্য সমিতির বিদ্য-নিবন্ধন সমিতি

৩৭৩

৯। নিবৃত্ত-দাহ (চিত্র)

৪৮৫

১০। বর্ধমান অষ্টম সাহিত্য সমিতির সভাপতি

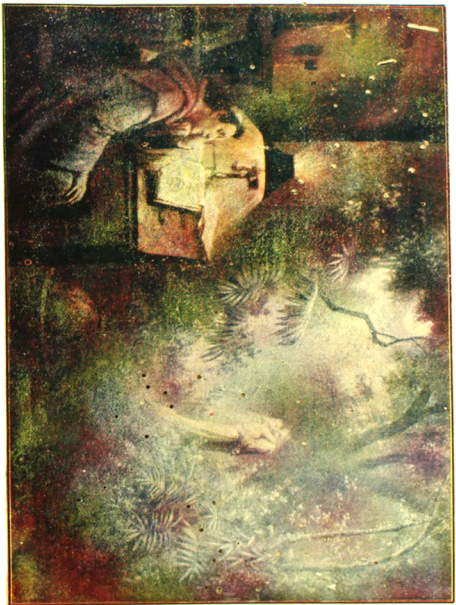
৪৯৭

১১। বর্ধমান (চিত্র)

৬১৩

১২। বর্ধমান অষ্টম সাহিত্য সমিতির প্রতিনিবন্ধন

৬৩৬



दार्शनिक

‘মানসী’ বর্ধারম্ভ ফাঙ্কনে । বিগত মাঘে মানসীর বর্ষ পূর্ণ হইয়াছে । ঐ বর্ষে বঙ্গদেশে ২৬২ খানি বাঙ্গলা সাময়িক পত্র প্রকাশিত হইয়াছে । দশ বৎসরের পূর্বের তুলনায় সাময়িক পত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে । গত দশ বৎসরের মধ্যে অনেক মাসিকপত্র জন্মিয়াছিল, তাহার কতক বিলুপ্ত হইয়াছে, কতক স্থায়িত্ব লাভ করিয়াছে । যাহারা স্থায়ী হইয়াছে, তাহাদের প্রয়োজনীয়তা ছিল না, একথা বলা ধুট্টা মাত্র । আজকাল কেহ কেহ নবপদ্ধতিতে মাসিকপত্র প্রচারের ব্যবস্থা দিয়া থাকেন । যাহারা নূতন প্রণালীতে মাসিকপত্র পরিচালনের উপায় উদ্ভাবন করিতে বলেন, তাহাদের একটু পশ্চাদ্ধিক কিরিয়া দেখা উচিত । সময় ও প্রয়োজন উপস্থিত হইলে, সমাজ তাহার উপায় আপনিই করিয়া লয়, আর তাহা স্থায়ী হইয়া যায় ; অন্যথা কোন বিষয়ের চেষ্টামাত্র করিলে তাহা অসাময়িক বা প্রয়োজনের বহু অগ্রবর্তী বলিয়া নষ্ট হইয়া যায় ! দৃষ্টান্তস্বরূপ বুঝাইলে কথটা পরিষ্কৃত হইবে ;—দেখুন, সেকালে ‘বঙ্গবাসীতে’ ডাক্তার রাজেন্দ্রলালের “বিবিধার্থ সংগ্রহের” অঙ্ককরণে যে সমস্ত কাঠখোদিত মোটা কাকের শিল্পকৌশলহীন ছবি প্রকাশিত হইত, তাহা দিয়া ‘জন্মভূমি’র কলেবর সুশোভিত করা হইত এবং মাঝে মাঝে জন্মভূমির জন্যই নূতন ছবির ব্যবস্থা করা হইত । ইহা দ্বারা আলেখ্যময়ী মাসিকপত্রিকা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা এবং অভাব নিবারণের এক উপায় করা হইয়াছিল মাত্র, কিন্তু তখনও ঠিক জিনিষ না পাওয়ায় এবং প্রয়োজনের তীব্রতা না থাকায় ৯৬২সর পরে ‘বঙ্গবাসী’র অধিকারীকে ‘জন্মভূমি’ প্রচারের সমস্ত পরিত্যাগ করিতে হয় । ইতার পর ‘সাহিত্য’ প্রতি সংখ্যায় বাঙ্গালার সাহিত্যরসীদিগের এক এক জনের হাকটোন ছবি ছাপিতে আরম্ভ করেন । কেবল মূর্তিদর্শনের আশ্রয় বাস্তীত তাহাতে আর কোনও প্রয়োজনীয়তা বাড়াইতে পারে না । তাহার পর ‘প্রদীপ’র জন্ম হয় । নানা ধরনের উৎকৃষ্ট ছবি লইয়া ‘প্রদীপ’ সেখা দেওয়ালে তাহার দিকে লোকের দৃষ্টি পড়ে । এই সময়ে চিত্রকলার অসুশীলন জাগিয়া উঠে । উৎকৃষ্ট উপায়ে রঙ-বিরঙে ছবি ছাপিবার প্রণালী ও যন্ত্রাদির আয়োজন হইতে থাকে । এখন এমন হইয়াছে,—ভারতী, মানসী, প্রবাসী, ভারতবর্ষ, সঙ্গর, বিজয়া, যমুনা, প্রতিভা, ঢাকা প্রতিভা প্রভৃতি সমস্ত প্রধান মাসিক পত্রের উপযুক্ত, স্বন্দর, শিল্পকৌশলসম্পন্ন বহুচিত্রের সমাবেশ হইতেছে । ‘সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা’র চেষ্টায় তাছাতে এবং তদনুসরণে অন্যান্য পত্রিকার শিলালেখ, তাম্রশাসনাদির প্রতিলিপি, ইতিহাস এটিকোএরি, এসিয়াটিক সোসাইটীর পত্রিকা প্রভৃতির ন্যায় স্ফন্দর হইয়া ছাপা হইতেছে । এখন ছবি মাসিকপত্র প্রকাশের একটা অবশ্য-প্রয়োজনীয়

অঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে। তথ্যবোধিনী, নব্যভারত, হিন্দুপত্রিকা, বামাবোধিনী প্রভৃতি প্রাচীন পত্র-পত্রিকাগুলি এই ছবির অঙ্গটি গ্রহণ করিতে পারেন নাই বলিয়া, তাঁহারা ক্ষতিগ্রস্ত হ'ন নাই বটে, কিন্তু পূর্বোক্ত নবীন সহযোগীদের তুলিয়া তুলিয়া ততটা সমুখে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিতেছেন না; অথচ ছত্ৰিনা দেওয়ার জন্য যে অঙ্গহীনতা ঘটিতেছে, তাহা দূর করিবার জন্য তাঁহারা নূতন উপায়ও কিছু অবলম্বন করিতেছেন না। সময়ের গতি, সমাজের আগ্রহ, লক্ষ্য করিয়া পরিবর্তন অবলম্বন করা যে উন্নতি ও সকলতার জন্য আবশ্যিক, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বিষয়ভেদে বিশিষ্ট পত্র পত্রিকা প্রকাশের দিল আসিয়াছে—যাঁহারা এইরূপ মনে করেন, তাঁহারা এখনও তাহা পরীক্ষা করিবলৈ অবসর পান নাই। পূর্বে সে পরীক্ষা একেবারে হয় নাই, এমন বলা যুগি না;—তবে তখনও তাহাদের সময় আসে নাই, তাহাদের প্রয়োজনীয়তা ও অভাব ততটা তীব্রভাবে অনুভূত হয় নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা শিল্পপুঞ্জালি, সঙ্গীতপ্রবেশিকা, বীণাবাদিনী, জীড়াকোতুক, কমলা, কৃষিদর্পণ, বৈষয়িকতত্ত্ব, কৃষিগেজেট, রঙ্গালয়, রঙ্গভূমি, রঙ্গমঞ্চ, আয়ুর্কেন্দ্রসজীবনী, চিকিৎসক, চিকিৎসা-সম্মিলনী, বিজ্ঞানদর্পণ, জ্যোতিষদর্পণ, অদৃষ্ট এবং সর্বশেষ ও সর্বপ্রধান ঐতিহাসিক চিত্রের কথা ধরিতে পারা যায়। অবশ্য এখনও দু'এক খানি বিষয়গত বিশিষ্ট পত্রিকা যে নাই তাহা নহে; তন্মধ্যে সর্বপ্রাচীন "কৃষকে"র নাম সর্বাগ্রে করিতে হয়, তৎপরে শিল্প ও সাহিত্য, কাজের লোক, আর ধর্মসম্বন্ধে হিন্দুপত্রিকা। পুত্রা, ব্রহ্মবিজ্ঞা, ধর্ম-প্রচারক, বৈষ্ণব পত্রিকা অনেক বাহির হইয়াছিল, কিন্তু কোনখানিই দীর্ঘকালস্থায়ী হয় নাই;—এখন যে ছুঁচান্নিখানি বাহির হয়, সেগুলি সকলেই শিশু। বৌদ্ধদের 'জগজ্জ্যোতিঃ' কয়েক বর্ষ চলিতেছে, কিন্তু এখনও নবীন এবং এখনও বিষয়গোরবে প্রসিক্কিলাভ করিতে না পারিলেও অচিরে উন্নত হইবে বলিয়া আশা করা যায়। জৈনদিগের কোন বাঙ্গালা পত্রিকা নাই। মুসলমান সম্প্রদায় হইতে একসময়ে কোহিনূর, নবনূর, ইসলাম-প্রচারক প্রভৃতি উৎকৃষ্ট মাসিকপত্র বাহির হইত, এখন একবাণিও নাই; কেবল 'কোহিনূর' কখন কখন ধুমকেতুর মত দর্শন দেন। এতস্তিন্ন বিষয়ের, বিশিষ্টতা-বিশিষ্ট বহু বিষয়ের মাসিক পত্রিকার অবসর আছে; কিন্তু সেগুলি প্রকাশ করিয়া তাহাদের প্রয়োজনীয়তাকে স্বাদ্ঘিষ্ট দিয়া তাহানিগকেও স্থায়ী করিতে পারেন, এমন শেখক ও সম্পাদক দেশে থাকিলেও আজিও দেখা দেন নাই। বিজ্ঞানের বহুবিভাগে কেবল পাশ্চাত্য জ্ঞানের প্রচলনার্থে বহু পত্রিকা প্রকাশিত হইতে পারে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের

বিজ্ঞানশাখার সদস্যেরা বিগত কয়টি সাহিত্য-সম্মেলনে সপ্ৰমাণ করিয়া দিয়াছেন যে, এদেশের বিজ্ঞানের ছাত্রেরাও মৌলিক গবেষণায় এক বৎসরে যে পরিমাণে কার্য করিয়া তুলিতেছেন, তাহা দ্বারাও ছ'একখানি বৈজ্ঞানিক পত্রিকা চলিতে পারে। চিকিৎসা-বিজ্ঞানে আয়ুর্বেদ বা হোমিওপ্যাথী প্রণালীতে মাসিকপত্র প্রকাশের চেষ্টা বহু হইয়াছে, এবং এখনও বহু হইতেছে; তবে কিসে যে এগুলির স্থায়িত্ব হইবে, অমুষ্ঠাতৃবর্গ এখনও তাহার উপায় স্থির করিতে পারেন নাই। চিত্র-কলার আলোচনা দেশে জাগিয়াছে, তৎসম্বন্ধে অতি অল্পদিনের মধ্যে পাঁচ সাতখানি উৎকৃষ্ট পুস্তকও বাহির হইয়াছে, কিন্তু এই নব উদ্ভাসিত চিত্রশিল্পের বিশিষ্টতা-প্রচারের জন্য ইংরেজি-পত্রিকার প্রচারের প্রয়োজনীয়তা অল্পকৃত হইলেও ভারতবাসীর মধ্যে ভারতবর্ষীয় কোন ভাষায় এখনও ইহার বিশিষ্টতা আলোচনার অভাব অল্পকৃত হইতেছে না; সুতরাং তৎসম্বন্ধে এখনও মাসিক পত্রিকা জন্মগ্রহণ করে নাই। অদৃষ্টবাদী, গ্রহফলবিদ্যাসী, পঞ্জিকাতন্ত্রী বাঙ্গালীর মধ্যে কি গণিতজ্যোতিষ, কি ফলিতজ্যোতিষ—কোন বিভাগেরই বিশিষ্টতা আলোচনার জন্য মাসিকপত্র নাই। দৃগুগণিত ঐক্য করিয়া একখানি পত্রিকা বাহির হয় বটে, কিন্তু দৃগুগণিত আলোচনা করিবার স্থান এখনও সৃষ্ট হয় নাই। বাঙ্গালীর কীর্তন, বাঙ্গালীর চণ, বাঙ্গালীর হাফ-আখড়াই, বাঙ্গালীর কবি, বাঙ্গালীর পাচালী প্রভৃতি কত প্রকার সঙ্গীত-ভেদ থাকিতে, বাঙ্গালীর একখানি স্মৃতি সঙ্গীত-পত্রিকা নাই, ইহা কম আক্ষেপের কথা নয়। সঙ্গীত-কলার ভারতবাসীর বৃত্ত প্রকারভেদ আছে, পৃথিবীতে তত আর কলারও নাই। দর্শনের আলোচনা বন্ধ নাই; কিন্তু কেবলই বিশিষ্টভাবে দর্শনশাস্ত্রের বিশিষ্ট পত্রিকা কই? বেদের দোহাই সকলই দিয়া থাকি, কিন্তু কেবল বেদ, উপনিষদ, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও বেদাঙ্গগুলির আলোচনার্থ ত্রুতদিন বাঙ্গালার কোন পত্রিকা ছিল না; পণ্ডিত উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্নের 'মন্মারমালা' একা কেবল সে দিকে অতি ক্রীণ হস্তে কার্য করিতে নামিয়াছে,—‘লগত লগত কঠে’ বলিয়া সম্পাদক সাধরে আহ্বান করিলেও সাধারণে সে মালার আদর করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। এইরূপ কঠ বলিব? যে দিকে চাহিয়া দেখিবেন, অভাব সেই দিকেই,—অথচ দেশে সে সকল অভাব মোচনের কোন প্রকৃষ্ট উপায় হইতেছে না! কেন হইতেছে না, অল্পসন্ধান করিতে গেলে বলিতে হয়,—দেশের লোক, দেশের সমাজ, কৃতবিদ্যাপ্রণী কেহই তেমন তীব্রভাবে সে অভাব বোধ করিতেছেন না।

মাসিকপত্রের অবস্থা এখন যাহা দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে দেখা যাইতেছে যে,

সকলেই পাঁচকূলে সাজি সাজাইয়া পাঠক-দেবতার সেবায় লগাইতেছেন; আর যাহার সাজিতে হুদুশা ও হুগন্ধ কূলের যত ঘন-সন্নিবেশ হইতেছে, তাহার ততই কৃতিত্ব জাহির হইতেছে। একটা ধূমু উঠিয়াছে, লোকে গল্প-কবিতা-নাটক-উপন্যাসে মশগুল হইয়া পড়িয়াছে, তাই গভীর বিষয়ের আলোচনা পড়িতে চায় না;—মাসিকপত্রের পরিচালক আমরা—আমরা কিন্তু সে কথার মানি না, তাহা যদি হইত, তাহা হইলে কেবল গল্পময়ী পত্রিকা প্রাচীন “উপন্যাস-রত্নাবলী” “উপন্যাসমঞ্জরী,” “আদরিণী” এবং সে দিনের “নন্দনকানন” “দারোগারদপ্তর” প্রভৃতি উঠিয়া যাইত না; কেবল কবিতাময়ী পত্রিকা বীণা, লহরী প্রভৃতি লোপ পাইত না। সত্য বটে, এখনকার কালেও গল্প-কবিতা-উপন্যাস না দিলে “হাটে নাহি বাট নিলে”—কিন্তু হাটে বস করিয়া দাঁড়াইয়া হইলে, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান, ভ্রমণ, সমালোচনা প্রভৃতি কোন বিষয়ই ত বাদ দিতে পারা যায় না।

কেহ কেহ গল্প ও উপন্যাস বাদ দিয়াছেন, কবিতা রাখিয়াছেন; কিন্তু কই, তাহাদের যে বিশেষ কিছু সম্রম বাড়িয়াছে, তাহাত’ অহুত হইতেছে না। কেহ কেহ নাটক দিয়া আসর জমাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতেও তাহাদের বিশেষ কিছু সফলতা হইয়াছে বলিয়া শুনা যায় নাই। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া মনে হয় ‘মানসী’র পূর্বেও মাসিক-পত্রিকার হাটের যে অবস্থা ছিল, যেমন মালের কেনাবেচা হইত, যে শ্রেণীর খরিদদার যাতায়াত করিত, আলোচ্য বর্ষেও ঠিক সেই অবস্থা গিয়াছে, কোন কিছুই পরিবর্তন দেখা যায় নাই। তবে কয়েক বর্ষ হইতে শিশুপাঠ্য পুস্তকের মত শিশুপাঠ্য মাসিকপত্রের কিছু প্রাবল্য হইয়াছে। কিন্তু কোনখানিই সেকালের ‘বালক-বন্ধু,’ ‘সখা,’ ‘সাধী’র জায় দাঁড়াইতে পারিতেছে না। ‘মুকুল’ মধ্যকালে যে প্রতিপত্তি বা আদর পাইয়াছিল, নবীন শিশু-সঙ্গীদের কেহই সে আদর পাইতেছেন না। কেন, তাহা ঠিক খুলিয়া বলা চলে না;—কিন্তু একটা কথা বলা চলে,—আজকাল শিশু-সঙ্গীর শিশুদের জন্ত যে ভাষা ও প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাতে বোধ হয় তাহারা যাহাদের সঙ্গ চাহিতেছেন, তাহাদের কাছেই পৌছিতে পারিতেছেন না।—এই ত গেল মাসিকপত্রের হাটের অবস্থা।

কেবল কি মাসিক পত্রের বাজারই এইরূপ? সাহিত্যের হাটেও আলোচ্য বর্ষে এমন কোন বিশেষ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় নাই। ‘থোড় বড়ি খাড়া, খাড়া বড়ি থোড়ে’ বেচাকেনা চলিয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে কান্তন হইতে মাঘ পর্যন্ত অনূন ১১২২খানি নূতন বাঙ্গালা পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে ; কিন্তু মুদ্রিত বাঙ্গালা পুস্তকের সংখ্যা ১৪৫২ ; তন্মধ্যে বেঁ সকল পুস্তকের নূতন সংস্করণ হইয়াছে তাহাদের সংখ্যা ১৯২ । এগুলির সংখ্যা আমরা ধরি নাই । উল্লিখিত ১১২২খানি পুস্তকের মধ্যে,—

• বিগুজ বাঙ্গালায়—	৮১২
মুসলমানী বাঙ্গালায়—	১৬
বাঙ্গালা ও সংস্কৃত—	৮৭
বাঙ্গালা ও ওড়িয়ায়—	২
আরবি ও মুসলমানী বাঙ্গালায়—	৪
• বাঙ্গালা ও ইংরেজিতে—	১৬৭
পারসী ও মুসলমানী বাঙ্গালায়—	৫
বাঙ্গালা, ইংরেজি ও হিন্দীতে—	২
বাঙ্গালা, ইংরেজি ও সংস্কৃত—	২২
বাঙ্গালা, পালি ও সংস্কৃত—	৩
বাঙ্গালা ও উর্দুতে—	২

মোট—১১২২খানি

পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে । ইহার মধ্যে বিগুজ বাঙ্গালা, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত, বাঙ্গালা ও ইংরেজি, বাঙ্গালা ইংরেজি ও সংস্কৃত এবং বাঙ্গালা, সংস্কৃত ও পালিতে প্রকাশিত ১৬ খানি পুস্তকের বিষয়-ভেদে শ্রেণী-বিভাগ করিলে দেখা যায় ;—

আলোচ্যবর্ষে,—

- কলা-বিজ্ঞান—
- জীবন-নৃত্যস্ব—
- নাটকাদিতে—
- উপজ্ঞাসে—
- ইতিহাস-ভূগোলে—
- সাহিত্যে—
- আইনে—
- চিকিৎসায়—
- দর্শনে—

কাব্য ও কবিতার—

ধর্মবিষয়ে—

ভ্রমণে—

বিজ্ঞান বিষয়ে—

বিবিধ বিষয়ে—

৬০

মোট ১০১৬খানি পুস্তক

প্রকাশিত চইয়াছে। পূর্ব পূর্ব বার্ষিক সাহিত্য-বিবরণের রীতামুসারে ধর্ম-বিষয়ক পুস্তকগুলির মধ্যে খৃষ্টানদিগের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্ম-পুস্তিকাগুলি তালিকাভুক্ত করা হয় নাই। পূর্বেকৃত বিভাগের মধ্যে—

ইতিহাস ও ভূগোল ৪৫খানির মধ্যে— ৩২ খানি

সাহিত্যের ২২৫ খানির মধ্যে— ১৮১ „

কাব্য ও কবিতার ১০২ খানির মধ্যে ২৮

বিজ্ঞান বিষয়ক ১০২ খানির মধ্যে— ৮২ „

বিবিধ বিষয়ক ৬০ „ „— ২৫

এই মোট ৩৪৮ খানি পুস্তক স্থল-পাঠ্য।

আলোচ্যবর্ষে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রকাশিত অক্ষ-কবি ভবানীপ্রসাদের দুর্গামঙ্গল ও চণ্ডীদাসের পদাবলী বাতীত প্রাচীন সাহিত্যের অক্ষয় ভাণ্ডার হইতে আর কেহ কোন রত্ন প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া জানা যায় নাই। উপ-জ্ঞাস, নাটক, কাব্য, কবিতা, ইতিহাস, বিজ্ঞান, ধর্ম প্রভৃতির মধ্যে তেমন চটকদার চমৎকার-প্রদ গ্রন্থ কিছু বাহির হয় নাই,—নূতন বা ভাল গ্রন্থ সকল-রকমে বিশ ত্রিশখানি যে বাহির হয় নাই, এমন কথা আমরা বলিতেছি না। সে সকল গ্রন্থকারা বঙ্গবাণীর পুষ্টি যে হয় নাই, এমন কথা আমরা ভাবিও নাই; বরং কোন কোন গ্রন্থের ক্ষুদ্র উৎসাহ গৌরব বাড়িয়াছে, সন্দেহ নাই। তেমনতর ছইচারিখানি গ্রন্থের নাম আমরা না করিয়া পারিতেছি না।

সেকালে “দেবগণের মর্ত্যে আগমন” নামধরা যে ধরণে দেশ-ভ্রমণকাহিনী কোমল কোমলী-লেখক লিখিয়া গিয়াছিলেন,—তদপেক্ষা সুন্দর উপায়ে এক

নূতন প্রণালীতে অধ্যাপক বিপিনবিহারী গুপ্ত, অধ্যাপক রামেন্দ্রচন্দ্র ত্রিবেদীর স্বতিভাণ্ডার আলোড়ন করিয়া কত অপূর্ণ কথা “বিচিত্র প্রসঙ্গ” নাম দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। একরূপ গ্রন্থ একরূপ প্রণালীতে প্রকাশ বাক্যলাভাভাব এই নূতন। বিষয়-গৌরবে ও নূতনত্বে এখানি বাক্যলাভাভাব গৌরব বাক্যইবে।

ইতিহাস বিভাগে এবার একখানি অতি সুন্দর গবেষণাপূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। আমাদের বাক্যলাভ দেখিতে দেখিতে অনেক জেলারই ইতিহাস বাহির হইয়া গেল। এ পর্য্যন্ত বাক্যলাভ যতগুলি প্রাদেশিক ইতিহাস বাহির হইয়াছে, তন্মধ্যে “খুলনা ও যশোহরের ইতিহাস” শীর্ষস্থান অধিকার করিবার উপযোগী, সন্দেহ নাই। ঐতিহাসিক কাহিনী হিসাবে এ বৎসর আর একখানি অতি উপাধেয় গ্রন্থ এ বিভাগের সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। প্রবৃত্তবিশিষ্ট শ্রীযুক্ত রাধালাল বন্দ্যোপাধ্যায়, পরিভ্রমলঙ্কৃত ঐতিহাসিক মালমশলাগুলি অতি সুন্দরভাবে সাজাইয়া গুছাইয়া তাঁহার কাহিনীর বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। একরূপ নীরস বিষয় লইয়া ইহার পূর্বে আর কেহ কাহিনী লেখেন নাই। এই গ্রন্থে প্রতিলিপিত কৃতি-হস্তের নিপুণ রেখা নিখুঁত রহিয়াছে। উপস্থাপন ও গল্প বিভাগের মধ্যে “বিন্দুর ছেলে” সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। বহুদিন বাক্যলাভ সাহিত্যে একরূপ গ্রন্থ প্রকাশিত হয় নাই। এ খানিকে প্রকৃত প্রস্তাবে উপস্থাপন বা ছোট গল্প বলিতে পারা যায় না।

নাটক-বিভাগে শ্রীযুক্ত ফারোদচন্দ্র বিজ্ঞানিন্দোদ মহাশয়ের আহেরিয়া ও শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র কুণ্ডলিখিত “ফ্রিওপেট্রা” অতীব সুন্দর হইয়াছে। অম্বুদ-গ্রন্থের মধ্যে সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিজ্ঞানচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের “গীতগোবিন্দ” বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কবিতা-পুস্তকের মধ্যে অষ্টোত্তর-শত কবিতা-বিশিষ্ট রবীন্দ্রনাথের “গীতালী” কাব্য-বিভাগের শিরোমণি।

সাহিত্যের হাটে আলাচ্য বর্ষে এই কয়খানি মাত্র একটু বড় গলায় পরিচয় দিবার মত গ্রন্থ বাহির হইয়াছে। কাজেই সকল দিক দিয়াই এই বৎসরটি সাহিত্য-সংসারে বিশেষ কোন চিহ্ন রাখিয়া গাইতে পারে নাই।

শ্রীঅম্বুদচরণ বিজ্ঞানচন্দ্র ।

মধুমােসে ।

দক্ষিণ আশার পথে অই স্রাসে মলয় বাতাস,
চন্দনের বিধ্ব গন্ধে বহি লয়ে শান্তির আশাস ।
মঙ্গল অরুণ পুষ্পে অশোকের আজিকে উৎসব,
ভোরণ-রচনা বাধে চূতশাখে তরণ পল্লব,
পিককণ্ঠে হলুধ্বনি ব্যস্ত আজি করে চরাচরে,
মাধবের আগমন বহুধার বিবাহ-বাসরে ।

অনঙ্গসুখার সনে ধরণীর আজি স্বপ্নসর,
প্রণয়ের নেত্রপাতে নিদ্ধালোকে প্রাবিত অধীর,
প্রায়ুট অজস্র পুষ্প বরমালা রচনার তরে,
দূর্ব্বার কোমল পথ নিখিলের ঞ্চামল প্রান্তরে,
সৌরভে দিগন্ত তরে নব আশ্রমুকুলের বাসে,
উৎসে বাজে নহবৎ, স্রোতস্বিনী নাচিছে উল্লাসে ।

বাসাভাঙা পাখী করে কুলায়ের নব আয়োজন,
দিকে দিকে কলগীতি আনন্দের নব আবাহন ।
বিরহ বিলুপ্ত বার্থ আকাশের ধূসরের সনে,
আশার অপরাঙ্কিতা হাসে স্বচ্ছ সুনীল গগনে,
আবীর কুঙ্কমছায়া তরু-শাখে দোলে কুন-ভোর—
দোললীলা, বিশ্ব আজি মিলনের মাধুরী-বিভোর ।

ঐপ্রিয়তমা দেবী ।

ভাস

দ্বিতীয় প্রস্তাব ।

পূর্ব্ব প্রস্তাবপাঠের পর কোনও বহু একটা প্রমাদের প্রতি আমার দৃষ্টি
আকর্ষণ করেন । আমি বলিয়াছি স্বপ্নবৃত্তের শেষে রাজা নন্দ । এটা ভ্রম ।
চাণক্য ও চন্দ্রগুপ্ত তুল্যকাল । চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যুকু প্রায় ১০০ বৎসর পরে মগধে
স্বপ্নশাসনের প্রতিষ্ঠা হয় । ঐ শাসনকালে কালিদাসের শকুন্তলা সমাজে পরম
সমাদর লাভ করিয়াছিল । লোকে যেন একে রাধাকৃষ্ণের বা হরপার্বতীর

চিত্র অবলম্বনে কার্যকার্য করিয়া থাকে, তৎকালে চিত্রশিল্পের মৃগয়া প্রভৃতি শকু-
 ত্বলার দৃশ্য অবলম্বনেও সেইরূপ করিত । ঐদৃশ প্রচার ও সমাদর লাভ করিতে
 ১০০ বৎসরের অধিক সময় লাগিবে মনে করা কিছুই অসম্ভব নহে । তাহা হইলে
 চাণক্য ও কালিদাস একই সময়ের লোক, ইহাই দাঁড়াইল । এতেও চাণক্য
 অপেক্ষায় ভাসের পূর্ববর্তিতা অব্যাহত থাকিয়া যাইতেছে । আর পূর্বপ্রবন্ধের
 মূল সিদ্ধান্তগুলির কোনও রূপ সন্দোহ হইতেছে না । এই ভ্রম দেখাইয়া দেওয়ার
 জন্য প্রদর্শকের নিকট কৃতজ্ঞ রহিলাম ।

প্রথম প্রস্তাবে ভাসের আবিষ্কার, যোগ্যতা, দাবী ও কাল সর্বক্ষে আলোচনা
 করা গিয়াছে । 'তৎপ্রতি একটা আপত্তি, আর ভাসের দেশ ও কাল সর্বক্ষে দুইটা
 মত্ববা, উপস্থাপিত হইয়াছে । অদ্য প্রথমে সেইগুলির চর্চা করিব ।

আপত্তিটা এই—চাণক্যের উক্ত 'নবং শরাবম্' ইত্যাদি দ্বিতীয় শ্লোক ভাসের
 'প্রতিজ্ঞা' নাটকে রহিয়াছে ; অথচ ভাস উহাকে উক্ত বলিয়া নির্দেশ করেন
 নাই । তবে সে শ্লোক ভাসের নিজের । কাজেই পূর্বপ্রস্তাবে উভয় শ্লোক
 একই স্থান হইতে উদ্ধৃত দেখাইয়া আমি যে প্রতিবাদের অবতারণা করিয়াছি,
 তাহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে ভাসের গ্রন্থে উভয় শ্লোকই ছিল, কিন্তু কদা-
 চিৎ কোনও লেখকের দোষে একটা খালি হইয়াছে, পরবর্তী লেখকেরা যথাদৃষ্ট
 একটা শ্লোকই লিখিয়া গিয়াছেন ।

এ আপত্তি গুরুতর না হইলেও উপেক্ষার যোগ্য নহে । উত্তরে বলি—মনে
 করুন আপত্তির সহিত হইল না । তাহাতে কতি বুদ্ধি কার ? "ভাস চাণক্যের
 পূর্ববর্তী" শাস্ত্রমহাশয়ের এ সিদ্ধান্তে আমার বিবাদ নাই । তিনি যে প্রণালীতে
 এ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, আমি শুদ্ধ তাহারই প্রতিবাদ করিয়াছি । আমা-
 দের উভয়ের লক্ষ্য একই, পথ বিভিন্ন এই মাত্র প্রভেদ । তবে অবশ্য একথা
 স্বীকার করিতে হইবে যে, ঐ প্রণালী নির্দোষ প্রমাণ করিতে পারিলে
 শাস্ত্রমহাশয়ের মুখরক্ষা তো হইলই, অধিকন্তু ভাসের পূর্ববর্তিতা দুইটা স্বতন্ত্র
 ভিত্তির আশ্রয়ে বিগুণ দৃঢ়তার সহিত প্রতিষ্ঠিত হইল ।

চতুর্থের বিষয় সংস্কৃতগ্রন্থকারেরা সব সময় উক্ত অংশের মূল নির্দেশ আব-
 ল্যাক মনে করেন না, কাজেই মূলের উল্লেখ নাই বলিয়া, শ্লোকটা ভাসের নিজের
 একথা বলা যায় না । তববোধিনী ও মনোরমা সিদ্ধান্তকৌমুদীর দুইখানি প্রসিদ্ধ
 টীকা । তববোধিনীকার প্রতিপক্ষে মনোরমার বিচার উক্ত করিয়াও দুইচারিটা
 স্থল ভিন্ন বড় একটা ঋণস্বীকার করেন নাই । আমাদের বাল্যে পল্লভকলিলেজে

৮ভরত শিরোমণি মহাশয় স্বস্তির অধাপক ছিলেন। শুনিয়াছি কোনও একটা বড় মোকদ্দমায় তাঁহাকে জজ-পণ্ডিতরূপে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্ত হাইকোর্টে ঘাইতে হইয়াছিল। Sir Barnes Peacock তখন প্রধান বিচারপতি। মোকদ্দমার ৮ধারকানাথ মিত্র এক পক্ষের উকীল। শিরোমণি মহাশয় বচনের পুত্রবচন উদ্ধৃত করিয়া অর্পণ করিয়া ঘাইতেছেন, সবই মিত্র মহাশয়ের সপক্ষে। প্রতিপক্ষের উকীল আর সহিতে পারিলেন না। তিনি Peacock সাহেবকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—ধর্ম্মাবতার, ইনি বচনের মূল বলিতেছেন না। শিরোমণি মহাশয়কে প্রশ্ন করা হইল—আপনার কথার প্রমাণ কি? ব্রাহ্মণের স্তুতিমানে আঘাত লাগিল, তিনি মনে করিলেন, কথাগুলি প্রমাণিক নহে বলিয়া সন্দেহ হইতেছে। অমনি সগর্বে মাথা উঁচু করিয়া বুক চাপড়াইয়া বলিলেন “প্রমাণ আমি” !! প্রতিপক্ষ পাইয়া বসিলেন, বলিলেন—হজুর এঁর প্রমাণ নাই, বলিতেছেন নিজেই প্রমাণ। বেগতিক দেখিয়া মিত্র মহাশয় বলিলেন—ধর্ম্মাবতার, স্বতিনায়ে ইহার যেমন প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও অপ্রতিবন্দ্য অধিকার, তাহাতে ‘ইনি নিজে প্রমাণ’ এ অজ্ঞায় উক্তি নহে। তথাপি এঁর কথার মূল নাই এ অসম্ভব। আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি। তখন বুঝাইয়া বলা হইল—হজুর জানিতে চান আপনার কথাগুলি ঋষিবাক্যের অন্তর্কূল কি প্রতিকূল। “ও হু তাই !!” বলিয়া “যাক্তবক্ষ্য এই বলেন” “আপনত্ত্বের মত এই” “আখ্যায়নে এই আছে” ইত্যাদিক্রমে কয়েকটা নাম করিতেই Peacock সাহেব বলিলেন “Enough.” বলা বাহুল্য মিত্র মহাশয়ের জয় হইল। এই দৃষ্টান্ত হইতেই বৃহৎ মূলনির্দেশে ভারতবাসীর আগ্রহ কত দূর। সীতাহরণের পর রাম তাঁহার অধেষণ করিতে করিতে মুমূর্ষু জটায়ু দেখা পাইলেন। রামাষণে আছে জটায়ু বলিলেন—

যামোষমিষিবাণ্ডয়ন্ বিচিনোষি মহাবনে।

স। সীতা মম চ প্রাণা রাবণেনোভয়ং হৃতম্ ॥

ভবভূতি টাঁহার বীরচরিত গ্রন্থে এই শ্লোকটা অবিকল উদ্ধৃত করিয়াছেন, কিন্তু বাস্তবিকের নাম করেন নাই। কথশিবাগণের আগমনে রাজ্য হৃদ্যন্ত বিনয়ের সহিত আসনভাগ করিয়া পাড়াইলেন, দেখিয়া শাস্ত্রবের মুখে কালিদাসের সরস্বতী বলিয়া উঠিলেন—

ভবান্তি নম্রান্তরবঃ ফলাগঠৈম্ পূবাশুভির্দৃষ্টবিলম্বিনো বনাঃ।

অনুজ্ঞতাঃ সংপূক্বাঃ সমুজ্জিভিঃ স্বভাব এতৈব পরোপকারিণাম্ ॥

• মানসী । [৩৭ম বর্ষ, ১ম খণ্ড—১ম সংখ্যা ।

শ্লোকটা ভর্তৃহরি স্বরূপ নীতিশতক গ্রাণ্ডে কোনও মূলের উল্লেখ না করিয়া গ্রহণ করিয়াছেন । বিহুরের গৃহে ভগবান্ অতিথি হইলে ভক্ত বলিয়াছিলেন—

সামে প্রীতিঃ পুকারাক ভদাগমুনসন্তবা ।

সাম কিমাবেদাতে তুভামস্মরাস্মাসি দেহিনাম্ ॥

আর কালিদাস সপ্তর্ষিগণকে মহাদেবের সম্মুখে আনিয়া তাঁহাদের মুখে বলাইতেছেন—

যা নঃ প্রীতিবিরূপাক ভদমুদ্যানসন্তবা ।

সাম কিমাবেদাতে তুভামস্মরাস্মাসি দেহিনাম্ ॥

সপ্তর্ষির ও ভক্তের উক্তি ঠিক এক না হইলেও এতই সরূপ যে কালিদাস ব্যাসের কর্ণে প্রতিক্রিয়া করিয়াছেন বলা যাইতে পারে, অথচ তিনি ব্যাসের নাম করেন নাই ।

দ্বিতীয়তঃ দেখুন “নবং শরাবম্” ইত্যাদি শ্লোকে যদি মূলের উল্লেখ করিতে হয়, কে করিবেন ? কবি স্বয়ং উল্লেখ করিতে পারেন না, কারণ নাটকে রঙ্গ-যোজনা (Stage-direction) ভিন্ন কবির উক্তি থাকিতে পারে না । পাত্র ও উল্লেখ করিতে পারেন না, কারণ তথ্য তাঁহার অবসর নাই । কিসে তিনি অনবসর জানিবার জন্ত তৎকালের বটনাবলীর প্রতি লক্ষ্য করা যাউক । বৎসরাজ অবস্তির কারাগারে । তাঁহার মুক্তির জন্ত, সেবকগণ অনেকে ছদ্মবেশে অবস্তি-রাজের অধীনে নিয়োগ গ্রহণ করিয়াছেন । একদিন সুযোগক্রমে বৎসরাজ অবস্তিরাজকন্যা বাসবদত্তাকে লইয়া পলায়ন করিলেন । চারিদিকে ঘোর কোলাহল উঠিল । “এক ছদ্মবেশ সেবক কোলাহলের মর্ম বুঝিয়া গর্জন করিয়া বলিয়া উঠিলেন—”ভো ভোঃ সুহৃদঃ শৃণুঃ ভবন্তঃ নবং শরাক সলিলাঃ সুপূর্ণম্” ইত্যাদি । দেশ ও কাল ভাবিলে তখন কার্য্যের সময়, বাক্যব্যয়ের সময় নহে । সে সময়ে যাত্রার স্থায় লক্ষ্য প্রভুর পদবীর অহুসরণ অথবা প্রভুর পশ্চাৎ ধাবিত বিপক্ষগণের আক্রমণ, ইহাই সেবকের কাজ । এই কার্য্যের অহুকূলে কোন্ কোন্ মূনি মত দিয়াছেন সে কথা তাঁহার মনেও আসিবে না, উল্লেখ দূরের কথা ।

অতএব মূলের উল্লেখ নাই বলিয়া শ্লোকটি ভাসের রচিত মনে করিতে পারি না ।

পক্ষান্তরে, ভাবিয়া দেখিলে মনে হয় যেন চাপকোর উক্ত উভয় শ্লোক তো এখানে ভুলই না, অধিকন্তু যে শ্লোকটা এখন আছে, “ভাষ্যে ভাস নিখিয়া বাস

নাই, পরবর্তী কোনও পাঠককর্তৃক এখানে প্রকিপ্ত হইয়াছে। প্রমাণে প্রকরণ দেখুন। প্রোকেসর বক্তা বৎসরাজের একজন চর। ছদ্মবেশে হাতীর নহিত সাক্ষিরা গাজসেবক নামে এতদিন অবস্থিতে পরিচিত আছেন। বৎসরাজের পলায়ন-কালে তিনি মনমত্ততার ভান করিতেছিলেন। কোলাহল শুনিয়া ব্যাপার বুঝিয়া বলিতেছেন—অবিদ্রমন্ত স্বামিনঃ। বয়ং থলু আর্গাযোগদ্ধারায়নেন শ্বেদু শ্বেদু স্থানেবু স্থাপিতাশ্চারপুরুষাঃ। যাবদহমপি সূক্ষ্মদনস্ত সংজ্ঞাং করোমি। এতে তে সূক্ষ্মদো নিরোধমুক্তা ইব ক্লকসর্পাঃ ইত্যুক্তো নির্ধাবন্তি। ভো ভোঃ সূক্ষ্মদঃ শূদ্রস্ত ভবন্তঃ। নবং শরাবম্ ইত্যাদি। সার এই—প্রভুর মঙ্গল শুভক। আমরা আর্গা যোগদ্ধারায়নের চর, যথাস্থানে নিযুক্ত হইয়াছি। আমি সূক্ষ্মদগণকে সন্বেদিত করি। এই যে সূক্ষ্মদেরা কারামুক্ত ক্লকসর্পের জায় ইত্যুক্তঃ ধাবিত হইতেছে। ওহে সূক্ষ্মদেরা শুন—নবং শরাবম্ ইত্যাদি।

এখানে “নবং শরাবম্” ইত্যাদি প্রোকেসর প্রয়োজন কি? সূক্ষ্মদগণকে উপস্থিত ক্ষেত্রে কর্তব্য বুঝাইয়া দেওয়াই একমাত্র প্রয়োজন। কিন্তু এই সূক্ষ্মদেরা সকলেই কোলাহলী লোক, বৎসরাজে পরম প্রীতিমান। প্রভুর বিপদে বিপন্ন ও প্রলীড়িত হইয়া ইহারী স্ত্রী, পুত্র প্রভৃতি স্বজনের মমতা ত্যাগ করিয়া কোলাহলী ছাড়িয়া ছদ্মবেশে শত্রুগণের নানাবিধ ক্রোশে দিনু কাটাইয়া প্রভুর অপমানের প্রতিশোধ লইবার স্বযোগ অপেক্ষা করিতেছে। ইহাদিগকে এই মুহূর্ত্তে এই একটা প্রোকেসর কর্তব্য আর কি বুঝাইয়া দিবে? ইহারী কর্তব্য পূর্বে হইতেই বুঝিয়াছে, আর বুঝিয়াছে বলিয়াই আজ ইহারী অবস্থিতে প্রাণসংশয়ে প্রবাসী। উপস্থিত ক্ষেত্রে ইহাদের উত্তেজনার অল্প প্রোকেসর প্রয়োজন একথাও বলা যায় না। সে সময়ে বয়ং বক্তারই কতকটা উত্তেজনার অভাব দেখা যায়। সূক্ষ্মদেরা যারপরনাই উত্তেজিত একথা বক্তার “নিরোধমুক্তা ইব ক্লকসর্পাঃ” এই উপমা হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। সূক্ষ্ম উত্তেজিত নয়, উত্তেজনার বশে ইহারী “ইত্যুক্তো নির্ধাবন্তি”—দংশন করিবার অল্প ইত্যুক্তঃ অপকারীর অন্বেষণে ধাবিত হইতেছে। চির-প্রার্থিত শুভফল অল্প ইহাদের সমীপে উপস্থিত। তদর্শনেই ইহারী উত্তেজিত। তৎকালে ইহাদের উৎসাহ চন্দ্রোদয়ে প্রবৃত্ত সাগর-জলের জায় উদ্বেল। ইহাদের অল্প প্রোকেসর আশ্রিত, আর অরণ্যে বৃক্ষোস্তমগণের বিমর্দে প্রবৃত্ত প্রবল প্রভঞ্নের বেগবৃদ্ধির অল্প কৃৎকার-প্রদান, ভূলাক্ৰান্ত হাঙ্কর সন্মেল নাই।

বস্তুতঃ উক্ত “ভো ভোঃ সূক্ষ্মদঃ” এই কথাটির পর “শূদ্রস্ত ভবন্তঃ” হইতে আরম্ভ করিয়া “নবং শরাবম্” ইত্যাদি প্রোকেসর শেষ পর্য্যন্ত, যেন প্রকরণের সহিত সঙ্গত

হইতেছে না । এই অংশ ছাড়িয়া দিলে বাক্যের শেষ ভাগের আকার এইরূপ হয়—“এতে তে স্নহদো নিরোধমুত্তম ইব কৃষ্ণসর্পা ইত্যন্ততো নির্ধাবন্তি । ভো ভোঃ স্নহদঃ, ক স্ন খলু আখ্যায়োগকরায়ণঃ” ইত্যাদি—এই যে স্নহদেরা সর্পের মত এদিকে সেদিকে দাবিত হইতেছে! ওহে স্নহদর্গ, বলি, আখ্যায়োগকরায়ণ কোথায় ?” ইত্যাদি । ইহাতে বাক্যের স্বাভাবিকতা অক্ষত থাকিতেছে । এ সামাজ্যাতিক মুহুর্তে ‘নেতা কোথায়’ এ প্রশ্ন সর্বত্র মনে হওয়ার কথা । স্নহদর্গের প্রতি নিতান্ত অনাবশ্যক কতকগুলি উপদেশবাণী বর্ণন করিয়া পরে নেতার অহুসঙ্কান অস্বাভাবিক সন্দেহ নাই । ভাস মহাকবি, তাঁহার চক্ষে এ অস্বাভাবিকতা ধরা পড়িল না এ মনে করা অস্বাভাবিক । তাই বলি শ্লোকটা এখানে প্রকৃষ্ট ।

কবির দেশ ও কাল লব্ধে মত্তবা দুইটি এই—(১) ভাস খ্রীষ্টের পরবর্তী তৃতীয় শতাব্দীর লোক হইতে পারেন । (২) সম্ভবতঃ তিনি দাক্ষিণাত্যের লোক ।

এই দুই সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে উপস্থাপক মহাশয়ের দৃঢ়প্রতিভা নাই ; তবে উভয়ই আলোচনার যোগ্য এইমাত্র তাঁহার ধারণা । তিনি বলেন প্রতিজ্ঞায়োগকরায়ণ, স্বপ্নবাসবদন্ত, পঞ্চরাত্র, অবিমারক, বালচরিত, অভিষেক এই কয়খানি নাটকের অন্তর্ভুক্ত শ্লোক এই উভয় সিদ্ধান্তের অঙ্গুল । স্বপ্নবাসবদন্ত ও বালচরিতের শ্লোকের শোধার্ক এই—

মহীমেকাতপত্রাঙ্কং রাজসিংহঃ প্রশান্ত নঃ ।

অপর কয়খানি নাটকে আছে—

ইমামপি মহীং কৃৎস্নাং রাজসিংহঃ প্রশান্ত নঃ ।

অর্থ ছয়েরই এক—আমাদের রাজসিংহ সমগ্র পৃথিবী শাসন করন ।

শ্লোকার্কে রাজসিংহ শব্দের বার বার আগুতি দেখিয়া মন্তব্যের উপনৈতা মনে করেন ভাস রাজসিংহ নামক কোনও রাজার অধিকারে বাস করিতেন । নাটকান্তে শ্লোকচ্ছলে কবি স্বপ্রভুর ঐশ্বর্যকামনা করিতেছেন । অহুসঙ্কানে পাওয়া যায় খ্রীষ্টের পর তৃতীয় শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যে পাণ্ড্যবংশে রাজসিংহ নামে এক রাজা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । অতএব ভাস ঐ সময়ে ঐ দেশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন একথা অসম্ভব নহে ।

ইহার উত্তরে বলা যায় উক্ত শ্লোকের রাজসিংহ শব্দ কাহারও নাম নহে । সিংহশব্দ এখানে শ্রেষ্ঠাধিপতি । অর্থাৎ রাজসিংহশব্দ মহারাজ অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে । প্রমাণে পঞ্চরাত্র নাটকের শেষবাক্য দেখুন । সেখানে বক্তা দ্রোণ । তিনিও বলিতেছেন—ইমামপি মহীং কৃৎস্নাং রাজসিংহঃ প্রশান্ত নঃ । এখানে

দ্রোণের লক্ষ্য রাজা দুর্যোধন। রাজসিংহ শব্দ তৃতীয় শতাব্দীর রাজবিশেষের নাম হইলে দ্রোণ দুর্যোধনকে লক্ষ্য করিয়া ঐ শব্দ প্রয়োগ করিতে পারিতেন না।

তর্কস্থলে বলা যাইতে পারে—দ্রোণকে উপলক্ষ্য করিয়া কবি স্বপ্রভুর প্রতি কটাক্ষ করিয়াছেন। আর, পঞ্চরাশ্রে না হয় দ্রোণবাক্য বলিয়া রাজসিংহ শব্দে মহারাজ অর্থ হইল, অস্ত্র গুলিতে শেষ শ্লোক তরতবাক্য, সেই গুলিতে রাজসিংহ শব্দ কবির স্বপ্রভুর নাম মনে করায় দোষ নাই। উত্তর—নাটকের শেষে তরতবাক্যে তাৎকালিক কোনও রাজার নাম করার রীতি নাই। না থাকার কারণও রহিয়াছে। কবি গ্রন্থ লিখিয়া উহার প্রচার অবিজ্ঞিত থাকুক ইহাই কাননা করেন, এজন্য যাহাতে প্রচারের বিষয় হইতে পারে এমন কোনও কাজ তিনি করিতে পারেন না। কিন্তু তদানীন্তন কোনও রাজার নাম তরতবাক্যে থাকিলে প্রচারবিষয় অবশ্যজ্ঞাত, কেননা ঐ রাজার অভাবে সে নাটক আর অভিনীত হইতে পারিবে না। রাজসিংহের পুত্রের রাজত্বকালে “রাজসিংহঃ প্রশান্ত নঃ” এই তরতবাক্য নিতান্ত অসংলগ্ন হইবে, কাজেই ভাসের নাটকের অভিনয় রচিত হইবে, নাটকগুলির প্রচার বন্ধ হইবে।

বলিতে পারেন, ভাসের নাটকগুলির অপ্রচারই তো ঘটয়াছিল, অতএব রাজসিংহ যে নাম সেই কথারই পোষকতা হইতেছে। কিন্তু অপর দিকে দেখুন সে কালে রাজারই সম্মুখে নাটকের অভিনয় হইত। ভাসের নাটকের অভিনয়-কালেও সেথা যায় স্বয়ং রাজা রজালয়ে উপস্থিত ছিলেন। স্বপ্রবাসবদন্তে দূতদ্বারা প্রবেশ করিয়াই আশীর্বাদ করিতেছেন—

উদয়নবেন্দুর্জ্ঞানবাসবাদস্তাবলৌ বলন্ত স্বাম্।

পদ্মাবতীর্ণতীর্ণৌ বসন্তকন্তৌ ভূজৌ পাতাম্ ॥

অর্থাৎ—“বলদেবের দুই বাহু আপনাকে রক্ষা করুক”—বলন্ত ভূজৌ স্বাম্ পাতাম্। আশীর্বাদ সমগ্র পরিষদের প্রতি হইল না, বাছিয়া একটা মাত্র লোককে করা হইল। সে লোক রাজা ছাড়া আর কেহ হইতে পারে না। ‘স্বাম্’ এই একবচন হইতে রাজা উপস্থিত বুঝি যাইতেছে। অবিমারকে একথা আরও স্পষ্টভাবে দেখান হইয়াছে। তত্ৰত্যা আশীর্বাদ-শ্লোকটা এই—

উৎকিণ্ঠাং সাহুকম্পং সলিলল্লিখিতলাভেন্দুদংষ্ট্রীক্লান্তাম্

অক্রান্তামাজিমধ্যে নিহতমিতিহুত্মৈকপাদাবধূতাম্।

সমুত্তাং প্রীতিপূর্ব্বং স্বভূজরশগতমৈকচক্রাভিগুপ্তাং

শ্রীমান্ নারায়ণন্তে প্রদিশত্ব বহুধামুচ্ছিতৈকাতপত্নাম্ ॥

অর্থাৎ “ভগবান্ নারায়ণ আপনাকে সমগ্রপৃথিবীর অধীশ্বর করুন” । রাজা ভক্তি আর কেহ এ আশীর্বাদের পাত্র হইতে পারেন না । অপরের প্রতি এ আশীর্বাদ প্রয়োগ করিলে রাজত্বোহ হইবে । উভয় স্থলেই রাজাকে রত্নাণ্ডে উপস্থিত বলিতেছি কারণ প্রাকোক্ত ‘তাম্’ ও ‘তে’ এই শৃঙ্খলের নির্দেশ অল্পস্থিতেই প্রতি হইতে পারে না ।

এই উভয় নার্টকের ভরতবাক্যে আছে “রাজসিংহঃ প্রশান্ত নঃ”—আমাদের রাজসিংহ সমগ্র পৃথিবী শাসন করুন । রাজা বসিয়া আছেন, তাঁহার মুখের উপর নাম উচ্চারণ করা হইতেছে, অথচ সম্মানহৃচক বা প্রশংসাবোধক একটি বিশেষণও দেওয়া হইতেছে না । ‘আমাদের দীনপালক রাজসিংহ’, ‘আমাদের শরণাগতবৎসল রাজসিংহ’ ইত্যাদির কোনও একটি বলিলেও এক প্রকার চলিত । উচিত সংবোধন করিতে হইলে বলিতে হয়—আমাদের দীনপালক রাজাদিরাজ ঐরাজসিংহ দেব ইত্যাদি । আছে হুধু “আমাদের রাজসিংহ” । এ অসহ বেদাদবী । এবে বেদাদবী তাহা ভাস বিলক্ষণ জামিতেন । রাজা তো রাজাই, মন্ত্রীর নাম ও সম্মানহৃচক বিশেষণ বিনা লোকে উচ্চারণ করুক ভাস তাহাতে রাজি নহেন । দৃষ্টান্ত দেখুন—বৎসরাজ শত্রুকর্জুক গৃহীত হইয়াছেন । আপ্তভৃত্য হংসক আসিয়া অমাত্য যোগকরায়ণকে এই সংবাদ জানাইল । নানা কথার পর যোগকরায়ণ জিজ্ঞাসা করিলেন—“অথ নামন্তরেণ স্বামী ন কিঞ্চিদাহ” —আচ্ছা আমার সমক্ষে প্রভু কিছু বলিলেন না ?

হংসকঃ—অযা, অথি । পদকুখিনীকরঅন্তো ভট্টারং অন্তজ্ঞলাবগাঢ়াএ দিট্টীএ বহুকং সন্দট্টকামেণ বিম কি ভট্টিনা উত্তো গচ্ছ জোঅফ—ই । মহাশয় তাহাও বলিবার আছে । যখন জলভারাক্রান্ত চক্রে প্রভুর প্রদক্ষিণ করি, তখন প্রভু যেন কর্তৃ কিছু বলিবেন মনে করিয়া, বলিলেন—যাও যোগক—
যোগকরায়ণঃ—স্বৈরমভিদীয়তাং স্বামিবাক্যমেতৎ—অচ্ছন্দে বলিয়া যাও এবে প্রভুর বাক্য ।

হংসকঃ—জোঅকরায়ণ পেঞ্চেহি ত্তি—যোগক রায়ণের সঙ্গে দেখাকর এইমাত্র ।

এখানে দেখুন হংসক “যাও যোগক—” এই পর্য্যন্ত বলিয়া আর বলিতে পারিল না । বৃক্ষিল সম্মানহৃচকপদবিরহিত ক্ষেবল যোগকরায়ণ শব্দ তাহার মুখে আসিলে সে অপরাধী হইবে । অমুক্ত বাক্যার্জ তাহার মুখেই রহিয়া গেল, দেখিয়া যোগকরায়ণ বুঝাইয়া দিলেন—প্রভুর বাক্য তুমি বলিতেছ, এতো তোমার নিজের কথা নহে । অর্থাৎ নিরূপপদ যোগকরায়ণ নীম

উচ্চারণ একেত্রে ভোমার দোষের নহে। তখন হৃৎক প্রকৃতিই হইয়া বলিল, “যাও যোগদ্ধরায়ণের সঙ্গে দেখা, কর প্রভু এই কথা বলিলেন”। যে কবি শিষ্টাচার রক্ষার এত দূর পক্ষপাতী তিনি এ ব্লোকে নির্বিশেষণে রাজার নাম ব্যবহার করিরাছেন, একথা বিশ্বাস করা কঠিন।

আবার রাজসিংহ শব্দ নাম হইলে, ‘নঃ’ শব্দটীও ঐখানে কন্মার যোগ্য নহে। ‘নঃ রাজসিংহ’—আমাদের রাজসিংহ—একথা রাজার সম্মুখে রাজপিতা রাজমাতা প্রভৃতি গুরুজনের মুখে শোভা পাইতে পারে, একজন অভিনেতার মুখে দণ্ডনীয় বলিয়া মনে হয়। এই সকল কারণে উল্লিখিত ব্লোকসমূহে রাজসিংহ শব্দে উপমিতকর্মধারণ মনে করাই অধিকতর নৃক্ষিসঙ্গত। তাঁহা হইলে পাণ্ডাবংশের রাজসিংহের সহিত ভাসের কোনও সংশ্রব রহিল না, আর কবিকে দাক্ষিণাত্যের বা গ্রীষ্টের পরবর্তী তৃতীয় শতাব্দীর লোক মনে করার কারণ উপস্থিত হইল না।

ভাসকে দাক্ষিণাত্যের লোক মনে করার পক্ষে আরও দুইটা কারণের উল্লেখ হইয়াছে। প্রথম, ভাস বৈষ্ণব। দ্বিতীয়, বর্তমানে ভাসের গ্রন্থ দাক্ষিণাত্যেই আবিষ্কৃত হইল।

ভাস বৈষ্ণব সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাঁহার পুত্রকের বহুস্থলে নারায়ণের জুতি দেখিতে পাওয়া যায়। শিব বা অন্তদেবতার মাহাত্ম্যবর্ণন একপ্রকার নাই বলিলেই হয়। কিন্তু ভাসের এই আত্মাত্মিক বিমূর্ত্তকি দেখিয়া আমাদের মনে হয়, তিনি দাক্ষিণাত্যের লোক নহেন। দাক্ষিণাত্য এক কালে লক্ষ্মণের রাবণের অধিকার ছিল। খর, দুষণ ত্রিশিরা এই তিনটা রাজপ্রতিনিধি মিলিয়া সে দেশ শাসন করিতেন। শৈবকুলচূড়ামণি রাবণ ত্রিবিষ্ণুর চিরশত্রু ও বিমূর্ত্তকের দারুণ বিষেবী ছিলেন। তাঁহার অধিকারে বৈষ্ণব থাকিতে পারিত না। মুনিগণ লুকাইয়াও যাগাদির অমুষ্ঠান করিতে পারিতেন না। দাক্ষিণাত্য তখন শৈবের আবাস ছিল, বৈষ্ণবগণ আর্ধ্যাবর্ষে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছিলেন। ত্রিামচন্দ্র প্রভৃতির বিজয়াভিযানের পর ক্রমে “বৈষ্ণবেরা দাক্ষিণাত্যে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু এখনও বোধ করি সে অঞ্চলের লোকের বাস্তব আনা ভাগ শৈব, আর, শাক্ত বৈষ্ণব প্রভৃতি সকলে মিলিয়া বাকী চারি আনা। মহারাষ্ট্রীয়েরা এখনও “শিব হর হর মহাদেও” বলিয়া অয়ধ্বনি করেন। কিছু দিন পূর্বে একদা Carnatic Infantry নামক সৈন্যদল রণবাণ্য বাজাইয়া গান করিতে করিতে কলিকাতা হইতে বারিকপুরের দিকে দৌড়িতেছিল। পাড়াইয়া শুনিলাম “লক্ষর

শব্দর শব্দর শব্দর শব্দর 'মহাদেও' এই তাহাদের প্রয়োগসঙ্গীত । অতএব বৈষ্ণব বলিয়া ভাসকে দাক্ষিণাত্যের লোক মনে করা সঙ্গত হইবে না ।

ভাসের লুপ্ত গ্রন্থগুলি সে দিনে দাক্ষিণাত্যেই পাওয়া গেল ইহাতেও কিছুই প্রমাণিত হয় না । পূর্বে প্রবন্ধে বলিয়াছি মহাভাষ্য আর্ঘ্যাবর্ষে লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, দাক্ষিণাত্যেই হইতে পুঁথি আনিয়া উদ্ধার পুনরুদ্ধার করা হয় । বাক্যপদীয় গ্রন্থে ভর্তৃহরি বলিতেছেন—

যঃ পতঞ্জলিশিষ্যোভ্যাং ত্রষ্টৌ ব্যাকরণাগমঃ ।

কালে স দাক্ষিণাত্যেণ গ্রন্থমাত্রে বাবস্থিতঃ ॥

পর্যভ্রাদাগমং লক্। ভাষ্যবীজ্যাহুসারিতিঃ ।

স নীতো বহুশাখস্বঃ চন্দ্রাচার্যাদিভিঃ পুনঃ ॥

ভাল, ভাষ্যকারের লুপ্ত গ্রন্থ দাক্ষিণাত্যে হইতে আহৃত হইল এই ভাবিয়া ভাষ্যকারকেও দাক্ষিণাত্যের লোক বলিতে হইবে কি? বলিলে ভুল হইবে, ভাষ্যকারের জন্মভূমি আর্ঘ্যাবর্ষ । সেপুন, কাত্যায়ন বার্ত্তিক করিলেন—“লোকতঃ অর্থপ্রযুক্তে শব্দপ্রয়োগে শাস্ত্রেণ ধর্ম্মনিয়মঃ, যথা লৌকিকবৈদিকেষু” । ইহার বিচারে ভাষ্যকার পতঞ্জলি দেখিলেন বার্ত্তিকে অকারণ ‘লৌকিক’ ও ‘বৈদিক’ এই দুইটা অটল শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে । ইহাদের পরিবর্ত্তে ‘লোক’ ও ‘বেদ’ বলিলে সূত্রও সংক্ষিপ্ত হয় অর্থবোধেরও ব্যাঘাত হয় না । বার্ত্তিককার এই সুগমতা উপেক্ষা করিয়া ‘লোক’ ও ‘বেদ’ শব্দে ‘ঠক্’ ‘ঠক্’ ও দুই তদ্ধিত প্রত্যয় যোগ করিয়া গ্রন্থগোরব কেন করিতে গেলেন তাহার ছেতুর অহুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া ভাষ্যকার দুই প্রকারে মীমাংসা করিলেন । প্রথম মীমাংসা এক কথায় হইল—‘এ তদ্ধিতপ্রয়োগ বার্ত্তিককারের খামখেয়ালি মাত্র । কাত্যায়ন দাক্ষিণাত্যের লোক, আর সে দেশের লোক তদ্ধিত বড় ভালবাসেন, স্থানে অস্থানে তদ্ধিত যোগ করিয়া থাকেন । এখানে বার্ত্তিককার অস্থানে তদ্ধিত যোগ করিয়াছেন—“প্রিয়তদ্ধিতা দাক্ষিণাত্যাঃ । যথা লোকে বেদে চ ইতি প্রযোক্তব্যো যথা লৌকিকবৈদিকেষু ইতি প্রযুক্ততে ।” এইরূপে যিনি পরকে দাক্ষিণাত্য বলিয়া অহুযোগ দেন, তিনি স্বয়ং দাক্ষিণাত্য নহেন এ নিশ্চিত । তাই বলি, ভাসের পুঁথি দাক্ষিণাত্যে পাওয়া গেল বলিয়া ভাস দাক্ষিণাত্যের লোক এ ভেদন কাজের কথা নহে ।

তারপর দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিয়া প্রবন্ধের কলবর বৃদ্ধি করিব না । আপনাতা ধরিয়া নিন যে ভাসের নাটকের দেশ ও পাত্রগণ, একটাও খাটি দাক্ষিণাত্যের মতে । এতেও ভাসকে আর্ঘ্যাবর্ষের লোক বলিয়াই মনে হবে ।

কিন্তু তাসকে আখ্যাবাক্তের লোক বলিবার পক্ষে 'এতদপেক্ষাঃ প্রকৃষ্টতর যুক্তি রহিয়াছে। স্বপ্নবাসবদন্ত ও বালচরিত নাটকের ভরতবাক্য এই—

ইমাং সাগরপর্য্যন্তাং হিমবর্ষিকাকুণ্ডলান্ ।

মহীমে কাতপজ্ঞাং রাজসিংহঃ প্রশান্ত নঃ ॥

অর্থাৎ—যে পৃথিবীর দুইকর্ণে হিমালয় ও বিদ্যা দুই কুণ্ডলরূপে বিরাজমান, আমাদের মহারাজ সেই সমাগরা পৃথিবীর একচ্ছত্র অধিপতি হউন। স্রোকে হিমালয় ও বিদ্যাকে দেবী দরিদ্রীর কর্ণের কুণ্ডল কল্পনা করা হইল। কর্ণধর একটা দক্ষিণে ও একটা বামে থাকে। তাসের চক্ষে পৃথিবীর দক্ষিণে ও বামে বিদ্যা ও হিমালয় এই দুই পর্বত রহিয়াছে। অতএব তাসের পৃথিবী পূর্বপশ্চিমে বিভূত, তাহার সেই হিমালয়ের উত্তরেও নাই বিদ্যার দক্ষিণেও নাই। পৃথিবী উত্তর দক্ষিণে বিভূত মনে করিলে হিমালয় উর্দ্ধে ও বিদ্যা তাহার নিম্নে আসিয়া পড়ে। তাহা হইলে আর এই দুইটিকে কর্ণের কুণ্ডল মনে করা যায় না (কারণ কর্ণধর সমন্বয়ে অর্থাৎ পাশাপাশি থাকে, উল্লেখোভাবে থাকে না), স্রোকের রূপকে ওরুতর দোষ পড়ে। অতএব আমরা বলিতে পারি যে, উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে বিদ্যা, পূর্বে বঙ্গোপসাগর, পশ্চিমে আরবসাগর এই চতুর্দিশীয়ার বন্ধ ভূখণ্ডকে ভাস 'মহী' বলিয়া জানিতেন। এই দীপার মধ্যে কোথাও তাঁহার বাস ছিল। অতএব তাঁহাকে উত্তর ভারতের লোক মনে করা অজ্ঞান নহে।

আবার দেখিতে পাই, অবিমারুক নাটকে পুত্রের বিবাহের জন্ত কাশির ও সৌবীর দেশের রাজা শ্যালক কুন্তিভোজের কৃত্তা প্রার্থনা করিতেছেন। ঐ কৃত্তা আবার সৌবীর-রাজের ভাগিনেয়ীও বটেন। শ্যালক এ প্রার্থনা অসুচিত মনে করিতেছেন না। 'অপর সকলেও ইহাতে বিস্মিত হওয়ার কারণ দেখিতেছেন না। রাজমন্ত্রী কৌঞ্জায়ন রাজাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন— "স্বামিন্, বহুযপি ক্ষত্রিয়েষু পূর্বসম্বন্ধবিশেষৌ সৌবীররাজকাশিরাজৌ স্বামিনৌ ভগিনীপতিভে তুল্যৌ অস্বত্সম্বন্ধযোগৌ, ইতি স্বামিনা চিন্তিতৌ। তত্র পূর্বমেব সৌবীররাজেন পুত্রস্ত কারণাৎ দূতঃ প্রেষিতঃ..."—স্বামিন্, "ক্ষত্রিয় অনেক উপস্থিত। তাঁহাদের মধ্যে সৌবীররাজ ও কাশিরাজ পূর্বসম্বন্ধ আছে বলিয়া বিশিষ্ট। উভয়েই আপনার ভগিনীপতি—আপনার নিকট সমান। আপনিও ইহাদের সঙ্গেই সম্বন্ধ কর্তব্য স্থির করিয়া রাখিয়াছেন। সৌবীররাজ পূর্বে পুত্রের জন্ত দূত পাঠাইয়াছিলেন...। অপর মন্ত্রী ভূতিক বলিতেছেন— "স্বামিন্ সৌবীররাজকাশিরাজৌ স্বামিনৌ ভগিনীপতিভে তুল্যৌ, অথ দেব্যা ভ্রাতা ইতি

সৌবীরেস্ত্রো' শ্লোগাধিকঃ"—স্বামিন্, সৌবীররাজ ও কাশিরাজ আপনায় ভগিনীপতি বলিয়া তুলাগোরব, কিন্তু দেবীর ভ্রাতা বলিয়া সৌবীররাজ দ্বাধাতর। সৌবীরকুমারের সঙ্গেই কস্তার বিবাহ হইল। দেববর্ষি নারদ স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া বিবাহকর্য্য সম্পন্ন করাইলেন। বর্তমানে অনেক স্থানেই একরূপ বিবাহে ঘোরতর আপত্তি হইবে। কিন্তু মহাভারতের সময়ে একরূপ বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল না। যুদ্ধিষ্ঠিরাদির মাতুল বহুদেব। অর্জুন বহুদেবকস্তা স্তভদ্রার পাণিগ্রহণ করেন। জীঠের পূর্বে পঞ্চম শতাব্দীতে মগধরাজ অজাতশত্রু কোলাধিপতি মাতুল প্রসেনজিতের কস্তা বিবাহ করেন। কালে এ প্রকার বিবাহ উত্তর-ভারত হইতে উঠিয়া যায়। বাঙ্গালায় এক্ষণে বর-কস্তার পাঁচ কস্তার বাবধান না থাকিলে বিবাহ হয় না। শুনিয়াছি দক্ষিণ ভারতে এখনও মাতুল-কস্তা বিবাহ প্রচলিত আছে। অতএব যে কালে সমগ্র ভারতে মাতুল-কস্তা বা পিতৃষ্মার কস্তা বিবাহে লোকে দোষ মনে করিত না, ভাস সেই কালে উত্তর-ভারতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, একথা বলা যাইতে পারে। বলা বাহুল্য এতদ্বারা ভাস জীঠের পূর্ববর্তী চতুর্থ বা পঞ্চম শতাব্দীতে মগধেশ্বর অজাত-শত্রুর অধিকারে, বা কোঙ্গলে প্রসেনজিতের শাসন কালে, প্রাজ্ঞভূত হইয়াছিলেন, একথা বলা হইতেছে না।

এই পর্য্যন্ত লেখার পর ভাস সম্বন্ধে ত্রিযুক্ত জয়সোয়াল মহাশয়ের টিপ্পনী ও ত্রিযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী মহাশয়ের প্রবন্ধ হস্তগত হইল। দেখিলাম ইঁহারা উভয়েই ভাসের নাটক হইতে ঐতিহাসিক তথ্য কি পাওয়া যায় প্রধানতঃ তাহারই চর্চা করিয়াছেন। আমার প্রধান উদ্দেশ্য অত্র প্রকার। ফরুজির বশে আমার জায সামান্য ব্যক্তি ভাস ও কালিদাসের কবিত্বের তুলনার প্রদানী। আমার পক্ষে কবির কালবিচার আবুধঙ্গিক মাত্র। অতএব তাঁহাদের কালবিচারে আমার বিশেষ কিছু বলিবার নাই। তবে তাঁহারা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহার সহিত আমার সিদ্ধান্তের অনেক প্রভেদ, এমনটা সামান্য ভাবে যৎ-কিঞ্চিৎ বলিতে চাই।

১৯১৩ সালের অক্টোবর মাসের Modern Review নামক পত্রের চৌধুরী মহাশয় বলেন—

"Mr K. P. Jayaswal, following the clue afforded by the Bharat-vakya of his dramas, has come to the conclusion that Bhasa was the court poet of Narayana the Kanva. In my opinion Mr Jayaswal's

theory must stand, until and unless evidence of a conclusive character comes forth to disprove it."

ইহার সার এই—“ভাসের নাটকের ভরতবাক্যে শ্রীকৃষ্ণ জয়সোমাল মহাশয় স্বত্ববিশেষ প্রাপ্ত হইয়া তদবলম্বনে স্থির করিয়াছেন যে, ভাস এক-বংশীয় রাজা নারায়ণের সভাপতিত্ব বা রাজকবি ছিলেন। আমার মতে, বিশিষ্ট প্রমাণ দ্বারা খণ্ডিত না হওয়া পর্যন্ত জয়সোমাল মহাশয়ের সিদ্ধান্তই গ্রহণ করিতে হইবে। ইতিহাস বলে, রাজা নারায়ণ খ্রীষ্টের প্রায় ৫০ বৎসর পূর্বে বর্তমান ছিলেন। অতএব ইহাদের উভয়ের মতে ভাসেরও ঐ কাল।

যে স্বত্ব অবলম্বনে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গিয়াছে, তাহা ১৯১৩ সালের জুলাই মাসের *Journal of the Asiatic Society* নামক পত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। তথায় শ্রীকৃষ্ণ জয়সোমাল মহোদয় বলিয়াছেন—

"In the *Madhyama-vyayoga*, the *Bharata-vakya*, or, to be more accurate, the last verse (for the expression *Bharata-vakya* is not to be found there) runs thus :—"As the *Samudra* is the lord of rivers, as fire is the lord of offerings, as even mind is the lord of the organs of senses, so our lord (lit. master) is the majestic *Upendra*". This *Upendra* seems to be alluded to quite in the opening line in the manuscript of Mr. Ganapati Sastri. A more pointed *slesha* may be found in the first verse of the *Avimaraka* where *Upendra* is replaced by *Narayana* :

"May the majestic *Narayana* rule for you this earth under lofty one umbrella &c" *Upendra* and *Narayana* are equivalent terms; which of the two is the proper name of the 'master' of *Bhasa*? I am inclined to identify the *Kanva* *Narayana* with *Bhasa's* *Upendra* and *Narayana* (about 53—41 B. C.)"

ইহার তাৎপর্য্য এই—“মধ্যমব্যায়োগের শেষ স্লোকে আছে—সমুদ্র যেমন নদীর প্রভু, অগ্নি যেমন আহুতির প্রভু, মন যেমন ইন্দ্রিয়গণের প্রভু, তেমনই ভগবান্ উপেন্দ্র আমাদের প্রভু। গণপতি শাস্ত্রি মহাশয় যে পৃথি থানিতে কোনও নাম পান নাই, তাহার প্রারম্ভস্লোকেই এই উপেন্দ্রের প্রতি আবার লক্ষ্য করা হইয়াছে। অবিমারক নাটকের নির্দেশ আরও স্পষ্ট। সেখানে উপেন্দ্র নাম তুলিয়া দিয়া স্পষ্টই নারায়ণ বলা হইয়াছে। যথা—আশা করি শ্রীমান্ নারায়ণ আপনার হইয়া একচ্ছত্রভাবে এই পৃথিবীর শাসন করিবেন। উপেন্দ্র ও নারায়ণ একই অর্থ। এই দুইটির কোনটী ভাসের প্রভুর প্রকৃত নাম? আমার মনে হয় খ্রীষ্টের পূর্বে

৫৩ হইতে ৪১ বৎসর মধ্যে কথবংশে নারায়ণ নামে যে রাজা ছিলেন, তিনিই ভাস্কর উপেন্দ্র ও নারায়ণ ।”

এখানে আমাদের বক্তব্য এই যে, বৈষ্ণবকবি নমস্কার ও আশীর্বাদ প্রভৃতিতে উপেন্দ্র, নারায়ণ, দত্তমাদয় প্রভৃতি নাম অবশ্য ব্যবহার করিবেন। তাহা দেখিয়া যদি মনে করা হয় যে, ঐ ঐ নামের ব্যক্তি-বিশেষের প্রতি লক্ষ্য হইতেছে, তবে হিন্দুর পক্ষে শুদ্ধ ভগবানের নাম করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। সকল দেবতার নামই আমরা মাহুঘের নাম করিয়া লইয়াছি। কালীশঙ্কর, হরিশঙ্কর, ইত্যাদিরূপে হিন্দুর নাম করা হইয়া থাকে। অতএব শাক্ত কবি কালীনাম করিলেই বলা হইবে, ও পাড়ার কালীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য তাঁহার উদ্দিষ্ট। বৈষ্ণব কবিও হরিনাম করিয়া পার পাইবেন না। কৃষ্ণে কবি কালিদাস তাঁহার কাব্যে ওপ্‌ ধাতুর শুটিকতক প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন, আর ঐ হুত্রে ইউরোপীয় প্রত্নবিৎ তাঁহাকে শুভ্রবংশের রাজকবি বলিয়া গ্রেপ্তার করিয়া বসিয়াছেন! এ নূতন প্রকারের গবেষণা। প্রণালীটা এই—কবির গ্রন্থে কোন্‌ কোন্‌ ধাতুর প্রয়োগ আছে, তাহার একটা তালিকা করুন। তালিকায় কোন্‌ ধাতুর বাহুলা ভাটাও দেখুন। এক্ষণে ভারতের রাজাবলীর মধ্যে কাহার বা ক্ষেত্রবংশের নাম ঐ ধাতু হইতে নিম্নরূপ তাহা দেখিলেই হইল। কবি ঐ রাজা বা রাজবংশের স্বাক্ষর না হইয়া যান না। এমন সহজ প্রণালীর অহুকরণ হইবে না তাও কখন হয়? আমরা ইহার অহুকরণ ধরিয়াছি নর, অহুকরণে আদর্শ ছাড়িয়া বহু উর্দ্ধে চলিয়া গিয়াছি। ধাতু-প্রত্যয় গোলমালে জিনিশ, নামের প্রয়োগ দেখুন আরও সহজ। আমরা তাহাই করিতেছি। আমাদের প্রযুক্ত প্রত্নবিদ্যার পথ অচিরে সরকের পথ অপেক্ষায়ও রূপ হইয়া উঠিবে সন্দেহ নাই! এই অভিনব প্রণালীর প্রসাদেই ভাস্কর উপেন্দ্র নাম উচ্চারণ করিতে যাইয়া রাজা নারায়ণের চাটুকবি বলিয়া ধরা পড়িতে চলিয়াছেন। একটি গল্প মনে পড়িল। বাদশাহ পীড়িত, পথ্য ব্যবস্থা হইয়াছে—উষ্ট্রমাংস। শীকারীরা উট-শীকারে বাহির হইয়া বনের দিকে চলিয়াছে। পথে দেখিল এক খরগোস বন ছাড়িয়া মহালক্ষ্মী মাঠ পার হইয়া যাইতেছে। জিজ্ঞাসা করিল—ও ভাই খরগোস, এত ব্যস্ত যে? খরগোস না পাড়াইয়া ছুটিতে ছুটিতেই বলিল—ভাই সব, বাদশাহের লোক উট ধরিতে বনে আসিতেছে। শীকারীরা ভাব না বুঝিয়া প্রশ্ন করিল—জ্ঞাতে তোমার ভয়টা কি? খরগোস হাসিয়া কহিল—আরে ভাই, শত্রু অনেক। জানি কি? কে কোথা হইতে চোঁচাইয়া উঠিবে ‘এটা উটের ছানা’ তবেই তো গেলাম!! খরগোস পলাইতে পারিয়াছিল,

উপেক্ষা ধরা পড়িয়াছেন, আর দেখিতেছি ভাসকেও ধরাইয়া দিতে বসিয়াছেন।

উপেক্ষা-ঘটিত শ্লোকটি এই—

যথা নদীনাং প্রভবঃ সমুদ্রো যথাস্থতীনাং প্রভবো হতাপঃ।

যথেন্দ্রিয়াণাং প্রভবঃ মনোহপি তথা প্রভূর্নো ভগবানুপেক্ষঃ ॥

এই শ্লোকে উপেক্ষা শব্দে রাজা নারায়ণকে লক্ষ্য করা অভিপ্রেত হইলে কবি ‘ভগবান্’ এই বিশেষণটি দিতেম না। মুনি, ঋষি বা দেবতার বিশেষণে ‘ভগবান্’ বসিতে পারে, রাজার প্রতি এ বিশেষণ চলিত নাই। পূর্বে দেখাইয়াছি তৎকালে রঙ্গভূমিতে রাজা উপস্থিত থাকিয়া অভিনয় দেখিতেন। এই নাটকের অভিনয় কালে রাজা নারায়ণ সম্মুখে বসিয়া আছেন মনে করিতে পারি। যদি যথার্থই এই শ্লোকে পুরোবর্তী রাজাকে লক্ষ্য করা হইয়া থাকে, তবে শ্লোকটি চাটুবান ভিন্ন আর কিছুই নহে। উদ্দিষ্ট ব্যক্তি কণাগুলি আশ্চর্যবিষয়ক বলিয়া স্পষ্ট বুদ্ধিতে না পারিলে চাটুবাক্য সম্পূর্ণ বার্থ হয়। কিন্তু “তথা প্রভূর্নো ভগবানুপেক্ষঃ” এই কথা উচ্চারণ করিলে রাজা নারায়ণ কিছুতেই বুদ্ধিতে পারিবেন না যে তিনি স্বয়ং এই শ্লোকের বিষয়। বস্তুতঃ রাজা নারায়ণকে লক্ষ্য করা যদি অভিপ্রেত হইত, তবে কবি সাক্ষাৎ-সবন্ধে ‘নারায়ণ’ শব্দেরই উচ্চারণ করিতেন। “নারায়ণো নঃ প্রভবন্তধেব” বলিলে সর্বাভিপ্রায় সিদ্ধ হইত। অধিকন্তু প্রভু শব্দের পরিবর্তে প্রভব শব্দ থাকাতে পূর্ববর্তী তিন চরণের সহিত চতুর্থ চরণ অধিকতর সুশ্লিষ্ট হইত। ‘প্রভব’ বলাতে অর্থের দোষ হয় মনে করা অস্বাভাবিক। ত্রিকৃৎকে লক্ষ্য করিয়া ভীম এই শ্লোক উচ্চারণ করিয়াছেন। যুধিষ্ঠির ত্রিকৃৎকে দ্বারা অনেক শত্রুর নিপাত ঘটাইয়াছেন, শত্রুযোদ্ধিত বহুবিধ বিপজ্জাল হইতে মুক্ত হইয়াছেন। অতএব ‘প্রভবতি শত্রুভ্যাঃ অনেক’ এই বৃৎপতিতে ত্রিকৃৎকে পাণ্ডবগণের ‘প্রভব’ বলা চলে। যদি বলেন “শ্লোকটি ভরতবাক্য, ভীমের উক্তি নহে, অতএব চতুর্থ চরণে রাজাকে লক্ষ্য করা আবশ্যিক; অথচ রাজা অর্থে প্রভব শব্দের প্রয়োগ নাই, কাজেই ঐ শব্দদ্বারা চতুর্থপাদ পূরণ করা অস্বাভাবিক”, তাহা হইলে “নারায়ণো নোহপিপতিস্তধেব” এই পাঠ গ্রহণ করিতে পারেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ত্রিমুখ জয়সেনার মহাশয় শ্লোকের যে অর্থ করিয়াছেন, তাহা সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। চতুর্থ চরণের ‘প্রভু’ শব্দে রাজাকে বুদ্ধিরা তিনি অস্তু তিন চরণের ‘প্রভব’ শব্দেরও রাজা অর্থই ধরিয়া লইয়াছেন। ফলে এখানে ‘প্রভব’ শব্দের অর্থ তো রাজা নয়ই, প্রভুশব্দও

রাজাকে বুঝা উচিত হইবে না । কিন্তু এ বিচার আমার পক্ষে অবশ্যকর্তব্যের মধ্যে নহে । আমার পক্ষে এক্ষণে এই মাত্র বলিলেই পর্যাপ্ত হইবে যে, নারায়ণ শব্দ শ্লোকে সুপ্রবেশ হইলেও যখন কবি তাহা ব্যবহার করেন নাই, তখন তিনি ইচ্ছা পূর্বক এ স্থলে ঐ শব্দ ত্যাগ করিয়াছেন । অতএব এ শ্লোকে লোকে উপেক্ষা শব্দে রাঙ্গা নারায়ণকে বুঝুক ইহা কবির অভিপ্রায় নহে ।

অবিমারকের শ্লোকটি এই—

উৎকিষ্টাং সাত্ত্বকম্পং সলিলনিধিজলাদেতদংষ্ট্রাগ্রকট্যম্
আক্রান্তামাজ্জিমধ্যে নিহতদিতিস্মৃতামেকপাদাবধূতাম্ ।
সমুজ্জ্বলাং প্রীতিপূর্ণং স্বভূজবলগতামেকচক্রাভিগুপ্তাং
শ্রীমান্ নারায়ণন্তে প্রদিশতু বহুধামুচ্ছিতৈকাতপত্ন্যাম্ ॥

শ্রীযুক্ত জয়সোদাল মহাশয় চতুর্থ চরণের অর্থ করিয়াছেন—‘নারায়ণ আপনার হইয়া পৃথিবীর শাসন করুন’ । এ অর্থ কিরূপে আইসে বুঝিতে পারিলাম না । শ্লোকে আছে ‘বহুধাং প্রদিশতু’ । ‘প্রদিশতু’ শব্দ প্রপূর্বক দিশ্ ধাতুর প্রয়োগ । ‘শাসন করা’ অর্থে প্রপূর্বক দিশ্ ধাতুর প্রয়োগ দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না । ভাল মানিলাম যেন ‘শাসন করা’ অর্থ হয়, তথাপি ‘নারায়ণ আপনার হইয়া পৃথিবীর শাসন করুন’ একধার তাৎপর্য বুঝা সহজ নহে । কথাটা অবশ্য রঙ্গালয়ে উপবিষ্ট পুরোবর্তী রাজাকে সম্বোধন করিয়া বলা হইতেছে । অতএব ‘আপনার হইয়া’ অর্থ ‘রাজার হইয়া’ । ‘নারায়ণ রাজার হইয়া’ বলিলে নারায়ণ ও রাজা বিভিন্ন ব্যক্তি হইয়া পড়িল । তাহা হইলে জয়সোদাল মহোদয়ের ইষ্টসিদ্ধি হইল না । শ্লোকের ‘তে’ শব্দটিতে আটকাইতেছে । এটাকে অপপাঠ মনে করিয়া ছাড়িয়া দিয়া ‘নারায়ণঃ বহুধাং প্রদিশতু’ একপাঠ ধরিলেও জয়সোদাল মহাশয়ের সিদ্ধান্তের পৌৰকতা হয় বলিয়া বোধ হয় না । ‘শ্রীমান্’ এই বিশেষণটি উহার প্রতিকূল । ‘শ্রীমান্ নারায়ণঃ’ এই কথার কবি যেন বলিতে চান ‘শ্রীসনাথো নারায়ণঃ’ অর্থাৎ ‘লক্ষ্মীর সহিত এক যোগে নারায়ণ’ । কিন্তু দেখুন লক্ষ্মী স্বয়ং কখনও রাজার প্রভৃতি পার্শ্বি ঐশ্বর্য ভোগ করেন না । তিনি এগুলির প্রদাতা বলিয়া পরিচিত, ইহাদের উপভোক্তারূপে কেহ তাঁহাকে জানে না ।

বস্তুতঃ, ‘প্রদিশতু’ শব্দ এখানে ‘দদাতু’ অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই । প্রমাণে শ্লোকের কবিস্বের বিচার আবশ্যক । কবিস্বচর্যা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য না হইলেও প্রয়োজনের অনুরোধে আপনাদের অনুমতি লইয়া করিতে

চেষ্টা করিব। শ্লোকটা কান্যাস্থে উত্তম। কবি সমর্থ ব্যক্তির দানের প্রকার বর্ণনা করিতে যাইয়া বলিতেছেন—“নারায়ণন্তে বহুধাং প্রদিশতু”—নহারাজ, আপনি নারায়ণের পরম ভক্ত। আশা করি ভগবান্ প্রসন্ন হইয়া পাণ্ডব দানের সারকৃত, রত্ন ও মণিনিচয়ের আকর, এই বহুধাই আপনার ছায় সেবককে অর্পণ করিবেন। আপত্তি—কবিবর, এ তোমার ছায়া। লক্ষ্মীর অমুগ্রাহ না হইলে কেহ পার্থিব সম্পদের অধিকারী হইতে পারে না। খণ্ডন—‘জ্ঞানান্ নারায়ণঃ’—লক্ষ্মী চিরকাল নারায়ণের অমুগামিনী। যেখানে নারায়ণ তুটে সেখানে লক্ষ্মীও তুটে; অতএব আশা অসঙ্গত নহে। প্রশ্ন—ব্রহ্মার রচনা বহুধা বিধ দিবেন, এ কিরূপ দান? উত্তর—‘সলিলনিধিজলাং সাহু কল্পম্ উৎকৃষ্টাং বহুধাং’—ভগবান্ নারায়ণ পূরের ধনে পোদারী করেন না। ব্রহ্মার সৃষ্ট বহুধা সাগর জলে ডুবিয়া নষ্টই হইয়া গিয়াছিল। বরাহমূর্তিতে নারায়ণ তাহার উদ্ধার করেন, অতএব বহুধা তাঁহার ষোপার্জিত সম্পত্তি, উহার দানে তাঁহারই অধিকার। আপত্তি—কিস্ত তুমি দেখিতেছ না যে সর্ক্সাণ্ডে সেবককে দান, স্বার্থসংস্কৃষ্ট হইয়া, অধম দানে পরিণত হইল। খণ্ডন—‘নিহতদিতিস্বতাম্ আজিমেধ্যো আক্রান্তাং বহুধাম্’—অধম দান হইবে কেন? প্রথমেই দেবতার উদ্দেশে দান হইয়া গিয়াছে। দিতিপুত্র বলি ইচ্ছা হইতে বহুধা কাড়িয়া লইলে, নারায়ণ বামনমূর্তিতে দৈত্যকে অভিজুত করিয়া ইচ্ছাকে বহুধা অর্পণ করেন। প্রশ্ন—মানিলাম এ অধম দান নহে, তথাপি যে দ্রব্য প্রভুর ভোগে আসিল না সেবক তাহা ভোগ করিবে কিরূপে? বহুধার দান আমি কল্পে গ্রহণ করিল। উত্তর—‘স্বভূজবশগতাং প্রীতিপূর্কং সম্ভূ বহুধাম্’—ক্সাং নারায়ণ বহুধাকে বরাহাবতীরে ছায়তঃ অর্জুন করিয়া, বামনাবতারে সংপাণ্ডে বিতরণ করিয়া, রামীাবতারে স্বয়ং ভোগ করিয়াছেন। অতএব প্রভুর প্রসাদই আপনার ভোগে আসিতেছে, আপনি ইতস্ততঃ করিবেন না ॥ প্রশ্ন—ভাল, প্রভুর সেবক অনেক, সকলকেই তিনি কিছু কিছু দিবেন, আমার বিশেষত্ব কিসে হইল? উত্তর—উচ্ছ্রিতৈকাতপজ্ঞাং বহুধাং প্রদিশতু’—আশা করি প্রভু আপনাকে ইতরবিলক্ষণরূপে একচ্ছত্ররাজ্য করিবেন। প্রশ্ন—বহুধায় রাজচ্ছত্রের বাহুল্যনবোও এক্ষে নারায়ণের আগ্রহ হইবে কেন? উত্তর—‘একদংষ্ট্রোৎকৃষ্টাম্ উৎকৃষ্টাং বহুধাম্’—সকল ক্রিয়ায়ই নারায়ণের একত্ব আগ্রহ। দেখুন বহুধার উদ্ধারে, ছই দস্ত থাকিতেও এক দস্তেই তিনি উৎক্ষেপণ ক্রিয়া নির্বাহ করিলেন। আপত্তি—ভাল, উৎক্ষেপণ ক্রিয়ায় না হয় একত্বযোগ হইল।

কিন্তু ক্রিষ্মা যে নানা প্রকার । উৎক্ষেপণ অবক্ষেপণ, ধারণ প্রভৃতি ক্রিয়াভেদ আছে তো ? খণ্ডন—‘একপাদাবধূতাম্ আক্রান্তাং বহুধাম্,—দৈতারাঙ্গ যখন পাতালে অবর্জিত হইলেন তখন এক পাদেই নারায়ণ পৃথিবীকে আক্রমণ করিয়াছিলেন । এটা অবক্ষেপণ ক্রিয়ায় একত্ব । প্রশ্ন—বেশ, ধারণ ক্রিয়ায় একত্ব কোথায় ? উত্তর—‘একচক্রাতিগুপ্তাং সমুজ্জ্বলাং বহুধাম্’ ভোগের সময়ও নারায়ণ একচক্রের অর্থাৎ স্বর্গাদেবের বংশকে আশ্রয় করিয়া রামরূপে বহুধা ধারণ করিয়াছিলেন । এইরূপে যিনি সর্বক্রিয়ায় একত্বের পক্ষপাতী, তিনি ছত্রসমুচ্ছিন্ন ক্রিয়ায়ও একত্বেরই আদর করিবেন আশা করিতে পারি ।

উক্ত মৌকের যদি ইহাই প্রকৃত অর্থ হয় তবে ত্রীযুক্ত জয়সোদাল মহাশয়ের অবলম্বিত হয় ছিন্ন হইবে, তাঁহার সিদ্ধান্তও ভূমিসাৎ হইবে ।

এই স্বত্রের দৃঢ়তাসম্পাদনমানসে ত্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী মহাশয় নিম্ন-লিখিত ভাষার ইহাতে তত্ত্বসংযোগ করিয়াছেন—

“Our theory is that Bhumimitra and Narayana were respectively the eldest and the second son of Vasudeva...The peculiar fact about Balacharit is, that in this play the hero has not once been mentioned by the name Krishna—but always as Narayana—a very unusual thing in Sanskrit literature. That Vishnu in his Krishna incarnation was quite different from Narayana is stated by Bhasa himself in the introductory verse of this very play—

শঙ্করীবপুঃ পুরা কৃতযুগে নামা তু নারায়ণ-
 স্ত্রেতায়াং ত্রিপদার্পিতজীবনো বিকুঃ স্ববর্ণপ্রভঃ ।
 দুর্কীশামিতমুঃ স রাবণবধে রামো যুগেন্বাপরে
 নিত্যং যৌহনসন্নিতঃ কলিযুগে বঃ পাতু দামোদরঃ ॥

The natural inference is that Bhasa deliberately used the name Narayana to indicate that his patron and master was the real hero of the play...We also find in this drama that Vasudeva's eldest son is always called Sankarsana instead of Balaram—the better known and the more commonly used name of Krishna's eldest brother. Our idea is that Sankarsan was the real name of Vasudeva the Kanva's eldest son and Bhumimitra was a descriptive title”.

ইহার তাৎপর্য এই—“আমার মনে হয় কথবংশীয় বহুদেবের স্যোষ্ঠপুত্র ভূমি-মিত্র, কনিষ্ঠ নারায়ণ । বালচরিতে নারায়ণকে কৃষ্ণনামে মোটেই উল্লেখ করা হয় নাই, সর্বত্র নারায়ণ নাম ব্যবহৃত হইয়াছে । এ আশ্চর্য্য । বিকুর কৃষ্ণ অবতার ও

নারায়ণ অবতার পূর্ণক একথা ভাস এই নাটকেরই মঙ্গলশ্লোকে স্বয়ং বলিয়া গিয়াছেন। ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে ভাস রাক্ষাস নারায়ণকেই নাটকের নায়ক কল্পনা করিয়া ইচ্ছাপূর্বক কৃষ্ণনাম পরিত্যাগে নারায়ণ নাম ব্যবহার করিয়াছেন। বলরামকেও আগাগোড়া সঙ্কর্ষণ নামে অভিহিত করা হইয়াছে। ইহাতে মনে হয় কাব্য বহুদেবের জ্যেষ্ঠ পুত্রের প্রকৃত নাম সঙ্কর্ষণ, তুমিষির্জাতীহার উপাধিমাত্র, আপ্য নহে।”

এগুলির একটাও উচিত কথা বলিয়া মনে হয় না। প্রথমতঃ, ত্রীকৃষ্ণের অগ্র-জের নাম বলরাম নয়। ইহার নামের পূর্ণায়ে অমরসিংহ ‘বলভূত’, ‘বলদেব,’ ‘বল’ ও ‘রাম’ এই চারিটা শব্দ গ্রহণ করিয়াছেন, ‘বলরাম’ শব্দ দেখিতে পাওয়া যায় না। পরশুরাম ও ত্রীরাম হইতে প্রভেদ দেখাইবার জন্য ইলবিশেষে বলরাম বলা যাইতে পারে, কিন্তু সাধারণতঃ অমর হইতে উক্ত চারিটা নামেরই তুরি প্রয়োগ। বালচরিতের পঞ্চম অঙ্কে ‘বল’ ও ‘রাম’ এই উভয় নামই পাওয়া যায়। “দামোদরং সহ বলেন সমাচরন্তম্”, “রামেন সার্কিমিহ মৃত্যুরিবাবতীর্ণঃ”, “পূর্বজ্যোত্স্ব রাম ইতি শ্রুতং” ইত্যাদি প্রয়োগ দেখুন। দ্বিতীয়তঃ, ভাস বালচরিতের নায়ককে দামোদর নামে অভিহিত করিয়াছেন, নারায়ণ নাম তিনি তাঁহাকে দেন নাই। আবার কৃষ্ণনামে নায়ককে মোটেই লক্ষ্য করা হয় নাই একথাও বলা যায় না। প্রথম অঙ্কে হরিচক্র স্মরণন মূর্ত্তিমান্ হইয়া বলিতেছেন “চক্রোহস্মি কৃষ্ণস্ত করাগ্রশোভী”। অতএব “the hero has not once been mentioned by the name Krishna but always as Narayana”—“কৃষ্ণনাম একবারও করা হয় নাই সর্বত্র নারায়ণ”—চৌধুরী মহাশয়ের ইত্যাদি উক্তিগুলি সম্পূর্ণ নির্মূল।

জিজ্ঞাসা হইতে পারে, সর্বলোকপ্রিয় কৃষ্ণনাম পরিত্যাগেরই বা তাৎপর্য কি? কবি স্বয়ং মঙ্গলশ্লোকে এ প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন। ধৃষ্টা মার্কন্দা করিবেন, আমার মনে হয় চৌধুরী মহাশয় শ্লোকটির অর্থ বুঝিয়াছেন, তাই কবি যে এ ক্ষেত্রে কৃষ্ণনাম ত্যাগ করিতে বাধ্য একথা তাঁহার মনে আইসে নাই। “That Vishnu in his Krishna incarnation was quite different from Narayana is stated by Bhasa himself” চৌধুরী মহাশয়ের এই কথা হইতে আমার এ সন্দেহ হ্রিতর হইতেছে। ভাস মঙ্গলশ্লোকে স্বীকৃতি মোটেই অবতার বলেন নাই। কৃষ্ণও দামোদর অভিন্ন, আর বিষ্ণু ও নারায়ণ উভয়েই দামোদরের অবতার ইহাই ভাসের অভিপ্রায় বলিয়া মনে হয়। অহমতি হইলে শ্লোকটির ব্যাখ্যা করিবার একথা বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

বৈশ্বকরণ নর্মে করেন শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণত্রয়ঃ, রামাদি তাঁহারই অংশাবতার মাত্র । শ্রীকৃষ্ণের এই পূর্ণতাই শ্লোকটির প্রতিপাদ্য । নৈতিক পূর্ণতা (moral perfection) শ্লোকে উপেক্ষিত হইয়াছে । কবির লক্ষ্য দৈহিক পূর্ণতা । দেহের ও উন্নতি, সারবত্তা প্রভৃতি গুণকে অন্তরে রাখিয়া বর্ণমাত্রকে শ্লোকের বিষয় করা হইয়াছে । কবি আশীর্বাদ করিলেন ‘দামোদরঃ বঃ নিত্যং পাতু’—দামোদর আপনাদিগকে রক্ষা করুন । দামোদর কে ? ‘যঃ কলিযুগে অজ্ঞানদগ্ধিতঃ,—’ যিনি কলিযুগে বর্ণদগ্ধকে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া দেখিতে অজ্ঞানের ন্যায় হইয়াছেন ॥ কবে ইনি বর্ণবিষয়ে অপূর্ণ ছিলেন ? ‘শঙ্খক্ষীরবপুঃ পুরা কৃতযুগে’—সত্যযুগে ইহার কোনও বর্ণ ছিল না । তখন ইনি সর্করবর্ণের অভাবে অথবা তুলাসজ্জাবে বর্ণহীন হইয়া দেখিতে শঙ্খ বা ছন্ধের স্থায় ছিলেন । সে ছিল নিত্য অপূর্ণ অবস্থা ॥ তখন নাম ছিল কি ? ‘নাম্না তু নারায়ণঃ’—ঐ অবতারে দামোদর নারায়ণ নামে পরিচিত ছিলেন । বর্ণের পরিবর্তন কখন হইল ? ‘স্ববর্ণপ্রভঃ ত্রেতায়াং’—পূর্ণতা হইতে অনেককাল লাগিয়াছিল । সম্পূর্ণ সত্যযুগ শুভ্রবর্ণে কাটাইয়া কিঞ্চিৎ কৃষ্ণগুণের উপচয়ে ত্রেতায় দামোদর স্বর্ণমূর্তিতে অবতীর্ণ হইলেন ॥ তখন কি নাম ছিল ? ‘ত্রিপিদার্পিতজিহুবনো বিষ্ণুঃ’—ঐ অবতারে দামোদর তিন পাতে তিন ভুবন পরিব্যাপ্ত করিয়া ‘বিষ্ণু’ অর্থাৎ ‘ব্যাপক’ এই অর্থ নামে পরিচিত হইলেন ॥ স্বর্ণবর্ণ ছাড়িয়া কতদিনে কৃষ্ণবর্ণ হইলেন ? ‘দ্বাপরে যুগে দুর্দ্বাক্ষ্যামতমুঃ—’আবার এক যুগ স্বর্ণবর্ণে থাকিয়া আরও কিঞ্চিৎ কৃষ্ণগুণাধান হইলে দ্বাপরে ‘দ্বানদেহ’ হইলেন ॥ কি নাম হইল ? ‘রাবণবধে রামঃ’—এই অবতারে জিহুবনের রাবণ অর্থাৎ শোকপ্রদ যে লঙ্কেশ্বর রাবণ তাহাকে বধ করিয়া দামোদর ‘রাম’ অর্থাৎ ‘লোকনুগ’ এই বার্থ নামে পরিচিত ছিলেন ॥ তারপর যুগান্তে কৃষ্ণবর্ণের পূর্ণতা ঘটিল । তিনি কৃষ্ণবর্ণ হইলেন । শ্লোকের প্রথম তিন চরণে একটি একটি নাম আছে । কারণ, সমুদায় হইতে অংশ পৃথক করিলে দুইভাগ হয়, প্রত্যেক ভাগের পৃথক নাম আবশ্যক হয় । এইজন্ত দামোদর ও নারায়ণ সত্যো, দামোদর ও বিষ্ণু ত্রেতায়, দামোদর ও রাম দ্বাপরে । চতুর্থ চরণে দামোদরই কৃষ্ণবর্ণ হইলেন, অংশ পৃথক হইল না, পৃথক কৃষ্ণনামের আবশ্যক হইল না । ‘দামোদর’ নামের পরিবর্ত্তেও কৃষ্ণনাম এখানে চলিবে না । কারণ যে ক্রমে তিন তিন বর্ণের আবেশ করনা হইতেছে সে বস্তু স্বয়ং বর্ণহীন, অতএব বর্ণ পুরস্কার তাহার নাম হইবে না । এইজন্ত এখানে পরব্রহ্মের নাম দামোদর রাখা হইল, কৃষ্ণ, শ্রাম, প্রভৃতি করা হইল না । * বস্তুতঃ

চৌধুরী মহাশয়ের প্রদত্ত তত্ত্ব এতই কীল যে তদ্বারা জয়সোয়াল মহাশয়ের অবলম্বিত সূত্র কিয়ৎ পরিমাণেও ভারমহ হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

অবাস্তব কথার বাহুল্য বিরসই হইয়া থাকে। অতএব এই স্থলেই প্রস্তাবের উপসংহার করিয়া এ প্রবন্ধের প্রতিপাদিত বিষয়গুলির প্রতি পুনরায় মনোযোগ আকর্ষণ করিব। আমরা প্রধানতঃ দুইটি কথা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি—

(১) ভাস উত্তর ভারতের অধিবাসী।

(২) ভাস কোন্ কালের লোক জানা যায় নাই, কিন্তু খ্রীষ্টের ৩০০ বৎসরেরও অধিক পূর্ববর্তী একথা কতকটা দৃঢ়তার সহিত বলা যায়।

শ্রীসারদারঞ্জন রায়।

হারা।

তারই চুলের গোদার্পী ফুলের
 শুক ধূসর পাপড়ি এই—
 এই উপাধান, শয়ন-শিখান,
 শূন্য আধেক—সে আজ নেই।
 ঢকে আমার, বকে আমার,
 মুখখানি সেই লুকিয়ে রাখা!—
 এই বালিশের ঝালরগুলি,
 তারই কালো অলক-ঢাকা;
 যেখানটিতে রাখত মাথা,
 চাইলে পরে পরাণ ফাটে—
 আধেকখানি, শূন্য আজি,
 দীর্ঘ নিদ্রাধ একলা কাটে।
 এম্নিতরই চান্দনী রাতে
 বালির বালিশ-শয্যা 'পরি
 শুইয়ে দিলাম শেষ প্রতিমা—
 অধর জম নিলাম ভরি'।
 এই হৃদয়ের আধেকখানি
 পুড়ল ধূম্ব দ্বিতার বুকে,
 আধখানিতে, দারুণ ব্যথা,
 'শোণিত ছোটে কতর মুখে।
 শ্রীকরণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়।

অভিবাদন । *

রোগ, শোক, দুঃখ, দৈহিক, হতাশার, হতাশাস পলে পলে এই আর্ন্ত, পীড়িত বহুকরার জীর্ণ কঙ্কাল টানিয়া বাহির করিতেছে, যে আনন্দের ভিখারী হইয়া মানবের অশ্রু-অঙ্ক ভাঙ্গাল নয়ন চারিদিকে চাহিয়া চাহিয়া কামনার ধন হারা-নিধি খুঁজিয়াই মরে, সন্ধান আর কিছুতেই পায় না, সেই সঞ্জীবন সুধারসের অমৃত আশ্বাস কবে এই পীড়িত মূচ্ছিত বহুকরার আদিপুরুষগণ পাইয়াছিলেন জানি না ; কবে জ্ঞান আসিয়া অজ্ঞানের চক্রে অজ্ঞান পরাইয়া দিয়াছিল, কবে বিশ্বের স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া ভারতের শাস্ত্রিময় শাস্ত্র তপোবন হইতে “শ্রুত বিশ্ব অমৃতস্ত পুত্রাঃ ;” বলিয়া গম্ভীর মস্ত্রে মস্ত্রোচ্চারণ হইয়াছে, কবে কোন বসন্তের প্রথম সমাগমদিনে বাগ্বেদবার মানসী মূর্ত্তি মানবের মনে উদ্ভাসিত হইয়া তাহাকে আনন্দে আত্মহারা উন্মাদ করিয়া দিয়াছিল, ইতিবৃত্ত তাহার সত্য সন্ধান দেয় না । কবে কোন সুদূর অতীতে স্বর্গের মন্মদবনের নিত্য অধিবাসিনী বসন্তরাণী তাহার প্রার্থিত পদপল্লবস্পর্শে বহুকরার জীর্ণ কলেবর পত্র পুষ্পে পূলকাক্রান্ত করিয়া দিয়াছিলেন, তাহা কেহই বলিতে পারে না । সেই দিন হইতে বর্ষে বর্ষে স্বর্গের বাতায়ন খুলিয়া একবার করিয়া তাহার মেহদৃষ্টি এই ক্রিষ্ট ধরার সর্বাপেক্ষে আসিয়া পড়ে । মল্লী, মালতী মাধবী, তখন পর্য্যাপ্তপুষ্পসম্ভারে হাতুময়ী হইয়া উঠে, অশোক আসিয়া মেহকাতর বহুকরার জংপিণ্ডের শোণিমা মানবের চক্ষের সম্মুখে ধরে, জগন্ময় চিরাদাধ্যাত্মীমূর্ত্তির বর্ণালুকরণে চম্পক আসিয়া মানবের মন হরণ করিয়া লয়, বিভূষ মর্কটরস বসন্তারবিন্দ্রের নয়নাভিরাম শোভাসৌন্দর্য্যে প্রাণমন আকুল করিয়া তোলে, তখন এই দৈন্যপীড়িত শূন্য শুষ্ক জীবনের উপর আনন্দধারার অভিযিক্তন করিবার নিমিত্ত আমরা “কৈ শ্রিয়, কোথা শ্রিয়ন্তম,” বলিয়া আমাদের প্রসারিত আলিঙ্গনের মধ্যে কাহাকে ধরিতে চাই কে জানে ? কামনার স্পর্শমণি, চিরপ্রার্থিত ধনকে পাইবার সৌভাগ্য সকলের সব সময়ে হয় কি না বলা কঠিন, আমাদের সময় অল্প, আশা বৃহৎ, সব অহুষ্ঠান সাঙ্গ করিয়া গৃহ মার্জনা করিয়া রত্নদীপ আলোহিতা বাসরশয়ন বিছাইবার পূর্বেই হয়তো নিকটদেবদাতার দূর আহ্বান আমাদের কাণে আসে, সাধের অহুষ্ঠান অসমাপ্ত রাখিয়াই, অসীম যাত্রার ভূমি বাহির হইয়া পড়িতে হয়, অসমসুহৃৎ যে অশ্রুণীর লইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলাম, বিদায়ের ক্ষণেও তাহার শেষ হইল না,

নয়নজলের কুরাশার মধ্যেই আবার যাত্রা আরম্ভ হয়, কেবে কোথায় কেমন করিয়া শেষ হয় কে বলিবে? বুকের মধ্যে অসীম আশা লইয়া যখন মূর্ছিত নয়নে স্রুথের কল্লনার বিচ্ছল হইয়া আছি, হঠাৎ চাহিয়া দেখি, আমার সমীপনে কল্পিত স্ববর্ণসৌন্দর্য তুলুপ্তিত; আশার আশ্রয় আমার জাগ্রাময় শ্মশান-বহ্নিশিখায় নিঃশেষে ভস্মসাৎ হইয়া গিয়াছে। বিনিত্র নয়নে বহুনিশা জাগরণ করিয়া যাহার অমৃতজ্ববি বার বার করিয়া বক্ষে চাপিয়া ধরিতেছি, কেমন করিয়া শিথিল পরিবেষ্টের অবকাশে বুকের মাণিক হারাইয়া ফেলিয়াছি জানি না, চাহিয়া দেখি বক্ষের মণিহার আমার বুকের কাছে আর নাই, যে সকলের সর্ব্বত্র অপহরণ করে, আমার এ কণাটুকুও সে ফেলিয়া যায় নাই। নিরন্তর নিদারুণ পরিহাসে দুর্জল মানবের আনন্দের অপরিহার্য্য বিষ এই। তাহার পর হুপ্রাপোর দুরাশা ত্যাগ করিয়া, যাহারা গিয়াছে তাহাদের অল্প শৈবক সমাপ্ত করিয়া, যে ভালবাসিয়া কাছে আসিয়াছে তাহাকে বুকে টানিয়া লইয়া, যে হৃদয়ের অল্প প্রীতি-পরিবেষ্টনের মধ্যে নিরাপদ নীড়টি রচনা করিব তাহারও পক্ষে শত বিষ সহস্র বাধা, লক্ষ অন্তরায়! যেটুকু আছে তাহাও আমরা ভাল করিয়া ভোগ করিবার অবসর পাই না। আনন্দের পরম বিষ, শান্তির চরম উৎপাত, মানব মনের হিংসা, বিবেচ, বিগ্রহ, স্বজন করিয়া যুগে যুগে প্রলয় তাণ্ডবে মত্ত হইয়া উঠিতেছে। আজ গগনের পশ্চিম কোণে যে প্রলয়কালের কালো মেঘ উদ্ভিত হইয়াছে, যে প্রাণসংহারী বিদ্বাংবহ্নি নয়ন ধাঁধিয়া দিতেছে, যে ঘোর বজ্রবে ভয়ভীত বহুকরা মুহূর্ৎ কল্পিত হইতেছে, এ কেন, কে বলিবে? দিগ্বিজয়াকাজী জিগীষুদিগের মধ্যেই এ প্রলয়নৃত্য সীমাবদ্ধ হইয়া নাই; দূরদূরান্তরবাসীর ক্ষুধার শাকারের মধ্যেও বারুদগন্ধকের রেণু আসিয়া মিশিতেছে—ইচ্ছা থাকিলেও নিবারণের উপায় করে কার সাধা? ইতিহাস বলিতেছে, বর্ষের তৈমুর একদিন মল্‌বামুণ্ডে মিশরের পীরামিড রচনা করিয়াছিল, আজ সুসভ্য ইউরোপ অসংখ্য নরমুণ্ডের উপর দাড়াইয়া শোণিতকর্দমাঙ্ক ধরিত্রীর বুকে জয় পতাকা প্রোথিত করিবার বীভৎস উদ্দেশ্যে যদি মাতিয়া উঠে, তবে জী, সম্পদ, শান্তি, শোভা, মিলন, আনন্দ কোথায় কাহার আশ্রয় খুঁজিবে ভাবিয়া পাই না।

যুগ যুগ ধরিয়া ধর্ম্ম যাহা শিক্ষা দিয়াছে, দর্শন যে দৃষ্টি দান করিয়াছে, ভাবের তাহার মানস-প্রসূত যে জীমূর্ত্তি গড়িয়া ধরণীক ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছে, শিল্পী যে চিত্রে মনমোহনের প্রয়াস পাইয়াছে, স্থপতি যাহা গড়িয়া ধরিত্রীর শোভা বর্দ্ধন করিয়াছে, সাহিত্য, কাব্য, অলঙ্কার, ছন্দ, নিরুক্ত, ব্যাকরণ, গণ সব যদি এক নিমেষে

মানবমনের বিবেচন-প্রসূত সমরানলে জলিয়া ছাইতাম হইয়াই গেল, বিংশতি হইতে আরম্ভ করিয়া পঞ্চাশৎ বর্ষ বয়স সম্বলি স্বস্থকায় মানব যদি এক দিনে নিঃশেষ হইয়া যায়, ধরণীর ঘোবনদম্পদ, লক্ষীতী, যদি মুহূর্ত্তে বিলীন হইয়াই পড়ে, তবে জয়ন্তী-জনিত আনন্দ উপভোগ করিবে কে? বিধবার অশ্রুজলের উপর, বৎসহারা জননীর হ্রঃসহ জদয়বেদনার উপর রাজছত্রের মহিমা প্রচার করিয়া, শ্রাদ্ধও পরিচালন করিয়া, স্বপ্ন ও আনন্দ হয় কিনা তাহা বলা আমার সাধার আয়ত্ত নহে। যে বিশ্বব্যাপী আনন্দধারা, সূর্য্যোজ্জ্বল, গ্রহনক্ষত্র, জলস্থল, অস্থরীক, পত্রপুষ্পপল্লব হইতে নিরন্তর অজস্র ধাবায় ক্ষরিত হইয়া সকলেরি জন্ম করিয়া পড়িতেছে, সকলকে বক্ষিত করিয়া বৃষ্টি তাহার উপভোগ সম্ভব হয় না; তাই বৃষ্টি ভারতের বনস্থলী যখন যজ্ঞধূমে সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিয়া ছিল, আর্দ্রবলির ভীতশিচিংকারে করুণা যখন অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল, তখন একদিন কপিলাবস্তুর রাজপ্রাসাদ হইতে বরাভয়ের আনীর্ষাদবাণী, আর্দ্র বস্ত্রধারার কাণে গেল। ভীতি-নিকম্পিত ধরণী আশ্রয় হইল। আজ এই পূর্ণাতিবেকী কূলাচারীদিগের মধুঘামেধ বস্ত্রে ধরিজীর কলেবর কম্পাঘিত; প্রবুদ্ধকারী বুদ্ধের জন্ম যাচিয়া কোন তপোবনে কে একমর্মে তপস্ত্রানিরত হইয়া চক্ষু মুদ্রিয়া বসিয়া আছে জানি না, প্রবল স্বপ্নার পর শাস্তি অসিবেই এ আশা ভরাশা নহে।

এ জগৎ কবে স্বার্থপর হইয়া ইহাকে নানা প্রকারে হত্যাশালা করিয়া কে গড়িয়া তুলিয়াছিল জানি না, তাপতপ্ত মানবমনে আনন্দের বিমলধারার প্রাবন আনিয়া দিবার জন্যই বৃষ্টি ভারতবর্ষের তপোবনে ধ্যান-নিবিষ্ট তপস্বীর মনে তরুণেন্দুকান্তিনর্তী স্তনভরনমিতাঙ্গী সিঁড়িতে সন্নিবৃত্তা বীণাবাদিনীর অমৃত-চ্ছবি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল। আজ এই রোগশোক, হত্যা, অরকটের দিনে ভারতের পুরুষপার্বত্যে বসিয়া যাহারা যুগযুগান্তের আরাধ্যা বাণেশবতার অমৃত নিবাসী বীণার ক্ষীণতম স্বরারও শুনিতে ও শুনাইতে এই আনন্দের মহামেলার সজ্জন করিয়াছেন, এই মহোৎসবপন্থতে সমবেত সজ্জনের জদয়ুপাত্রে সরস্বতীর পাদপীঠকমলের বিন্দু মধুও দিবার আয়োজন করিয়াছেন, তাহাদিগকে আমি বার বার নমস্কার করি।

ঐজগদীশ্বনাথ রায়।

কেশ সমস্যা ।

প্রথম যখন যৌবনেতে কঙ্কলাম পদার্পন,
চুলটা নিয়ে বড় বেশী হ'ল সন্তর্পন ।
অবশ্য সে মাথার চুল, কারণ গোঁফ দাড়ি
উঠতে তারা করেনিকো বেশী তাড়াতাড়ি ।
আর হ'লো এক বিঘম চিন্তা—কি প্রকারে চুল
মাথার পরে রাখবো, কারণ নাইক এতে ভুল
চুলটা রাখা আবশ্যক সবারি একান্ত,
বিজ্ঞানেতে ইহার নাকি হয়েছে সিদ্ধান্ত ।
আর তা ছাড়া ইতিহাসেও প্রমাণ আছে ঢের,
চুলের ভিতর শক্তি থাকে, যথা স্ত্রীমসনের ।

যদি বল পশ্চিমেতে ঘারাই পালাম্যান,
(মাঘ মাসেতে গায়ে ঘারা না দেয় আলোয়ান)
তারাই আরো একেবারে ছোট চুল ছাটে ;
তা হ'লে বলি যে তাঁরা ধারেরই বেশী কাটে
ভারের চেয়ে, অর্থাৎ তাদের এতই ঘন কেশ,
বাড়তে দিলে একেবারে ড'রে যেত দেশ ।
কিন্তু তাদের চুলের গোড়া এত বেশী পুরু,
বাড়তে দিলে মাথা হ'ত বুরুয়ের গুরু—
অর্থাৎ কি না একেবারে সজ্জাকর গাভ্র
সন্দেহ নাইক তাতে কোনো তিলমাত্র ।

শক্তিশালী নাই যে কিছু চুলের সমান ;
পূজ্যকারে কেশ-গুরু তাহারি প্রমাণ ।
বৈদ্যাতিকী শক্তি আশ্র চৌধক-প্রবাহ
টিকী দিয়া চলে যেন ধূরি পরীবাহ ।
কবিরাজ চুল ও দাড়ি রাখিতেন লম্বা ;
তাইতে ছিলেন তাঁদের প্রতি প্রীত জগদম্বা ।
নেড়ামাথা হরিন্দাস দেখতেও অতি বিজী,
• • যেমন ধারা ওপাড়ার ওই গদাধর মিত্রী ।

চুলটা রাখা অতএব বিশেষ দরকারী
 মাহুষের পক্ষে, যেমন কোলে তরকারী ।
 চুলই হ'ল মাহুষের মাথার বাহার
 ভ্যাতই যথা : তাহাদের প্রকৃত আহার ।

আর তা ছাড়া চুলের সঙ্গে নিকট সম্বন্ধ
 দেহের ও মনের ; যারা একেবারে অন্ধ,
 তারা ভিন্ন কেউ না ইহা করবে অবিশ্বাস,
 সত্য ইহা যথা মোরা টানিগো নিঃশ্বাস ।
 যদি বল, তবে কেন বুদ্ধি ভরা থাকে
 টানের মধ্যে, মধু যথা মোমাছির চাকে ?
 তা হ'লে বলি যে তাহা শুধুই কূট-বুদ্ধি,
 খুঁজে যাহা পরজিত্র, পরের অশুভি ।
 বিসমার্ক চাণক্য আর প্লাউষ্টোন মন্ত্রী,
 কূট-নীতি-বিশারদ ছিলেন কূট-যন্ত্রী ।
 ব'লে রাখি কিন্তু পাছে হয় অবিচার
 বিজ্ঞানাগর, সেকস্পিয়ারে জেনো বাড়িচার ।

এখন হ'ল ইহাই কিন্তু সমস্তা প্রধান,
 কি প্রকারে চুল রাখা উচিত বিধান ।
 চুলটা দেখে মাহুষের ধরণ ধারণ
 প্রায়ই লৌকে অনুমান করে, এ কারণ
 চুলটা নিয়ে হওয়া চাই বড়ই সতর্ক,
 এবস্থিধ মনে মনে করি নানা তর্ক,
 দেখলাম যে বেণী রাখা নহে সমীচিন ;
 কারণ তাতে হ'তে হয় নারী কিম্বা চীন ;
 ফ্রিন্সা বড় ক'রে যদি রেখে দিইঁ জটা,
 তবু ব'লে সবাই হবে আমার পরে চটা ।
 আর যদি খুব ছোট ক'রে ছোট ফেলি চুল,
 তেড়ী কাটার সখটা হবে সমূলে নির্মূল ।

আরো তবে দেখলাম, যদি রাখি এক টিকী,
 কলেজেরি ফুৎগুলো হবে টিকটিকী ;

অর্থাৎ সেটা কেটে দেবার করবে তারা চেপ্টা,
টিকী নিয়েই দেশটা ছাড়া হ'তে হবে শেষটা।
তার চেয়ে কৌকড়ানো চুল নয়কো কিছু মন্দ,
যে কারণ কেউ না সৈটা করে অপছন্দ।
কিন্তু তারো ভারি এক গুণগোল আছে,
আট আনা দক্ষিণা মাসে নরোত্তমের কাছে।
আর যদি চুল সমান ক'রে ছাটি আগাগোড়া,
বলবে সবাই মাথা যেন কদমের তোড়া।
যদি বা স্নমুখে চুল রাখি কিছু বড়,
বুড়োরা সব বলবে ঘোড়ার পিঠে গিয়ে চড়।

এ ছেন মুক্তিলা পড়ি উপায় কি করি— •

ভাবতেছিলাম, এমন সময় বন্ধু ভজহার
বলে “দেখ, বাবরী রাখা বড়ই প্রশস্ত ;
বাবরী রাখ, হবে তুমি কবির মন্ত।
বাবরী 'পরে সরস্বতী হবেন অবতীর্ণ,
গঙ্গা যথা হর-শিরে ঘন জটাকীর্ণ।
কিন্তু তারও চাই আগে প্রচুর সাধনা,
তাইতে হ'ল নাক আর বাণীর আরাধনা।
অগত্যা শেধেতে আমি করিলাম ঠিক,
সস্তাবনা বুঝে আর ভেবে চারিদিক,
নূতন প্রকারেতে চুল রাখাই বিহিত,
পিছন দিকে বড় আর সামনে বিপরীত।

ত্রিসতীশচন্দ্র ঘটক।

রামপাল।

সেদিন পৌদের এক অতি সুন্দর প্রভাত—বিহগকুঞ্জ-মুখরিত, শিশির-
সিক্ত, কুয়াসা-বিমুক্ত, বালরূপ-কিরণে সমুজ্জ্বল। যেকুণ তীব্র আকাঙ্ক্ষা ও আবেগ
হৃদয়ে লইয়া ভক্ত দেব-দেউলে ঘাবা করে, আমিও সেদিন তেমনি বাঙ্গলার এক
অপ্রময় রহস্যময় তীর্থদর্শনে যাত্রা করিয়াছিলাম।

সেই সন্মহান অতীতের বিরাট দৃষ্টাবলী যেন মুক্তি লইয়া সে দিন আমাকে দেখা দিয়াছিল। যেন দেখিতে লাগিলাম, সৌধের পর সৌধের সারি, তড়াগের পর তড়াগ—যেন মন্দিরের পর মন্দির হইতে ধূপ ধূম-গন্ধ উর্কে উখিত হইয়া দেবচরণে ভক্তের পূজার বাস্তা নিবেদন করিতে স্বর্গের গিহ্বারে যাত্রা করিয়াছে। দেউলে দেউলে শব্দ ঘণ্টা বাজিতেছে। যেন দেখিলাম, বিচ্যুত রাজপথ কোলা-হল-চঞ্চল। কোথাও বঙ্গবীর বর্ষে চখে স্পোভিত হইয়া অস্বাভাবিক সেনা-নিবাসে যাইতেছে—হস্তীর পর হস্তী চলিয়াছে, রথের পর রথ। যেন বিজয়ী বাহিনী জয়যাত্রার হইতে রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিতেছে। তুরী বাজিতেছে। জয়ডঙ্কার বিপুল নিনাদে গগন পরিপূর্ণ হইয়াছে।

এমন সময় একজন বন্ধু বলিলেন—“এই গ্রামের নাম পঞ্চসার।”

দেখিলাম অগণিত কদলীবৃক্ষ-সমাক্ষর একখানি গড়গ্রাম। মুসলমান কৃষকের হাল তাহার প্রতি ক্ষেত্র বিদীর্ণ করিয়া নানা শব্দ উৎপন্ন করিয়াছে। পশিপার্শ্বে কয়েকখানি ক্ষুদ্র কুটার পঞ্চসারের বাজার নামে পরিচিত হইয়া অল্পসঙ্কীর্ণ কোতুহল উদ্দীপিত করিতেছে।

কাণাকুজাগত পঞ্চব্রাক্ষণের চরণপূজা করিয়া আদিশুর তাঁহাদিগকে যে পঞ্চ গ্রাম দান করিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে, এই কি তাহার একখানি? আমরা কি তবে সেই সুরসরিদবধোতপাদ গোড় নগরের উপকণ্ঠে আসিয়া উপনীত হইলাম?

কালপ্রভাবে কি না হয়? শ্রমানে কুসুম ফোটে, সাগর শুক হয়, পর্বতচূড়া ধসিয়া যায়। বেদজ্ঞ ব্রাক্ষণের সামগান-মুখরিত পুণ্যক্ষেত্র যে এখন নৃতলীল গৃহপালিত কুকুট কুকুটার ক্রীড়াভূমি হইবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি? কিন্তু ইহাই কি সেই গোড়-স্মরণপদ? তবে সে সুরসরিৎ কৈ? তাহার তিরিহ বা কৈ? কোন দিন কি তাহা রামপালের সরিকটে বর্তমান ছিল? তবে তাহার ঐতিহাসিক প্রমাণ কৈ?

সত্যই কি তবে পঞ্চব্রাক্ষণ বঙ্গে আগম্বন করিয়াছিলেন? “বেদবাণীক শাক্তে গোড়ে বিপ্রাঃ সমাগতাঃ” কি তবে ঠিক? তবেদেবের ভুবনেশ্বর প্রশস্তির

*সকল গণ সমেতাঃ সাংঘ্যক ব্রহ্মনিষ্ঠা।

... ব্রাক্ষণাঃ কাণাকুজাঃ।

সুরসরিদবধোতঃ বাতি গোড়ং বনোজঃ।

...বারেজ কুলপতী।

তবে অর্থ কি? তবে তাহাতে ভবদেবকে আদিশুরের আমন্ত্রণে সমাগত পরাশরের বংশসম্ভূত বলিয়া পরিচিত করা হয় নাই কেন? কোন্ ভিত্তির উপর নির্ভর করিয়া এ কথা বলিতে সাহসী হইবে যে “বেদবাণীক শাকে” সমগ্র বঙ্গদেশে ধর্ম্মশীল বেদবিৎ একজন ব্রাহ্মণও বর্তমান ছিলেন না? বোধহয় কি বঙ্গ হইতে ব্রাহ্মণ্যকে একেবারেই বিলুপ্ত করিয়াছিল? সকল প্রকার একমাত্রই উত্তর আছে—নহাশ্রম জনশ্রুতি:। কিন্তু জনশ্রুতি এতই পল্লব-বহুল যে, শুধু তাহার ছায়ায় আশ্রয় লইয়াই নিজেদের নিরাপদ বলিয়া মনে করা যায় না।

যতই চিন্তা করিতে লাগিলাম, ততই মনে হইতে লাগিল, আদিশুর কি সত্যই একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি? যদি তাহাই হইবে, তাহা হইলে বলিতে হইবে এখন পর্য্যন্তও এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই, যাহার উপর নির্ভর করিয়া অশংসয়ে বলা যাইতে পারে—আদিশুরের ঐতিহাসিকতা সন্দেহ আর সন্দেহ নাই। জনশ্রুতি বহুদিন হইতে আদিশুরের নাম বহন করিয়া বেড়াইতেছে। সুতরাং কে অশংসয়ে কহিবে—আদিশুর কবিকল্পনামাত্র। ইনি তবে কে? দক্ষিণ রাঢ়ের অদিশি রণশুরের বংশধর? না বীরসেন? না অস্ত্র কেহ? বাঙ্গালার ইতিহাস এখনও অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন! কতদিনে সে অন্ধকার বিদূরিত হইবে? কতদিনেই বা সত্যের দ্বার উন্মোচিত হইয়া ঐতিহাসিক সারসভা আবিষ্কৃত হইবে? বাঙ্গালী এ চেষ্টা না করিলে কে আর তাহা করিবার অস্ত্র অগ্রসর হইবে? ইংরাজ লিখিত বাঙ্গালার ইতিহাসে এবং কেবল তদুপরে রচিত বাঙ্গালীর ঐতিহাসিক নিবন্ধে প্রবাদ-প্রসঙ্গও সম্পূর্ণরূপে ঐতিহাসিক প্রমাণের স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে!

সেই অল্প পরিসর ইত্যন্ত: ভয় কাঠসেতুর দ্বারা সংযুক্ত গ্রাম্যপথে আরও কিছুদূর অগ্রসর হইলাম। স্নেহবংশের গোরব-কাহিনী তখন হৃদয় মধ্যে জাগিতেছিল। সেন ও পাল রাজগণের সমর-দ্রুপ্তি যেন তখন শুনিতেছিলাম। হায় রে। কোথায় বা সেই মহারাজাধিরাজ জ্যোতিবর্ধ-পাদাঙ্ঘ্র্যাত-পরমবৈষ্ণব-পরমেশ্বর—পরমুচ্চৈশ্বর্য—মহারাজাধিরাজ হরিবর্ধদেব যিনি বিক্রমপুর সমাবাসিত শ্রীমঙ্গলরক্ষাবার হইতে ভূমি দান করিয়া তাম্রফলকে সে কাহিনী উৎকীর্ণ করাইয়াছিলেন। ঐতিহ্য কি ইহার কথা একেবারে বিস্মৃত হইয়াছে? কোথায়ই বা সেই বিজয়সেন, লক্ষণসেন, আর কোথায়ই বা সেই গর্গ-যবনাদায় কালরূপ?

বাঁহাদের অমিত বিক্রমে বহুদিন পর্য্যন্ত পূর্ব্ববঙ্গে মুসলমানের বিজয়কেতন

উজ্জীন হইতে পারে নাই* এই কি তাঁহাদের সেই বিশাল রাজধানীর বিলুপ্ত আশান? একদিন হয় ত এই স্থানে কত বিজয়-চম্পতি নিদানিত হইয়াছে, কত বীরসেনা “হর হর বম্ বম্ মহা কল্লব” দশদিক বিকম্পিত করিয়া বিজয়-মাল্যে বিভূষিত বীরনৃপতির অঙ্গুগমন করিয়াছে। আঙ্গ আর সে নগরী নাই, সে রাজপথ নাই। ভূগর্ভে নিহিত ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ইষ্টক দেখিয়া এখন তাহার অস্তিত্ব কল্পনা করিয়া লইতে হয়। ইষ্টকরাশিও এখন ভূপৃষ্ঠে শুপের স্তায় বর্তমান থাকিয়াও অট্টালিকাদির অবস্থান স্মরণ করে না! কুম্বকদের হল ক্ষেত্র-গুলিকে ধুলিতে পরিণত করিয়াছে। যেখানে উদ্যানবাটিকায় সূর মল্লিকা মালতী হাসিত, এখন সেখানে নিরাবচ্ছিন্ন রামপালের সুবিধাত কদলীকুঞ্জ বর্তমান!

অহুস্ফান করিলে “বম্বাল বাড়ীর” নিকট হইতে আরম্ভ করিয়া অনেক দূর পর্য্যন্তও প্রচুর পরিমাণে ইষ্টক পাওয়া যায়। কোন কোন গ্রামের ভূগর্ভ হইতে জীর্ণ কক্ষাদির চিহ্ন, ধাতব দেব দেবী মূর্তি প্রভৃতি পাওয়া গিয়াছে। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, বিক্রমপুরের সেই প্রাচীন রাজধানীর বিস্তার প্রায় ১০১২ মাইল ছিল! বহু লোক মৃত্তিকা খননকালে স্বর্ণ রৌপ্য ও মূল্যবান প্রস্তরাদি প্রাপ্ত হইয়াছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে এক যুবক সপ্ততি সহস্র মুদ্রা মূল্যের একখানি হীরক প্রাপ্ত হইয়াছিল।*

বিক্রমপুরের অনেক গ্রামই—সকল গ্রাম বলিলেও অস্তায় হইবে না পার্শ্ববর্তী ক্ষেত্র হইতে অনেক উচ্চে অবস্থিত। অনেক অর্থ ব্যয় করিয়া গ্রাম-বাসীরা একরূপ করিয়া থাকেন। না করিলে বর্ষা সমাগমে গৃহাদি ভাদিয়া বাই-বার সম্ভাবনা থাকে। রামপালেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে নাই। কোন প্রাকৃতিক নিয়মে রামপাল এইরূপ ঘটয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। কে তবে একরূপ করিয়াছিল—কোন যুগে একরূপ করিয়াছিল—কি কারণেই বা করিয়াছিল, স্বতঃই এই সকল প্রশ্ন মনে উদ্ভিত হইতে লাগিল। আমরা অনুমান করিলাম,

* The Bengal territory conquered in 1203-4 by the Mahomedans did not comprise the Eastern District. The *Bangadesh* was still under Ballal's descendants till the end of the 13th century, when Sonargaw was occupied by the second son of the Emperor Bulban.

—Blochman's History and Geography of Bengal.

* A few years ago a Raiyat while ploughing a field in this place found a diamond of the value of Rs. 70,000 (£7000). It afterwards gave rise to a law Suit before the Provincial Court of Appeal.

Topography of Dacca.—Taylor.

মুন্সীগঞ্জ অপেক্ষা বঙ্গালবাড়ীর উচ্চতা প্রায় মুন্সীগঞ্জের সনুকারি গৃহগুলির ছাদের সমান হইবে !

এই বিষয় আলোচনা করিতে করিতে আরো কিয়দূর অগ্রসর হইয়াই দেখিলাম পার্শ্ববর্তী তরুণাজির উপর শির তুলিয়া একটা প্রাচীন মহীকুহের প্রেতমূর্ত্তি দণ্ডায়মান রহিয়াছে—উহা শাপাহীন, পত্রহীন, রসহীন। তুনিলাম উহাই বিক্রমপুরের স্মৃতিখাত গজ্জারি বৃক্ষ (শাল বৃক্ষ)—কানকুল্লাগত পঞ্চ ব্রাহ্মণের তপঃ প্রভাবের স্মৃতি বহিয়া আজিও দণ্ডায়মান রহিয়াছে ! যখন উহার নিকটে যাইয়া উপস্থিত হইলাম, উহার স্মৃতিকানিষ্ঠিত বেদী পরিক্রমণ করিলাম, তখন জদয়ে আনন্দ অনুভব করিলাম। কিন্তু তখনই মনে হইল বঙ্গ পঞ্চ ব্রাহ্মণের আগমন প্রমাণ করিতে কি এখন ইহাট আমাদেৱ অকৃতম প্রধান সম্বল ? ইহার উপর নির্ভর করিয়াই কি এখন বাঙ্গালীর ও বাঙ্গালার ইতিহাসের এক অপরিচ্ছাদিত অংশ অনুমান করিয়া লইতে হইবে।

এই কি সেই শুক মল্লকাঠ যাহা একদিন নবগত ধর্ম্মপ্রাণ ব্রাহ্মণ-দিগের করচ্যুত আশীর্বাদবারি বা আশীষ-কুসুম শিরে ধারণ করিয়া মুহূর্ত্তে নবজীবন লাভ করিয়াছিল ? সেই ইঙ্গাজালই কি এখন বাঙ্গালার এক অতি প্রাচীন ও অতীত সমৃদ্ধিগোরবে গরীয়সী বীরপ্রসধিনী পণ্ডিতজননী শতশ্যামলা নদী-মেখলা প্রদেশের ইতিহাস রচনার প্রধান পাদপীঠ !

যেমন আর সে রাজধানী নাই, রাজপ্রাসাদ নাই, যেমন আর সে ব্রাহ্মণ নাই, যজ্ঞভূমি নাই—যেমন ছিল তেমন এখন আর কিছুই নাই, সেই মহামহীকুহই বা থাকিবে কেন ? উহা জীর্ণ হইয়াছে, উহার রসাল বক্ষ বহু স্থানে বিদীর্ণ হইয়াছে, উহার পত্র-পুষ্পের চিহ্ন পর্য্যন্ত আর নাই ! আছে কেবল মসীবর্ণ দুইটা স্মরণীয় শাখা ও তাহাদের একটির শিরে একটা জীবন্ত বৃক্ষ শকুনি ! কিন্তু বিক্রমপুরের নরনারীর জদয়ে আজিও উহার প্রতি যে শ্রদ্ধা ও ভক্তি জাগ্রত রহিয়াছে, হিন্দু মুসলমান উভয়ের নিকটেই উহা আজিও যেরূপ দেব-ভাবে পূজিত, তৈল ও সিন্দূরের অঙ্কনপেই তাহার পরিসর স্বর্ত্তমান রহিয়াছে। তুনিলাম আজিও কত রমণী, বক্ষাৎ দূর করিবার জন্ত ভুক্তিতরে এই বৃক্ষকে স্পর্শ করিয়া থাকে। সংসঙ্গে বাসের জন্ত পার্শ্ববর্তী আশ্রয় পনস ও খর্জুর বৃক্ষাদিও পূজা লাভ করিতেছে। বৃক্ষগুলি একটা ক্ষুদ্র দেব-পরিবারের জায় অবস্থিত থাকিয়া প্রবাদের দোহাই দিয়া নিতাপূজা আদায় করিয়া লইতেছে !

ঐশ্বর্য্যালব্ধি গজ্জারি বৃক্ষের নিকট হইতে অনুমান ২৪½ হস্ত দূরে দেখিলাম

আর একটা গজারি বৃক্ষ দুইটা শাখা বিস্তার করিয়া উর্দ্ধে উঠিতেছে। উহাও শুষ্কির অর্থাৎ হইতে বঞ্চিত হয় নাই। শুনিলাম তিন বৎসর পূর্বে একবার প্রাচীন গজারি বৃক্ষের নবীন পল্লব দেখা দিয়াছিল—শুষ্ক তথা বৃক্ষরিয়াছিল। কিন্তু আশ্বিন মাসে অকস্মাৎ একদিন পল্লবগুলি শুষ্ক হইয়া উঠিল এবং একে একে ঝরিয়া পড়িল। শুনিতে পাওয়া যে, ঢাকা জেলার এক ভাওয়াল বাতীত বিক্রমপুরের অন্ত কোন স্থানেই গজারি বৃক্ষ নাই। ঢাকার নূতন নগর রমনায় আমরা গজারিকুল দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে। রামপালের প্রাচীন গজারি বৃক্ষের সর্বনিম্ন স্থানের পরিধি প্রায় ৪২ হস্ত হইবে। উচ্চতা ৫০ হইতে ৬০ হস্তের ভিতর। ৩২ কি ৪ হস্ত উর্দ্ধ হইতে দুইটা শাখা বহির্গত হইয়াছে। নবীন বৃক্ষটির পরিধি ১২ কি ১৩ হস্ত হইবে।

যে ভূভাগ পূর্বে পদ্মানদীর পূর্ব তীরে, ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিমে, বড়ীগঙ্গার দক্ষিণে ও ইদিলপুরের উত্তরে অবস্থিত ছিল, তাহাই সেকালে বিক্রমপুর নামে পরিচিত ছিল। এই ভূভাগের রাজার নাম নিকম ছিল বলিয়াই না কি স্থানের নামও বিক্রমপুর হইয়াছিল। ইহাই দিগ্বিজয়-প্রকাশের সিদ্ধান্ত। ‘বিপ্রকল্প-লতিক’কার বলেন যে এই নৃপতির পিতৃপুরুষগণ দাক্ষিণাত্য হইতে বঙ্গ আগমন করিয়াছিলেন। Hunter সাহেব তাঁহার Statistical Account এ লিখিয়াছেন যে, হিন্দু নরপতি সুবিখ্যাত বিক্রমাদিত্যের রাজসভা কিছুদিন ঢাকা জেলার দক্ষিণাংশে বর্তমান ছিল। এ সকলই অসুমান মাত্র।

পদ্মানদীর তরঙ্গ-তাড়ণে বিক্রমপুরের পূর্বশেখা ও সম্পদ সমস্তই বিনষ্ট হইয়াছে। শোণ্য বীর্ণ্য সম্পদ সমৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চরিত্র-বৈত্তবও বৃদ্ধি গত হইয়াছে। নতুবা এখন যেমন দেখিতেছি, বিক্রমপুরের আন্তান্তরীণ অবস্থা একরূপ কেন ? কলহ স্বার্থপরতা ঈর্ষ্যা প্রভৃতি এখন যেন বিক্রমপুরকে ঘিরিয়া ধরিয়াছে ! বিরাট অতীতের গৌরবোজ্জ্বলমুষ্টি এখন একখানি দীর্ঘ মথ অপবিত্র কাঠামকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে মাত্র !

মোগলদিগের শাসন সময়ে বিক্রমপুর সোনারগাঁও অন্তর্গতঃ ৫২টা পরগণার একটা ছিল ! সোনারগাঁও রাজস্ব ২৫৬২৮৩৪ মুদ্রা নির্ধারিত ছিল। তন্মধ্যে কেবল বিক্রমপুর হইতে ৮৩৩৭৭ মুদ্রা আদায় হইত।

যখন পাল-নরপালগণ বঙ্গের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তখন বঙ্গদেশেও বৌদ্ধ ধর্মের প্রবল প্রভাব বিস্তার লাভ করিয়াছিল। সেই সময়েই বিক্রমপুরেও বৌদ্ধ ধর্ম আশ্রয় লাভ করিয়া রাজ-সিংহাসনের ছায়াতলে পারিপুষ্ট হইয়াছিল। বলিয়া

কথিত হয়। এই বিক্রমপুরই দীপকর শ্রীজ্ঞানের জন্মভূমি, হলায়ুধের জীড়াকেন্দ্র।

পাল ও সেন রাজ্যদিগের শাসনকালই বিক্রমপুরের গৌরবের যুগ! জ্ঞানে কর্মে, রণে ধর্মে, শিল্পে বাণিজ্যে, ধনে জনে সেই সময়েই বিক্রমপুর একরূপ শ্রী ধারণ করিয়াছিল যে, কোনও ঐতিহাসিক কবি তাঁহার একখানি অমুদ্রিত কাব্যে কহিয়াছেন—“দেবের নৈবেদ্য সম শ্রীবিক্রমপুর।” রামপাল সেই শ্রীবিক্রমপুরের অত্যন্তম রাজধানী।

মহম্মদ তোঘলক যখন পূর্ববঙ্গের স্বাধীনতা দমন করিলেন, তখন দেখিলেন, শাসন-সৌকর্য্যার্থ এই বিস্তৃত জনপদকে বিভক্ত করা আবশ্যিক। তাঁহারই আদেশে পূর্ববঙ্গ নিম্নলিখিত তিনভাগে বিভক্ত হইয়াছিল—(১) লক্ষণাবতী (২) সাতগাঁও এবং (৩) ঢাকা ও সুরবর্ণগ্রাম একত্রে।

বর্তমান ঢাকা ও ফরিদপুর জেলার কিয়দংশ এখন বিক্রমপুর নামে পরিচিত।

রামপালের নামকরণ সম্বন্ধে নানাবিধ প্রবাদ প্রচলিত আছে। ঐতিহাসিক ভিত্তির অভাবে তাহাদের কোনটার উপরেই সম্পূর্ণরূপে আস্থা স্থাপন করা উচিত কি না, বিবেচনার বিষয়। কেহ বলেন পালবংশীয় নরপতি রামপালের নামানুসারেই রাজধানীর নাম হইয়াছিল। লঘুভারতকার বলেন, রাম নামক একজন, “মহা ধনী” নরপতির রাজধানী বলিয়াই উহার নাম রামপাল। কাহারও মতে রাজা বল্লালের রাজ্যবাড়ীর মুদী রামানন্দ পালের নামের সহিত রামপালের স্মৃতি বর্তমান আছে!

যেমন রামপালের নামকরণ সম্বন্ধে, তেমনি আদিশূরের আমন্ত্রণে গৌড়ে পঞ্চ ব্রাহ্মণের আগমন সম্বন্ধেও নানাবিধ প্রবাদ শুনিতে পাওয়া যায়। ইতিহাস একেবারেই মুক্ হইয়া শুধু প্রবাদ-প্রসঙ্গের দিকেই ইঙ্গিত করিতেছে। স্বয়ং আদিশূরও যেমন কুহেলিকাময় অতীতের অন্ধ আবরণে সমাচ্ছাদিত থাকিয়া কবির বহনকে মূর্ত্তি গড়িবার অবসর দিয়াছেন, তাঁহার ব্রাহ্মণ-নিমন্ত্রণ-ব্যাপারও তেমনি অহুকুল ও অতিকূল নানা প্রসঙ্গের সহিত বিজড়িত হইয়া সত্য নির্ণয়ের পথ একান্ত দুষ্কর করিয়াছে।

কিত্তীশ-বংশাবলীর চরিতকার বলেন যে, একবার রাজপ্রাসাদের উন্নত-নীর্ঘে একটা গৃহ দর্শনে মহারাজ তাহার বাবস্থা নির্ণয়ের জন্য সভাসদগণকে আদেশ করিয়াছিলেন। তখন নাকি সমগ্র বঙ্গদেশে শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ একজনও

ছিলেন না । সেই জন্ত কাণ্যকুব্জ হইতে ব্রাহ্মণগণকে আনয়ন করা আবশ্যক হইয়াছিল । ইহা হইতেই ইংরাজ ঐতিহাসিক অনুমান করিয়াছেন যে, তখন এদেশে ধর্ম বিলুপ্ত হইয়াছিল । ঢাকা জেলার ব্রাহ্মণগণ ধর্মহীন হইয়াছিলেন । সাধারণে ধর্মপ্রচার ও সকলকে ধর্ম শিক্ষা দিবার জন্তই কাণ্যকুব্জ হইতে ব্রাহ্মণ আনয়ন করা আবশ্যক হইয়াছিল । ইতিহাস যখন শুধু প্রসঙ্গের উপর নির্ভর করে, তখন এইরূপেই বিকৃত হয় ! • কেহ কেহ বলেন রাজপের যজ্ঞ সম্পন্ন করিবার জন্য আদিশূর ব্রাহ্মণদিগকে বিক্রমপুরে আনাইয়াছিলেন । কাহারও মতে আদিশূরের পুত্রোক্তি যজ্ঞই সাময়িক বেদজ্ঞ-ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণের কারণ বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে ।

কল্পনা লীলাময়ীঃ দেবীবর বলিতেছেন—ব্রাহ্মণগণ আসিলেন, কিন্তু সকলেরই শক্তিবশ—খড়া চর্ম্মাদি স্থশোভিত ! মহারাজ আদিশূরের ক্রময়ে আঘাত লাগিল । তিনি হয়ত ভয়সা করিয়াছিলেন যে, জটাবকলধারী কৌপীন-পরিহিত তেজঃপূজকাস্তি পক্ষ ব্রাহ্মণ পদরজ দানে তাঁহার রাজাকে পবিত্র করিবেন । মহারাজ বিরক্ত হইয়া তাঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতেই আসিলেন না । ব্রাহ্মণগণ আশীষ পুষ্প হস্তে সিংহদ্বারে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন । তাঁহার। যে রাজঅভিধি, অতিথি-সংকার যে পরম ধর্ম—ইহাও কি রাজা বিশ্বত হইয়াছিলেন ? ধর্ম-প্রতিষ্ঠাই যাহার কামনা ছিল, তিনি একথা যে বিশ্বত হইবেন, ইহা সহজে বিশ্বাস হয় না । যাহা হউক, মহারাজ যখন নিতাস্তই আসিলেন না, তখন তাঁহাকে প্রবৃত্ত করিবার জন্য ব্রাহ্মণ্যের প্রভাব প্রদর্শন বিবেচনা করিয়া ব্রাহ্মণগণ হস্তস্থিত আশীষপুষ্প নিকটবর্তী একটা শুক হস্তিবন্ধন-কাঠের শিরে বর্ধন করিলেন—অমনি “তদা কাষ্ঠং সজীবং স্ত্রাৎ ফলপন্নব-সংযুতং”—সেই ফলপন্নব-সংযুক্ত গজারি বৃক্ষের* প্রেতমূর্তিই এখনও বর্তমান রহিয়াছে ! কবে যে এই অলৌকিক ব্যাপার সংসাধিত হইয়াছিল, তাহা জানিবার উপায় নাই ! সখদ-নির্গমকারের মতে আদিশূরের রাজত্বকাল ৯০০ হইতে ৯৫২ খ্রীষ্টাব্দ । তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, গজারি বৃক্ষের বয়স ঐয় সহস্র বৎসর ! বিশেষজ্ঞগণ অনুসন্ধান করিলে বৃক্ষ দেখিয়া একবার বিচার করিতে পারিবেন । ব্রাহ্মণালের নিকটে কোনো স্থানেই (একটি তিস্তিড়ী বৃক্ষ ভিন্ন) খুব বেশী প্রাচীন বৃক্ষ

* He sent to Kanauj for Brahmans to teach the people the religion which even the priestly class in the district (ইনিও সমগ্র বঙ্গদেশের কথা বলেন না) had forgotten and five Brahmans accompanied by five Kayasthas in due time arrived—Allen's Gazetteer.

দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। ছইটী বৃক্ষের (সিপাহী পাড়ায় একটা তিস্তিড়ী ও বলাল বাড়ীতে একটা আশ্র) প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে আলোচনা হইয়াছিল। কিন্তু উহারও ছই তিন শত বৎসরের অধিক পুরাতন, আমরা এরূপ অস্বাভাবিক কথিতে পারি নাই।

গজারি বৃক্ষের অতি দক্ষিণেই দক্ষিণে বলাল দীঘির উত্তর তীর। বৃক্ষ হইতে তীর বোধ হয় ২০ হস্তের অধিক ব্যবধান হইবে না। দীঘিকা বিশালায়-তন। দীর্ঘে প্রায় ৩ মাইল এবং প্রস্থে ১ মাইল। উহার তলদেশে এখন পাট ও ধানের চাষ হয়। কোন কোন স্থানে এখনও জল আছে। তাহা ঘন শৈবালে ও শ্রদ্ধার্থ ঘাসে সমাচ্ছাদিত। দেখিলাম দীর্ঘিকার দক্ষিণাংশে একজন কৃষক অতি কষ্টে একখানি ক্ষুদ্র নৌকা বহিয়া বাস কাটিতে বহিতেছে। বরেন্দ্র-অম্বুসন্ধান-সমিতির সদস্যদিগকে লইয়া বগুড়া ও দিনাজপুর জেলার সীমান্তে জগবল নামক গ্রামে অনতিদূরে যে দীর্ঘিকা দেখিতে গিয়াছিলাম, উহা এই বলাল দীঘি বা রামপাল দীঘির সহিত তুলিত হইতে পারে—এ সংবাদ বরেন্দ্র-অম্বুসন্ধান সমিতির নিকট আবশ্যক বোধ হইতে পারে বিবেচনার একথা লিখিলাম। সেই উদ্দেশ্যে ইহাও লিখিতেছি যে, অনেক করিয়াও রামপালের জগবল নামক কোনো গ্রামের পরিচর পাইলাম না! এখানে জোড়াদেউল নামে একটা গ্রাম আছে।

(ক্রমঃ)

ঐরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য।

ভ্রম সংশোধন (?)

অসি ও কিরীট ধরে

মহীর শাসন করেছে কক্ষ সিংহাসনের পরে”

“মহী কা’রে বল, অহির শাসন করেছে, সে মিছে কীরে;

সিংহ-আসন নহেত, তবে সে কাণীয় ভূজগ শিরে;

দেখিতে ভুলেছ অসি নহে সেট, বানী বটো প্রাণচোরা,

কিরীট বলিবে বলগে তোমরা, শিখি-চুড়া কই মোরা।”

* The site of the old capital of Vikrampur is pointed out near the large tank called Rampal Dighi, which is three quarters of a mile long by a quarter of a mile broad. Ailen's Gazetteer.

(২)

“রক্ত প্রবাহ মাঝে,
শিশুপাল সহ যুঝিলেন তিনি বীর-কেশরীর সঙ্গে”

“সৈট্টা একরূপ যুদ্ধ বই কি ? রক্ত নয়ত, রঙ,
হোলীর দিনে সে পিচকারী খেলা, যুদ্ধের মত টঙ্ক ।
শিশুপাল নহে পশুপাল বল,—গোপালগণের সহ
বীর কেশবের ফাগকুড়ুম কেলিরণ তাহে কহ ।”

(৩)

“কুরুক্ষেত্র’পরে,
রথের রশ্মি ধরিলেন ঐতু ধর্মের জয় তরে ।”

“রথের রশ্মি কোথা পেলো, তবে তরীর কর্ণ বটে,
নর্শের লাগি বাহিতেন তরী যমুনার তটে তটে ;
কুরুক্ষেত্র মাঠ কোথা পেলো, মথুরার পার ঘাটে,
পার হয়ে যেত গোপ গোপী যত দুধ বেচিবারে ছাটে ।”

(৪)

“বিজয় রক্ত-কেতু
রথের উপর গাহিলেন গীতা ভুভার হরণ হেতু ।”

“রথ নয় সেত ঝুলন দোলায়, গীতা নয়, সেত গীত ।
পতাকার কথা বলিতেছ যাহা, রক্ত নহৈত, পীত ।
ভুভার হরণ সে কথা আবার পেলো তুমি কোন্‌খানে ?
গোপীজন মনোহরণের লাগি’ গাহিলেন বেণু তানে ।”

ত্ৰীকালিদাস রায় ।

প্রশংসা-প্রসঙ্গ । *

অহুপ্রাস মাফ করিবেন। বস্তুতঃ অহুপ্রাসের খাতিরে আমি প্রশংসার পশ্চাতে “প্রসঙ্গ” প্রয়োগ করি নাই। “প্রসঙ্গ” কথাটির বহুল প্রচলনই আমাকে প্রলুব্ধ করিয়াছে। আমার একজন বন্ধু এক অতি অপূর্ণ নূতন জিনিষ “পুরাতন প্রসঙ্গ” নাম দিয়া বাহির করিয়াছেন। কিন্তু এমন একটা প্রকাণ্ড প্রতারণা আপনারা ধরিতে পারিলেন না, ইহাই আমার সে গুপ্ত-বন্ধুর বাহাগুরি। আমার এই প্রশংসা-প্রসঙ্গে সেরূপ কোনও লুকোচুরী থাকিবে না, ইহা আমি পূর্ক হইতে নিঃসংশয়ে বলিয়া রাখিতেছি।

“প্রশংসা”র স্বরূপ নির্ণয়ে আমি আপনাদিগের সময় অপহরণ করিতে চাহি না। প্রশংসার প্রভাবে ব্যুৎপত্তির অনেক সময় লেশ হয়, সুতরাং ইহার ব্যুৎপত্তি আর কি বলিব? তবে, “প্রশংসা”র উপসর্গের বড় বাড়াবাড়ি। মূল ধাতু ‘শংস’ সম্বন্ধে আপনাদের যে কোনও সংশয় থাকিতে পারে, সেরূপ আমার মনে হয় না। ধাতু প্রত্যয় ধরিতে গেলে ইহার বেশী কিছু নিষ্পন্ন হওয়া কঠিন। তবে আমাদের ‘ধাতু’ আবার এমনই ‘অদ্ব্যুত’ যে, সহজে ‘প্রত্যয়’ হওয়া দুর্বল। তোমাকে যখন কেহ প্রশংসা করিল, তখন ইহা প্রত্যয় করিতে তোমার মোটেই প্রবৃত্তি হয় না যে তাহার পশ্চাতে একখানি লঘু মেঘখণ্ডের মত বিজ্ঞপ্ত প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। অপর কোনও দিক হইতে একটু বাতাসের সাহায্য পাইলেই তাহা নিন্দার খনখটায় আচ্ছন্ন করিয়া দিতে পারে। চুর্কাঝোর তীত্র আলাময়ী অননিও তাহাতে চকিতে চমকিয়া উঠিতে পারে।

আমার এক বন্ধু গ্রন্থকার একদিন তাঁহার গ্রন্থখানি দেখিবার জন্ত আমাকে তাঁহার ভবনে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। ছাত্র জীবনে এরূপ আহ্বান পাইয়া আমি যে সুখী হইলাম, সে কথা বলা বাহুল্য। তিনি আমাকে পাইয়া তাঁহার গ্রন্থখানি আত্মোপাস্ত পাঠ করিবার আয়োজন করিয়া বলিলেন। আমার ত চক্ষুঃ স্থির! তব্বে সাহিত্যিক বন্ধুগণের সাহচর্য্য লাভে ঐহারা ভাগ্যবান, তাঁহার স্বভাবতঃই কিছু সহিষ্ণু; মাঝে মাঝে তাঁহাদিগকে এরূপ ঘেঁহের অত্যাচার সহ্য করিতে হয়। কেহ একটি কবিতা লিখিয়াছেন, তাহা আপনার কাছে না গুনাইলে তাঁহার কবিতা সার্থক হয় না; কেহ একটি ছাপ্পার পৃষ্ঠাব্যাপী ছোট গল্প লিখিয়াছেন, তাঁহার খানিকটা অন্ততঃ (অর্থাৎ আগাগোড়া) আপ-

* সাহিত্য-সম্বন্ধের ঐর্থ্য অববেশনে গঠিত।

নাকে শুনিতেই হইবে ; কেহ একটি সমালোচনা লিখিয়াছেন, তাহা আপনার জায় তীক্ষ্ণদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি একবার না শুনিলে, তাহা ছাপিতে দিতে লেখকের কেমন কেমন বোধ হয় ! (অথচ সে সমালোচনা যে বহুপূর্বে মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইবার অল্প প্রেরিত হইয়াছে, সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিত থাকিতে পারেন) । আপনাকে এ সকল শুনিতেই হইবে এবং শ্রবণ কালে আপনি আপনার পারলৌকিক চিন্তায় লিপ্ত থাকুন, আর ভাল কারদা ভাব গ্রহণ-বাপ-দেশে একটু তজ্জালু হইয়াই পড়ুন—তাহাতে তত আসিয়া যায় না । পাঠ-শেষে আপনি যদি বলেন ! “ বাঃ এরই মধ্যে শেষ হইল ! কি চমৎকার ! কবিতাটি রবীন্দ্রবাবুরও যোগা, গল্পটি প্রভাতবাবুকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে, সমালোচনাটি সমালোচ্য পুস্তক অপেক্ষাও প্রতিভার পরিচায়ক—“ ইত্যাদি বা এইরূপ ধরণের কিছু—তাহা হইলেই আপনার বন্ধু খুব গুলী হইবেন । ইতার পরে যদি আপনার ভাগ্যে মাঝে মাঝে অলযোগের ব্যবস্থা হয়, তাহা হইলে আপনি বিস্মিত হইবেন না । তবে চুঃখ এই যে, এ দেশে সাহিত্যিকগণ বড় গরীব । ছই একজন ডায়াবান লেখক যাহারা ধনী, তাহারও দ্বর্ভাগ্যের বিষয়, সত্য সত্যি চান ।

আমার সেই বন্ধু—যিনি আমাকে নিয়ন্ত্রণ করিয়াছিলেন—তিনি ধনী নহেন । তিনি যখন তাঁহার দেড়শত পৃষ্ঠার কেতাবখানি খুলিয়া বসিলেন, তখন গ্রীষ্ম-মধ্যাহ্নের সূর্য্য পশ্চিমে ঈষৎ হেলিয়াছে । ক্রমে সূর্য্য অন্তর্মিত হইল । তখন আমরা উঠিয়া ছাতে গেলাম । সেখানেও পুস্তকপাঠ চলিতে লাগিল । পরে যখন সন্ধ্যার অন্ধকার পাঠে বাধা জন্মাইতে লাগিল, তখন পুনরায় আমরা নীপালোক্ত কক্ষে ফিরিয়া আসিলাম । কিছুক্ষণ পরে পাঠ সমাপ্ত হইলে, জলখাবার আসিল । সেগুলি উদরসাৎ করিতে করিতে গ্রন্থের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম । ‘বলা বাহুল্য, তৃপ্তিকর অলযোগের মত, তাহাও সরস হইয়াছিল ।

অদৃষ্টের পরিহাস এইখানেই সমাপ্ত হইল না । আর একজন সাহিত্য-রসিক বন্ধুর হাত এড়াইতে না পারিয়া ‘ঐ পুস্তক খানিরই সমালোচনা করিতে হইল—আমাকেই । বন্ধুবরও আমার সহিত যোগদান করিলেন । সমালোচনায় অনেক কথা বলিলাম । কিন্তু সেগুলি, গ্রন্থকারের গৃহে যাহা বলিয়াছিলাম, তাহা হইতে সম্পূর্ণ অল্প রকমের । কিছু বেশী তীত্র হইয়া গেল । অনেকেই তাহা উপভোগ করিলেন—করিলেন না কেবল লেখক । অবশ্য

ইহার পরে সেই আশ্রয়কার বন্ধু বা তাঁহার পুত্রকের নাম জানিতে চাহিয়া আমাকে কেহ লজ্জা দিবে না, ইহা আমার কৃতজ্ঞানিসহ অমরোদ্যম।

অনেকে হয়ত আমাকে কপটতার জন্ত দোষী করিতেছেন। যেটুকু কপটতা শিষ্টাচারের জন্ত অমরোদ্যমিত, আমি তাহারও সীমা লঙ্ঘন করিয়াছি বলিয়া কেহ কেহ নিশ্চয়ই মনে করিতেছেন। তৎ সত্ত্বেও আমার বক্তব্য এই যে, তখন আমি নিতান্ত অপরিণত-বয়স্ক, জলযোগের মহিমায মুগ্ধ-এবং সে দিন আমার কিছু প্রার্থনা ছিল।

প্রশংসা জিনিষটি বড় মূখরোচক। প্রশংসায় বদ্ধজন্ম হইতে মাঝে মাঝে শুনা গিয়া থাকে—কিন্তু অকৃত্রিম কথা বড় একটা শুনা যায় না। বয়ঃসত্য মিথ্যায়, কর্মে অকর্মে অকৃতি হইলে প্রশংসার পুঁজু দিয়া তাহাকে বেশ মূখরোচক করিয়া তুলিয়া যায়। এমন কি বশাকরণের মত পর্য্যন্ত প্রশংসার উদাত্ত-অমরোদ্যম-স্বরিতে এখিত। অথেষ্টের তত্ত্বজ্ঞতির যুগ হইতে বাল্যসেনের রজত-শাসনের কোলিত যুগ পর্য্যন্ত বশীকরণের মধ্যে প্রশংসার একাধিপত্য স্থিতি হইতেছে। যিনি বলের খ্যাতির বিড়ম্বনা আমি চাহি না, তোনামোদকে আমি ঘৃণা করি—তিনি গভীর জলে নোঙর করিয়া রহিয়াছেন। তিনি মনে করেন প্রশংসার ছোট ছোট লাগজিঙাগুলি পাল তুলিয়া তাঁহারই দিকে ছুটিবে। তিনি মুখ ফিরাইয়া অপর দিকে চাহিয়া থাকিলেও তাঁহার অপারদের লোলমুষ্টি এক একবার চকিতে পশ্চাদিকের সন্ধান জানিয়া লইতেছে। এত লোকের মধ্যে কেবল তাঁহারই যে প্রশংসা ভাল লাগে না—অন্ততঃ এই প্রশংসাটুকুর কাঙ্গাল তিনি!

তবে একটা কথা বলিয়া রাখি—প্রশংসাটা ভরাপেটেই লাগে ভাল। সেই জন্ত বাস্তবিকই আমার ভয় হইতেছে যে, এই জলবিয়োগ-বিধুর অর্থাৎ নির্জল-যোগ হস্তরাং অসঙ্গত সাহিত্য-সঙ্গতে আমার এই প্রশংসা আপনাদের তৃপ্তিকর হইবে কি না। চায়ের ছলকে, চুম্বকের ধূমে, তাম্বুলের রাগে প্রশংসার নেশা পাছে ছুটিয়া যায়, এই ভয় মনে বাসি।

প্রশংসার নেশা খুব জমে। প্রথমটা সব নেশার মত এ নেশাও ধরাইতে কিছু কষ্ট। অস্ত্র নেশার শত্রু—অর্থাত্তাব। এ নেশার শত্রু—বিস্রুপ। প্রথমটা মাত্রা ঠিক না রাখিয়া প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিলে মনে হয় যেন ঠাট্টা। তখন নেশা ধরিতে চাহে না। একবার প্রত্যয় হইয়া গেলে, শেষে প্রশংসার ফোঁসরা ছুটাইয়া দাও। নেশার ডরপুর হইয়া বাইবে।

শেষে ক। কা রবে চক্ষু নড়ে
 মিঠাই মাটিতে পড়ে,

শৃগাল পলায় লয়ে মনের হরষে ।

নিষ্কার একটা গুণ এই যে, ইহাতে প্রায়ই আন্তরিকতা থাকে, প্রশংসা প্রায়ই থাকে নূন। তাহা বলিয়া একেবারে আন্তরিকতাশূন্য নিলজ্জ প্রশংসা সব ঘারগায় চলে না। অনেক স্থলে পাতায় ঢাকা ফুলের মত, ঘোমটায় ঢাকা মুখের মত প্রশংসার মধ্যে একটু সংকোচের ভাব থাকে। এই সংকোচের ভাব ঢুকাইরা দেওয়াই প্রশংসার আর্ট (art)। প্রশংসা দিতেও সংকোচ, নিতেও সংকোচ। স্বেচ্ছাচারী নিকে শলমাচুমকীর কাজের মত এই সংকোচটুকু বেশ সাজাইয়া মানাইয়া মিশাইয়া দিতে অনেক কারিগরী চাই। সময়ে সময়ে একটি কথা, একটি ইঙ্গিত, একটুখানি স্বতি, সুরের একটু কম্পনে এত প্রশংসা প্রকাশ করা যায় যে, প্রশংসার দীর্ঘছন্দে একখানি বিরাট পর্ক রচনা করিলেও তেমন লাগসই হয় না। এই মনে করান, আপনি একটি কবিতা পাঠ করিতেছেন, আর আমি নিম্নেষে আপনার মুখের নিকে চাহিয়া এমনই গদগদ ভাব প্রকাশ করিলাম যে, সহস্র বাক্যযোজনায় অপেক্ষা আপনি তাহাতেই গলিয়া গেলেন।

প্রশংসা অতি সস্তা হইলেও দ্রুমা। অর্থনীতির হিসাবে কথাটা ঠিক না হইলেও, অনেক সময়ে এমন অনর্থও ঘটে। নদী খাল বিল সব সাগরে গিয়া মিশে। সাগরের জলের লোণা তাহাতে কাটে না। অভিমানের রোদ্দ-করে সে সব জল টানিয়া দ্রুমা ধোয়ায় মত কোথায় উড়াইয়া লইয়া যায়। আর স্বচ্ছ নির্ঝল পুতৌসক সীতাকুণ্ডের সঙ্গে একটি ধারাও আসিয়া সঙ্গত হয় না। এমন অনেক স্থলে দেখা যায়।

প্রশংসা পাইতে যদিও সকলেরই খুব আগ্রহ আছে, কিন্তু দিতে তেমন আগ্রহ বড় দেখা যায় না। অনেকের প্রশংসাই দেখিবেন—সবক্কে ওজন করা বিন্দু বিন্দু কৃপা। সাময়িকপত্র-সম্পাদক এমনই এক তুলাদণ্ড হস্তে তাঁহার জীর্ণ, মনীলগ্ন টেবিলের সম্মুখে বসিয়া আছেন। গল্প প্রবন্ধ কবিতা—ত্রিপদী : চতুশ্ৰী চতুর্দশপদী—ভারে ভারে আসিতেছে। তিনি নিদ্রালু চোখে সেগুলি একবার তাঁহার তুলাদণ্ডে আছাড়িয়া ফেলিতেছেন। অধিকাংশই ঝরিয়া টেবিলের নীচে ঝড়িতে পড়িয়া পতিতেছে; অবশিষ্ট ছাপাখানার মসী কর্ম্ম অতিক্রম করিয়া দিনের আলোক দেখিয়া অম্মসার্থক করিতেছে। ইহাই প্রশংসার সম্পাদকীর রীতি। আজ যাহাকে তাঁহার পত্রে স্থান দিয়া সম্পাদক

স্বমৈয়ুশ্রে তুলিয়া দিলেন, কাগ আবার সমালোচক হিসাবে তাহাকে বৈতরণীতে ভাসাইয়া দিলেন। কিন্তু ইহার কোনওটির জন্ত “সম্পাদক দায়ী নহেন।” সম্পাদকীয় প্রশংসার একটি নমুনা দিতেছি।

“মরীচিকা” একখানি কাব্য। আধুনিক কবিতা যেরূপ দুর্কৌশল অথচ লঘু, অর্থশূন্য অথচ মিষ্ট, স্নানর বাধাই অথচ স্নগত, এখানিও সেইরূপ। প্রীতি, অবসর, নিৰ্দ্ধার, শেকালি প্রভৃতি কবিতা বাজে, রাবিশ। • অপর কবিতাগুলিতে মৌলিকতার লেশ নাই। কবিতার মধ্যে যেটুকু আর্ট, লেখক তাহা ধরিতে পারেন নাই। তবে মোটের উপর গ্রন্থখানি মন্দ নয়, আমরা সকলকেই পড়িতে অহুরোধ করি।”

বলা বাহুল্য, সম্পাদক দায়ী নহেন।

অদিকাংশ লোকই প্রশংসার সম্পাদকীয় রীতি অমিসরণ করিয়া থাকেন। কেমন যেন একটু কৃপণতা স্বভাবতঃই আসিয়া পড়ে। আমাদের কেহ মুক্ত-কণ্ঠে প্রশংসা করে না, সে জন্তই হউক, অথবা আমি নিজের অভিমান লইয়া ব্যস্ত বলিয়াই হউক, অপরকে মন খুলিয়া শ্রুতিয়া করিতে যেন কুণ্ঠিত। সকলেই যে এইরূপ ভাবাপন্ন, তাহা বলিতেছি না। কেহ কেহ এমন আছেন যাহারা নিঃসংকোচে হৃদয় ঢালিয়া দিয়া প্রশংসা করিতে পারিলেই স্বীকৃত হন। যেখানে বার আনা প্রাপ্য, সেখানে ঘোল আনা দিয়াও তৃপ্ত হন না।

প্রশংসার আর একটি বিপত্তি এই যে, কেহ কেহ অপরকে প্রশংসা করিবার উপলক্ষে নিজের প্রাপ্য আদায় কল্পিব্যুর স্বযোগ অহুসন্ধান করেন। আপনারা হয়ত দেখিয়াছেন যে, অনেক প্রশংসাপত্রের ভাষা যেন অল অল করিতেছে। তাহার মধ্যে কত ভাব, কত কাব্য, কত রস প্রবেশ করাইবার চেষ্টা হইয়াছে! আমাদের মধ্যে দেখিয়াছি অনেক প্রশংসাপত্র লিখিবার সময়ে, পাত্রের গুণাগুণ অপেক্ষা English Compositionএর দিকে বেশী মনোযোগ দিয়া ফেলেন। যেখানে আর একটি adjective না বসাইলে finish ভাল হয় না, একটা superlative না দিলে style জমাই হয় না, সেখানে চোখ কাণ বুজিয়া দিয়া ফেলা স্বাক্ষর—কে আবার ভাবে?

প্রশংসাপত্রের ভাষায় আর একটি লক্ষ্য করিবার জিন্ম আছে। কোনও কোনও প্রশংসাপত্রে প্রকৃত অর্থ গোপন করিবার বেশ একটি প্রয়াস দেখিতে পাওয়া যায়। বাধা হইয়া যেখানে কোনও বস্তু বা ব্যক্তির প্রশংসা করিতে হয়, সেখানে অর্থের একটু আধটু গোলযোগ থাকা মন্দ নহে। একজন ম্যালেরিয়া

মিক্‌শার অথবা বকুল-কুসুম তৈল প্রস্তুত করিয়াছেন ; তাঁহাকে একটা ভাল সার্টিফিকেট দিতে হইবে । কি করা যায় ? “নিয়মিত ব্যবহার করিলে ম্যালেরিয়া রোগে অথবা কেশশূন্যতা উপকার দর্শিবে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই ।” ইত্যাদি প্রকারে প্রশংসা করা চলে । কোনও কোনও প্রশংসাপত্রে স্বার্থ-বোধক বাক্যও দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে । একটি কেশ-তৈলের প্রশংসায় একজন লিখিয়াছিলেন “কেশ উঠিতে আরম্ভ করিলে এ তৈল ব্যবহারে আর উঠে না ।” প্রশংসা করিবার বিশেষ কিছু যেখানে থাকে না, সেখানে আমরা “এই ব্যক্তির উন্নতির কথা শুনিলে সুখী হইব, এই ঔষধের বহুল বিক্রয় কামনা করি” ইত্যাদি লিখিয়া পাদপূরণ করিয়া থাকি ।

পাদপূরণের পরিবর্তে যেখানে প্রশংসা উদর পূরণের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়, তখন ইহা নানা ভাবে, নানা আকারে দেখা দেয় । আপনি আপনার ছেলের শিক্ষককে জিজ্ঞাসা করিলেন, “পটলা, কেমন পড়িতেছে ?” মাষ্টার মহাশয় অকপটচিত্তে বলিলেন, “পড়ে ভাল ; কিন্তু মনোযোগ তাদৃশ নাই । যদি মনোযোগ দিত, তবে ক্লাসে ফাষ্ট, সেকেন্ড হ’তে বাধা ছিল না ।” ঐ “যদি”, তাঁহাকে এ যাত্রা বাঁচাইয়া দিল । এইরূপ যত্নাঘ্রক প্রশংসা অনেকের আত্মপ্রসাদের মূল । অমুক যদি উকীল হইতেন, তবে আজ ডাঃ ঘোষকে পলায়ন করিতে হইত । অমুক যদি চাকরীর পরিবর্তে লেখনী ধরিতেন, তবে বঙ্গ সাহিত্যের শ্রী অশ্রু রূপ হইত, ইত্যাদি অতি নিরাপদ রকমের প্রশংসা ।

প্রশংসার ফল যেখানে ফলে—সেখানে প্রত্যক্ষ । আপনার বই বাজারে চলে, না, কবির পরমানন্দকে অথবা বাগ্‌বির, জ্ঞানানন্দকে উৎসর্গ করুন । কিছু কাটিবে । পাঠ্য-পুস্তক করিতে চান, শ্রীল শ্রীগুরু মহোদয়কে নানা বিশেষণ ও উপাধি সম্বৃত্ত পুষ্পাঞ্জলির দ্বারা উৎসর্গ করুন । অবার্থ । গায়ককে সুখ্যাতি করুন, দুই একবার বাহবা দিন, গায়কের চক্ষু আপনাকে অবেষণ করিবে । গায়ক, বাণ্যকর, শিল্পী কিছু প্রশংসার প্রত্যাশী । বাহবা ব্যতীত গান জন্মে না ।

শুধু গায়কের দোষ দিব কেন ? প্রশংসার সুযোগ পরিত্যাগ করা সকলের পক্ষেই কঠিন । গায়ক প্রশংসা লাভের “অধিকারী, তাঁহারা এরূপ সুযোগ পরিত্যাগ করিতে চাহেন না কেন, তাহা বুঝিতে পারা যায় । কিন্তু গায়ক অধিকারী নহেন, তাঁহারাও এ সুযোগ পরিত্যাগ করিতে অনিচ্ছুক । এমনই ছরস্ত্র নেশা । যিনি বক্তৃতা করিতে পারেন, তিনি বক্তৃতা করিবার লোভ

সামলাইতে পারেন না । যিনি গান করিতে পারেন, তাঁহাকে অহরোধ করিবার পূর্বেই তিনি স্বর ভাজিতে থাকেন । আর যিনি বক্তৃতায় তেমন অভ্যস্ত নন, তিনি অন্ততঃ সভাপতিকে ধন্যবাদ দিবার প্রসঙ্গে দশমিনিট বলিতে চান । গান না করিতে পারিলেও পাখোয়াজের লয়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রবল বেগে মাথা ঝাঁকাইয়া সোমে তাল হাঁকড়াইবার জন্ত বাগ ।

প্রশংসার এক অভিনব সুযোগ আজকাল দেখা যাইতেছে—অপরকে দিয়া গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়া লওয়া । এ প্রথাটি মন্দ নয়—ইহাতে আহার ঔষধ জুই-ই হয় । যাহাকে ভূমিকা লিখিবার জন্ত অহরোধ করা হয়, তাঁহাকে বেশ আটের সহিত প্রশংসা করিয়া লওয়া হইল । তিনিও দ্ব্যস্তায় কিস্তী পাইয়া গভীর গবেষণা জুড়িয়া দিয়া নিজের প্রশংসাপ্রাপ্তির সুযোগ করিয়া লইলেন, এবং গ্রন্থের সম্বন্ধে অবাস্তর ভাবে তিনি বাহা বলিলেন, তাহাতে গ্রন্থকারেরও হয়ত সুখ্যাতির সঙ্গে সঙ্গে একটু চৈতন্য হইল । আমার ইচ্ছা আছে, একখানি গ্রন্থ লিখিয়া উঠিতে পারিলে বড় বড় লোকের Symposium, জুটাইয়া, অবাকুস্মের প্রশংসাপত্রের আকারে একটি ভূমিকা লেখাইয়া লইব ।

প্রশংসা সম্বন্ধে অনেক কথাই বলিয়াছি, কিন্তু আমার এই বাক্যজালে সেত ধরা পড়িল না । কতবার জাল ফেলিয়াছি ও ফেলিতেছি, কিন্তু সে শফরী একবার সূর্য্য কিরণে বিহ্বল খেলিয়া জালের কাঁক দিয়া পলাইয়া যায় । জালে বাধিয়া আসে, গুম্ব, শঙ্কু ও কর্দম ।

জাল না ফেলিয়া যখন কমলাকান্তের মত চকু মুদিয়া নিরীক্ষণ করি, তখন দেখি প্রশংসা ফুলের মত ফুটিয়া রহিয়াছে । আমরা যেন প্রশংসাকে ফুল বলিয়াই মনে করি । ফুলে পৃথিবীর কোনও কাজই হয় না । বালক বৃদ্ধ যুবা ধনী দরিদ্র সকলেই কিন্তু ফুলের লোভে মুগ্ধ । ফুলে সংষ্ট হয় না কে ? কিন্তু ফুল দেবপুঞ্জায় লাগিলেই তাহার ফলজন্ম সার্থক । তাই বলিতেছি, ঐ প্রশংসার ফুলরাশি ঘরে লইয়া গিয়া কাজ নাই । উহা ভগবানের চরণে অর্পণ করিয়া বিদায় লই ।

উপসংহারে একটি কথা বলিতে চাহি ; প্রশংসাত্মকে ভুলক্রমে যদি কাহারও নিন্দা করিয়া ফেলিয়া থাকি, তবে তাহা ব্যাকস্তুতি বলিয়া সহদয় বঙ্গগণ গ্রহণ করিবেন এই অহরোধ ।

সঙ্গী ।

একা ঘরে নিশিদিন বসতি আমার,
তবু শুধু ফিরে ফিরে চাই,
অঙ্গের চন্দন গন্ধ আসে যেন কার,
পদধ্বনি শুনিবারে পাই !
বাতাসে ঢেঁকল হয় অঞ্চল আমার,
স্থর্য্য করে রাঙা হয় মুখ,
মনে জানি ছুঁয়ে গেল পরশ কাহার,
কে আমার ভরে' দিল বুক !

ঐপ্রিয়বদা দেবী ।

সত্যকাম জাবাল

(বৈদিক চিত্র)

বৈদিক যুগে একদিন, সত্যকাম নামক একটি কিশোর বালক, তাহার জননী জবালকে বলিল—‘মা, একপভাবে ক্রীড়া কৌতুকে অনর্থক সময় নষ্ট করিতে আমার আদৌ প্রবৃত্তি হইতেছে না—আপনি অমুমতি প্রদান করুন, আমি ঋষি-আশ্রমে ব্রহ্মচর্য্য প্রতিপালন করিয়া ব্রহ্মবিজ্ঞানভে জীবন সার্থক করি ।’

জবাল দাসীবৃত্তি করিয়া জীবন ধারণ করে—তাহার পুত্র ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া দিব্যজ্ঞান লাভ করিবে—একথা শ্রব্দের হইলেও মহা আনন্দের বিষয় । সুতরাং তাহার পুত্র স্বইচ্ছায়, অপরাপর গ্রাম্য বালকের হ্রাস বৃথা সময় অতিবাহিত না করিয়া দিব্যজ্ঞান লাভ করিবার জন্য আগ্রহাযিত হইয়াছে, ইহা অপেক্ষা সৌভাগ্যের বিষয় আর কি হইতে পারে ?

জবালার নয়নদুগল আনন্দে ছলছল করিয়া উঠিল । পুত্রকে প্রগাঢ় স্নেহ সহকারে নিবিড়ভাবে আলিঙ্গন করিয়া তাহার মস্তক আশ্রয় করিল ।

তদনন্তর জবালা কহিল—‘বৎস সত্যকাম, তোমার যে মহৎ আকাঙ্ক্ষা উৎকৃ

হইয়াছে—আশীর্বাদ করি—তুমি নিজ কৃতিত্ববলে সেই চির আকাজ্কিত হুঁও
বস্তুর সন্ধান লাভ করিতে সমর্থ হও—আমার এই গুণ্য দাসীজীবন সার্থক
হউক—তোমার অসাধারণ সত্য-নিষ্ঠা, অসীম ধৈর্য্য ও অধ্যবসায় এবং প্রবল
জ্ঞানলিপ্সার কথা, অনন্তকাল ধরিয়া জগতের সর্বত্র বিমোচিত হউক।

বর্তমান সময়ের ছায় তৎকালে গুরুগণ, জাতিব্যবসায়-নির্কিশেষে শিষ্যপদ-
কাজ্ঞী ব্যক্তি মাত্রকেই বিদ্বাদান করিতেন না। প্রত্যেক শিষ্যের বংশ-পরিচয়
ও অধিকারের তারতম্য বিবেচনা করিয়া এবং তাহাদের স্বভাবজাত মনোবৃত্তির
গতি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া শিক্ষাদান করিতে প্রবৃত্ত হইতেন। যে কেহ আসিয়াই
শিষ্যত্বের গৌরব লাভ করিতে সমর্থ হইত না। এই নিমিত্ত তখন গুরুশিষ্যের
সম্বন্ধ, পিতা পুত্রের সম্বন্ধ অপেক্ষা কোন অংশেই নূন ছিল না—গুরুর আশ্রমে
তাঁহার নিত্য সতর্ক তত্ত্বাবধারণ ও পর্য্যবেক্ষণ গভীর মধো অবস্থিত রহিয়া
তাঁহার পুত্র চরিত্রের পূণ্যপ্রভাব, শিষ্যের স্বভাব ও চরিত্রের মধো ওতপ্রোত
ভাবে সঞ্চারিত হইয়া যাইত।

সত্যকাম, আশৈশব জননীর তত্ত্বাবধারণে বিভিন্ন স্থানে অতিবাহিত করিয়া
নিজ বংশের বিশিষ্ট পরিচয় অবগত হইবার সুযোগ প্রাপ্ত হয় নাই। এখন,
সত্যকাম জননীকে জিজ্ঞাসা করিল—“মহা, গুরুর নিকট বিদ্যালিক্ষার্থ চলিয়াছি—
গুরু অপরিচিত শিষ্য গ্রহণ করেন না—আমি নিজ গোত্র-পরিচয়-অবগত নহি—
আপনি কৃপা করিয়া আমার গোত্র-পরিচয় প্রদান করুন—আমি গুরুগৃহে প্রস্থান
করি।”

সত্যকামের উক্ত আকাঙ্ক্ষার কথা শ্রবণ করিয়া জবালার চিরমলিন আনন
সমধিক প্রফুল্ল ও সন্মুখ হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু এখন সত্যকামের প্রশ্ন
শুনিয়া যেন ততোধিক বিষমলিন ও ত্রিঃমান হইয়া গেল—তাঁহার সদা গর্ভোন্মত
হৃদয় অচিরে অতিমাত্রায় সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল।

জবালা, সত্যকামের প্রশ্নের পর কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া স্থির করিল—এ
জীবনে যে পাপ সঞ্চয় করিয়াছি, তাহারই সম্যক প্রায়শ্চিত্ত শত শত জীবনে
ঘটিয়া উঠিবে না—আবার কেন মিথ্যার প্রভ্রম দিয়া পাপের ভার বর্দ্ধিত করি।
জবালা, এইরূপ সত্যের আশ্রয় গ্রহণে স্থির-প্রতিজ্ঞ হইলে শ্রনরায় অপূর্ব প্রভায়
সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

সে তাহার প্রাপ্তজ্ঞান পুত্রের সমক্ষে নিজ কলঙ্কের কথা প্রকাশিত করিতে
বিন্দুমাত্রও দ্বিধা বোধ না করিয়া অসঙ্কোচে স্পষ্ট ভাষায় বলিল—“বৎস, তুমি

কোন গোত্র, তাহা আমি যথার্থরূপে অবগত নহি । আমি যৌবনাবস্থায় বহু গৃহে পরিচালিকার কৰ্ম করিতে করিতে তোমায় লাভ করিয়াছিলাম । এই নিমিত্ত, কাহার ঔরসে তোমার জন্ম হইয়াছে, তাহা আমি বলিতে পারি না । তবে, আমার নাম জবাল—তোমার নাম সত্যকাম—তুমি ‘সত্যকাম জবাল’—এই মাত্র বলিয়া গুরু স্রমীপে আত্মপরিচয় প্রদান করিও ।”

সে দাসীপুত্র ও জারজ—একথা সত্যলোক নিবন্ধদৃষ্টি সত্যকামের মনে স্থানলাভ করিয়া তাহাকে বিচলিত করিতে পারিল না । সত্যের বিমল জ্যোতিঃ যাহার অন্তরে প্রবেশ করিয়াছে, সে দৃঢ় পদক্ষেপে স্থির লক্ষ্য হইয়া গন্তব্যপথে দ্রুত অগ্রসর হইবে—অবাস্তুর বিষয় তাহার গতি প্রতিরোধ করিতে কখনই সমর্থ হইবে না ।

সত্যকাম মাতৃচরণে প্রণাম করিয়া আশ্রম উদ্দেশে যাত্রা করিল ।

(২)

বহুবিস্তৃত অরণ্যমধ্যে, বৃক্ষবিরল একটি নিভৃত প্রদেশ । তথায় স্বচ্ছতোয়া নাতিবৃহৎ এক স্রোতস্বিনী কুলুকুলু শব্দে সদাই প্রবাহিত হইতেছে ।

অদূরে এক বৃহৎ বনস্পতি অগণিত লতায়মান সুদীর্ঘ শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া দিয়া এক ছায়াশীতল মনোরম স্থান রচনা করিয়া দণ্ডায়মান । ছায়াতলে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কয়েকটি ক্ষুদ্র কুঠার, বৃক্ষমূলে একটি মৃদয় ক্ষুদ্র বেদী ।

বেদীর উপর কুশাসনে উপবিষ্ট রহিয়া মহর্ষি জ্যোতির্ম উপদেশ প্রদান করিতেছেন—আর নিম্নে শিষ্যগণ মণ্ডলাকারে উপবিষ্ট রহিয়া একাগ্রচিত্তে উৎকর্ষ হইয়া তৎসমুদয় শ্রবণ করিতেছে । অদূরে কুঠারে বিভিন্ন অধিকারের শিষ্যগণ মধ্যে কেহ কেহ বা অস্থূলকণ্ঠে নিজ নিজ পাঠ আবৃত্তি করিতেছে—কেহ কেহ বা স্মরিত উদাত্ত স্বরে বেদগান করিয়া সেই নিভৃত আশ্রম সুধরিত করিয়া তুলিতেছে । কোন শিষ্য বৃক্ষবীধিকার জলসেচনে, নিবৃত্ত—কোন শিষ্য পুষ্পচরনে—কেহ বা কুঠার-মার্জনে—কেহ বা সন্ধি আহরণে—কেহ বা কৃষিকর্মে—কেহ বা গোপালনে—এইরূপ দলে দলে শিষ্যগণ নিজ নিজ নির্দিষ্ট কৰ্মে লিপ্ত রহিয়া একাগ্রমনে তৎসমুদয় সম্পাদনে যত্নপর রহিয়াছে ।

সত্যকাম, কল্পনায় যে সত্যের আলোক-রেখা-সম্পাতের আভাস মাত্র প্রাপ্ত হইয়াছিল—এই বিজন প্রদেশে কল্পনার অগোচর মনোহর স্থান ও সত্যের সূচনা-

নাকাজ্জী অগণ্য শিষ্য ও সারসভ্যের অধিকারী মহর্ষি গৌতমকে নেত্রগোচর করিয়া, তাহার মন্তক সম্বন্ধে স্তব্ধ হইয়া পড়িল।

সত্যকাম, সেই পূণ্য আশ্রমের বহির্দেশে দণ্ডায়মান রহিয়া একদৃষ্টে গৌতম ঋষির অপূৰ্ব দীপ্তোজ্জ্বল দ্বিচ্ছ স্তম্ভি দর্শন করিতে লাগিল। ভাবিতে লাগিল—‘আহা, এই ঋষি যাহাদিগকে তাঁহার সেবাদিকার প্রদান করিয়া শিষ্যত্বের গৌরব প্রদান করিয়াছেন—তাঁহারা ধন্ত, কত ভাগ্যবান! এ বৃথা আকাজ্জা আমি কেন করিতেছি—আমার এমন কি স্বকৃতি আছে!’ সত্যকামের গণ্ডযুগ বহিয়া এবল ধারায় অশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল—সে অশ্রুসিক্ত লোচনে দূরে দণ্ডায়মান রহিয়া আশ্রমের ক্রিয়াকলাপ নয়নগোচর করিয়া নিজে কৈ চরিতার্থ জ্ঞান কল্পিতে লাগিল।

অধ্যাপনা সমাপন হইলে মহর্ষি গৌতমের নবাগতের প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল—তিনি তাহাকে তাঁহার নিকটস্থ হইবার অন্ত ইঙ্গিত করিলেন।

সত্যকাম, দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া তথা হইতে ঘোড়করে সসঙ্কোচে দীপপদে অগ্রসর হইয়া অপেক্ষাকৃত নিকটস্থ হইলে পুনরায় প্রণাম করিয়া তাঁহার আজ্ঞার প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান রহিল। মহর্ষি গৌতম, তাহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, সত্যকাম বলিল—“ভগবান্, ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া আপনার নিকট অবস্থান করিয়া সেবাদিকার প্রাপ্ত হইবার আকাজ্জা আমি এখানে আগমন করিয়াছি—আপনি এ অধর্মের প্রতি সদয় হউন।”

তখন মহর্ষি গৌতম, সত্যকামকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“তোমার বংশ-পরিচয় কি?—তুমি কোন গোত্র-সম্প্রদায়?”

সত্যকাম বলিল—“ভগবান্, আমি কোন গোত্র-সম্প্রদায়, তাহা অবগত নহি। জননীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—তিনি বলিয়াছেন যে যৌবন কালে তিনি বহু স্থানে বহু লোকের পরিচালিকার কার্য্য করিতে করিতে আমার প্রাপ্ত হইয়াছেন সুতরাং আমি কোন গোত্র-সম্প্রদায়, তাহা তিনি নির্দিষ্ট ভাবে বলিতে পারেন না। আমার মাতার নাম জবালা—আমার নাম সত্যকাম। এই নিমিত্ত, আমি ‘সত্যকাম জবালা’ এই মাত্র আমার কুহিয়া দিয়াছেন—এতদতিরিক্ত আমি নিজের বংশ-পরিচয় অবগত নহি।”

মহর্ষি গৌতম সত্যকামের অসাধারণ সত্যপ্রায়গতা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলেন। যে বালক সত্যের অন্ত, জননীর ও নিজের মানিকর বৃত্তান্ত অসঙ্কোচে লোকসমক্ষে প্রকাশ করিয়া বলিতে বিধা বোধ করে না, তাহার হৃদয় কত মহান—তাঁহার চরিত্র ও নৈতিকবল কত দৃঢ়—তাঁহার আদর্শ কত উচ্চ!

উদারহৃদয় সম্ভ্রতমনা মহর্ষি, সত্যাকামের প্রতি সদয় ও প্রেময় হইলেন— দাসীর জারজ সন্তান বলিয়া তাহার প্রতি ঘৃণার পরিবর্তে তাহার অপূর্ণ সত্য-নিষ্ঠার বিমুগ্ধ হইয়া বলিলেন—“বৎস তুমি আপনাকে জারজ দাসীপুত্র বলিয়া পরিচয় প্রদান করিলেও আমি দিবা দেখিতে পাইতেছি, তুমি অ-ব্রাহ্মণ নহ— প্রকৃত ব্রাহ্মণ বস্ত্রীত অপর কেহ এরূপ ভাবে নিঃসঙ্কোচে সত্য বলিতে সমর্থ হয় না— তুমি সমিধ আহরণ কর—আমি এখনই তোমায় উপনীত করিয়া কষ্টচিন্তে শিষ্যাদিকার প্রদান করিব। তুমি সত্য হইতে কণামাত্রও বিচলিত হও নাই, তুমিই আমার শিষ্য গ্রহণের প্রকৃত অধিকারী।”

সত্যাকারী মহর্ষি গৌতমের অত্যন্ত উদার ভাব দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল—জারজ দাসীপুত্র, সত্যের কাকাল হইলে—প্রকৃত সত্যাত্ম্যেই হইলে, ব্রাহ্মণের গৌরব দান করিতে উদ্বৃত্ত—এতদপেক্ষা আর মহত্তর ভাব কি হইতে পারে ?

সত্যাকার, মহর্ষি গৌতমের পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িল।

অজ্ঞানহুয়ারী সমিধ আহরণ করিলে মহর্ষি গৌতম, সত্যাকামকে তৎক্ষণাৎ উপনীত করিয়া শিষ্যত্বে বরণ করিলেন। সত্যাত্ম্যেই সত্যাকার, অভিজ্ঞ পরিচালকের অভয়-আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া ধন্য ও আশ্বস্ত হইল।

(৩)

যথারীত উপনীত করিয়া মহর্ষি গৌতম সত্যাকামকে বলিলেন—“বৎস সত্যাকার, তুমি এই আশ্রমের দুর্জল ও ক্লশ ষোড়শপাল হইতে চারিশত গাভী মোচন করিয়া চারণা ও পরিচর্য্যার জন্য তাহাদের অল্পগামী হও।”

সত্যাকার, শুষ্ক আদেশ লাভে নিজেকে ধর্মী জ্ঞান করিয়া চারিশত দুর্জল ও ক্লশ গাভী, তৎক্ষণাৎ গো-গৃহ হইতে মোচন করিয়া চারণার্থ বহির্গত হইলে মহর্ষি কহিলেন—“এই চারিশত গাভী যাবৎ সংখ্যা পূর্ণ-সহস্র না হয়, তাবৎ আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করিবে না।” সত্যাকার ঋষির চরণ বন্দনা করিয়া গো-পাল সহ প্রস্থান করিল।

মানবের স্বভাবতঃ প্রবুদ্ধ বুদ্ধি-বৃত্তির সম্যক বিকাশ সাধনই বিজ্ঞানশিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য। এই বিজ্ঞানশিক্ষা করিয়া দিব্যজ্ঞান বা ব্রহ্মানুভূতি লাভই ইহার চরম পরিণতি।

এই প্রবুদ্ধ বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ এবং এই বিকশিত বা উন্মোচিত বুদ্ধিবৃত্তির

সহায়তায় দিব্যজ্ঞান লাভ করিবার জন্য, ঐহবন্ধ জ্ঞানই একমাত্র অবলম্বনীয়” আশ্রয় নহে । সমগ্র পরিদৃশ্যমান জগৎ ব্যাপিয়া প্রকৃতির প্রতি ঠাঁই, জ্ঞানের অনন্ত ভাণ্ডার উন্মুক্ত রহিয়াছে—কুত্র কক্ষ মধ্যে নিবদ্ধ রহিয়া এছাড়া অ্যাপেক্ষা প্রকৃতির লীলানিকেতন মধ্যে সতর্কদৃষ্টি হইয়া অবাধ ও স্বচ্ছন্দ বিচরণ, বুদ্ধি-বৃত্তির বিকাশ সাধন পক্ষে অল্প কার্য্যাকরী নহে ।

অনন্ত নীল আকাশতলে শ্রামায়মান জনশূন্য বিশাল বন্যস্থি-রৌদ্রদগ্ধ বিপুল প্রান্তর, চঞ্চলগতি তটিনী—মুক্ত প্রকৃতির এ সকল বিচিত্র বিকাশ যে প্রকৃত ভাবকের জগৎ, ঐবসন্তোর স্বর্গীয় মহিমা প্রকটিত করে, তাহার তুলনা কোথায় ? তবে, এই ভাবে প্রকৃতির জগৎখাপী ক্ষেত্র হইতে শ্রাব বা জ্ঞানবিস্ত সঞ্চয় করিবার মত প্রবল অহুমুগ্ধতা, হুম্ম বিভাবনা ও গভীর পর্য্যবেক্ষণ শক্তির অধিকারী হওয়া একান্ত আবশ্যক । নচেৎ, নিরঙ্কর ব্যক্তির সমক্ষে অক্ষরময় গ্রন্থের ছায়া, অনবহিত ব্যক্তির পক্ষে, উন্মুক্ত প্রকৃতির বিরাট নিকেতন চিরকক্ষের ভাষ প্রতীয়মান হয় ।

মহর্ষি গৌতম, সত্যকামকে উপনীত করিয়া, জ্ঞানাজন-শলাকা দ্বারা তাহার জ্ঞান চক্ষু উন্মীলিত ও পর্য্যবেক্ষণ শক্তি উদ্বোধিত করিয়া দিলেন । প্রবল জ্ঞান-লিপ্সু সত্যকামের এখন দিব্য দৃষ্টি লাভ হইল—সমগ্র জগৎ তাহার সমক্ষে এখন এক অভিনব রূপ পরিগ্রহ করিয়া প্রকটিত হইল ।

কি অরণ্য প্রান্তর, কি গিরিগুহা নদীকলয়, কি তরুগুচ্ছ, কি লতাবিতান, কি তড়াগ সরোবর, কি পুঙ্কীর কুঞ্জন—পশুর গর্জন—বস্ত্রের নির্যোধ, কি পদ্মের পরিমল—আশানের ধুম—প্রকৃতির সকলেই সর্বত্র জ্ঞানের অনন্ত ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া দিল । সত্যকাম, দিব্যদৃষ্টি লাভ করিয়া—তাহা ছাড়ে ছাড়ে বর্ণে বর্ণে পাঠ করিয়া স্তম্ভিত হইতে লাগিল । বৃহস্প, প্রচুর ধাতু প্রাপ্ত হইয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া গেল ! যেমন অসীম জ্ঞানলিপ্সা, তেমনই জ্ঞানের অক্ষরস্ত ভাণ্ডার !—যেমন দাতা, তেমন গ্রহীতা—আদান প্রদানের বিচিত্র লীলা !

সত্যকাম, শয়নে স্বপনে—আহারে বিহারে—অহরহঃ অনন্যমনে, প্রকৃতির অনন্ত রূপ চিন্তা করিয়া—চক্ষু স্বর্ষ্য, গ্রহ নক্ষত্র—গিরিবন, নদী সমুদ্র প্রভৃতির অন্তর্নিহিত শক্তির প্রভাব অহুতব ও উপলব্ধি করিয়া ক্রমেই সারসভ্যের সমীপস্থ হইতে চলিয়াছে—ক্রমেই বহিঃপ্রকৃতি হইতে অন্তঃপ্রকৃতির চিন্তায় আত্মস্থ হইয়া চরম সত্যের দিব্য স্নিগ্ধ জ্যোতির সন্ধানলাভে কৃতার্থ হইতে চলিয়াছে ।

● মহর্ষি গৌতম ঐষ্টা । তিনি সত্যকামকে শিক্ষাধিকার প্রদান কালেই বুদ্ধি-

রাছিলেন, এ-বালক আরজ দাসীপত্র হইলেও ইহার অন্তর মধ্যে এমন কিছু নিহিত ও প্রচ্ছন্ন আছে, যাহার অধিকারী হইলে, জাতি বা বাবসায় নির্বিশেষে তাহাকে অ-ব্রাহ্মণ কহা সম্ভব নহে ।* এই বৃষ্টিয়াই তিনি তাহার অর্ধ-প্রবুদ্ধ শক্তি জাগ্রত বা, বিকশিত করিবার সহায়তা-কল্পে উপনয়ন-সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন এবং তাহার ধারণাশক্তির প্রাণী ও পরিমাণ নির্ণয় করিয়া প্রকারান্তরে তাহার দ্বিভাজন লাভের কাল নির্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন ।

সত্যকাম যখন চরন সত্য উপলব্ধি করিবার প্রকৃত অধিকারী হইয়া উঠিল, তখন সে দেখিতে পাইল—তাহার চারিশত গো-পাল, সহস্রে পরিণত হইয়াছে !

(৪)

সত্যকাম আচার্য্য-আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে ।

এমন সময়, দিক্ সমূহের দেবতা বায়ু, সেই গো-পালের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গো আশ্রয় করিয়া সত্যকামকে বলিলেন—“হে সোম্য, আমরা এখন সংখ্যায় সহস্র হইয়াছি, আমাদিগকে আচার্য্যের আশ্রমে লইয়া চল । আমি তোমায় ব্রহ্মের অংশ চতুর্ভুজের মধ্যে একাংশ বর্ণন করিব ।”

এই কথা শ্রবণ করিয়া জাবাল অতিশয় আগ্রহান্বিত হইয়া বলিল—“ভগবান্, রূপাপূর্ব্বক বর্ণন করুন—আমি চরিতার্থ হই ।” তখন ঋষভরূপী বায়ুদেবতা বলিলেন—

“এই পূর্ব্ব দিক্, এই পশ্চিম দিক্, এই দক্ষিণ দিক্, এই উত্তর দিক্—এই দিক্চতুর্ভুজ ব্রহ্মের অবয়ব স্বরূপ । এই প্রকাশমান অবয়ব চতুর্ভুজ হইতে ব্রহ্ম প্রকাশময় নামে অভিহিত হইয়াছেন । বিদ্যান ব্যক্তি, এই প্রকাশময় রূপের উপাসনা করেন ; তিনি ইহকালে খ্যাতি অর্জন করেন এবং পরকালে অমৃত-লোক প্রাপ্ত হন । অগ্নি, তোমায় ব্রহ্মের অপর একপাদ বর্ণন করিবেন ।”

এই ছলভ উপদেশ শ্রবণ করিয়া জাবাল, বায়ুদেবতার আশ্রয়ভূত ঋষভকে ধন্যবাদ প্রণাম করিয়া, তাহা ধ্যান ও ধারণাগতি করিয়া লইল । তদনন্তর সত্যকাম, পরদিন গো-পাল সহ আচার্য্য আশ্রমভিমুখে প্রস্থান করিল । পথিমধ্যে সায়ংকাল উপস্থিত হইলে, সেই স্থানে গাভী সকলকে রক্ষা করিল এবং সমিধ দ্বারা অগ্নি প্রজ্জ্বালিত করিয়া তৎ পশুগণে পূর্ব্বাহ্ন হইয়া উপবেশন করিল ।

তখন অগ্নি-দেব বলিলেন—“হে সোম্য, আমি তোমায় ব্রহ্মের অংশ চতুর্ভুজ মধ্যে অপর একপাদের কথা বর্ণন করিব ।” সত্যকাম করজোড়ে প্রার্থনা করিয়া

বলিল—“হে ভগবন, রূপাপূৰ্ণক ত্র্যক্ষের অপর একপাদ বর্ণন করিয়া আমায় ধন্ত করুন।” অগ্নিদেব বলিলেন—

“পৃথিবী ত্র্যক্ষের অবয়ব, অশ্বরীক্ষ ত্র্যক্ষের অবয়ব, স্বৰ্গ ত্র্যক্ষের অবয়ব, সমুদ্র ত্র্যক্ষের অবয়ব। এই অবয়ব চতুষ্টি হইতে ত্র্যক্ষের নাম অনন্তময় হইয়াছে। যে ব্যক্তি, ত্র্যক্ষের এই অনন্তময় চতুরবয়ব রূপের উপাসনা করেন, তিনি ইহলোকে অনন্তময় হন এবং পরলোকে অনন্তময়-লোকপ্রাপ্ত হন। হংস তোমারি ত্র্যক্ষের অপর এক পাদ বর্ণন করিবেন।”

এই বলিয়া অগ্নিদেব নিরন্ত হইলেন।

জাবল পরদিন প্রাতে গাভী সকলকে পুনরায় আচরণ্য আশ্রমভিমুখে লইয়া চলিল। সায়াংকাল উপস্থিত হইলে, অগ্নি সমুখে রাখিয়া বসিয়া আছে, এমন সময় হংসরূপী আদিত্য-দেব উড়িয়া আসিয়া বলিল—“হে সোম্য, আমি তোমার ত্র্যক্ষাবয়বের অপরাংশের কথা বর্ণন করিব—

“অগ্নি ত্র্যক্ষের অবয়ব, সূর্য্য ত্র্যক্ষের অবয়ব, চন্দ্র ত্র্যক্ষের অবয়ব, বিহ্বা ত্র্যক্ষের অবয়ব—এই অবয়ব চতুষ্টি হেতু ত্র্যক্ষ জ্যোতিষ্ম নামে অভিহিত হইয়াছেন। যে ব্যক্তি এই জ্যোতিষ্মের রূপ ত্র্যক্ষের উপাসনা করেন, তিনি ইহলোকে জ্যোতিষ্ম হইয়া বিরাজ করেন এবং পরলোকে জ্যোতিষ্ম-লোক প্রাপ্ত হন। মদগু পক্ষী তোমায় ত্র্যক্ষের শেষপাদ বর্ণন করিবেন।” এই বলিয়া হংসরূপী আদিত্য-দেব নিরন্ত হইলেন।

জাবল পুনরায় গাভীসকল পরিচারণা করিয়া আচার্য্য গৃহভিমুখে আসিতে আসিতে সায়াংকাল উপস্থিত হইল। সে পূর্ব্বের ছায় অগ্নিকে সমুখে রাখা করিয়া উপবিষ্ট আছে, এমন সময় এক মদগু পক্ষী উড়িয়া আসিয়া সত্যকামকে বলিল—“আমি তোমায় ত্র্যক্ষের শেষাংশের কথা বর্ণন করিব।”

সত্যকাম বলিল—“হে ভগবন, বর্ণন করুন—আমার জীবনধারণ সার্থক হউক—আপনাদের সহপদে গৌরবমণ্ডিত হউক।”

তখন মদগুরূপী বরুণদেব বলিলেন—“হে সোম্য, প্রাণ ত্র্যক্ষের অবয়ব, চক্ষু ত্র্যক্ষের অবয়ব, শ্রোত্র ত্র্যক্ষের অবয়ব, মন ত্র্যক্ষের অবয়ব—এই অবয়ব চতুষ্টি হেতু ত্র্যক্ষ আয়তনবান বা আশ্রয়বান। যে ব্যক্তি ত্র্যক্ষের আশ্রয়বান রূপের উপাসনা করেন, তিনি ইহলোকে আশ্রয়বান হন এবং পরলোকে আশ্রয়বানলোক প্রাপ্ত হন।”

এই বলিয়া বরুণ-দেবরূপী মদগু পক্ষী নিরন্ত হইলেন।

পরদিন, সহস্র গাভী লইয়া সত্যকাম, মহর্ষি গৌতমের চরণ ধননা করিল।

(৫)

প্রথম দর্শনে মহর্ষি গৌতম সত্যকামকে, উহার ক্ষীণ আভায় প্রকাশমান ধরণীর ছায়, আশা ও আকাঙ্ক্ষার প্রকট-মূর্তির ছায় অবলোকন করিয়াছিলেন । এখন প্রুথর স্বর্ষ্য-করোজ্জ্বল ধরণীর ছায় অপূর্ণ প্রভায় সমুদীপ্ত দেখিয়া তাঁহার বৃত্তিতে ~~অক্ষী~~ ^{অক্ষী} ~~ন~~ ^ন ~~হি~~ ^{হি} ~~ল~~ ^ল ~~না~~ ^{না}—জারজ দাসীপুত্র জাবাল, যথার্থই ‘সত্যকাম’ হইয়াছে—তাঁহার অন্তরে ব্রিহৎ প্রথর বিমল রশ্মি প্রতিভাত হইয়া তাহাকে অপূর্ণ মহি-মোজ্জল করিয়া তুলিয়াছে ।

মহর্ষি বলির্গেন—“বৎস, আমি তোমায় এখন দর্শন করিয়া যথার্থই প্রীতি-লাভ করিলাম—তুমি প্রুক্রুত ব্রহ্মবিদ্ ব্যক্তির ছায় শোভা পাইতেছ । তোমার নিশ্চিন্ত সহাস্য বদন, প্রসন্নোজ্জ্বল ও বিশিষ্ট বাহ্যকৃতি দেখিয়া আমার স্পষ্টই প্রীতীতি হইতেছে—তুমি দাবতীয় বিজ্ঞায় পারদর্শী হইয়াছ—তুমি চরম সত্যের সন্ধান প্রাপ্ত হইয়াছ । তোমার অন্তবিধ কোন আনুষ্ঠানিক শিক্ষার প্রয়োজন নাই ।”

মহর্ষির চরণরেণু মস্তকে ধারণ করিয়া সত্যকাম বলিল—“ভগবন্, আপনার শুভানীর্কাদে আমি মহুচ্ছ্যতর দৈবীশক্তি দ্বারা শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছি । কিন্তু দেব, আমি সে শিক্ষাকে তাদৃশ ফলদায়ক বিবেচনা করি না । আপনি রূপাপূর্ণক আমার শিক্ষাদিকার প্রদান করিয়াছেন, আপনার আদেশ প্রতিপালনের সফল সঙ্গে সঙ্গেই প্রাপ্ত হইয়াছি । এখন এই অধমকে আপনার প্রসাদ লাভে বঞ্চিত করিবেন না । আপনার শুভাহুগ্ৰহে, এই “কথবৎসর, ধরিয়া প্রকৃতির নিকট আমি যে জ্ঞান সঞ্চয় করিয়াছি, তাহা আপনার অর্গন-স্পর্শে মহীয়ান্ হইয়া উঠুক—আপনার সঙ্গপদেশ লাভে তাহা সংহত ও সংযত হইয়া গৌরবাধিত হউক, শিষ্যের একনিষ্ট যত্ন ও চেষ্টার উপর, আচার্য্যের কীর্তি-বৈজয়ন্তী চির প্রতিষ্ঠিত হউক ।”

মহর্ষি গৌতম এইবার জারজ দাসীপুত্রকে আলিঙ্গন দান করিলেন । তাঁহার আনন্দাঙ্গধারায় জারজ দাসীপুত্রের গাত্র-কলঙ্ক স্থলিত ও বিলুপ্ত হইয়া গেল !

মহামনা মহর্ষি ক্রমে সত্যকামকে বোড়শকলা ব্রহ্মবিজ্ঞা সমগ্র দান করিলেন । তদনন্তর তিনি জাবালকে অচাৰ্য্য পদে ব্রতী করিয়া জগতে সত্যনিষ্ঠা, একাগ্রতা ও গুরুশিষ্যের নিত্য মধুর সম্বন্ধের গৌরবন্তস্ত চিরপ্রোথিত করিয়া গেলেন ।*

ত্রীশিবরতন মিত্র ।

উৎসবে

হে উৎসব হে আনন্দ, তোমার অতীত ইতিহাস
কোন্ কল্পলোক হ'তে বহি' আনে কিসের আভাস ?

কোন্ পূর্বে কোন অমরায়
কবে কোন্ পূর্ণিমানিশায়
প্রথম বাসর তব যাপিয়াছ বাসব-সভায় ;
অশ্রাহীন অমর নগর
'অনিমেঘ চাহি' অমুকুণ
তোমারে বরিয়া নিল ত্রিলোকের কামনার ধন ;
নন্দন বিলাস ফুলবাস
বসন্তের বহিল নিশ্বাস
তারি সাথে তাল রেখে মন্দাকিনী তুলিল উচ্ছ্বাস ;
মধুমাস মধুবাস চারিপাশে ফুটে মধুহাস—
এই তব জন্ম-ইতিহাস !

তারপরে ফিরে' কোন্ বৈদিকের শাস্ত তপোবনে,
দেবকল্প ঋষিদের যজ্ঞসমাগম স্তম্ভকর্ণে—

অঙ্গণের প্রথম ইঙ্গিতে
সামচ্ছন্দে মিলিত সঙ্গীতে
শ্রোতস্বতী স্রস্বতী-তীরতলে ছিলে তরঙ্গিতে !

হোমধূপে হবিগন্ধভারে
স্বর্গগামী অর্ঘ্যউপচারে
স্বাহা স্বধা মন্ত্রভরা রিষ্টিহরী ইষ্টমন্ত্রাগারে,
শাস্ত্র মুখে শুচিতত্ত্ব হাসি—

স্বর্ণপাত্রে কুলফুলরাশি
তেজস্বী তাপসকণ্ঠে স্তম্ভিতাঙ্গী উঠিল উচ্ছ্বাসি' ;
মহোৎসবে মুখরিত স্বরভাষী তপোবনবাসী—
স্বভাবতঃ আনন্দে উদাসী ।

হাঁসের কোথায় স্বর্গ কোথা বা সে পুণ্যতপোবন,
কোথায় এ চির আর্ন্ত মর্ত্যলোকে উৎসবের ব্যর্থ আয়োজন ;
ইন্ড্রের নন্দনে যাহা রাজে
সে কি সাজে পথপঙ্কমাবে
চিরবিধবার বীণে স্রবের সাহানা সে কি বাজে !
রোগ শোক যুগ আর জরা
শ্রশানের হরিধ্বনিভরা
লক্ষণত বেদনায় নিয়ত কাতরা বহুকলা ;
চক্ষে যেথা অশ্রু জেগে রহে
হাহাকার নিত্য চিত্ত দহে
হাসি কি তাহার কাছে নিদারুণ পরিহাস নহে ?
উৎসব সে কোথা পাবে—সাহারায় সুরধুনী বহে ?
কার সাধ্য এত মিথ্যা কহে !

এই যে কহিল কথা, এই যে ডাকিল প্রিয়নামে,
সে সুর মিলাল কোথা স্বরহীন কোন ভিনগ্রামে !
কিসের আশ্বাস নিয়া তবে
বীণা বেধে আনিব উৎসবে,
'নাই' ও 'হারাই' নিয়ে হেথাকার অভিনয় যবে !
নিরাশায় নিভৃত সঙ্কায়
সাজাইছ যে প্রাণসখায়
জান কি তাহারি ডাক পড়িয়াছে স্রুত্রে কোথায় ?
বিরহের যে ভয়ের লাগি
কত নিশি ঘাপিয়াছ আগি'
শতবার দিবা দিয়া এক-ই কথা লইয়াছ মাগি',
ব্যথা বুকিবার আগে জন্মশোধ সে গেছে তেমাগি' ।
• আনন্দ কোথায় অহুমাগি ?

কোন্ উপাদানে হায়, তোমার গঠন ওরে মন !
নাই শান্তি নাই তৃপ্তি দিবরাতি ঝরিতে নয়ন !

হাস যবে প্রাণপণ হাসি—
তারও যে গোপন বক্ষোবাসী
কাঙাল ককালসার রক্তধার হিরা উপবাসী ।
চক্ষে ভাসে আনন্দ তরল,
বক্ষ বেয়ে উঠে অশ্রুজল—
বিন্দু অশ্রুতের তলে পানপাত্রপূর্ণ হলাহল !
এই নিয়ে জীবনের খেলা,
এই নিয়ে মিলনের মেলা—
এই নিয়ে কুয়াশায় মেঘচ্ছায় বেড়ে যায় বেলা ;
কে কোথায় ডুবে যায়, শেনে হায় তুমি সে একেলা—
পানাবারে ভেসে চলে ভেলা ।

ঐ যে প্রলয় ঝড় উঠিয়াছে পশ্চিমের কোণে—
কি করিতে পার তুমি—সে কি কারো অহুযোগ শোনে !
বৈষ্ণব সে তুলসীতলায়
নিজ বনে জীবে নয় চায়,
বিশ্ব ছুড়ি' তাত্ত্বিক যে বসিয়াছে শব-সাধনায় !
কোথা মগ্ন কোথা জপমালা,
কোথায় বা বংশীধর কালা,
চেয়ে দেখ লোলমুখী মুক্তাহতা ভৈরবী করালী !
কমলা সে লুকাল কোথায়,
জীবন্তনা তারা নাহি হায় ।
রক্তাধরা ছিন্নমস্তা আপনার বক্ষরক্ত খায় !
ভয়ে বিশ্ব নুসে আঁখি, শান্তি লাজে শিহরি লুকায়—
তবু হায় আনন্দ কে চায় !

সতাই যে আনন্দই চাই, গান চাই, চাই আলো—
মরণের কোলে নসে দও ছই তবু বাসি ভাঙো ।
বিরহের চিন্তাচিন্তা আগে
তবু হায় অন্ধ অহুরণে
ঘর্ষমাঝে চেপে ধরি প্রাণপণে যানে ভাললাগে ।

তাই—এই আনন্দের মেলা,
 তাই—এই উৎসবের থেলা,
 তাই—এই মিলনের অভিনয়, যতক্ষণ নাহি পড়ে বেলা ।
 ডাক 'প্রিয়' ডাক 'প্রিয়তম',
 ডাক 'বন্ধু' ডাক 'সখা মম'—
 বল 'কমা করিলাম', বল 'কম অপরাধ মম,
 মিলনের বরি' লও জীবনের চিরসঙ্গী মম ।
 উৎসব তোমায় নমোনমঃ ।

কিস্ত হায়, কতক্ষণ,—পথ যে ফুরায়, দিন যায়—
 গোষ্ঠুলির স্বপ্নালোক মিলায় যে নেত্রতারকার !
 ওরে পাছ, ওরে রে পথিক,
 অন্ধকারে ঢেকে আসে দিক—
 তন্ময় আসিবার আগে চক্ষু তোর বালা চিনে নিক্ ।
 অনন্তের প্রশান্ত পন্থায়
 কি পাথের সাথে নিলি ভাই,
 কোন্ অহুনের নিম্নে কার কাছে দাঁড়াবি সন্ধ্যায় ?
 মৃত্যুমাঝে অমৃত বীহার,
 ছই নেত্র অলৌ অন্ধকার—
 ভূঃধন্থ হর্ষামর্ষ সমান প্রসাদ পুষ্পকার ;
 রূপ ও অরূপ যিনি, যিনি পার, যিনি পারাবার !
 তাঁরে মন কর নমস্কার ।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী ।

মন—বুলবুল।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

আমার পিতৃব্য নবাব ইমদাদ আলিখাঁ বাহাদুর সে বৎসর গভর্ণমেন্ট হইতে সি, আই, ই, উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় দরবার, মহামাফ বড়লাট সাহেব বাহাদুর উপাধিদানিগণকে সনদ বিতরণ করিবেন। পিতৃব্য মহাশয় আমায় বলিলেন—“চল আহমদ, কলিকাতা বেড়াইয়া আসি।”

কয়েকমাস পূর্বে আমার জীবনযোগ হইয়াছিল। প্রথমটা শোকে একান্ত মুহমান হইয়া পড়িয়াছিলাম।—এখনও আমার চিত্তবিকার উৎপন্ন হইয়াছে না;—দেশভ্রমণে যদি আমার মন ভাল হয়, সম্ভবতঃ এই আশঙ্কিতই পিতৃব্য মহাশয় আমায় সঙ্গে লইবার প্রস্তাব করিলেন, তাহা বুঝিতে পারিলাম। আমি সম্মত হইলাম।

আমাদের সংসারে একজন বৃদ্ধা দাত্তী আছে; আমার পিতাকে, পিতৃব্যকে এবং আমাকেও সে মাহুষ করিয়াছিল। সে বলিল—“বাগজান! এই দিঘী সহরেই জীবন কাটিল, কলিকাতা কেমন, তাহা কখনও চক্ষে দেখিলাম না। শুনিতে পাই ইংরাজেরা নাকি কলিকাতাকে এক আশ্রয় সহর তৈয়ারী করিয়াছে। চিড়িয়াখানা, বাহুঘর, আরও অনেক অনেক আশ্চর্য্য জিনিষ সেখানে আছে শুনিয়াছি। বুড়া হইয়াছি, কবে আছি কবে নাই—একবার চক্ষু সার্থক করাইয়া দাও বাবা! তোমার কলিকাতার খালীসাহেবাকেও অনেক দিন দেখি নাই; তাহার সঙ্গেও একবার শেষ দেখাটা করিয়া আসি।”—পিতৃব্য মহাশয়কে বলিয়া তাহার অনুমতি লইলাম,—দাত্তীও আমাদের সঙ্গে চলিল।

আমার খালীসাহেব (পিসেমশায়) কলিকাতার একজন অনারারী প্রেসি-ডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট এবং ছোটলাট বাহাদুরের সদস্ত-সভার সভ্য। চোরঙ্গি অফলে আমাদের জন্ত একখানি ভাল বাড়ী এবং দুইখানি হাওয়াগাড়ী ভাড়া করিয়া রাখিতে তাহাকে তার দেওয়া হইল। নির্দিষ্ট দিনে আমরা কলিকাতায় পৌছিলাম।

মাসখানেকের মধ্যেই দরবারের অধিবেশন সম্পন্ন হইয়া গেল। পিতৃব্য মহাশয় বলিলেন—“চল আহমদ, এবার দেশে ফেরা যাউক।”

কলিকাতাটা আমার বড়ই ভাল লাগিয়া গিয়াছিল। আমার স্বাহোর ও

মনের এ সমস্ত বেশ উন্নতি দেখা যাইতে লাগিল। আমি বলিলাম “হজরৎ যদি অহুমতি করেন—আমি আরও মাসখানেক এখানে থাকি।”—সম্মতি দিয়া পিতৃবা মহাশয় দেশে ফিরিলেন। দাদী আমার কাছেই রহিল।

কয়েক দিন পরে রাজ্যে আহ্বারের পর শয়ন করিতে যাইবার পূর্বে ড্রিংকসে বসিয়া ধূমপান করিতে করিতে একখানি পুস্তকের পাতা উন্টাইতেছিলাম—সময়ে দরজাটি আস্তে আস্তে কে খুলিল! চাহিয়া দেখি ছিন্নবস্ত্র-পরিহিতা, কর্দ্দমাস্ত্র একটি চৌদ্দ পনেরো বৎসরের বালিকা দরজায় দাড়াইয়া। ইহার বেশ পশ্চিমদেশীয়া মুসলমান রমণীর মত। বালিকাটি অসামান্য স্থল্মী—তাহার রূপ যেন ফাটিয়া পড়িতেছে।—দেহখানি শীর্ণ—রক্ত চুলগুলি দ্বকের চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। তাহার বড় বড় কাণ চোপছটি আমার পানে কাতর ভাবে চাহিয়া আছে।

জিজ্ঞাসা করিলাম—“কে তুমি?”

মেয়েটি পরিকার উদ্গুতে তাড়াতাড়ি বলিল—“মাফ্ করুন—ঘরের মধ্যে আলো দেখিয়া প্রবেশ করিয়াছি। নবাব ইম্দ্দাদ আলি খাঁ সাহেবের সঙ্গে একটিবার দেখা করিতে চাই—এটা কি তাঁহারই বাড়ী?”—তাহার কণ্ঠস্বরটি মৃদু ও অত্যন্ত মিষ্ট।

আমি বলিলাম—“হাঁ—তাঁহার কাছে তুমি কি চাও?”

“গুলিয়াছি তিনি বড় দয়ালু—সকলেই তাহা বলে।—আমি—আমি কোথাও যাইবার আর স্থান না পাইয়া—আমি এখানে আসিয়াছি।”

বেশ বুঝা গেল, বালিকা বিশেষভাবে বিপন্ন হইয়াই আসিয়াছে। বলিলাম—“ঘরের মধ্যে এস—বস—তোমার কি হইয়াছে, বল।”

মেয়েটি আমার দিকে চাহিয়া বলিল—“আপনি যদি কিছু মনে না করেন,—তাহা হইলে আমি নবাব সাহেবের নিকটেই বলিব।”

“তিনি এখানে নাই—সপ্তাহখানেক হইল তিনি দিল্লী গিয়াছেন। আমি তাঁহার ভ্রাতৃপুত্র—তোমার কি বলিবার আছে বল?”

আশ্চর্য্য হইয়া মেয়েটি বলিল—“এখানে নাই?” বলিয়াই মুখখানি দুই হাতে ঢাকিয়া ফেলিল।

আমি বলিলাম—“তিনি এখানে না থাকাতে তুমি কি অত্যন্ত নিরাশ হইয়াছ?—আমার দ্বারা যদি তোমার কোনও উপকার হয় ত বল?”

“আপনার দ্বারা হইবার নহে, সাহেব!”

“কেন?”

একটু ইতস্ততঃ করিয়া, মুখ হইতে হাত নামাইয়া, সে বলিল—“আমি মনে করিয়াছিলাম নবাব সাহেব আছেন—তাই আসিতে সাহস করিয়াছিলাম। আমি এখন যাই। আমাকে মাফ করিবেন।”

আমি হাসিয়া বলিলাম—“পিতৃব্য মহাশয়ের নিকট তোমার বাহা বলিবার ছিল—তাহা আমাকে সব না বলিলে তুমি যাইতে পাইবে না। ছেলেমানুষ তুমি—এই রাজ্যে—”

মেয়েটি তিরস্কারচ্ছলে বলিল—“আমার বয়স পঞ্চদশ বৎসর।”

“আচ্ছা যাক—তোমার নাম কি বল।”

“আগে আমার কাহিনী অল্পগ্রহপূর্বক শুনিবেন কি?—আপনি যদি আমাকে সাহায্য করিতে না পারেন—বোধ হয় আপনি পারিবেন না—তাহা হইলে আমার নাম জানিয়া আপনার কল কি?”

আমি বলিলাম—“আচ্ছা, তোমার কাহিনীই আগে বল, শুনি।”

মেয়েটি বলিল। কোলের উপর হাত দুটি রাখিয়া আনত নেত্রে বলিতে লাগিল—“আমার পিতা একজন ব্যবসায়ী ছিলেন—দিল্লীর চাঁদনি চকে তাঁহার দোকান ছিল।—মা আমার শৈশবেই মারা যান। আমি যখন পাঁচ বৎসরের, সে আশ্রয় দশ বৎসরের কথা—বাবাও মারা গেলেন। আমার এক চাচা আছেন, তিনিই আমার ভার লইলেন। আমার চাচা ও চাচানী আমাকে বেশ যত্নই করিতেন। তাহার পর আমার চাচানীর মৃত্যু হইল। আমার চাচাও সরাব ধরিলেন সব পরিবর্তন হইয়া গেল। সামান্য একটি চাকরী করিতেন—চাকরীটি তিনি হারাইলেন। তাহার পর অস্বাভাবে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিলেন। চারি বছর তিনি এইরূপ পথে পথে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছেন। তিনি ও আমি দুজনেই ভিক্ষা করি—আমি যে ভিক্ষারিণী তাহা বোধ হয় আমার চেহারা ও ছিন্নবস্ত্র দেখিয়াই আপনি বুঝিতে পারিয়াছেন। তাহার উপর তিনি আমার প্রতি বড়ই রুচি ব্যবহার করিয়া থাকেন।”

মেয়েটি আমার দিকে চাহিল—দেখিলাম, তাহার চক্ষুদুগল অশ্রুপূর্ণ।

বাম হস্তে আঙিয়ার আন্তিন একটু তুলিয়া সে আমাকে দেখাইল। দেখিলাম, তাহার সেই অঙ্গে কাগ একটা দাগ পড়িয়াছে—আঘাতের চিহ্ন। মেয়েটি বলিয়া যাইতে লাগিল—“তাঁহাকে দেখিলে এখন আমার ভয় করে। এ

জীবন আমার অসহ্য । আমাকে যদি কেহ কাণ দেয়, তাহা হইলে বাচিয়া যাই—আমি এখন দাসীপণ্য করিতেও প্রস্তুত আছি ।”

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—“তুমি কি পলাইয়া আসিয়াছ ?”

মেয়েটি বলিল—“হা—চাচা মাতাল হইয়া পড়িয়াছেন । এই দিক দিয়া আমরা যাইতেছিলাম ; পথে একজন খানসাহা যাইতেছিল—তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম এ বাড়ীতে দিল্লীর বিখ্যাত ধনা নবাব ইমদাদ আলি সাহেব বাস করিতেছেন । দিল্লীতেও বালাকালে আমি তাঁহার নাম ও বশ শুনিয়াছিলাম । এখান হইতে কিয়দূরে একটা গলির ভিতর যে কয়লার গুদাম আছে, সেই গুদামে শুইয়া চাচা ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন । আমি শ্রবোগ বুঝিয়া সরিয়া পড়িলাম । প্রথমে কিয়ৎকণ রাত্তার ওপারে গাছের তলায় পাড়িয়াছিলাম । শাতে কাপিতে কাপিতে এই বাটীর আলোকের পানে চাহিয়া নবাব সাহেবের কথা মনে করিতেছিলাম—এই এত বড় বাড়ীটাতে বৃদ্ধ মাহুষ একলা বাস করেন—যদি আমি যাই, তাহা হইলে হয়ত আমার প্রতি তিনি একটু দয়া প্রকাশ করিবেন—আমার একটা উপায় করিয়া দিবেন । তা তিনি ত এখানে নাই ।”

মেয়েটির কৰুণ, কাতর কণ্ঠস্বরে, ততোধিক তাহার সরল চোখের আন্তর্দৃষ্টিতে আমি বড় বাধিত হইলাম । বলিলাম—“তোমার চাচা তোমার প্রতি কর্কশ ব্যবহার করেন ?”

প্রথম কয়েক মুহূর্ত্ত বালিকা কথা কহিতে পারিল না । ছিন্ন মলিন ওড়নার প্রান্ত দিয়া চক্ষু মুছিয়া শেষে বলিল—“হাঁ, তিনি আমাকে এখনও ছেলেমানুষটি মনে করেন । কিন্তু আমি ত তাহা নই । অুমল্ল কি কষ্টে যে জীবন কাটাইতেছি, তাহা আমরাই জানি ।”

আমি বলিলাম—“আমি তোমার চাচাকে ডাকিয়া পাঠাইতেছি । খানটায় সে পড়িয়া আছে বলত ।”

মেয়েটি শঙ্কিত হইয়া বলিল—“আবার চাচাকে ডাকিয়া পাঠাইবেন ? তাঁহাকে সব বলিবেন ?—সর্বনাশ ! তাহা হইলে তিনি কি আর আমার রাখিবেন ? কোর্সানী করিয়া ফেলিবেন । আপনি বোধ হয় মনে করিয়াছেন আমি বাড়াইয়া বলিতেছি ?—তা ত ঠিকই—আপনি আমার বিশ্বাস করিবেন কেন ?”—বলিয়া মেয়েটি চোখে অঞ্চল দিল ।

আমি দেখিলাম মহা বিপদ । বলিলাম—

“তবে আমি কি করিব তাহাই আমার বল না কেন ?”

সে কঁদ কঁদ হইয়া বলিল—“আপনাকে কিছু করিতে হইবে না—আমি পূর্বেই বলিয়াছিলাম আপনি কিছু করিতে পারিবেন না ।” —বলিয়া সে উঠিয়া পাড়াইল ।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—“বৃদ্ধ নবাব সাহেব হইলে আমাকে তুমি তোমার জ্ঞাত কি করিতে বলিতে ?”

“সবই ।”

“আমি তাহা কি করিতে পারি ন’ ।”

“সবই ।”

ভাবিলাম, আশ্চর্য্য লোক ত ! কখন কি বলে কিছুই হিরত নাই । আসলে উহার মাথার ঠিক নাই । একটু চিন্তা করিয়া শেষে বলিলাম—“তোমার মনে কি হইতেছে আমি বুঝিতে পারিতেছি ।* আমি যদি তোমাকে সাহায্য করি—তাহা হইলে লোকে জানিতে পারিলে তুমি লাঞ্চিত হইবে । তা—কাহারও জানিবার প্রয়োজন কি ?”

মেয়েটি বলিল—“আমি যদি এখানে থাকি—সে কথা কাহারও জানিবার প্রয়োজন নাই ?”

আশ্চর্য্য হইয়া আমি বলিলাম—“তুমি যদি এখানে থাক !”—বলিয়া আমি তাহার মুখের পানে চাহিয়া তাহার মনের ভাব পাঠ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম ।

মেয়েটি বলিল—“এখানে না থাকিলে আপনি আমাকে কি করিয়া তাহার হাত হইতে রক্ষা করিবেন ? আপনারা বড়লোক, আপনাদের শক্তি বল আছে—তিনি আপনাদের অনিষ্ট করিতে সাহস করিবেন না । কিন্তু অস্ত্র লোকের কাছে আমার যদি পাঠা—” বলিয়া মেয়েটি থামিল ।

আমি একক্ষণ বিশেষ অভিনিবেশ সহকারে তাহার মুখের পানে চাহিয়াছিলাম । সে চক্ষুযুগলে সরলতা ও পবিত্রতা ছাড়া আর কিছু দেখিলাম না । আমি যে অস্ত্রস্ব সন্দেহ করিয়াছিলাম, সেজন্য মনে মনে লজ্জাহত হইয়াছিলাম ।

কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলাম—আবার বলিল—“আমি তাহা হইলে এত লোক থাকিতে এখানে আসিলাম কেন ? যে কোনও লোক ত আমাকে সাহায্য করিতে পারিত । কিন্তু যদি চাচা তাহাদের কাছে গিয়া আমাকে দাবী করিতেন—তাহা হইলে চাচার বিরুদ্ধে কেহ কি কথা কহিতে পারিত ?—আপনারা শক্তিশালী—তাই আমি আপনাদের কাছে আসিয়াছি ।”

কি উত্তর দেয় দেখা যাউক ভাবিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—“তোমার কি মর্মে হয় আমি তোমাকে এ বাড়ীতে থাকিতে দিব ?”

“আমি জ্ঞান আপনি দিতে পারিবেন না । আমি ত আগেই

কমা-প্রার্থীর মত আমি বলিলাম—“হা—আগেই বলিয়াছিলে বটে । তুমি গোড়া থেকেই এই কথা বলিতেছ । বৃদ্ধ নবাব সাহেবের সঙ্গে আমার এই বানীই প্রভেদ, না ?”—বলিয়া মূহু হাত করিলাম ।

মেয়েটির চক্ষু দিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছিল । জিজ্ঞাসা করিলাম—“তোমাকে কিছু টাকা দিব ?”

বিরক্তি সহিত সে তীব্রস্বরে বলিল—“কেন ? চাচার সরারের খরচ যোগাইবার জন্য ?”

বুলিলাম এ বার্ষিকার অবস্থা নিতান্তই সঙ্কটাপন্ন । ইহার কি উপায় করা যায় ? যদি ইহাকে এ অবস্থার বিদায় করি, তাহা হইলে—ইহার ভবিষ্যৎ দারুণ অন্ধকারময় । আহা, এমন ফুলটি পথকর্দমে লুটাইয়া কলঙ্কিত ও পদদলিত হইবে ? ভাবিতে আমার বড় কষ্ট হইতে লাগিল । অবশেষে বলিলাম—“আমার অনেক বন্ধুবান্ধব আছেন—তাহাদের কাহারও গৃহে—”

বালিকাটি ঘাড় নাড়িতে লাগিল । এমন সময়ে অর্ধ-মুহূর্ত—অর্ধ পশুৎৎ আকারের এক ব্যক্তি হঠাৎ দ্বার ঠেলিয়া খলিতপদে আসিয়া প্রবেশ করিল ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

আগন্তকের আকার দীর্ঘ, মস্তকের রুদ্ধ, কেশগুলা সম্মার কাঁটার মত দণ্ডায়মান, দাড়িতে কাদা লাগিয়া রহিয়াছে,—অঙ্গ স্থানে স্থানে তালি দেওয়া এক ওভারকোট, হস্তে যষ্টি । টলিতে টলিতে আসিয়া বালিকাটির হাত ধরিয়া সে টানিতে লাগিল । বালিকা ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল ।

লোকটা, তাহার রুদ্ধ মুখখানা, মেয়েটির মুখের কাছে লইয়া গিয়া বলিল—“কি হারামজাদী ? পলায়ন করিয়াছিলি ? আচ্ছা—আচ্ছা—এর শোধ লইব ।” বলিয়া আমার দিকে ফিরিয়া, আমায় সেলাম করিয়া বলিল—“মাফ করিবেন হুজুর ! এই মেয়েটা নিশ্চয়ই আপনার কাছে একটা অলীক উপভাস স্বীকৃত করিয়া দিয়াছিল—আমীর কোনও সন্দেহ নাই । ওর রোগই ঐ । মনে করিবেন না যে, লোককে ঠকান এই উহার প্রথম । ভারী মিথ্যাবাদী—ভারী মিথ্যাবাদী !—আমার নামে অনেক বদনাম আপনার কাছে করিয়াছে বোধ

হয় ?”—তাহার পর বালিকাটির দিকে তাকাইয়া কঠোর স্বরে বলিল—“যে চাচা তোকে বালাকাল হইতে মানুষ করিয়াছে—তাহার নিকট হইতে পলাইতে-
ছিন্ ? আমি না থাকিলে তোর হৃদয়া কি হইত বুল দেখি ? কোণার তোর
দাঁড়াইবার স্থান নিলিত ?”

মেয়েটি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—“যেখানে এতদিন রাখিয়াছ সেখানেই
থাকিতাম—পথে পথে—লোকের হস্তারে হস্তারে ।”

লোকটা মুখ বিকৃত করিয়া বলিল—“গুরুজনের মুখের ওপর খুব কথা
কহিতে শিখিয়াছিন্ ! যা, এই ভদ্রলোকটির কাছে যাক্ চা ।”—আমার দিকে
ফিরিয়া সে বলিল—“হুজুর, ও ছেলেমানুষ, ওকে নাক্ করন ! আপনাকে
নিশ্চয়ই বিরক্ত করিয়াছে । আমার নিজের কোনও লোবের জন্ত আমি এ
অবস্থায় পড়ি নাই—আর আমার এই অবস্থা বলিয়াই ও পলাইতে চায় । কিন্তু
আমার মৃত্যুর এক মিনিট পূর্বে পর্যন্ত উহাকে কোণাও নড়িতে দিতেছি না ।
শিশুকাল হইতে উহাকে বড় করিয়া তুলিয়াছি—নিজে না থাইয়া উহাকে খাওয়া-
ইয়াছি—এই তার পুরস্কার ? উঃ—ছনিয়া কি বেইমান !”

লোকটা আভাবিক অবস্থায় ছিল না । তারার বড় বড় মোটা মোটা অঙ্গুলি-
গুলি বালিকাটির বাহু দৃঢ়ভাবে চাপিয়া ধরিতেছিল । মেয়েটি আমার দিকে
চাহিয়া ভয়ে ভয়ে বলিল—“মহাশয়, আমাকে নাক্ করন ।”

লোকটা মেয়েটিকে জোর করিয়া নিজের সম্মুখে টানিয়া আনিল—সে পড়িতে
পড়িতে সামলাইয়া গেল ; জড়িত স্বরে বলিল “হী, ভাল করিয়া নাক্ চা ।”

মেয়েটি কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল—“মহাশয়, তবে আমি এখন ঘাই । আপ-
নাকে বিরক্ত করিয়াছি, কিছু মনে করিবেন না । চাচা, চল ।”

আমি দাঁড়াইয়া উঠিলাম । কিছু না ভাবিয়াই বলিয়া ফেলিলাম—“তোমার
ব্রাতুষ্প্রী আমার এখানে থাকিবে ।”

লোকটা কঠোর স্বরে বলিল—“কি ?—কি বলিতেছেন ?”

আমি বলিলাম—“স্ববতী জীলোককে সঙ্গে লইয়া রাত্তার রাত্তার বেড়াইবার
মত অবস্থা তোমার এখন নয় ।”

“কি ?”

আমি পরিষ্কার করিয়া বলিয়া দিলাম—“তুমি এখন মাতাল ।”

লোকটা গর্জন করিয়া বলিল—“তুমি কে ?”

আমি উত্তর করিলাম—“আমি দিল্লীর সৈয়দ আহমদ আলি খাঁ—নবাব

ইমদাদ আলি খাঁ বাহাধুরের ভ্রাতৃপুত্র—আমার সঙ্গে চালাকী চলিবে না ।”

“আ—আপনি—নবাব সাহেবের ভ্রাতৃ—ভ্রাতৃপুত্র ?”

“হাঁ,—শোন । তোমার ভ্রাতৃপুত্রী আজ রাতে এখানে থাকিবে—আমার বৃদ্ধা দাত্তীর নিকট তাহাকে রাখিয়া দিব । কাল সকালে তাহাকে কোনও একটা ক্রীড়া দিব ।”

“আমাকে এ কথা বলিতেছেন ?”

“হাঁ, তোমাকেই বলিতেছি—আর যদি ভাল চাও, তাহা হইলে আমার কথা শুন । তোমার ভ্রাতৃপুত্রী নিজে ইচ্ছা করিয়া তোমার নিকট না গেলে, তাহাকে পাঠাইব না । অস্ত্র হইতে উহাকে নিজের ভগ্নীর মত যত্ন করিব ।”

লোকটা বলিকণর হাত ছাড়িয়া দিয়া, একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িল । বলিল—“উহাকে একটা কাণ দিবে বলিতেছেন ? কি কাণ ?—চাকরাণীর কাণ ত ?—আপনি উহাকে ভগ্নীর মত দেখিবেন বলিতেছেন—আপনার ভগ্নী থাকিলে তিনি কি চাকরাণীর কাণ করিতেন ? মহাশয়, আমার সঙ্গে মিথ্যা চালাকী করিবেন না । মনে করিয়াছেন আমার অবস্থা মন্দ বলিয়া আমার সহিত যাহা ইচ্ছা সেইরূপ ব্যবহার করিবেন । হুল—ঐটি আপনার ভুল ।”—সঙ্গে সঙ্গে তাহার বহুমুষ্টি সশব্দে টেবিলের উপর আসিয়া পড়িল ।

আমি হাসিয়া বলিলাম “আমার সঙ্গেও চালাকী খাটিবে না । আমার বলিতেছি তোমার ভ্রাতৃপুত্রী আজ এ বাড়ীতে থাকিবে ।”

“যদি বলি, আমি উহাকে ছাড়িব না ?”

“বাহা খুসী বলিতে পার । তোমার নাম কি ?”

“তসদ্দুক হোসেন—আমার নাম তসদ্দুক হোসেন । দিল্লীতে আমার গরীবানা । আমি সোজা লোক নহি । দেখি আমার ডাইনিকে আমার নিকট হইতে কে লয় ? দেখি ত একবার !”

আমি বলিলাম—“দেখ তোমাকে আবার বলিতেছি, গুব্বী খ্রীলোক তোমার সহিত ভ্রমণ করিয়া বেড়াইবার উপযুক্ত নহে ।”

তসদ্দুক চক্ষু বুজিয়া সেই কৰ্দমাঙ্গ দাড়ীর ভিতর হইতে দুই পাটী দস্ত বাহির করিয়া, হি হি করিয়া হাসিল । শেষে বলিল—“এ কথা আপনি কি করিয়া আনিলেন ?”

“কেন, স্বচক্ষে দেখিতেছি তুমি অপ্রকৃতির, তোমার মুখ হইতে সুরাবের ধ্বংস

বাহির হইতেছে। তোমার জাতপুত্রী এখন আর বালিকা নাই—ও যুবতী হইয়াছে।”

লোকটা বলিল—“আপনার যেমন কথা!” কে বলিল আপনাকে যে ও যুবতী হইয়াছে? কবে আবার যুবতী হইল?”

আমি গম্ভীরভাবে বলিলাম—“ও বয়সের মেয়েকে লোকে যুবতী বলিয়াই গণ্য করিয়া পাকে।”

লোকটা তখন বালিকার দিকে ফিরিয়া বলিল—“তোমার বয়স কত?”

“পনের।”

লোকটা আশ্চর্য হইয়া বলিল—“প—নে—র?”

আমি বলিলাম—“তবেই তুমি বুকিতে পারিতেছ ও সেয়ানী হইয়াছে—সঙ্গে লইয়া পথে পথে বেড়াইবার অবস্থা উহার আর নাই! এখন তবে আমার দ্বাতীক ডাকি, সে আসিয়া ইহাকে অন্তরে লইয়া যাউক—তাহার পর আমরা দুইজনে বসিয়া এ বিষয়ে কথাবার্তা করিব।”

তসম্মুখ আমার ধুমায়িত আলবোলায় প্রতি সূকনেজ্রে চাহিয়া একটু হাস্ত করিল। আমি দ্বাতীকে ডাকিলাম—সে আসিয়া মেয়েটাকে বাড়ীর ভিতর লইয়া গেল। যাইবার সময় মেয়েটি ত্বাহার চাচার দিকে একবার চাহিয়া চলিয়া গেল।

লোকটা তখন পকেট হইতে একখানি ছোঁড়া রুমাল বাহির করিয়া চক্ষু মুছিতে লাগিল। বলিল—“দেখুন, মেয়েটাকে ছাড়িয়া থাকিতে আমার বড় কষ্ট হইবে। আমি নিতান্ত ছুঁড়াগা—অদৃষ্ট আমার নিতান্ত মন্দ। মেয়েটাকে আমি আপনার সন্তানের মত ভাল বাসিতাম।”

আমি গম্ভীর ভাবে বলিলাম—“তোমার কথা বিশ্বাস করা শক্ত।”

লোকটা একমিনিটকাল কোনও কথা কহিল না, উদ্ধৃষ্টি হইয়া চাহিয়া রহিল। শেষে একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—“ইয়া আল্লা!”

আমি বলিলাম—“তুমি যে কথা বলিতেছ, তাহা যদি সত্য হয়—বাস্তবিকই উহাকে যদি তুমি নিজ সন্তানের তুল্য ভাল বাস—তাহা হইলে বরং আল্লাকে ধন্যবাদ দাও যে, তোমার স্থগিত সংস্পর্শ হইতে ও মুক্তিলাভ করিল।”

তসম্মুখ বলিল—“উহার সঙ্গে আমাকে আর দেখা করিতে দিবেন না?”

“নিশ্চয় না, ও তোমাকে দেখিলে ভয় পায়।”

অল্পদিকে চাহিয়া তসদ্দুক কয়েকবার ঘাড়টি নড়িল । তাহার পর দস্তদ্বারা ওঠ দর্শন করিতে লাগিল ! হঠাৎ আমার দিকে ফিরিয়া বলিল—

“আপনি কি আমার ভাইঝিকে জোর করিয়া আপনার কাছে রাখিবেন ? মনে করিয়াছেন এটা মগের মুলুক ? জানেন, আমি আদালতে নাগিশ করিয়া আমার ভাইঝিকে আপনার কাছে হইতে উদ্ধার করিতে পারি ?”

“আমি বলিলাম—“বেশ ত ! তাহাই করিয়া দেখ না ! তুমি ত’ একমুষ্টি অর্ঘের জন্য লোকের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াও ; মোকদ্দমার খরচ চালাইবে কি প্রকারে ? আর সাক্ষীই বা পাইবে কোথা ? আমি লক্ষ টাকা খরচ করিব । তুমি আমার সুহিত লড়িবে এমন হিম্মৎ তোমার আছে ?”

তসদ্দুক কিয়ৎক্ষণ ভাবিল ।—শেষে বলিল “সত্য । আমি কি করিয়া আপনার সহিত মোকদ্দম লড়িব ? কিন্তু দেখুন—আমার ভাইঝির সহিত আমাকে দেখা করিতে না দেওয়াটা আপনার অজ্ঞায় ।”

আমি বলিলাম—“কিছুই অন্যায্য নহে ।”

“হাজার হউক আমি তাহার চাচা ত’ বটে ! আমি কি উহাকে চাকরাণী হইতে দিতে পারি ? আমার ভাইঝির সম্বন্ধে আমারও ত’ কিছু বলিবার অধিকার আছে ! ওর বাপ শরীফ আদমি ছিলেন ।”

আমি কহিলাম—“সে কথা বরং বিশ্বাস করিতে পারি ।”

তসদ্দুক কিয়ৎক্ষণ নীরবে চিন্তা করিয়া বলিল—“বেশ—আপনি যদি আমাকে তাহার পিতৃব্যের দায়িত্ব হইতে মুক্ত করেন, তাহা হইলে সে দায়িত্ব আপনাকেই লইতে হইবে । আপনার নিজের ভদ্রীর মত তাহাকে প্রতিপালন করিতে হইবে ।”

“তোমার ভ্রাতৃপুত্রীকে ভ্রাতৃলোকের কন্যার মতই প্রতিপালন করিব ।”

“নিজের ভদ্রীর মত ?”

“হাঁ, নিজের ভদ্রীরই মত । উহাকে এখন লেখাপড়া শিখাইব,—যথাসময়ে কোন পরিবারের সচ্চরিত্র ও বিদ্বান যুবকের সহিত উহার বিবাহ দিব ।”

তসদ্দুক খুসী হইয়া হাতদুটি ঘসিতে ঘসিতে বলিল,—“বেশ, কিন্তু একটা কথা আমার ভাল লাগিতেছে না । আমার ভাইঝি—যে এত বড়লোকের ভদ্রী-স্থানীয়া, তাহার চাচা কিনা রাস্তায় রাস্তায় মাতলামি করিয়া বেড়ায়, যাহা পায় তাহাই খাইয়া লোকের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়ায়—এটা কেমন দেখায় ?”

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—“তোমার মূল্যবটা যে না বুঝিয়াছিলুম এমন নয় ।”

লোকটা ছই হাত নাড়িয়া বলিল—“টাকা—টাকা—কিছু টাকা চাই। আপনাত ও আপনাত ভদ্রীর সুনাম বজায় রাখিবার জন্য কিছু টাকা চাই। বেশী নয়, এই পাচশত টাকা পাইলেই আমি তাইতির উপর নিজের দাবী দাওয়া ছাড়িয়া চলিয়া যাইব ?”

আমি হাসিয়া বলিলাম—“টাকাটা ফুরাইয়া গেলে আবার আসিবে ত ?”

“আমার কসম, না।—আমি দিব্য করিয়া বলিতেছি—আমি আর আসিব না।”

“তোমার কথায় বিশ্বাস কি ?”

তসদ্দুক ধীরস্থরে বলিল—“কথা ছাড়া আমার দিবার আর কি আছে ? আমি বলিতেছি—পবিত্র কোরাণের দ্বিধা করিয়া বলিতেছি—পাঁচশত টাকা পাইলে ওলিয়তির দাবী করিয়া বা অন্য কোনও দাবীতে কোনও প্রকার নালিশ করিব না।”

আমি ভাবিলাম—ইহা একটা আশঙ্ক্যের কথা বটে। লোকটা বেরূপ প্রকৃতির—টাকা না পাইলে ওরূপ একটা হাদ্যমা বাধাইয়া দিতে পারে। বালিকার যতদিন অষ্টাদশবর্ষ বয়স্ক না হইতেছে, ততদিন আইন অমুসারে ওই তাহার ওলি বা অভিভাবক। ভাবিয়া চিন্তিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—“মেয়েটির নাম কি ?”

“ওর নাম বরকৎ-উল্লিহা—কিন্তু সে নাম ব্যবহার নাই। উহাকে মনু-বুলবুল বলিয়াই সবাই জানে।”

“ও কিছু লেখাপড়া শিখিয়াছে ?”

“দিল্লীতে থাকিতে ছই তিনখানা উর্দু বহি পড়িয়াছিল। করিমা-ববজ্ঞাও এরিয়াছিল। চিঠিপত্র লিখিত্ত পারে।”

“তুমি ছাড়া উহার আর কে আছে ?”

“আর কেহই নাই।”

একটু চিন্তা করিয়া বলিলাম—“আচ্ছা—আমি ৫০০ দিব। তুমি এই দশের একটা একরারনামা লিখিয়া দাও যে ৫০০ পাইয়া আজ হইতে তোমার ত্রাতৃপুত্রীর ওলিয়তির দাবী ত্যাগ করিলে। লিখিয়া দিবে কি ?”

তসদ্দুক সম্মত হইল।

বলিলাম—“আচ্ছা, তবে এইখানে বস। আমি টাকা আনিতেছি।” বলিয়া উঠিয়া দাড়াইলাম।

সেও সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া দাঁড়াইল । হস্তে হস্ত বর্ষণ করিয়া বলিল—“হজুর—যদি মেহেরবাণি হয়—” বলিয়া লোলুপ দৃষ্টিতে আমার আলবোলায় পানে তাকাইয়া একটু হাসিল ।

তাহার অভিপ্রায় বুঝিয়া বলিলাম—“তামাক খাইবে?—তা বেশ ত—খাওনা ।”—বলিয়া আমি ভিতরে প্রবেশ করিলাম ।

লোহার দিম্বুক খুলিয়া পাঁচখানি একশত টাকার নোট বাহির করিয়া আনিলাম । বেহারাকে বলিলাম কাগজ ও কলমদান আনিতে । ড্রিংক্সে ফিরিয়া দেখি লোকটা আরামে চক্ষু বুজিয়া ধূমপান করিতেছে । আমাকে দেখিয়া বলিল—“হজুর, এ অতি উৎকৃষ্ট তামাকু—একবারে লা—জাওরাব । বহুকাল এমন তামাক অদৃষ্টে ছুটে নাই ।”

আমি বলিলাম—“ইহা লন্ডনের তামাক ।”

তুতা কাগজ প্রতৃতি লইয়া আসিল । আমার আদেশ অমুযায়ী একরারনামা লিখিয়া, নোট পাঁচখানি পরীক্ষা করিয়া তসদুক বলিল—“হজুর, এ সব নম্বর-ওয়ারী নোট—যদি আমার চোর বলিয়া ধরে ?”

আমি বলিলাম—“প্রত্যেক নোটের পশ্চাতে আমার নাম দস্তখত করা আছে, দেখিয়া লও ।”

তসদুক বলিল—“আজ্ঞে হাঁ—তা ত আছে । তবু কি জানি, ডাঙ্গাইবার সময়ে যদি আমার সন্দেহ করে ? আপনি বরং দয়া করিয়া একটা রসীদের মত লিখিয়া দিন ।”

দেখিলাম লোকটা মাতাল হইলেও, চালাকু . কম নহে । একটা কাগজে নোটের নম্বরগুলি সহ জুইছজ লিখিয়া তাহাকে দিলাম । সেগুলি পকেটে পুরিয়া, অন্য পকেট হইতে তসদুক একটা বোতল বাহির করিল । “গোস্তাফি মাফ করিবেন”—বলিয়া, ছিপি খুলিয়া খানিকটা মদ্য হড়্ হড়্ করিয়া মুখে ঢালিয়া দিল । বোতল বন্ধ করিয়া, পকেটে রাখিয়া, সেই ছেঁড়া ক্রমালখানি দিয়া মুখ মুছিতে মুছিতে বলিল—“যদি এম্বাজ হয় তবে এখন উঠি । অনেক রাত হইল ।” বান্দার অপরাধ লইবেন না । সেলাম হজুর !” বলিয়া, ওভার-কোটের বোতাম আঁটিতে আঁটিতে খলিতপদে সে বাহির হইয়া গেল ।

আমি তখন বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম—এক যুবতীকে আশ্রয়দান করিলাম—কথাটা কিরূপ হইল জানি না । যদিও খাজী এখানে রহিয়াছে, তথাপি সে দাসীমাজ—আমার আত্মীয় বা অভিভাবক নহে । আমারও এমন

কিছু বয়স হয় নাই—সবে ত্রিশ বৎসর। এ অবস্থায় অমন হুমকী যুবতী মেয়েটিকে বরে রাখিলে লোকাপবাদ অবশ্যস্রাবী। কোথায় মেয়েটিকে রাখি ? কাহার সঙ্গেই বা পরামর্শ করি ? ভাবিতে ভাবিতে তখন আমার খালী সাহেবার (পিসীমাতার) কথা মনে পড়িল। কাগজ কলম লইয়া তাঁহাকে একখানি পত্র লিখিলাম। অহরোধ করিলাম, কল্যাণে যেন একবার দয়া করিয়া এখানে তত্রিক লইয়া আসেন। হাওয়াখাড়ীর শোফারকে ডাকিয়া পত্রখানি তাহার জিন্মা করিয়া হুকুম দিলাম—কল্যাণে যেন ইটালীতে কার লইয়া যায় এবং খালি সাহেবকে লইয়া আসে।

শয়ন করিতে গিয়া ধাত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলাম—“মন-বুলবুলকে কিছু খাইতে দিয়াছ ?”

“দিয়াছি। খালি একটু গরম দুধ খাইয়াছে। আর কিছু প্লাইল না।”

“সে কি বুঝাইয়াছে ?”

“না, এখনও জাগিয়া আছে।”

“তবে তাহাকে গিয়া বল, তাহার চাচাকে আমি নগদ ৫০০ দিয়া বিদায় করিয়াছি। আর আসিবে না। মন-বুলবুল যেন নিশ্চিন্ত থাকে।”

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

শয্যা শয়ন করিলাম বটে কিন্তু নিদ্রা আসিল না। বালিকার সেই অশ্রু-সিক্ত সরলতামাখা স্বপ্নের মুখখানি কেবলই মনে পড়িতে লাগিল। উহাকে লইয়া কি করি ?

ভোরের দিকে নিদ্রিত হইয়া পড়িলাম।

নিদ্রাভঙ্গে দেখিলাম, প্রভাতের আলো আসিতেছে। একজন দাসী শয্যা-পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বলিতেছে—“হুজুর, শীঘ্র উঠুন। কাল রাতে যিনি আসিয়াছেন, তাঁহার শয়নকক্ষ ভিতর হইতে বন্ধ—অনেক ডাকাডাকিতে তিনি ঘর খুলিতেছেন না।”

আমি ভাবিলাম—“কি সর্বনাশ !” আশ্চর্য্য করিল না কি ?”

চট করিয়া আমার ঘুমের ঘোর কাটিয়া গেল। উঠিয়া পড়িয়া, যে ঘরে সে শয়ন করিয়াছিল—তাহার দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া নাম, ধরিয়া একবার—দুই-বার—তিনবার ডাকিলাম—কোনও সাড়া পাইলাম না। দ্বারে ধাক্কা দিলাম—কোনও উত্তর নাই। শেষে বলিলাম—দ্বার ভাঙ্গিয়া ফেল। পাঁচমিনিটের

মধ্যে আমার আদেশ প্রতিপালিত হইল ! ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম—
কেহই নাই, ঘর খালি।

আমরা সকলে স্তম্ভিত হইয়া পড়িয়া আছি এমন সময়ে বাহিরের জানালায়
নীচে চীৎকার শব্দ শুনিতে পাইলাম। জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখি—
নিম্নে একজন মালী কুঁকিয়া কি দেখিতেছে ! আমাকে দেখিবারাত্র সে
বলিল—“হুজুর ! এখানে একটি মেয়ে পড়িয়া আছে—বোধ হয় মরিয়া গিয়াছে।”

আমরা তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া গেলাম। মেয়েটি আর কেহ নয়—
মন-বুলবুল মাটিতে উপুড় হইয়া পড়িয়া আছে। বুকে হাত দিয়া দেখিলাম—
ধুক্‌ধুক্‌ করিতেছে—খোদা রক্ষা করিয়াছেন—বালিকা সংজ্ঞাহীন হইয়াছে
মাত্র।

একটা চাকরকে বলিলাম—“হাওয়াগাড়ী খালীসাহেবাকে আনিতে
গিয়াছে—তুই টমটন্থানা লইয়া গিয়া শীঘ্র ডাক্তার সাহেবকে ডাকিয়া আন।”

ডাক্তার ডাকিতে আদেশ দিয়া বালিকাকে উঠাইয়া বাড়ীর ভিতর আনিলাম।
সে যে কক্ষে শয়ন করিয়াছিল—একেবারে সেইখানে তাহাকে লইয়া গেলাম।
নিজের বিদ্যামত মুছ্‌ভাঙ্গের জন্য শ্বেলিং সন্টসের শিটি তাহার নাসিকার
কাছে ধরিলাম।

ডাক্তার সাহেব আসিয়া বলিলেন—ভয়ের কারণ কিছুই নাই—পায়ের
কাজী মঠকাইয়া গিয়াছে মাত্র—অস্থি ভাঙ্গে নাই। ঔষধাদি দ্বারা তিনি শীঘ্রই
বালিকার চেতনা সম্পাদন করিলেন। যাইবার সময় ডাক্তার আমাকে বলিয়া
গেলেন যে রোগিনীকে তিনি একটা ঘুমের ঔষধ দিয়াছেন।

খালীসাহেব আসিয়া পৌঁছিলেন। কার হইতে নামিবারাত্র সমস্তই তাহাকে
বলিলাম। শুনিয়া তাহার যেন মনঃপুত হইল না।—তিনি খড় নাড়িয়া
বলিলেন—“তুমি—উহার বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ—তোমার এই অজ্ঞ বয়স—দুনিয়ার
হাল তুমি কিছুই জান না। তুমি না তাবিয়া চিন্তিয়া উহাকে আশ্রয় দিলে
কেন ? তোমার অগাধ সম্পত্তি ; ও যদি ধরাপ মৎলবে আসিয়া থাকে ?”

আমি বলিলাম—“না না—মোট পনের বৎসরের বালিকা। জগতের ও
কি জানে ? আপনি উপরে গিয়া তাহাকে দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন।”

খালীসাহেব চলিয়া গেলেন।

ঘণ্টাখানেক পরে তিনি উপর হইতে নামিয়া আসিলেন। দেখিলাম তাহার
মুখ গম্ভীর। বলিলেন—“আহমদ, ও মেয়েটা কলীবাঙ্গ।”

আমি বলিলাম—“খালীসাহেবা! আপনি কি বলিতেছেন? উহার পা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে—ডাক্তার বলিয়াছে—একথা অবিশ্বাস করেন না?”

তিনি বলিলেন—“না আমি সে কথা বলিতেছি না। মেয়েটা ঘুমের ঘোরে অনেক কথা বলিয়াছে—সে বলিতেছিল—‘চাচা, আমি যাব না—না না আমি যাব না—কি বলছ—তিন দিন পরে ধর্মভাঙ্গার মসজিদের কাছে? হঁ! হঁ! মনে পড়েছে—’ এই বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল।”

আমি বলিলাম—“নিশ্চয়ই ওর চাচা আসিয়া উহাকে মারিয়া গিয়াছে?”

পিলীমাকে বলিলেন—“দেখ আহম্মদ, নিশ্চয়ই একটা বড় ব্যয় হইয়াছে! ওর চাচা তোমার নিকট উহাকে রাখিয়া টাকা লইবে, আর ও তিন দিন পরে পলাইয়া ধর্মভাঙ্গার মসজিদের কাছে গিয়া চাচার সহিত জুটিবে, নিশ্চয় এইরূপ বড় ব্যয় হইয়াছে। দেখিতেছ না?”

“না না আপনি কি বলিতেছেন?—বড় ব্যয়? অসম্ভব।”

পিলীমাকে কিছুতেই বিশ্বাস করাইতে পারিলাম না।

তিনি বলিলেন—“দেখ, তুমি উহার জুয়াচুরী ধরিয়া ফেলিবে বলিয়া উহার ভয় হইয়াছিল—নহিলে দুয়ার বন্ধ করিয়া জানালা দিয়া পলাইবার চেষ্টা কেন?”

“কি করিয়া জানিলেন—ও পলাইবার চেষ্টা করিতেছিল?”

“তা না হইলে ঠিক জানালার নীচ পড়িয়া থাকিবে কেন? ওর চাচা মাতাল হইয়া আসিয়াছিল বলিতেছ—ও ত আর মাতাল হয় নাই?”

“সেখুন খালীসাহেবা! আপনি উহার নামে মিথ্যা দোষ দিতেছেন। আমার ত মনে হয় না যে, স্বপ্নেও ও বড় ব্যয়ের কথা মনে স্থান দিতে পারে!”

খালীসাহেবা বলিলেন—“তবে মেয়েটা জানালা দিয়া পড়িল কি করিয়া, সেইটে আমার বুঝাইয়া দাও না।”

আমার স্বীকার করিতে হইল যে উহার কারণ নির্ণয়ে আমি অসমর্থ। তিনি বলিতে লাগিলেন—“ছেলেমানুষ তুমি—কলিকাতার জুয়াচোর চেন না—এক জুয়াচোর আসিয়া তোমার নিকট হইতে পাঁচশত টাকা ঠকাইয়া লইয়া গিয়াছে। সে আসিবে না বলিয়াছে—ঠিকই বলিয়াছে—সে আর কেন আসিবে? যাহার নিকট হইতে ঠকাইয়া লইয়া গিয়াছে, তাহার মত বোকা সে নয়।”—বলিয়া খালীসাহেবা উপরে চলিয়া গেলেন।

আমি বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম—এমন সূক্ষ্মরূপ বিধাতা যাহাকে দিয়াছেন, তাহার সূক্ষ্মে এত কুটিলতা দিয়াছেন—তাহাও কি সম্ভব? লোকে বলে

চাঁদে কলক আছে—কিন্তু এ চাঁদ দেখিলে কি মনে হয় যে তাহাতে কলক থাকি সম্ভব ?

এইরূপ ভাবিতেছি এমন সময়ে খালীসাহেবা একখানি পত্র হাতে করিয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন । আমার সম্মুখে টেবিলের উপর পত্রখানা ছুড়িয়া ফেলিয়া বলিলেন—“দাত্তী এই পত্রখানা মেয়েটার বিছানায় কুড়াইয়া পাইয়াছে । উপরে তোমার ঠিকানা রহিয়াছে—পলাইবার চেষ্টা করিবার পূর্বে তোমাকে লিখিয়াছে—সন্দেহ নাই ।”

চিঠিখানা খুলিয়া দেখি, তাহার মধ্যে পাঁচখানা একশত টাকার নোট ও একখানি পত্র । দেখিয়া বুঝিলাম এই নোট কথানাই আমি তদনুকূলে দিয়াছিলাম । পত্রখানাতে উদ্ধৃতে এইরূপ লেখা ছিল :—

“আমরা আপনাকে ঠকাইয়াছি । চাচা আপনার নিকট হইতে টাকা লইবেন ও আমি এখানে তিন দিন থাকিয়া পলারন করিব এবং ধর্মতলায় মসজিদে চাচার নিকট গিয়া পৌছিব—এইরূপ বন্দোবস্ত ছিল । চাচা আমাকে ভয় দেখাইয়া এই কার্য্যে প্রবৃত্ত করাইয়াছিলেন । আমি আপনার সঙ্গে যেরূপ ব্যবহার করিয়াছি—তাহাতে আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেও লজ্জাবোধ করি । আজ আপনার দয়া দেখিয়া—আমার প্রতি আপনার ব্যবহার দেখিয়া—আর একটা কথা বলিব কি ?—আর বা দোষ কি ? আপনার সহিত এ জন্মে আর ত দেখা হইবে না—আপনার দেবোপম সৃষ্টি দেখিয়া আমার নিজের প্রতি দিকার জন্মিয়াছে । জানালায় ধারে যে গাছটা আছে, সেই গাছ দিয়া নাচে নামিয়া গিয়া করলার গুদামে পৌছিয়া দেখি, যে চাচা নিশ্চিন্তমনে নিদ্রা যাইতেছেন । তাঁহার পকেট হইতে নোট কয়খানি বাহির করিয়া লইয়া আসিলাম । সেই বৃক্ষের সাহায্যে আবার জানালা দিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া আপনাকে এই পত্র লিখিতেছি । নোট কয়খানিও এই সঙ্গে দিলাম । পত্র শেষ করিয়াই চলিয়া যাইব । কি করিব, কোথায় যাইব কিছুই জানিনা—কিন্তু চাচার নিকট আর ফিরিব না । এবার হইতে সৎপথে চলিবার চেষ্টা করিব ।* আপনার দয়া এ জীবনে ভুলিব না । এ পৃথিবীতে আপনার মত লোক যে আছে, তাহা জানিতাম না । আপনি নিশ্চয়ই আমাকে দ্বন্দ্ব করিবেন—দ্বন্দ্ব ছাড়া আমি আর কিছু পাইবার প্রত্যাশা করি না । আমার সম্বন্ধে আপনাকে যাহা যাহা বলিয়াছিলাম—তাহা সবই সত্য । আমার ইচ্ছা যে এই খানেই থাকিতে পাই, কিন্তু তাহা হইল না । আপনি আমার জন্ত যাহা যাহা করিয়াছেন ও যাহা যাহা করি-

বেন বলিয়াছিলেন—তাহা আমার মনে পাকিবে ও আমি প্রত্যাহ আমার নিকট আপনার মঙ্গল কামনা করিব। আমার কথা ভুলিয়া যাউন। শুধু এইটুকু মনে রাখিবেন যে আপনার টাকা আমি চাচাকে লইতে দিলাম না। চোপের জলে কি লিখিতেছি কিছুই দেখিতে পাইতেছি না—আমার কেবলই মনে হইতেছে—আমি জুয়াচোর, আমি পাপী, আমি বিশ্বাসঘাতক। হতভাগিনী মন্বলবুল।”

দুই বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। যেদিন মন্বলবুল খালীসাহেবের সহিত তাঁহার শাড়ীতে চলিয়া গেল—সেই দিন হইতে আমি তহাকে ভুলিতে পারি নাই। দিল্লীতে ফিরিয়া আসিলাম—কিন্তু বেশীদিন থাকিতে পারিলাম না। আবার বাস বিছানা বাধিয়া কলিকাতা রওনা হইলাম। খালীসাহেবের গৃহে অতিথি হইয়া কিছুদিন যাপন করিলাম। এইরূপ দুই তিন বার কলিকাতা ও দিল্লী করিবার পর—খালীসাহেব একদিন আমাকে নির্জনে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—“ওরে আহমদ—তুই আর কত দিন এরূপ ফকিরী করিয়া বেড়াইবি বাছা?—তোরা আত্মাঙ্গী যদি জীবিত থাকিতেন—তাহা হইলে তুই কি এরূপ করিতে পারিতিস্?—আমাদের সকলেরই ইচ্ছা—তুই আবার বিবাহ করিয়া সংসারী হ।”

আমি তাঁহার মনের ভাব বুঝিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম—“কোনও পাত্রী কি ঠিক করিয়াছেন?”

খালীসাহেব হাসিয়া বলিলেন—“সেটা ঠিক না করিয়াই কি আমি বলিতেছি?”

কতদিনে, যথান্য মন্বলবুলের সহিত আমার বিবাহ হইয়া গেল।

শ্রীঅরুণকুমার মুখোপাধ্যায়।

চা-গ্রন্থ।

ভূমিকা।

জাপানী লেখক ওকাকুরার পুস্তকগুলির সহিত বঙ্গীয় পাঠকবর্গের পরিচয় আছে কিনা জানি না। তিনি স্বীয় মাতৃভাষায় কি রচনা করিয়াছিলেন সে বিষয় আমরা জ্ঞাত নহি; তবে তাঁহার প্রথম ইংরাজী পুস্তক “Ideals of the East-এর” ভূমিকায় আর্থ্যা নিবেদিতা তাঁহাকে পাঠক সমাজে পরিচিত করাইয়া

দিয়াছিলেন । এই প্রাচ্য লেখকের ইংরাজী রচনা-ভঙ্গী বড়ই স্বন্দর । চায়ের অমুঠান তাঁহাদের মধ্যে শুধু একটি দৈনিক জাতীয় অমুঠান নহে, ইহার সহিত তাঁহাদের সমাজ ধর্ম শিল্প সকলেরি সংযোগ আছে । এই সম্বন্ধে তিনি এক-খানি বড় মনোরম ক্ষুদ্র পুস্তিকা রচনা করিয়া গিয়াছেন । তাহাই আমরা ‘মানসীর’ জন্ত অমুবাদ করিয়া দিলাম । ইহাতে মূলের রচনা-কৌশল রক্ষিত হইল কিনা সন্দেহ, তবুও ইহা পাঠ করিয়া বঙ্গীয় হৃদীসমাজ যদি মূল গ্রন্থের সৌন্দর্য্যের কিছুনাঅ আভাস লাভ করেন, তাহা হইলে আমার শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব ।

চা-গ্রন্থ ।

বিশ্বমৈত্রীর পেয়ালা ।

চা অল্পপাণে জন্মগ্রহণ করিয়া পানীয়ে পরিণত হইয়াছে । অষ্টম শতাব্দীতে চীনে স্বতন্ত্র আনন্দ স্বরূপে কাব্য-রাজ্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল, পঞ্চদশ শতাব্দীতে জাপান তাহাকে চান্স কচিধর্ম, চা-ধর্মের মহিমায় উদ্ভীত করিয়াছে । দৈনিক জীবনের তুচ্ছতার মধ্যে বাস করিয়াও সৌন্দর্য্য উপাসনাই চা-ধর্মের সাধনা । ইহার নম্রবলে মানবমনে পবিত্রতা এবং সান্য প্রবেশ লাভ করে, একের প্রতি অপরের সমবেদনার, দয়া ধর্মের রহস্য ব্যক্ত হয়, সমাজ-নিয়ম কাব্যের ন্যায় স্বনন্দুর হইয়া উঠে । ইহা বিশেষ করিয়া অপূর্ণের পূজা, কেন না জীবন স্বরূপ অসম্ভব ব্যাপারে কোন কিছু সম্ভব করিবার জন্যই এই স্বকূনার প্রধাস ।

সাধারণতঃ সৌন্দর্য্য উপাসনা বলিলে যাহা বোঝায়, চায়ের দর্শন কিন্তু শুধু তাই নয় । কেন না ইহা ধর্ম এবং নীতিবিজ্ঞানের সাহায্যে আমাদিগের (অর্থাৎ জাপানীদিগের) মানবপ্রকৃতি এবং বিশ্বপ্রকৃতি সম্বন্ধে ধারণা প্রকাশ করে । ইহা স্বাভা-নীতি, কেন না শুচিতা ইহার অনতিক্রমনীয় বিধান ; ইহা অর্থশাস্ত্র, নিত্যব্যয়িতা ইহার বিশেষত্ব ; জটিল ও মহার্ঘের প্রত্যাহার, এবং সরগতার মধ্যে আরাম সঞ্চয় করাই ইহার বিশেষ উদ্দেশ্য । ইহা নৈতিক জ্যামিতি বলিলেও চলে, কেন না ইহারি মধ্য দিয়া ব্রহ্মাণ্ডের এবং ব্যক্তিগত পরিমাপ বৃত্তিতে পারি । ইহা প্রাচ্য গণতন্ত্রের যথার্থ পরিকল্পনা, কেন না এই উপায়ে, চা-ধর্ম-দীক্ষিত প্রত্যেক ব্যক্তিকে স্বকচির আভিজাত্য প্রদান করা হয় ।

পৃথিবীর আর সকল দেশ হইতে বহু বৎসর ধরিয়া জাপানের এককাবস্থান ধান ধারণার সহায় হইয়া, চা-ধর্মের জনবিকাশের বিশেষ সাহায্য করিয়াছে। আমাদের গৃহ এবং অভ্যাস, আমাদের বেষ্ট্রবিজ্ঞাস এবং রক্ষন-বিলাস, আমাদের শব্দের মত শুভ, ঋতুর মত সুকুমার, চন্দ্রালোকের মত নিরাময় দীপ্তি চীনা-মাটির তৈজস পত্র, কাঠে লাগার বিচিত্র কারুকার্য, চারচিত্র-লিখিত এমন কি আমাদের সাহিত্য পর্যন্ত ইহার প্রভাব গ্রাহ্য করিয়া চলিয়াছে। জাপানী সভ্যতা বৃদ্ধিতে হইলে কিছুতেই ইহাকে উপেক্ষা করা চলিবে না, কেন না ইহা যেমন ধনাঢ্যের সুসজ্জিত অট্টালিকায়, তেমনি দরিদ্রের নিরলস্র কুঠীরেও স্থান লাভ করিয়াছে। আমাদের কৃষকগণ দূল সাধাইতে শিখিয়াছে, আমাদের দীনতম শ্রমজীবীগণ ইহারি প্রসাদে পর্বতের মহিমা এবং নদীধারায় সৌন্দর্যের সমুখে ভক্তির সহরে প্রণতি জানাইয়া থাকে। আমাদের মধ্যে যে লোক মানব-জীবনের হৃৎস্থের লীলায় একেবারেই চঞ্চল হয় না, যে বড় বিজ্ঞ তাহার কথা বলিতে, আমরা বলি, বেচারীর মধ্যে এতটুকুও, চা নাই। আবার যে পাগল সৌন্দর্য-প্রেমিক পার্থিব নাটকের বিরোগান্ত পরিণাম ভুলিয়া, যৌবন-বসন্তে উচ্ছ্বল প্রবৃত্তির উৎসাহে প্রমত্ত হইয়া ফেরে, তাহার মধ্যে চায়ের পরিমাণ কিঞ্চিদধিক বলিয়াই সন্দেহ করিয়া থাকি। বাহিরের লোক যথার্থই মনে করিতে পারে, এ আমাদের একটু বেশী বাড়াবাড়ি, ধান ভানিতে শিবের গীত। ছোট চায়ের পেয়ালায় মাগো, এ কি স্বপ্ন, সেত বলিবেই। কিন্তু যখন ভাবিয়া দেখি, অসহায় মানবের আনন্দ উপভোগের পেয়ালাটি কত ছোট, কত অল্প সময়ের মধ্যে অশ্রুতে ভরিয়া ওঠে, অনন্ত পিপাসায় কাতর আমরা কত সত্তর তাহার সমস্ত মধুরতাটুকু নিঃশেষে পান করিয়া ফেলি, তখন, যদি চায়ের পেয়ালাটিকে একটু অধিক আদর করি তবে এমন কি দোষ হয়? মানুষ তো এর চেয়ে আরো অনেক বেশী অজ্ঞান করিয়াছে। বাকশী সেবার আমরা কতই না বলিদান করিয়াছি, রণনিপুন দেবসেনাপতিকেও মদমত্ত হলধরে পরিণত করিতে ক্রটি করি নাই। তবে ক্যামেলিয়ার রঞ্জিত উদ্দেশে আপনাদিগকে উৎসর্গ করিতে বাধা কি? সেই জন্মের পুষ্পবেদিকা হইতে সহস্রহুতির স্বধোক আনন্দধারা নিরন্তর প্রবাহিত, তাহাতে একেবারে মগ্ন হইয়া যাই না কেন? বিরদ-রদ-চিকন পানপাত্রে উজ্জল কান্দনধারায় দীক্ষিত সোভাগ্যবান, কনকুসিয়ার মৌনমাধুর্য, লোৎসের কশায় স্বাদ এবং শাক্যমুনির স্বর্গীয় সৌরভের স্পর্শ লাভ করিতে পারেন।

যাহারা আপনার মধো বৃহত্তর তুচ্ছতা অগ্রত্ব করে না, তাহারা প্রায়ই অপরের মধো কুঁচুতমের মহত্ব বুদ্ধিতে অক্ষম। পান ভোজনে দিবা পরিক্রপ্ত, পরিপুষ্ট সাধারণ পাশ্চাত্য জীব, এই চা-অস্থিষ্ঠানের মধো প্রাচীণবাসী আমাদিগের অনেক অদ্বুত খেয়াল, ছেলেমাছুষি এবং বৈচিত্র্যপ্রিয়তার পরিচয় পাইবে সন্দেহ নাই। জাপান যতাদন শান্তিপ্রিয় ছিল, চারুশিল্পের চর্চ্চা করিত, ততদিন তাহারা আনাদিগকে বর্ষের বলিয়া জানিত; মাপুরিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে অসংখ্য জীবনের সর্বনাশ করিয়া যে দিন রক্তনদী বহাইয়াছি, সেই দিন হইতেই আমরা হুসভা বলিয়া গণ্য হইতেছি। সামুরাইগণের রণসংহিতার অনেক ভাবাই আজকাল প্রতীচ্যে প্রচারিত হইয়াছে; আনাদের সে মৃত্যু অশ্রুশমন কাব্যের মতই মনোহর, তাহার মহিমায় যুদ্ধ প্রত্যেক দৈনিক আত্মত্যাগের উৎসাহে প্রাণ বিসর্জন করা মহানন্দ স্বরূপ জ্ঞান করে। কিন্তু জীবন-কাব্যস্বরূপ চাধর্মের প্রতি কোনও মনোযোগই দেওয়া হয় নাই। যুদ্ধজয়ের ঘোর রক্তাক্ত গোরবই যদি আমাদিগকে সভা মনে করিবার একমাত্র দাবী হয়, তবে আমরা চিরদিনই যেন অসভ্য বলিয়া পরিগণিত হই। যতদিন আনাদের আদর্শ, আনাদের কাব্য-সৌন্দর্য্য এবং চারুশিল্প সমুচিত সম্মান লাভ না করে, তত দিন অসভ্য আমরা প্রতীক্ষা করিতে প্রস্তুত আছি।

কবে প্রত্যচ্য প্রাচ্যকে বুঝবে—কিধা বুঝিবার চেষ্টা করিবে? আসিয়া-বাসী আমাদিগের সর্বদে যে অদ্বুত সভ্য এবং কল্পনার জাল রচিত হয়, তাহা দেখিয়া আমরা একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া যাই। হয় আমরা পদ্বল্পগন্ধ সম্ভোগে অথবা ছুছুন্দরী এবং তৈলপায়িকা ভোজনে জীবনধারণ করিয়া থাকি, এমন জনশ্রুতি শুনিতে পাই। হয় আমরা অদৃষ্টবাদের প্রভাবে অন্ধ-অজ্ঞানীভূত, নয় ত নীচ ইন্দ্রিয়পরায়ণতায় তন্ময়। ভারতবর্ষীয় ধর্মভাব অজ্ঞান বলিয়া উপেক্ষিত, প্রাচীন চীনের চিরন্তন সংঘম এবং গাভীর্ঘ্য বুদ্ধিহীনতা এবং জাপানী স্বদেশপ্রীতি অদৃষ্টবাদ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। আমরা যে শাস্ত্র ভাবে অদ্বাভাত, বেদনা, দৈন্ত, শ্রিয়জনব্রিজেদু সহ করিয়া থাকি, জীবনের পরিপূর্ণ আনন্দের মধোও বৈরাগ্যের আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারি, তাহা কেবল আমাদের শক্তির স্বল্পতা, দ্রাঘুজালের হীনতার প্রভাবে হইয়া থাকে; তাহার সম্যক বৈজ্ঞানিক প্রমাণ সংগ্রহ হইয়া গিয়াছে, শুনিলাম।

আমাদের লইয়া একটু আমোদ, তা' করনা কেন? তাহাতে আপত্তি নাই, আমাদেরও আমোদ করিবার স্বাধীনতা আছে? যদি জানিতে পারিতে তোমাদের

সমক্ষেও আমরা কত কথা, কেমন বানাইয়া বর্ণনা করি, তবে হালির কারণের অভাব হইত না । সে পরিকরনার গোপলি-ছায়াচ্ছন্ন রহস্য সম্পূর্ণ বিহীন, বিশ্বাসের সহজ ভক্তি, অনিশ্চয়ের ক্ষুদ্রনিষ্ঠতারও অভাব নাই । এমন পরিপাটি স্বল্প মার্জিত অতীন্দ্রিয় শ্রুণ সমূহে তোমাদের অলঙ্কৃত করা হইয়াছে যে ঈর্ষা করিবারও অবসর নাই, এমন সুন্দর ললিত চারু চমৎকার রসনে অভ্যস্ত বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে যে, নিন্দা করা অসম্ভব । আমাদের অতীত কালের লেখকগণ সর্বস্ত্র পণ্ডিতবর্গ বলিয়া গিয়াছেন, তোমাদের পরিচ্ছদ অন্তরালে বেশ সুন্দর এক একটি পরিপুষ্ট রোমশ লাদুল আছে—আর তোমরা প্রায়শঃই নবজাত শিশুর দেহের কাব্য ভঙ্গন করিয়া ক্ষুধা নিবৃত্তি করিয়া থাক । শুধু তাই নয়, ইহার অধিক নিন্দাবাদও শোনা গিয়াছে, তোমাদের আমরা নিত্য বিধবুদ্ধি বলিয়াই জানিতাম ; কেন না শুনিয়াছি, তোমরা যাহা প্রচার কর, তাহার অনুযায়ী কার্য্য কখনই কর না ।

কিন্তু এদব ভুল ভ্রান্তি ক্রমশঃই অস্তর্ধান হইতেছে । বাণিজ্য প্রভাবে অনেক প্রাচ্য বন্দরেই ইউরোপীয় ভাষার প্রাভাব ঘটিয়াছে । আসিয়াবাসী যুবকগণ, বর্তমান যুগের শিক্ষা আদর্শ করিবার জন্ত দলে দলে প্রতীচ্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে প্রবেশ করিতেছে । আমাদের অগ্রদৃষ্টি তোমাদের সভ্যতার নম্রভেদ করিতে পারে না সভ্য, তবুও আমরা শিথিতে অনিচ্ছুক নহি । আমার স্বদেশবাসীদিগের মধ্যে কেহ কেহ তোমাদের ধরণ ধারণ, ভাব ভঙ্গী অত্যধিক পরিমাণে আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিয়াছে ; বিশ্বাস কঠিন কলার (collar) এবং সমুচ্চ হ্যাট (Hat) হস্তগত হইলেই, তোমাদের সভ্যতার শ্রেষ্ঠতম পদবীতে উন্নীত হইব । এ ভ্রান্তি যতই শোচনীয় এবং হ্রঃখজনক হউক না কেন, ইহা হইতে অমায় পাওয়া যায় যে, প্রভাচ্যের দরবারে আমরা বিনয়বানত-জাহ্ন হইয়া অগ্রসর হইতে দগ্নত । আক্ষেপের বিষয় প্রাচ্যপরিচয় গ্রহণ ব্যাপারে প্রভাচ্যের ভাবটি এমন প্রীতিমধুর নহে । পৃষ্ঠীয় ধর্ম্মের প্রচারকগণ শিক্ষাদান, করিতেই আইসেন, আদৌ গ্রহণ করিতে নহে । আমাদের বিশাল সাহিত্য-বারিধির পরিচয় হয় অহ-বাদের গভূষে, নগ্নত পর্য্যটকের আকর্ষণ গল্প হইতেই তোমরা গ্রহণ করিয়া থাক । স্বর্গগত লাফ কাড়ি ও হাণ কিংবা আর্থ্যা নিবেদিতার মত এমন মহাশূভব ব্যাখ্যার ব্যবী লেখক লেখিকা আর পাওয়া যাইবে ? তাঁহারা যে আমাদের ধর্ম্মবল, এবং প্রীতি-অহুভূতির দীপ্তি বিস্তার করিয়া, ঘনীভূত প্রাচ্য অন্ধকারে জাগরণের জীবন সঞ্চার করিয়াছেন ।

এমন অসংযতবাক হইয়া ছায় আনি চা-দগ্ন সম্মুখে অজ্ঞতার প্রকাশ করিলাম সন্দেহ নাই । কেন না চা-দগ্নের মর্শ্ব-শক্তি আমাদিগকে সেই কথা বলিতেই বাধা করে, অপরে যাহা আমাদের নিকট উনিবে বলিয়া প্রত্যাশা করিয়া আছে ; তাহার অধিক আর একটি কথাও বলিবার অধিকার থাকেনা । আমি কিন্তু তাই সে অশুশাসন মানিব না । ইউরোপ এবং আসিয়া উভয়তঃ আপনাদিগকে ভুল বুদ্ধিবার নিমিত্ত এক শত অনাস্থিগ্ৰস্ত সৃষ্টি করিয়াছে ; এত অনর্থ সংঘটন হইয়াছে যে, তাহা দূর করিবার জন্য আমি যদি চূড়ারিটি কথা বেশী করিয়াই বলিতে চাই, তবে তাহার জ্ঞাত ক্রটি স্বীকার করিতে আমি কোন ক্রমেই বাধা হইব না । কথিয়া যদি জাপানকে বুদ্ধিবার ক্ষমতা তিলমাত্র অমুগ্রহ-চেষ্টা করিত, তবে বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ত্রিংশবাসীকে এমন লোমহর্ষণ, রক্তপ্লাবন সমরাভিনয় দেখিতে হইত না ! প্রাচ্য জ্ঞানমত্তা সকল উপেক্ষা করিবার পরিণাম কি ভয়ানক, তাহার ফলে বিশ্বপরিবারের নিমিত্ত কেমন অনর্থের বীজ নিহিত থাকে, তাহা সহজে অমুমেয় নহে । ইউরোপীয় ইম্পিরিয়ালিজম হাত-জনক “পাণ্ডু” বিপদের আশঙ্কার ছন্ধারে দিক্‌বিদিক মুগ্ধিত করিতে কুঠা বোধ করে নাই, আসিয়ার পক্ষে অকস্মাৎ হুরোরোগা ধবল-বিভাদিকঃ সম্মুখে সচেতন হইয়া উঠাও কিছুমাত্র বিচিত্র নয় । তোমরা হয়ত আমাদের মধ্যে চায়ের নাতা কিঞ্চিদধিক দেখিয়া বেশ একটু হাসিতে পার ; কিন্তু আমরাও কি তোমাদের গুণ কাষ্ঠ তিষ্ঠতাগ্রে ভাবিয়া একে-বারেই অগ্নিশর্মা হইতে পারি না ?

আইস, আমরা উভয় মহাদেশকে পরস্পরের প্রতি তুর্ণ তীক্ষ্ণ বাক্যবাণ এরোগ ব্যাপার হইতে নিরস্ত করি ; উভয়তঃই আপনাদিগকে কেবলমাত্র অর্ধ গোলকের অধিকারী জানিয়া, জ্ঞানী যদিও নাই হইতে পারি, তবু বিবাদ সৌম্য বৈরাগ্য অর্জনের চেষ্টা করায় ক্ষতি কি ? আমরা ভিন্ন উপায়ে, স্বতন্ত্র চেষ্টায় জাতীয় পরিণতি লাভ করিয়াছি ; তাই বলিয়া একে অপরের সহায় হইবার পথে কোনও বাধাত দেখিতে পাই না । তোমরা শাস্তি-বিযুক্ত, চাঞ্চল্য-পরিণাম ঐশ্বর্য্য-বিস্তার প্রাপ্ত হইয়াছ, আর আমরা যে তাললয় রাগ সংযুক্ত সঙ্গীতের মত নির্ধ্বংসীয় অনাহত শাস্তির স্বজন করিয়াছি, তাহা নিতান্ত শূন্যমার বলিয়াই একান্ত আশ্চর্য্যক-অসমর্থ । তবুও বলিলে প্রত্যয় যাইবে কি, অনেক বিষয়েই প্রাচ্য প্রতীতি অপেক্ষা স্নাত্তে ভাল ।

আশ্চর্য্যের কথা, আজ পর্য্যন্ত প্রায় সমস্ত বিশ্ব পরিবারই ক্ষুদ্র চায়ের পেয়াগাটির মধ্যে আত্মীয়তার আনন্দবাদ পাইয়াছে । আসিয়ার এই একমাত্র অমুদ্যানই

সর্বত্র সম্মান লাভ করিয়া আসিয়াছে। ইউরোপীয় গৌরান্বিত আনন্দের দর্শ ও নীতিশিক্ষা অবজ্ঞার চক্রে দেগিতে কিছু মাত্র কৃষ্ঠাবেশে করে নাই; কিন্তু এই পাটল পানীয়টুকু সকল পাইবামাত্র সাদরে স্বাগত জানাইয়াছে। বৈকালীন চা প্রতীচ্য ভদ্র সমাজের বিশেষ একটি অপরিহার্য্য অঙ্গুষ্ঠান। চায়ের চামচ পৌরিতে যুগ্মনিকণে হুজুমারী গৃহস্থানিনীর কোষ পরিচ্ছদের চিক্ণল্যমে গৌর শরীর সন্তকে মধুরপ্রস্রের নিরতিশয় মাধুর্য্যে চায়ের পূজা যে স্থির-প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, তাহাতে নিঃসন্দেহ হইতে পারা যায়। নকলের নাকাল নিশ্চিত জানিয়াও নিমগ্নিত অতিথি যে প্রকার সাধু ঔদাস্যের সহিত প্রস্তুত পানীয়ের প্রতীক্ষা করিয়া থাকেন, সেই নয় বৈরাগ্যই প্রাচ্য প্রভাবের অগ্রগণ্য পরিচয়।

ইউরোপীয় সাহিত্যে চা সন্তকে প্রথম উল্লেখ ৮৭২ খৃষ্টাব্দে পরে একজন আরবীয় পরিব্রাজকের ভ্রমণ-বৃত্তান্তে দেখা যায়। তিনি লিখিয়াছিলেন, চীন রাজধানী ক্যান্টনে রাজস্বের প্রধান আমদানী চা এবং লবণের গুহ হইতেই হয়। মার্কো পাওলো লিখিয়াছেন—১২৮৫ খৃষ্টাব্দে প্রধান কোনও চীন রাজস্বসচিব স্বৈচ্ছায় চায়ের গুহ বৃদ্ধি করা অপরাধে, পদচ্যুত হইয়াছিলেন। নূতন নূতন দেশ আবিষ্কারকালে ইউরোপীয়গণ দূরান্ত পূর্বের সংবাদ জানিতে আরম্ভ করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে ওলন্দাজগণ সংবাদ আনিলেন যে, প্রাচ্য দেশে কোনও গুহাবিশেষের পাতা হইতে বড় চমৎকার পানীয় প্রস্তুত হইয়া থাকে। পরিব্রাজক Giovanni ১৫৫২, আলমিড ১৫৭৬, মাগিনো ১৫৮৮, এবং তারিরা ১৬১০ খৃঃ অব্দে চায়ের উল্লেখ করিয়াছেন। শেষোক্ত বৎসরে ডচ্ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর জাহাজ ইউরোপে সর্বপ্রথম চায়ের আমদানী করে। ফ্রান্সে ১৬৩৬ খৃঃ অব্দে চায়ের পরিচয় হয়, ১৬৩৮ খৃষ্টাব্দে ক্রশদেশে তাহার আবির্ভাব দেখা যায়। ১৬৫০ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ড তাহাকে স্বাগত জানাইয়া বলে “সর্ব ভিষক অমুমোদিত চমৎকার পানীয়, চীনবাসীগণ তাহাকে, চা, নামে অভিহিত করিয়াছেন, ভিন্ন দেশবাসীগণ তাহাকে টে, কিম্বা “টী” বলিয়া থাকে।”

পৃথিবীর সব ভাল কিছুই মতই চায়ের প্রচারপথে অনেক বাধা ঘটয়াছিল। নিসনিষ্ঠ নিম্নকের নাম হেনরী স্যাভিল ১৬৭৮ খৃষ্টাব্দে চায়ের অমুষ্ঠান অতি অপরিচ্ছন্ন বাপার বলিয়া উল্লেখ করেন। জোনাথ হ্যান্ডয়ে বলেন চা পান করিলে পুরুষের শরীরের আয়তন ও সৌষ্ঠব হ্রাস হইয়া যায়, রমণীর রমণীয় লাবণ্য আর থাকে না। সেকালে আমেরিকা চায়ের দান আট দশ টাকার অধিক ছিল ;

কাজেই জনসাধারণের পক্ষে তাহা সংশ্লিষ্ট করিবার সৌভাগ্য হইত না । রাজকীয় "কিষা সম্রাজ্ঞবংশীয়দিগের উৎসব অহুষ্ঠানে চায়ের ব্যবহার হইত দূরান্তর হইতে রাজদর্শনপ্রার্থী ব্যক্তিগণ ইহা উপচোকন স্বরূপ আনয়ন করিতেন । চুখুলা হওয়া সবেও আশ্চর্য্য এই যে, চায়ের ব্যবহার অত্যন্ত কালের মধ্যেই সাধারণে প্রসার লাভ করিয়াছিল । অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ ভাগে লণ্ডনের বাহিরের আড্ডাগুলি ক্রমে চায়ের দোকানে পরিণত হয় । সাহিত্য-রসরসিক Addison এবং Steele প্রভৃতি পণ্ডিতগণ সেই সকল স্থানে প্রকাণ্ড পাতে চা লইয়া, দিবা রাত্রির অধিকাংশ অতিবাহিত করিতেন । এই পানীয়টি বিলাস-সামগ্ৰী হইতে ক্রমে জীবনের দৈনিক অত্যাবশ্যকীয় ব্যবহার্য্য দ্রব্য হইয়া উঠিল । শুধু তাহাই নয়, ইহার উপরে আবার লবণ আর অহিকেনের মত শুকও ধার্য্য হইয়া গেল । এই পানীয়টি অধুনাতন ইতিহাসগঠনে কতখানি সাহায্য করিয়াছে, তাহা এই সংক্ষেপে স্মরণ না করিয়া থাকা যায় না । যতদিন পর্য্যন্ত চায়ের শুক উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়া মানব সম্বন্ধ-শক্তির সীমা অতিক্রম না করে, ততদিন পর্য্যন্ত ঔপনিবেশিক আমেরিকা অত্যাচারের হস্তে আপনাকে একান্ত ভাবেই সমর্পণ করিয়া রাখিয়াছিল । বোষ্টন বন্দরে চায়ের সিন্দুকগুলি যেদিন সিঁচুর গ্রাসে নিক্ষেপ করা হয়, সেই দিন হইতেই আমেরিকান স্বাধীনতার স্বরূপান্তর ।

চায়ের স্বাদে এমন একটি চতুর মাধুর্য্য আছে যে, ইহার মোহে অভিভূত না হইয়া থাকা যায় না এবং কল্পনার সাহায্যে ইহাতে কল্পলোকের সৌন্দর্য্য আরোপ করিতেই হয় । রসিক ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ ইহার মূহু মৌরভের সহিত আপন আপন চিন্তার পরিমল মিলাইতে বড় অধিক বিলম্ব করেন নাই । এই পানীয়ের স্বগন্ধে স্তরার মদগন্ধ, কফির আত্মস্তুতি এবং কোকোর আত্মবিশেষত্ব-বর্জিত গুরুল নির্দোষিতা নাই । ১৭৭১ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগেই spectator পত্রিকায় দেখিতে পাই "যে সকল স্বনিয়মিত পরিবারে প্রতি প্রভাতের প্রহরেক কাল চায়ের সহিত কটি মাথনের সম্ভাবনারে ব্যয়িত হয়, তাঁহাদের আমি একান্ত নির্দোষস্বারে এই অহুরোধ করি যে, তাঁহারা যেন এই সংবাদপত্রখানিকে সেই চা-অহুষ্ঠানের অভিন্ন অঙ্গ স্বরূপ জ্ঞান করেন ।" Samuel Johnson আপন চরিত্র-চিত্র অঙ্কন করিতে লিপিয়াছেন ; "একজন নিলজ্জ চা-খোর আজ বিশ বৎসর ধরিয়া এই স্বল্পর মোহকর পানীয়ের সাহায্যে আহাৰ্য্যদ্রব্য গলাধঃকরণ করিয়া আনিতেছেন । তিনি চায়ের সহায়তায় সায়াক্স রসদীপ, নিঃসঙ্গ বিগ্রহর

রাত্রি সাহসনাময় এবং প্রভাতের প্রথম আলোককে স্বাগত জ্ঞাপন করিতেন। চার্লস লাব যখন বলিষ্ঠাছিলেন স্বকৃত সংকার্য্য সন্ধাননে রাখিয়া এবং জ্ঞাপনের স্বকৃত সহসা প্রচার করিয়া দিয়া তাঁহার আনন্দ লাভ হয়, তখন তিনি চাধর্ম্মের বীজময় আবিষ্কার করেন। কেন না জুর্জীয়াত সৌন্দর্য্যের আবিষ্কারই চাধর্ম্মের শিল্প; সুস্পষ্ট অভিযান্ত্রিক অপেক্ষা আভ্যন্তরীণ প্রকাশই তাঁহার নীতি। স্বীয় স্বভাবের অক্ষমতা কিম্বা দুর্ব্বলতা দেখিয়া প্রাণ ভরিয়া হাসিতে পারাই ইহার সাধনা, ইহার রহস্য, ইহার রসবোধ এবং ইহার জ্ঞান ও দর্শন। যথার্থ রসজ্ঞ প্রত্যেক ব্যক্তিকেই চা-দার্শনিক বলা যাইতে পারে। দৃষ্টান্তরূপ ধ্যাকারে একজন, আর সেক্সপীয়র অবশ্যই প্রথম এবং প্রধান। Decadence কালের কবিগণ (হার পৃথিবীর অবস্থা Decadence ভিন্ন আর কবেই বাঁ কি ছিল?) পৃথিবীতে বিষয়-বিশ্ব বিস্তারিত বিরুদ্ধে যখন কোনও কিছু বলিয়াছেন, তখন চাধর্ম্মের অগ্রসর হইবার পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়াছেন। সম্প্রতি অসম্পূর্ণের অর্থাৎ জীবন-ব্যাপারের চিন্তা করিতে করিতে আমরা একটি ক্ষীণ আশা পোষণ করি যে প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য ভয়ত একই সাধনা স্থলে সম্মিলিত হইবে। 'তাও' ধর্ম্মীগণ বলেন, সেই অনাদি কালের বিশাল প্রারম্ভে আত্মা এবং পরমাণু বিষম সংগ্রাম-নিরত হইয়াছিল। অবশেষে পীত সম্রাট আকাশের স্বর্গদেব অন্ধকার এবং পৃথিবীর দানবকে পরাভব করেন। মৃত্যু-ঘন্ত্রণায় অধীর এই অন্ধুর মন্তকের আঘাতে চন্দ্রকান্তমণি-নির্ম্মিত আকাশ-গগুজ চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দেয়। নক্ষত্রেরা আপন আপন কুলায় আশ্রয় হারাইয়া ফেলিল, লক্ষ্যভ্রান্ত চন্দ্রমা অন্ধকারের দুর্গম গিরিদরীতে ঘুরিয়া মরিতে লাগিল। নিরাশা-কাতর বিপদগ্রস্ত পীত সম্রাট আকাশ-সৌধের পুনঃ সংস্কারের জন্ত দূর দূরান্তরে স্থপতি খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তাঁহার বাকুল অমুসন্ধান ব্যর্থ হইল না। পূর্ব সমুদ্র হইতে স্বর্গীয় দেবী রাজ্ঞী নিউকা উদ্ভূত হইলেন। তাঁহার লপাটদেশে চন্দ্রকলার দীপ্তি, সর্বাঙ্গ সমুজ্জল অগ্নিরাগ বর্ণে আচ্ছাদিত। তিনি তাঁহার দিব্য কটাছে পঞ্চ বর্ণের সংমিশ্রণে বাসব-ধনুর স্রুতি করিয়া ভয় আকাশ আবার সূনির্ম্মিত করিলেন। কিন্তু হায়, দেবতার কার্য্যও ভ্রমবর্জিত নহে; ক্ষুদ্র ছুইটি ছিদ্র, সম্পূর্ণ রোধ করিয়া দিতে তিনি ভুলিয়া গেলেন। সেই হইতে প্রেমের ষ্ঠেত-ভানের স্রুতি হইল। ছুইটি আত্মা অন্তরীনের দেশে কেবলি ভাসিয়া চলিয়াছে; যত দিন উভয়ের একত্র সম্মিলনে বিশ্বের সম্পূর্ণতা সাধন না হয়, তত দিন, এ গতির আর নিবৃত্তি নাই। আত্মাদিগের প্রত্যেককেই তাই ত সম্মেলন নূতন কারিয়া আপন আপন আশা ও শক্তির আকাশ গড়িয়া তুলিতে হয়।

বর্তমানে হায়, বিশ্বমানবের স্বর্গলোক ক্ষমতা এবং অর্থ এই দুই অমূল্য শক্তির সংঘর্ষে বারবার ভাঙিয়া পড়িতেছে। তাই আজ নিখিল বিশ্ব আত্মস্ত্রিভা এবং ক্রটিহীনতার অন্ধকার ছায়ায় উদ্ভ্রান্ত, ভ্রাম্যমান। বিকারগ্রস্ত বিবেকের বিনিময়ে আমরা জ্ঞানার্জন করিতেছি। দয়াধর্ম স্বার্থচেষ্টার নামান্তর মাত্র। প্রাণী এবং প্রভীতি ফেনোবেল সমুদ্রে ভীষণ দুইটি এহের নাগ, জীবনের স্পর্শমণির সন্ধানে উদ্দাম হইয়া ফিরিতেছে। এই মহাধ্বংসের সংস্কার করিবার রক্ত আবার যে দেবসম্রাজ্ঞী নিউকার আবগুক; আমরা বিশ্বপালক বিষ্ণুর অবতারের প্রতীকায় বসিয়া আছি। এস, ততক্ষণ একটু চা পান করিয়া লই; আকাশে স্বর্গাস্তের স্বর্ণরাগ বংশপত্রের চঞ্চল চামরের উপরে পড়িয়া আলোছায়ায় মায়ায় খেলা সৃজন করিতেছে। উৎসরাজিতে আনন্দের গদ গদ ভাষা ক্ষরিত হইতেছে, পল্লববহুল দেবদান্ন-বীথিকার মর্ম্মর-গান চায়ের উষ্ণ জলের পাত্রের মধ্যে অব্যক্ত মধুর শব্দে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। এস ভগো বহু এস, আমরা এই অবসরে নবরতার আনন্দের স্বপন দেখিয়া লই, অবোধ স্বপ্নের ঘটনা সমাবেশের মধ্যে বিভোর হইয়া থাকি।

(ক্রমশঃ)

ত্ৰীপ্রিয়দর্শনা দেবী।

রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যুৎসব।

যে কক্ষপক্ষে আমরা আজ মিলিত হইয়াছি ইহার নাম পিতৃপক্ষ। হিন্দুগণ এই পক্ষে পিতৃপুরুষগণের তর্পণ করিয়া থাকেন। পিতৃপুরুষ বলিলে যে কেবল পিতা, পিতামহাদি পূর্ব পুরুষই বুঝায়, তাহা নহে। বেদে সকল বংশেরই পূজা এক প্রেমীর পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্য আছে। তাঁহারা অগ্নিরস, অথর্বন, ভৃগু, বলিষ্ঠাদি বংশীয় ঋষি। এই সকল প্রাচীনকালের ঋষিগণের পিতৃরূপে পূজিত হওয়ার কারণ ইহারা “পথকৃত্য” বা পথপ্রদর্শক ছিলেন। আজ আমরা ভক্তি-কৃতজ্ঞতারূপ তিলোদক দ্বারা যে মহাপুরুষের তর্পণ করিতে সমবেত হইয়াছি, তিনি নবভারতের প্রধাম “পথকৃত্য”। • ধর্ম্মসংস্কার, সমাজ-সংস্কার, শিক্ষা-সংস্কার, রাষ্ট্রনীতি-সংস্কার, সাহিত্য প্রভৃতি সকল প্রকার সদগুঠান-ক্ষেত্রেই মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় আমাদের পথপ্রদর্শক। কেহ কেহ বলিতে পারেন, “হলেন ইবা রামমোহন রায় পথপ্রদর্শক—তিনি যে সময়ে প্রাহুভূত হইয়াছিলেন সেই

সময়ে এ দেশের জনসাধারণ অশিক্ষিত অন্ধ ছিল, তাদের ত্বিনি পৃথগ্ৰদর্শক ছিলেন; আমরা বিংশ শতাব্দীর অশিক্ষিত চক্ষুমান লোক, আমরা কেন সময় নষ্ট করিয়া বৎসর বৎসর তাঁহার স্মৃতির আরাধনা করিব। আমাদের বিংশ শতাব্দীর হিসাবে তিনি এমন কি অসাধারণ লোক! রামমোহন রায় যে অস্বাভাবিক সঙ্গ্রদায়ের সংস্থাপক, সেই সঙ্গ্রদায়ের লোকের তাঁহাদ্বারা স্মৃতির প্রতি বিশেষ ভক্তি দেখাইবার কারণ থাকিতে পারে। শিক্ষাক্ষেত্রে রামমোহন রায়ের সময়ে যে সকল শুভাশুভানের সূচনা হইয়াছিল তাহা তাঁহার একার চেষ্টার ফল নহে। তাঁহার রচনাই বা এখন কয় জনে পড়ে? আজকার উৎসবের মত উৎসবের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা বা উপকারিতা কি?”

রামমোহন রায় যে আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া কৰ্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছিলেন, এখনকার লোকের মধ্যে কেহ কেহ তদপেক্ষা উচ্চতর আদর্শের সন্ধান পাইয়া থাকিলেও থাকিতে পারেন। রামমোহন রায়ের মত লেখক এবং পণ্ডিত হয়ত এখন বিরল নহে। কিন্তু তাঁহার উচ্চ-আদর্শ-নিষ্ঠার, বিজ্ঞতার, এবং যোগ্যতার পশ্চাতে এমন একটি শক্তি ছিল, যাহা এদেশে অত্যন্ত বিরল—সেই শক্তি চরিত্রশক্তি (vigour of character)। আমরা চরিত্র বলিতে সাধারণতঃ একটা স্থিতিশীল (static) জিনিষ মনে করি; দোবলেশশূন্য ব্যক্তিকে আমাদের হিসাবে চরিত্রবান। এই শ্রেণীর লোকের দ্বারা সমাজের অপকার হয় না বটে, কিন্তু ইহাদের লইয়া সমাজ যে উন্নতির পথে বিশেষ অগ্রসর হইতে পারে তাহা মনে হয় না। চরিত্র একটা গতিজননশীল (dynamic) শক্তি। এইরূপ চরিত্র-শক্তিসম্পন্ন পুরুষ সমাজ ও সেবাত্ত গ্রহণ করিলে সমাজে গতিশীলতা সঞ্চারিত হইতে পারে। কিন্তু যে কারণেই হউক, আমাদের দেশে সমাজসেবার ক্ষেত্রে এইরূপ চরিত্র-শক্তিসম্পন্ন পুরুষের সংখ্যা অতি অল্প। আমরা অনেকেই অবসর মত সমাজের হিতচিন্তা করি, উপস্থিতমত হুচারিটা কথাও বলি; কিন্তু কায়ে বিশেষ কিছু করিয়া উঠিতে পারি না, এবং আর কাহাকেও কিছু করিতে দেখিলে তাহার ভিতরে একটা অস্তিসন্ধি আছে, এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া নিজের যে সদিচ্ছা তাহাও একরূপ গুণা টিপিয়া মারিয়া ফেলি। আমাদের এইরূপ আচরণের কারণ বিজ্ঞা বুদ্ধির বা সদভিপ্রায়ের অভাব নহে, চরিত্র-শক্তির অভাব। আমাদের দেশে যে চরিত্র-শক্তিসম্পন্ন পুরুষ প্রচলিত হইতেছেন না, এমন নহে। এক নিঃশ্বাসে আমরা হয়ত ৫১৬ জনের নাম করিয়া ফেলিতে পারি—যথা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যালয়গর, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,

বিবেকানন্দ স্বামী, অখিনীকুনার দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি । কিন্তু স্রোত-
হীন, পঙ্কিল, আগাছা-আচ্ছন্ন জলাশয়ের তুল্য আমাদের এই গতিহীন সমাজ
দেহকে নাড়িতে হইলে বহু কক্ষীর প্রয়োজন । চরিত্র-শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ-
গণের এই প্রকার বার্ষিক তর্পণ চরিত্র-শক্তিমান কক্ষী গড়িবার একটা উৎকৃষ্ট
উপায় । আমাদের শাস্ত্র বলে “ব্রহ্মবিদ ব্রহ্মৈব ভবতি” । যিনি ব্রহ্মকে জানেন
তিনি ব্রহ্মস্বরূপ হয়েন । আমরাও মহাপুরুষগণকে যতই ভাল করিয়া বুঝিতে
পারিব, জানিতে পারিব, ভাল বাসিতে পারিব, ততই তাঁহাদের মহৎগুণের
কিছু কিছু অংশ আমাদের চরিত্রে সঞ্চারিত হইবে । আজিকার উৎসবের মত
উৎসবে যোগদান করার উদ্দেশ্য এই প্রকারে শক্তিলভ করা ।

যে সকল চরিত্র-শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ বঙ্গদেশে প্রচলিত হইয়া জনসমাজের
অশেষ হিতসাধন করিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে রাজা রামমোহন রায়ের স্থান অতি
উচ্চ, এবং সময় সামগ্রী হিসাব করিয়া বোধ হয় বলা যাইতে পারে, বর্তমান
যুগের সমাজসেবক কৰ্ম্মবীরগণের মধ্যে তাঁহার স্থান সর্বোচ্চ । রামমোহন রায়ের
অসাধারণ-চরিত্রশক্তি কি প্রকারে তাঁহাকে এতগুলি সংস্কার সাধনে সমর্থ
করিয়াছিল এখানে তাঁহার একটু মাত্র পরিচয় দিব । বোল বৎসরের সময় তিনি
হিন্দুদিগের পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে একখানি পুস্তক লিখিয়াছিলেন । এটী সূত্রে
আত্মীয়দিগের সহিত রামমোহনের মনান্তর উপস্থিত হয় । মনান্তরের ফলে
তিনি গৃহপরিত্যাগ পূর্বক দেশত্যাগে বহির্গত হইলেন । ভারতবর্ষের অন্তর্গত
অনেকগুলি প্রদেশ ভ্রমণ করিয়া ভারতবর্ষের বহির্ভূত কয়েকটি দেশ এমন কি
তিব্বতেও ভ্রমণ করেন । পরে তাঁহার বিংশতি বৎসর বয়সের সময়ে তাঁহার পিতা
তাঁহাকে পুনর্বার আহ্বান করেন । স্বভাবতঃ স্বাধীনচেতা যুবক রামমোহন
রায়ের এই দেশ বিদেশ ভ্রমণ অসমসাহসের পরিচায়ক হইলেও, ইহাকে
অনেকটা যুবজ্ঞানস্বলভ ঋণিকের ফল বলিতে হয় ; ইহাতে আমরা রামমোহনের
প্রকৃত মহত্বের পরিচয় পাই না । কিন্তু ৩০ বৎসর বয়সের সময় যে দিন রাম-
মোহন চাকুরী ছাড়িয়া কলিকাতার আসিয়া একরূপ স্থানু হইয়া বাসিলেন, সেই
দিনই আমরা তাঁহার মহত্বের বৃহত্তর যথার্থ পরিচয় পাই । রামমোহন রায়ের
জীবনচরিতকার লিখিয়াছেন—

“রামমোহন রায় ১৭৩৯ সালে (১৮১৪ খৃষ্টাব্দে) চল্লিশ বৎসর বয়সে কলি-
কাতার আসিয়া বাস করিলেন । এখন হইতেই তাঁহার জীবনের কার্য্য প্রকৃত
রূপে আরম্ভ হইল । তাঁহার সমুদয় অবকাশ ও অর্থ, শরীর ও মন, অন্তর্ভূমির

হিতসাধনব্রতে উৎসর্গ করিলেন। যতদিন বাঁচিয়া ছিলেন, তাহার অল্প কার্য্য ছিল না, অল্প চিন্তা ছিল না। ধর্মসংস্কার সমাজ-সংস্কার, রাজনৈতিক সংস্কার, বাঙ্গলা সাহিত্যের উন্নতি প্রভৃতি সকল প্রকার শুভকর কার্য্যেই তিনি হস্তার্পণ করিয়াছিলেন। তৎক্ষণ্ণ পরিশ্রমেও কাতর ছিলেন না।

এই যে “অল্প কার্য্য অল্প চিন্তা ছাড়িয়া অবকাশ, অর্থ, শরীর ও মন জন্ম-ভূমির হিতসাধনে উৎসর্গ করিলেন” ইহা তিনি দায়িত্বহীন প্রথম যৌবনের যৌবকের মাথায় যখন বেশী কিছু দিবার ছিল না তখন করিলেন না। চল্লিশ বৎসর বয়সে, সংসার-বৃক্ষের স্বথঃস্বরূপ সকল প্রকার ফলের স্বাদ গ্রহণ করিয়া, জীপুত্র পরিজনদের ভার পৃষ্ঠে লইয়া রামমোহন রায় কলিকাতার লোকারণ্য মধ্যে এক অপূর্ণ সম্মাস-আশ্রম নির্মাণ করিয়া কঠোর তপশ্চরণ আরম্ভ করিলেন। ষোল বৎসর বয়সে গৃহত্যাগের দিন যে চরিত্র-শক্তির প্রথম উন্মেষ দেখা দিয়াছিল, চল্লিশ বৎসরে তাহার পূর্ণ পরিণতি। ২০ বৎসরব্যাপী গৃহস্থ-জীবনের বাধা বিপত্তি, ১০ বৎসরব্যাপী কলেক্টরীর সাধারণ আমলাগিরি চাকুরী, রামমোহনের চরিত্র-শক্তিরূপ বৃক্ষের ক্রমবৃদ্ধির কোনরূপ বাধা জন্মাইতে পারে নাই। চল্লিশ বৎসর বয়সের সময় ফলফুলে ভরা সেই বৃক্ষ কলিকাতায় শিকড় গাড়িয়া বসিল। শত ঝড়বাত, সমাজের শত তাড়না, তাহাকে টলাইতেও পারিল না, তাহার শীতল ছায়ায় দেশের উন্নতির নানা পথ গুলিয়া গেল। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে রামমোহন রায় যে দিন কলিকাতায় গিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন, সেই দিন ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটি স্মরণীয় দিন। ১৭ বৎসর কাল কলিকাতায় থাকিয়া এবং ৩ বৎসরকাল ইংলণ্ডে থাকিয়া মহাত্মা রামমোহন কিরূপ অক্লান্ত পরিশ্রম, আশ্রম্য ত্যাগ এবং অন্তঃকরণীয় নির্ভীকতার সহিত স্বীয় মহৎ ব্রত উদ্‌যাপন করিয়াছিলেন, তাহার বিবরণ পাঠ করিবার অল্প আপনাদের সকলকেই সাহসের অহুরোধ করি। আমরা যখন ষোল হইতে বিশ বৎসরের যুবক, তখন আমরা স্বদেশের কত হিতাহুষ্ঠানের কল্পনা করিয়া থাকি, সমাজের উন্নতির কত স্বপ্ন দেখিয়া থাকি, কিন্তু আর বিশ বৎসরের পরে সেই সকল কল্পনা, সেই সকল স্বপ্ন কোথায় বিলীন হইয়া যায়। আমরা, এই পূর্ণাদিনে সকলে প্রার্থনা করি ৪০ বৎসর বয়সে যেন সমাজসেবাত্রাহুষ্ঠানের উপযোগী চরিত্র-শক্তি আমরা লাভ করিতে পারি। অলমতি বিস্তরেণ।

ঐরমাশ্রমাদ চন্দ্র

গৌরী

তখন সন্ধ্যা হইয়াছে । সরোজকুমার কলিকাতার শিবনারায়ণ দাসের গলীতে একটি মেসে বসিয়া আছেন । টেবিলের উপর একখানা কলিকাতা গেজেট, তাহাতে এম, এ পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হইয়াছে । প্রথমেই লাল পেন্সিলে চিহ্নিত নিম্নের নামটির পানে চাহিয়া মাঝে মাঝে তিনি ভবিষ্যতে কি করিতে হইবে তাহারই ভাবনায় তন্ময় হইয়া পড়িতেছেন ।

পিতা ছিলেন ধনী, ইচ্ছা করিলে পুত্র কোন কাজকর্ম না করিয়াও জীবনের করটা দিন অথেষ্ট্রিক্সে কাটাইয়া দিতে পারিতেন । তবুও কোন বিষয়ে পরের গলগ্রহ না হইয়া আপনার পায়ে ভর দিয়া পাড়াইবার জন্য তিনি মেসে থাকিয়াই আইন পড়িবার সঙ্কল্প করিলেন ।

গ্রামে থাকিতে তাহার প্রবৃত্তি ছিল না । মাঝে মাঝে গ্রামের নিরঙ্কর সংকীর্ণচিত্ত লোকগুলির কথা তাঁহার মনে পড়িত । তাহাদের অল্পশ্রম নিন্দাবাদ করিয়াও তিনি তৃপ্ত হইতেন না । তাহারা দলাদলি, বিবাদ ও হিংসাধেষ লইয়াই আছে ; তাহারা মাথা তুলিয়া গ্রামের বাহিরের বৃহৎ জগতটির পানে চাহিতে জানে না, কতকগুলি অপ্রয়োজনীয় ছুট সমাজনীতি মানিয়া আপনাদের ও সমগ্র হিন্দু জাতিকে তাহারা ধ্বংসের পথে প্রেরণ করিতেছে এই সব কথা মুখে বলিয়া যখন তিনি ক্লান্ত হইয়া পড়িতেন, তখন তাঁহাকে মাসিক পত্রের সম্পাদকগণের দ্বারস্থ হইতে হইত ।

বাঙ্গালা ভাষার তাঁহার দখল ছিল না । সেই জন্য প্রথমে ইংরাজী ভাষায় প্রবন্ধ লিখিত হইল । ছই একজন বন্ধু সরোজকুমারকে বলিল—কোন বাঙ্গালী তাঁহার মত ইংরাজী লিখিতে পারে না ।

এইরূপে সাহস পাইয়া সরোজকুমার একদিন একখানা মাসিকপত্রে “হিন্দু ভবিষ্যৎ” শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখিয়া ফেলিলেন । অন্য পক্ষে তাহার সমালোচনা বাহির হইল । সরোজকুমার তাহা পাঠ করিয়া বুঝিলেন সমালোচক তাঁহার যুক্তির দোষ দেখাইতে পারেন নাই ; কেবল তাঁহার ভাষার নিন্দা করিয়াছেন ।

সরোজকুমার কালবিলম্ব না করিয়া “বাংলা ভাষা ও সাহিত্য” শীর্ষক প্রবন্ধে সমালোচকের চতুর্দশ পুরুষের মধ্যে কেহ কোন দিন ভাষার আদ্য অক্ষর পর্য্যন্ত

লিখিতে পারে নাই এ কথা সপ্রমাণ করিয়া তুলিলেন। বন্ধু বলিল “তাহার ভাষা অতি স্বন্দর, তিনি আড়ষ্ট বঙ্গভাষাকে একটা গুতি ও বেগ দান করিয়াছেন।

দৃষ্ট শিক্ত যুবক—কেহ তাঁহাকে কণ্ঠ্য আঁটিয়া উঠিতে পারে না, কোন প্রকার বন্ধন এখন তাঁহার কাছে শিথিল, সুখভেদ্য।

রাত্রি সাতটা বাজিল। বেয়ারা একখানি পত্র আনিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া দিল। পত্র পাঠ করিয়া তিনি বুঝিলেন— তাঁহার বিবাহের সপক্ষ হির হইয়াছে, দশদিন পরে তাঁহার বিবাহ।

সরোজকুমার একটু চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। পিতা যে উপযুক্ত পুত্রের মত না লইয়া বিবাহ জিনিষটাকে একটা তুচ্ছ সম্পর্ক মনে করিয়া সহসা যে কোন একটি কন্যাকে মনোনীত করিবেন ও তাঁহাকে বাধা হইয়া তাহাকেই বিবাহ করিতে হইবে, এই সব কথা ভাবিতে ভাবিতে তিনি বড়ই ক্রুদ্ধ হইয়া পড়িলেন।

সরোজকুমার হির করিলেন—তিনি পত্রের জবাব দিবেন না; বাড়ীও যাইবেন না, কিন্তু বেদিন পিতার দ্বিতীয় পত্র আসিল, সেদিন বন্ধের ভবিষ্যৎ সংস্কারক তাহা অগ্রাহ্য করিলেও তাহার অন্তরের বালকটি পিতার ডাকে সাড়া না দিয়া থাকিতে পারিল না।

বাড়ীতে আসিয়া তিনি দেখিলেন—বিবাহের উৎসব-আয়োজন চলিতেছে। সকলের মুখেই একটা আনন্দের চিহ্ন বর্তমান। সরোজকুমার মুখখানা গম্ভীর করিয়া আপনার কক্ষে আসিয়া বসিলেন।

অপরাহ্ণে কাল্পনের অসংযত বাতাসনহবতের ইমন্ তুপালী সুরের সঙ্গে সঙ্গে হিম্মোলিত হইয়া উঠিতেছিল। এমন সময় পালের বাড়ীর কিরণ দিদি আসিয়া বলিলেন “সরোজ, তোর সঙ্গে কার সপক্ষ হইয়াছে জানিস?”

সরোজকুমার বলিলেন “কি, এ বিবাহের কোন কথাই ত আমি জানি না।”

কিরণ দিদি বলিলেন “ও পাড়ার নন্দখুড়োর মেয়ে গৌরীকে দেখিয়াছিস ত?”

সরোজকুমার বলিলেন “না দেখিলেও চলিত, বিবাহ ত বন্ধ থাকিত না।”

কিরণ দিদি বুঝিলেন—বিবাহের সপক্ষ-ব্যাপারে সরোজের সহিত কোন পরামর্শ করা হয় নাই বলিয়া তিনি একটু চটিয়াছেন।

কিরণদিদি কোন কথা চাপিয়া রাখিতে পারেন না। কাজেই কথাটা ক্রমশঃ কতীর কাছে উঠিল।

কর্তা গ্রামের জমিদার, পূর্বপুরুষের ধনরাশি সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিতে

না পারিলেও তাঁহার বংশের মর্যাদা তিনি কখনও একটুও ক্ষুণ্ণ হইতে দেন নাই । নূরনপুরের চৌধুরীবংশ দাতা ও ভদ্রানক জ্যেষ্ঠী বলিয়া বিখ্যাত ; কর্তাও দানশাল ছিলেন, কিন্তু একবার রাগিলে কেহ তাঁহার সম্মুখে পাড়াইতে পারিত না ।

সরোজকুমার, তাহার ছোট ছোট ভাইভগ্নী ও পাড়ার দুই একজন বর্ষীয়সী একটি কক্ষে এসিয়া আছেন, এমন সময় খড়মের শব্দে সকলকে চকিত করিয়া কর্তা সেখানে উপস্থিত হইলেন, গভীর স্বরে ডাকিলেন “সরোজ ।”

সরোজ বাহিরে আসিয়া পাড়াইলেন ।

কর্তা বলিলেন “দেখ সরোজ, আমারই বাবস্থানুসারে তুমি আজ এম, এ পাশ করিয়াছ, এখন আমার বাবস্থামতে তোমার বিবাহও হউক ইহাই আমার ইচ্ছা ; শুনিলাম—আজ তোমার ইচ্ছার সহিত আমার ইচ্ছার মিল হয় নাই বলিয়া তুমি চাঃখিত । যাই হোক, এখন তোমার বিবাহ দিবার ভার হইতে আমাকে মুক্ত থাকিতে বল কি ?”

সরোজকুমার বলিলেন “আমি ত আপনাকে কোন কথাই বলি নাই ।”

কর্তা বলিলেন “আমি সে অধিকার এখনও তোমাকে দিতে ইচ্ছা করি না । তুমি অন্য কাহারও নিকট আপনার মনোভাব প্রকাশ করিয়াছ ।”

সরোজকুমার বলিলেন “আমি কাহাকেও কোন কথা বলি নাই ।”

কর্তা বলিলেন “মিথ্যা কথা ; যাহার নিকট আমি শুনিয়াছি, তাহার কথা অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ দেখিতে পাই নাই, তাই তোমার নিকট আসিয়াছি, নচেৎ আসিতাম না ।”

সরোজকুমার চূপ করিলেন । কর্তা বলিলেন “বল, তোমার বিবাহের সম্বন্ধ কি ভাবিয়া দিব ?”

সরোজকুমার বলিলেন “আপনি যাচা করিবেন, তাহাই হইবে ।”

কর্তা বলিলেন, “ভাবিয়া দেখ, তোমাকে দুই দিন সময় দিলাম—আমি একটা যা তা কথা শুনিতে চাই না ।

খড়মের শব্দে স্ত্রক হানটিকে মুখরিত করিয়া কর্তা চলিয়া গেলেন ।

২.

সরোজকুমার বিবাহে আপত্তি প্রকাশ করিলেন না । যথাসময়ে বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল ।

গৌরী পরিচের কন্যা ; তাহার পিতা শতরেরই জমীদারীতে কাজ করিতেন ।

কিন্তু বিবাহের পর কষ্ঠা তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন “দেখ রামমোহন, তোমার সঙ্গে আর প্রভু-ভক্তের সম্পর্কটা রাখিতে চাই না। লক্ষীপুরের উত্তরলিকের রমীটা তোমাকে দিলান, তবে তাই এক একবার দয়া করিয়া আমার জমীদারীটা দেখিতে হইবে।” সেই অবধি রামমোহন আর কষ্ঠাকে মুখে মনিব বলিয়া স্বীকার করিতেন না বটে, কিন্তু কার্যো তাঁহার দাসাশ্রুদাস হইয়া রহিলেন।

দরিত্রের কল্যা হঠাৎ জমীদারের গৃহে আসিয়া প্রথমটা ত্রুটি টকিত হইয়া উঠিল। তারপর স্বস্তরের বেহ, দেবর ও ননদের ভালবাসা তাহাকে জমীদারঘরের বড় বধু করিয়া তুলিল।

বিপুল সংসারকে কর্ত্তীহীন করিয়া যেদিন গৃহিণী ঠাকুরাণী মৃত্যুতরঙ্গ ভাসিয়া গেলেন, সেইদিন হইতে কষ্ঠা একট উপযুক্ত পুত্রবধূর অঙ্গসন্ধান করিতেছিলেন।

নিজের দিকে তিনি দৃষ্টিপাত করিতেন না, থান কাপড় ও নানাবলী পরিধান করিয়া অবসরের অধিকাংশ সময়টুকু ঠাকুরদেবতার পূজা আরাধনা লইয়াই থাকিতেন; এই সময়ে গৌরী স্বস্তরের সেবাশ্রম আরাধ্য করিল। আর তাঁহার যত্নের ত্রুটি রহিল না; স্বস্তরের আহারের সময় সে কন্যার মত কাছে বসিয়া থাকিত, যাহাতে স্বস্তরের কোন বিষয়ে সামান্য অসুবিধাটুকু না হয় তাহার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিত। এই জন্য স্বস্তর মাঝে মাঝে বলিতেন “বউটি আর জন্মে আমার মা ছিল।”

গৌরী বিপুল চৌধুরী পরিবারের কর্ত্তীর পদটা ক্রমশঃ বিনা চেষ্টায় অধিকার করিয়া ফেলিল; কাহারও ভয়ী, কাহারও কন্যা, কাহারও দাসীর অভাব পূরণ করিয়া সংসারের মধ্যে আপনাকে টুকরা টুকরা করিয়া বিলাইয়া দিল, সকলের মন সে আকর্ষণ করিল, কেবল সরোজকুমারের সহিত তাহার সম্পর্কটা কেমন শিথিল হইয়া গেল।

দাস, দাসী, ভ্রাতা, ভয়ী, সকলেই কথায় কথায় তাহার নিকট ছুটিয়া আসে, সেও তাহাদের যত্ন করিয়া তাহাদের সহিত মিলিয়া মিশিয়া দিনের পর দিনগুলি স্বচ্ছন্দে কাটাইয়া দিতেছে—এই সব দেখিয়া শুনিয়া সরোজকুমার একদিন ভাবিলেন—পিতা তাঁহার বিবাহ দিয়া কন্যাটিকে সংসারের কর্ম্মতরঙ্গের দাসী করিয়া তুলিয়াছেন, তাঁহার চক্ষে বধু অপেক্ষা সংসার বড়, সেই জন্য তাহার প্রয়োজনের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ না করিয়া, তাহার স্বাতন্ত্র্যটুকু নিঃশেষ করিয়া রাখিয়াছেন, তাহার প্রতি মাঝে মাঝে যে যত্ন প্রকাশ করেন, তাহা কেবল অবলাটিকে সংসারের যুগকাণ্ডে বলি দিবার জন্য।

শুধু সরোজকুমার একথা বুঝিল না । একদিন পূর্ণিমার অম্লান-শুভ্র জ্যোৎস্নার পরিপ্লুত উঠানের প্রান্ত হইতে হেনার গন্ধ যখন তাহার অন্তরে একটা আকস্মিক চঞ্চলতা আনিয়া দিল, তখন গৌরীও বুঝিল—এত আনন্দ, এত প্রতিপত্তির মধ্যেও তাহার অন্তরে কি একটা অর্ভাবের বেদনা সঞ্চিত রহিয়াছে ।

দরিদ্রের কন্যা জমীদারঘরের বড় বধু ও গৃহিনী হইয়া প্রথমে যে আনন্দের স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছিল, সহসা তাহার গতি প্রতিহত করিয়া অন্তরের কোনখানে এই বেদনা কখন জাগিয়া উঠিল তাহা সে বুঝিতে পারিল না । কিন্তু বিচক্ষণ শ্বশুর মহাশয় তাহার প্রতি লক্ষ্য করিলেন, পুত্র ও পুত্রবধুর চালচলন দেখিয়া তিনি কতকগুলি কথা ভাবিয়া লইলেন ।

একদিন ঠাকুরপুঞ্জা শেষ করিয়া গৃহকর্ত্তা কক্ষের বাহিরে একখানা আসনের উপর উপবেশন কুরিয়াছেন, এমন সময় বধু তাহার জলযোগের জন্য কিছু মিষ্টান্ন সম্মুখে রাখিয়া গেল । শ্বশুর মহাশয় জলযোগের পর বধুকে কাছে ডাকিয়া বলিলেন “বউমা, তোমার সঙ্গে আমার কয়েকটা কথা আছে ।”

বধু মাথাটি নীচু করিয়া বলিল “কি বাবা ?”

শ্বশুর মহাশয় বলিলেন “দেখ মা, তুমি আমার ঘরের লক্ষ্মী, চৌধুরী পরিবারের মা হইয়া তুমি দীর্ঘজীবী হও, ভগবানের কাছে ইহাই আমার প্রার্থনা—”

এই ভূমিকাটি শুনিয়া বধু একটু চকিত হইল । শ্বশুর মহাশয় বলিতে লাগিলেন “কিন্তু বউমা তোমাকে একটা কথা বলিব ।”

বধু বলিল “কি বলুন না বাবা ?” শ্বশুর মহাশয় বলিলেন “দেখমা, শুধু সংসারের স্ববন্দোবস্ত করাই স্ত্রীর ধর্ম নয় ; মা, তুমি এতবড় সংসারটিকে বশে আনিয়াছ, কেবল আমার হতভাগা ছেলেটিকে বুশে আনিতে পারিলে না ?”

গৌরী মুখ অবনত করিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল । একটা সঙ্কোচ ও বিবর্তনের সহসা তাহার মুখ মলিন হইয়া গেল ।

গৃহকর্ত্তা চলিয়া গেলেন । বধু আপনার কক্ষে প্রবেশ করিয়া চৌধুরী পরিবারের কর্ত্তব্য বিষ্মত হইয়া বালিকার মত শয্যায় মুখ লুকাইয়া অনেকক্ষণ পড়িয়া রহিল । তারপর হৃদয়ের সকল আবেগ দমন করিয়া যখন সে বাহিরে আসিল তখন, স্পষ্ট বুঝিতে পারিল—শুধু চৌধুরী পরিবারের জন্ত প্রাণপন পরিশ্রম করার চেয়েও একটা শ্বশুরের কাজ তাহার আছে । সে কাজ পরের জন্ত নয়, সে কাজ আপনার জন্ত, শুধু আপনার স্বপ্ন-স্বচ্ছন্দতার জন্ত !

এতদিন সে চৌধুরী পরিবারের মধ্যে আপনার আসনটিকে প্রতিষ্ঠিত করি-
বার নেণায় মাতিয়া উঠিয়া এদিকে দৃষ্টিপাত করিবার অবসর পায় নাই, আজ
সে বুঝিল—সে সত্য সত্যই একটা ভুল পথে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে,
এখন এমন একটা স্থানে উপনীত হইয়াছে যেখান হইতে তাহার অন্তরের
ঈশ্বরিত জ্বিনিসটি মোটেই দৃষ্টিগোচর হয় না। বিবাহরাত্রে, কথা মনে
পড়িল। জমিদারের বাড়ী বিবাহ এই কথাটাই তাহার অন্তরে এমন একটা
ঝটিকা আনিয়া দিয়াছিল, যাহাতে তাহার বিবাহের পরবর্তী জীবনের স্বপ্নস্বপ্নটুকু
শরতের স্নান শুভ্র মেঘখানির মত একটুও স্থির হইতে পারে নাই। আজ সে
বিপুল পরিবারের মধ্যে দৃঢ় প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া নববধূর ভাবনা ভাবিয়া-ভাবিয়া
দেখিল—বিবাহের পর দীর্ঘ তিন বৎসর বার্থ হইয়া গিয়াছে।

(৪)

সরোজকুমার ঐশ্বের ছুটির সময় বাড়ী আসিয়া দেখিলেন—তখনও বসন্তের
শেষ চিহ্ন বর্তমান—তবে পৃথিবীর উপর যে পূজার উপকরণগুলি সজ্জিত ছিল,
তাহার গন্ধপুষ্প পূজাস্থে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া হোমানলে মলিনশ্রী ধারণ
করিয়াছে।

রাত্রে শয়নকক্ষে প্রবিষ্ট হইয়া তিনি দেখিলেন—তাঁহার শয্যা রচনায়
একটু নুতনত্ব রহিয়াছে—আজ বর স্নগদে পরিপূর্ণ। সরোজকুমার পূর্বে গৃহ-
কর্মরতা গৌরীর সাক্ষাৎ বড় একটা ল করিত না। আজ অলক্ষণ অপেক্ষা
করিতে-না-করিতেই সে গৃহকর্ম শেষ না করিয়াই শয়নকক্ষে উপস্থিত হইল।
পূর্বে কর্মরাস্ত শরীরে সঙ্কোচনত মুখে সে শয়নকক্ষে প্রবেশ করিত, তখন এক
দিনও বেশের পরিপাটোর প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিবার অবকাশ নাই। আজ
সরোজকুমার দেখিলেন—সে তাহার বিবাহবাসরের কাপড়খানি পরিধান করিয়া
গৃহসংলগ্ন উজানের বসন্তসম্ভারের অবশিষ্ট কয়েকটি নীর্ণ কুসুমের মাথো কে-
বন্ধন যথাসম্ভব শোভিত করিয়া চিরাগত অতিথির মত সজ্জিত হুদয়ে দাঁড়াইয়া
আছে। সরোজকুমার তাহার নীরব অবনত মুখে অন্তরের অন্তরতম কথাগুলি
স্পষ্ট শুনিতে পাইলেন। গৌরী যাহা এতদিন শুধু কল্পনায় ভরিয়া রাখিয়াছিল,
যাহা না পাইয়া এত সমৃদ্ধি, এত গৌরব, এত প্রতিপত্তির মধ্যেও আপনাকে
দীনদরিদ্র ভাবিয়াছিল, সেই স্বামীর আদর লাভ করিয়াও তাহার আশ্বাদ গ্রহণ
করিতে পারিল না।

পরদিন সে সংসারের কাজে পূর্বাপেক্ষা অধিক মনোনিবেশ করিল। শয্যা

রচনা ও বেশভূষায় আর তাহার নূতনত্ব দেখা গেল না। আবার সে কর্ণের শ্রোতে আপনাকে অসহায় ভাবে ডানাইয়া দিতে দ্বিধা করিল না।

যথাসময়ে সরোজকুমার কলিকাতায় চলিয়া গেলেন। গৌরীরও সংসার কর্ণের নেশা কাটয়া গেল। সরোজকুমার তাহা দেখিতে আসিলেন না, তিনি ভাবিলেন—সে চৌধুরী পরিবারের মধ্যে আপনাকে নিমজ্জিত করিয়া তাহার সংকীর্ণ গভীর মধ্যে আপনার সমস্ত চেষ্টাবৃত্তকে আবদ্ধ করিয়া আত্মঘাতী হইয়াছে।

সরোজকুমার আবার গৃহে আসিলেন, তখন গৌরী আবার উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। কিন্তু তারপর যখন স্বামী জীর নিকট আসিল, তখন জীর প্রত্যাশিত উৎফুল্লতা সহসা বিলীন হইয়া গেল।

কেন না সেদিন রাত্রে সরোজকুমার জীকে বলিয়াছিলেন “তোমাকে মাটির পুতুল বলিয়া বোধ হয়, তোমার প্রাণ নাই, তেজ নাই, কোন বিষয়ে কোন মতামত নাই, আমার একটি জী-বন্ধু আছেন তিনিই এমন নন?”

জী বন্ধুটা কিরূপ তাহা গৌরী বুঝিতে পারে নাই, কাজেই কথটা তাহার একটা জীমূলভ আকুলতা আনিয়া দিয়াছিল।

সরোজকুমার কলিকাতায় চলিয়া গেলেন, সে ভাবিল—সে দরিদ্রের কষ্টা কোন মতেই জমীদারপুত্রের অর্দ্ধাঙ্গিনী হইবার উপযুক্ত নয়। স্বামী যে তাহাকে পছন্দ করিবে না একথা ত অসম্ভব নয়। পিতামাতা বলিয়াছেন—গৌরী ভাগ্যবতী, কিন্তু আজ সে মনে করিল—জমীদারঘরের বধূ হইবার সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হইলেই সে আপনাকে ভাগ্যবতী মনে করিতে পারিত।

দিনকতক সে খুব বিমর্ষ ভাবে পরের মত বাড়ীর এদিকে-সেদিকে ঘুরিয়া বেড়াইল, এক দিন গৃহকর্ত্তা তাহাকে বলিলেন “বৌমা, তোমাকে এত বিমর্ষ দেখিতেছি কেন?”

বৌমা “কিছু ত হয়নি বাবা” বলিয়া কক্ষে প্রবেশ করিল, তারপর আর সে অশ্রুজল সংবরণ করিতে পারিল না।

অনেক দিন কাটয়া গেল, তবুও সরোজকুমার বাড়ী ফিরিলেন না। পিতা পত্র লিখিলেন, পুত্র উত্তর দিল—আমি পড়াশুনার ব্যস্ত আছি; দিন কতক পরে পিতা লিখিলেন—বন্ধ হইয়াছে, পড়াশুনা ছাড়াও অস্ত্র কাজ আছে, ভূমি বাড়ী আসিবে। পুত্র লিখিল—বাড়ী গেলে আমার কতকগুলো কাজের ক্ষতি হইবে। দিনকতক পরে পিতা একখানি রেজেষ্টারী খামে পুত্রকে লিখিলেন—আগামী

১লা আশ্বিন তুমি যদি বাড়ীতে না আস, জানিয়া রাখিও ভবিষ্যতে আমার সহিত তোমার কোন সম্পর্ক থাকিবে না।

(৪)

সরোজকুমার কলিকাতায় নব্য সঙ্গীতের সঙ্গীত করিয়া শান্ত গ্রামে জীবনকে খুবই সুগার চক্ষে দেখিয়াছিলেন। আচারনিষ্ঠ পিতাকে দেখিয়া অনেক সময়ে তাহার মনে হইত—তিনি একটা ভুল পথ ধরিয়া চলিয়াছেন। বাড়ীতে শালগ্রাম শিলা ছিল, পিতা যখন নামাবলী পরিয়া ঘণ্টা নাড়িতে-নাড়িতে তাহার আরতি করিতেন, তখন সরোজকুমার ভাবিতেন—শালগ্রামের আরতি করিয়া কোন লাভ নাই, শিলাখণ্ড কখনও ভগবান হইতে পারে না—এ সব কথা জানিয়া শুনিয়াও লোকে সত্যের চেয়ে মিথ্যাকে প্রার্থ্য দেয় কেন? পিতা গোড়া হিন্দু; শূদ্রের বাড়ীতে আহার করেন না; ভগবান ব্রাহ্মণ শূদ্রকে ভিন্ন করিয়া গড়েন নাই, তবুও মাছুষ এমন বাধাধরা নিয়ম প্রস্তুত করিয়া সমাজকে নিষ্পেষিত করিতে চায় কেন?

দুগ্ধ অদূরদর্শী যুবক—যাহা ভাবে তাহাই কাজে পরিণত করিতে চায়। পিতার উপর যখন তাহার একটা ক্রোধ ক্রমশঃ প্রবৃদ্ধ হইয়া উঠিতেছিল, পিতা যখন তাহার সম্মতে তাহারই জন্য একটা বিবাহসম্বন্ধ স্থির করিয়া নিজের ইচ্ছা কার্ণে পরিণত করিলেন, তখন তিনি যথাসময়ে বাধা না দিতে পারিয়া এমন একটা কাজ করিতে চাহিলেন, যাহাতে পিতার অব্যাহত অসংগত শক্তি নিতান্ত নিষ্ঠুর ভাবে প্রতিহত হয়। পিতা যাহার সহিত তাহার বিবাহ দিলেন, তাহাকে তিনি গ্রাহ্য করিলেন না, বাড়ী না আসিয়া পিতার অবাধ্য হইলেন, তারপর আরও একটা এমন কাজ করিয়া বসিলেন, যাহার জন্য পিতার সহিত তাহার চিরবিচ্ছেদ ঘটিবার সম্ভাবনা হইল।

বালেশ্বর জেলার একটি গ্রামের এক দরিদ্র পরিবার সহসা কলিকাতার ব্রাহ্মসমাজের নব্য তত্ত্বে দীক্ষিত হইয়া পড়িলেন। তাহার পুত্রাতন সমাজের খোলস ছাড়িয়া সবে মাত্র নূতন সমাজের পরিচ্ছদ মাঝে মাঝে পরিতে চেষ্টা করিতেছেন, অল্পকরণের পালা এখনও শেষ হয় নাই, এমন সময় হঠাৎ সরোজকুমারের সহিত তাহাদের আলাপ হইল। পরিবারের সকলের চেয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করিল—একটি কন্যা। সে স্ববর্ণরেখার কুলে কুলে বালি অঙ্ক করিয়া হাসিয়া খেলিয়া বেড়াইত, হঠাৎ কলিকাতার জাঁক-জমক অথবা তাহার বয়স সর্বশরীরে একটু অহুতবযোগ্য দীপ্ততা আনিয়া দিয়া-

ছিল । সরোজকুমার তাহার শিক্ষার ভার গ্রহণ করিলেন, তারপর স্ত্রীলোকের যে ভাবে শিক্ষিত হওয়া উচিত, সেই ভাবে তাহাকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন ।

সরোজকুমারের পড়াশুনা একপ্রকার বন্ধ হইয়া গেল, সে দিনে ও রাতে মুরলার শিক্ষাকার্য্যে ব্রতী হইল ।

এই সময় একদিন সে গৃহে যায় নাই বলিয়া পিতার পত্র পাইল । সেই দিন সে যৈ কন্যার পাণিপ্রার্থী একথা মুরলার পিতাকে জানাইয়াছে, মুরলার পিতাও তাহাতে অসম্মতি প্রকাশ করেন নাই । ক্রমশঃ ১লা আশ্বিন বিবাহের দিন স্থির হইয়া গেল ।

মুরলার পিতা অমুসন্ধান করিয়া যখন জানিতে পারিলেন—তাঁহার ভাবী জামাতা বিবাহিত, তখন তিনি বিবাহ বন্ধ করিতে উদ্যোগী হইলেন । কিন্তু কোন ফল হইল না । ১লা আশ্বিন সরোজকুমার ও মুরলা অদৃষ্ট হইয়া গেল । মুরলার পিতা এই সব কাণ্ড দেখিয়া অবাক হইয়া পড়িলেন, ঘটনাটা যথাসম্ভব গোপন রাখিয়া কন্যার অমুসন্धानে প্রবৃত্ত হইলেন । দুই তিন দিন পরেই তিনি পত্র পাইলেন—সরোজকুমার ও মুরলা তাঁহার গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে ও প্রচার করিয়াছে তাঁহারা পরস্পর বিবাহহুজে আবদ্ধ । এই হৃদ্যস্ত হুঃসাহসিক সুবকের কার্য্যে ভীত হইয়া ও কন্যার অন্যত্র বিবাহ হইলে গ্রামে যে কথা প্রচার হইয়াছে তাহাতে সকলেই মুরলাকে নিন্দনীয় মনে করিবে স্থির করিয়া মুরলার পিতা কন্যার সহিত সরোজকুমারের বিবাহ দিতে প্রতীকৃত হইলেন ।

১০ই আশ্বিন বিবাহ শেষ হইয়া গেল । ১২ই আশ্বিন সরোজকুমার পিতাকে অপমানিত করিবার জন্যই নববধূর সহিত পিতালয়ে উপস্থিত হইলেন ।

(৬)

তখন রাত্রি দশটা ; বাহিরে একখানি গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল, মুরলার অবিরত ঘা পড়িতে লাগিল ।

স্বি আসিয়া দ্বার খুলিল । কর্তা খাটের উপর বসিয়া উপনিষৎ আবৃত্তি করিতেছেন, তিনি চীৎকার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন “কে আসে ?”

স্বি বলিল “দাদাবাবু” । কর্তা বলিলেন “মরজা বন্ধ করিয়া দাও, আসিতে দিও না ।”

স্বি বলিল “সঙ্গে একটি মেয়ে ।”

কর্তা চাপা গলায় বলিলেন “কতটা কে জিজ্ঞাসা কর ।”

স্বি বলিল “বউ গো, বাবা, তোমার বউ ।”

কর্তা দৃঢ়স্বরে বলিলেন “আমার বউ গরে আছে, উহার চলিয়া যাক।”

এরূপ ঘটনা যে একটা নিশ্চয়ই ঘটবে তাহা পূর্বেই বুঝিয়া সরোজকুমার একটা আশ্রয় ঠিক করিয়াছিলেন। গাড়ী সেইখানে চলিয়া গেল। কর্তা শাকরভাবো মনোনিবেশ করিলেন।

গৌরী সব কথাই শুনিла। যন্ত্রচালিতের মত গৃহকর্ষ করিতে করিতে সে আপনাতর শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল; সমস্ত রাত্রি তাহার নিদ্রা হইল না।

মুরলাকে লইয়া দিন কতক পার্শ্ববর্তী গ্রামে বাস করিয়া সরোজকুমার কলিকাতায় একটি স্কুলে শিক্ষকের কার্য্য করিতে আরম্ভ করিলেন। এখন মাসিক পথে প্রবেশ লেখাই তাহার বিশেষ কার্য্য হইয়া পড়াইল।

এই সময়কাল সাংসারিক জীবনের ইতিহাসটা আমরা ভাল করিয়া জানিতে পারি নাই। তবে এটুকু শুনিয়াছিলাম—সরোজকুমার যদি পিতার উপর না রাগিত, তাহা হইলে বোধ হয় এই কল্যাণকে বিবাহ করিত না। মুরলা সন্দেহী ছিল—কিন্তু হিন্দুধর্মের বাঙ্গালী মেয়ের মত সেও কতকটা পুত্রলিপাকৃষ্টি অবলম্বন করিয়াছিল।

তবে গৌরীর মত সে নীরব, শান্ত ও ধীর ছিল না। কথাই, হাতের ও চালচলনে তাহার এমন একটু বিশেষত্ব ছিল, যাহাতে সরোজকুমার নবাতার এতটা অন্ধ পক্ষপাতী না হইলে মুগ্ধ হইতে পারিত। কিন্তু মুরলা যখন আসিল, তখন সরোজকুমারের অন্তরে যে বিষেব-বলি জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, তাহা প্রশমিত করিয়া স্বামীর উপর আপনাতর আধিপত্য বিস্তার করিবার উপযোগী গুণ তাহার ছিল না, অথবা সে গুণ থাকিলেও তাহা কার্য্যে প্রকাশ করিবার ক্ষমতা তাহার অল্পই ছিল; কেননা ক্রম পিতামাতার সম্বন্ধ বলিয়া তাহার স্বাস্থ্য ভাল ছিল না, বিবাহের পর সহসা তাহার দেহে যে লাভণ্য পুঞ্জীভূত হইয়াছিল, কিছুদিন কাটিতে-না-কাটিতেই তাহা ক্রমশঃ মলিন হইতে আরম্ভ করিল।

মাতার ছিল যক্ষ্মারোগ; সেই জন্য কল্যাণ থাকিয়া থাকিয়া প্রায়ই বুকের রোগে কষ্ট পাইত; ক্রমশঃ সে ক্লম হইতে লাগিল। সরোজকুমার প্রথম প্রথম তাহাকে বিশেষ যত্ন করিতেন; কিন্তু যত দিন কাটিতে লাগিল, ততই নূতন পক্ষীর প্রতি তাহার আকর্ষণ একটু একটু করিয়া কমিয়া আসিল।

মুরলা সপক্ষীকে দেখিতে ইচ্ছা করিত; সেও যে তাহারই মত অনাদৃত তাহার ইতিহাস সে কতকটা শুনিয়াছিল। সে বুঝিল—নীচই তাহাকেও গৌরীর দশায় উপনীত হইতে হইবে। তবে গৌরীর আশ্রয় আছে; তাহার যে পিতামাতা

পরিদ্র হাঙ্গ, পুড়িয়া • দগ্ন হইলেও তাহার অতৃপ্ত ছাড়া আর আশ্রয় নাই ।

একদিন শীতের রাত্রে মোটর গাড়ীতে চড়িয়া স্বামী-স্ত্রী সাংস্রমণে বহির্গত হইয়াছিলেন, বাড়ী ফিরিয়া দেখিলেন—মুরলার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছে, তিনি বলিলেন “সামান্য শীতে এত কাঁপিতেছে, কিরূপ তোমার শরীর ?” মুরলা বলিল “গাড়ীতে বড়ই ঠাণ্ডা লাগিয়াছে ।”

পরদিন মুরলার অর হইল ; কাশীর সঙ্গে সঙ্গে সে বুকে একটা বেদনা অনুভব করিল । সরোজকুমার দেখিলেন—মুরলাকে যত্ন করিবার লোক তিনি ছাড়া আর কেহই নাই । অথচ তাহাকে রীতিমত দেখিতে হইলে সকল কাজ পরিত্যাগ করিতে হয় । পিতা খরচ পাঠাইতেন না ; কাজেই তিনি কন্ঠত্যাগ করিতে পারিলেন না । তিনি একবার গৌরীকে আনিবার সঙ্কল্প করিলেন, কিন্তু তখনই মনে হইল—পিতা তাহাকে পাঠাইবেন না ।

কেন পাঠাইবেন না ? আমার স্ত্রীকে ঘরে বন্দি করিয়া রাখিবার কি অধিকার তাহার আছে ? এই কথাগুলি হঠাৎ একবার সরোজকুমারের অন্তরের কোধবহিঃ প্রকল্পিত করিয়া দিল ।

মুরলার অর বাড়িতে লাগিল ; বাড়ীতে একটু ঝি ; সে মাঝে মাঝে আসিয়া তাহাকে ঔষধ পাওয়াইয়া যাইত ; সন্ধ্যার পর সরোজকুমার তাহার কাছে আসিয়া বসিতেন ।

এইরূপে কিছুদিন কাটিবার পর সরোজকুমার রোগীর সেবা করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন । একদিন মুরলা একটু সুস্থ ছিল, সে দিন কথায়-কথায় তিনি তাহাকে বলিয়া ফেলিলেন—তোমাকে বিবাহ করিয়া অবধি একদিনও নিশ্চিন্ত হইতে পারিলাম না ।

কথাটা মুরলার অন্তরে দারুণ আঘাত করিল, সে বলিল “আমি বুঝিতেছি—আমাকে লইয়া তুমি কষ্ট পাইতেছ ; ভগবান যদি একটু শীঘ্র আমার মৃত্যুর ব্যবস্থা করেন, আমি সুখী হই ।”

সরোজকুমার বলিলেন “আমি সে কথা ভাবিতেছি না, তবে তুমি সুস্থ হইলে আমার আর কোন দুঃখই থাকে না ।”

মুরলার শুক মুখমণ্ডলে চক্ষু ছুটি উজ্জলতর হইয়া উঠিল, সে বলিল “যদি সুস্থ না হই”—

সরোজকুমার বলিলেন “তুমি নিশ্চয়ই সুস্থ হইবে ।” আর একদিন অপ-

রাছে মুরলীর কক্ষের বাহিরে ছাদের উপর একটি আত্মবৃক্ষের নিবিড় ছায়া প্রসারিত হইয়াছে; কোথা হইতে বাতাসের সঙ্গে একটা স্বগন্ধ কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়া বাহিরে যাইবার পথ পাইতেছে না, এমন সময় মুরলা স্বামীর পাছটি জড়াইয়া বলিল “দেখ, আমি বাঁচিব না, আমার একটা কথা রাখিবে?”

সরোজকুমার বলিল “কি?”

মুরলা বলিল “সপত্নীকে আমি দেখি নাই, তাহার সহিত যাহাতে আমার দেখা হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে পার।”

সরোজকুমার বলিলেন “কেন?”

মুরলা বলিল “কেন বলিতে পারিব না, বোধ হয় তাহাকে দেখিলে আমার মনোনাশ কবিবে।”

সরোজকুমার বলিলেন “তুমি ছঃখ করিও না; আমি স্ত্রীত্যাগ ইচ্ছা পূর্ণ করিব।”

তখন অপরাহ্নের সূর্য্য পশ্চিম আকাশ রক্তবর্ণে রঞ্জিত করিয়া; রুদ্রিরাগ্নুত আসন্নমৃত্যু অবসর সেনাধীর মত ক্রমশঃ নিশ্চল হইয়া আসিতেছিল। সরোজ-কুমার জানালায় পাশে দাঁড়াইয়া নিশ্চলভাবে অনেকক্ষণ সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন।

(৭)

প্রভাতে যি একখানি পত্র আনিয়া দিল। গৌরী তাহা পাঠ করিয়া বৃথিল —স্বামী তাহাকে বিস্তর অনুন্নয় করিয়া জানাইয়াছেন—কোন উপায়ে স্বপ্তের অনুমতি লইয়া তাহাকে কলিকাতায় স্বামিগৃহে আসিতে হইবে।

স্বামীর নিকট তীব্র অপমান লাভ করিয়াও সে তাহার অভাবে ছঃখ অনুভব করিত, তবুও এই নিমন্ত্রণপত্রটি সে সাগরে গ্রহণ করিতে পারিল না। সামান্য একটু কাগজে কয়েকটা অক্ষর তাহার অন্তরঙ্গমণ্ডিত নিবিড় বেদনাকে চঞ্চল করিয়া তুলিল।

গৌরী পত্রটি লইয়া একমনে পড়িতেছে, সহসা তাহা কর্তার নজরে পড়িল। তিনি বলিলেন “কে পত্র দিল, বোমা।”

গৌরী কোন কথা বলিতে পারিল না। কর্তা বলিলেন “কে মা? সরোজ কি কিছু লিখিয়াছে।”

গৌরী ঘাড় নাড়িয়া বলিল “হাঁ, বাবা।”

কর্তা বলিলেন “কি লিখিয়াছে বল ত মা।”

গৌরী বলিল “আমাকে কলিকাতায় যাইতে বলেন ।”

কর্তা বলিলেন “তোমার যাইতে ইচ্ছা করে, জমিদারপুত্রের খোঁজামোদ করিতে রাজী আছ ?”

গৌরী চুপ করিয়া রহিল । তাহার মুখে একটা ভেজ, একটা দৃঢ়প্রতিজ্ঞার কঠোরতা ফুটিয়া উঠিল ।

কর্তা বলিলেন “আমি ইচ্ছা করি মা, তুমি যাও ; কিন্তু সেই হতভাগা ছেলের কাছে যে অপমান তুমি মাথা পাতিয়া লইয়াছ, তাহার পর, তোমাকে আবার তাহার কাছে যাইতে বলিবার সাহস নাই ।

গৌরী স্থিরভাবে অনেকক্ষণ মাথা নত করিয়া বসিয়া রহিল, তারপর বলিল “বাবা, আপনার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক ।”

পরদিন প্রভাতে কর্তা লোকজন সঙ্গে দিয়া বধুকে স্বামিগৃহে পাঠাইয়া দিলেন ।

স্বামী কেন ডাকিয়াছেন, গৌরী তাহা বুঝিতে পারে নাই ; তবুও স্বস্তির ইচ্ছায় মনের সমস্ত কালিমা মুছিয়া ফেলিয়া যখন সে পথে অগ্রসর হইতেছিল তখন প্রতি মুহূর্তে একটা প্লকের আবেগও অন্তরে স্পন্দিত হইতে লাগিল । সেদিন শরতের আকাশে একটুও মেঘ ছিল না । স্বর্ঘ্যের আলোকে, বৃক্ষতার শ্রামল আভায়, ধূলিহীন বাতাসে যে প্রসন্নতা প্রকাশ পাইতেছিল, ক্রমশঃ তাহা গৌরীর অন্তরেও প্রসারলাভ করিতে লাগিল । গাড়ীর ফাঁক দিয়া সে দেখিল—দুই দিকে দিগন্তচুম্বী হরিৎশস্যক্ষেত্র বায়ুতরে তরঙ্গিত হইয়া উঠিতেছে ; মাঝে মাঝে এক একটা দীর্ঘ সরল বাশের গাছ ; দেখিতে দেখিতে তাহার অন্তরে কি একটা ভাব আগিয়া উঠিল—মুখ অঞ্চলে আবৃত করিয়া সে চোখ বুজিল ; সে মনে করিল—স্বামী যদি তাহার সহিত ভাল করিয়া কথা না কয় তাহা হইলেত তাহার হৃৎকের অবধি থাকিবে না ।

স্বামীর জন্ত তাহার প্রাণ বহুদিন হইতেই ব্যাকুল হইয়া আছে । কেবল তাহার নিষ্ঠুর ব্যবহার স্মরণ করিয়া যে মাঝে মাঝে মর্মের বেদনাকে দমন করিতে চেষ্টা করিত । মাঝে মাঝে স্বামীর প্রতি একটা দারুণ ক্রোধও তাহার হৃদয়ে জ্বলিয়া উঠিত ।

হঠাৎ সে একটু রাগিয়া গেল, ভাবিল স্বামী যদি তাহার সহিত ভাল করিয়া কথা না কয়, তাহা হইলে হৃৎকের কোন কারণ নাই । সেত চিরকালই অনাদৃত, আজ ত সে স্বামীর আদর পাইবে, বলিয়া কলিকাতায় যাইতেছে না । স্বামী

ডাকিয়াছেন, তাঁহার কান্না আছে, সেই কান্না—শুধু কণ্ঠব্যটুকু করিতে সে ঘাইতেছে; কণ্ঠব্য শেষ হইলে আবার ফিরিয়া আসিবে।

গাড়ী সরোজকুমারের গৃহদ্বারে থামিল। গৌরী সাহসে ভর করিয়া নিঃসঙ্কেচে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল, কেহ তাহাকে অভ্যর্থনা করিবে বা কেহ পথ দেখাইয়া কক্ষে লইয়া যাইবে এ সব বিষয় একটুও ভাবিল না।

সরোজকুমার যে ঘরে রত্ন পত্নীর শিয়রে বসিয়া একথানা বই পড়িতেছিলেন, গৌরী সহসা তপঃপ্রদগ্না বরদাতার মত তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, বলিল “আমায় ডাকিয়াছে কেন?”

সরোজকুমার চকিতের মত বলিয়া ফেলিল “তোমার এই ভয়টির শুভ্রতা করিতে হইবে।”

গৌরী শীর্ণ শব্দাকার ভয়টির তপ্পন লাগিয়া পদাঘাত করিল, তাহার জীর্ণ বন্ধ-পত্নীর হাত বুলাইয়া দিল। তারপর তাহার দুর্বল শিতটিকে অপর ঘরে ছেঁচ পাওয়াইল। সে পূর্বে কথা সব বিস্মৃত হইয়া, কোন বিষয়ে স্বামীর অপেক্ষা না করিয়া আপনার কার্যে প্রবৃত্ত হইল। সরোজকুমার বসিয়া-বসিয়া গৌরীর কার্যকলাপ দেখিতে লাগিলেন, তাহার গাত্র রোমাক্ত হইয়া উঠিল, গৌরীর নিকট তাহার বাক্যসুর্ভি হইল না।

গৌরী স্বত্তরকে একখানি পত্র লিখিল—“বাবা, আপনি একবার এখানে না আসিলে একটা স্ত্রীলোক ও তাহার পুত্রটির প্রাণনাশের সম্ভাবনা।”

ছই দিন পরে “বোমা কোথায় গা” বলিতে বলিতে দীর্ঘদেহ, গোরবর্ণ, তেজস্বী ব্রাহ্মণ উপরে উঠিয়া আসিলেন। গৌরী গলবস্ত্র হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। পুত্র তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতে পারিলেন না। গৃহকর্তা মুরলার ঘরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তৎক্ষণাৎ ভাল ডাক্তারের বন্দোবস্ত হইল। তিনি অনেকক্ষণ মুরলার নিকট বসিয়া ডাক্তারের কথাও শুনিলেন। একজন বিচক্ষণ কর্মচারীর হতে অর্থাদি রাখিয়া, রোগিনীর সকল সংবাদ যথাসময়ে পাইবার বন্দোবস্ত করিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। সরোজ আপনার ঘরে পরের মত বসিয়া-বসিয়া সব ব্যাপারই দেখিতে পাইলেন।

ঘরে আপনার স্ত্রী মৃত্যুশয্যায়া শায়িত—যে সে স্ত্রী নয়—কেহ তাহাকে পছন্দ করিয়া সরোজকুমারের অত্মমতি না লইয়া, শুধু কতকগুলি মন্ত্র উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ করিয়া দেয় নাই, ইহাকে সরোজকুমার নিজের পছন্দ করিয়াছেন, নিজে শিক্ষা দিয়াছেন, তাহার সহিত বিবাহের সমস্ত দায়িত্ব নিজের

উপর । আজ স্বামী বর্তমান থাকে সত্ত্বেও সে আজ অনাথা, অজ্ঞলোকে তাহার সেবা করিতেছে—একজন সপত্নী, একজন শশুর—যাহাদের সহিত এই বিবাহের কোন সম্পর্কই নাই । সরোজকুমার নিশ্চল হইয়া বসিয়া রহিল, অথচ তাহার পত্নীর কোন সেবাশ্রমাদি ক্রটি হইল না ।

গৌরী মুরলার শুষ্ক মুখ ও স্পন্দিত বক্ষপানে চাহিয়া যখন স্বামীকে মাঝে মাঝে সে ঘরে চোরের মত প্রবেশ করিয়া নিঃশব্দে চলিয়া যাইতে দেখিত, যখন মুরলা কখন-কখন বহু কষ্টে মাথা তুলিয়া একজনকে দেখিতে পাইবে বলিয়া এদিকে-সেদিকে চাহিত ও নিরাশ হৃদয়ে আবার মন্তক উপাধানে রক্ষা করিয়া ছই হাতে গৌরীর কণ্ঠ বেঠেন করিত, তখন গৌরী একবার আপনার কথা ভাবিত না এমন নয় । তাহার অন্তরে যে বেদনা সঞ্চিত ছিল, তাহা সম্মুখের বেদনার তুপ-টিকে ছই হাতে সমুদ্রে সময়ে জড়াইয়া ধরিয়া সে কিয়ৎ পরিমাণে তুলিয়া যাইত । একদিন মুরলা বিকারের ঘোরে সহসা গৌরীর পাছটি ধরিয়া তাহার মুখপানে শূন্যদৃষ্টি নিক্ষেপ করিল, কি একটা কথা বলিতে গেল, কিন্তু পারিল না ।

আর একদিন অন্তরের কথাটা তাহার প্রকাশ হইয়া পড়িল । সে দিন সে গৌরীকে বলিল “দিদি, আমার ছেলেটিকে তোমার হাতে দিলাম ।”

সেই দিন রাতে মুরলা পৃথিবীর সর্বল হৃৎবেদনার কবল হইতে মুক্তি লাভ করিল ।

ছই চারি দিন পরে গৌরী স্বামীর নিকট আসিয়া দাঁড়াইল, বলিল, “বাবা আমাকে বাড়ী যাইতে বলিয়াছেন, আমান্ন একটা কথা রাখিবে ?”

সরোজকুমার বলিলেন “বল ।”

গৌরী বলিল, “আমি তোমার ছেলেটিকে লইয়া যাইব, তুমিত উহাকে পালন করিতে পারিবে না ।”

সরোজকুমার অনেকক্ষণ চুপ করিয়াও কোন উত্তর খুঁজিয়া পাইলেন না, তারপর হঠাৎ বলিয়া ফেলিলেন “বেশ, লইয়া যাইও ।”

পরদিন গৌরী শশুরালয়ে চলিয়া ফ্রাসিল ।

(৮)

প্রভাতে স্নান সমাপন করিয়া গৃহকর্তা উদাত্ত স্বরে স্তোত্র পাঠ করিতেছিলেন, এমন সময় মুরলার শিশুটি হৃদয়ের আলোক দেখিয়া অধীর আনন্দে কক্ষের বাহিরে আসিয়া কোন মতে শিথিল পদব্দের উপর দেহভার রাখিয়া দাঁড়াইয়া

উঠিল, প্রভাতের আলোকের মতই তাহার হাসিটুকু ওঠে, গণ্ডে বিকশিত হইয়া সর্কাসে ছড়াইয়া পড়িল, গৃহকর্তা তাহাকে কোলে তুলিয়া লাইলেন ।

গৌরী বলিল “বাবা আমার কাজ শেষ হইয়াছে, আমি থোকাকে কোলে লইতেছি ।”

গৃহকর্তা বলিলেন, “বউমা, আমি থোকাকে কোলে করিলে তুমি অত ব্যস্ত হও কেন মা ?”

গৌরী উত্তর দিতে পারিল না, কর্তা জানিতেন—থোকা ব্রাহ্মণীর গর্ভজাত নয়, তারপর মুরলার সহিত সন্ন্যাসকুমারের যে বিবাহ হইয়াছে, তাহাকে তিনি শাস্ত্রসম্মত বিবাহ বলিতে রাজী নন । তিনি বুঝিলেন—গৌরী সেই ক্ষুদ্র থোকাকে কোলে করিতে দেখ না ।

তিনি বলিলেন, “না মা, তুমি ভাবিও না, আমি যে দেবতার পূজা করি তিনি সব প্রাণীকেই সমভাবে দেখেন, আমাদের শাস্ত্রও এত নির্ভর নয় যে সে নিরাশ্রয়কে আশ্রয়দানে বাধা দিবে ।”

গৌরী আশ্বস্ত হইল । মুরলার শেষ কথাগুলি তাহার অন্তরে কেবলই দীপ্ত হইয়া উঠিল । তাহার কথামত থোকাকে লালন পালন করিয়া এই নিঃসন্তান যুবতী তাহার অন্তরের কোষবন্ধ মাতৃহৃৎকু কখন ফুটিয়া উঠিল, কখন তাহা গন্ধে বর্ণে তাহার সমস্ত মন-প্রাণ, অন্তর-বাহির পরিপূর্ণ করিয়া নূতন জ্ঞান, নূতন দৃষ্টিক্ষেত্র উন্মুক্ত করিয়াছিল তাহা বুঝিতে পারে নাই । আজ সে বুঝিল—এত দিনে থোকাকে ভাল বাসিয়া অন্তরে অন্তরে সে একটু স্বস্তি হইয়া উঠিয়াছিল ; যাহার ধনে সে ধনী, যাহার জ্ঞানে তাহার জ্ঞান, তাহার শক্তিতে সে শক্তিমতী, যাহার অস্তিত্বে তাহার অস্তিত্ব বিলীন, সেই আরাধ্য পিতৃপ্রতিম স্বপ্নরকে ছাড়িয়া সে একটা স্বতন্ত্রতা অহুত্ব বহিয়াছিল ; এই ভাবে আর দিনকতক কাটিলে থোকাটি পুস্ত্রবধু ও স্বপ্নরের মধ্যে একটা দারুণ ব্যবধান হইয়া দাঁড়াইত । কিন্তু আজ গৌরী বুঝিতে পারিল—তাহার স্বাতন্ত্র্য স্বপ্নরের ব্যক্তিত্বে প্রতিহত হয় নাই, বরং তাহাতেই বিগ্ধন হইয়া গিয়াছে ।

কর্তা পূজা করিতে চলিয়া গেলেন । গৌরী থোকাকে বুকে করিয়া নিম্পদ ভাবে বসিয়া রহিল, কিন্তু তাহার অন্তরে একটা পুলকের চাঞ্চল্য ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠিতে লাগিল । সে বুঝিল—তাহার স্বামী একটা অজ্ঞান অসত্য স্বতন্ত্রতা অবলম্বন করিয়া বার্থতার অসহ বেদনা সহিতেছে—আর তাহার স্বাতন্ত্র্য পরতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত হইয়াও পার্শ্বক ।

তারপর গৃহকর্ম শেষ করিয়া স্বস্তির মধ্যদিনের ক্রিয়াকর্মের আয়োজন করিয়া গৌরী যখন পট্টবস্ত্রে লম্বীর মত সাজিয়া ঠাকুরঘরে শালগ্রাম শীলার সম্মুখে প্রণত হইল, তখন তাহার হৃদে চক্ষু অশ্রুজলে ভরিয়া উঠিল। কেন তাহার প্রাণে এ আবেগ আসিল তাহা সে নিজেই বুঝিতে পারিল না।

আহা! তে খোকা কে কোলে করিয়া যখন সে বিশ্রামশযায় শয়ন করিল, তখন খোকা হাসিতেছিল, দালানের বাতাস পাশের নেবু গাছটির পুষ্পগন্ধ বহিয়া বাতায়নপথে প্রবেশ করিয়া তাহার বেশগুচ্ছ স্নেহে চঞ্চল করিয়া তুলিতেছিল। হঠাৎ সে খোকা কে বুকে চাপিয়া ধরিল, খোকা হাসিল, মাতিল, হাত পা ছুঁড়িয়া আনন্দে বিহ্বল হইয়া উঠিল; গৌরীর নয়নপ্রান্ত হইতে দুই বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল—তাহার অন্তরের নিভৃততম প্রদেশে কে যেন বলিয়া দিল—সে স্বামীর অনাদৃত্য, তাহা না হইলে ভগবান তাহার আশীষস্বরূপ এমন একটি শিশুই তাহাকে দান করিতেন।

গৌরী তৎক্ষণাৎ অশ্রু মুছিয়া ফেলিল, ভাবিল—কেন আমার ত পুত্র আছে। একটা চিন্তা সে দূর করিয়া দিল; কিন্তু সে যে স্বামীর অনাদৃত্য একথা সে ভুলিতে পারিল না।

এমন সময় কর্তা দ্রুতপদে ভিতরে আসিয়া বলিলেন “বউমা, আমি চলিলাম ফিরিতে বিলম্ব হইবে।

গৌরী বলিল “কেন বাবা?”

কর্তা বলিলেন “বৈকুণ্ঠ চক্রবর্তী কাল রাত্রে মারা গিয়াছে, এখনও তাহার শব বাহির করা হয় নাই।”

গৌরী জানিত—বৈকুণ্ঠ চক্রবর্তী ব্রহ্মস্ব অপহরণ করিয়াছিল বলিয়া পাড়ার লোকেরা তাহাকে এক ঘরে করিয়াছিল; সেই জন্য তাহার শব কোন লোক স্পর্শ করিতে চাহিতেছে না। আজ আচারনিষ্ঠ স্বস্তরকে সেই কার্যে ব্রতী দেখিয়া গৌরী স্বস্তরে একটা গর্ষ অনুভব করিল। স্বস্তরের প্রতি তাহার ভক্তি পূর্বাপেক্ষা বাড়িয়া গেল। অন্ধকারে নক্ষত্রখচিত অমাবস্তার আকাশের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া সে ভক্তি-বিহ্বল হইয়া কাহাকে প্রণাম করিল সেই জানে।

(২)

সমস্ত রাত্রি শ্মশানঘাটে কাটাইয়া গৃহকর্তা যখন গৃহে ফিরিলেন, তখন আকাশের পূর্ব প্রান্তে অলোক দেখা দিয়াছে। ডাকাডাকি করিয়া ষিচাকরদের

নিম্না না ভাবিয়া তিনি চণ্ডীমণ্ডপে আসনশূন্য হইয়াই উপবেশন করিলেন ; সম্মুখের বটগাছে পাখীর দল জাগিয়া উঠিল, দূরে ধানক্ষেত্রের সীমায় একটা নারিকেল গাছের পাশে সূর্য্যের অর্ধচন্দ্র পরিদৃষ্ট হইল।

গৃহকর্ত্তা কিসের ভাবনার তন্ময় হইয়াছিলেন জানি না, সহসা তিনি দেখিতে পাইলেন—একটি যুবক সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে।

গৃহকর্ত্তা সে দিকে চাহিতেই যুবক হইহাতে তাহার পদদ্বয় জড়াইয়া ধরিলেন।

কর্ত্তা দেখিলেন—সরোজকুমার শুক শীর্ণ হইয়া গিয়াছে ; তাহার কেশ কৃষ্ণ, বসন মলিন, দর্প ও স্বাধীনতার উজ্জ্বলতা আর তাহার মুখে নাই। কখন যে তাহার এ পরিবর্ত্তন হইয়াছে, কখন যে তাহার স্বাতন্ত্র্য একটা হুর্দ্বৈ তারের মত তাহাকে অধিকৃত নিষ্পেষিত করিয়াছে ; কখন তাহার অন্তরের সমস্ত চিন্তা, সমস্ত ভাব তাহার বিকল দণ্ডায়মান হইয়া, তাহাকে দমিত করিয়া প্রতিমুহূর্ত্তে তাহাকে তাহাকে উদ্ধৃত স্বাতন্ত্র্য হইতে মুক্তি লইতে আদেশ করিয়াছে তাহা তিনি নিমেষে ভাবিয়া গেলেন। পিতা পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া পার্শ্ব বসাইলেন ; সরোজকুমার বলিলেন “আমি আজ হইতে আপনার কাছেই থাকিতে চাই।”

কর্ত্তা অবনত মুখে অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, সরোজ নীরবে তাহার উত্তরের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

তখন প্রভাতের আলো পল্লবে-পল্লবে, স্তূপ দূর ধানক্ষেত্রে আনন্দের হিল্লোল তুলিয়াছে। গাছে গাছে পাখীর কলরব জুড়িয়া দিয়াছে। সর্বত্র একটা পুলকের অধীরতা। কেবল কর্ত্তার চণ্ডীমণ্ডপে ছইটি ব্যাকুল প্রাণী অনেকক্ষণ নিঃশব্দে মুখোমুখি হইয়া বসিয়া রহিল। তারপর কর্ত্তা বাড় নাড়িয়া গভীর স্বরে বলিলেন—“সরোজ তাহা অসম্ভব। তবে তুমি বোমা ও তাহার পালিত পুত্রকে লইয়া অন্ত্র চলিয়া যাও, তাহাতে আমার আপত্তি নাই।”

কর্ত্তা ভিতরে চলিয়া গেলেন। আপনার কক্ষে বসিয়া কিসের ভাবনার নিবিষ্ট হইলেন।

মধ্যাহ্ন কাটিয়া গেল। সূর্য্যের আলোক বসন্তের নবপল্লবপুষ্পে বিকীর্ণ হইয়া একটি অপূর্ণ শ্রী প্রতিফলিত করিয়াছে। আজিকার এই সময়টি যেন বছদিনের পরিচিত—তাই আজ গৃহকর্ত্তার অনেক পূর্ব্বস্মৃতি উদ্ভিত হইতে লাগিল। দূরে একটা শিশু গাছ রক্তপুষ্পে পরিপূর্ণ হইয়া বাতাসে ছলিয়া উঠিতেছিল, কর্ত্তা তাহার দিকে অশ্লক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন।

এমন সময় গৌরী আসিধা ডাকিল “বাবা ।”

কর্তা মাথা তুলিয়া কাপা গলায় উত্তর দিলেন “কেমন মা ?”

গৌরী বলিল “বাবা, আমাকে কি যাইতে বলিয়াছ ?”

শুভ্র বলিলেন “হাঁ মা, তোমার বিবাহের দায়িত্ব আমি গ্রহণ করিয়াছি, এত দিন তোমাকে স্বামিগৃহে যাইতে বলি নাই, আজ বলিতেছি তুমি যাও ।”

চলিয়া যাইবার পূর্বে স্বামিত্রী কর্তাকে প্রণাম করিল । কর্তা ছকনের মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করিলেন ।

শ্রীস্ববোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ।

সুদূর ।

তোমারি লাগিয়া কত না যামিনী

চোখে ঘুম নাহি মোর,

শুভ্র শয়ন ছুইয়া ছুইয়া

ঝরে নয়নের লোর !

ওগো পরবাসী, দয়িত সুদূর

এস এ বৃকের কাছে,

অতল বাতাস যেমন করিয়া

জীবন জড়াবে আছে !

চাঁদের আলোক উত্তরী হয়ে

ঘেরিয়াছে ধরণীরে,

অমনি করুণ-কোমল পরশে

• আমাদের লহগো ঘিরে । •

শ্রীপ্রিয়দর্শনা দেবী ।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা

ভারতী, মাঘ—

অধিকাংশ কবিতা: প্রকাশ্য রচনা ও আনন্দিক সংবাদে পরিপূর্ণ। শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের “আধুনিক ভারত” মাসিকের কবিতা এইতে গৃহীত; বিনয় কথো পূর্ণ। শ্রীমদনকুমার চট্টোপাধ্যায়ের “জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কবিতা-মুদ্রিত” স্থপাঠ্য। শ্রীমদনকুমার চৌধুরীর “পিনীলিকাধের মুদ্রণশালা” নামক বিদেশী লেখকদিগের রচনা এইতে সংগৃহীত।

প্রতিভা, মাঘ—

শ্রীকামিনীকুমার সেনের “পুলকিত কবিতা-গোবিন্দদাস” শীর্ষক গ্রন্থটিতে গোবিন্দ দাসের ও তাঁহার কবিতার সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সমালোচনার অংশে অন্তর্ভুক্তির পরিচয় না থাকিলেও আমরা এ রচনাটির আদর করি। গৌড়বিলদাস প্রকৃত কবি—বাক্যলার বেশী হ্রস্ব তাঁহার কবিতায় সন্নিবেশিত হইয়া উঠিয়াছে। আনন্দকালকায় প্রায়শঃ দিনে নানা দিক হইলে যে তাব প্রত্যেকের দ্বারা ছুটিয়া আসিতেছে তাহা দেখিতে গিয়া দেশের নদীটির কথা আমরা জুলিয়া যাই। বাহা বেশবানীর তৃপ্ত দূর করিয়া আসিয়াছে, আসিতেছে ও ভবিষ্যতে আমাদের অন্তর পূর্ণ ও স্বাভাৱ উন্নত করিবে, তাহাকে নিশ্চিত হইতে যিনি যে ভাবেই বিশেষ করেন না কেন, তাঁহার প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গুহ “কর্ম ও চিন্তার স্বাধীনতা” শীর্ষক গ্রন্থে বলিয়াছেন—ভারতে মানুষের কর্মসম্বন্ধে যেমন সমাজনিগড়ে আবদ্ধ করিয়া রাখিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল, চিন্তা-প্রযুক্তিকে সেজন্য করা হয় নাই। পাক্ষাত্য দেশে ঠিক ইহার বিপরীত। তথায় কর্মের স্বাধীনতা আছে। স্বাধীনচিন্তকগণ (Free-thinkers) সে দেশের সমাজে ছেয়। ভারতের সমাজ চিন্তাবীরের এবং ইউরোপের সমাজ কর্মবীরের আবির্ভাবের সহায়তা করে। আজকাল আমরা সমাজধ্বংস চিত্র করিয়া ইউরোপের রীতিনীতি মানিতেছি, ইহা আমাদের স্বাধীনতার পরিচায়ক মনে করি; কিন্তু এক প্রকৃষ্ট পরিবর্তে অপর প্রকৃষ্ট প্রতিষ্ঠা করা ভিন্ন আমরা আর কিছুই করিতে পারিতেছি না। ফলে আমাদের মানসিক স্বাধীনতাটুকু বিসর্জন করিতে উদ্যত হইতেছি। গ্রন্থটি হালিখিত, মুদ্রিতপূর্ণ ও সমরোপযোগী। এরূপ আলোচনার দিন আসিয়াছে। বিন্দু সমাজে কর্মের স্বাধীনতাও আছে; কিন্তু যেমন স্বাধীনতা ইউরোপে আছে আশুপ জালাইয়া দিয়াছে, সেজন্য স্বাধীনতার আমল দেওয়া হয় নাই। এ সব কথার আলোচনা যত অধিক হয়, ততই ভাল।

“কবিতার কথা” শ্রীচিন্তারঞ্জন দাসের গ্রন্থ। লেখক বলিতেছেন—সংসার ও পরমার্থ, প্রত্যেক ও পরমার্থ এই দুই লইয়া আমাদের জীবন। ইহাদের কোনটাকেই আমরা একবারে ছাড়িয়া দিতে পারি না। তদুপসংসার ও প্রত্যেক অথবা পরমার্থ ও পরমার্থ দুইই আমাদের জীবন নয়। আমাদের প্রত্যেক প্রত্যেকের, প্রত্যেক ভাবের, প্রত্যেক মনোরমের মধ্যে একটা অন্তঃপ্রকৃতি আছে। আমরা সকলেই অন্তঃপ্রকৃতির সেই প্রাণের খোঁজে ব্যস্ত হইয়া পুঁজিয়া বেড়াই।

আমাদের জীবন মহামিলনমন্দির । এখানে শুধু সংসার নাই, শুধু পরমার্থও নাই, শুধু ইন্দ্রিয়প্রত্যাক বাস্তবতা নাই, বস্তুহীন করনাত নাই । তাহা আছে তাহা দ্রুতের মিলন ; তাহাই জীবনের স্বরূপ ; এই জীবন লইয়াই কবিতা । যে শুধু ছোবড়া গায়, সে কখনও কলের খাদ পায় না । যে জীবনের বহিরাবরণ ভেদ করিয়া অন্তঃপ্রকৃতির সন্ধান না পায়, সে কবিতার রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে না । আর যে ছোবড়া না ছোড়াইচা ফল খাইতে চাহ, সেও ফলের খাদ পায় না । সে জীবনের অন্তঃপ্রকৃতির একটা মনগড়া কল্পিত লোক সৃজন করে মরি । এই কল্পিত লোকের কোন সত্তা নাই । বৈক্য কবিতাগুলি বীয়েলিষ্টিক নয়, আইডিয়েলিষ্টিকও নয় ; এগুলি মহামিলনমন্দির জীবনের ধ্বনি । ইহাই হিন্দুর আত্মরিক ভাব, বাঙ্গালীর কবিতার আশ । আমরা বলিতে চাই—দেশ বিদেশ হইতে কবিতার উপকরণ-সংগ্রহ, লেখক তাহা নিশ্চিনীত মনে করিলেও, একান্ত অযোগ্যনীয়, তাহাতে বাঙ্গালা কবিতার এসার বাড়িতে পারে । তবে শুধু তাহাতেই মতিছা উঠিলে চলিবে না । লেখক প্রবন্ধের আরম্ভে বহিরাবরণ ও অন্তঃপ্রকৃতির মিলনেও কবিতা হয় এ কথা স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু শেষে সংসার ও পরমার্থের মিলনের উপর বাঙ্গালা কবিতার প্রতিষ্ঠা করিতে চান । বাঙ্গালার এমন অনেক কবিতা আছে বাহাতে পরমার্থের গন্ধ নাই, কিন্তু অন্তঃপ্রকৃতির রেখা বর্ষে বর্ষে প্রতিফলিত ; এগুলি কি বাঙ্গালার রত্ন নয় ?

প্রবাসী, মাঘ—

“গান” শ্রীযুক্তনাথ ঠাকুরের কবিতা । এখানে কবি ভরুণ যাত্রীদলকে আহ্বান করিয়া বলিতেছেন—

“দশদিক অন্ধনে দিগন্তনাশ
খনিজ পুত্র ভরি লব্ধ হৃদয়ল
চল রে চল চল ভরুণ যাত্রীদল
তুলি নব মালতী মঞ্জরী”

কবিতার ছন্দ ও গতি ভাব নুতন না হইলেও পাঠককে মুগ্ধ করে । বর্ষার ঝড়-ঝাতাস মেঘ-বিছাড়ের মধ্যে পাগলের কথা কবির মনে উদ্ভিত হইয়াছে; তখন তিনি লিখিয়াছেন “আকাশ জুড়ে জাগল পাগল;” এখানেও পদ্যবকল্পন দেখিয়াও তিনি এ বলে বলিতেছেন “পল্লবে পল্লবে পাগল জাগল”; এ দুটি পাগল এক রকমের নয় । “পাগল” বলিতে মহাদেবের বাহ্যিক ভাবটি পরিচ্ছন্ন হয় । বর্ষার প্রকৃতিতে তাহা দেখিতে পাওয়া যায় । এখানেও পদ্যবকল্পনে তাহা নাই । আনন্দচিত্ত শিশুকে কখন কখন আদর করিয়া “পাগল” বলা হয়—কথাটি এখানে গৌণ অর্থে প্রযুক্ত । এই কবিতার “পাগল” শব্দটিও তাই । এ কথার আরোণ বিশেষ বলে বিশেষ অবস্থার হইয়া থাকে । পাগলের সহিত যে ভাব জড়িত, কবিতাটি পড়িলে এখানে কথাটিকে সে ভাব হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার প্রম স্বীকার করিতে হয় ।

এখানে কবি আহ্বানের দুরটিকে প্রকৃতির মধ্যে জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছেন । কবিতার অন্তিম দু ভাবের সহিত সঙ্গিলিত হইয়া বিশেষ মাধুর্যের সৃষ্টি করিয়াছে ।

“কবরের দেশে দিন পনর” মায় বেগিরা এই গ্রন্থটি পাঠ করিতে ইচ্ছা হয় । রচনার বিশেষ দেশের বিবরণ যথাসাধ্য সংগৃহীত হইয়াছে । এ সব রচনান্তে লেখকের গ্রন্থের ছাপ প্রয়োজনীয়, মনুষ্যজীবন হইতে বৃত্তান্ত করিয়া রাখিলে কোন রচনাই আমাদের আনন্দ দান করিতে পারে না,—তদু বিশেষ বিবরণ লিখিলে চলিবে না, বাহ্যতে তাহাদের প্রতি পাঠকের চিত্ত আকৃষ্ট হয়, তাহার উপায়ও করিতে হইবে ।

ভারতবর্ষ, মায়—

“কবি কেশবদাস” শীর্ষক গ্রন্থকে জীৱসিকলাল রায় হিন্দী সাহিত্যাকাশের উজ্জল নক্ষত্র কবি কেশবদাসের ও তাহার প্রচলিত পুস্তকগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছেন । হিন্দী সাহিত্য ভারতবর্ষের, বাঙ্গালা সাহিত্যের সহিত তাহার সম্পর্ক থাকিলেও পরিচয় এখনও বিশেষভাবে হয় নাই । লেখক যদি সে কাণ্ডের ভার লন, তাহা হইলে তিনি যে কাজ করিবেন তাহার মূল্য নির্ধারণ করা কঠিন । তদু সংক্ষিপ্ত বিবরণে কাজ হইবে না । হিন্দী সাহিত্যের ঐক্য গ্রন্থগুলির বিশেষ পরিচয় তাহাকে দিতে হইবে । হিন্দী সাহিত্যের ঐশী কোনখানে তাহাও নির্দেশ করা আবশ্যিক । এইরূপে ভারতের ভিন্ন ভাষার সহিত পরিচয় হইলে ভারতবাসীর অন্তরে কোন হ্রস্ট ধর্মিত হইয়া উঠিতেছে, তাহা সকলেই জানিতে পারিবে ।

“সফা” জীৱসিকলাল মুখোপাধ্যায়ের কবিতা—শান্ত, স্নিগ্ধ, অসানগুণসম্বিত । কবি সফার ভাষাটি কবিতায় প্রসঙ্গরূপে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন ।

হিংস; দীপ্ত রণোন্নাস নিঃশব্দ নিবৃত্তি মাঝে

যাক—তুবে যাক্,

গভীর মরণমত আশ্রুকু নীরবে সফা।

পরম নির্ঝাঁক ।

* * *

নিবসের ভেদবৈধা পুস্ত বেগ অককারে

নাহি আশ্রয়

য়গ্মগুণাত্মের সাক্ষী অসংখ্য নক্ষত্রমালি

মাথার উপর ।

চুটিছে—চুটিছে কত, অনন্তের নাহি কতি,

নাহি তার আন ;

তুমি কেন আপনাত্তে দীন পরান্নিত ভাবি’

ফেলিছু নিঃবাস ।

উঝামগতন মাঝে তুমি জীড়নক নর,

কারে বল কতি ?

সেই বিলম্বের বীজ, তুমি যারে পরাক্রম

ভাবিছ সস্ত্রতি ।

অনন্তর দুখে সাধুর স্থাননির্দেশ, দৈনন্দিন জীবনকে অনন্ত জীবনের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লেখক করিতা ও দর্শনের মিলন-সাধন করিয়াছেন ।

ঈদগেঞ্জনাথ সোমের "রঘুস্মৃতি" দীর্ঘক এবংক মাইকেল মধুসূদন দত্ত সবকে করেকটি কথা লিপিবদ্ধ হইয়াছে ।

"সত্যতা বর্ণাশ্রম বর্ধরতা" ঈবিপিনবিহারি গুপ্তের প্রবন্ধ । তাহা মার্জিত, ত্রুটিমধুর । লেখক বর্তমান ইউরোপীয় সভ্যতার প্রকৃতি হঠাৎরূপে বর্ণনা করিয়াছেন । রচনা চিত্তাকর্ষক । ঐতিহাসিক অংশগুলি বেশ সরস করিয়া লেখা, পড়িতে পড়িতে মূগ হইতে হয় ।

ঈদানাধিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "ভূদেববাবু ও বেলেদের শিক্ষা" দীর্ঘক এবংক ভূদেব সবকে বে কথাগুলি লিপিত হইয়াছে, তাহা সুখপাঠ্য । "প্রবন্ধের বাহুল্য অংশ পরিবর্জিত হওয়া উচিত ছিল । "দুর্যোশে তিনমাস" ঈদেবপ্রসাদ সর্গাধিকারীর জন্মগ কাহিনী—প্রকাশিত অংশে বিলাতের অনেক জাতবা বিবরণ সংবলিত হইয়াছে । তাহাটি বেশ সরল, মার্জিত, কোথাও বাহুল্য আছে বলিয়া মনে হয় না ।

"বিজ্ঞান-বিদ্যার ব্যাকরণ" ঈদামেন্ত্রজ্ঞানের জীবনীর প্রবন্ধ ; জীবনীর মতাপর বহুদিন পরে যে রচনার হাত দিয়াছেন তাহা বঙ্গসাহিত্যের একটা অমূল্য পুরণ করিবে বলিয়া মনে হয় । লেখক বলিতে চান—বিজ্ঞান প্রত্যক্ষবাদী ; প্রত্যক্ষ প্রমাণই প্রমাণ ; কিন্তু এ প্রত্যক্ষ কার প্রত্যক্ষ ? জনসাধারণের প্রত্যক্ষ গ্রহণ করিতে হইবে । সব জনসাধারণ নয়—প্রকৃতিই জনসাধারণ । এ জগতে প্রকৃতিই কেহই নহু । Bain সাহেব যে বলিয়াছেন—In regard to object properties all minds are affected alike—এই কথাটি কিছুতেই বলা চলে না, তাহা হইলে observation এর art খুব সহজ হইয়া যায় । যিনি বৈজ্ঞানিক তিনি কোন একজনের সাক্ষ্য না লইয়া, সকলেরই সাক্ষ্য মিলাইয়া, একটা average কথিয়া লইয়া সাক্ষ্য গ্রহণের বর্ণনা দেন । বাহার প্রত্যক্ষ ঠিক বলিয়া গ্রহণ করা হয়, তাহা একটি মাঝারি মাঝের ব্যাকরণ এর এই mean man কল্পনার সিনিধি, পৃথিবীতে তাহার অস্তিত্ব নাই । স্বাক্ষর লোকেরাই এই mean man এর । কাছাকাছি । বাস্তবিক তাহাদের লইয়াই এই জগৎ । তাহাদের জীবন উক্ত অঙ্গের psychological বা religious জীবন নয় । তাহাদের জীবন biology র life অর্থাৎ চলারের secretion, excretion digestion assimilation ইত্যাদি । তাহাদের রাজ্যের সত্য ব্যবহারিক সত্য, জীবনের দ্বারে তাহাকে মানিতে হইবে । ইহা বাস্তবিক সত্য সত্য আছে, তাহা প্রাতিষ্ঠানিক । সত্যকে এই দুই বিভাগে বিভক্ত করিয়া লেখক এবারের মত বিচার গ্রহণ করিয়াছেন । জীবনকে এ বিষয়ে আরও বিশেষ আলোচনা তাহার নিকট আশ্রয় আশা করি । রচনা আকর্ষণ, দ্রুত বিবরণ স্থলর ও হৃৎপিঠরূপে প্রকাশ করিবার ক্ষমতা তাহার অসাধারণ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই । আজকালকার বিজ্ঞানের রাজ্যের দিনে তাহার কথাগুলি অনেক উবিবার বিদগ উপস্থাপিত করে । আমরা সকলকে এই প্রবন্ধ পাঠ করিতে অনুরোধ করি । "

"দর্পচূর্ণ" ঈদারবচন্ত চট্টোপাধ্যায়ের গল্প, ইন্দু স্তম্ভ নারিকায় ; বিমলা ধামীর আত্মপু বর্ত্তনী, শেষে বিমলার মরণ, ইন্দুর পরাজয়, তবে এপ্রাজয় অনেকটা জয়েরই মত । শরৎবা

गान्धी—



अथर्व ८ शाश्वतसुखे शाश्वतः ।



ସମ୍ପାଦକ ଡାକ୍ତର ବ. ଉଦୟନାଥ ଟ୍ରଷ୍ଟିମାନଙ୍କ ।

বলিতে চান—ইন্দ্র পরাজয়টা হুপের নয়; পরের একটা হুপের ভবিষ্যতের। দিকেখু তিন অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়াছেন। বোধ হয় তিনি ইন্দ্রকে প্রথমে বতস্ত তারপর খেজুর পরতর করিয়া সবুজ পত্রের নারিক। যে সোপানে উঠিয়াছে তাহারই একপাশে দাঁড় করাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। গল্পটি অত্যন্ত দীর্ঘ, স্থানে স্থানে দু একটা কথা অন্তরে যেনাপাত করে, কিন্তু ঘাটের উপর জিনিসটা মনোরম হয় নাই।

:

শোক-সংবাদ।

ডাক্তার ৮অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়। •

ডাক্তার ৮অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়কে জানিবার সৌভাগ্য বাহারই ঘটিয়াছে তিনিই আজ তাঁহার অভাবে শোক না করিয়া পারিবেন না। পরকে আপন করিবার এমন অসাধারণ ক্ষমতা তাঁহার ছিল, ছুচারদিনের দেখাশোনার চির-পরিচিতের মত হইয়া যাইতেন। তাঁহার মৃত অসামান্য পণ্ডিত, উৎসাহী কর্মবীর অতি অল্পই এদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ব্রাহ্মসম্মান ভারতবর্ষের প্রধানতম মুসলমানরাজ্য হাইদ্রাবাদে যে অনন্যসাধারণ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা কেবল তাঁহার বিজ্ঞাবত্তার জ্ঞান নয়; হৃদয়ের ঔদাস্য, সহানুভূতি, শিশুর ছায় সরল ব্যবহার গুণেই তিনি সকলকে মুগ্ধ করিতেন। সংস্কৃত, পারস্য, ইংরাজী, জর্মান প্রভৃতি ভাষায় তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল, রসায়নবিজ্ঞা তাঁহার বিশেষ প্রিয় ছিল। ইহার নানাবিধ বিচিত্র পরীক্ষা করিতে তিনি বড়ই ভাল বাসিতেন। তাঁহার স্বনামখ্যাত কন্যা সরোজিনী নাইডুর একখানি কবিতাপুস্তকের ভূমিকা লিখিতে প্রসিদ্ধ সাহিত্য-সমালোচক এডমণ্ড গস্ (Edmund Gosse) লিখিয়াছেন—তিনি যে রসায়নবিজ্ঞার মধ্য দিয়া সকল পদার্থকেই স্বর্ণে পরিণত করিবার চেষ্টা করিতেন, তাঁহার এই কল্পনাপ্রবণ উদ্ভাবনী শক্তি কল্পার জীবনে কাব্যাদৌন্দর্য্যে পরিণত হইয়াছে। তাঁহার পারিবারিক জীবন বড় সুন্দর ছিল; সম্মাননিগের প্রতি কর্তব্যপরায়ণতা, স্নেহ, সর্বদয় সহানুভূতি, তাহাদের চরিত্র গঠনের জন্ত সত্যক স্বাধীনতা দান করিতে তিনি কখনো কুণ্ঠিত হইতেন না। ব্যবহারে যেন তিনি তাঁহাদের সমবয়সী বড় ছিলেন। আর তাঁহার একনিষ্ঠ পরীক্ষামূলক বিশেষ করিয়া উল্লেখযোগ্য।

উনপঞ্চাশ বৎসর স্থায়ী তাঁহাদিগের বিবাহিত জীবনে স্বথের পরিপূর্ণতা ছিল, এই পত্নীর উদ্দেশ্যে তিনি যে কত গান ও কবিতা রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহার সংখ্যা নাই। রোগের কষ্ট তাঁহাকে ভোগ করিতে হয় নাই—হাসিতে হাসিতে মুহূর্তের মধ্যেই জীবনলীলার অবসান হইয়াছিল, নিকটে সেই পত্নী ভিন্ন তখন আর কেহই উপস্থিত ছিল না। আজ দেশজননীর তত্ত্ব সন্তান চলিয়া গিয়াছেন। নিয়ত উন্নতির পথে অগ্রসর হওয়াই তাঁহার জীবনের লক্ষ্য ছিল, সত্যকে আরন্ত করিবার জন্য প্রাণপাত চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন—তাঁহার নিকট জাতি, বর্ণ, বয়স ভেদ ছিল না, স্বদেশীমাত্রেই তাঁহার বন্ধু—তাঁ সে হিন্দু মুসলমান, খৃষ্টান, পার্শী, জী, পুরুষ, বালক যিনিই হোন না কেন। শিক্ষা ও সাহচর্য্য দানে কত অপরিণত বয়স্ক বালকের চরিত্র তিনি যে গঠন করিয়া গিয়াছেন তাহার সংখ্যা নাই। পরিশ্রমে তিনি অক্লান্ত ছিলেন, নিজের কালোজের নিয়মিত দৈনিক কাজ করিয়াও অবসরকালে শিক্ষার্থীদিগকে সানন্দে সাহায্য করিতেন। তাঁহাকে একক কখনো দেখি নাই, সর্বদাই সঙ্গীপরিবৃত থাকিতেন। প্রাণপূর্ণ বাক্যালাপ ও উচ্চ সরল হাস্য তাঁহার গৃহ সর্বদাই আনন্দময় ছিল। আজ সব মীরব হইয়া গিয়াছে, তবুও তাঁহার বন্ধুদিগের মন হইতে সেই ভোজানাতের মত সদানন্দ মূর্তি কখনই মুছিয়া যাইবে না। মৃত্যু যে ধ্বংস, বিনাশ—ইহা তিনি কখনই স্বীকার করিতেন না, মরণ জীবনেরই পর্যায়ভেদ, এক পায়শালা হইতে আর একটিতে আশ্রয়গ্রহণমাত্র বলিয়া জানিতেন। তিনি আজ এ পৃথিবীর কণিক আवास ছাড়িয়া গিয়াছেন; তাঁহার জুতাবে আত্মীয় বান্ধববর্গের জীবন নিরানন্দ হইয়াছে—কিন্তু তবু মনে হয় তিনি যে নবজীবনের মধ্যে গিয়াছেন সেখানে, আবার সেই আনন্দের কলহাশ উৎসারিত হইয়া চারিদিক স্নান ও স্বথময় করিয়া তুলিতেছে।

৬গোপালকৃষ্ণ গোখলে

ভারতের স্বসন্তান স্বনামখ্যাত গোপালকৃষ্ণ গোখলে পক্ষীয় সুপরিচিত। বিজ্ঞা বুদ্ধি, দেশহিতৈষণা কর্তব্যপারায়ণতায় গোখলের মত ভারতে আর নাই বলিলেও অত্যাধিক হয় না। একনিষ্ঠ হইয়া—সংসারের কর্ম্মপথে নির্লোভ থাকিয়া অবিলম্বে তাঁবে আপন কর্তব্য প্রতিপালন গোখলের মত অতি কম লোকেই করিয়াছেন। সংসারের যে কোন কর্ম্মক্ষেত্রেই গোখলে প্রকৃত ধনো-

পার্সন করিয়া স্বথে কালাতিপাত করিতে পারিতেন, কিন্তু নির্লোভ ব্রাহ্মণ যাবৎজীবন কেবলমাত্র অধ্যাপনার সংস্থান স্বরূপ ৭০টি টাকার কার্যশালান কলেজের অধ্যাপনাকার্যের ত্রুত গ্রহণ করতেন এবং বিংশবর্ষব্যাপী অধ্যাপনার পর স্বদেশবাসীগণের নির্ধন্যতাশয়ে বড়লাটের সদন্তসভায় বোম্বাইয়ের প্রতি নিধিক্রমে বসিতে স্বীকৃত হন। তদবধি অনন্যকর্মী হইয়া নিজ কর্মে অমন্য দক্ষতার সহিত করিয়াছেন; আজ তাঁহার আকস্মিক অকালমৃত্যুতে দেশজননী সর্বাঙ্গের ক্লান্তি সন্তান হারাইয়াছেন বলিলে পরলোকগত মহাত্মা গান্ধীজীর অসত্য প্রতিবাদ হইল এ কথা কেহ বলিতে পারিবেন না। তাঁহার মৃত্যুতে যে স্থান আজ শূন্য হইয়াছে কবে সে স্থান পূর্ণ হইবে তাহা সর্বনিয়ন্তা সর্বোচ্চর ভগবানই জানেন।

সাহিত্য-সমাচার।

মুসলমানসমাজের লক্ষপ্রতিষ্ঠ ঐতিহাসিক মোলভী শেখ আবদুল আজ্জব সাহেব প্রণীত—“মক্কা শরীফের ইতিহাস” ও “জিরদালাহ বা বরতুল মোকামসের ইতিহাস” অভিনব সাজে সজ্জিত লইয়া বর্তমান মাসে প্রথম সংস্করণে প্রকাশিত হইবে। এইবার ইতিহাস হই খানিতে বহু নতুন তথ্য ও অনেক ছবি থাকিবে।

শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মুহাশয়ের নবীন সন্ন্যাসী মনোরঞ্জন সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিটল সীতারামপুঞ্জের কর্তৃত্ব মারাঠী ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। ইহাতে ৮খানি ছবি আছে, তাহা ছাড়া প্রভাতবাবুর চিত্র ও ৩১২ পৃষ্ঠা ব্যাপী জীবনচরিত আছে। স্মরণ্য এক হিসাবে মারাঠী পাঠকগণেরই জিৎ।

Home University Library Series এর অন্তর্গত “Evolution of Industry” নামক পুস্তক অবলম্বনে রচিত, সর্বপ্রথম বাঙ্গালা প্রবন্ধের স্রষ্টা, চৈতন্য লাইব্রেরির কার্য নির্বাহক সমিতি, “বিশ্বস্তর সেন পারিতোষিক” হিসাবে, এক শত টাকা পুরস্কার দিবে। আগামী ৩০শে নবেম্বরের মধ্যে, চৈতন্য লাইব্রেরির সম্পাদক, বিডন ট্রাষ্ট, কলিকাতা, এই ঠিকানায় প্রবন্ধ প্রেরিতব্য।

মানসী

৭ম বর্ষ

১ম খণ্ড

চৈত্র ১৩২১ সাল

১ম পঞ্চ

২য় সংখ্যা

অভিভাষণ *

যে বিজয়-বল্লাল-লক্ষ্মণাদির কীর্তিকণিত বরেন্দ্রভূমিতে আজ সমাগত সাহিত্যিকবৃন্দকে আমি স্বাগত জিজ্ঞাসা করিবার জন্য দাঁড়াইয়াছি, সে সিদ্ধহানের প্রসিদ্ধি আজ আর নাই, তাহার খ্যাতি প্রতিপত্তি অস্তিত্ব, চিরদিনের জন্য সে তীর্গমরূপ পূণ্যভূমির পূতগচ্ছিন্না বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। রাজধানী বিজয়পুরীর সৌধশিখর আজ চীনাংশুক-পতাকাগ্ন পল্লিশোভিত নহে; দেবপাড়ার প্রসিদ্ধ মন্দিরচূড়া আজ আর দিন-দেবতার বিপ্রানার্গ উচ্চশির উর্ধ্বে তুলিয়া ধরে না। চিরপ্রোদিত অগস্ত্যকে দাক্ষিণাত্য হইতে প্রত্যাবর্তন করিবার জন্য উদ্যমপতির উদ্যান কলনা আজ আর উজ্জ্বল হইয়া উর্ধ্বে উদ্যত হয় না। হরিহর প্রাণ্মুগ্ধের প্রাঙ্ক-মধ্যাঙ্ক-মায়াক্ষর পূজারতির শঙ্খচঁটারব তক্তজনের শ্রবণে মাধুর্য্যময় সঙ্গীতের মত আজ আর বাজিয়া উঠে না, মন্দিরসম্মিহিত সরোবরে সহস্রাংশুর আনন্দবর্ধনার্থ সহস্রারবিন্দ তাহার বিভূষ মকরন্দ লইয়া দিনারঞ্জে আজ আর নয়ন উন্মীলন করে না, “গন্ধর্ব্বীমরসিককিরণ-বদন” অঙ্গখলিত কুচুনপকে সরোবরের স্বচ্ছ সলিল আজ আর পীত শোভায় প্রতিভাত নহে। কমলকুচুমের সংমিশ্রিত সৌরভ আজ দিগ্দিগন্তে প্রসারিত হইয়া দূরদূরান্তর হইতে নলিনী-বন-বনজ অলিকূলকে আদরামৃত্যুণে আহ্বান করিবার কোন উত্তমই আজ আর কীর্তিতেছে না। তক্তমুখোচ্চারিত স্ততি-পীতমুখরিত দেবধানী আর নাই, তোয়-তরঙ্গ-ভঙ্কচপলা লক্ষী বিজয়পুরী

* উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলনের রাণসাহী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিয়া পঠিত।

চিরদিনের জ্ঞাতাগ করিয়া গিয়াছেন, বিজয়সেনের বিজয়োদ্ধত সেনানীর গলিত পাদক্ষেপ-প্রসীড়িত বরেন্দ্রভূমি আজ শ্মশান অপেক্ষাও নীরব, নিস্তব্ধ ; বিগত-ইতিহাস-অহুসন্ধিস্থর আকুল অধেষণ ভূগর্ভ পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়াও অক্লান্ত ভ্রমের কিঙ্কিয়ারও সার্থকতা সম্পাদন করে কি না সম্ভেদ । বিরূপসভার পতিদম্বী লক্ষণের স্বারস্বত সভার পক্ষ মহারত্ন আজ আর নাই, রাজপ্রেমাদিনিী অপরীর প্রেমাকুল বিলাপগীতি উৎস-মুগ্ধনিঃসৃত নির্মল বারিধারার জায় ধোয়ীর লেখনীমুখে আজ আর অজস্র ধারায় প্রবাহিত হয় না, বিলাসকলা-কুফলী হরিষ্মরণে সরস মনকে পুরিতৃপ্ত করিবার জ্ঞাত পদ্মাবতী-সমনের রসভার-নন্দর গোবিন্দগীতাবলী আজ চিরদিনের জ্ঞাত স্বরূপ হইয়া গিয়াছে । নোগর্গের দিল্লীসিংহাসন-ছায়ায় যে বিস্তীর্ণ ভূভাগ “রাজসাহী” নামে অভিহিত ছিল, যার অতুল সম্পদ, অসীম ক্ষমতা এবং অপার মহিমান কথা পারাবারের পরপার পর্য্যন্ত একদিন বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল, আজ সে রাজসাহীও নাই এবং রাজসাহীবাসী জন-গণ-নাথক বলিয়া গাঢ়ারা একদিন সর্বপ্রকারের প্যাতিপ্রতিপত্তির আশ্রয়স্বরূপ ছিলেন, তাঁহারাও আজ পূর্ণভাবে দিগ্ভ্রম্যমান নছেন । আজ যাহার উপরে এট সমবেত সজ্জনগণী ও ননীদিবসের অভ্যর্থনার ভার অর্পিত হইয়াছে, সে সর্বতোভাবে ইহার অধুপবৃত্ত । বৎসরের সকল দিনগুলিই যাহার নিকট ঐপক্ষমীর অনধ্যায়ের দিন ছিল, সে কেমন করিয়া বাগ্বেদব্যতার সেবকবৃন্দকে স্বাগত প্রদান করিবে, ভাবিয়া পাইতেছে না ।

এ বৎসর যে চর্কবৎসর, একথা সকলেই জানেন—বিশেষতঃ উত্তর ও পূর্ব বঙ্গের পক্ষে মদ্য মহন্তরের বৎসর বলিলেও অতিশয়োক্তি বা অতিরঞ্জনের দোষে দোষী পড়িতে হয় না । এই সন্দেহ-সময়ে রাজসাহী এই মহাবজ্রের অধুপ্তান করিয়াছে ।

সারস্বত কুঞ্জের কলবিজ্ঞ-সমাগমে রাজসাহী আজ মুখরিত । দ্রুতবেগবাহী রাজসাহীর জদয়ে আনন্দ নিরানন্দ উভয়েরই আজ একত্র সমাবেশ হইয়াছে । বীণাবাদিনী বাগ্বেদব্যতার পাদপীঠ-কমলোর বিমল মধুস্বাদী মনীষিসমাগমে তাহার আনন্দের সীমা নাই ; আবার কেমন করিয়া দীন আয়োজন তাঁহাদের সম্মুখে ধরিয়া আতিথ্যের মর্গাদা রক্ষা করিবে ভাবিয়া পাইতেছে না ; দীন দেশের দীন আয়োজনের অর্পণতা যদি জদয়ের অভ্যর্থনায় পরিপূর্ণতা লাভ করিতে পারে, তবে রাজসাহীবাসীর ভয় করিবার কোন কারণই আজ নাই । “কাঞ্চন

থালি নাহি আনাদের" কিন্তু কদমীপত্রের প্রকাশিত শাকার সদৃশ্যবাহন পুরিতাজ্য নচে; সেই সাচসে সাহিত্য-যজ্ঞের দীন অহুস্তান করিয়া রাজসাহী আপনাদিগকে আহ্বান করিয়াছে; বাহপূজা অপেক্ষা মনিসপূজার মাতাঘা ভূনিগাছি সমদিক— আজ তাহা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইব আশার দীন আগোজনের গজ্ঞা আনাদিগকে জুহু করিতে পারিতেছে না।

পূর্বাঙ্গের নিয়মাবলীতে যে স্থানে সাহিত্য-সভা আহূত হয়, তাহার যৎকিঞ্চিৎ পূর্ণ পরিচয় অভ্যর্থনাদিনিতির সভাপতির দ্বারা। যুগের কপার দে পরিচয় দেওয়া অপেক্ষা পূর্বাঙ্গের প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখাইতে পারিলে, তাহা অধিকতর আকর্ষণের কারণ হয়। আজ আনন্দের সহিত বলিতে পারিতেছি, এই সভাস্থানের অনতিদূরে যে সংগ্রহালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, পূর্বাঙ্গবৈভবের স্মৃতিস্বরূপ শ্রীমুর্তি, তাম্রশাসন, প্রস্তরফলক, বাহা সংগৃহীত হইয়া দেখানে সংরক্ষিত আছে, তাহা দেখিলে অভীতগোরবের আভাস পাইতেই হইবে সন্দেহ নাই।

যে রাজ্য কাগজপত্রের ভাসিয়া গিয়াছে, যে রাজধানী কালের তত্ত্বাবলম্বে বিগুপ্ত হইয়াছে, যে বেউলের দেবতার সঙ্গে সঙ্গে মন্দির পর্যন্ত কালসাগরের জলে নিমজ্জিত হইয়াছে—সে প্রাচীনকালের সমগ্রমানুষ ইতিহাস বিদেশী-লিখিত মুদ্রিত পুস্তকে এবং ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেই পাওয়া যায় না। অসীম শৈব্যসঙ্কর, অপরিমেয় অশাব্যতারের সচিত, অরণ্যকান্ডের ভূমির ভূগর্ভে সকল নিফল নানা প্রকার অহুসকানে তাহার অস্তিত্বের কীৰ্ত্তি বাহির করিতে হয়। এ চেষ্টা অচিৎ বাঙ্গলার অনেক স্থানেই দেখা যাইতেছে। তাহার মধ্যে বিশেষ করিয়া উল্লেখযোগ্য—কামরূপ অহুসকান সমিতি, দেতনপুরের মহারাজকুমার মহিমানিরঞ্জনপ্রতিষ্ঠিত বীরভূম অহুসকান-সমিতি এবং মহারাজাধি-রাজ বর্ধমানাধিপতির পৃষ্ঠপোষিত এবং মহানরোপাধায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও প্রাচ্যবিজ্ঞানদর্পণ সিদ্ধান্ত-বারিদি নগেন্দ্রনাথ বহু মহাশয়ের নেতৃত্বাধীন রাঢ় অহু-সকান-সমিতি। কিঞ্চিৎ গর্কমিশ্রিত আনন্দের সহিত আজ উল্লেখ করিতে পারি যে, এই রাজসাহীতে রাজসাহীর অহুসকান স্টোপারপ্রতিম কুমার শরৎকুমারের জ্ঞান, বিজ্ঞা, অহুসকানসূচী ও অর্থগুরুল্যে বরেন্দ্রের বিগত-বিদ্বত বৈভবের ইতিহাস অন্বেষণ আরম্ভ হয়; এবং সেই অক্ষয়নার দয়া নিকেতন বরেন্দ্রের বিদ্যুৎ গরিনার ভ্রমাবশেষ অক্ষয়নার সাহায্যেই জীবান্ শরৎ দীমানের কলাবিজ্ঞানের সহিত সংগ্রহাণয়ে সমুদ্রে রক্ষা করিতে পারিয়াছেন।

আজ ফাগুন পূর্ণিমা । মেঘলেশহীন কুয়াটিবিহীন সুনির্মল নভঃ আজ দিক-চক্রবাণ পর্বাঙ্ক অনন্ত নীলিমায় পরিপূর্ণ, দক্ষিণের মুহুমন্মানিল চুতমুকুল ও নানবী-মহরীর ননোমুদ্রকর আকুল গর্ভী বহিরা বিগদিগন্ত আমোদিত করিয়াছে, অশোক, চম্পক, কিংডক, কাঞ্চনের বর্ণবিভায় বহুধরার আজ বাসকঁসজ্জা সন্মুখিত । কত সহস্র বৎসর পূর্বে জানি না বসন্তের এই মনোমোহন আয়োজনের মিনে বৃদ্ধাবিপিনতারী রাধাজন্মবিহারী নব নটবর ঐশ্ব্যামহুনের কঙ্কলীগার মহানছোঁসব হইয়াছিল । আবার প্রায় পঞ্চশত বর্ষ পূর্বে এই দিনে শতীমাতার অকলের নিধি, বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রিয়তম ধন, প্রেমের তুফান তুলিকাংর ভ্রত, প্রেমের নববীপচন্দ্র—ঐচৈতন্যদেবের নদীয়ার আবির্ভাব হয় । আজ কর শতাব্দী পূর্বে এই রাজসাহীর অনতিদূরে বরেন্দ্রভূমির খেতুরীগ্রামে—ঐনরোত্তন ঠাকুর কর্কক সোণার গৌরঙ্গ ও বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রতিষ্ঠা হয় । বরেন্দ্রভূমিতে ঐগৌরঙ্গের বিগ্রহপ্রতিষ্ঠা বাপার ধর্ম্মজ্ঞানের ইতিগমে চিরন্তন স্মরণীয় ঘটনা । এই উৎসবকে উপলক্ষ করিয়া তদানীন্তন পরমভাগবৎ বৈষ্ণব মহাজনগণের মহামিলন এই খেতুরীগ্রামে সংঘটিত হইয়াছিল । ঐক্লবানুধান, নীলাচল, নববীপ, শাস্তিপুর, খড়দহ প্রভৃতি যাবনীর বৈষ্ণব-নিবাসের তীর্থভূমি হইতে সাধু সঙ্ঘনগণের সমাবেশ হয় ।

ক্লবানুধান হইতে সমাগত ঐনিবাস আচার্য্য বিগ্রহের অভিষেক-ক্রিয়া সম্পাদন করেন । অব্যুত্চাচার্য্য নিত্যানন্দ প্রভৃৎ তখন তিরোভাব হইয়াছে ; তাহার অবর্ত্তমানে তদীয় সহধর্ম্মিণী ঐশ্বরী ক্লবী দেবী খড়দহ হইতে খেতুরীগ্রামে ত্তভাগবন করিয়া এই বৈষ্ণব মহাসঙ্ঘিলনীতে যোগদান করিয়াছিলেন এবং তাহারই নিষেশাশ্রমারে দেববিগ্রহপ্রতিষ্ঠা ও তদঙ্গীয় যাবনীর কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়াছিল ; বৈষ্ণব গ্রন্থপাঠে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় । ইহা হইতে তৎকালে বোগ্যভাগসারে ধর্ম্মজ্ঞগতে এবং বিশ্বসঙ্ঘনসমাঙ্গে স্বীলোকগণ নিজ নিজ স্থান অধিকার করিতে পারিতেন, ইহা অসুমান করিলে অসঙ্গত অসুমান না হইতেও পারে । নরোত্তন কর্কক সোণার গৌরঙ্গ প্রতিষ্ঠা দ্বারা এতদ্দেশে ঐগৌরঙ্গের অবতারণার প্রচোর হয় এবং সেই স্বত্ব খেতুরীর এই বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-বাপার বৈষ্ণববিগের ধর্ম্মজ্ঞগতে চিরস্মরণীয় ঘটনা এবং সেই ঘটনা এই রাজসাহীর কর নাটল মায় দূরেই ঘটয়াছিল । সেই দিন হইতে আজ পর্বাঙ্ক নির্ব্বারিত নিবাসে বৎসর বৎসর সেই বৈষ্ণব-মহাসঙ্ঘিলনী এই খেতুরীগ্রামে হইয়া থাকে । সেই মিলনক্ষেত্রে চরিত্তিপুত্রাধরণ বৈষ্ণব নরনারীর ভক্তিপরিপ্লুত

সম্মিলিত সনদের নামসকীর্তন, বৈকুণ্ঠবিহারী শ্রীহরির মহিমান্বয় সিংহাসন
তবে সন্নিবেশিত হয় কি না জানি না, তবে কীর্তনানন্দের উদ্ভাদ পুলকে
আম্বাহারা বৈকুণ্ঠ-সম্প্রদায়ের পরাভক্তি এবং প্রেমসাগরের উচ্ছ্বসিত রসতরঙ্গ
যে দেখিরাছে, তাহার নরন সার্থক, জন্ম মজ্জা, জীবন সফল এবং দেহনন পবিত্র।
অনিকোপানমে তদ্বীভূত যুগ্মসহস্র সগরসন্তান উদ্ধারের দ্বজ তপঃস্নিক ভগীরথ
যেমন নন্দাকিনীর পাবনী ধারাধ দরশী পবিত্র করিরাছিলেন, প্রেমময় শ্রীগোরাঙ্গের
বিগ্রহের অর্চনা প্রতিষ্ঠিত করিরা ভক্তপ্রবর নরোত্তম তেমনই বরেন্দ্রভূমি
পবিত্র করিরা গিরাছেন, সন্দেহ নাই। নরোত্তম ঠাকুরের জীবনব্যুত্থ এবং
সোণার গোরাঙ্গ প্রতিষ্ঠার অংগুসঙ্গিক কাহিনী অতি অপূর্ণ। রাজৈশ্বর্য-
সম্পন্ন ব্যক্তির সম্ভান নরোত্তম শিশুকাল হইতেই দর্শনপিপাসী; যৌবনে স্নানাগ
পাইরা গৃহভাগী হইরা শ্রীগুরুদেবদামে জীব গোপালীর শিকট বৈষ্ণবশাস্ত্র
অধ্যয়ন করিতে যান এবং লোকনাথের নন্দশিষ্য হইরা লালকঙ্কারী নরোত্তম,
সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। শাস্ত্রাধ্যয়নে শেব করিরা পরমভাগবত সন্ন্যাসী নরোত্তম
প্রেমভক্তি বিতরণমানসে বেশে প্রভাগমন করেন এবং স্বগাদিষ্ট হইরা
শ্রীগোরাঙ্গের সোণার বিগ্রহ সর্পসঙ্কুল ধাতাগারে প্রাপ্ত হইরা, পরন সমারোহে
বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা-উৎসব সম্পন্ন করাইরাছিলেন। শাস্ত্রদর্শী ভক্ত নরোত্তম,
শাস্ত্রাধ্যয়ন ও হরিগুণাধীকীর্তনে জীবনাতিপাত করিরা যান এবং জীবিতকালে
হরিভক্তিবিধরক গ্রন্থাদি যাহা বাঙ্গলা ভাষায় রচনা করিরা গিরাছেন, তাহার
সংখ্যা এবং সাগবত্তা কন নংহ, অতজ্ঞা নরোত্তম বরেন্দ্রভূমে প্রেমভক্তিই
কেবল বিলাইরা গিরাছেন তাহাই নংহ, তাহার দ্বারা নাট্যভাষাও যথেষ্ট
পরিপুষ্ট লাভ করিরাছে। রাজসাহীবাসী বাঙ্গলভাষার চরণনিশ্চলী মধু
দ্বানের দ্বজ ভিন্নদিনই লোপূপ; অতি অল্পকাল পূর্বেও এই জেলায় অসংখ্য চতুষ্পাঠী
ছিল। প্রতি গ্রামে একাধিক চতুষ্পাঠী ছিলই, কোন কোন স্থানে একই গৃহে
এক সময়ে কাব্য, অলঙ্কার, স্মৃতি, দর্শন প্রভৃতি বিবিধ শাস্ত্রের অধ্যয়ন হইতে
পারিত। গৃহস্থ সকলেই পণ্ডিত,—এমন গৃহ এই রাজসাহীতে বিরল ছিল না।
জীনেশ্বরীকৃত “কাশিকা বিবরণ পট্টিকা” বা “ভাস” মৈত্রেয়রক্ষিতকৃত
“তঙ্গপ্রদীপ”, পুরুষোত্তমকৃত “ভাষ্যভূতি” প্রভৃতি এই রাজসাহীতে আজও
পাওয়া যায়। দ্বজবজ্রাশ্রু-অঙ্কিত শ্রীহরির পদাঙ্গ অংগুসরণ করিরা আতীর
রনবীর চিরপ্রাণিত দগ্ধিতক্লমী ভাবদধেষণ-কাহিনী, যাহা “পদাঙ্গদূত” নামে
অভিহিত হইয়া আসিতেছে, সেই পণ্ডিতকান্ত গোপাবলী এই রাজসাহীর

রাজকবি ঐক্যলক্ষ্যাকৃত । অতি প্রাচীন কাল হইতে আজ পর্যন্ত এখানে বেশকালোপযোগী বিস্তার অর্থশীলন অবিলম্বে চলিয়া আসিতেছে । বেটিক এবং মেকলে প্রবর্তিত নবশিক্ষানীতির প্রথম ফলস্বরূপ জেলায় জেলায় যে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল, বোয়ালিয়া জেলা স্কুল সেই সময় প্রাচীন বিদ্যালয়ের একতন । ভবনচর্চীর সংকল্পশীল রাজা প্রমথনাথ রায় অর্থসাধ্যতার দ্বারা সেই স্কুলকে ছাটস্কুল করিয়া দেন ; তৎপর দিগপতিয়ার সুপ্রতিষ্ঠিত বিদ্যোৎসাহী শৈশবিতৈষী পুণাশীল রাজা প্রমথনাথ সেকেন্ড হেডে কলেজে বিএ ক্লাস স্থাপনের সচেষ্টতা করিয়া উত্তরবঙ্গে আধুনিক উচ্চশিক্ষার পরম সুযোগ করিয়া দিয়াছেন । তৎকালে সমগ্র উত্তরবঙ্গে আর কলেজ ছিল না । এই রাজসাহী কলেজই সর্বপ্রথম এবং সর্বপ্রধান । কলেজ এবং এই বিদ্যালয় সেই প্রাচীন খ্যাতি আজ পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে । যে বিদ্যালয় সমগ্র উত্তরবঙ্গবাসী বিদ্যালয়-দিগের শিক্ষার একমাত্র স্থান, এক সময়ে তাহার অস্তিত্ব পর্যন্ত লোপ হইবার উপক্রম হইয়াছিল বর্তমান সুযোগ; অধ্যক্ষ রায় কুন্সিনিীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় দাচাঙর, দিগপতিয়ার সর্ববিধের সুযোগ্য আমার পরম বান্ধব বিদ্যোৎসাহী রাজা প্রমথনাথ রায় বাহাদুরের সচেষ্টতায় অপরিমিত ধৈর্য্য ও অক্লান্ত শ্রমের ফলে তাহাকে কেবল রক্ষণায় করিয়াছেন, তাহাই নহে, সে বিদ্যালয়ের সর্বপ্রকার গৌরব এমন করিয়া বর্দ্ধিত করিয়া দিয়াছেন যে, ইহার সমকক্ষ কলেজ আর নাই বলিলে কৈতববানের দোষ কেহ দিতে পারিবেন না । আমার সোদরপ্রতিম রাজা প্রমথনাথ এবং আমার অধ্যাপক রায় বাহাদুর কুন্সিনিীকান্ত সমগ্র রাজসাহীবাসীর একান্ত কৃতজ্ঞতাভাজন । প্রান্তঃ-স্বরসীরা নগরাসী শরৎসুন্দরীর উপযুক্ত উত্তরাধিকারিণী দানশীলা পুণ্যবতী ঐক্যলক্ষ্য রায়ী হেমসুন্দরী দেবী একটা সংকীর্ণ কলেজ প্রতিষ্ঠিত করতঃ পরোক্ষ নৃত্যকর সংস্কারশীলনে নবজীবন সঞ্চার করিয়া, জনসাধারণের চির-কৃতজ্ঞতার পাত্রী হইয়াছেন ।

ঐক্যলক্ষ্যর পদাঙ্কদূত এবং নরোত্তমের কোমলকান্ত বৈক্যবপদাবলীর মধুর সঞ্চারের পর বাণেশবতার বীণার তুরী শুদ্ধ হইয়া যায় নাই, আরও অনেক কবি, অনেক লেখক এই রাজসাহী ভূমিতে জন্মলাভ করিয়া তাহাদের কৃতিত্বের চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছেন এবং বর্তমানেও নাত্যভাবার ভাঙারে মূল্যবান রচনাজি উপঢৌকন দিয়া সমৃদ্ধ করিতে নিরলস গতের যাত্রাদের ত্রুটি নাই, এমন লোকও বিরল নহে । কান্তকবি রত্ননীকান্ত আপনাদের সকলেরই সুপরিচিত ছিলেন,

ভাচার জীবন-দ্রব্য। মধ্যাগমনে না আসিতেই অস্ত্রশিখরীর পরপারে চিরদিনের জন্য অস্ত্রনিভ হইয়া গেল ; বঙ্গবাসীর ছর্ভাগ্যের কথা, কিন্তু অল্পদিনেই প্রকৃতির এই কলবিহঙ্গ নধুর-কাকলীর স্বরলহরিতে বঙ্গের কাব্যকানন অঙ্কিত করিয়া তুলিয়া-ছিল।—সে নধুর স্বকার বঙ্গবাসী শীঘ্র তুলিতে পারিবে না। ভাচার কৃষ্ণনে শিষ্টজন-নোদিত শুভ্র কলহাশা ছিল। কন্যাধারগ্রস্তের জন্মবেদনা ভাচার মুঁড় করিয়া কেহ প্রকাশ করিয়াছে কি না জানি না ; আবার ‘কেম বঞ্চিত হব চরণে’ যখন শুনিয়াছি, মনে করিয়াছি যে, এমন করিয়া যে চাহিতে জানে, সে চিরপ্রার্থিতের চরণকমলের বহুরেণুকার কখনই বঞ্চিত হয় না। রাজনীকান্তের বিললশুভ্র কাব্যকৌমুদী আজ আর নাই ; রাজসাহী আজ সত্যসত্যই রাজনীর অফকারে আবৃত হইয়া আছে। কাব্যকবির স্বগত-সঙ্গীতের স্বরে ও শব্দে আজ সনাগত সাহিত্যিকহৃদকে তৃপ্ত করিতে পারিতেছি না, রাজসাহীবাসীরা ইচ্ছা পরন ছর্ভাগ্যের কথা।

আজ যাহাকে আপনাতা পোরোহিত্যে বরণ করিয়া বীণাবাদিনী বাগ্বেবতার অর্চনা আরম্ভ করিতেছেন, ইনি আপনাদের সকলের নিকট সুপরিচিত ; কলনর্ণগায় তিনি রানদেব দেওয়ান চৌধুরীর বংশধর, বারেন্স ব্রাহ্মণ-সমাজের কাপকুলচূড়ানবি, বিখ্যাতশ্রমালয়ের সাহিত্যের এম্ এ পরীক্ষায় সর্ব প্রথম হইয়া উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন ; লবণাধরাশির পরপার হইতে নানা রত্নরাজি আহরণ করিয়া আনিয়াছেন ; বর্তমানে বাহালা দেশের একখানি উৎকৃষ্ট মাসিক পত্রিকার সুযোগা সম্পাদক, অর্কশত “সন্কেটের” শিল্পচতুর কবি, বঙ্গসরস্বতীর সর্বাঙ্গ দিব্যভরণে ভূষিত করিয়াও ভাচার কর্ণে “বীরবোদী”টি পর্য্যন্ত দিতে তিনি বিম্বত হন নাই। ভাচার জ্ঞানভাণ্ডারে অমূল্য রত্নরাজি হইতে আরম্ভ করিয়া সংসারের নিত্য প্রয়োজনীয় “তেল নুন লকড়ী” পর্য্যন্ত বাচ্যর বাহ্য প্রয়োজন, সবই পাওয়া যায়। এই স্নানস্বত-সম্মিলন আজ ভাচাকে সভাপতিস্বরূপে পাইয়া ধনা হইয়াছেন।

কোন নবীন প্রভাতের মাছের মুহূর্তে তরণেন্দু কাশ্মিনভী সিতাক্ষে সন্নিবন্ধা বীণাবাদিনী বাগ্বেবতার মানসী মৃতি মানবের মনে প্রথম উদ্ভাসিত হইয়া চুঃখভারপ্রসীড়িত জরাঞ্জীর্ণ জীবনে নন্দনের চরিত্রচন্দন-শোভার সৃষ্টি করিয়াছিল জানি না—তারপর যুগযুগান্ত ধরিয়া সেই অমৃতজ্জ্বলি বিশ্বের মানস-স্বর্গে চিরস্থনী হইয়া রহিয়াছে ; ভাচারই শিল্পচন্দনাক্ষিত পাদপীঠের অধুযানে-ভারতের নবা কবিসম্প্রদায়ের চিরবরেণ্য অধিতীয় মণীবাসম্পন্ন রবীন্দ্রনাথ—

জগতের কাবাসভাগ বঙ্গ-স্রবতীর রহস্য মিচামন স্থাপন করিয়াছেন । আমরা 'সিক্কিস'বিতার প্রথমাক্ষরীপ্তি দেখিতে পাইয়াছি মাত্র, তাপোভা সম্পূর্ণকল অজ্ঞ ও আমাদের হৃদয়ত হয় নাই । বিদিনির্দিষ্ট এই সাহিত্যের পথেই আমাদের সর্বপ্রকার সিক্কির অন্বেষণ করিতে হইবে । বাগ্বেবতার চরণাক্ষর-কিরণোদ্ভাসিত এই পথেই আমাদের সর্ব প্রকার সার্থকতার সন্দর্শন আমরা লাভ করিতে পারিব । এই সাহিত্যের উপর উদ্বুদ্ধ পথেই বিগত-বৈভবা বঙ্গজননী বৈষ্ণবের বিকাশ সম্ভব হইবে ।

সংগত সাহিত্যিক স্বীকৃতিজন্যকে আমি বারংবার অভিবাধন জানাইতেছি ।

শ্রীচন্দ্রদিল্লনাথ রায় ।

ভ্রমর ।

‘ওগ্’ ‘ওগ্’ ‘ওগ্’ ‘ওগ্’, ‘ওগ্’ ‘ওগ্’ ‘ওগ্’ ‘ওগ্’,
ওরে অলি, একি নগ্ন বলি,
পতঙ্গেরে নাচাইলি, চম্পকেরে হাসাইলি,
রসাইলি রসালের কলি !
যুবকেরে কাপাইলি, যুবতীরে জাগাইলি,
রে রসিক চূড়ানগ্নি অলি,
না জানি কি কথা বলি, দিলি তার অঞ্চল চকলি !

‘ওগ্’ ‘ওগ্’ ‘ওগ্’ ‘ওগ্’, ‘ওগ্’ ‘ওগ্’ ‘ওগ্’ ‘ওগ্’,
পরী-রাজ্যে বাজায়ে মুরলী,
নেতেছিঁস্ কি উৎসবে, ও তোর আনন্দ-রবে,
ভরি গেল কুল আর গলি !
গোলাপেরে লাগাইলি, কাণে তার কি কহিলি ?
পরশে পলিল মুক্তাবলী !
একি শোভা মনোলোভা, হাসিয়া উঠিল বনহনী ।

৩

গুণ্ গুণ্ গুণ্ গুণ্, গুণ্ গুণ্ গুণ্ গুণ্,
 শঠ-চূড়াননি ওরে অলি,
 ওই স্বন্দরীর মুখে, গুঞ্জরিলি কি কোকুকে,
 ভয়-ক্রান্তা উঠিল উছলি !
 ওই বিরহিনী দনী, দিন গনি, দিন গনি,
 ছিল চুপে আপনারে ছলি,—
 ও তোর চরণ-চাপে আচল, তার বুক দিলি দলি ।

গুণ্ গুণ্ গুণ্ গুণ্ গুণ্ গুণ্ গুণ্ গুণ্
 পূর্ষজন্মে ছিলি কি স্তবেশা
 নটী, গীত বাজে ভোম, এ জনমে তাই ভোম
 বুটিল না আনন্দের নেশা ?
 ছাগানটে আলাপিয়া, নেগরাগ আলাপিয়া,
 স্বরারিধা ললিত বেলাগ,
 কোন্ বরে কোন্ শাপে, হয়েছিল মৃদ্বিনান রাগ ?

গুণ্ গুণ্ গুণ্ গুণ্, গুণ্ গুণ্ গুণ্ গুণ্,
 উর্ধ্বশীর বিরহের স্নান,
 প্রাণে পশিয়াছে বুঝি ? কণ্ঠ-মালো নাথ! ওঁজি
 ছিলি !—তাই আনন্দে আতুর ?
 বিরহান্তে নিলনের আত্মদ পাইলি টের,
 কোন্ দেব-দম্পতির গেছে ?
 উদ্বেল আনন্দে মগ্ন চলি অলি কোন্ নাড়-ঝেড়ে ?

গুণ্ গুণ্ গুণ্ গুণ্, গুণ্ গুণ্ গুণ্ গুণ্,
 ওরে ভূপ, বুঝি কোন কালে,

রানার স্তম্ভ-শব্দ, শুনি হঠাৎছিলি বুক ?

আনন্দে নাচিলি তালে তালে !

বৃষ্টি চপ্তি-স্বপ্ন-গান চুপে করেছিলি পান,

নারদের বীণায় বসিয়া ?

হেঁ রমিক ! সেই রসে চিরদিন আছিহুঁ রসিয়া ?

শুণ্ শুণ্, শুণ্ শুণ্ শুণ্ শুণ্,

আনন্দের সরণা অদ্বৈত,

এ বিধুর মদা ভাগে স্বর্গের ঠিকারে জাগে,

তুই বৃষ্টি তাকানি বৃষ্ণ ?

শোক তাপ হৃদ্যভয়, সে আনন্দে পায় লয় ;

লয়ে তারি বারতা অদ্বৈত,

এসেছিহুঁ বৃষ্টি তুই, চিরানন্দ তরে দেবদূত ?

শুণ্ শুণ্ শুণ্ শুণ্,

“হেন বস্ত্র নাহি রে মহীতে !”

সেই পূর্ণ মাধুর্যের, আশ্বাদ পাইয়া টের,

তাই বৃষ্টি বুলিস্ ইঙ্গিতে ?

তাই তুই কুল চান্, . প্ৰধু পাস্ বার নাস !

সৌন্দর্যের একি আরাধনা !

প্রাণপণে নরি, নরি, মাধুর্যের এ কি উপাসনা !

শুণ্ শুণ্ শুণ্ শুণ্,

আমরাও করি অহমিণ,

স্বাক্ষরিতা স্বাক্ষরিতা, মায়াবৃক্ষে বসি গিয়া,

মধু-ভ্রমে পান করি বিণ !

তোর মত একাগ্রতা, তোর মত তন্দ্রমতা,

নাই ! নাই ! তাইরে ভ্রমর,

বসন্তেও গুণী নোরা নিরন্তর, কাতর কুর্জর !

১০

শুণ্, শুণ্ শুণ্ শুণ্ শুণ্,
ওরে ভগ্ন, শুণ্-নগ্ন নোরে
শিখায়ে দে, শিখায়ে দে,— এ নাই পুরাণে, বেদে,
পড়িয়াছি বিব্রনের ঘোরে !
শাস্তি চাই, শাস্তি নাই,— গুরিহ্ সফল ঠাট !
দেরে দীক্ষা শুণ্-নগ্নে নোরে,—
গুচুক বিরহ-বাথা এ স্নানার, পেয়ে চিত্তচোরে !
ঐদেবেক্সনাথ কখন ।

রোগশয্যার প্রলাপ ।

(১১)

একদিন নামে হইল,—“কছাদায়ে বাঙালার এত বিড়ম্বনা কেন ?”—
“বাঙালীর কছাদায়” বলিয়াই কথাটা নমন উঠিল, কিন্তু ভাবিয়া দেখিলান,
বাঙালীর মনস্ত জাতির নিগূঢ় খবর আনার মানস-ভাণ্ডারে সঞ্চিত নাই,
আমার নিজের ঘনিষ্ঠ রাষ্ট্রীয় ত্রাণকণ কাছস্থ সনাতনের কথাই আনি বেঁধা
জানি এবং তাহাদের কথা ভাবিয়াই যেন কতকটা কুল কিনারা পাই।
মন তাই ভাবিতে লাগিল। ভাবিতে ভাবিতে দেখা গেল,—আমাদের নত
উচ্চ সনাতনের শিক্ষা দীক্ষার প্রভাবে আমরা জানিয়া রাখিয়াছি,—

কছা বরষতে রূপং নাতা বিত্তং পিতা ধনং ।

বাক্সবা কুলনিচ্ছন্তি নিষ্টাঘ্ননিতরে জনাঃ ॥

এই ভুলই সকল পিতাই কছার পাত্রাধেশ্বনে রূপ, বিত্তা, অর্থ, কুল, ও
দাতা ভোক্তা পাত্রেরই চেষ্টা করেন। সর্বত্র সকলের সনাতন পাত্রাধেশ্ব
না, কাজেই অল্পাদিক কান্যগুণ বিশিষ্ট পাত্রের নির্বাচনই কার্যক্ষেত্রে ঘটয়া
থাকে। এখন যে প্রবোর প্রাপ্তী অধিক হয়, বাজারে তাহার দরও অধিক
হয়, ইহা চিনিয়ার চিরসত্য নিয়ম। চিনিয়াদারীতে যখন এ নিয়মের বাস্তব
কৃত্তাপি দেখা যায় না, তখন বরের বাজার চড়িবে না কেন ? যে দর দিতে
পারিবে, সে ভাল জিনিস পাইবে। এতিয়ার রুচি ও প্রয়োজন অনুসারেও
অধিকাংশ স্থলে বিষয়ের ভালমন্দ নির্বাচিত হয়। আমরা আজকাল প্রাণ-

পণ শুল্কিতে পুর্বোক্ত অতঃলা কানা গুণের সকল ভাদাইয়া দিয়া অর্থ-কেই সম্ব্যাপেক্ষা প্রার্থনীয় করিয়া তুলিয়াছি। এখনকার শিক্ষা দীক্ষা আমা-দিগকে সকল ভূলাইয়া একমাত্র অর্থনৈবত করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছে। মেয়েটো যেখানে খাইতে পরিতে পাইবে, হাত পুড়াইয়া রাখিবে না, বাসন নাভিবে না, স্বচক্ষে গৃহকর্ম করিবে না, এমন স্থলেই কল্যাণান করিতে আত্ম-কাল আনন্দের সকলেই একান্ত কামনা করি। আত্মকাল আমরা যে পাত্রেয় বিস্তার পরিমাণ জানিতে চাই, তাহার মধ্যার্থ তখনে পাত্র ভবিষ্যতে কি পরিমাণ অর্থ উপার্জন করিতে পারিবে, তাহারই কুং করিয়া লইয়া পাত্রেয় দর ঠিক করি। এই ভাবের অমূল্যে বড়মানুষের ঘরের রূপ গুণ বিস্তা-তীন পারও অর্নস্ত আগ্রহের সচিত গৃহীত হয়! তাহার পরেই এখনকার বিশ্ববিদ্যালয়ের বিস্তার ওজনে আগ্রহ ও দরের ব্যবস্থা হয়। গাঁহার বরের বাজারের চড়া দর দিয়া উচ্চশিক্ষার ছাপমাত্রা পাত্র বা ধনী সন্তানকে জানাচুকে বরণ করিতে পেরেন না, তাহার চাকুরীজীবী অথবা অল্প প্রকারে “রোজগারে ছেলের” বাজারে গুরিতে বাধ্য হন। সেখানেও দর বড় কন নহে। এখন জমীদার ও অর্থশালীর সন্তানেরাই কুলচূড়া, বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষার নার্কানারা ছেলেরাই কুণীন এবং ‘রোজগারে ছেলের’ উন্নকুণীন, আর ব্যবসায়ারের কাজের লায়ক ছেলেরা শ্রোত্রিয় বলিয়া গণ্য হইতেছে! যখন আনিম্ময় রাষ্ট্রীয় ব্যারেক্টের শ্রোত্রবিজ্ঞানসম্পন্ন আনিপুঙ্গবগণকে এসেছে আনয়ন করিয়া সনাজের নধো সনাজের সর্কোক্ত সোপান্নে বসাইয়া নিজে মস্তক নত করিয়া গ্রামাদি দানে উগাদের পূজা করিয়াছিলেন, তাহার পূর্বে দেশের ব্রাহ্মণাদি সনাজে কি ভাবে কি কামাণ্ডা বিশিষ্টতায় পাত্র নির্বাচন করা হইত, তাহা আর এখন অমূল্য করিবার উপায় নাই; কিন্তু ঐ ঘটনার পর হইতে ঐ পত্র শ্রোত্রজ্ঞানসম্পন্ন রাজ্যবাসে প্রতিপত্তিশালী, রাজপুজিত এবং তদনুসারে নকশাদিতে প্রস্তুত উপার্জনশালী ও বিত্তশালী কাঙ্ক্ষকুঞ্জীয় ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ বংশধরগণকে কল্যাণান করিতে দেশের সমস্ত ব্রাহ্মণ কায়স্থ কুঁকিয়া পড়িল। সেই ধোঁক—সেই আগ্রহের ফলে দেশের পূর্ব ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ সনাজ—বিপুল সম্পত্তী ব্রাহ্মণবংশ এবং কত্রিয়োপেত কায়স্থ সনাজ কাঙ্ক্ষকুঞ্জীয় ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ সনাজে মিশিয়া গিয়া সাতশতী শ্রোত্রিয় ও বাহ্যতুরে কায়স্থ নামে পরিগণিত হইল। তাহার পর যখন বল্লালের কোলীজ প্রণা ব্যবস্থিত হইল,—তখনও মনে হয়, এই বিপুল সনাজে জ্ঞাবার পাত্রবিভ্রাট

ঘটিয়াছিল। সকলেই কাঞ্চকুঞ্জীয় পায়ে কছাদান করিতে থাকায় কাঞ্চকুঞ্জীয় পায়ে দর বাড়িয়া গেল। তাহার উপর কাঞ্চকুঞ্জীয়গণের রাজ্যধারে শ্রেষ্ঠ সম্মান ও প্রতিপত্তি থাকায় তাঁহারাও ক্রমশঃ বাড়িয়া বাড়িয়া ধনীরা কছাই গ্রহণ করিতে লাগিলেন। ইহাতে গরিবের পান্নাভাব ও প্রাচীন বংশের পাত্রীর অভাব ঘটিতে লাগিল। তার পর ধনীর সংশ্রবে ও রাজ্যধারে অসংচিত ভাবে বস্ত্রসম্মান এবং বৃত্তি বন্দোবস্ত থাকায় এবং মাতামহ ও শ্বশুর নিবৃত্তির প্রভাবে কাঞ্চকুঞ্জীয়েরা ক্রমশঃ আলস্ত বিলাসের ক্রোড়ে আপাইয়া পড়িয়া শ্রোতবিয়্যাহৃত চটতে লাগিলেন। কালে তাহারা এতটা বিজ্ঞাটীন হইয়া ভ্রষ্টাচার চটয়া পড়িলেন যে, রাজা বল্লাল সেনের সময়ে দেশের কাঞ্চকুঞ্জীয় সনাত্তের একটা শাসন আবশ্যক হইয়া পড়িল। এই শাসনই কোলীজ প্রণা। তবে এই শাসনের মূল নীতিতে রাজা বল্লাল সেনের নিষেধের স্বার্থ নিহিত থাকায় প্রথমটা বেশ নিষেধ চটতে পারে নাই। রাজা বল্লাল সেন নিজ গুরু সপুত্রপুত্রী বংশীয় অনিচ্ছক ভট্টের তান্ত্রিকাচার লক্ষ্য করিয়া কাঞ্চকুঞ্জীয় ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণের মধ্যে যাহারা তান্ত্রিক আচারে সর্ক্যাপেক্ষা অধুরক্ত এবং সিদ্ধ এমন রাজ্যীয় ১২ জন এবং বারেন্দ্র নাম ব্রাহ্মণকে কুলীন এবং অপর সকলের মধ্যে যাহারা উক্ত জনের জ্ঞাতি ও সমগ্রামী তাঁহাদিগকে বংশজ অর্থাৎ কুলীন বংশজ এবং তদ্ব্যতীত অপর সকলকে শ্রোত্রিয় আখ্যা দান করিলেন। কোলাচার তদ্ব্যতীতের মধ্যে সর্ক্যশ্রেষ্ঠ আচার বলিয়া তৎকালে গণ্য হইয়াছিল। শ্রেষ্ঠ কোলগণই তদ্ব্যতীত কুলীন। বল্লাল সেন নিজে তান্ত্রিক এ তান্ত্রিক গুরুর শিষ্য বলিয়া রাজা মধ্যে রাজ্যীয় ও বারেন্দ্র যে জনকে কুলীন আখ্যা দিয়াছিলেন, তাহারা হইত তখনকার মধ্যে শ্রেষ্ঠ কোল ছিলেন। কুলীচার কোল প্রভৃতি শব্দ হইতেই তদ্ব্যতীত শ্রেষ্ঠত্ববাহী কুলীন শব্দের উৎপত্তি। শ্রোত্রিয় শব্দের অর্থ বেদবিৎ। হইত এমনও হইতে পারে, তদ্ব্যতীতকে প্রাধান্য দিবার জন্য তান্ত্রিক রাজা ও রাজগুরু পরামর্শ করিয়া কাঞ্চকুঞ্জীয় ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যাহারা তখনও বেদাচার রক্ষা করিয়া চলিতেছিলেন, তাহাদের পূর্ব সংজ্ঞা শ্রোত্রিয় নাম লোপ না করিয়াই “শ্রোত্রিয়”কেই দেশের মধ্যে কুলীনগণ্যাপ করিয়া দিলেন। এই শ্রোত্রিয়ের ও আবার উক্তন যথায় অধম—গুরু, মাধা ও কষ্ট শ্রোত্রিয় নামে তিন ভাগ নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন। কে বলিতে পারে, যাহারা সর্ক্যাপেক্ষা দৃঢ়ভাবে বেদাচার প্রতিপালন করিতেন, রাজচক্রান্তে তাহারা কুলীন-শব্দ কষ্টশ্রোত্রিয়

আখ্যা পান নাই, হয়ত এই জন্যই বাবুজী চাইয়াছিল, কুলীনের। বংশজ কন্যা ও কষ্টেশ্রোত্রিয়ের কন্যা গ্রহণে কুলজই চাইবেন : আর শ্রোত্রিয়ের পক্ষে বাবুজী হটল শ্রোত্রিয় কুলীন পায়ে কন্যাদান করিলে-সম্মানিত হইবেন । রাজার এই বাবুজীর আবার পাঠবিদ্যাটো ঘটল । বংশজ ও কষ্টেশ্রোত্রিয়ের! অধিক অর্থদান করিয়া কুলীনের কর্তৃত্ব করিয়াও নিজেরে জন্ত সম্মান 'ক্রয়' করিতে লাগিলেন । কুলীনের কুলীন কন্যা ও শ্রোত্রিয় কন্যাত পাইতেনই আবার কুলনাশে প্রীত হইলে বংশজ ও কষ্টেশ্রোত্রিয়ের কন্যা অর্থ ও বিত্ত মত পাইতেন, ; কিন্তু শ্রোত্রিয় ও বংশজের পাত্রীর অভাব হইতে লাগিল । এত বৃত্তে বংশজেরা অর্থলোভে শ্রোত্রিয় ও বংশজ পায়ে কন্যাদান না করিয়া তাঁহাদের নিকট কন্যাবিক্রয়ী হইয়া উঠিলেন । ক্রমশঃ বংশজের কন্যাবিক্রয় এবং কুলীন পাত্রের কুলনাশক বিবাহে সংকুলীনে কন্যাদিগের পাত্রাভাব ঘটিতে লাগিল । তখন রাজবিধি বলবৎ পাকিয়া ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারিত অরজরা কন্যাদান বন্ধ হইয়া অবিবাহিতা অধিকবয়স্ক কুলীন কন্যারীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে লাগিল । এই গাওগোল যুগাবতার চৈতন্যদেবের কিছু পূর্বে পর্য্যন্ত চলিয়া আসিয়াছিল । চৈতন্য-জন্মের ২৭১৮ বৎসর পূর্বে ঘটকরাজ দেবীর কেবল রাণীর কুলীন-কন্যারীর পাত্র বাবুজী স্থলত করিবার জন্য, বসন্তবিধি অনুসারে কুলজগ্রহণের স্বতন্ত্র বাবুজী করিবার জন্য এবং দেশের নূতন রাজশক্তি মূল্যনান অত্যাচার-জনিত, সাচরণজনিত, চবিত্ত ব্রাহ্মণবংশগুলির বাবুজী করিবার জন্ত অর্থাৎ তাৎ-নিগকে বাড়াই করিয়া সনাজের মধ্যে স্বতন্ত্র স্থান নিবাস জন্য নেল বন্ধন করিলেন । “সোমধাং নেলকো নেলঃ ।” সনসোমাক্রান্ত ব্যক্তিবর্গকে বাড়িয়া এক একটা করিয়া চিহ্নিত নেল নামিলেন । “তেজীয়সাং ন দোষায়,” “অশ্রিত পড়িলে শুদ্ধ হয় সর্গজন” ইত্যাদি বচনের জোরে এতদিন দেশের যত বড় বড় পণ্ডিত ও প্রতিপত্তিশালী ব্রাহ্মণপুত্রব কুলবিধি, ধর্ম্মবিধি, সনাজবিধি উপেক্ষা করিয়া চলিতেছিলেন । কাজেই নেলবন্ধনের সময়ে দেবীররের সনসামগ্রিক ব্রাহ্মণবংশীর মধ্যে গাভারা বড় কুলীন বংশধর ও গাভারা পণ্ডিত বা প্রতিপত্তিশালী, তাঁহাদেরই অধিকাংশ বেশীদোষাক্রান্ত বলিয়া প্রমাণিত হইয়া একটা না একটা নেলের মধ্যে নিবিষ্ট হইলেন । গাভারা নেলের বাহিরে ব্যক্তিরে রহিলেন, দরিদ্রে হইবে দেবীরর তাঁহাদের বিশেষ নাসাম্বক অর্থাৎ নেলভুক্ত করিবার মত কোন দোষ পান নাই । অনেকী কুলীন সনাজের মধ্যে নগদা, নিরীহ, দরিদ্র, সদাচার ব্রাহ্মণের সংখ্যাই বেশী ছিল, এরূপ অল্পমান করিলে

অসম্ভব হইবে না। দেবীবরের সংস্কার বা নেলবিধি ইচ্ছাদের স্পর্শ করিলু না, হয়ত করিবার আবশ্যকই ছিল না। নেলী কুলীনসমাজের দোষ সমাজের সমাচার আক্রমণের মধ্যে বা একনেপের দোষ অপর নেলের সংক্রান্ত না হয়, এতদুভয়ে প্রতি নেলের প্রকৃতি-পানটী বা পরিবর্ত প্রণার বিধান করিয়া দেবীবর অতি উৎকৃষ্ট প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন। এইরূপে ১৮৭ শতাব্দীতে রাজ-শক্তির সাহায্য না পাওয়াও কেবল ঘটকের আসনে বসিয়া দেবীবর রাজ্য-ব্রাহ্মণসমাজে নেলবিধি প্রচলিত করিয়া যে ভাবে সমাজ-সংস্কারের স্বত্বপাত করেন, সেই ভাবে বারেন্স সমাজে পণ্ডিতাগ্রাগণা উদয়নাচাৰ্য্য ভাড়াটী কাপ ও পঠিভাগ করিয়া সমাজ-সংস্কার করিয়াছিলেন। কালে সকল বিধিই বশবৎ রাপিবার শাসন-শক্তির অভাবে শিথিল হইয়া পড়ে। পাণ্ডিত্য ও প্রতিপত্তি কীল বসীয়ায় থাকায় নেলী কুলীন সমাজ দোষাশ্রিত বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হইলেও দেশের শ্রদ্ধা ভক্তিত্ব হইল না, কাজেই তাঁহারা প্রবল থাকিয়া অনেক কুলীন সমাজকে “দেবীবর ছাঁটা বংশজ” আখ্যায় বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলিলেন। সমগ্রদেবী প্রবলের অত্যাচারে এবং দেশের চর্চাগাবশতঃ বেদাচারের পরিভাষে ক্রমশঃ অনেক কুলীন সমাজে নেলী কুলীন সমাজে নিশ্চয়া ঘাইতে লাগিলেন। এখন দেশে বলালবিহিত আদি বংশজগণের ও দেবীবর ছাঁটা বংশজগণের স্বত্ব অস্তিত্ব নাই বলিলেই চলে। এইরূপে দেবীবরের অতি অল্পদিন পরেই কুলজট, রঙ, পিও, বলাংকার দোষ সংযুক্ত, যবনায় গ্রহণ ও যবন পরিবাদগ্রস্ত বহুবিধ দোষসন্নিহিত নেলীকুলীনেরাই দেশের মধ্যে কোলীনোর স্পর্শ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। লম্বা গলায় দোষ গুলিঃকই গোরবর ও মহর্ষের পরিচয়হীন করিয়া চলিতে লাগিলেন। আমি ফুলেমেলের কুলীন, আমি খড়নহমেলের কুলীন, আমি ছায়ানরেন্দ্রীনেলের কুলীন, আমি চট্টরাঘবী নেলের কুলীন—ইত্যাদি। কি কি বিষয় দোষে এই সকল নেলের সৃষ্টি হইয়াছিল, সাধারণতঃ কুলীন সমাজ ও ঘটকগণ বাতীত আর কেহ বড় স্মরণ নাথেন নাই; তাই তাঁহাদের একপ নিখার উপর, ভ্রষ্টাচারের উপর গোরবর ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিবার স্বেচ্ছা হইয়াছিল। তাঁহারা ভাবিতেন না অথবা ভাবিলেও গোরবর আবরণ দিয়া একটা সামাজিক নিয়ম দণ্ডকে লুকাইতে চেষ্টা করিতেন। দেবীবর ঘটক নেলের নামে নেলী কুলীন সমাজকে বংশাভ্যুত্থানে পরিচয় দিতে বাধ্য করিয়া কোশলে এমন ভীষণ দণ্ডে দণ্ডিত করিয়া গিয়াছেন যে, পুরুষপুরুষের সমাজভাবে এবং স্মিতমুখে স্বীকার করিয়া যাঁইতে হইবে যে, আমি অমুক নেলের কুলীনবংশের অর্গাং আমার পূর্বপুরুষ এই নেলের গঠনহতু অমুক

অনুক নৃন্যাদেশের অসুষ্ঠাভা ছিলেন। ঋগ্ভার এইরূপে দুলে নেল বিফুঠাকুরের সন্তান বলিয়া বেশে দেশের নিকটে আশ্রয়গোরব প্রকাশ করেন, তিনি ভাবেন না যে তদ্রূপ পরিচয় দ্বারা তাঁহার কোন পূর্ব পুরুষকৃত “নান্দা দান্দা বারুইচাটী মলুকছুড়ী” এই চারিটি নৃন্যাদেশেরই ঘোষণা করিতেছেন। নিরুজ্জ্বল পাপের কীটন নিজে করিলে পাপ নষ্ট হয়—এইরূপ একটা ঋষিবাক্য আছে; তদনুসারে মেলী কুলীনসমাজের বংশধরেরা আজ চারিশতাধিক বৎসর ধরিয়া প্রত্যেক বাক্তি সে প্রায়শ্চিত্তটা বিধিনত প্রকারেই করিয়া আসিতেছেন। বলিয়া রাখা ভাল এই প্রলাপ-লেখকও কুলেনেলের সন্তান।। রাষ্ট্রের সমাজের জায় বারেন্দ্র সমাজেও ঠিক এই ব্যবস্থা চলিয়া আসিতেছে। যাক্, কথায় কথায় আমরা অনেক দূরে গিয়া পড়িয়াছি। অতঃপর মেলীকুলীন সমাজ অর্থাবিস্তারভাৱে আশায় বংশজ-কজ্ঞা গ্রহণ করিয়া ভগ্ন হইতে লাগিলেন। এই সকল ভগ্ন কুলীন পাত্রে কজ্ঞাদান করিয়া বংশজ ও শ্রোত্রিয়েরা কুলীনে কজ্ঞাদানের গর্গ অদৃশ্য করিতে লাগিলেন। কোলীজবিধি অনুসারে নিকম কুলীন পাত্র শ্রোত্রিয়ের পক্ষে চলিত ছিল না, কিন্তু বংশজের একান্ত অপ্রাপ্য ছিল। বংশজেরা ও কষ্টেশ্রোত্রিয়েরা অর্থবলে কোন কুলীনের কুলভগ্ন করিতে না পারিলে নিকম কুলীনি পাত্রে কজ্ঞাদানের গোরব লাভ তাঁহাদের ভাগ্যে ঘটত না। কাজেই তাঁহারা এইরূপে কোন ভগ্ন কুলীনে (প্রকৃত প্রস্তাবে কুলভগ্ন অকুলীনকে) কজ্ঞাদান করিয়াও কুলীনে কজ্ঞাদানের অভিনয় করিতে লাগিলেন। ইহাতে তাঁহাদের বাসও কিছু লঘু হইত। এই সময়ে বিজ্ঞা ব্রহ্মণের প্যতি সাধারণতঃ কুলীন-সমাজ বিশেষতঃ, বংশজ সমাজ হইতে লোপ পাইল। তখন কুল-গোরবকে মূলধন করিয়া ভগ্ন কুলীনেরা স্বকৃত ভগ্ন, স্বকৃত ভগ্নের পুত্র, স্বকৃত ভগ্নের পৌত্র তৎপরে চারিপুরুষে, পাচপুরুষে কুলীন বলিয়া আপনাদের পুরুষাশ্রুত্রে কোলীজের দাবী রাখিয়া বিবাহ ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন। ভগ্ন কুলীনের ৭ম পুরুষ অতীত হইলে তিনি আর কুলীনত্বের দাবী করিয়া সম্মান বা বিবাহ ব্যবসায় রক্ষা করিতে পারিতেন না। তখন তাঁহাদের নিজেদের কজ্ঞাদানের অন্তরায় ঘটত এবং স্ববংশের আদি স্বত্ব বা নাতানত দত্ত বিত্ত ক্রমশঃ পুরুষাশ্রুত্রে বিভাগ বেশে ক্ষয় হওয়াতে কুলীনপাত্রে ঋগ্ভারা কজ্ঞা দিতে পারিতেন না, তাঁহারা নিজের অরূপ বংশজ পাত্রে বা কষ্টেশ্রোত্রিয় পাত্রে কজ্ঞা বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিলেন। এই কজ্ঞাপণ দিয়া কজ্ঞাক্রয়ও অনেকের ভাগ্যে দরিদ্রতা বশতঃ

ঘটিত না। ভাষাতে অনেক বিখ্যাত বংশ লোপ হইতে লাগিল। ওদিকে অর্থলোভে নিকম কুলীনেরা ভঙ্গ হইয়া নিবাহ ব্যবসায় আরম্ভ করায় নেলী কুলীন সমাজে স্বদেশের পাণ্ডীত্বের প্রাজ্ঞাভাব ঘটিল। অনেকে এই সমাজ মেলাস্তরে বিবাহ দিয়া কল্যাদার হইতে উদ্ধার হইতে লাগিলেন। ইহাতে দেবীবরের শাসনবিধি অমূল্যে খণ্ডিতকে “মেলকাটা” বোলে জানাত্তনেন গ্রহণ করিয়া কুলীন সমাজেও কতকটা চীনমর্যাদা হইতে চইল। দেবীবর সমাজ-সংস্কারের ছদ্ম যে মেল বন্ধন করিয়াছিলেন, তাহার ফল কিছুদিন চলিয়াছিল। তৎপরে বল্লাল বিধির অপব্যবহারে কুলীন সমাজের একদিকে যেমন কুলনাশ, নোষাশয় ও কুলীন পাজের পাজ্ঞাভাব, অল্পদিকে বংশজ শ্রোত্রিয়ের পাতীর অভাব ঘটয়াছিল। দেবীবরের মেলবিধির অপব্যবহারে ঐ ছই দিকে ঠিক সেই সকল নোষই ঘটিতে লাগিল; অধিকতর কল্যাবিক্রম, বহুবিবাহ ব্যবসয়ে পরিণত হইয়া রাষ্ট্রীয় ত্রাঙ্কণসমাজে ভীষণ কলঙ্ক চাপাইয়া দিল। এই সকল দোষ সংক্রান্ত হইয়া মেলী কুলীন সমাজকেও বিপর্যাস্ত করিয়া ফেলিল। আরও উত্তরকালে আর কয়েকজন ঘটক চূড়ানবি ঐ সকল নোষাদোষ বিবচনা করিয়া নেলীকুলীন সমাজ আবার কতকগুলি ভাব, থাক, যুগের ভাণ নির্দেশ করিয়া দিলেন। তা’র পর সমাজ ঐ এক ভাবেই চলিতেছিল। পরে জনশঃ ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে বর্তমান অর্থদৈবত কোলিঙ্কের উপাসনা পাজ্ঞাভাব ঘটাইয়া তুলিয়াছেন। পাজ্ঞাভাবের ইতিহাস দেখিতে গেলে আমাদের দেশে প্রায় সকল কালেই একভাবে চলিয়া আসিতেছে; কাজেই এখন “অঙ্কেপ করিলেই বা ফল কি হইবে? আবার একটা বল্লাল বা দেবীবরের মত শক্তিশালী পুরুষ আসিয়া এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করিলে আবার কিছু দিন এ চূর্ণশার প্রতিকার হইবে না। তবে দেখা যাইতেছে, যিনি যখনই সংস্কারবিধি প্রবর্তন করিয়াছেন, কিছুদিন পরে কল্যাপকের আগ্রহকে অবলম্বন করিয়া বরপক্ষ অর্পকেই আপনাদের প্রোক্ত মূল্য হ্রাস করিয়া অনর্থ ঘটাইয়াছেন। আবার শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠে জানা যায়, কল্যাপণ গৃহীতার কল্যাবিক্রমীর তত্ত্ববিজ্ঞেতার বেক্ষণ নিন্দা ও ইচ্ছালোকে এবং পরলোকে দণ্ডের বিধান করা হইয়াছে যে, তৎকালে “চক্রো দার-সংগ্রহের” নিবৃত্ত বরপক্ষকে কতই না ব্যস্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইত তাহা আমরা শ্রাদ্ধকালে রুচিরোপাধ্যানে জানিতে পারি। হইতে পারে এই সমাজে “অষ্টবর্ষা ভবেদুগোদী নববর্ষা চ রোহিণী দশমে কল্যকা পোক্তা অতঃ উক্তঃ

রক্তস্রাব" নিয়মটা বিধিবদ্ধ করিয়া মেয়েটার আটবৎসর ঘাইতে না ঘাইতে তাহার পিতা নাভাকে গৌরীদানের ফল লাভে প্রলোভিত করিয়া দারসংগ্রাহের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। আর এষ্ট সময়েই কল্যাণকদম্বান রূপ কুৎসিত প্রথা এত বাড়িয়া গিয়াছিল যে, কল্যাণ গৃহীতাকে কল্যাবিক্রয়ী, গুরুবিক্রয়ী—বলিয়া সমাজে নির্মিত, পতিত এবং অশুভ ভীষণ নরকগামী করিবার ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল এবং আধুনিককালে সামান্য কথায় কল্যাবিক্রয়ী বংশজ ও কষ্টভ্রাতার দিগকে পাটাবেচা নাম দিয়া স্থগা করা হইত। অতএব দেখা-গেল, কি প্রাচীনকাল, কি মধ্য কাল, কি ইমানীতুন কাল—সর্বকালেই দারকর্মে অর্থাৎ বিবাহব্যাপারে একপক্ষ অর্গকে স্বার্থের পরমার্থ করিয়া তুলিয়াই অনর্থ এবং পাত্যপাত্তী সংগ্রহে বিভ্রাট গটাইয়া তুলিয়াছেন। এই মূল কথার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া যদি কেহ মনেই কুঠারামাত করিবার কোন উপায় করিতে পারেন, তবে যদি কোন প্রতিকার হয় হয়। এইরূপ ভাবিতেছি এমন সময়ে মাতৃদেবী বলিলেন “বড় পুতীকে পাত্যপাত্তের পছন্দ হইয়াছে, তাহার নগর কিছুট মটাবে না, তবে বিবাহের ভয় তাহারের দাড়া দায় হইবে সেটা বোধ হয় নিতে হইবে।”—আনি ননে ননে বলিলান “এবমন্ত

ত্রীরোগাতুর শর্য।

বাসন্তিকা ।

কত না পথ বাওয়ার পরে এলে আজি গরব ভরে
পীতাম্বরে ছড়িয়ে তঁহুঁলতা,
কুটিলে দিয়ে কুলের রাশি স্নোৎস্না মুখে ছড়িয়ে হাসি
পানীর গানে ছুটিরে কলকণা ।
গাভের পাতা জ্ঞানল করি নল্পরীতে কানন ভরি
ঝিকির ডাকে সজাগ করি বন ;
দৃশ্যভাসা বনের পারে মূপনা কোন্ নদীর ধারে
বিছিয়ে দিয়ে উতলকরা মন !
গানের ক্ষেত্রে ছড়িয়ে সোণা আসন যেন জরির বোনা
রবির করে ঝলক হানে চোখে,
পুষ্পকোটা কাননমাঝে উদাসকরা পাণ্ডু দাঁকে
ভ্রমরগুলো যাচ্ছে মিছে বকে !

বকুলঝরা শিথিল কেনে হৃদয়-হরা ফুলের বেধশ
 সেজেছ আজ তে লাবণ্য-বাণী,
 নাতিয়ে দিয়ে বিশ্বপ্রাণে পক্ষে রূপে স্পর্শে গানে
 স্বরগ ত'তে প্রোনের সুরা 'আনি'
 মরাল ডাকে বনের মাঝে যেন তোমার কাঁকণ বাজে
 মধুর স্বরে ছুটিয়ে কণকনি
 সন্ধ্যাবেলা তারার রাশি আকাশতলে উঠছে তাসি
 যেন তোমার মুকুটঝরা নবি,
 ছুটিয়ে দিয়ে লাল করবী এসেছ আজ অগ্নি পরবী
 আফিম ফুলে আলতা ঢালি দিয়া,
 তোমার সিঁথের সিঁদূর ঝরি, ডালিন ফুলে দিচ্ছে ভরি'
 ছোঁরির খেলা রঙ্গে নাতাইরা,
 কোকিল ডাকে আমের শাখে, নিবিড় ঘন পাতার ফাঁকে
 তোমার চোখে কাজল সম কালো,
 গোলাপ গাছে ফুলের রাশি যেন তোমার 'আঁখির তাসি
 যেন তোমার বৃকের রাজ্য আলো !
 কুলেছ আজ বায়ু তুফান ছুড়িয়ে দিয়ে ক্রান্ত পরাণ
 মুছিয়ে দিয়ে শাস্ত চির মুখ,
 বাথিত কোন্ জীবনধানি কোলের পরে নিলে টানি
 শাস্ত করি ডেউদোশান বুক !
 এসেছ আজ আকাশ ভরে' এসেছ আজ বাতাস ভরে'
 এসেছ আজ কানন ভরে' তুনি,
 এসেছ আজ ফুলের মাঝে, এসেছ আজ আজ উদার সাজে
 ভ্রমররূপে ফুপের কলি চুমি'—
 এসেছ আজ বায়ুর দোলে এসেছ আজ ধরার কোণে
 প্রবাস-ফেরা মেয়ের মত চেমে,
 মা'র বক্ষ করে থালি হৃদয় পুরে না'র ঢলালি,
 কাদিয়ে যারে অজানা কোন্ দেশে ।

শ্রীমতী নিরুপমা দেবী ।

পদাবলী সাহিত্য

সংগ্রহ ও প্রচার

প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যে বৈষ্ণব পদাবলী বহুতরম অধিকার করিয়া ইহাকে সাহিত্য-জগতে অপূৰ্ণ নহিমোচ্ছল করিয়া রাখিয়াছে। পদাবলী সাহিত্য আমাদের অপূৰ্ণ সম্পদ। আমরা শুদ্ধ টেটাই নাত্র সৰল পদাবলী সাহিত্য বিধ করিয়া জগত-সভায় উপস্থিত হইবার চক্ৰ অগ্রসর হইলে, মানাদিককে কেহ দরিত্র বনিয়া উপেক্ষা করিতে পারিবেন না। পদাবলী-সাহিত্য আমাদের শিরোনগি—ইহারই অপূৰ্ণ প্রভায় আমাদের মগন বদন প্রদীপ্ত রহিয়াছে।

অগণিত কীটের নৃগুণ্যাস্তব্যাপী অক্লান্ত পরিশ্রম ও প্রাণপাত দ্বারা যেমন সমুদ্রগর্ভে একটি দ্বীপ বা ভূমিখণ্ড জাগিয়া উঠে, তজ্জপ বহুশতবর্ষব্যাপী অগণিত ভক্তবৃন্দের জীবনব্যাপী একনিষ্ঠ সাধনা ও প্রাণপাত দ্বারা পদাবলী সাহিত্যের দ্বীপে দ্বীপে অপূৰ্ণ-পদাবলী-সাহিত্য গঠিত হইয়া উঠিয়াছে। ইহা সাময়িক উজ্জ্বলের পরিত্যক্ত নিদর্শন নহে। ইহা বঙ্গবাসীর রক্তে নাংসে, জীবনে মরণে, ইহকালে পরকালে, ওতপ্রোত ভাবে বিচ্ছিন্নিত। পদাবলী, সাহিত্য হিসাবে গঠিত হয় নাই—হইলে বৃষ্টি একপ হইত না। পদাবলী-সাহিত্য আমাদের জীবন-সঙ্গী ও প্রাণারাম—মানব-জীবনের চরম সঙ্গতি লাভের সোপান ও বিরামস্থল। আমাদের পদাবলী-সাহিত্য তাই এত অপূৰ্ণ, এত উচ্ছল, এত মধুর! বঙ্গ-সাহিত্য এই পদাবলীকে আপনার অন্তর্ভুক্ত করিতে পাইয়া ধন্য হইয়াছি—আমরা বঙ্গভাষাকে নাত্য-ভাষারূপে প্রাপ্ত হইয়া চরিতার্থ হইয়াছে।

পদাবলী, সাহিত্য, সঙ্গীত ও ভগবৎ সাধনার ত্রিবেণী-সঙ্গম। যাহা কিছু সত্য শুদ্ধ, যাহা কিছু মধুর, যাহা কিছু পবিত্র—সমস্তই অত্যাশ্রিত বিভাবনা ও চরমগম্য স্বপ্ন বিচারণা দ্বারা অনুস্থিত হইয়া এক অপূৰ্ণ অমৃত রসের উদ্ভব হইয়াছে। অজ্ঞানিক পথিমার্গে ইহার রসাস্বাদনে কখন না কখন চরিতার্থ না হইয়াছিল, এরূপ বঙ্গবাসীর সংখ্যা নিতান্তই বিরল।

শিল শিল করিয়া নচে—জগতের ধাবতীর মৌল্য্যই স্পৃষ্ট করিয়া পদ-কর্ষণ, পদাবলী-সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছেন। এতদিন আমরা একক, ইহার

বিশ্ববিনোদন সৌন্দর্য্য উপভোগ করিয়া বৃদ্ধ চটতেছিলেন—আমাদের সুবৃত্ত-
নন্দিত বিপুল রত্নরাশি, যকের মত আকড়িয়া বসিয়াছিল। এতদিন
আমরা, আমাদের সাদন-লক্ষ প্রেম ও ভক্তি-রচিত
পদাবলীর সংস্করণ
ও প্রচার। সৌন্দর্য্যের মূর্ত্ত-নিকেতন, নিজেই অবলোকন করিয়া স্বর্গীয়

নিমল আনন্দ উপভোগ করিতেছিলেন—ভগবৎ-কৃপালক্ষ
বিচিত্র দান, জগতের সর্ব্বজ, সকলে সমভাবে উপভোগ করিয়া কৃতার্থ হউক—এ
কল্পনা এতদিন আমাদের মনে উদিত হয় নাই। ত্রিফালক ধন বণ্টন করিয়া
মহোৎসব করাই বৈধবের কার্য্য—ভগবানের কৃপা-লক্ষ আশীর্বাদও যে জগতের
সকলকেই সমভাবে বণ্টন করিয়া দিতে চাইতে, তাহা আমরা একবারে
অনবহিত ছিলাম। দরিদ্র-কুটীরে স্নানস্তকমণি থাকিতে পারে, একথা কেহ
অজ্ঞান করে নাই—আমরাও কাহাকে আমাদের সঞ্চিত রত্নরাশির সন্ধান
করিয়া দিতে অগ্রসর হই নাই।

এখন, আমাদেরই এক ভাণ্ডার কবি, জগত সমক্ষে আমাদের গুরুর
সন্ধান প্রচার করিয়াছেন—ইঙ্গিতে বুঝাইয়া দিয়াছেন, আমাদের পর্ণকূটীরে
কুটীরে অমৃতের কত ছড়াছড়ি, কোহিল্লুরের কত গড়াগড়ি,
পাশ্চাত্যগণের ইহার
সমাধা। ও সৌন্দর্য্যের কত বাড়াবাড়ি পাশ্চাত্যজগত এই স্থানের
সন্ধান—সন্ধান কেন, কেবল আভাসমাত্র—পাইয়াই বিমুগ্ধও

স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছে ! এখন আমাদের দরিদ্রের পর্ণকূটীরের প্রতি পাশ্চাত্য জগত,
উগ্রীব দোহাক ও পোপ্প-দৃষ্টিপাত করিতে আরম্ভ করিয়াছে। আমাদের সঞ্চিত
সৌন্দর্য্যের মূর্ত্ত-নিকেতন দেখিতে ও উপভোগ করিতে পাশ্চাত্যগণ কিয়ৎ
পরিনাশে চঞ্চল হইয়াছেন। এখন আমরা কৃপণতা না করিয়া আমাদের রক্ষণার
উদ্যোগ করিয়া দিই—তাহারা আমাদের সম্পদ উপভোগ করিবার সুযোগ
প্রাপ্ত হইয়া ধন ও কৃতার্থ হউক।

কিন্তু আমরা যে পদাবলী-সাহিত্যের অধিকারী বলিয়া বিশ্ব সাহিত্য-সংক্ষেপ
বিশিষ্ট স্থান সঞ্চয় করিবার প্রয়াসী হইয়াছি, সেই পদাবলী-সাহিত্যে দুর্ব্বলতা
ও অনাদরের কথা স্মরণ করিয়া আমরা নিতান্তই মর্ম্মাহত ও সঙ্কুচিত হই।

পদাবলী-সাহিত্য সমুদ্র বিশেষ। ইহা চাই এত শত বৎসরের সঞ্চয় নহে।
চৈতন্যদেবের পূর্ব্ববর্ত্তীকালে চণ্ডীদাস ও বিজ্ঞাপতি কবিশৃঙ্গলের অপূর্ণ পদাবলী
সমগ্র সাহিত্য-জগতকে এখনও গৌরবান্বিত করিয়া রাখিয়াছে। চৈতন্য
মহাপ্রভুর ভাস্কর দীপালোকের রশ্মিরেখা সম্প্রতি প্রেম সরোবরে অগণিত

শতদল যুগপৎ প্রগৃহীত হইয়া সমগ্র ভূবন আলোকিত এবং অপূর্ণ সৌরভে ক্ষুদ্র মানবচিত্রকে প্রমত্ত করিয়া তুলিয়াছিল। নিতাইচাঁদের বিধ্বস্তশির অধঃক্ষেপে একেবারে শত শত ক্ষুদ্র দিগ্‌দিগন্ত সমুদ্ভাবিত করিয়া প্রগৃহীত হইয়া উঠিয়াছিল। অনন্তর গৌর নিতাইয়ের শ্রেণীপরিষদারায় অভিসিক্ত হইয়া ক্ষীণপ্রাণ ও হীনবুদ্ধি মানবের মুগ্ধচিত্ত গুস্তিলাভ করিল—দেশময় গ্রামে গ্রামে একাধারে ভক্ত, কবি ও শ্রেমিকের উদ্ভব হইল। সেই সময় চাইতে বৈষ্ণব কবিগণ তারম্বরে যে গান ধরিলেন, বহুকাল ধরিয়া তাহার আর বিরাম হয় নাই।

“পদকল্পতরু”, “পদামৃত সমুদ্র”, “পদকল্পলতিকা”, “পদচিত্তামণিমালা”, “গীতচন্দ্রোদয়” প্রভৃতি পদ-সংগ্রহ গ্রন্থ-নিচয়ে এইরূপ বহু সংখ্যক প্রসিদ্ধ পদকর্তা বিরচিত পদাবলী সংগৃহীত হইলেও, প্রাচীন হস্তলিখিত পুথিবাদে এমন স্মরণ স্মরণ অপ্রকাশিত-পূর্ণ পদাবলী আবিষ্কৃত হইতেছে, যাহা সাধারণ নথো প্রচলিত

পদাবলী অপেক্ষা কোন অংশেই চীন নচে। পদ-সংগ্রহ গ্রন্থমধ্যে সংগ্রহকার রসপর্যায়ানুসারে এক এক বিভাগের কতকগুলি করিয়া সমতাবাপন্ন পদাবলী চয়ন করিয়া পুস্তক সঙ্কলন করিয়াছেন—সুতরাং, সেই সকল গ্রন্থে যাবতীয় পদকল্পগণের সমগ্র রচনা একত্র সংগৃহীত হওয়া সম্ভবপর নহে।

এ দেশে যুগাবয়ব প্রতিষ্ঠিত চটবার পূর্ণ, পদকর্তা গ্রন্থকারগণের রচনা, তত শীঘ্র প্রচারলাভ করিতে পাইত না। ইহার ফলে হইয়াছে এই যে, এই সকল পদসংগ্রহ গ্রন্থসূত পদাবলী বাতীত অসংখ্য উৎকৃষ্ট প্রাচীন পদাবলী অচিরে বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে। যে সকল প্রাচীন পদসংগ্রহে গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে, তৎসমুদয়ে আনন্দা তিন সহস্রের অধিক পদাবলীর পরিচয় প্রাপ্ত হই না। এমন প্রাচীন পুথির উদ্ধার কালে প্রায়ই নব নব পদকর্তা ও তাঁহাদের রচিত বহু সংখ্যক পদাবলীর সন্ধান প্রাপ্ত হইতেছি।

অপ্রকাশিতনামা পদকর্তা বাতীত অনেক প্রণাতনামা মহাজনগণের যাবতীয় পদাবলীই সংগ্রহ-গ্রন্থে স্থান লাভ করে নাই। সঙ্কলয়িতার দৈর্ঘ্য, জ্ঞবিদ্যা ও প্রবৃত্তি অনুসারে, পদাবলী সংগ্রহ গ্রন্থ সঙ্কলিত হইয়াছে। বর্তমান সংগ্রহ-গ্রন্থে মিচয়ে পরবর্তীকালের মহাজন পদাবলীর কথা দূরে থাক, সঙ্কলয়িতার সমকালে বা পূর্ববর্তীকালে রচিত অনেক সুপ্রচারিত পদাবলী এই সমস্ত সংগ্রহ-গ্রন্থে স্থানলাভ করে নাই।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা চণ্ডীদাস, ভগদানন্দ, নয়নানন্দ প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ কবিগণের নানোন্মেষ করিতে পারি। এখন, এই অপ্রকাশিত প্রাচীন মহাজন রচিত পদাবলী বথান্থানে রসপর্যায়সারে সন্নিবেশিত করিয়া একপানি স্বতন্ত্র পদাবলী সংগ্রহ-গ্রন্থ প্রকাশিত করা একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

আমরা আপনাদের দাতৃত্বভার প্রতি ঐকান্তিক অত্যাগ ও দাতৃত্বভার উন্নতি-কল্পে আপনাদের প্রাণপণ যত্নের কথা স্মরণ করিয়া আপনাদের এ বিধীয় দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি—আশা করি আপনারা বিষয়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া এই প্রস্তাবটির প্রতি যথোচিত মনোযোগ প্রদান করিতে বিরত হইবেন না। কাগের করাল

সংগ্রহ কার্যের

তৎপরতা

গ্রাস হইতে অপ্রকাশিত গ্রন্থরাজি অচিরে উদ্ধার করিতে আপনারা কালবিলম্ব না করিয়া কার্যক্ষেত্রে অগ্রসর হউন। উপযুক্তরূপ অঙ্কনস্থান-কার্য আরম্ভ হইলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, অল্পকাল মধ্যে পদাবলী সাহিত্যের একটি বিরট সংগ্রহ সাধিত হইতে পারে। এরূপ সংগ্রহ যে আমাদের বঙ্গসাহিত্যের একটি মহা গৌরবের বস্তু হইবে, তাহা আমরা বিশ্বাস করিয়া বলিবার আবশ্যক আছে মনে করি না।

আমরা বহুকাল অবধি ‘পাদসমুদ্র’ নামক বিরট পদাবলী সংগ্রহ-গ্রন্থের নাম শুনিয়া আসিতেছি—ইচ্ছাতে নাকি দশ পুনর সহস্র মহাজন পদাবলী ‘রসপর্যায়সমুদ্রে’ সংগৃহীত আছে। এই গ্রন্থ কিম্বা এখনও পদসমুদ্র’

পর্যাপ্ত শিক্ষিত সাধারণের নয়নগোচর বা আয়ত্তাধীন হয়

নাই—অনেকে আবার এই গ্রন্থের অস্তিত্বেই সন্দিহান! আমাদের বিশ্বাস, এরূপ গ্রন্থ বর্তমান থাকিবারই কথা। এইরূপ গ্রন্থের সন্ধান করিতে পাইলে, আমাদের প্রস্তাবিত সংগ্রহ-কার্য অনেক সহজ হইতে পারে—হয়ত আপাততঃ নূতন করিয়া পদসংগ্রহের আর আবশ্যক হইবে না। এই রূপ গ্রন্থের সন্ধানে অবিলম্বে নিযুক্ত হওয়া একান্ত আবশ্যক হইয়াছে। বিশেষে হয় ত, সভ্য-সভাই নিরাশ হইতে হইবে। তখন আমাদের অবহেলাজনিত পাপের ভার রক্ষা করিবার স্থান রহিবে না।

আনাদের ব্যক্তিগত কীণতম চেষ্টায় সহস্রাধিক প্রাচীন পুথি-সংগৃহীত হইয়াছে—এই গ্রন্থনিচয় মধ্যে বহুতর প্রাচীন পদ ও পদকর্তার সন্ধান প্রাপ্ত হইয়াছি। পূর্বে আমরা মাত্র কয়েকপানি পদ-প্রাচীন পুথি ও পদাবলী সংগ্রহ গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছি।—সেইগুলি বাতীত, কুঙ্গ বৃহৎ আরও অনেকগুলি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পদসংগ্রহ-গ্রন্থ আমাদের নিকট

রহিয়াছে। উপযুক্ত সহকারীর সহায়তায় অনন্যকন্ধ্যা হইয়া রীতিমত তৎপর ভাঙ্গা-সহিত কিছু দিনকাল এই সংগ্রহকারী চাকর্য্যইবার সুযোগ প্রাপ্ত হইলে, অচিরে যে আমাদের ঈশ্বরীত পদসংগ্রহ-গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইতে পারিলে, তাহা যথেষ্টরূপ দৃঢ়তার সহিতে বলিতে পারা যায়।

এখন আমাদের সাধনায় প্রাণনা, আপনারা এই কার্য্যটি আবশ্যক ও সঙ্গত বিবেচনা করিলে, ইহার অসম্পাদনের বিহিত ব্যবস্থা করুন। আপনারা ইচ্ছার ব্যয়ভার সংগ্রহ করিয়া দিলে, কোন বিশিষ্ট স্থানকে কার্য্যভার গ্রহণের প্রাণনা কেন্দ্র করিয়া আবশ্যক মত বিভিন্ন ছেলার পরিভ্রমণ দ্বারা এই সংগ্রহ ও সম্পাদন কার্য্য নিরূপিত হইতে পারিবে।

মাতৃভাষায়, কল্যানে নিঃস্বার্থ ভাবে ব্যয় করিতে আশ্রয় লক্ষ্যবস্ত্র মহামাতৃভাষণ তাদৃশ স্কুতিত নহেন—বাণীর সেব্য লক্ষীর বরণপূর্ণগণ যে এখন মুক্তহস্ত হইয়াছেন, ইহা আর কাহারও অবদিত নহে। সন্মিলনের কার্য্য ধর্ম্মীয় কিস্তি, তাঁহাদিগকে এই স্মরণ্য কার্য্যে প্ররোচিত করিবার সাহায্যসাধ।

উপযুক্ত মঙ্গলদাতা আবশ্যক। আমরা সন্মিলনকেই তরুণ কার্য্য যথায়োয়া রূপ উপযুক্ত স্থির করিয়া সন্মিলনের সনকে উপস্থিত হইতেছি—আপনারা সন্মিলন হইতে কোন ধর্ম্মীসন্তান দ্বারা এই পুণ্যনয় কার্য্য সম্পাদন করিতে অগ্রসর হউন। একরূপ কার্য্য একক ভক্তি অপেক্ষা সন্মিলিত শক্তির তত্ত্বাবধারণে হওয়াই বাঞ্ছনীয়। ইচ্ছাতে আরক কার্য্যের গুরুত্ব এবং সম্পাদিত কার্য্যের প্রামাণিকতা স্চিত হইবে।

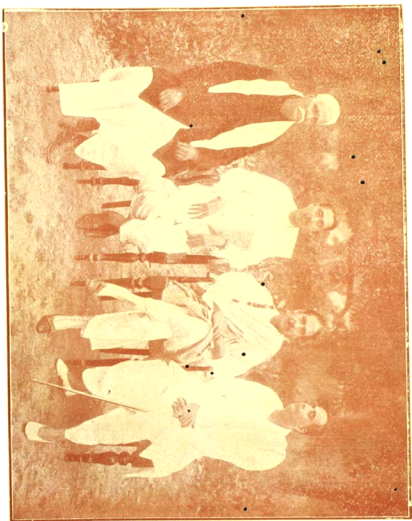
আমাদের মনে হয়, “উত্তর বঙ্গ” কেন, যে কোন সন্মিলনই এইরূপ একটি কার্য্য গড়িয়া তুলিতে পারিবে, তাহাদের সন্মিলিত-জীবন সার্থক হইবে,

মাতৃভাষার উন্নতি করে তাহাদের অদমা চেষ্টি, বিজয় ও গৌরবমুকুট বিভূষিত হইবে। যে ভাগ্যবান ধর্ম্মীসন্তান, মাতৃভাষার সেবকগণের এই সাধু চেষ্টির সহায় হইবেন, তাহার অর্থের সন্মতবহার জীবনের সন্মতবহার এবং সর্বোপরি তাহার বিবেকবুদ্ধির সন্মতবহার করা হইবে। তিনি জননী বীণাপাণির শুভানীর্কাদ লাভ করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হইবেন—মাতৃমুকুট গঠনের সহায়তা করিতে গিয়া তিনি নিজেই অঙ্গগ গৌরব মুকুটে সন্মোচিত হইবে। *

* ১৩২১ সালের (ফাল্গুন) উত্তর বঙ্গ সাহিত্য সন্মিলন সম্পাদকের আছরানে লিখিত ও সাহিত্য-বিভাগের অধিবেশনে পঠিত বলিয়া গৃহীত।

ঐশ্বর্য্যতন নিভ।

11
11
11
11



11
11
11
11

তারকেশ্বরের পালা ।

আমাদের প্রাচীন কবিগণ সাহিত্যের আসরে ধর্মের জন্য অতি উচ্চ স্থান নির্দেশ করিয়াছিলেন । সে জন্য প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যকে এক হিসাবে ধর্মের সাহিত্য বলিলেও অত্যাুক্তি হয় না । প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে ধর্ম-কথার যেমন ছড়াছড়ি, এমন আর কিছুই নয় । প্রাচীন সাহিত্যের এই দিকটা বড় স্থানীয় । এক দিকে কাব্যরস, অত্ৰদিকে ধর্মমুত্ত । যিনি যাহার অভিনাযী, তিনি তাহা সত্ৰজেই পাইতে পারেন ।

প্রাচীন বঙ্গীয় কবিগণ কেবল ধর্মালোচনার জন্যই সাহিত্যালোচনা করিতেন, এ কথা এখন আর বিশেষ করিয়া বুঝাইবার প্রয়োজন নাই । 'প্রাচীন কালের রচনাগুলিতে তাহার প্রচুর প্রমাণ বিদ্যমান রহিয়াছে । ধর্ম-চর্চা তাঁহাদের প্রের বস্ত না হইলে প্রাচীন সাহিত্যে ধর্মপ্রসঙ্গের এমন বাস্তবা কদাপি থাকিত না । প্রাচীন সাহিত্যের এক এক যুগে এক এক দেবতার অন্নবিস্তার প্রভাব পরিলক্ষিত হয় । একুপ প্রভাবের ফলে অসংখা দেবতার অসংখা লীলাকাহিনী বঙ্গসাহিত্যে প্রবেশ লাভ করিয়া তাহাকে শুধু ঐশ্বর্যাশালী নয়, বিলক্ষণ ধর্ম-ভাব-মূলক হইবারও সুযোগ প্রদান করিয়াছে । ইঁতিনধে প্রাচীন সাহিত্যে বহু দেবতারই মাহাশ্চা-জ্ঞাপক প্রবাদি যে কাল-সাগরে বিলীন হইয়া গিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা অসম্ভব । চত্রী, মনসা ও সতাপীরের প্রভাবে বঙ্গসাহিত্যের কলে-বর বহু পরিমাণে পরিপুষ্ট হইলেও অন্যান্য দেবতাসেরও আপন আপন যুগে অল্লাধিক প্রতিপত্তি ও প্রভাব ছিল, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই । একুপে বহু দেবতার আবির্ভাবে প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে বহু যুগের সৃষ্টি হইয়াছে । সেই সকল যুগ-ভেদে বঙ্গভাষার ইতিহাস লিখিবার এখনো সময় আসে নাই । সুখের বিষয় সেইরূপ ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহের দিকে এখন বাঙ্গালী লেখকদিগের অনেকেরই নৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে । প্রাচীন সাহিত্যের অসীম বিস্তারের কথা বিবেচনা করিয়া বলিতে গেলে আরো অধিক সংখ্যক লোকের এই কার্যে যোগদান করা আবশ্যক বলিয়া মনে হয় ।

আমার সংগৃহীত অসংখা প্রাচীন পুথির মধ্যে নানা দেবতার মাহাশ্চা-জ্ঞাপক বহু ক্ষুদ্র গ্রন্থ আছে । সে সকল পুথি হইতে বাঙ্গালার লৌকিক ধর্মের ইতি-হাসের প্রচুর উপকরণ সংগৃহীত হইতে পারে । এই উদ্দেশ্যের বশবর্তী হইয়া

আজ এখানে তারকনাথ দেবের মহাশ্মা-প্রকাশক একখানি কুঙ্গ পুণির আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি ।

বিগত ১৩১৩ সালের অগ্রহায়ণ মাসের “জন্মভূমি” পত্রিকায় কটনেক লেখক কর্তৃক “তারকনাথ দেবের ছড়া” শীর্ষক প্রবন্ধে একটি কবিতা প্রকাশিত হয় । একজন অধীতিপন্ন সূক্ষ্মর যথ হইতে লেখক মহাশয় উহা সংগ্রহ করিয়াছিলেন । এখন দেখিতেছি, এই প্রবন্ধের সমালোচা পুঁথি আর উক্ত ছড়া পরস্পরের মধ্যে স্থানে স্থানে সামান্য পার্থক্য থাকিলেও উভয়ই একই জিনিষ । একই জিনিষ হইলেও কিন্তু পদ বিন্যাসের বাস্তবিক নিবন্ধন উভয়ই আবার পৃথক জিনিষের আকার ধারণ করিয়াছে । পাঠান্তর দিয়া এক একটার পূর্ণাঙ্গতা বিধান করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু তাহাতে উভয়ের মধ্যে যে অসামঞ্জস্য বিদ্যমান আছে, তাহা দূরীভূত করা যায় না । এই কারণে তাহাদের সামঞ্জস্য সাধনের চেষ্টা না করিয়া আমরা উভয় নিবন্ধই এখানে প্রকাশ করিয়া দিতেছি । পাদটীকায় যাহা প্রকাশিত হইল, তাহাই “জন্মভূমির” প্রকাশিত ছড়া বৃত্তিতে হইবে ।

আমাদের প্রাপ্ত পুঁথিখানি আকারে অতি কুঙ্গ ও অত্যন্ত ভীর্ণ নীর্ণ । মোট ৩টি পাত্রে উহা সনাপ্ত । ১৬×৮ অঙ্গুলি পরিমিত বাঙ্গালা ভাগ্যের উভয় পৃষ্ঠে লিপিত । শেষ পত্রটি স্থানে স্থানে ছিন্ন হইয়া গিয়াছে । উহা সন ১২২৮ সালে লিপিত ও দ্বিচ্ছ মহাদেব কর্তৃক রচিত বলিয়া জানা যায় । “জন্মভূমির” প্রকাশিত ছড়াত স্পষ্ট কোন ভণিতা পাওয়া যায় না । তবে রচয়িতা যে ভলগড় পরগণার অধ্বর্গত মন্মনবাটা-নিবাসী ছিলেন, তাহা উল্লিখিত আছে ।

তারকনাথ দেব সপক্ষে বঙ্গভাসায় আর কোন প্রাচীন গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে বলিয়া জানা যায় নাই । আমাদের প্রাপ্ত পুঁথি খানিই এ বিষয়ে সর্বপ্রথম প্রাপ্ত গ্রন্থ বলিয়া বোধ হয় । সেই হিসাবে ইহা বিশেষ সমাদর লাভের উপযুক্ত, সন্দেহ নাই । এ স্থলে পুঁথিখানি অবিকল উদ্ধৃত করা গেল :—

শ্রীশ্রীসিবদর্গাঃ ভরসাঃ ।

নম স্কনসায় নমঃ ।

অথো তাড়কেশ্বরের বন্দনা লিখিতে ।

শিব বোনের (বনের) মধ্যে কেপা পুষ্পতি ।

চারিদিকে উপু খাগড়া বেনার বসতি ॥

চৌদিকে ভঙ্গল ভলা গছন কানন ।
 মধ্যোতে সিংল দীপ অতি রমা বোন (বন) ॥
 কপিল দিতেছেন চক্ষু একচিত্র হুয়া ।
 দেখিল মুকুন্দ ঘোষ কাননে রাসিয়া ॥
 কপিলার হৃদে তুষ্ট ভোলা মহেশ্বর ।
 মৃতিকা খুলিয়া দেখে অপূৰ্ণ পাথর ॥
 হস্তে ধোদে নাট কেহ দিয়া কেহ বাড়ি ।
 পাশে দেখিয়া বনে হইল ছেয়াগাড়ি ॥ ১
 ক্রমান্বে কাটয়ে ধান্ন রাখালে কুড়ায় ।
 রানন্দে শঙ্কর শিরে ধান্ন ভেনে খায় ॥
 এইরূপে গেল দিন দ্বাদশ বংশর ।
 বিবাত প্রানান গর্ভ মন্তক উপর ॥
 মন্তকের বেদনায় শঙ্কু হইয়া কাতর ।
 কহেন মুকুন্দ ঘোষে আমি তাড়কেশ্বর ॥
 তাড়কেশ্বর আমি কাননে নিবাসি ॥
 যোর সেবা কর বাছা হইয়া সন্ধ্যাসি ॥
 ভক্তি করি দিবে নোরে এক বিষদল ।
 "অস্ত্রকালে চরণ কমলে দিব স্থল (স্থল) ।

- ১ বল্লভ বিলেত মদ্যো ফেপা পত্নপতি ।
 চারিদিকে উন্মুখ থাকড়া বেনার বসতি ॥
 চৌদিকে ভঙ্গল ভলা গছন কানন ।
 মধ্যোতে সিংল দীপ অতি আম্বন ॥
 ক্রমান্বে কাটয়ে ধান্ন রাখালো কুড়ায় ।
 রানন্দে শঙ্কর শিরে ধান্ন ভেনে খায় ॥
 কপিলায় দিচ্ছে চক্ষু একচিত্র হইয়ে ।
 দেখিলেন মুকুন্দ ঘোষ কাননে বসিয়ে ॥
 মন্তকের বেদনায় শঙ্কু হইলেন কাতর ।
 কহিলেন মুকুন্দ ঘোষে আমি তারকেশ্বর ॥
 তারকনাথ শিব আমি কাননে বসতি ।
 অবনী ভেদিয়া বাছা আমার উৎপত্তি ॥
 কপিলার হৃদে তুষ্ট ভোলা মহেশ্বর ।
 • মৃতিকা খুলিয়া দেখে অপূৰ্ণ পাথর ॥

তবে আশা (আজ্ঞা) করিলেন দেব ত্রিপুরারি ।
 রাগ ভারানব রাজা পাইল সন্নাচারি ॥
 কাননে সিবের লিঙ্গ সুনিষ্ঠা শ্রবনে । ২
 ভারানব ছাত্রা কৈল দিব দরসনে ॥
 রাক্তত রাক্তত ঘোড়া সাজিল লগ্নর ।
 ভারানব প্রবেশিল বোনের (বানের) ভিতর ॥
 জটাধারি ত্রিপুরারি দেখিয়া নিগড়ে ।
 রাজা বলে রাখ লয়া রামনগড়ের গড়ে ॥
 শত কোড়া নিছজিল কাটিবারে মাটি ।
 জত কোড়ে তত বাড়ে পুঙ্খনির ছাটি ॥
 বাহো দিন কোড়ে তবু অস্ত নাছি পায় ।
 জত কোড়ে শঙ্কুয়ে পাতাল পানে চায় ॥
 ভক্ত হুংখ দেখি তখন ভাবিয়া অস্তরে ।
 নিসি জোগে বসিলেন রাজার শিয়রে ॥ ৩

- ২ চক্রে গোড়ে নাটী কেহ গোড়ে দিয়া বাড়ি ।
 পাবাণে দেখিয়া বলে হৈল ছিছাগাড়ী ॥
 রাক্তত রাক্তত ঘোড়া সাজিল লগ্নর ।
 তারা সব প্রবেশিল জটাল ভিতর ॥
 জটাধারী ত্রিপুরারি দেখিয়ে নিজে রড়ে ।
 রাজা বলে লয়ে রাধি রামনগরের গড়ে ॥
- ৩ শত কোড়া নিয়ে দিল কাটিবারে মাটি ।
 যত কোড়ে শঙ্কু বাড়েন পুঙ্খনির নাটী ॥
 বারমাস কোড়ে শঙ্কুর অস্ত নাছি পায় ।
 তবু শঙ্কু নিয়ত পাতাল দিকে দায় ॥
 ভক্তের হুংখ পাটয়ু ভব জানিয়া অস্তরে ।
 নিশিরাত্রে গিয়ে বসেন রাজার শিয়রে ॥
 সন্ন্যাসী চইয়া মূর্ত্তি কহেন তখন ।
 শুন রাজা ভবরাম আমার বচন ॥
 অকারণে হুংখ পাইয়া নোরে কেন গোড় ।
 গয়া গঙ্গা বারাগঙ্গী তুথানে সে জড় ॥

চইয়া সজ্জা দি মুক্তি কহেন সপন ।
 গুন রাজা ভারাম্বর আমার বচন ॥
 তাড়কেসর দিব আমি কাননেতে বসতি ।
 অবনি তেজিয়া বাজা ভগতে উৎপতি ॥
 অকারনে ভাণ্য পায় মোরে কেন কোড় ।
 গয়া গঙ্গা বারানসি আদি মোর জড় ॥
 গুনিয়া নৃপতি চইলা আনন্দে অস্তির ।
 জঙ্গল কাটিয়া দিল অপূর্ণ মন্দির ॥
 আম জাম রূপীলা গোবাক নারিকেল ।
 ডানিভাগে সরবর সিদ্ধিমাথা জল ॥
 পাথরে বান্ধিয়া দিল মন্দিরের গোড়া ।
 জলের কুস্তির আইসে ডাকি নোকড়া ॥
 তেন মতে বিশ্বনাথ চইল অবতার ।
 নিলের দিল সরবর গঙ্গার জুয়ার ॥ ৪
 বিচিত্র মন্দির মাঝে মহাচক্র সঙ্গে ।
 প্রমাদ বেতাল ভূত নাচে কত রঙ্গে ॥
 মাথায় জটার ভার প্রকাণ্ড স্বরির ।
 চারি পাসে চারি মুক্তি ধরে পঞ্চ (সির ?) ॥

৪ গুনিয়া নৃপতি চইলা আনন্দে অস্তির ॥
 জঙ্গল কাটিয়া দিল অপূর্ণ মন্দির ॥
 আম জাম রুচিলেন গুয়া নারিকেল ।
 ডান ভাগে সরোবর সিদ্ধিমাথা জল ॥
 পাথরে বান্ধিয়া দিলেন মরীচির গড়া ॥
 জলেতে কুস্তীর ভাসে ডাকে কড়া কড়া ।
 বিচিত্র মন্দিরের মাঝে মহামায়া সঙ্গে ।
 প্রেমতরে ভাল লয়ে নাচে কত রঙ্গে ॥
 নীল দিনে সরোবর গঙ্গার জোয়ার ।
 পাতকী তারিতে ভবে চইলা অবতার ॥
 মদিখানে তারকনাথ চারিদিকে জল ।
 ভক্তগণে দিয়ে পূজা কালা ফলের মালা ॥
 মনে হয় মৃত্যুঞ্জয় চইলেন এক চমিশ সালে ।
 বৃষধ্বজে পুন্ড্রিগেন গিয়ে ঐফলের মূলে ॥

মনহর স্থান জে × × ।
 × তপ করে জটিল সজাতি ॥
 তাড়কেবর চাপি ×
 পূজে দিয়া কান্য কুলের মালা ॥
 আলিগড় পরগণাতে × ×
 পাতকি তরাইতে প্রভু তাড়কেবর নাম ॥
 নোণে (মনে) হয় নৃসিংহ এক × ×
 নৃসিংহ বনিলেন শ্রীকৃষ্ণের মূলে ॥
 বাগ্‌চাল আসন ভূসন গাণায় ।
 “কিবা সে আনন্দ ছটা কহনে না যায় ॥
 পঞ্চম অক্ষয় মণ্ডি প্রভু দিলে
 × × বাণি তথি কারণে ॥
 গান দ্বিজ মহাদেব সমুদ্র ভাবনা ।
 নিবাস × × র পরগণা ॥
 ইতি তাড়কেবরের পালাঃ সমাপ্ত ॥
 ইতি ১২২৮ সাল ।

ছড়ায় আছে, ৪১ সালে তারকনাথ দেবের আবির্ভাব বা লোকে প্রকাশ ।
 এই ৪১ সালে লইয়া বহু মতভেদ আছে । কেহ বলেন,—১১৪১ সাল ; আর
 কেহ বলেন,—১০৪১ সাল । বহুদিন পূর্বে তারকেশ্বর ধাম হইতে একপানি
 ইতিবৃত্ত-মলক গ্রন্থ বাহির হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়, কিন্তু তাহা সংগ্রহ
 করা যাইতে পারে নাই । শুনা যায়, সেই পুস্তকেও যায় ৪১ সালে তারক-
 নাথের আবির্ভাব বলিয়া লিখিত আছে । তাহা সত্য হইলে সনাত্ত আরো গুরুতর
 হইয়া পড়ায় । ১০১৫ জন নাথ নোহাতের অধীনে এত শত বৎসর অতীত হইল
 কিরূপে, বুঝা হকর । এই বিষয়ে ঐতিহাসিকগণের মনোযোগ প্রার্থনীয় ।

আবৃত্তল করিম ।

বাগ্‌চাল আসন বিভূতি গাণা গায় ॥
 নিগুদী মন্দন বাটী কখন না যায় ॥
 গাঢ়িল সকল দ্বিজ শব্দর ভাবনা ।
 নিবাসী মন্দন বাটী জলগড় পরগণা ॥

স্বগত।

আমার অভাবের প্রভাব এক এক সময় এমনি দুর্বল হইয়া ওঠে যে, মনে হয় যেন এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড, এই অগণ্য গ্রহ চন্দ্র তারকা, সূর্য্য সঞ্চিত আকাশ, এই অসুখীনি নিরন্তর প্রবাহিত বাতাস, এই উদ্ভাসিতরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ সমুদ্র, আর এই বিপুল পৃথিবী সব লইয়া যদি বৃক পুত্র, তবুও তাহার শুল্ক পরিপূর্ণ হয় না। তবুও মন কাঁদে, তবুও আরো চায়;—আবার এক এক সময় সব অভাব এমনি সামান্য হইয়া যায়, আমি যেন পৃথিবী-আকাঙ্ক্ষ-মগ্ন কুন্দ গুচ্ছটির বৃক কুন্দতন কুলের মতন হইয়া যাই। আকাশের আলোতে একটু দিন ভাল করিয়া চোখ খুলিয়া চাওয়া, বাতাস ভর দিয়া থানিকটা চলিয়া চলিয়া আনন্দ করা, তারপর রাত্রির অন্ধকারে শিশিরে অভিষিক্ত হইয়া একেবারে গুমাইয়া পড়া, প্রায় এর অধিক কোনও আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে না। কিন্তু বেগিতে পাই ব্রহ্মাণ্ড বৃক পুত্রের লগ্ন্য তবু সচল কিম্ব কুলের নতটুও হয়। সাধারণতঃ নয়, কেন না কুলের নত যদি স্বভাব জন্ম না হয়, তাহা হইলে কে তাহাকে তেনন করিতে পারে ?

বার বার কি কথা বলিতে গিয়া হতাশ হইতেছি, কিছুতেই প্রকাশ করিতে পারিতেছি না; দিনের শেষ আর প্রভাতের আরম্ভ, আমার সমস্ত মনে যে কি বাকুলতার সঞ্চার করে, তাহা আমি ভাল করিয়া বুঝিতেই পারি না, প্রকাশ করিব কি করিয়া ? একান্ত প্রিয়জনকে নিতান্তই ছাড়িয়া যাইতে হইলে নাহুল মনে যে বেদনা পোষণ করে, মুখে বলিতে পারে না, এ যেন তেননিতর কিছু! আমার একলা ঘরটিতে সঞ্চার অন্ধকারে চোখ বুজিয়া চুপ করিয়া থাকি, দেশ কাণ বোধ আমার লোপ হইয়া যায়, আমি ভুলিয়াই যাই আমার শরীরি কোনও অস্তিত্ব আছে; আমি যেন শুধু একটি মন, অথচ সে মন যাহা অহুভব করিতেছে তাহা প্রকাশ করিতে পারিতেছে না। বাণা বোধ করিয়াও মূকের অধাক্ত বেদনায় যে কাতরতা চোখে মুখে ভাবে ছড়াইয়া পড়ে, এ সেই বেদনা। এমন নিবিড়, এমন গভীর, অথচ এমন জীবন্ত, জাগ্রত, তীব্র যে আমি একেবারে অধীর হইয়া পড়ি। যখন আলো জাগিয়া পড়িতে বসি—মনে হয় কতদূর কোন্ লোকান্তর হইতে ফিরিয়া আসিলাম। আমার মনে, শরীরে, জীবনে কেমন যেন থাপ থাচ্ছেনা !—

মনটি আমার ছাড়াইয়া কোথায় যে চলিয়া গিয়াছে, তাহার ঠিক নাই। অর্ধেক স্নানান্তে ঘুম ভাঙিয়া যায় আর আসেনা, নিশ্চয় পৃথিবী মৃতের মত আমার কাছে কেবলি অনন্তের কথা বলে। আনাকে যে পথে ডাকে সে পথের সন্ধান আনি কোন সন্ধান পাইব। প্রতি প্রাতে আমি কিসের আশায় থাকি ? কোন অপূর্ণ নিশ্বাসের—যাহার অভাবে আমার এই আকাশের আলো ম্লান, এই বাতাসের স্পর্শ উদাস, আর এই পত্র পুষ্পের লীলা, পাখীর গান আমার ননকে স্পর্শ করে না। আমার এত দিনের ভালবাসার বহু সব আমার ছাড়াইয়া কোথায় গেল ? একেলা যে পথের মাঝে আমার দাঁড় করাইয়াছে, সেখানে সবই অস্পষ্ট, রহস্যময়, সেই কারণেই নিরন্তর বাকুলতাকে কেবলি উদ্রেক করে, অগত্যা শান্ত করে না ! আবার সন্ধ্যা আসে স্নানান্তে দিবসের আশা অন্ধকারের অন্তরে বিসর্জন হইয়া যায়, তবুও নিরাশা আসেনা। বিজয়া দশমীর বিসর্জনের মধ্যে যেনন সশূণ্য বংশরের আবাহন সঙ্গোপন থাকে, আমার ননের আশাও তেমনি আছে। প্রতিদিনের বার্তা এখন পর্য্যন্ত তাহাকে নিরাশায় পরিণত করিতে পারে নাই, এ অপূর্ণ রহস্যের অর্থ যে কি, আনিও কিছুই বুঝিতে পারি না !

মৃত্যু আর প্রেম ভিন্ন নয়, মৃত্যু ইঞ্জিয়ার বাবধান লুপ্ত করিয়া দিয়া যায়, প্রেম দ্বারের সব তার দগ্ধ করে, ভালবাসিলে আনন্দের প্রতি মুহূর্তেই মরিতে আরম্ভ করি, আনন্দের সব বাসনা বিসর্জন করিয়া প্রিয়তমের স্থানের মধ্যে স্থান পাইতে চাই, অপি সেই ত্যাগ সেই মৃত্যুতেই অমর হইয়া উঠি। প্রেম মৃত্যুর মত রহস্যময়, তাহার সবটুকু কে কবে আয়ত্ত করিতে পারিয়াছে ? আভাস তাহার ভাবা, তাহার প্রকাশ কবিকের বিহাদীপ্তির মত, মুহূর্তের শুভদৃষ্টিতে চির জীবনের পরিচয়, তার পরের আর সব অমুঠানই বাহুলা।

চোখে চোখে যাহার সঙ্গে মালা বদল হয়, তাহাকে না পাইলে চির জীবনই বৃথা ; ভাষায় ভালবাসি, বলিবার আবশ্যক হয় না, যদি মনে মনে বোকা পড়া হইয়া যায়, সে যে দূরীকৃত লোকান্তরে পাকিয়াও বুকের মধ্যে স্থান পায়, চোখ না চাছিলোও অবিরত দেখা হয়।

চৈত্র ।

চৈত্র অই চৈত্র আসে

বিচিত্র পুষ্পের রং,

তারাদীপ্ত ভাষাপণে,

চৈত্রিবার আশে,

চিত্রা আর চন্দ্রমার

মিগুনের নাধুরীসস্তার—

বসন্তের বৈভবস্ত্রী অনিবার ছলিছে পবনে

কুহনের আন্তরণ বিস্তারিত সমস্ত ভ্রবনে,

আকাশ-মণ্ডপে আলো অচরহ আজি অনির্বাণ

চন্দ্রকের তীত্র গন্ধে বাসনার বিহ্বল আত্মান !

চৈত্র অই চৈত্র আসে,

চৈতালির আলিম্পন

স্বর্ণ বর্ণ স্তম্ভোত্তর

প্রান্তরে বিকাশে,

স্বচ্ছ সরোবর জলে

মেহদৃষ্টি ফুল শতদলে !

গোধূলির গুভলয়ে সন্ধ্যাকাশে কণক-অঙ্গনে,

কীণকলা শশধর, পরিপূর্ণ স্নানকল কণে,

তারি বক্ষোলম্ব স্থির হস্তভরা চিত্রা রাজে আজি

পূর্ণ বরষের আশা, মাস্তুলিক উঠিয়াছে বাজি ।

২৭শে ফাল্গুন ১৩২১ ।

ঐপ্রিয়দম্মা দেবী

রামপাল ।

(২) .

নৃপতির চর্যলতার জন্য গোড়রাজ্যে বছবার বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছিল । তাঁহার অন্যতম নিদর্শন আজিও দিনাজপুরের এক রৌদ্রকবোজ্জ্বল দীপিকাবকে জয়গর্ভে দণ্ডায়মান আছে । মদনপালের রাজ্যকালে যে বিভ্রাট ঘটয়াছিল, তাহার সুযোগে বিজয়সেন বীরেন্দ্রভূমে একটা নবরাজ্য সংগঠিত করিয়াছিলেন । তাঁহার

“উত্তম দেবমন্দির” ও অগণিত “বিতত তন্ন” একদিন বরেন্দ্রের শোভাবর্ধন করিয়াছিল। তাঁহার সনরবিজয়-কাহিনী, গোড়েঙ্গ পরাজয়, মিথিলাপতির সহিত সংঘর্ষ করিকল্পনা নহে। তাহা এবং শিলায় সে পরিচয় বর্তমান আছে। উদ্যাপতির প্রাশস্তি তাহার নিখিত ইতিহাস। প্রত্নতত্ত্বের মন্দিরবিশেষ তাহার কীর্তিচিহ্নের মধ্যে একটি। আভ্যন্তরীণ অবস্থাদি বিচার করিয়া বরেন্দ্র অল্পসংখ্যক সন্নিহিত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন বিজয়নগরেই বিজয়সেনের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল। সে বিজয়নগর রানপালে বা তন্নিকটে নহে। উহা ঢাকা জেলাতেও নহে। উহার অবস্থান উত্তরবঙ্গের রাজসাহী জেলায়।

বিজয়সেনের পুত্র বল্লালসেন পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করিয়াই পাল নরপাল-দিগকে উৎখাত করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। তাঁহার রাজ্যাভিষেক তবে কোথায় হইয়াছিল? পূর্ব বঙ্গে, না উত্তর বঙ্গে? * তাঁহার অমিত বিক্রম বর্ধরাজকে পরাজিত করিয়া তাঁহাকে বঙ্গে এবং রাঢ়ে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, কাটোয়ার নিকটে† প্রাপ্ত তাম্রশাসনে এ পরিচয় লাভ করা যায়। সেই তাম্রশাসন বল্লাল রাজ্যের ১১ সংবতে বৈশাখমাসের ১৬ই তারিখে ত্রিবিক্রমপুর সন্যাসিত ত্রিভুজবন্দ্যবাসে সম্পাদিত হইয়াছিল।

বল্লালসেন বঙ্গবিধ্বস্ত বীর নরপতি। তাঁহার কীর্তিকাহিনী বাঙ্গালীর ইতিহাসে ও সমাজে সুপরিচিত। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, নানা ঐতিহাসিক প্রমাণ বর্তমান থাকিতেও ইংরাজ ঐতিহাসিকের কল্পনা বল্লালকে ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্ব বলিয়া পরিচিত করিয়া তাঁহাকে অবতারত্ব প্রদান করিয়াছে।‡

বল্লালসেন বিদ্যান বুদ্ধিমান ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তাঁহার রচিত অমৃত-সাগর ও দানসাগর ইহার পরিচয়। বল্লালের রাজত্বকাল দ্বাদশ কি ত্রয়োদশ বর্ষ ব্যাপী বলিয়া অনুমান হইয়াছে। ইহার অধিককালই গোড়রাজ্যের বিভিন্ন অংশ

* বিজয়পুর নামক রাজধানীতেই বিজয়সেনের পুত্র বল্লালসেনের অভিসেকক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছিল বোধী কবির পদমন্ত্রে একত্র লিখিত আছে। রাজসাহী জেলার পোদাগড়ী থানায় দেখাড়া গ্রামে সেন-রাজবংশের প্রথম শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। বল্লালসেন দানসাগরে বলিয়াছেন যে তাঁহার পিতা বরেন্দ্রে আশ্রয় লইয়াছিলেন। তাঁহার গুরুদেবও বরেন্দ্রমণ্ডলে অশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন।

† সম্প্রতি Herald পত্রিকা লিখিয়াছে যে কাটোয়া বিক্রমপুরের রাজধানী ছিল। এ সংবাদ কোঁতুলোদ্দীপক মনে হয় না।

‡ Ballal Sen is fabled to have been the son of the Bramaputra river, which took the form of a Brahmin:—Manshan.

জয় করিবার চেষ্টাতেই ব্যয়িত হইয়াছিল। বিক্রমপুরে চাইলন বল্লালসেন রাজ-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন বলিয়া কথিত হয়। এই দ্বিতীয় বল্লালসেনকে ? কবে কোথায় বর্তমান ছিলেন ? কিরূপেই বা বিক্রমপুরের রাজসিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন ? প্রবাদ ইহাকে বেদসেন বা বিশ্বকর্তার পুত্র বলিয়া পরিচিত করিয়াছে। বেদসেন এবং বিশ্বকর্তা একই ব্যক্তি, কি অভিন্ন ব্যক্তি তাহার ঐতিহাসিক প্রমাণ কিছু আবিষ্কৃত হইয়াছে কিনা জানা নাই। বেদসেন বা বিশ্বকর্তাই যে কোথা হইতে কিরূপে বঙ্গে আগমন করিয়াছিলেন, তাহাও জানিবার উপায় আছে বলিয়া বোধ হয় না !

আর কিছু না হউক, বাঙ্গালীর কল্পনাকে কেহ পরাজিত করিতে পারে নাই। সেই কল্পনার বলে নানারূপ প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া আবশ্যকমত শব্দ বা বাক্যবিশেষের অর্থান্তর গ্রহণ করিয়া আমরা কখন যে কাহাকে আনিয়া কোন রাজসিংহাসনে সংস্থাপিত করিয়া গ্রন্থরচনা করিতেছি, তাহা অস্ত্রের কথা দূরে থাকুক, আমরাই বৃষ্টিতে পারি না ! ইংরাজ ঐতিহাসিককে কল্পনাপ্রিয় বলিয়া দোষ দিলে কি হইবে ? আমরা আদিশূরকে ঐতিহাসিক ব্যক্তিরূপে পরিচিত করিবার জন্য অকুণ্ঠিত চিন্তে কহিয়াছি তৎকালে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ বাঙ্গালায় ছিল না বলিয়া পঞ্চব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়া দেশে ধর্মসংস্থাপন করা প্রয়োজন হইয়াছিল ! লোকনাথের ত্রিপুরা-তাম্রশাসন শীর্ষক প্রবন্ধে সম্প্রতি প্রক্টে বঙ্কু রাধাগোবিন্দ বাবু দেখাইয়াছেন যে, পূর্বে বঙ্গেই সেকালে (সপ্তম শতাব্দীতে) বেদবিৎ ব্রাহ্মণের অভাব ছিল না। “চতুর্বিদ্যা” ব্রাহ্মণ ও আর্য্যগণের বাসস্থানের জন্য মহানান্দ প্রদোষণর্থাৎ রাজসমীপে ভূমি প্রার্থনা করিয়াছিলেন। * ঐতিহাসিক রচনা-কৌতুক শীর্ষক + প্রবন্ধে পরমপুণ্ডরীক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার নৈরাজ মহাশয় শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সিকান্তবারিদি মহাশয়ের নব প্রকাশিত রাজগুণ্ড নামক স্মৃতি ইতিহাস গ্রন্থের সমালোচনাকালে কহিয়াছেন—“উহা রচনা-কৌতুকের আধার !” সকলগুলির ব্যাখ্যা করা দূরে থাকুক, উল্লেখ করিতে হইলেও এক একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করিতে হয়। ‘কার্য্য সমাজের বিশাল ইতিহাসের, মুখবন্ধ যে এইরূপ রচনা-কৌতুকের আধার হইয়াছে, ইহা যথার্থই অশুশোচনীয়।’ ছর্ভাগ্যের বিষয় যে, এই সকল গ্রন্থ বাঙ্গালার ইতিহাসরূপে

* লোকনাথের ত্রিপুরা-তাম্রশাসন—শ্রীরাধাগোবিন্দ বসাক।

+ ঐতিহাসিক রচনা-কৌতুক—শ্রীঅক্ষয়কুমার নৈরাজ।

সমাদৃত হইবার জন্ত দাবী করিতেছে ; কালে হয়ত ইহা হইতেই মতামত উদ্ধৃত হইয়া কত ঐতিহাসিক প্রবন্ধ রচিত হইবে এবং বঙ্গের ঐতিহাসিকদিগের কল্পনা মাশন্যানের কল্পনাকেও পরাভিত করিয়া কত নতন নতন তথ্য প্রচার করিবে !

বিক্রমপুরের ঐতিহাসিক কহিয়াছেন—“এই পাতনামা রাজার [বল্লাল সেনের] রাজত্ব সময়েই বিক্রমপুর ধনে, মানে, জ্ঞানে ও পাণ্ডিত্যে অগতির এক শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়াছিল । বিক্রমপুরের প্রতি মৃত্তিকাকণায় বল্লালের পদ-চিহ্ন একদিন অঙ্কিত হইয়াছিল, কোলীন্তের গোরব প্রতিষ্ঠা করিয়া ইনি যশস্বী হইয়াছিলেন । আজ পর্য্যন্তও বিক্রমপুরের ঘরে ঘরে ইহার পবিত্র স্মৃতি বিরাজমান । অজ্ঞান শিশু হইতে অনাতিপর বৃদ্ধ পর্য্যন্ত সকলেই এই মহাহুতব রাজার কীর্তিকাহিনী উপকথার ন্যায় বলিয়া থাকে ।”

এ রচনা অতিশয়োক্তির নিদর্শন হইলেও ইহার মূলে সত্যের অভাব নাই । বল্লাল যে কীর্তিমান নরপতি ছিলেন তাছাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই । কিন্তু সে কালের সমৃদ্ধি ও গৌরবের আর কোন বিশেষ চিহ্ন এ অঞ্চলে বর্তমান নাই । আছে কেবল দুইটা হ্রদ স্রুত । একটি মিরকাদিমের খালের উপর এবং অপরটা তালতলার খালের উপর । ইহাদের দ্বারা ইহাই সূচিত হইতেছে যে, বহুকাল পূর্বেও বঙ্গের স্থাপত্যকলা সেতুনির্মাণ বিষয়েও সমুদ্রত ছিল । *

পূর্বে প্রবন্ধে বর্ণিত গজারি বৃক্ষের সন্নিকটেই ২০০ ফিট প্রশস্ত বিপুল পরিধায় পরিনেষ্টিত বল্লাল প্রাসাদের অবস্থান চিহ্ন আজিও বর্তমান আছে । অটালিকার ভগ্নাবশেষ নাই, দেব-দেউলের ভগ্ন স্তূপ নাই । এ রাজধানী হয়ত কেবল প্রথম বল্লালের অথবা উভয় বল্লালের যত্নে চন্দ্র, ভোরণে, দেউলে, উদ্যানে সুশোভিত হইয়াছিল । কোথায় প্রাসাদ, কোথায় প্রাকার, কোথায় উদ্যান, কোথায় রাজসভা ছিল, তাহা নির্দেশ করিবার এখন আর কোন উপায় নাই ! আছে কেবল তিন সচস্র বর্গফিট আয়তনের একটা প্রকাণ্ড উচ্চ ভূমি । এখন উহার সকল অংশই কর্ষিত হইয়াছে । ইহাই এখন বাঙ্গালার সেন রাজবংশের অগ্রতম

* It is said to have been built by Raja Ballal Sen before the conquest of Bengal by Mahomedans—List of Ancient Monuments.

Ibid.—there are 2 bridges in the neighbourhood which tradition ascribes to Ballal Sen. One is over the Mirkadim khal and is called the Ballal Bridge : it has 3 arches and the piers are six feet thick. The other is a little further to the west and spans the tallola Khal ; this also has 3 arches, but was blown up in the early days of British rule to enable large boats with troops to pass to and from Dacca.

অবস্থান-চিহ্ন—ইটাই এখন বিক্রমপুরের কীর্তি ও গৌরবের শ্মশানভূমি! এই শ্মশান কি বাঙ্গালী ঐতিহাসিকের কব্ধক্ষেত্র নহে? কে ইহার গর্ভে চইতে রত্ন আবিষ্কার করিবার জন্য আগ্রসর চইবে? যে এখন এই চিতাভস্ম লটয়া মূর্ধি গড়িবে—কে এখন সেই মূর্তিতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবে? কে এখন অক্ষকার যবনিকা উন্মোলন করিয়া, সেই স্মনহান বিরাট বিশাল স্ফোতিষ্ময় অতীতকে মুগ্ধ নরননারীর নয়ন সমক্ষে আনিয়া ধরিবে? কোন্ ভক্তের অর্থা আবার পুত্রা-তবেয় মন্দিরভালে নবীন পাদপীঠ রচনা করিবে? ঢাকার সাহিত্য-পরিষৎ কি এদিকে বিশেষ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবেন?

এ অঞ্চলে বঙ্গাঙ্গসেনের নামের সহিত একটা কলঙ্ককাহিনী বিজড়িত রহিয়াছে। কোন ডোনকন্নার রূপে মুগ্ধ হইয়া তিনি তাহাকে পত্নীয়ে বরণ করিয়াছিলেন। দেশের হিন্দু সমাজ ঘাচাতে রাজার এই কার্য্য অন্ত্যমোদন করেন সে জন্য রাজা উৎপাত করিতে ক্রটি করেন নাই! উৎপাত এত অধিক চইয়াছিল যে দেশের লোক “বহ্নান ছাড়িয়া সব গেলা অবশেষে!” হিন্দু সমাজের সহিত কলঙ্ক করিয়াই রাজা ক্ষান্ত হন নাই, পিতার সহিত এই বিষয়ের উচিতাভূতিত্ব সর্বদে বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন! সহজ কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, তিনি ডোন কন্নার রূপলালসায় পিতার সহিত কলঙ্ক করিয়াছিলেন!

ইনি কি সেই বঙ্গাঙ্গসেন যিনি গোবিন্দপাল দেবকে রাজ্যভ্রষ্ট করিয়া, স্বর্গরাজকে পরাজিত করিয়া বঙ্গ এবং রাঢ়ে স্বীয় অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন? ইনি কি সেই বঙ্গাল সেন যিনি শুধু বঙ্গ-বিজয়ে পরিতৃপ্ত না হইয়া কলিঙ্গ আক্রমণ করিয়াছিলেন? এই কি সেই বঙ্গালের চরিত্র-কাহিনী যিনি দানসাগরের মঙ্গলাচরণে আপনাকে গোড়েশ্বর বলিয়া পরিচিত করিয়াছিলেন?

বিক্রমপুরের ঐতিহাসিক বলিতেছেন—“মহারাজ বঙ্গাল যে ১৩৫০ শকাব্দ হইতে ১০২০ শকাব্দ অর্থাৎ ১১১৮—১১৬৮ খৃষ্টাব্দ এই পঞ্চাশ বৎসর রাজত্ব করেন ইটাই স্থির সিদ্ধান্ত।” জীগৃহ্ষ মনোমোহন চক্রবর্তী মহাশয় বঙ্গালের অক্লুতসাগর হইতে দেখাইয়াছেন, বঙ্গাল-রাজত্বের প্রথম বৎসর ১১৫২ খৃঃ অব্দ বা ১০৮১ শক। বঙ্গালের দানসাগর রচনায় কাল ১০২১ শক বা ১১৬২ খৃঃ অব্দ। ইহারই পূর্ব বৎসর অর্থাৎ ১০২০ শক বা ১১৬৮ খৃঃ অব্দে তিনি অক্লুতসাগর রচনা করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু উহা শেষ না হইতেই স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে বঙ্গালের রাজত্বকালে কোন ক্রমেই “পঞ্চাশ বৎসর” ব্যাপী ছিল না।

বিক্রমপুরের ইতিহাস হইতে জানা যাইতেছে—“ময়মনসিংহের অষ্টগ্রাম প্রভৃতির দত্ত বংশীয়দিগের কুর্ছিনামার উপরও এই শ্লোকটা দৃষ্ট হইয়া থাকে—

চন্দ্রধ্বজাবনিসংগাশাকে বল্লালভীতঃ খলু দত্তরাজঃ ।

শ্রীকর্তৃনামা গুরুণা বিজেন, শ্রীমাননন্তরাজগান বঙ্গঃ ॥”

অর্থাৎ ১০৬১ শাকে বা ১১৩৯ খৃষ্টাব্দে শ্রীমান্ অনন্ত দত্ত বল্লালের; ভয়ে আপন গুরু শ্রীকর্তৃ শর্ম্মাকে সহ বঙ্গে পলায়ন করেন ।”

বল্লালের কলঙ্কটাকা সম্বন্ধে ইহাই কেহ কেহ বিশেষ প্রমাণরূপে ব্যবহার করিতে চাহেন । এই সঙ্গে “গোড়ু জাঙ্গল” ও “বৈষ্ণব কুলপঞ্জিকা” হইতেও শ্লোকাবলী উদ্ধৃত করিয়া দেখান হইয়া থাকে যে, বল্লাল সত্যই চরিত্রহীন ছিলেন ! কিন্তু দেখা যাইতেছে ১১৩৯ খৃঃ অব্দে বল্লাল আদৌ রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট হন নাই ! বল্লালের পিতা বিজয়সেনের রাজ্যকাল সম্বন্ধে যতই কেন নতভেদ থাকুক না, ইহা নিশ্চিতরূপে বলা যাইতে পারে যে ১১৩৯ খৃঃ অব্দে তিনি গোড়ুসিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন । তাঁহার শাসন সময়ে রাজকুমার বল্লালের এতদূর উচ্ছৃঙ্খল হইবার সম্ভাবনা ছিল না, যে অত্যাচারে দীড়িত হইয়া দেশের লোক হানান্তরে প্রস্থান করিতে বাধ্য হইয়াছিল ! বল্লালের সমগ্র জীবন গোড়ুরাই গঠন করিতেই ব্যয়িত হইয়াছিল । নিত্য রণকোলাহলে নৃত্য থাকিয়া জন্মভূমির গৌরবরক্ষাই তাঁহার ব্রত ছিল । পিতৃদেবের উত্তরু দেবনন্দির সমূহ এবং বহু বিত্ততত্তম গাচাকে সর্বদা লোকহিতকর কার্যে উৎসাহিত করিত—ডোন কল্পার রূপনোহে আচ্ছন্ন হইয়া তিনি আপন সমাজকে নিগৃহীত করিবার অবকাশ পাইয়াছিলেন কিনা তাহাও চিন্তার বিষয় । রূপতুষ্কার শাস্তি বিধান করিবার জন্য গাচার চিত্র অহির, অসিধারণ করিয়া জন্মভূমির উদ্ধার সাধন ও গৌরব-বর্দ্ধন তাঁহার ধর্ম্ম নহে !

বহুদিগের সহিত বল্লাল-চরিত্র সম্বন্ধে আলোচনা করিতে করিতে ‘বল্লাল-ভিটার’ চতুর্সীমা মধ্যে ভ্রমণ করিতে লাগিলাম । কল্পনা সেই স্ববহান অতীতকে জাগ্রত করিয়া দিল । দেখিলাম বল্লালের জয়দ্বন্ধাবার পত্রে পুষ্পে স্নানোভিত হইয়াছে । রক্ত পীত নীল খেত জয়পতাকা ধীর পবনে চলিতেছে, বঙ্গবীরের কবচত অসি অগিতেছে, জয়চকার-বিপুল নিনাদে দিগমণ্ডল পরিপূর্ণ হইয়াছে । বিস্তীর্ণ চন্দ্রাতপতলে, বহুমূল্য আসনে উপবিষ্ট হইয়া মহারাজ বল্লাল সেন রাঢ়-জয়কারী সেনাকুলকে যথাযোগ্য পুরস্কার প্রদান করিতেছেন, “শ্রীবর্দ্ধমান ভূতান্তঃপাণ্ডী উত্তর রাঢ়-মণ্ডলের” ভূমি দান করা হইতেছে ।

ডাক্তার-বন্ধুর আফ্রানে চনক ভাঙ্গিল। দেখিলাম আমরা একটা ক্ষুদ্র জলাশয়ের নিকট আসিয়াছি। শুনিলাম ইহারই নাম অগ্নিকুণ্ড ! দ্বিতীয় বল্লালের রাজাস্তঃপুরচারিকারা জনৈক পতিত হইয়া, মুসলমান শত্রুর হস্ত হইতে সতীদৰ্শ রক্ষার জন্ত এই কুণ্ড নধো নাকি অগ্নিপ্রবেশ করিয়াছিলেন !

দ্বিতীয় বল্লাল যখন শুনিলেন যে একদল মুসলমান সৈন্য রামপালের নিকট-বর্তী আবছানাপুরে সেনা সমাবেশ করিয়াছে এবং তাঁহার ভ্রূণ নধো গোমাংস নিক্ষেপ করিয়াছে, তখন রাজাজ্ঞায় হিন্দু সৈন্য যুদ্ধের জন্ত সজ্জিত হইল। রাজা যুদ্ধযাত্রা করিলেন। যাত্রাকালে জনমীর চরণ বন্দনা করিলেন, রোক্ষ-মানা পত্নীদিগের সিন্ধু বদনে চূষন করিয়া তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিলেন। তাঁহারা রোদন করিতে করিতে কহিলেন, ‘নাথ, যুদ্ধে যদি অমঙ্গল ঘটে তবে আমাদের গতি কি হইবে?’ রাজা গদগদ হইয়া পুনর্বার চূষন ও আলিঙ্গনান্তর তাঁহাদিগকে অভয় দিলেন। স্থির হইল যে, রাজা যুগল কপোত লইয়া যুদ্ধ যাত্রা করিবেন। যদি তাঁহার পূর্বেই কপোত প্রাসাদে প্রত্যাবর্তন করে, তবে বৃষ্টিতে হইবে যুদ্ধে অমঙ্গল ঘটিয়াছে—স্বধর্মরক্ষার সময় নিকট হইয়াছে। পুনরারীরা তখনই যবন-স্পর্শকলঙ্ক হইতে আত্মরক্ষার নিমিত্ত পূর্বপ্রস্তুত চিতায় আরোহণ করিলেন।

দ্বিতীয় বল্লালের যুদ্ধযাত্রার বর্ণনা অত্যন্ত কল্পণ ও কদম্বগ্রাহী সন্দেহ নাই এবং আধুনিক বঙ্গবীরদিগের উপযুক্ত। তবে যে যুগের রসগীদিগের ব্রত কথায় “থোড়ায় আসি, দোলায় যাই” প্রভৃতি বীরনারীর উক্তি বর্তমান ছিল, সে যুগের বীর রাজসহধর্মিণীর উপযুক্ত কিনা তাহা বিবেচনায় বিষয়। কিন্তু কবি গোপালভট্ট এইরূপই লিখিয়াছেন—

প্রণমা মাতরং স্ত্রীভ্যাং দম্বালিঙ্গনচূষণাং ।

ত্রিঘোহত্রবংস্ত রাজানং বাম্পাকুলিতলোচনৈঃ ॥

যদিচ্ছাদশিবিং যুদ্ধে কিং নো নাথ গতিস্তদা ।

ততো গদগদসৌ রাজা সংচূষ্যালিঙ্গাং তাঃ পুনঃ ॥

• • • • •

কপোতযুগলং দৃভং সমাকর্ষণহৃৎকং ।

পূর্বপ্রস্তুতচিতায়াং দৃষ্টৌব মরণং এবং ॥ •

বল্লাল যুদ্ধে গমন করিয়া অরাতি নিধন করিলেন । কিন্তু সে যুদ্ধ বীরের যুদ্ধ নহে, কাপুরুষের যুদ্ধ !

শফর নিকটবর্তী হইয়া তিনি দেখিলেন, বাবা আদম উপাসনায় নিযুক্ত রহিয়াছেন। নিরস্ত্র অগ্নির শির ছিন্ন করিতে মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া বল্লাল সেন বাবা আদমের দেহে অস্ত্রাঘাত করিলেন! তাঁহার ভিন্ন শির ভূমিডলে লুটাইল। ইতিমধ্যে রাজার শিখিল বগ্নাভাস্তর হইতে তাঁহার অজ্ঞাতে কপোত-যুগল উড়িয়া গিয়া রাজপ্রাসাদে উপনীত হইল! রাজরমণীগণ অননি কাল-বিলম্ব না করিয়া প্রজ্জ্বলিত অগ্নিমধ্যে স্বল্প প্রদান করিলেন!

কপোত যুগল পলায়ন করিয়াছে দেখিয়া বিফ্রী বল্লাল কিপ্রগতিতে প্রাসাদে প্রত্যাবর্তন করিয়া দেখিলেন, ধূ ধূ অশ্লল অগ্নিতেছে—চিহ্নধনে চারিদিক সনাঙ্কর—তাঁহার সকল স্বপ্ন সকল সন্তোষ ভগ্ন হইয়া গিয়াছে! বল্লাল নিজেও সেই অগ্নিমধ্যে প্রবেশ করিলেন!

শুনিতে পাওয়া যায় কিছুদিন পূর্বে মৃত্তিকা খনন কালে এই কুণ্ড হইতে অনেক অস্ত্র উঠিয়াছিল। ধনরত্নের গোভে অনেকে এই স্থান খনন করিতে চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু পারে নাই! শুনা যায় কিয়দূর খনন করিলেই জুইয়া নানক এক শ্রেণীর বিস্মাক্ত পিপীলিকা শাতে সহস্রে বধির্গত হইয়া খননকারীকে আক্রমণ করে?

ডাক্তার বন্ধু স্বয়ং এইরূপ দেখিয়াছেন বলিয়া আমরা খনন করিতে বিরত হইলাম।

অগ্নিকুণ্ডের নিকটেই একটা জলাশয় দেখিলাম। শুনিলাম ইহার নাম মিঠাপুকুর। পুষ্করিণীর জল ভাল বলিয়া বোধ হইল। অগ্নিকুণ্ড এবং মিঠাপুকুরের মধ্যবর্তী স্থানে একটা ক্ষুদ্র স্তূপ দেখিলাম। অভ্যন্তরে ইষ্টক আছে বলিয়া বোধ হইল। কোতুলকের বশবর্তী হইয়া একটু খনন করিতেই এক খানি ইষ্টক বাহির হইল। দেখিলাম উহার গাত্রে তদগণ-শিল্পের চিত্র বর্তমান আছে। অম্মান হয় এখানে একটা মন্দির ছিল।

তাইটা পরিষ্কার মধ্যভাগ দিয়া বল্লালবাড়ীর মতই উচ্চ যে প্রশস্ত ভূখণ্ড দেখিতে পাওয়া যায়, ঐস্থানে পূরপ্রবেশের সিংহদ্বার ছিল বলিয়া কথিত হয়। এখন সেখানে সিংহদ্বারের কোন নিদর্শন বর্তমান নাই। সেই ভূখণ্ডের পার্শ্ব দিয়া একটা ক্ষুদ্র খাল কাটা আছে। শুনিলাম উহা মুনসীগঞ্জের কাটাখালি নামক খাল পর্য্যন্ত আসিয়াছে।

রাজপ্রাসাদের চতুর্দিকে যে পরিখা ছিল তাহা এখন বর্তমান আছে। উহা সুবিস্তৃত। উহার কোন কোন স্থান শুষ্ক হইয়াছে। যেখানে জল আছে তাহাও

ঘন শৈবালে সমাচ্ছন্ন। উত্তর দিকের পরিধার অপর পারেই যে স্থান আছে তাহাকে এখন সিপাহীপাড়া বলে। পুত্ররক্ষীদিগের বাসের জন্য ঐ স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছিল বলিয়া অনুমান হয়। এখন সেখানে সারিবিহীন কদলীবৃক্ষ শোভা গাইতেছে। নিকটবর্তী পাইকপাড়া গ্রামও চরত সকালে সেনানিবাস ছিল।

নিকটেই একটা দীর্ঘিকা বর্তমান আছে। উহা ‘কোদাল-ধোয়া’ দীর্ঘি নামে পরিচিত। ইহার সহিতও একটা প্রবাদ জড়িত রহিয়াছে। যাহারা বলালদিখি খনন করিয়াছিল, দিনের কাৰ্য্য শেষ করিয়া তাহারা প্রতিদিন একই স্থান চাইতে এক কোদাল করিয়া মাটি কাটিয়া পরে আপন আপন কোদাল ধুইয়া ফেলিত। এইরূপে মাটি কাটিতে কাটিতে একটা নাতিদীর্ঘ দীর্ঘিকা খনিত হইয়াছিল। এখন উহার অনেক অংশই চাব হইতেছে। মধ্যস্থলে একটা গোলাকার কাঠ প্রোথিত রহিয়াছে। পল্লীজ্ঞানকগণ বলিল উহার নাম “নাগখণ্ডি”। তীরের নিকটেই একখানি ক্ষুদ্র জীর্ণ তরলী ছিল। কৌতূহলী হইয়া মুন্সেফ-ভাষ্যার সহিত সেই তরলীবোগে নাগখণ্ডির নিকটে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। ডেপুটীভাষা এবং ডাক্তার-বন্ধু তখন শ্রান্তদেহে বৃক্ষচ্ছায়ায় বসিয়া তাম্বকুট ও কসলালেবুর রস গ্রহণ করিতেছিলেন এবং যাহাতে আমাদের তথ্য জীর্ণতরী নিমজ্জিত হয় ভগবানকে ডাকিয়া তাহাই বলিতেছিলেন।

নাগখণ্ডির নিকটে যাইয়া দেখিলাম উহা একটি গোলাকার সাগকাঠ। যতই উল্কে উঠিয়াছে ততই অগ্নে অগ্নে সর হইয়াছে। উহা এখন জীর্ণ হইয়াছে। মাপিয়া দেখিলাম জলের উপর প্রায় চুট চতুর্ভুজ এবং জলের মধ্যে চার চতুর্ভুজ পরিমাণ বর্তমান আছে। শিরোদেশের পরিধি প্রায় ১১০ হস্ত হইবে। উহার গাত্রে কোনরূপ কার্যকার্য্য নাই। শিরোদেশের কিয়দংশ একরূপ ভাবে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে যে দূর হইতে দেখিলে মনে হয়—কিছু যেন ছিল। অনুমান হয় পুত্ররক্ষী ও অন্যান্য সৈনিকদিগের ব্যবহারের জন্য এই দীর্ঘিকা খনন করা হইয়াছিল।

কোদাল-ধোয়া দীর্ঘি চাইতে অল্পদূরেই বাবা আদমের মসজিদ ও সমাধি। বাবা আদম আদম মঠি নামেও আখ্যাত। তাহার ঠিক পরিচয় পাইবার কোন উপায় আছে বলিয়া বোধ হয় না। কিম্বদন্তী—বাবা আদমের কাহিনী নানা ভাবে লোকসমাজে প্রচলিত করিয়াছে। উপাসমকালে দ্বিতীয় বলাল-সেনের হস্তে তাহার হত্যা, তদ্বাধো একটি। একরূপ প্রবাদও আছে যে তাহার সহিত বলালের চতুর্দশ দিবসব্যাপী দ্বন্দ্বযুদ্ধ হয়। সে সময়ে কেহ কাহাকেও

পরাজিত করিতে পারেন না । অবশেষে একদিন সায়াংকালে বাবা আদম উপাসনা-নিরত হইলে বল্লাল পশ্চাত হইতে তাঁহাকে আঘাত করেন ।

বল্লালের অসি বার্থ হইল । বাবা আদমের উপদেশে বল্লাল তখন তাঁহারই অসি দ্বারা তাঁহার মস্তক সেহচ্যুত করিলেন ।

বাবা আদম কেন যে পূর্ববঙ্গে আগমন করিয়াছিলেন তাহার কোন বিখাস-যোগ্য কারণ জানিতে পারা যায় না । এরূপ প্রবাদ আছে যে, দ্বিতীয় বল্লালের আদেশে রামপালের গো-হত্যা নিবারণিত হইয়াছিল । কিন্তু একজন মুসলমানের এইরূপ প্রতিজ্ঞা ছিল সে তাহার পুত্র হইলে সে গোবধ করিয়া জ্ঞাতিবর্গকে ভোজন করাইবে । কালক্রমে পুত্র জন্মিলে সে গোহত্যা করিয়াছিল, কিন্তু একটা ছিল একখণ্ড গোমাংস আনিয়া রাজপ্রাসাদে নিক্ষেপ করিলে পর বল্লাল অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সেই মুসলমানের শিশুটিকে পিতার সম্মুখেই নিহত করিয়াছিলেন ।

পিতা শোকার্ত হইয়া মকায় গমন করিলে পর বাবা আদমের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল । প্রতিহিংসা সাধনের জন্ত তিনি পূর্ববঙ্গে আসিয়া যেরূপে নিহত হইয়াছিলেন তাহা পূর্বেই বলিয়াছি । মৃত্যুর পর বাবা আদমের দেহ রামপালে এবং শির ঈডটে সনাহিত হইয়াছিল বলিয়া প্রবাদ আছে ।

বাবা আদমের মসজিদটা এক সময়ে দেখিতে অতি সুন্দর ছিল । কক্ষ, প্রাচীর ও বহির্ভাগ যে কারুকার্যময় ছিল, সে পরিচয় এখনও বর্তমান আছে । এখন মসজিদটির জীর্ণ দশা । ইহা দৈর্ঘ্যে ৪৩ ফিট এবং প্রস্থে ৩৬ ফিট । কক্ষ প্রাচীরের বেধ ৬০ ফিট । ছয়টা গম্বুজে ইহার ছাদ নির্মিত হইয়াছিল । মসজিদগাত্রে যতগুলি ইষ্টক আছে, সমস্তই পোদিত লতাশুল্পে সজ্জিত । ভিতরে পলতোলা ভূইটা প্রস্তর স্তম্ভ আছে । উহারাই ছাদের থিলানগুলিকে রক্ষা করিতেছে । স্তম্ভ ভূইটা বাবা আদমের গদা নামে পরিচিত ! মসজিদের শিরে আরবাভাসায় যে প্রস্তর-ফলকলিপি আছে তাহা হইতে জানা যায়—মহম্মদসাহের পুত্র সুলতান জালালুদ্দীন আবুল মোজাফ্যার সাহ সম্রাটের পুত্র সুলতানের সময়ে ৮৮৮ হিজরীতে এই মসজিদ নির্মিত হইয়াছিল ।

মসজিদের নিকটেই বাবা আদমের জীর্ণ সমাধি বর্তমান আছে । মসজিদের চতুর্দিকে গুবাক আম্র প্রভৃতি বৃক্ষ এবং বাঁশঝাড় আছে বলিয়া স্থানটা শীতল ও অপেক্ষাকৃত অন্ধকার । পূর্বকথিত সিপাহীপাড়ার পর হইতেই ভূমি ক্রমেই : নিম্ন হইতে নিম্নতর হইয়া নদীর দিকে আসিয়াছে । বাবা আদমের মসজিদ হইতে দলেখরীর তীর ১১০ মাইলের অধিক হইবে না ।

রামপালে অল্প আর কিছুই দ্রষ্টব্য নাই । কিন্তু ঐ নামের সহিত বস্ত্র-কীর্তি কাহিনী বিজড়িত রচিয়াছে । বাঙ্গালার ইতিহাসের অনেকাংশ ঐ নামের সহিত সংযুক্ত । রামপালের নাম শুনিলেই বরেন্দ্র কবি কলিকাল-বাগ্নিকী সন্ধ্যাকর নন্দীর কথা মনে পড়ে, মনে পড়ে সেই “কলিযুগ রামায়ণ” রামচরিতের কথা ; মনে পড়ে বস্ত্রের বিপুল কৈবর্তবিস্তার । সেই বিগত-গোরবের অতীত শোষণের, প্রথিত জ্ঞান-বৈভবের—সেই শিল্পসৌন্দর্যের, ধনৈশ্বর্যের, স্বাধীনতা ও ভাবগোচর কত কথাই মনে পড়ে !

মনে পড়ে একদিন কারাক্রিষ্ট মহারাজ রামপাল তাঁহার জনকভূমি বরেন্দ্র ত্যাগ করিয়া শক্তি সন্ধ্যের জ্যেষ্ঠ অঙ্গ, মগধ এবং রাঢ় জনপদ পরিভ্রমণ করিয়া-ছিলেন । পরিশেষে তাঁহার মাতুলমহলের নেতৃত্বে সামন্তগুণে মিনিত হইয়া বিদ্রোহের দমন পূৰ্ব্বক তাঁহাকে রাজসিংহাসনে সংস্থাপিত করিয়াছিলেন । দ্রুত রাজ্য উদ্ধৃত হইলে পর রামপাল বরেন্দ্রভূমে যে নব রাজধানী নিৰ্ম্মাণ করিয়া-ছিলেন, কেহ কেহ রামপালকেই সেই রামাবতী বলিয়া নির্দেশ করিতে চাহেন । যাহা দেখিলাম তাহাই কি তবে সেই রামাবতীর চিত্তভঙ্গ !

উত্তরবঙ্গে পাল রাজগৃহবর্গের কীর্তিচিহ্ন এখনও যেরূপ স্থাপ্তি দেদীপ্যমান—তন্মের পর তল, কোথাও সোপানসম্বলিত ঘাট, স্তূপের পর স্তূপ, কোথাও ইষ্টক মণ্ডিত বাট—কোন স্থানে বিপুল গৃহভিত্তি, কোথাও চারুকারমণ্ডিত প্রস্তরস্তম্ভ, কোথাও আবার ভাস্করের কঠিন হস্তে গঠিত নবনীতসদৃশ কোমল জীবন্তবৎ মৃষ্টি-নিচয়, আঁধার প্রত্নতত্ত্ব রাজনগরের ধংসাবশেষ, জগদ্বল নামক গ্রাম—তথায় বৃদ্ধা-কারে বৃহৎস্তূপ, স্তূপান্তান্তরে, পাষাণস্তম্ভ—স্তম্ভগারে চাক্টিকানয় কাচ—গ্রান হইতে কিঞ্চিত দূরে রৌদ্রকরোজ্জ্বল বিশাল দীঘিকা—কোথাও আবার শীর্ণকায়্য পুণ্যতোয়া তরঙ্গিণী, কোথাও বা তাহার প্রাচীন খাত—রামপালে এ সকলের কিছুই দেখিলাম না !

এই রামপালেই কি তবে অধুনা-বিলুপ্ত মহাতীর্থ অপূনর্ভবা—এইখানেই কি জাগরল মহাবিহার—ইহাই কি পালরাজবংশের শেষ রাজধানী ? অথবা ইহা রাম-পাল হইতেও বহু প্রাচীন অল্প কোন পরাক্রান্ত নৃপতির রাজনগর কিবা প্রথম বসতির একটি অন্ততম জয়দ্বারার মাত্র ?

শ্রীমদেবপ্রসাদ আচার্য্য ।

বিরহে ।

ওগো কেমনে পরাণ দরি' ?

সবাই হেথায় তোনারি কথায় আছে বাঁড়ী ঘর ভরি !

বেড়ের বাগানে কোন্ কোন্ গাছ

রোপিয়াছ তুমি বলে হবে আজ,

কবে নৈশবে পাঠশালা হ'তে

গুকায়ে পলায়ে আসি—

দেপেছিলে দারাদিন আম পাড়ি

আরক্ত্র নুগে সাজে ফেরা বাড়ী

জননীত তা'র কঠোর শাসন—

ক'ন তিনি হাসি হাসি !

আমি, আনন্দনা ভাগে শুনে শুনে হই তদগত চিন্তায়,

ওরা, এক ভাকে কেউ জবাব না পেয়ে করে মোরে নিশাই ।

ভাগ্য বড়ির অঙ্গল হ'লে

ভাল বাসিতে যে তুমি হবে বলে'—

সে দিন আমার কি যে দশা হয়—

কেমনে বলিব নাথ !

দেখিতে না পাই জল ভরা আঁধে

যেমন পাবার তেমনিটি থাকে,

সুধালে নন্দী কালের অছিল

করি ধুই মুখ হাত !

সব ; পড়শীরা ক'র, বউটি দেখায় রোগা কেন দিন-দিন ?

ওগো, মুখের আহারে কিবা ফল হবে ? বুক যে খাজ হীন !

সংসারটির সব কায় করি

দিন রাত্র খাটি তবু থাকে পড়ি,

তবু মনে হয় কোন কায় নাই

দিন যেন নাহি যায় ;—

মাথার কাপড় খসে' পড়ে আজ
তুলিতে তাহারে নাহি আঞ্জাজ,
উঠানে পাড়ায়ে চুল শুকানোতে
নাহিও অন্তরায় !

রাগাঘরের কানাচেতে যেথা আগে শুকাতাম মাথা,
এখন সেখানে যাবার দো নেই এত জনা ঘাস পাতা !

গিড়্‌কি দ্বারের পেরানার পাছে
এবার প্রথম ফল পরিয়াছে,
যাঁর তলে আমি নেয়ে এসে নিতি
শুকানো কাপড় লাগি
দাড়া তান, তুমি চকিতে চাছিল
বাঁটতে সরিষা উঠান ছাড়িয়া—
সেখানে এখন হইয়াছে জড়'
বাড়ীর ক'টান' মাটি !

বন্ধুরা তব এই পথে যাম সুদায়ে কুশল তব,—
তাদেরে এখন এত ভাল লাগে—কেমনে তা' আমি ক'ব ?

দাওয়ায় বসিয়া এবে চুল বাদি,
গৃহকোণ নোর মরিতেছে কাদি,
দেখে আরদীতে এই পোড়া মুখ'
চোখ ফেটে পড়ে জল ;—

সেই পালক সেই সে শয্যা,
সেই ঘরে ঢুকা নাহি সে লজ্জা—
নাহিক আবেশ বাধ' বাধ' ভাব
ঘোমটা টানার ছল !

নাহি ছরু ছরু পুলক বক্ষে,—সন্ধ্যাচ স্নানধূত,
নাহি শিরশ্রী প্রীতির বেপথু, শুধু হাহা পরিপূর !

নাহি সন্ধ্যাচ ভয় ও ভাবনা
এবে কোন' কায় থারাপই হোক না,—
কেউ নাই মোরে করিতে নিন্দা,—
কেমনে এখানে থাকি ?

‘আমারে লক্ষ্মী চাসি মুখে কার’
 সরস ঠাট্টা চম্বনাক’ আর ;
 সেই জড় সজ্জ ভাব খুচে গিয়ে
 উড়ু উড়ু প্রাণ-পাখী !
 চির পরাদীনে স্বাধীনতা কি গো এ ছেন লাতনা যোর ?
 কেড়ে লও তবে, দাও বন্ধন—মুছাও নয়ন-লোর !

সারাদিন তুমি থাকিতে ভিতরে
 রাগিতাম তা’র নিছে ছল করে,—
 ‘ও দিদি বারেক যেতে বল সরে’
 বলিতে কি ছিল স্বথ !
 প্রাণের কণাটি বৃত্তিতে দগ্ধিত
 আর’ কাছে-কাছে গুরিতে নিয়ত,
 আনাতে কি আমি থাকিত তখন ?
 হ’ত নানা ভুল চুক !
 ওগো অকারণে হ’ত অপচয় কত শুনিতাম শত গালি—
 সেই গালি যে আমার জীবনের স্বথ—দেবতার বড় ডালি ।

সারাদিন পরে নিশ্চিন্তি রাজ,
 সেই যে মিলন ক্ষণিক নাত্র
 তাই যে আমার সুব-স্বপ্না স্বথ
 সেইটুকু নাই বলি,—
 এ জীবন আচ্ছন্ন গুরুভার মম
 নব যৌবন অভিশাপ সম,
 সব স্বথ মোরে করে পরিহাস—
 রস-হীন এ সকলি !
 তোমা ছাড়া এই জগত তিক্ত তোমারি পথটি চাওয়া—
 এই কি বিরহ ? এবে অহরহ বেঁচে থেকে মরে’ যাওয়া !

জীবনসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

স্বপ্নো হু, মায়া হু, মতিভ্রমো হু ?

(কোন ক্রমান্বয়ে গল্পের ছদ্ম অবলম্বনে।)

আমি তাহাকে পাগলের মতই ভাল বাসিতাম, হায় মাহুষে ভালবাসে কেন বলিতে পার ?

কেন ভালবাসে, কেমন করিয়া বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত সৌন্দর্য্য একটিমাত্র মানবের মধ্যে কেন্দ্রীভূত হইয়া অত্যাশ্চর্য্য আলোকে আর সবই বিলুপ্ত করিয়া দেয়, জীবনের অশেষ চিন্তা পুঞ্জীভূত হইয়া কেবলমাত্র একটিমাত্র চিন্তার তন্ময় করিয়া রাখে, একটিনাত্র কামনায় হৃদয় ভরপুর হইয়া যায়, একটিমাত্র প্রিয়নাম ইষ্টমন্দের মত অন্তরে জাগরুক থাকিয়া, বিগলিত নিষ্কর ধারার জ্বালায় নিরন্তর কল মধুর সঙ্গীতে আপনাকে বাস্তব করিতে চাহে। অহোরাত্র পৈতৃপ সাধনার আর অন্ত থাকে না, এ আরাধনার আর বিরতি নাই, এ পূজার অহুষ্ঠানে দেশ কাল পাত্র সকলই পবিত্র হইয়া যায়।

আমি আমার এ ভালবাসার কাহিনী তোমায় বলিব, একটি বারের এ কথা আমার চির জীবনের চিরদিনেরই কথা। আমি তাহাকে দেণিবামাত্রই ভাল বাসিয়াছিলাম, এ কথাই এই হৃদয়, আবার এই সমাপ্তি। একটি সম্পূর্ণ বৎসর ভরিয়া আমি তাহার স্নেহে, সমাদরে, তাহার দিবা স্পর্শে, তাহার কনকীয় লাবণ্যে, তাহার বেশবিক্রাস, বিলাস বিন্ধনে, তাহার সেবা শুক্রমার সুধারসে সজীবিত ছিলাম। তাহারি মধ্যে আমার জীবনের সীমা আপনাকে সঙ্গ করিয়াছিল। আমি তাহার স্বেচ্ছাবন্দী ছিলাম, দিবারাত্রির ভেদ আমার বুদ্ধি হইতে তিরোহিত হইয়া গিয়াছিল। ওগো আমি একেবারে ভুলিয়াই গিয়াছিলাম যে, এই প্রাচীন বহুবর্তীর মাতৃবক্ষের আশ্রয়ে আমি তখনও জীবিত আছি, না স্বর্গের চিরনবীন নন্দনোজ্বানের অভিনন্দিত অতিথি হইয়াছি।

তাহার পর সে মরিয়া গেল, কিসে, কেমন করিয়া, আমিও বলিতে পারি না। আমি যে এখনও সে কথা জানি না, কিন্তু একদিন সন্ধ্যায় সে ভিজিয়া বাড়ী আসিয়াছিল, সেদিন বড়ই বৃষ্টি হইতেছিল। তাহার পরদিন হইতেই তাহার কানী হইল, এক সপ্তাহ যাইতে না যাইতে সে শয্যাধরা হইয়া পড়িল। কি যে হইয়াছিল এখনও মনে করিতে পারি না। ডাক্তার আসিতেন, ঔষধ লিখিয়া দিয়া যাইতেন, ঔষধ আসিত, প্রতিবেশিনী স্ত্রীলোকেরা জোর করিয়া তাহাকে তাহা খাওয়াইয়া দিত। তাহার হাত দুখানি, কপালটুকু সর্ব্বদাই যেন পুড়িয়া

ঘাইত, অরের তীর আলার বিষয় চোখ ছোট উজ্জল হইয়া উঠিয়াছিল। আমি কথা বলিলেই সে উত্তর করিত, কিন্তু মনে ত নাই কি কথা আনরা বলিয়াছিলাম, আমি সমস্তই ভুলিয়া গিয়াছি, একেবারেই ভুলিয়াছি। সে মরিয়া গেল, তবু তাহার শেষ কণিণ শ্রান্ত নিশ্বাসটুকু এখনও মনে পড়ে। শুষ্কশাকারিণী মাথা নাড়িয়া একবার বলিল, আমি নুঁকিয়াছিলাম, আমি ত আগেই বলিয়াছিলাম।

তাহার পর আর কিছুই জানিনা, শেষ সংস্কারের ক্ষণ ধর্ম্মবাক্যকে ডাকিয়া আনিলাম। তিনি আসিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, এই রমণী, একি তোমার বিবাহিতা পত্নী? আমার মনে হইল পুরোহিত যেন তাহাকে অপমান করিতেছেন। সে ত মরিয়াই গিয়াছে, তাহার সম্বন্ধে প্রশ্ন করিবার আর কাহার কি অধিকার আছে? আমি সে পুরোহিতকে দূর করিয়া দিলাম। আর একজন আসিলেন, তাহার মনটি অতি কোমল, কথাগুলি বড়ই মধুর। তাহার সম্বন্ধে তিনি যে কথা বলিলেন, আমি আর চোখের জল সামলাইয়া রাখিতে পারিলাম না। কতই কাঁদিলাম। কেনন করিয়া শেষ কাজ সমাধা করিবে, সে বিষয় তাহারা আনার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। কি শুনিয়া কি যে বলিয়াছিলাম, কিছুই আর ত মনে নাট, তবে তাহারা যখন তাহার কফিনের ডালা হাড়ুড়ি দিয়া পেরেক ঠুকিয়া, বন্ধ করিয়া দিল, সে শব্দ এখনও ভুলিতে পারি নাই। সেই ছোট একটুকুখানি সিঁদুক, তাহারই মধ্যে তাহাকে চিরদিনের নত বন্দী করিয়া রাখিল। হায় ঈশ্বর, একি সবিভবাতা! তাহার কবর হইল, কাহার? —সেই সুকুমারী তথী, লাবণ্যময়ী ললিতা তরুণীর! পর্যাপ্ত পুষ্পস্তবকাবনম্রা সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতিকার নত; মৃদু স্বন্দর সেই কণিণসেহবরী মাটির মধ্যে গঠ করিয়া তাহার পুত্ৰিয়া রাখিল। ছচারিজন স্ত্রীলোক বহু তাহাই দেখিতে আসিয়াছিল। আমি পলাইয়া গেলান, যতদূর পারি উর্জ্বাসে দৌড় দিলাম, তাহার পর সদয় রাগ্তার আসিয়া পড়িয়া হাঁটরা বাড়ী পৌঁছিয়া। পরদিনই বতনূরে নিরুদ্দেশ-যাত্রায় বাহির হইয়া পড়িলাম।

সবে নাত্র কাল আমি ফিরিয়া আসিয়াছি। যখন আবার আমার ঘরগানি, আনার কেন, আমাদের সেই ঘর বিছানা তৈজসপত্র, মৃত্যুর পর মানব জীবনের যাহা কিছু 'অবশেষ' পড়িয়া থাকে, তাহাই সব দেখিলাম, তখন আমার মনে ছঃপের বৃত্তিক এমনি স্ত্রীতীর সংশন করিল যে, আমি যন্ত্রণার অধীর হইয়া পড়িলাম, ইচ্ছা হইল ত্রিতলগৃহের সমুচ্চ বাতায়ন হইতে নুতপাণের উপর কাঁপাইয়া

পড়িয়া আশ্বনাশী হই। সে দৃষ্টোন্নয়ন নধো অধিকরণ তিষ্ঠিতে পারিলান না, ঘরের সেই সঙ্গীণ চারপাশি প্রাচীর, বাহার নধো তাহার স্বপ্নের আশ্রয়শীড়টি রচিত হইয়াছিল, এখনও সেখানে তাড়নর অঙ্গ সৌরভ, কেশের স্রবাস বসতি করিতেছিল, বাহার প্রাত্যেক অণু পরনাণু তাহারই স্বতিতে অঙ্গপ্রাণিত, সেখানে আনার নিশ্বাস রোধ হইয়া আসিল, আমি পলাইয়া আসিগান। নির্ভি দিয়া নামিয়া আসিতে আসিতে বড় আশ্বনাশানির উপর আনার দৃষ্টি পড়িল, সম্মুখে পাড়াইলে তাহাতে আপাদমস্তক দেখা যায়, সাজিয়া গুচ্ছিয়া নিমগ্নঃ সভার যাইবার সময় কতবার সে ঐ খানির সম্মুখে পাড়াইয়া আপনার প্রতিবিম্ব দেখিয়া হাসিয়াছে। ফুলের নত অল্পময় মুখপাশি ঘুরাইয়া ফিরাইয়া কত ভঙ্গীতেই আপনাকে দেখিত। আশ্বনাশানির সম্মুখে ধমকিয়া পাড়াইয়া ভাবিতে লাগিগান। কত বার বার তাহার ছায়া যে ইহার উপর আসিয়া পড়িয়াছে, তাহার সংখ্যা করা কঠিন, তবুও কি কোনই স্বতি রাখিয়া যাইতে পারে নাই? এও কি কখনও হয়, আশ্বনাশানি যে আমারই নত মুখ বিছল লাগিলনে তাহাকে সর্কান্ন বেটন করিয়া ধরিত, তবে কেমন করিয়া তাহার ছবি মুছিয়া গেল? আমি একবার সেই অবিচলিত দর্পণখানি স্পর্শ করিগান, ননে হইল যেন তাহাকে ভালবাসি; কিন্তু হায় তাহার মধ্যে জীবনের শুল্লিঙ্গ নাহও অবশেষ নাই। একেবারে হিমার্ত নীতলতা, সম্পূর্ণ জীবন-বর্জিত। হায় স্বতির ছায়াবাচ্চি, হায় আনার অতীতের নাশামুকুর, তদন্ত আনার নন, কোন ছবিই ত মুছিয়া গেল না। ঘুরিয়া ফিরিয়া সবই কেবলই চকোর সম্মুখে ভাগিয়া বেড়ায়, আর আমি যনগতনা ভোগ করি। বাহার কুলিতে পারে তাহারাই স্থগী। মেহপ্রীতি, স্বতিস্বপ্ন সবই বাহাদের অন্তঃকরণ হইতে তিরোহিত হয়, ঐ দর্পণখানির নত সমস্ত চিত্র মুছিয়া ফেলিয়া রূপ যাহাদের স্বচ্ছ অনাবিল, তাহারা কতই না সুখী। ভুলিতে পারিগান না বলিয়াই আনার স্বপ্নের আর অন্ত নাই।

আপনার অজ্ঞাতসারে কখন যে বাড়ীর বাহির হইয়া আসিয়াছিলান বুঝিতে পারি নাই। আমি সমাধি ক্ষেত্রের অভিমুখে চলিগান। সেখানে তাহার সমাধি খুলিয়া লইতে কষ্ট হইল না। খেত নর্থর ক্রুশ চিহ্নিত নিরাভরণ সে সনাদি। তাহারই গাত্রে, এই কয়টি কথা খোদিত ছিল—“ভালবাসিয়া, ভালবাসা পাইয়া, তবে সে মরিয়া গিয়াছে।” আমি সেই স্মরণ-স্তুত্বের পাদদেশে মাথা রাখিয়া মাটিতে পড়িয়া কাদিতে লাগিগান—কতকণ যে অতীত চইয়া গেল বুঝিতেই পারিগান না। যখন বুঝিলাম তখন মনে ছিল করিলাম যে, সে রাশি সেখানেই

কাটাইব। একরাত্রি তাহারই সনাদির পার্শ্বে, সেই হিম-কঠিন পাষণ্ড ব্যবধানকে ছুঁড়াইয়া ধরিয়া কাদিয়া কাটাইব। তাহার পর যেদিকে ছুই চোখ যায় সেই দিকে চলিয়া যাইব। কিন্তু কেহ যদি আমার দেখিতে পায় তবে ত থাকিতে দিবে না; তাই উঠিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম, সেখানকার স্নগক মনে করিবে আনি-বৃষ্টি চলিয়া যাইতেছি। জীবিতের আবাস জনকোলাহলবিহীন বিশাল নগরীর তুলনায়, মৃতের এই নিস্তরূপ পল্লীখানি কতই ক্ষুদ্র; কিন্তু দায় তাহাদের সংখ্যাত জীবিতের অপেক্ষা অধিক বই অল্প নয়।

বংশপরম্পরায় যাহারা এই পৃথিবীর দিবালোকের অধিকারী হইয়া জন্ম-গ্রহণ করে, তাহাদের জন্ম কত সুবৃহৎ অট্টালিকা; কেমন প্রশস্ত রাজপথ সকলের আবশ্যক হয়, উৎসাহারার স্বচ্ছ স্বচ্ছ সলিল, ভ্রাণাপুঞ্জের মধুর রসধারা তাহাদের পানীয়, বহুমতীর বক্ষোজাত স্নর্গ শব্দের অল্প তাহাদের খাদ্য।

কিন্তু যাহারা মরিয়া গিয়াছে, যুগ যুগান্তর ধরিয়া যাহারা ইহপরকালের সোপান স্ফুটন করিয়া আসিতেছে, তাহাদের জন্ম কোন আয়োজনই নাই। কোথায় না ক্ষেত্রের শস্ত, কোথায়ই বা ঘ্রোতবিনীর ষাঁতল পানীয়—ধরিয়া তাহাদের বক্ষে করিয়া লয়েন, তাহার পর অনন্ত বিস্তৃতি স্থির অক্ষকারের আচ্ছাদনে চির আবৃত করিয়া রাখে। আকাশে বাতাসে চারিদিকে, 'বিদায়' চিরবিদায়ের ক্লাস্ত বাণী অবিরত ধ্বনিত হইতে থাকে।

সেই সনাদি-ক্ষেত্রের এক প্রান্ত একেবারে পরিত্যক্ত, মৃত-বসতি-বিহীন, স্মরণচিহ্ন সকল অন্তর্ধান হইয়া গিয়াছে, কোথাও বা ভগ্ন শিথিল অবস্থায়, বিস্তৃত ব্রহ্মের বিরাট সাক্ষাৎ সুস্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছে। ইহারই পার্শ্বে পতিত জনি সবৃদ্ধ ভর্য্যায় করণ কোমল, জদিন পরে নবাগত মৃত অতিথি সকল সেখানে আশ্রয় লাভ করিবেন। নতুন, পুরাতনের এই সন্ধি ক্ষেত্রে অনেকগুলি গাছে শোণিতোজ্জ্বল গোলাপ ফুটিয়া চারিদিক রঙীন করিয়া তুলিয়াছে; তাহারই আশে পাশে সরগ উন্নত চ্চচারিটি শিশু দেবদারু তরু, মৃতদেহের অবশেষ আহার করিয়াই তাহারা এমন সরস, সতেজ, জীবন্ত।

অক্ষর্য্যক্রমে গনাইয়া আসিল, আমি নিঃশব্দ পদসন্ধারে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। মৃতের চিরনিদ্রা তাহার যদি ভাঙিয়া যায়, আমার অনবধানতায় যদি তাহারা কণিকের ক্ষত্বে ও চুৎখের পৃথিবীতে আবার জাগিয়া ওঠে, এই ভাবিয়া আমি বড়ই সাবধানে চলিতে লাগিলাম। কিছুই দেখা যায় না। চলিতে চলিতে আমি সর্ব্বদা আঘাত পাইতে লাগিলাম, কই তাহার সনাদি ত খুঁজিয়া পাই না।

অক্ষর মত হাতড়াইয়া চলিলাম, প্রত্যেক ক্রুশ প্রতি সৌচ-রেলিং, প্রস্তর-স্তম্ভ স্পর্শ করিয়া করিয়া চলিলাম, অঙ্গুলি চালনা করিয়া পৌঁদিত অক্ষরের লেখা নাম পড়িতে লাগিলাম। অচো, সে কি রাত্রি গিয়াছে, কি শোকগ্রস্ত বিভীষিকা-পূর্ণ, দীর্ঘ নিদ্রাধিনী। আমি আর তাহাকে খুঁজিয়া পাইলাম না।

চন্দ্রহীন রাত্রি, অন্ধকার আর গুচিল না, চারিদিকে নিস্তব্ধ নৃক সনাদি-চিহ্ন ব্যতীত আর কিছুই নাই। তাহাদের সন্বেদ পায়ণ ভার যেন আমার বুকের উপর চাপিয়া পড়িল, আমি যেন অন্ধকারের মধ্যে প্রোথিত হইয়া যাইতে লাগিলাম। কতকণ এই ভাবে ছিলান বন্ধিতে পারি নাই; চঠাং ননে হইল আমি যে সনাদির প্রস্তরাসনে বসিয়া ছিলাম, সেই নিশ্চল পায়ণ যেন নড়িতেছে। আমি একলক্ষে সে আসন ত্যাগ করিয়া উঠিলাম; দেখিতে পাইলাম সম্মুখে, আশে পাশে, চারিদিকেই সনাদিধার সকল উন্মোচিত; তাহা হইতে নর কঙ্কালগণ বাহির হইয়া আসিয়াছে—আমার সম্মুখের সনাদির ক্রুশের উপর লেখা ছিল “এইখানে—চির নিদ্রায় সনাদিত, ৫১বৎসর বয়সে তাহার মৃত্যু হইয়াছে, তিনি পরিবারবংসল, সাধুপ্রকৃতি ছিলেন, তাহার প্রতি .দেবাহুগ্রহ নিয়ত বর্দিত হইয়াছিল।” স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম সেই মাংসপেশীবর্জিত নরকঙ্কাল খুঁকিয়া পড়িয়া এই লেখাটি পাঠ করিল, তাহার পর অস্থির অঙ্গুলি দিয়া পৌঁদিত অক্ষরগুলি অতি যত্নে, দীর্ঘ অধ্যবসায় সহকারে মুছিয়া লিখিয়া দিল, “এইখানে—বিশ্রাম করিতেছে, ৫১বৎসর বয়সে তাহার মৃত্যু হয়, সন্তর বিষয়াদিক্রান্ত কনিবার জ্ঞান নিহ্নর ব্যবহারের দ্বারা স্বীয় পিতার মৃত্যু অব্যাহিত করিয়াছিল, স্বীকে নিয়ত যন্ত্রণাদায়, সন্তান গণকে উৎপীড়িত, প্রতিবেশীদিগকে প্রতারিত করিত; অশেষ কষ্টের মধ্যে তাহার মৃত্যু হইয়াছিল।” লেখা হইয়া গেলে মৃত ব্যক্তি একবার আপনাত হস্তাক্ষর ভাল করিয়া দেখিল। আমি ফিরিয়া দেখিলাম চারিদিকেই এট অত্যন্ত ঘটনা ঘটতেছে। তখন আমার ভয় দ্বিধা গুচিয়া গেল, আমিও দৌড়িয়া খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিলাম—মনে নিশ্চয় জানিলাম যে তাহাকে আবার দেখিতে পাইব—আমার আশা বার্থ হইল না। তাহাকে কঙ্কালাবশেষ দেখিতে পাইলাম, মুখখানি নিবিড় বস্মাকৃত ছিল, তট্টা দেখিবার দোভাগ্য ঘটিল না। যেখানে লেখা ছিল “সে ভালবাসিয়া, ভালবাসা পাইয়া তবে নরিয়াছে,” তাহার স্থানে দেখিলাম লেখা রহিয়াছে “কোনও বর্ষার দিনে সে তাহার

প্রিয়জনকে প্রভাষণ করিবার জন্য বাড়িরে গিয়াছিল—বৃষ্টিতে ভিজিয়া আসিয়া কাশরোগে, অর্ধদিনের মধ্যেই তাহার মৃত্যু হয় ।”

তিনিগান পরদিন প্রভাতে, তাহার সমাধির নিকট আমার আত্মীয় বাগব-
গণ আমাকে মৃতকর মূর্ত্যাপন্ন অবস্থায় আবিষ্কার করিয়াছিলেন ।

ঐপ্রিয়মদা দেবী ।

উদ্দেশ্য ।

নীলমণি তুই কোথায় গে'লি বল ;

আনি বেড়াই ডেকে, দিস্না সাড়া

(ও তুই) করিস্ কেন ছল !

কোন্ দেশে, তুই কোন্ প্রবাসে,

তুলে আছিস্ কার আবাসে,

(আমার) ডিয়ার নাথ জলছে অনল,

(আর) নয়নভরা জল ।

যেথায় তুমি গেছ যাও, ক'রুলে কি কেউ তোমায় যাও,

ননী, ছানা, মিষ্টি মধু, দিয়ে রসাল কল ?

দিন কয়েকের ক্ষণে গণিক,

বেথা দিয়ে গে'লে মানিক,

(এত) রাগরাগিনী বাজিয়ে শেষে,

ভাঙ্গ'লি বাণীর কল ।

ফেলে সকল গেছিস্ একা,

আর যদি তুই না দিস্ বেথা,

আনি কেমন করে আঁধার ঘরে,

(তবে) রইব একা বল !

আর কতদিন এমন কু'রে,

রব আমি পরাণ ধরে'

সেই মরণ দূতে পাঠিয়ে দিয়ে

আমায় মিয়ে চল ।

ঐমণীক্সনাথ রায় ।

সংস্কৃত নাটকের জন্ম-কথা

[সার-সংগ্রহ—

মূল নির্দেশের চরিত্রতা—অভিনয়-প্রবৃত্তির বিকাশ, কর্ম ও ভাবেষু অমূলকীকরণ—সংস্কৃত নাটক সম্বন্ধীয় প্রধান নতসমূহের আলোচনা—নাট্য চর্চাতে নাটক ‘নৃত্য’ ‘নৃত্য’ ও ‘নাট্য’—আদিগণ অধিবাসিগণ ও নাট্যপ্রয়োগ—পুতুল খেলা ও নাটক—সংস্কৃত নাটকে বিদ্যুৎ চরিত্র—ভরতের নত জঙ্ঘাসোৎসব মহাঃ পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহোদয়ের বাখ্যা—নত সমূহের জাতি-সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার প্রয়াস—নাট্যাচার্য্যগণের ধারা—ঋগ্বেদীয় সংবাদহস্ত নাটকের বীজ ইন্দ্রবুদ্ধ বৃদ্ধ ব্যাপার কর্মকাণ্ডের যুগে অভিনয়ের প্রয়োগ ; গদ্যের সম্মিলন—হৃতবীর শব্দের অর্থ—নাট্য ও ‘নটহৃত’—ভরত ও ভরতপুত্র—ইন্দ্রপুত্র ও ‘ত্রেণ্ডগোব’ নাট্যের নৃত্য প্রচার—(আৰ্য্য) নার্মনাট্য সাহিত্য ও (প্রাকৃত) ‘দেশী নাট্য’ সাহিত্য—নহা-ভাব্যের কংসবধ ও বলিবদ্ধ—সটক গোষ্ঠী, মূর্ত্তি প্রভৃতি—অভিনীত নাটকের হৃতপাত—রাজশক্তি পৃষ্ঠপোষকতা—নাট্যশাস্ত্রের ‘নাট্যশাপ’ ও রাজসভায় নাট্যপ্রয়োগ—সংস্কৃত নাটকের বিকাশ—অশ্বমেধ, ভাগ, কাশিদাস—বহু শতাব্দীর পরিণতির ফল—কালগত মূল নির্দেশের অসম্ভবতা—সংস্কৃত নাটকের প্রাচীনতা—সংস্কৃত নাট্যের উপর গ্রীক নাট্যের প্রভাবের কথা—উপসংহার]

যে কোন বিষয়েরই আদি নির্ণয় বা মূল নির্দেশ করা যে কত সমস্যার কথা, তাহা মানবজাতিই অল্পবিস্তর বুঝিয়া থাকেন ; তথাপি মানবের অমূল্যসিদ্ধি ও কোতুহল এত প্রবল যে, অধোদগমীয় মহতো নদীয়ান্ ত্রাঙ্ক হইতে তৃণগাছটা বা পান্যপান্যের পর্য্যন্তও জন্মকথা মানের নতন করিয়া প্রকাশ করিতে না পারিলে মানব তৃপ্ত হইতে চাহেন না । জগতের দর্শন, বিজ্ঞান যুগে যুগে মানবের এই সনাতন প্রবৃত্তিরই সাক্ষ্য দিতেছে । স্থল জগতের পদার্থসম্বন্ধে কোনও সিদ্ধান্ত অপেক্ষা স্থল জগৎ বা ননোজগতের পদার্থ সম্বন্ধে কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অধিকতর সমস্যার কথা ; কিন্তু শেষোক্ত বিষয় সমূহেও মানব-মস্তিষ্ক আলোড়িত হইয়া সংশয় অন্ধকারের মধ্য হইতেও সিদ্ধান্তের দীপ্তি প্রকাশ করিবার জন্য উজ্জ্বল হইয়াছে । মানবজাতির মধ্যে নাট্যসাহিত্যের আদির্নির্ণয়ের চেষ্টাও এই-রূপই চিন্তার ফল । আবেগ ও উচ্ছ্বাসকে, ক্রিয়া ও চেষ্টাকে, নাম ও রূপ দ্বারা

ব্যাকৃত কদ্রিবার আকুল পিপাসা হইতেই নাট্যের উৎপত্তি—ভরতের ভাবার, ভাব এবং কৰ্ণের অধুর্কীর্তন হইতেই নাটকের জন্ম। তাই মনোবিজ্ঞানের সিদ্ধান্তের সহিত সানন্দস্যা রাখিয়া ইহা বলা যাইতে পারে যে মানবজাতির মধ্যে গীতি-সাহিত্য মহাকাব্য এবং নাট্য সাহিত্য ক্রমপরম্পরায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। নাট্য-সাহিত্য কবির কৃতিত্ব, কৌশল ও সংযমের পরাকাষ্ঠা লক্ষিত হয়—প্রতী-চীর কবিসম্রাটের ভাষা “কল্পনার ভরপুর” (of imagination all compact) নাট্যকার সম্বন্ধে যেমন অনবদ্যভাবে প্রস্তুত হইতে পারে এমন অন্য কোনও রাজ্যের কবিসম্বন্ধে নহে।

মানবপ্রকৃতি মূলতঃ একং কাজেই ভারতীয় নাট্যসাহিত্যের আদিভেদের ভিত্তি ও এই পূর্ণোক্ত সার্বজনীন প্রবৃত্তি। তথাপি দেশকালাদি পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভেদে ভাঙতে যে নাটক প্রবর্তনের চেষ্টা, এবং তদুপযোগী অস্থান অস্থানে হইতে বিভিন্ন হইতে পারে তাহা একেবারে অসম্ভব নহে। বর্তমান কালে আনন্স যে সংস্কৃত নাট্য-সাহিত্যের প্রাচীনতম নমুনাও পাইয়া থাকি, বলা বাহুল্য তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে নাটকের পরিণতি ও উৎকর্ষের যুগের পরিপুষ্ট জিনিষ ব্যতীত অন্য কিছু নহে *। সর্বাঙ্গে শাস্ত্রানুত গ্রীক সেবী মিনার্ভার মত সংস্কৃত নাট্য সাহিত্যও আনন্দের নিকট মূর্তি পরিগ্রহ করে। আমাদিগকে এই পরিণতির ক্রমিক দারা নির্ধারণ করিতে হইবে, আৰ্য সাহিত্যের বস্তিকা সাহায্যে এই রহস্যাকার বিদূরিত করিতে হইবে, রূপকের ঘনঘটা হইতে সত্যের বিচ্ছলী-রেখার আভাস লক্ষ্য করিয়া নাটকের পরিপুষ্টির পথ বাহির করিতে হইবে। একদা ব্যাপারে মতের অনৈক্য। পাকা নিচির্গ নহে—সুতরাং আনন্দের বক্তব্য নিবেদন করিবার পূর্বে এ বিষয়ে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য পণ্ডিতগণের মধ্যে প্রচলিত মতবাদের ভিত্তর প্রধান তিনটা মতের উল্লেখ করিব।

অধ্যাপক বেবার, মিঃ উইলিয়ম্ ম্যাকডোনেল প্রমুখ পাশ্চাত্য সূদীগণের মতে নৃত্য বা নাচ হইতেই ভারতীয় নাটকের উৎপত্তি +। তাঁহার। বলেন নাটক সংজ্ঞাই তাঁহাদের মতের প্রকৃষ্ট পরিপোষক। সংস্কৃত নৃত্য ধাতু হইতে প্রাকৃত নাট্য

* We see the full-blown without a trace of the bud—S. M. Mitra, Anglo-Indian Studies.

+ অধ্যাপক ডনাল্ডসন্ জর্জান সাহিত্যিক হার্ডারের মতের অনুসরণ করিয়া সাধারণ ভাবেই বলেন—Dramatic poetry arose not at the altar but in wild merry dances.

ধাতুর উৎপত্তি, তাহা হইতে নট, নাটক প্রভৃতি কথা আসিয়াছে। প্রথমে আমোদ প্রমোদের জন্য কতকটা অভব্য শ্রেণীর অঙ্গবিক্ষেপ (ভাঙিঁ), পরে ভাগলয়ের সহিত সবিলাস “লালু” সঙ্গীত, অবশেষে হাবভাবের প্রকাশক কথোপকথনের বিন্যাস—প্রথম “নৃত্য”, পরে “নৃত্ত” শেষে “নাট্য”*, এই হইল নাটক অভিব্যক্তির দারা। অতি প্রাচীনকালে ভারতের আদিম অধিবাসিগণ তাহাদের ভাষার (অপভ্রংশ ভাষার) এই সকল নাটকের অভিনয় করিত। অপরূপ বেদসংহিতায় এইরূপ নৃত্যগীতাদির উল্লেখ পাওয়া যায়। অধ্যাপক সিল্ভান লেভি, বার্গ, শ্রীযুক্ত গিয়ারসন প্রভৃতির মতে এই লোক-নাট্য-সাহিত্যের অঙ্কুরণে শিষ্টজন-সংস্কৃত-সাহিত্যে নাটক অভিনয় প্রবর্তিত হইল +। অধ্যাপক কীর মহোদয়ও এই পক্ষের সমর্থনকারী বলিয়া মনে হয়। ‡ সম্ভ্রুতি অধ্যাপক হরউইটজ * বলিতেছেন যে, বেদের সংবাদহরু মুহূর্তের রচনার পূর্বেও আদিম অনাগ্য অধিবাসিগণের মধ্যে তাহাদের দেবতা শিব প্রভৃতির উৎসব উপলক্ষে এইরূপ তাহাদের অভিনয়ের প্রথা বর্তমান ছিল।

সুপণ্ডিত অধ্যাপক পিঞ্চেল মচোদয় বলেন, পুতুলের সং পেশাই (puppet play) হইল নাটকের পূর্ণ নিদর্শন +। অনাবৃত্ত বিস্তৃত প্রাঙ্গণে সাধারণতঃ

* পাত্রবিক্ষেপমাত্রস্ত সঙ্গীতভিনয়বিক্ষেপঃ।

আজিঃকাল প্রকারেণ নৃত্যং নৃত্যবিশো বিহুঃ।

দশবিদ্যা প্রতীতো যন্তালমানলয়াজিতঃ।

সবিলাসাক্ষবিক্ষেপো নৃত্যমিচ্ছাচ্যতে বৃধৈঃ।

যোঃয়ং স্বভালে লোকস্ত নানাবিশ্বাসার্থকঃ।

সাক্ষাভিনয় নৈমুঃস্তো নাট্যমিচ্ছাচ্যতে বৃধৈঃ। সঙ্গীত রত্নাকর।

+ Dr. Grierson on M. Barth's Review of Leri's theatretde Indian (Indian Antiquary

‡ Dr. A. B. Keith—The Vedic Akhyana and the Indian Drama—J. R. A. B.—1911 pp. 1008-09.

* E. P. Horowitz—The Indian Theatre.—“The Vedic dialogues reflect the afterglow rather than the first morning flush of the rude representations staged in the vulgar tongue of Kreshna's and Siva's ancient mysteries.”

+ It is not improbable that the puppet is in reality everywhere the most ancient form of dramatic representation. Without doubt this is the case in India “Mrs. Vyvyan's Translation of Pischel's the nome of the Puppet Play.”

দাসশ্রেণীর লোকেরা নানারূপ পুতুলের সংলইয়া আশ্ববিনোদন করিত। পরবর্তী সংস্কৃত সাহিত্যে (মহাভারত, ৪।৩৭।২৯, দশকুমারচরিত, বাৎসায়নের কামসূত্র, প্রিয়দর্শিকা) পাকালিকা, দারুণী শৃংগতথিকা, পুতলিকা প্রভৃতি কথা এই লুপ্ত প্রায় প্রকার স্থিতি অটুট রাখিয়াছে। জীপ্ত শব্দর পাণ্ডুর পণ্ডিত মহোদয়েরও ধারণা এইরূপ। ক্রমে এই সংস্কল কথা কহিতে লাগিল—একগাছি সূত্রের সাঁহাঘো এইরূপ এক একটা সংস্কলমধ্যে উপস্থাপিত হইত। নীচ হইতে বা পার্শ্ব হইতে মাত্রমে কথা কহিত। এইরূপে প্রথম অবস্থায় নাট্য অভিনয় চলিত। হর্ষচরিত ও বাসবদত্তা প্রভৃতিতে এইরূপ পুতলিকার উল্লেখ পাওয়া যায়। মহাভারতে এইরূপ “সূত্র প্রোত” “দাক্ষন্যী ঘোষার” উপস্থাপন “পুস্ততন ইতিহাস” (৩।৩০।২১, ২৩) বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। পুস্ততন প্রয়োগ সমূহে বে বাক্তিকে সূত্র ধরিয়া সকল সংয়ের সনয়নত সন্নিবেশ করিতে হইত, তাহার নাম ছিল সূত্রধার এবং যাহাকে সং উত্থাপিত করিতে হইত, তাহার নাম ছিল “উত্থাপক” (হরবিজয় ৪০।৩৮) বা “স্থাপক।” পরবর্তী সভ্যতার যুগে এই দুই বাক্তির কার্য একজনের দ্বারাই চলিত—তাই অলঙ্কারশাস্ত্রে + দুইটি নাটকীয় পারিভাষিক শব্দের উল্লেখ থাকিলেও এক সূত্রধারের দ্বারা কার্য সাধিত হইতে পারে বলিয়া নির্দেশ আছে। রাজশেখরের বাসবদত্তায় + ও জয়দেবের প্রসন্নসাবব + নাটক হইতেও এইরূপ পুস্ততন প্রকার আভাস পাওয়া যায়। বৈদিক যুগের আর্চ্যগণ এই প্রকার অঙ্কুরণ + করিয়াই তাঁহাদের কর্মকাণ্ডের মধ্যে গান ও কথোপকথনের সন্নিবেশ করেন; কালক্রমে উন্নততর হইলে উহা হইতেই পরবর্তী শিল্পজন সাহিত্যে নাটকের স্রষ্টি হইল। বিশেষ মহোদয়ের ন্যস্ত সংস্কৃত

■ Vido Notes, Vikramorvasi (Page 4)

+ বাসবদত্তায়— সূত্রধারচলচ্ছাপ্যাক্রে যং যত্র জানকী
বক্ স্তম্ভাঙ্গিকালোপা লঙ্ঘেঙ্গং বক্সিয়াতি ॥

■ প্রসন্নসাবব— মনকরাত্রে সূত্রলসাস্তিতবৃত্তিঃ ।

■ যথা নিবন্ধনের সাহিত্যমর্পণে ধনুজয়ের দশরূপকে ।

+ “On solemn occasions such as that of the sacrifice of a horse it was the custom in vedic times to recite old histories and songs, and the performers, the priests of the Rig-Veda and the Yajur-veda spoke turn about. There are no doubt (1) characteristics which remind us of popular performances.” Fischel's Home of the Puppet play (Transl.).

নাট্য-সাহিত্যে বিদ্যুৎ চরিত্রের সন্নিবেশই • পূর্বতন অনার্য প্রয়োগসমূহের সহিত সঙ্গত অবিকল্পিত রাখিয়াছে। ঐতিহাসিক যুগেও ভাষ্যদীপ্তপ্রবাহী হিন্দুদের মধ্যে নাকি পূর্বনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে নাটকের অভিনয় হইত +। অতি প্রাচীন কালে গ্রীস, পারস্য ও রূম দেশেও এই উপায়ে রূপকের অভিনয় হইত বলিয়া অনেকের ধারণা +।

ভরত মুনির “নাট্যশাস্ত্রে” “বেদসংগীত” নাট্য-বেদের উৎপত্তির অথবা মনুষ্যজাতির মধ্যে প্রচারের কথা বিভিন্ন ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ইঙ্গ প্রভৃতি দেবগণের দ্বারা অন্তরীক্ষ হইয়া তদ্বারা “মার্কবর্ষিক” পঞ্চম বেদের সৃষ্টি করিলেন। ধর্ম, অর্গ, বর্ষ প্রভৃতির উপদেশ, ইতিহাস ও শাস্ত্রার্থের নির্দেশ এই নব্য বেদে লোকশিক্ষার্থ নিবদ্ধ হইল। চাবুি বেদ হইতে ইহার উৎপত্তি।

জগাহ পাঠ্যমুখ্যেদাং সানন্তো গীতনেব চ।

যজুর্বেদাদভিনয়ান্ রসানাতর্কনাদপি ॥

বেদোপবেদৈঃ সঙ্গকো নাট্যবেদো মহাম্বন।

নাট্যশাস্ত্র ১।২।১।১৮)

ঋগ্বেদ হইতে কথোপকথনের অংশ, সামবেদ হইতে গীত, যজুর্বেদ হইতে অধ্বকরণাদিক ক্রিয়াকলাপ এবং অথর্ববেদ হইতে রাসের সংগ্রহ করিয়া নবীন নাট্য উৎপন্ন হইল। উপস্থিত “ইঙ্গধ্বজ মহোৎসবে” ভরতমুনির নেতৃত্বে পৃথিবীতে প্রথম নাটকের অভিনয় হইল—সেই নাটকের উপজীব্য বিষয় ছিল দেবতা-গণের নিকট দৈত্যগণের পরাজয়। দেবগণের রূপাভূষিত্যেও প্রয়োগ অসম্পন্ন হইল না—বিরূপাক্ষপ্রমুখ দৈত্যগণ মহা গোলযোগ বাধাইয়া দিল। নাটকের উদ্যোক্তৃগণের সহিত এই দৈত্যগণের তুমুল কলহ বাধিয়া গেল—অনন্তধারণ

* “Literature in India early came into the hands of the priests and it is quite incredible that they would have adopted a figure such as the Vidusika into the artistically developed drama, had it not been so closely connected with the stage in the minds of the people that its exclusion was impossible”—Mrs. Vyvyan's Transl. of Fischell's The Home of the Puppet-play.

+ Encyclopaedia Britannica 11th Edn.—Drama

++ “Of a marionette theatre, at all events, we must not think, though the Javanese puppet-shows might tempt us to do so”—Prof Weber's History of Indian Literature (Trans) Footnote.

হইয়া উজ্জ্বলগুণ ইন্দ্রধ্বজরূপ গ্রহণ দ্বারা দৈত্যগণকে “জর্জরীকৃতদেহ তাড়িত ও নিহত করিলেন। সেই হইতে ইন্দ্রধ্বজের নাম হইল “জর্জর” উজ্জ্বলগুণের সেদিন কিন্তু যথেষ্ট শিফালাভ হইল। অভিনয়ের সহিত রঙ্গ-পূজা (জর্জরপূজা, প্রবর্তিত হইল, নাট্যমণ্ডপ যথাবিধি নিশ্চিত হইল এবং এখন হইতে ভরত সূত নটগণের অমুরোধে পাশও কন্যায় বসনগণ উৎসারিত হইলেন। “অমৃতমন্ডন” ও “ত্রিপুরদাচ” এইরূপে প্রগুক্ত নাটকসমূহের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দেবদেব শিবের অমুরোধে অঙ্গভার (নৃত্য) * নাটকের মধ্যে নিবদ্ধ হইল। দেবগণ ভরত ও ভরতসূতগণের এই সকল প্রয়োগে অত্যন্ত পরিতুষ্ট হইলেন। ভরত ত্রক্ষার নিকট এই বেদ বিষয়ে উপদিষ্ট হন—ব্রহ্মা আবার শব্বরের নিকট শিফালাভ করেন (নাট্যশাস্ত্র, ৩৬২২)। কালক্রমে এই নাট্যবেদ মানব-সনাজে বহুল প্রচার হইয়া পড়িল, লোকের বিনোদন ও উপদেশ সাধনকল্পে ইহা এক অপূর্ণ সানগ্রী হইয়া দাড়াইল।

হইল নাট্য-শাস্ত্রের মতে নাটকপ্রচারের ইতিবৃত্ত। মহানরো-পাধায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত চরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহোদয় নাট্য শাস্ত্রের এইরূপ উক্তি হইতে “জর্জরাসংব” + হইতেই নাট্যের উৎপত্তি সন্ধান করিয়াছেন। এই রূপ মতে বিস্তৃত হইবার কোনও কারণ নাই। যে দেশে “যোগীশ্বর পূণ্য পরশে মৃত্যুরাগ উদিল চরমে,” সে দেশে ইন্দ্রপূজা হইতে নাট্যের উৎপত্তি তওয়া একেবারেই কল্পনার কথা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। কিন্তু “জর্জরোৎসব” যে অভিনয়, প্রয়োগের প্রণয় অবস্থায় সে বিষয়ে ভরতের নাট্যশাস্ত্র অসম্মিতভাবে সাক্ষ্য দিতেছে না—বরং ইহার পূর্বে স্বর্ণে নাট্য অভিনীত হইত, একথা স্পষ্টই উক্ত হইয়াছে। স্বর্ণ হইতে মর্ত্যে নাটকের অব-তারণা—(যাহা ভরত ও ভরতসূতগণের দ্বারা সংসাধিত হইয়াছে)—রূপক-বাহীত কিছু নহে। এই বিষয় বিচার করিবার পূর্বে আমরা নাট্যশাস্ত্রে ও অন্তর্য যে নাট্যাচার্য্যের সম্প্রদায়ের নির্দেশ পাইত তাহার উল্লেখ করিব। আমাদের ধারণা, এই ধারায় নির্দিষ্ট ক্রম হইতে নাট্যাংগপত্তি সম্বন্ধে কতক কথা বাহির হইবে।

* নাট্যশাস্ত্র ৪১২২-১৩

†. D. A. S. B. October 1909. বঙ্গবর শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় এম এ মহাশয় (প্রবাসী, অক্টোবর ১৯০৯) শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী মহোদয়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছেন।

ভরতের নাট্যশাস্ত্রে শিব ব্রজা ভরত ভরতহৃতগণ—এই হইল নাট্যচারণ-
গণের ধারা। শাস্ত্রদেবের সঙ্গীতরসাকরেও পাই,
সদাশিবঃ শিবো ব্রজা ভরতঃ*কণ্ঠপো মুনিঃ।

বাখ্যাতারো ভারতীয়ে—

গুডকরও বলিতেছেন,

উচ্যন্ত ভ্রমতে ব্রজা শক্রেনাভ্যর্থিতঃ পুরা।
চকারাকৃৎ বেদেভ্যো নাট্যবেদস্ত পকমন্ ॥
ভ্রোপবেদো গাফর্ষঃ শিবেনোক্তঃ ব্রহ্মসুবে।
তেনাপি ভরতায়োক্তস্তেননর্থো প্রচারিতঃ ॥
শিবাজ্যোনি ভরতান্ত্যাদস্ত প্রয়োজকাঃ।

সুতরাং তিনখানি তালিকা হইতেই প্রথম তিন জনের নাম অবিসম্বাদিত
ভাবে মিলিয়া যাইতেছে। শিব শুধু নাট্যশাস্ত্র কেন, শব্দশাস্ত্র ও যোগশাস্ত্রের
আদিম প্রযোক্তা বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়া থাকেন *। তিনিই নটরাজরাজ,† নটেশ্বর,
মহানটঃ আদিনট, নাট্যপ্রিয়†। এই প্রসঙ্গে প্রথমোক্ত নতের সমগ্ৰকণ
বলিবেন, শিব হইতে তাওব নৃত্যের কথা স্বতঃই আসে—তৎ, তাওব নৃত্যের
প্রবর্তয়িতা শিবেরই অঙ্গুচর। যাহারা দ্বিতীয় নতের পক্ষে, তাহারা বলিবেন,
শিব আদিম অধিবাসিগণের দেবতা—সুতরাং আদিম অধিবাসিগণের মধ্যে যে
নাট্যের প্রথম বিকাশ হয়, নাট্যচারণ সঙ্ঘদ্বারের এই ধারাই তাহার মাফা
দিতেছে। কিন্তু স্বর্গ হইতে মর্ত্যে*নাট্যকের অবতারণার বিষয় (বাচ্য স্পষ্টই
ভরত ও গুডকর কর্তৃক উক্ত হইয়াছে) কোনও নতেরই সহজবোধ্য নহে;
পক্ষান্তরে, স্বর্গ ও বৈদিকযুগের দেবতার সহিত নাটকের জন্মকথা জড়িত,
নাট্যবেদ “বেদবেদাঙ্গসম্ভব” এরূপ প্রমাণও বর্তমান। লেভিপ্রমুখ স্বধীগণও

* মৃত্যাবসানে নটরাজরাজো নমস্ চক্রঃ নথপকবারান্।

উক্ত শ্লোকঃ সনকাদি সিদ্ধান্তেতদ্বিশেষে শিবস্ত্রজাং ॥

† গুহাশিল্পেও শিবের ‘নটরাজরাজ’ আকার পরিলক্ষিত হয়।

মলিকেশ্বরকৃত কালিকা ও বালমুনোরমায় উক্ত।

Vide Archaeological Report, 1903-04 Page 67.

++ ত্রিকাওশেষ।

। ++ হেমচন্দ্রকৃত স্মৃতিধারচিন্তামণি। † আদিনটঃ হুতাপাং—সঙ্গীতবিদ্যাবিমোদ ॥

সংস্কৃত নাট্য-সাহিত্যের বেদের সহিত অল্প বিস্তার সম্বন্ধ একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। বেদের হৃদয়স্থ হইতে ধার্মাত্মকরূপে অভিনয় ও নাট্য-সাহিত্যের বিকাশ কেমন করিয়া আশ্রয়প্রকাশ করিল, তাহারই পর্যালোচনা করিতে হইবে।

ঋগ্বেদসাহিত্যের সংবাদহৃত (বৃহদেবতা) সমূহই • ভাবী নাটকের বীজ বলিয়া অনেকের ধারণা। এই সকল হৃদয়ে বৈদিক যুগের দেবতায় দেবতার কথোপকথন, অথবা দেবতা এবং তাঁহার ভক্ত ঋষির মধ্যে কথোপকথন নিবন্ধ আছে। ইহার মধ্যে কোনও কোনও হৃদয়ে মরুৎগণ, রুদ্র ও ইন্দ্রকে তুষ্ট করিবার জন্য বৈদিক ঋষিগণের আকুল প্রার্থনা স্নানরূপে অভিযুক্ত হইয়াছে। পরবর্তী যুগের শিব বৈদিকযুগের রুদ্রের প্রতিনিধি। †

এই রুদ্র • বৈদিকযুগের শেষভাগে মরুৎগণের হুলাভিযুক্ত হইয়াছেন। পরবর্তী যুগের ব্রহ্মা বৈদিকযুগের উত্তরকালের দেবতা ব্রহ্মসম্পত্তি—তিনিই প্রার্থনার অমিত্রাতী দেবতা। পরবর্তী যুগের ইন্দ্র পূর্ববর্তী যুগের দেবতার সংজ্ঞায় অভিহিত হইলেও শুধু “কানবর্ষী পর্জন্ত” তাহেই অর্জিত হইয়াছেন। কাজেই পূর্বে যাহা প্রাকৃতিক শক্তির স্বত্তি ও আত্মকূল্যার্থে ঋক্‌সাহিত্যের স্থান পাইয়াছিল, তাহা পরবর্তী সাহিত্যে রূপকভাবে অল্প আকার ধারণ করিয়া

* এগুলি কখন কখন বৈদিক সাহিত্যে ইতিহাস নামেও উল্লিখিত হয়। অধ্যাপক ডাঃ কল্‌ডেনবার্গ আবার এগুলিকে আত্মান নামে অভিহিত করিয়াছেন। তাঁহার ধারণা এই কথোপকথনের অংশগুলি পূর্বে গদ্যাক্ষর, রচনার দ্বারা সংযুক্ত ছিল, কিন্তু কালক্রমে ঐ গদ্যঅংশগুলি বিরিষ্ট ও লুপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহার মত উপযুক্ত প্রমাণের দ্বারা সমর্থিত হয় না যে বহিরাঙ্গ সর্গবাসিসমূহ বহিরাঙ্গ বিবেচিত হইতে পারে না। এ মতের প্রতিবাদী ডাঃ কপ্পে মহোদয়ের নুতি প্রদানযোগ্য। খ্রীষ্টপূর্ব Windisch মহোদয় একটু ভিন্ন ভাবে এই মতের উল্লেখ করেন।

† কৃষ্ণ সংহিতা ১১৭৭, ১১২৫ Sacred Books of the East Series-এর ১ম খণ্ডে প্রথম দৃষ্টান্তের প্রসঙ্গে অধ্যাপক বোল্‌ফুলরের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য।

‡ শিবকে আদিম অধিবাসিগণের দেবতা বলিয়া উড়াইয়া দিলে চলিবে না। শিব ঐতরেয় ব্রাহ্মণকে প্রসিদ্ধ দেবতা। বাজসনেয়ী সংহিতা শতপথ ব্রাহ্মণ ও অথর্ববেদ-সাহিত্যের কোন কোন অংশ হইতে শিব ও রুদ্রের অভিন্নত্ব পরিস্ফুট হইবে। অবশ্য ইহা একেবারে অসম্ভব নহে যে পৌরাণিক যুগের শিব ইহার সহিত আদিম অধিবাসিগণের vegetation spirit-এর কতক দ্বারা আদিয়া মিলায়া গিয়া থাকিলে।

নাটকের জন্মকথার বিবরণে অভিলোকিকদের * অবতারণা করিয়াছে। জাপানীয় (Japan's Lyric Drama) ও গ্রীকনাট্য সাহিত্যও এইরূপ প্রাকৃতিক শক্তির স্রুতি চাইতে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছে বলিয়া অনেক বিশেষজ্ঞের ধারণা। পরবর্তী সংস্কৃতসাহিত্য চাইতে (বৃক্ষচরিত ১৮৩, বৃহৎসংহিতা, ভবিষ্যন্তর পুরাণ :) ইন্দ্রধ্বজেন্দ্রব যে প্রাকৃতিক শক্তিরই স্রুতি তাহার স্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়। ডাঃ কীথ মহোদয়ের মতে ঋতকালের অবসান ও বসন্তকালের প্রারম্ভাবই চাইল প্রাকৃতিক ঘটনা, যাহা আদিমকালে ভারতীয় নাট্যের বীজ বপন করিয়াছে। তাঁহার পক্ষ সমর্থনের জন্ত তিনি মহাভাষ্যে উল্লিখিত কংশবধ নাটকে প্রাচীনতম নাটকের * ভাবগত প্রকৃত আদর্শ মনে করিয়া মহাভাষ্যই সন্দর্ভ ও গ্রীক সাহিত্যের সৌসাদৃশ্যের কথার উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু আদিম ভারতবর্ষবাসী এরূপ এক সাধারণ প্রাকৃতিক ঘটনা অপেক্ষা মৌণ্ডরী বায়ুর প্রবাহ + এবং তজ্জন্ত বৃষ্টি সৃষ্টির বিষয়কে অধিকতর আগ্রহের সহিত লক্ষ্য করিতেন। বেদ সাংহিত্য ইন্দ্রব্রহ্ম বাপারের প্রাধান্য থাপন ও পরবর্তী যুগে ভারতের নাট্যশাস্ত্রে ইন্দ্রধ্বজ মতোৎসবের সহিত নাটকের সম্বন্ধ স্থাপন, এ বিষয়ে সাহিত্যের দিক দিয়া প্রকৃষ্ট প্রমাণ। সুদীর্ঘ এতুলে কোন্ পক্ষ অবলম্বন যুক্তিযুক্ত, তাহা সহজেই বুঝিতে পারেন।

আর্য্য যুগে নাটক অভিনয় বিষয়ে কতক পরিমাণে পরিবর্তন ঘটিল। বৈদিক ক্রিয়াকলাপের সময় সম্বাদমুক্ত সমূহের মধ্যে কোনও কোনটী পঠিত বা গীত হইতে লাগিল—তাহার সহিত অমুঠান (অঙ্গবিক্ষেপাদি) প্রবর্তিত

* আদিম মানবের এইরূপ অগ্রাঙ্গ সে অত্যন্ত স্বভাবসিদ্ধ ছিল তাহা মনীষী ডাঃ ফ্রেডার মহোদয়ের অবলম্বনমুখে সুন্দররূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে। তাঁহার 'The Golden Bough'এর ৪র্থ খণ্ডের 'The myth of Adonis' প্রবন্ধ চাইয়া। + + + Encyclopaedia Britannica এবং I Am Or soe. 1901 চাইয়া।

গ্রীক নাট্যসাহিত্যের উক্তর সম্বন্ধে চিন্তাশীল লেখক ডাঃ ফার্বেলের মতও তুলনা করিবার যোগ্য।

‡ এবং মঃ কুরুতে যাজামিল্লকেন্তোয়ুঁধিষ্টির।

পৰ্জ্জন্তঃ কামবনী তাত্ত্ব্যপীজো ন সংশয়ঃ ॥ ইত্যাদি

+ Ragorin-এর Vedic India এবং Muir-এর Sanskrit Texts চাইয়া।

‡ "The clear evidence of the Mahabhashya proves the connection of the earliest Indian literary form which was clearly dramatic (r) with the context of the two figures Kamsa & Krishna—"P. 410. I. R. A. S. 1912.

হইল *। উৎসবের আড়ম্বর প্রযুক্ত নৃত্যাদির আড়ম্বর সংসাদিত হইল, “কন্ম ও” ভাবের অঙ্কুরোদগম” ছাটিল হইতে ছাটিলতর অবস্থায় উপনীত হইতে লাগিল। পুরোহিতগণের মধ্যে ও কন্মবিভাগ প্রবর্তিত হইল; নগ্নের সহিত গজ ও সরিষা হইল—এই হইল অভিনয়াম্বক রূপকের জন্ম। † বাঙ্গলার পুৰাতন যাত্রাগুলির জ্বায় এ সমস্ত নাটকে গজাম্বক কণোপকণনাংশ অপেক্ষা পুত্ৰাম্বক গীতই অধিক পাকিত। কন্মের উৎসব (Dramatic ritual) উৎসবাম্বক নাটো (ritual drama) পরিণত হইল। মহাপ্রভ উৎসবে ও স্থপর্ণাধারে ‡ এই ক্রমবিকাশের ধারা অনেকটা বাক্ত হইয়াছে। অম্বনেন প্রভৃতি নচাসনারোহে সম্পন্ন উৎসবসমূহে হোতা উপগাত্য প্রভৃতি বৈদিক পুরোহিতগণকে ক্রমপরম্পরায় স্ব স্ব বেনোক্ত পুরাণনয় ও পাক্ত বাক্যাদি পাঠ করিতে হইত—অগুঠান ষপাধি সম্পাদিত হইবার দৃশ্য একজন বিশেষজ্ঞ পুরোহিতকে লক্ষ্য রাখিতে হইত। তাহাকে কন্মপরম্পরায় “হু” ধরিতে হইত। অপর পুরোহিতগণ সেই হু অগুসারে স্ব স্ব কার্য সম্পাদন করিয়া যাইতেন। ইনিই হইলেন হুগ্রন্থ বা হুগ্রধার। উৎসবাম্বক নাটোর ইতিহাস অজ্ঞাত এইরূপ *। গ্রীকনাটকের কালে কোরাস প্রবর্তন * প্রকারে বিভিন্ন হইলেও উদ্দেশ্য এক। দেবতাদের এ “দিবা চাক্ষুসকু” * হইতে প্রকৃত প্রস্তাবে নাটকের উৎপত্তি হইল। নাটকের বেদবেদাসঙ্গতবহ প্রতিপন্ন হইল। † গ্রীক ও * ইংলেও এইরূপেই নাটো-সাহিত্য ধর্মের জোড়ে প্রতিপালিত হইয়াছিল।

* “Those hymns were combined with the dances in the festivals of gods, which soon assumed a more or less conventional form”—Encyclopaedia Britannica, vol. xviii p. 480.

† “The beginnings of drama and of primitive rites are intertwined at the very roots”—Miss Harrison’s *Thomis*.

‡ ডাঃ হার্টলের (*He-tel*) মতে স্থপর্ণাধার বৈদিক সাহিত্যের এক প্রকৃত নাটক।

* “Having chosen as spokesman, leader and representative, the chief dancer, they differentiate him to the utmost, make him their vicar and then draw off,.....” *Thomis* chapter II by Miss Harrison.

† ‘দেবান্ধবিনাথনক্সিনুদো দিব্যং কুতুং চাক্ষুসং—’ বালবিকারিষিত্র।

‡ All those matters (e. g. magic, Olympic games, drama) seemingly so disparate, in reality, cluster round the hymn—introduction to *Thomis* Harrison.

* “Only in the arms of the church, in the very chancel, indeed, was this expression of a dramatic instinct nurtured.....”—Chap II *Evolution of English Drama* by C. W. Wallace.

অতি প্রাচীন গুরুবজ্জুর্নদীয় শতপথ ব্রাহ্মণ (১৩৫।২৩) ও বাজসনেয়ী সংহিতায় (৩০।৩৫) এইরূপ উৎসবে নাট্যপ্রয়োগাদির উল্লেখ পাওয়া যায়। হৃত্তধার শব্দ পরবর্তী যুগে বিভিন্ন ভাবে ব্যবহৃত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। * তথাপি কার্যভেদে তাহার পূর্বতন প্রয়োগসমূহের সহিত সৰ্ব্ব অসঙ্গ আছে। হৃত্তধার শব্দ আদির দ্বারা কথক নাট্যসমূহ ও নবহৃত্তের † সহিত সংশ্লিষ্ট কথক ধারণ করা হইয়া দেয়। কাজেই হৃত্ত-সাহিত্য-যুগের আরম্ভেই নটের প্রচলন বা নাট্যের প্রয়োগ বেশ প্রসাৰিত করিয়াছিল। এই উদ্দেশ্যে যে সকল ঋষি বা পুরোহিত অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে ভরতবংশীয় পুরোহিতসম্প্রদায় অত্যন্ত। আখ্যায়ন শ্রোতহৃত্তে (১০।৫।৮) এবং কাভ্যায়ন শ্রোতহৃত্তে ভরতকৃত দ্বাদশাহ যজ্ঞ ও ক্রিয়াদির অঙ্কটানের কথা পাওয়া যায়। ময়যুগেও ভরতবংশীয় পুরোহিতগণ (ঋকসংহিতা ২।৩৬।২ ইত্যাদি) সৰ্ব্বত্র সনাদৃত হইতেন। সুতরাং ইহা বিচিহ্ন নহে যে, নাট্য-সাহিত্যের সহিত ভরত ও ভরতহৃত্তগণের নান এত ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ভরতকৃত নাট্যশাস্ত্র বলিয়া যে গ্রন্থ এখন পাওয়া যায়, তাহা ভরতবংশীয় বিশিষ্ট কোনও কোনও মুনির নটকৃত, নাট্যকারিকা, নাট্য নিরুক্ত, নাট্যভাণ্ড প্রভৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত। ইনিই কথককালের বাজলোর দিনে ইন্দ্রধ্বজ উৎসবের সময় “ত্রেণ্ডণোদয়” ‡ লোকচরিত্রয় নাটকের প্রয়োগ করিয়া দেবতার তৃপ্তিসাধন এবং মানুষের প্রশংসাভাজন হইয়াছিলেন।

নাটক প্রবর্তনের পরবর্তী স্তরসমূহের ইতিহাস নাট্যশাস্ত্র ও নাট্যস্থতির অস্তিত্ব গ্রন্থের সহিত একবাক্যে করিয়া পাওয়া যায়। আৰ্য্যগণের ইন্দ্র-ধ্বজোৎসবে অসম্বৃত্ত দাসগণ বা দৈত্যগণ আৰ্য্যনাট্য প্রয়োগের অঙ্গকরণে

† ‘নাট্যোপকরণাদিনি হৃত্তমিত্যভিধীয়তে।

হৃত্তং ধারতীত্যর্থং হৃত্তধারোখ্যতো বুধৈঃ ॥ বাজসনে উক্ত।

* পানিনির অষ্টাধ্যায়ী (৯।১।১০, ১১১) : শতপথ ব্রাহ্মণে “ইন্দ্রালিনো নটঃ”

• ত্রৈলোক্যস্তাত্ত সৰ্ব্বত্র নাট্যং ভাসজুকীৰ্ত্তনং।

যদ্বো ধৰ্ম্মজগুস্তাণাং কামঃ কামোপদেশিনাং।

অৰ্ণোগোষ্ঠীদিনামৰ্ণঃ.....॥ নাট্যশাস্ত্রে।

† সাখ্যায়ন ব্রাহ্মণে (২২।৫) শিবমেধে ত্রেণ্ডণাক্ক শিল্পের উল্লেখ পাওয়া যায়।

‘নৃত্য’ ‘নৃত্ত’ ও ‘নাট্য’—এই তিনই—শিল্পের তিন ভিন্ন অংশ। ছান্দোগ্য-উপনিষদের জননিদায়ক কি এই শিল্পের কথা উক্ত হইয়াছে?

তাহাদের নিজের ভাবে ও ভাষায় এক প্রকার অভিনয় প্রবর্তন করিল। জন কৈরক অসম্ভব নাট্য-প্রয়োগ-নিপুণ ব্রাহ্মগণও যে এই দলে যোগ দিয়া-ছিলেন তাহার আভাস নাট্যশাস্ত্রে পাই (৩৬।৩৩-৩৫, ৪১)। যাহারা একরূপ করিলেন, তাহার শিল্পমাজে নিম্নিত হইলেন। (কোটলা অর্গনায় ও মনুসংহিতা • ৩।১৫৫)। কিন্তু ইহাতে অনাৰ্গগণের মধ্যে নাট্যের উন্নতি সংসাধিত হইল। এই অবিগণের “অঙ্গকরণ গ্রামাধর্মিক সংসদ্বিযোজিত শিল্প”ই • কালে “দেশীনাট্য” • Secular drama বলিয়া আখ্যাত করিল। পরবর্তী সংস্কৃত নাট্য-সাহিত্যের ক্রমবিকাশ। সঙ্গে সঙ্গে আৰ্গগণের “মার্গনাট্য” • সাহিত্যও চর্চিত ও পুষ্ট হইতে লাগিল—পরম্পরের ঘাতপ্রতিঘাতে উভয় নাট্য-সাহিত্যই উন্নত হইল। পতঞ্জলির মহাভাষ্যে উল্লিখিত কংশবধ ও বলিবন্ধ এইরূপ শ্রেণীর উন্নত ধর্মাত্মক “মার্গ”নাট্য সাহিত্যের প্রাচীন নিদর্শন •। দেশীয় নাট্য-সাহিত্যের তালিকায় আমরা মূর্ত্তি নামে এক নাট্যের উল্লেখ পাই।

কল্পচিং খাতবৃত্তান্ত অভিনেতৃগণস্ত বা ।

অভিনেতৃঃ ক্রিদ্দাহীনা মূর্ত্তিত্ত্বাববোধিকা ॥

প্রদর্শিতা ভবেদ্ যত্র সূত্রধারেণ বর্ণিতা ।

মূর্ত্তিঃ সংকপিতা সৈব বিবৃদ্ধিঃ স্কন্দদর্শিতিঃ ॥

পিশেলের নচে উল্লিখিত পুতুলখেলা তানাসা প্রভৃতি দেশী নাট্য সাহি-

ঃ নাট্যশাস্ত্র, ৩৬।২২-৫০

+ মার্গদেশীতি নাট্যস্ত ভেদবয়মুদীরিতং ॥

ব্রহ্মণ্য যতপশুস্তা মার্গিতং শিবযোগঃ পুরঃ । মার্গনাট্যক তৎ প্রাচঃ.....॥

দণ্ডিলাদিত্ত্বস্তানি দেশীনাট্যানি নোভূত । সটকং মোটকং গোঞ্জি.....॥

+ অধ্যাপক ল্যাসেন প্রবৃতি এই মতের সমর্থন করেন। এ বিষয়ে আমরা ডাঃ কীথ মহোদয়ের মতের অগ্রসরণ করিতে পারিলাম না। তাঁহার মতে এই নাটকগুলি প্রাকৃতিক শক্তির সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই রচিত—বর্ধনবয়স্ক উৎসবের সহিত ইহাদের কোন সম্পর্ক নাই। তিনি তাহার পক্ষ হইতে ঐক নাট্যসাহিত্যের সাগুণ (magical) বাস্তব অস্ত্র কোন প্রবল যুক্তি প্রদান করেন নাই। মহাভাষ্যের যুগের পূর্বেই প্রাকৃতিক শক্তির সৃষ্টির দাঙলোর দিন অতীত হইয়াছিল—ভগবান যুদ্ধের বিরোধানের অন্নদিন পরেই তাহার জীবনের নানা ঘটনারূপ আশাব্যবস্থা লইয়া প্রাকৃত সাহিত্যে বহু রূপক অসুজ হইয়াছিল, এমন প্রমাণ পাওয়া যায়।

তোরই প্রাচীন নিদর্শন। ছান্দোগ্য উপনিষদে * বর্ণিত বিজ্ঞান তালিকায় যে জনবিজ্ঞান (নৃত্য-শিল্প-বিজ্ঞান) উল্লেখ পাওয়া যায়, তাহা হইতে ও মহাভারত হইতে এই দেশী নাট্য-সাহিত্যের প্রাচীনত্ব ও লোকপ্রিয়তা অস্বাভাবিক ভাবেই প্রমাণিত হইতে পারে।

অবশ্য এই উভয়বিধ নাট্যই সাহিত্যের কলাকৌশল প্রভৃতিতে অপূর্ণ ও হীন ছিল +। এই সকল রচনায় পঞ্চট প্রধানতঃ কথোপকথনের ভাষায় ব্যবহৃত হইত—গোড়ায় গছের নানাগন্ধও ছিল না; দৃশ্য প্রভৃতির একান্ত অভাব ছিল, রচিও মার্জিত হয় নাই †। পাত্রসংখ্যাও অল্প ছিল, কাহিন্যে এই সকল ত্রুটি সংশোধিত হইল—আর নাটক শুধু কৰ্মকাণ্ডে নিপুণ রাজকণের মৰ্ম্মাঙ্কক প্রয়োগ বা উচ্ছ্বাস শূন্যচারণ জনের আশোদমানপ্রীতি রহিল না—শিক্ষিত সাহিত্য-রসরসিক সম্প্রদায়ের মধ্যে নাটক অভিনয় দর্শন আশোদ ও শিক্ষার নিকটস্থ বলিয়া বিবেচিত হইতে লাগিল। সাহিত্যে নাটকের এক নবীন যুগের আরম্ভ হইল। এই পরিবর্তনের মূলে রাজশক্তি ও সমাজশক্তির মীলনট লক্ষিত হয়। সকলে এক রাজার প্রচা হইলেন, বৌদ্ধধর্মের অভ্যর্থন হেতুবাঙ্গের দিনে ধর্মের মানসজ্ঞত্বাপনে মতঃ সচায় হইল, ভিক্ষা ও সাহিত্যের একতানতার অমূলক অনেক কারণ উপস্থিত হইয়া সাহিত্যের বাধাধরা দগদগি মুছাইয়া দিল—নার্থ ও দেশী নাট্য-সাহিত্য উভয়েই মিলিয়া উভয়ের বিশেষত্বের অপূর্ণ সমন্বয় সাধন করিয়া নবীন সংস্কৃত নাট্য-সাহিত্যের সৃষ্টি করিল। সাহিত্যের হিসাবে, কলার হিসাবে এক উন্নতযুগের প্রবর্তন হইল। রাজশক্তি এই নবীন সাহিত্যিক উদ্বোধনের নেতা হইলেন *—নন্দাযুগে ইংলণ্ডের জায় এট সময়

* এটি *Tableaux vivants* শ্রেণীর। এইরূপ অভিনয় পিনেলের মতে উল্লিখিত আদিম পুতুল পেলার পরবর্তী সংস্করণ বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইতে পারে।

+ নারদ-সংস্কৃত্যের সংবাদ সপ্তম অধ্যায়।

† A ritual form, however solemn & significant, does not and did not make a great drama—Thomson, Chap. viii.

আমাদের দেশের প্রথম যুগের অনেক বাহ্যিক সাহিত্যহিসাবে এই শ্রেণীরই ছিল বলিয়া মনে হয়।

✓ * অদ্বৈতধর্মের সহিত সম্রাট কণিকের ও মহাকবি ভাস্কর সহিত তাঁহার রূপকসমূহে উল্লিখিত 'রাজসিংহ উপেন্দ্রনারায়ণের' সম্বন্ধ এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেছে। এই যুগের প্রারম্ভ হইতে সংস্কৃত নাট্য-সাহিত্যে অবনতির পূর্বে পর্য্যন্ত রাজশক্তিই এই বিষয়ে পথ দেখাইয়া আসিয়াছিলেন। আত্মীয়ের ভাষাভাষী পাহাড়ের অন্তঃস্থানে গোপিত ধ্বংসাবশেষ 'ললিতবিম্ব' ও 'হমকেলি' নামক নাটক দুইপাশ্বে হইতে ইহা স্পষ্টই স্মৃতিতে পারা যায়।

ভারতীয় • রাজসভায় উৎসব উপলক্ষে নাটকাদি প্রযুক্ত হইতে লাগিল । ভারতের নাট্যশাস্ত্রের শেষ অধ্যায়ে ভারত-শিখ্যগণ কর্তৃক নৃত্য নামে রাজতন্ত্রবর্তী সনয়ে নর্ত্তো নাটোর অবতারণা, ভারতবৃত্তান্তের নাট্যশাস্ত্রবিমুক্তি প্রভৃতি রূপকের সাচাযো উত্তর নাট্য-সাহিত্যের সমর্থ ও রাজসভায় প্রয়োগের কথা বর্ণিত হইয়াছে ।

অথঃ চি নন্তবো রাজা যাচতে নঃ কৃতাজ্জলিঃ ॥

গমাতাঃ সচি তৈতৃমিং প্রযোক্তুং নাট্যমেব হি ।

করিণ্যানন্ত শাপাশ্রমশ্চিন্ সনাক্ প্রযোজিতে ॥

রাজধান্যম্ নৃপানাঞ্চ ভবিষ্যৎ নকুংসিতা ।

তত্র গদ্য প্রযুক্ত্যন্ত্যম্ প্রয়োগা বহুধাতলে ॥ (নাট্যশাস্ত্র ৩৭।১৪-১৬)

ইংলেণ্ড চ্যাপেল রব্বলের জায় + ভারতের “অভিরূপভূষিত্ত্র ঐগগ্রাণী” পরিণত নবীন নাটকের সৃষ্টি ও পুষ্টিসাধন করিল । অভিনীত (acted) বস্ত্ততত্ত্বপ্রধান (realistic) বা ধর্ম্মতত্ত্বপ্রধান (ritualistic) নাটকের তিরোধান ঘটিল, সাহিত্যিক (literary) আদর্শবাদক (idealistic) নাটক তাহার স্থান অধিকার করিয়া অভুল প্রতিপত্তি ও প্রসার লাভ করিল । কবি ও পাণ্ডিত্য একে একে কল্মুষ ও ভানের দগ্ধাভিমুক্ত হইল, নাটক ক্রমশঃ কঠিন ও চর্কোপ হইয়া লোকসাহিত্যের ভাব হারা হইতে বসিল । সাধারণের উপদেশ সাধনরূপ উদ্দেশ্য শনৈঃ শনৈঃ লুপ্ত হইল । মহাকবি অশ্বমেধ ও ভাস প্রভৃতি এইরূপ সাহিত্যিক “বহুভূমিক” নাটক লিপিয়া যশস্বী হইলেন । অনঙ্গারশাস্ত্রে নাটকের আলোচনা-ভ্রম পরিগ্রহ করিয়া নাট্য রচনায় বাধা-বাহির স্বরূপাত করিল । শেষে কবিকুলচূড়ামণি কালিদাস স্বতন্ত্রভাবে অপচ অনঙ্গার শাস্ত্রের প্রামাণ্য • সম্পূর্ণ বজায় রাখিয়া মধুর উজ্জ্বলে নিশাইয়া অপরূপ কৃতিত্বের বলে নাট্যসাহিত্যে চরমস্থান অধিকার করিলেন । কাব্যভগ্ন ধস্ত হইল, সংস্কৃত ভাষা প্রাণময়ী হইল, সংস্কৃত-সাহিত্য অভিনব সম্পদে বরণীয় মুক্তি পরিগ্রহ করিল ।

• Chapel Royal.....the cradle of the New Drama v.de Chapter iv Evolution of the English Drama up to Shakespeare, by C. W. Wallace. (Berlin, 1912). vide also Chapter ii of the same book.

+ সম্ভবতঃ যে রাজার সময় নাট্য এখন রাজসভায় প্রযুক্ত হইয়াছিল, তাহার নাম নৃত্য না হইতেও পারে । নৃত্য বৈদিক যুগের এক ঐদিক রাজা (কবেদমহোত্তি ৭।২০) হইত নাটকের আগ্রহের ইতিহাসে পূর্বোক্তিপিত ইল্ল-রুত-সুত্র ব্যাপারের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার জন্য এই রাজাকে নৃত্য নামে অভিহিত করা হইয়াছে । মহাভারত ৫।১১-১৭ এইখ ।

কত শতাব্দীর + চেষ্টার ফলে এই পরিবর্তন সংস্কারিত হইল তাহা বলা
 চরম। তবে এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, সাহিত্যে প্রথম নাটকীয় শীলের
 অভিযাত্রার সময় হইতে সংস্কৃত নাটকের পরিপূর্ণি কালের ব্যবধান অস্তুতঃ
 পঞ্চদশ শতাব্দী হইবে। ভারতের নাট্যশাস্ত্র (বর্তমান গ্রন্থ) যে সময়ে সঙ্কলিত
 হইয়াছিল, তখনও দেশে অভিনীত নাটকের সংখ্যা অল্প নহে। তখন শিষ্টজন-
 সাহিত্য নূতন আলোকে দ্বিধিক উজ্জ্বলিত করিতে আরম্ভ করিয়াছে; কিন্তু
 তখনও নাট্য-সাহিত্যের বিধি প্রণয়ন করিবার পরিপূর্ণ জ্যোতিঃ কৃষ্টিয়া উঠে নাই।
 রামায়ণ মহাভারতে নাটক অভিনয়ের কৃতি কৃতি উল্লেখ পাওয়া যায়—ইছা
 অপেক্ষা প্রাচীনতর কালেও নাটক প্রয়োগের কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ
 করিয়াছি। “যখন ভগবান বুদ্ধ রাজগৃহে, তখন তাঁহার ছই শিষ্য সর্ব সমক্ষে
 নাটক অভিনয় করেন।” অথর্বোদের নাটকগুণ্ডলির পর্যবেক্ষণ এবং
 তাহাদের সহিত মহাকবি ভাস ও কালিদাসের রচনার আপেক্ষিক সমালোচনা
 না করিলে আমরা পরবর্তী সংস্কৃত নাট্য সাহিত্যের কালগত মূল নির্দেশ
 হুল ভাবেও করিতে সমর্থ হইব না। কালক্রমে প্রত্নতত্ত্বসমিৎস্বর্ণের
 ঐকান্তিক চেষ্টায় আরও প্রাচীনতর সংস্কৃত নাটকের আবিষ্কার হইবে, একপ
 ভরসা করা যায়; ফলে সংস্কৃত সাহিত্যে রূপকের ক্রমবিকাশের দ্বারা বিশদ-
 ভাবে পরিষ্কৃত হইবে।

এই স্থলে সংস্কৃত নাটকের জন্মকথার সহিত গ্রীক নাট্য-সাহিত্যের সঙ্গের
 প্রসঙ্গ উল্লেখ করা যাউতে পারে। বেবার প্রমুখ পণ্ডিতগণের মত পোষণ
 করেন এমন কেহ কেহ আছেন, যাঁহাদের দ্বারা পরবর্তী সংস্কৃত নাট্য সাহিত্যের
 নিকট গ্নী। কিছুদিন হইল সরগুজা ট্রেটের রামগড়ের গুহা ও তত্ৰতা
 শিলালিপিদের বিবরণ প্রসঙ্গে ডাঃ ব্রুক এইরূপ মতই প্রকাশ করিয়াছেন।

+ কালিদাসের সময় অলকার শাস্ত্র যে সুধীগণের মধ্যে বহুল প্রচার হইয়া গিয়াছিল, নিম্ন
 কাহ্ননের স্মৃতি করিয়াছিল, তাহা তাঁহার রচিত নিম্নলিখিত সন্দর্ভ হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়—

ভৌ সন্ধিযুবান্নিত্যন্তিভেদং রসাত্তরেণু প্রতিবন্ধরাগঃ।

অপম্প্রসঙ্গম্প্রসঙ্গং মুহূর্তং প্রয়োজনানঃ সলিতাঙ্গরঃ ॥ কুন্ডলিন্দন, ১১২১

+ S. M. Mitra, *Anglo Indian Studies*.

* বিবেচনা। বেরের সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসমতে একবার উল্লেখ আছে।

“It will likewise be admitted that the adoption of the stage of a
 Greek theatre in an Indian building, that served similar purposes, has
 a strong bearing upon the question of the Greek influence on the Indian
 drama”—Dr. Bloch, *Archaeological Report 1903-04*. Page 127.

এখানকার মীতা বেঙ্গাওয়া তাঁহার নতে গ্রীক ভাষ্য বাঙ্কলোর যুগে গ্রীক আদর্শে নিশ্চিত থু: থু: তৃতীয় শতাব্দীর এক ভারতীয় রঙ্গমঞ্চ—এই গুহার বসন্ত উৎসবে নরনারীগণ কঙ্ক সনাতোছে নাটক অভিনীত হইত । যোগীনারা গুহার উৎকীর্ণ লিপি হইতে দেখানে “দেবদাসী” গণের দ্বারা এবিধ অভিনয়ের কথাও পাওয়া যায় । অধ্যাপক রীচ নাকি শুধু সাহিত্য বটিক প্রমাণের উপর সংস্কৃত নাট্য গ্রীকনাটোর নিকট কত নদী, তাহা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন । এদিকে অধ্যাপক গিলবাট মারে মচোদয়ের মতে * গ্রীক সাহিত্যে নাটক-পর-বাচ্য প্রথম গ্রন্থ Theopis) থু: থু: ৫৩৪ অব্দে রচিত হয় । বর্তমান প্রবন্ধের পূর্বভাগে যাঁহা বলা হইয়াছে তাহা হইতে এ কথা বলা যাইতে পারে, যে ঐ সময়ে সংস্কৃত নাটক ছিল না, এক্ষণ অসুমান করা সম্ভব নহে । আরও ভারতে গ্রীক নাটকের অভিনয়ের কোনও বিশ্বাস-যোগ্য প্রমাণই পাওয়া যায় না ।

কলা শিল্প প্রভৃতি যে যে বিভাগে গ্রীক প্রভাব স্পষ্টই বর্তমান ছিল, তাহার নিদর্শন সেই সেই বিভাগেও অত্যাধি বর্তমান রহিয়াছে, অথচ সংস্কৃত নাটকে এক্ষণ কোনও নিদর্শন বর্তমান আছে বলিয়া নির্দ্ধারিত হয় নাই । † হুই একজন প্রতীচা বিশেষজ্ঞের মতও এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করিলে অসঙ্গত হইবে না । ডাঃ টেনেকোনা ও ডাঃ হ্যার+ মার্শেলের নতে অখণ্ড থু: দ্বিতীয় শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন + । টেনেকোনা বলেন—“The oldest Indian plays we know, the Aswaghosha Fragments published by Prof Lidars, do not remind us of the Greek stage at all” স্তবরা: সাহস করিয়া বলা যাইতে পারে যে, সংস্কৃত নাট্য সাহিত্য অতি প্রাচীনকাল হইতে স্বতন্ত্রভাবে উদ্ভূত হইয়া আপনার উন্নতির পথ কাটিকা লইয়াছে । ইহা অপেক্ষা প্রাচীনতর নাট্য-সাহিত্যের কথা আপাততঃ কেত জানেন না এবং তাহাই ইহার গৌরবের পক্ষে কন কথা নহে ।

শ্রীশিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য কাব্যতীর্থ ।

* History of Greek Literature (Heineman)

+ vide Keith J. R. A. S. 1909. page 208 ; and J. R. A. S. 1902. p. 423.

ডাঃ কীথ তাঁহার বহুতর দিক দিয়া এ বিষয়ে এক প্রমাণের কথাও বলিয়াছেন । তিনি বলেন—“But there is one salient distinction between Indian and Greek drama which adds to the improbability of the derivation of the former from the latter. The Indian drama must end happily, just as Krishna kills Kansa, the red the black, rather than black the red.....”

• Punjab Historical Society's Journal, September 1913.

† The Indian Antiquary, April, 1914.

ফাল্গুন-স্মৃতি

সেই ফাগু সেই ত ফাগুন !
 সেই ত ঘরের কাছে
 মাধবী কুটিয়া আছে,
 অশোকের গাছে গাছে সেই রক্তাকরণ ;
 সেই দক্ষিণের ছাতে,
 বাতাস তেমনি মাতে,
 তেমনি ঝরিছে প্রাতে ফুটন্ত বকুল ;
 সেই ছায়া সেই আলো
 সেই অঁখিতারা কালো,
 সেই যারা বাসে ভালো তেমনি ব্যাকুল !
 সেই ত পাগলপারা
 ছুটিছে প্রাণের ধারা,
 তেমনি কাটিছে সারা বসন্তের বেলা,
 আভাসে গুঞ্জে ভাষে
 কলগানে কলোচ্ছ্বাসে
 চলিছে উল্লাসে আসে ছদয়ের পেলা !
 সবি আছে কি যে নাই—
 আত্মিকে ভাবিয়া তাই
 আকুল নয়নে চাই আপমানই পানে ;
 কি যেন বুকের মাঝে
 লুটায় বাথায় লাজে,
 যোগীয়া কেন যে বাজে হিম্মোলার গানে !
 অশ্রু আসে অঁখি পূরে'
 সোহিনী লাগেনা স্থরে
 দীপকে জলিয়া পুড়ে লুকান আগুন ;
 বসন্ত যা-কিছু মাচে
 সবি ত তেমনি আছে—
 সেই ফাগু রক্তরাগ সেই সে ফাগুন !

সেই ফাগু সেই ত ফাগুন !
 লতায় পাতায় ঘাসে,
 প্রকৃতি তেমনি হাসে
 শুধু আনন্দের পাশে নিঃশেষিত কৃণ !
 মনে পড়ে ছেলেবেলা
 সাপী সাপে কত খেলা
 প্রনোদ উৎসব মেলা—চোলী মাতামাতি,
 যৌবনের রক্তরাগে
 মশ্ব কিছুকের দাগে
 আজও যে তেমনি জাগে বসন্তের রাত্তি !
 সেই অন্তরের ছাতে
 দোল পূর্ণিমার রাতে
 রক্তভরা কচিহাতে পিচকারী ভরি'—
 পা-টিপিয়া কাছে আসা
 সেই চোখে-চোখে ভাষা,
 সেই ছোট-করে' হাসা গুরুজনে ডরি' !
 বসন্ত বিহ্বল-বেশা
 অধীর সমীরে নেশা
 পুষ্প সুরতির নেশা তেমনি মধুর,
 শুধু এ জীবনে হার !
 তাহার বারতা নাই,
 ভাগ্যালে ভাগেনা তাই পরাণ বিধুর !
 কেন আজ বেদনাতে
 জল আসে অঁপিপাতে,
 জেগে উঠে সেই সাপে হিয়ার আগুণ ?
 যেন আজি হয় মনে
 ফুরিয়েছে এ জীবনে
 বসন্তের হাসি সাপে আনন্দ-ফাগুন !

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

ভাই ।

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

হরেন্দ্র আজ বছর দেড়েক যে এত ঘন ঘন বাড়ী আসিতেছে, ইহাতে গ্রামের প্রবীণ লোকেরা মাথা নাড়িয়া বলিল—“নিশ্চয়ই উহার একটা গভীর চরভিসন্ধি আছে ।” তাহারাই হরেন্দ্রকে যথোচিত সাবধানও করিয়া দিল । কিন্তু সে বড় একটা গা করিল না । ক্রম দ্বিতীয়গণ ক্রমে হরেন্দ্রের উপর বিলক্ষণ বিরক্তও হইয়া উঠিলেন । কেহ কেহ বলিলেন—“আমাদের কথা এখন শুনু না, শেষে পস্তাতে চবে কিন্তু । হরেন—যাকে তুনি নামের পেটের ভাই মনে কর্চ, সে তোমার শত্রু ।”

হরেন্দ্র একটু উদ্বেজিত হইয়া বলিল—“হরেন আমার ভাই, ছোট ভাই ! না যখন মারা গেলেন, তখন ও যে আমার কাছ ছাড়া একদণ্ডও কোথা থাকতো না । আমি ওর চেয়ে পাঁচ বছরের বড় বটে—তা হলেও আমার মনে হয়, আমি যেন ওকে নাচুষ করেচি । ও আমার কি শত্রুতা কর্বে ?”

চন্দ্র চক্রবর্তী তামাক পাইবার জন্য বাড়ির দুটি পাকাইতে পাকাইতে গভীর ভাবে বলিলেন—“হরিচরণ উইল কর্বে, তা জান ?”

হরেন্দ্র একটু তাক্কিলোর হাসি হাসিয়া তৎক্ষণাৎ বলিল—“তাতে আমার কি ? বাবা উইল কর্চেন, আমরা তাঁর ছেলে, আমাদেরই নামেই ত' উইল কর্চেন ? এতে আর হরেন্ আমায় শত্রু হলো কিদে ? যাক্গে চক্রবর্তী জ্যাঠা, বাবা যা করবেন তাই তো চবে ! বাবা থাকতে আমিই বা কে, আর হরেনই বা কে ?”

পাড়াগায়ের মেঠো চাওয়ার মত সেখানকার লোকের হৃদয়গুলিও অবাধ এবং নির্মল । তাহাতে কয়লা গুড়ির ভেজাল নাট । চন্দ্র চক্রবর্তী হরেন্দ্রের উক্তরূপ ব্রহ্মপ্রবণ বিশ্বাসভরা উত্তরে সম্বলিত থাকিতে পারিলেন না । তিনি তখন নিবারণ যুগোপাধায় মহাশয়ের গৃহে গিয়া তাঁহাকে আত্মপুর্নিক সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিয়া হরেন্দ্রের অভিমতও জানাইলেন ।

মুখ্যো মশায় কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া দ্বিজ্ঞানসা কবুলিলেন—“হরিচরণ যে হরেন্দ্রকে একবারে ক'কি দিবে, এ কথা তোমায় কে বল্গ ?”

“হরেন্দ্রের স্নীহু এ কথা নদীর ঘাটে আমার স্নীকে বলেছে ।”

“হরেন্দ্রের স্ত্রী কি বলেছে—বল তো তুনি আগে !”

চন্দ্র বলিল—“হরেন্দ্রের স্ত্রী বলেছে যে, একে স্বপ্নের বয়স হয়েছে, তাতে তার শরীরও ভাল নেই ; এই সব কারণে হরেন্দ্রের ইচ্ছা যে যা কিছু আছে বাপ থাকতে থাকতে তার একটা বিধি বাবস্থা হয়ে যান। নৈলে বাপের অকর্তন্যে ঐ নিয়ে শেষে আবার কোনও গোলযোগ ঘটে। সেটা তো ভাল না ! ঘরে আবার ঐ বিধবা মেয়ে ক্যাস্ত রয়েছে—বাপ যদি নিজে কিছু দিয়ে যায়, তা হলে ও বেচারীও কিছু পায় ! এ কথায় আমার স্ত্রী বলেছিল—সে তো ভালই। চাই ভাইও ত্রেনন কিছু কিছু পাবে, বোনটিরও তো তেননি কিছু পাওয়া উচিত। মা মরে যাওয়ার পর, ঐ তো বড় দিয়ে এতদিন ধঃসারটা খাড়া রেখেছে। এতেই হরেন্দ্রের স্ত্রী বলেছে—যে তার স্বপ্নের ইচ্ছে নয় যে, তিনি তার বড় ছেলেকে কিছু দিয়ে যান।”

মৃণোপাধায় মহাশয় বেশ অভিনিবেশ সহকারে শুনিয়া একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন—“দেখ চন্দ্র, আনার মনে হয়, এ সব ঐ ক্যাস্ত ছুঁড়িরই কার-সাজী। হুয়া ত ভয়কুটে, কিম্ব সে যে এতটা করতে সাহস করবে, আনার বিশ্বাস হয় না।”

“না দাদা, তুনি বুঝতে পারচনা। ছদ্মবেশে নিলেই ওরা এ কাজ করতে। হুয়ার তেজটা তো তুনি আজকাল দেখ নাই। ওরে বাপরে, তেজে মট-মট করতে। বাইশ টাকার নায়েবী করে, নাটিতে আর পা পড়ে না। আর কি সমস্ত রাজা উজীর মারা গল্প—শুনলে একবারে পিঙ্কি পর্দায় আসে যায়।”

“বলো কি ?”

চক্রবর্তী মহাশয় আরও উত্তেজিত হইয়া, একটু নড়িয়া চড়িয়া বসিলেন। মৃণোপাধায় মহাশয়ের গা টিপিয়া বলিলেন—“হা দাদা, তবে আর বলি কি ? হুয়া বাড়ী এলে, হুয়েন্ ভাইয়ের জন্তে একবারে ব্যস্ত হয়ে বেড়ায়। কোথায় কি হুয়েন্ ভাল বাসে—এই সব যোগাড়ায় করতে হুয়েনের নাইবার খাবার অবকাশ থাকে না। বড় ভ্রাই হয়ে ঠিক যেন চাকরের মতন পাটে, আর হুয়েন্ সেই বড় ভাইকে কি না সেদিন আমার সামনে বললে—‘তুনি একটা গাধা।’ হুয়েন্ মুখটি নীচু করে’ চলে গেল। আনি থাকতে পারলান না, হুয়েনকে একটু বকলাস—সেই থেকে বাবু আনার সঙ্গে আর কথাই কন না।”

“বলো কি চন্দ্রার ?”

“কি বলবে দাদা ? স্নেহের বসন্তে গেলাম সে বলো—ওঁ ছেলে মানুষ, ওর কথা কি মর্জনা ? না কি প্রাণা বলল বলে আমার গায়ে কোথা পড়ে গেছে ?”

“আচ্ছা, তুমি একবার দত্তমশায়কে খবরটা দিয়ে রাখ। অজি সন্ধ্যায়—না আজ সন্ধ্যায় নয়, আমার একটু কাল আছে—কাল সকালে চল আমরা সবাই গিয়ে একবার হরিচরণকে বলিগে।”

চক্রবর্তীর গৃহে সহানুভূতির পবিত্র আলোক উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। বলিলেন—“আমরা থাকতে গায়ে ভাল মানুষের উপর কোনও অত্যাচার হতে দেব না ! তা হলে লোকে বলবে, গায়ে কি কেউ মানুষ ছিল না ?”

পরদিন প্রভাতে গ্রামের মাতঙ্গর রাম দত্ত, নিবারণ যুগোপাধ্যায়, চক্র-চক্রবর্তী ও দীক্ষ্মণ্ডল হরিচরণের গৃহে গিয়া উপস্থিত হইল। অনিল অল্প প্রহ্লাবেই হরেরঙ্গের সঙ্গে হরিচরণ মহকুমায় গিয়াছেন। স্বরেন্দ্র বিগত সন্ধ্যা চইতে বাড়ী নাই, হরিশ বাড়ীর শব সংকার করিতে গঙ্গাতীরে গিয়াছে। এ দিকে এই সকালে তাহার স্ত্রী একটি কথা প্রসব করিয়াছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

হরিচরণ ভট্টাচার্য্য উইল করিয়া ফিল্লিলেন—এসংবাদ গ্রামে রাষ্ট্র চইতে বিলম্ব হইল না। কি যে উইল হইল, তাহা কিন্তু হরিচরণ গোপন করিলেন—লোকের অনেক পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও তিনি তাহা খোলসা করিয়া কাহাকেও বলিলেন না।

যে কাষ লোকে যত গোপন রাখিতে চেষ্টা করে, সে কাষ তত শীঘ্র প্রকাশ হয়—বিশেষতঃ অজ্ঞায় কাষ। স্বরেন্দ্রের যাহারা হিটৈতবী, তাহার মহকুমার রেজেষ্ট্রারী আফিস হইতে খবর লইয়া জানিল যে, হরিচরণ তাহার যথাসর্ব্বশ্ব দ্বাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি তাহার কনিষ্ঠ পুত্র জীমান্ হরেরঙ্গ নাথ ভট্টাচার্য্যকে লিখিয়া দিয়াছেন—কেবল পাঁচ বিঘা জমি ও যৎসামান্য পিতল কাঁসার জিনিষ তাহার বিধবা কন্যা জীমন্তী ক্যান্ডনণি দেবীর একমাত্র পুত্র জীমান্ সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে দান করিয়াছেন। ছোট পুত্র স্বরেন্দ্র-নাথ তাহার অসাধা প্রভৃতি কারণে তিনি তাহার সমস্ত সম্পত্তি চইতে

উক্ত সুরেন্দ্রনাথকে বঞ্চিত করিয়া কনিষ্ঠপুত্রকে তাঁহার অবর্তমানে বংশপরম্পরা-
স্থিত ভোগদখল করিতে অধিকার প্রদান করিয়াছেন ।

এই অদ্ভুত উইলের কথা শুনিয়া গ্রামশুদ্ধ লোকে একবারে স্তম্ভিত হইয়া
গেল । সকলেই আশা করিতে লাগিল—যে এইবার সুরেন্দ্র মহা হুজুং বাধাইবে ।
একে স্রে 'এক গু'রে লোক, তাহাতে আবার চ'বেলা ছ'মুঠো ভাতেও যখন
সবাই তাকে বঞ্চিত করিল, তখন এবার সে আর চূপ করিয়া থাকিবে না ।

লোকে অধীর উৎকণ্ঠায় দুইদিন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিল ; কিন্তু সুরেন্দ্রের
কোন ভাবান্তরই লক্ষিত হইল না । সে যেমন বেলা তৃতীয় প্রহরে যজ্ঞমানদের
বাড়ী পূজা সারিয়া, বামচণ্ডে নৈবেদ্যের ছোট ছোট রেকাবিগুলিকে উপর
উপর রাখিয়া গাম্‌ছার জুলাইয়া, খালি পানে খালি গায়ে বাড়ী ফিরিত—
তেমনিই গিরিয়া পাকে । মুখে হাসিটুকু লাগিয়াই আছে, চাচনিটি আগের
মতই শিথ, শান্ত, নির্ভীক, নিশ্চিন্ত ।

লোকে ভাবিয়াছিল, পিতার এই কার্যের বিরুদ্ধে পরামর্শ করিতে,
ডাং নিবেদন করিতে, সুরেন্দ্র নিজেই তাগানের দ্বারস্থ হইবে । তাহা যখন
হটল না, তখন লোকের বিশ্বাস ও কৌতূহল আর বাধা মানিল না ।

চক্র চক্রবর্তী সুরেন্দ্রকে ডাকিয়া আনাটয়া বাললেন—“বলি তোমার মঙ্গল-
পানা কি বল দেখি ? এত বড় যে একটা কাণ্ড চল—আমাদিগকে তা'
কি জানাতে নেই ? আনরা কি তোমার শত্রু ?”

সুরেন্দ্র বাগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—“কেন মাঠামশায়, কি কাণ্ড চলেছে ?
আপনি কি বলছেন, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না !”

“চিরকালই কি পোকাটি হয়ে থাকবে ? ‘কিছুই বুঝতে পারছি না’ । তোমাকে
সেদিন আমি বলেছিলান কি না যে, হরা তোমার শত্রু ! তখন যে তাইয়ের
পানে বড় টান দেগিয়েছিলে । এখন ? পূর্ব তাইয়ের কাণ্ড করেছে, নয় ?”

সুরেন্দ্র উঠেঃসরে হাসিয়া উঠিল—বলিল—“এই কথা মাঠা মশায় ? এতে
চলেছে কি ? আপনি কি মনে করেন যে, বাবা, হরেন্ সবাই আমার বলবে
—তুনি তোমার ছেলপিলে নিয়ে বেরিয়ে যাও ? তাই কখনও পারে ?
এ উইলের কথা তো আমি পরস্ দনই শুনেছি ।”

“তুই যে অবাক করলি সুরেন্ ! তুই ভাবচিস্ কি ? তোকে যদি না
তাড়াবে, তোকে যদি না ফাঁকি দেবে—তবে এ সব উইল ফুইল করবার
দরকার কি ?”

স্বরেন্দ্র একটু চিন্তা করিল। তাহার মূখমণ্ডলে হঠাৎ চিন্তার একটা কালো ছায়া আসিয়া পড়িল।

চক্রবর্তী মশায় বলিতে লাগিলেন—“এখন আজ যদি তোকে ওরা বের করে দেয়, তা হ'লে তুই ছেলে মেয়ে নিয়ে কোপায় পাড়াবি? পাবিই বা কি?”

স্বরেন্দ্র আরও চিন্তিত হইয়া পড়িল। কুক্ষিত ক্রমুগের নীচে স্বরেন্দ্রের বিফারিত আয়ত চক্ষুটির দৃষ্টি নির্নিমেষে ভূমিতে নিবদ্ধ হইয়া রহিল।

কিয়ৎক্ষণ উভয়েই নীরব। স্বরেন্দ্র একটু চঞ্চল হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—“তা হ'লে আমি কি করবো?” বলিতে বলিতে তাহার চক্ষুপন্নব আগ্রহইয়া উঠিল, কর্তব্যের ভারি হইয়া গেল।

চক্রবর্তী মশায় গভীর ভাবে বলিলেন—“আদালত ভিন্ন এর নীনাংসা আর কে করবে?”

কথা শেষ হইতে না হইতেই স্বরেন্দ্র দৃঢ় কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—“আদালত? বাপের নামে ছোট ভাইয়ের নামে বড় দিদির নামে আদালত! এ আমি পারবো না। কপালে যা থাকে তাই হবে।”

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

মহকুমা যাইবার তিন দিন আগে হইতেই হরিচরণের যে জর আসিয়াছিল—সে জর এখনও ছাড়ে নাই। গ্রামের মাতঙ্গর বাক্তির অপেক্ষা করিয়াছিল যে, হরিচরণের জর ছাড়িলেই তাহার তাহাকে পরিচা যে কোনও উপায়ে এ উইল রত্ব করাইবে। স্বরেন্দ্রকে সকণেই ভাল বাসে, তাহাকে এমন করিয়া স্নানাদি অধিকার হইতে বঞ্চিত হইতে তাহার দিবে না। কিন্তু যখন সবাই শুনিল যে, বৃদ্ধের অল্পখ উত্তরোত্তর বদ্ধিতই হইতেছে, তখন সকলে একদিন রোদ্দোজ্জ্বল বিপ্রহরে ডক্টারখ্যের গৃহেই আসিয়া উপস্থিত হইল।

শারীরিক অবস্থা, চিকিৎসা পথ্যাদির প্রকরণ প্রভৃতি নানা বাক্যালাপের পর নিবারণ মুখোপাধায় বলিলেন—“দেখ হরি ভায়া, ভূমি উইলটা এই সময় বদলিয়ে দিয়ে যাও। এটা কি তোমার ঠিক হয়েছে? তোমাকে তো লোকে ছি ছি করছেই, তার সঙ্গে আমরাও যে কেউ মুখ দেখাতে পারছি না।”

কক্ষে চরেন্দ্র একটা মোড়ায় বসিয়া একখানি বাঙ্গালা সাপ্তাহিক পড়িতে-ছিল । মুখ-ভুলিয়া ঘণাভরে একবার অভ্যাগতদিগকে নিরীক্ষণ করিয়া পুনরায় কাগজ পাঠে প্রবৃত্ত হইল ।

হরিচরণ নিরন্তর । চক্ষু বৃজিয়া নিশ্চেষ্টে তাবে যেমন শুইয়া ছিলেন, তেমনিই শুইয়া রছিলেন ।

চন্দ্র চক্রবর্তী বলিল—“কি ভাই শুন্চ’ ? মৃণ্ম্যে মশায় কি বললেন ?”

হরিচরণ মুদ্রিত নেত্রেই কহিল—“তা কি করব বল ? আমার—”

চরেন্দ্র বাধা দিয়া বলিল—“দেখ্‌চেন, ঠুর জ্বরে হুঁস্‌নেই, এখন আর বিরক্ত নাই বা করলেন ?”

চক্রবর্তী ও রাম দত্ত উভয়েই গজিয়া উঠিলেন—“তুমি চুপ করে’ থাক, নয় ঘর হ’তে বেরিয়ে যাও । যে কান করেচ, গলায় দড়ি দিয়ে মর গে !”

চরেন্দ্র দাঁড়াইয়া ফুঙ্ক স্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল—“কি, আমি বেরিয়ে যাব ? এ বাড়ী আমার তা জান ? বেরোও বল্‌চি, বেরোও আবার বাড়ী থেকে !”

রাম দত্ত ধীর ভাবে বলিলেন—“কান সঙ্গে কথা কইচ জান ?” এ বাড়ী তোমার নয়, এ বাড়ী ভট্টচাক্র মশায়ের । তা ছাড়া, কান মাটিতে এ বাড়ী জান ? আমি ইচ্ছে করলে এ বাড়ীতে ভাগাড় বসাতে পারি, তা জান ?” বলিয়া দরজার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া কহিলেন “এখুনিই ঘর থেকে বেরোও ।”

চরেন্দ্র নম্রাক্ষরের দ্বারা গৃহ হইতে নিজ্জান্ত হইল ।

হরিচরণ এই বচসার সনয়ে একবার চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া পুনরায় চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ভয়ে কাঁপিতেছিলেন ।

দত্ত মহাশয় কোমল অথচ দৃঢ় স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—“ভট্টচাক্র মশায়, এর ক্ষত্রে আপনি চিত্তিত হবেন না । একটু কেবল ধমক্ দিয়েছি । হাঁ, এখন বলুন, এ কায আপনি করলেন কেন ?”

হরিচরণ ভয়ে লজ্জায় কাঁপিতে কাঁপিতে আম্‌তা আম্‌তা করিতে লাগিলেন । গ্রামের জমিদারের কাছে একরূপ একটা অত্যাচারের সম্ভাব্যপ্রদ কৈফিয়ৎ দিতে তিনি মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না বলিয়া—একটা অশ্লীল শব্দ উচ্চারণ করা ছাড়া আর কিছুই করিতে পারিলেন না । হরিচরণের মাথা ঘুরিতে-ছিল, কর্ণমূল পর্য্যন্ত আরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল, কপালে বিন্দু বিন্দু স্বেদ নির্গত হইতেছিল দেগিয়া নিবারণ বলিলেন—“ও কথা না হয় যাক্‌গে, ও

আমরা সবই বৃষ্ণতে পেরেছি। এখন এ উইল আপনি বদলে, অরেনকে তার ছায়া প্রাপ্য দিতে রাজী আছেন ত ?”

হরিচরণ তাঁহার ব্যারামের যত্না অপেক্ষা উত্তরের জন্ত অনেক বেশী বাতিবাস্ত হইয়া পড়িলেন। ‘হাঁ’ ‘না’ কি’য়ে বলিবেন মাথায় কিছুই যোগাইল না। এই অশান্তি হইতে আশু নিষ্কৃতির জন্ত তিনি বলিলেন—“আচ্ছা বাবু, আমি একটু স্থব্ধ হইলেই এ বিষয়ে আপনাদের সঙ্গে পরামর্শ করের—না হয় তাই করব।”

চন্দ্র বলিল—“কি আর এমন তোমার ন’শো পকাশখানা তালুক বৃদ্ধ আছে যে, তার জন্তে এত সবপরাশর্শ! এই যে কেলেঙ্কারি করে’ এলে, ক’জনকে জিজ্ঞাসা করেছিলে ?”

নিবারণ, চন্দ্রকে থানাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—“আচ্ছা ধর’, ষ্ট্রবর না করুন, যদি নাই বাচ ? অবিশিষ্ট বয়সও তো হয়েছে। তখন ও বেচারীর কি দশা হবে ?”

হরিচরণ এতক্ষণ একটা বালিশে ঠেস্ দিয়া বসিয়া ছিলেন, হঠাৎ মূর্ছিত হইয়া বিছানায় পড়িয়া গেলেন। সকলে মিলিয়া ক্রিয়ৎক্ষণ শুশ্রূষা করিয়া তাঁহার চেতনা সম্পাদন করাইলেন। কিন্তু কোনও কথারই কিছু শেষ নিষ্পত্তি সে দিন আর হইল না।

সকলে চলিয়া গেলে হরেন্দ্র কাস্তমণিকে ডাকিয়া কহিল—“দেখ্চ দিদি, বনমাইসের কাণ্ড দেখ্চ ? গায়ের যত সব মজানারা বজ্জাত দিকে দিয়ে ওকালতী করানোর ধুম দেখ্চ ?”

কাস্ত দক্ষিণ হস্তের তালুটি হরেন্দ্রের সম্মুখে পাতিয়া নিরাশাবাজক স্বরে ছল ছল চক্ষে কহিল—“ভাই, তুমিই দেখ। তুমি তো বাড়ীতে থাক না—তুমিই দেখ। আমার দেখে দেখে হাড় মাস ভাজা ভাজা হয়ে গেছে। মনে হয় আফিং খেয়ে মরি।”

“তুমি সবুর কর দিদি। দেখ তো আমি একটা হেস্ত নেস্ত কিছু না করে’ ছাড়্চি না। আজ কালের মধ্যেই করে’ ফেল্চি, তুমি দেখে নিও।”

এমন সময় যেননি হরেন্দ্র কৌচার কাপড়ে করিয়া চারিটি জীৱন্ত নাওর মাছ লইয়া অগ্নিনায় উপস্থিত হইল, অমনি কাস্ত একবারে রণচণ্ডী মূর্তিতে হরেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিল—“এতক্ষণ কোথায় লুকিয়ে ছিলি রে হতভাগা ?”

হরেন্দ্র হাসিতে হাসিতেই উত্তর দিল—“দিদি একবারে চক্ষিণ ঘণ্টাই আশুণ! হরেন্দ্র মাগুর মাছ ভালবাসে, তাই গরাইদের পুকুরে এই মাছ ধরতে গিয়েছিলেন।”—

হরেন্দ্র বাধা দিয়া গভীর স্বরে কাস্তকে কহিল—“দিদি, ও মাছ আমি খাব না।” বলিয়া স্থানত্যাগ করিল।

হরেন্দ্র ক্ষুণ্ণ হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—“কেন তাই?”

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

সেই সময় হরিচরণের যে মুচ্চাঁ হইল, সেই মুচ্চাঁই তাহার কাল। সন্ধ্যার পর হইতেই অরের প্রকোপ অত্যন্ত বাড়িল। অরের ঘোরে সারা রাত্রি কত কি অসুস্থক বকিয়া বকিয়া প্রাতে গেনন একটু নিদ্রাবিষ্ট হইলেন, অমনি হরেন্দ্রের সারারাত্রি জাগরণক্লান্ত দেহখানি পিতার শয্যাপার্শ্বে মেঝের উপর তস্ত্রায় ঢুলিয়া পড়িল।

তখন স্বর্ঘ্যোদয় হইয়াছিল। তপনদেবের প্রচুর আলো পল্লীগামের অবাধ পথে, গাছে, শাখায়, পাতায়, লতায়, ছাদে, জানালায় ঠিকরিয়া পড়িয়া ধরণীকে শিশুর শুভ্র স্নহর হাসির মত শোভাময় করিয়া তুলিয়াছিল।

হঠাৎ গোলমালে এবং উচ্চ জননধ্বনিতে হরেন্দ্র জাগিয়া উঠিল। দেখিল, হরেন্দ্র সতীশ এবং কাস্ত তিন জনে ধরাধরি করিয়া মূর্খ হরিচরণকে নীচে নানাইতেছে। হরেন্দ্র চক্ষু মুছিতে মুছিতে সাশ্রনেত্রে পিতাকে আঞ্জিনার তুলনী মঞ্চতলে শোয়াইল। অরুণ-পরেই হরিচরণ তাহার ঘটবৎসরের পরিচিত সংসারের সচিত্র তাহার অকস্মাৎ প্রাণহীণ দেহটিকে রাখিয়া চিরদিনের মত চক্ষু মুদ্রিত করিলেন।

পিতার সংকার শেষ করিয়া বাড়ি ফিরিবার পরেই হরেন্দ্রের জর আসিল। বাটি পৌছিয়াই সে জেপ মুড়ি দিল। কবিরাজ মহাশয় বলিলেন—“হরেন্দ্র যে এই ১৫টা দিন উপরিউপরি রাত্রি জাগিয়া রোগীর সেবা করিয়াছে, দিনেও একটু বিশ্রাম করিতে পায় নাই—তার উপর এই হৃর্জাবনা ও মনেরকষ্ট, তাই নাড়ি একটু চঞ্চল হইয়াছে। ইহাতে ভয়ের কোনও কারণ নাই। এ জর তিন দিন মাত্র প্রাকিয়াই বিরাম হইবে।”

হরেন্দ্র তবু আশু হইতে পারিল না। চুপে চুপে গিয়া কাস্তকে

জিজ্ঞাসা করিল—“দিদি, কেমন বুঝ্‌চ’? আবার কি বিপদে পড়্‌বে নাকি?”

কাস্ত তখন কাপড় চোপড় কাচা ও ঘরংঘরার ধোয়া প্রভৃতি কার্যে খুবই বাস্ত ছিল; তাই সে ভাড়াভাড়ি অন্ন কথার উত্তর দিল—“তা’ ডাই, সে আশ্চর্য্য নয়, সে পোড়া কপাল আমাদের।”

হরেন্দ্র বলিল—“তাই তো বল্‌চি, যে শত্রুর পুরী হয়েছে, যদি কিছু হয় তো খালার্য্য বলবে মেরে ফেলেচে; আর অমনি হাতে দড়ি।”

“নিছে নয় ডাই, যা’ বলেচ’। তা’ হওয়াও কিছু শত্রু নয়! আচ্চা, হাতের কাযগুলো সেরে পরামর্শ কর্‌চি। তুমি একটু দাঁড়াও।”

ছই দিন ধরিয়া পরামর্শ চইল। তাহাতে এই স্থির চইল যে, স্বরেন্দ্রকে সপরিবারে এ বাট চইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতেই চইবে। ইচ্ছাত কালবিলম্ব করিলে চলিবে না। আর এই কথা জ্ঞাপন করার ভার কাস্ত নিজেই গ্রহণ করিল।

চতুর্থ দিন প্রভাতে স্বরেন্দ্র অরে বিদ্যার চইয়া পড়িয়া ছিল। কাস্তমনি তাহার শয্যাপাশে গিয়া দাঁড়াইয়া তাকিলোর স্বরে বলিল—“ওরে স্বরো, শুন্-চিস্—আর অমন ঠাট করে’ পড়ে থাক্‌লে চাবে না। নে নে ওঠ্‌।”

স্বরেন্দ্র মুণ্ড তুলিয়া কাতর দৃষ্টিতে দিদির বুখপানে চাটিয়া বলিল—“আমি কি অমনি সাধে পড়ে’ আছি, দিদি? বড় কাবু না হ’লে আমি পড়ে’ নাই। একবার গৌজ ও তো নাও না, তার আর কী বুঝ্‌বে?”

“তং দেখে বাচি না! অমর মাগগোটা শরীর—হয়েছে কি যে সারাদিন গৌজ তল্লাস কর্‌তে হবে?” ক্রমে স্বর নানাঈয়া বলিল—“তা সে যা’ হয়, লোকগে; এখন যা’ বল্‌তে এসেচি শোন,—আমি কায কানাই করে দাঁড়াতে পার্‌চি না। হরেন্‌ বল্‌চে যে তোমাদের আর এ বাড়ীতে সে থাক্‌তে দেবে না!”

কথাটা শুনিয়া স্বরেন্দ্র একবার আঁৎকাইয়া উঠিল। প্রথমটা সে ভাল করিয়া কিছুই বুঝিতে পারিল না। তাহার মাথার ভিতরে ভীমরূলের চাকে খোঁচা দেওয়ার মত বৌ বৌ শব্দ ধ্বনিত হইয়া উঠিল। যখন সে কতকটা প্রকৃতিস্থ হইল—তখন তাহার মনে হইল যেন তাহাকে শত শত ভীমরূলে দংশন করিতেছে। অভিমানে অপনানে চুঃখে রোগে যাতনার স্বরেন্দ্র একবারে হতভম্ব হইয়া গেল। সে নিরুত্তর!

নিরুত্তরের শানে আদেশকে আরও তীব্রতর করিয়া কাস্ত প্রণ করিল—

“চূপ করে’ বৈলি দে ? কখন যাবি বল ? আমার অনেক কায় রয়েছে । আমি কি পাড়াতে পারি ?”

এবার আর হুরেন্স থাকিতে পারিল না । তাহার বুক ফাটিয়া কান্না আসিল । বড় বড় উত্তপ্ত ফোঁটাগুলি তাহার রক্ত কপোল আর্দ্র করিয়া বিচানাঘ ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল । বলিল—“কখন যাব ? দিদি, কোথায়ই বা যাব ? পাবই বা কি ? একে এই ছঃসনয়, নানান্ দিকে বাতিবাস্ত ? কে জায়গা দেবে ? এই অশোচ, আমার এই অস্থগ, ওদিকে আঁতুরে রোগী, দশদিনের কাঁচা ছেলে, ছোট ছোট তিনটি মেয়ে ; এ অবস্থায় কোথা যাব দিদি ?”

কান্তর মন একটু নরম যদিও হইল, তবুও সে একথ নিরুপায়কে স্নেহবিক করিবার প্রলোভন ছাড়িতে পারিল না । বলিল—“সে কি, তোমার এত হিতৈষী বন্ধু ? ঐ চন্দ্রার চকোবতী, নিবারণ মৃণুষো, রামদত্ত, যারা তোমার জন্তে অনাস্তত ওকালতী করতে আসতে পারে, আর তারা তোমার একটু জায়গা দিতে পারে না ? কথায় তারা এত দরদ জানায়, আসলে কিছু করবে না—তাও কি হয় ?”

হুরেন্স বৃশ্ণিল, তাহাকে বাড়ী ছাড়িতেই চাইবে । তবুও বলিল “এই আজ মোটে চারদিন বাবা গেলেম, এখন যদি তোমরা আমার তাড়িয়ে দাও, তা হলে বড় কেলেকারী হবে । তার চেয়ে বাবার কাণটা ভাল ভালোই হয়ে থাক, আমার অরটাও সারক, এর মধ্যে যা’ হয় নাশা গুঁজবার একটা জায়গাও করে নি’—তারপর আমি আপনিই না চক্ষু যাব । এখন গেলে যে লোকে বড় নিন্দে করবে ?”

“হরেন্ বল, সে নিন্দে হয়, তার হবে । তার জন্তে তোমার ভাবনা কি ?”

হুরেন্স ভৎসনার স্বরে বলিল—“কি ? হরেনের নিন্দে হলে আমার কি ?”

ঘরের নিকট পাড়াইয়া হুরেন্স সব শুনিতোছিল । বেগে সে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া কহিল—“আর তোমার ভালবাসা দেখাতে হবে না, যথেষ্ট হয়েছে । এ বাড়ী আমার, তুমি এই মুহূর্তেই বেরোও ।”

বাহিরে আঘাতের মেঘনস্রিত, আকাশে তখন বাদলে বাওরে তুমুল কল কোলাহল চলিতেছিল—হুরেন্স নীরবে একবার বাতায়নপথে বহিঃপ্রকৃতিকে দেখিয়া লইল । মাথার গোড়ায় একগাছি বাশের লাঠি ছিল, তাহাতে তর দিয়া মাতালের মত টলিতে টলিতে বারান্দায় আসিয়া ডাকিল—“বড় বৌ, ছেলেদিকে নিয়ে আমার সঙ্গে এস ।” বড় বৌ কাদিয়া উঠিল—মেয়ে তিনটি মার কাছেই

বসিয়া ছিল, তাহারাও কাদিয়া উঠিল। সুরেন্দ্র কঠোর কণ্ঠে বলিল—“এসো—
দেবী করো না, বলচি। আমার সেই ছাতাটা আমার দাও।” “জরে তাঁহার
চক্ষু জবার মত লাল ছিপট, এখন যেন আরও ভয়ানক দেখাইতে লাগিল।

অঝোর বাদলে সুরেন্দ্র সেই শতভিন্ন ছাতাটি মাথায় দিয়া কাপিতে কাপিতে
গ্রামের পথে বাহির হইল। পথচারে সদোচ্ছ্বাসে শিশুকৃত্যকে বরাবর করিয়া
রোরদামানা পত্নী ও কণ্ঠাঘর।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বাট চইতে বাহির হইয়া সুরেন্দ্র বরাবর রান দস্তর নিকট গিয়া উপস্থিত
হইয়া তাঁহাকে আত্মপূর্ব্বিক যথাযথ সমস্ত ব্যাপার জানাইল। তিনি তৎক্ষণাৎ
তাঁহার ভৃত্যগণকে আদেশ দিলেন যে লক্ষ্মী ময়রাণীর দরুণ ঘরখানাতে এখন
সুরেন্দ্রের স্থান করিয়া দেওয়া হউক।

লক্ষ্মী এই ঘরখানি বন্ধক রাখিয়া দত্ত মহাশয়ের নিকট কিছু টাকা কর্জ
লইয়াছিল;—কিন্তু সে টাকা পরিশোধ করিবার পূর্বেই সে ইচ্ছানুসারে
করে। তাহার আর কোন ওয়ারিশ না থাকায় এ ঘরখানি দত্ত মহাশয়েরই
সম্পত্তি হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

দত্ত মহাশয় বলিলেন—“এ ঘরখানি মাঘ মাটি শুদ্ধ আমি তোমায় দান করলাম,
সুরেন্দ্র! পরে রীতিমত লেখাপড়া করে’ দেব এখন। অপাততঃ সেখানে
গিয়ে দাঁড়াও যে তো?”

সুরেন্দ্র জরে ও ঠাণ্ডায় কাপিতে কাপিতে কি বলিতে মাটতেছিল, দত্ত
মহাশয় তাঁহাকে বাধা দিয়া সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়া ভ্রমর খুলিয়া দিলেন।
অল্পক্ষণের মধ্যেই তৈজসপত্র খাণ্ড প্রভৃতি সমস্তই হাজির হইল।

সুরেন্দ্রের এ নির্ভরতা ও জয়ন্তীনতার কাহিনী গ্রামে রাষ্ট্র চইতে দেবী
লাগিল না। ঈদৃশ পৈশাচিক কার্যের প্রতিশোধ দিবার জন্য তৎক্ষণাৎ গ্রামের
একদল লোক প্রস্তুত হইয়া দত্ত মহাশয় ও সুরেন্দ্রের আদেশ প্রতীক্ষা করিয়া
দাঁড়াইল। দত্ত মহাশয় তাঁহার বয়সোচিত গাভীরা ও ধৈর্য্য সহকারে সকলকে
হিস হইতে ইঙ্গিত করিলেন। সুরেন্দ্রও অচরোপ করিল যেন সুরেন্দ্রের উপর কেহ
কোনও রূপ অত্যাচার না করে। অবমানিত জাত্যবহু সুরেন্দ্র এইরূপে
রাজধিকারের মণিসূক্টে ভূষিত করিয়া দিল।

হুসেনের অন্ন ছাড়িয়া গিয়াছে, আশ্রয় পাইয়াছে, গ্রামের সর্বসাধারণে তাহারকৈ সাহায্য করিতেছে, লোকে বলিতেছে যে চাঁদা তুলিয়া হুসেনের কন্ডার বিবাহ দিয়া দিবে, রানদত্ত ইহারই মধ্যে দশটাকা বেতনে তাহার সেরেস্তার হুসেনকে নিযুক্ত করিয়াছেন—ইত্যাদি সংবাদ হুসেন যতই শুনিতেছিল, ততই সে হুসেনের প্রতি বেশী বেশী হিংসাত্মক হইতেছিল। গ্রামের লোকের উপর সে তো চটিয়া আওন। সর্ব্বত্র কাড়িয়া লইয়া সে বাহ্যকে পথের ভিখারী করিতে চায়, লোকে কেন তাহাকে আদর করিয়া তাহার সমস্ত প্রয়াস ব্যর্থ করিয়া দিবে? হুসেন নীরবে সমস্ত লাঞ্ছনা বহন করিতেছে, সে যে বাধা দিতেছে না—ইহা হুসেনের অসহ্য। তবুও সে তাহাকে আশঙ্করূপে জ্ঞান করিতে পারিতেছে না। হুসেন আপনার এই ক্ষমতামতে অত্যন্ত পীড়িত হইয়া উঠিল।

শ্রদ্ধার সময় যখন নাপিত পুরোহিত ব্রাহ্মণ কেহই তাহার গৃহে পদার্পণ করা দূরে থাকুক, আছানই গ্রহণ করিল না—তখন হুসেন ভাবিল সে তাহার ব্যর্থ প্রয়াসের ভয় ভূপের উপর আঘাত্তা করে। সে ক্ষমতাও তাহার নাই। তাহার উচ্চ হইল—এই মুহূর্ত্তে গ্রামের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত এক বিশ্বদাষ্টী আওন আলাইয়া দেয়—ইহাও তাহার সাধ্যাতীত।

হুসেনের গৃহে পিতৃশ্রদ্ধার বিপুল আয়োজন। গ্রামস্থ লোক তাহার বাড়ীতে কানে অকানে কারণ অকারণে ঘুরিতেছে, ছকুম চালাইতেছে, কায় করিতেছে, গোলমাল করিতেছে, নৃতন ছোট ডাবা হাঁকা হাতে করিয়া মুকসী-য়ানা করিতেছে—অর্থাৎ এ যেন গ্রামস্থ লোকেরই পিতৃশ্রদ্ধা। হুসেনবাবু কলিকাতায় থাকে, মাইনর চতুর্থ শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়িয়াছে, কয়েক শিক্ষিত, জুতা পায়ে না দিয়া রাস্তায় বাহির হয় না, যদি দেখিয়া সময় নিরূপণ করে—সে এ অসভ্য গ্রাম বর্গেরদের পোষামোদ করিতে পারে না—তাই সেই দিনই কলিকাতা রওনা হইল। শ্রদ্ধা সেইখানেই করিবে।

তিন চারি দাস পরে হুসেন পরিবারবর্গকে পুনরায় গ্রামে রাখিয়া কলিকাতা ফিরিয়া গেল। সতীশের এবার তাহার ছোট মামার—সম্প্রতি মামাবাবুর—অধীনে দাসিক ছয় টাকা বেতনে একটি চাকরী হইয়াছে বলিয়া, সে আর আসে নাই।

কান্দমণির মনেভাবটা তবুও হুসেনের উপর তেমন প্রসন্ন নহে—এটা অনেকেই লক্ষ্য করিল। বিশেষতঃ গ্রামের ব্রীমহলে ইহা লইয়া বেশ কাণখুঁসা চলিতে লাগিল।

কাস্তমণির প্রাণপণ সহযোগিতায় হরেন্দ্র হরেন্দ্রকে তাহার পিতৃগৃহ চটতে যে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছে, এতনা কাস্তর সঙ্গেও মহিলারা ভাল করিয়া নিশেন না, কাগেই আসল ব্যাপারটা কেহই ভাল জানিল না । যে দিন হরেন্দ্রের স্বীয় সচিব কাস্তর একটি ছোটগাট কলচ হয়, সেট দিনই সকলে টের পাইয়াছে যে কাস্তমণির বহুদিন সঞ্চিত পাচশো পানি রোগামুদ্রা ছিল, তাহার উপর হরেন্দ্রের চিরকালই একটা আকর্ষণ ছিল—সম্প্রতি হরেন্দ্র সেগুলি আদ্যসাৎ করিতে সমর্থ হইয়াছে । সতীশকে ভাল চাকরী করিয়া দিবে, কাস্তকে তীর্থ করাইবে, আমরণ স্মাৰ্ণা ভগ্নীর সমস্ত ব্যয় বহন করিবে, প্রভৃতি মধুর বাক্যে প্রলুব্ধ হইয়া কাস্তমণি ছোট ভাইয়ের নিকট যে সেই রাশিপ্রমাণ টাকা গচ্ছিত রাখিয়াছে—তাহার যে পুনরুদ্ধার কখনও হইবে এ আশা অতি অল্প বলিয়া সময় সময় কাস্ত উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া থাকে । ইহাতেই গ্রামে আসল কথা ফাঁস হইয়া গিয়াছে ।

যষ্ঠ পরিচ্ছেদ ।

চারি বৎসর কাটিয়া গিয়াছে । দুই ভাই দুই ঠাই হইয়া এক রকম করিয়া দিনাতিপাত করিতেছে । হরেন্দ্রের আত্মনিক ইচ্ছা যে সে গিয়া হরেন্দ্রের সঙ্গে মিটুমাটু করিয়া আসে, কিন্তু সকলেই তাহার এ মতের বিপক্ষে বলিয়া সে কিছুই করিয়া উঠিতে পারে নাই ।

গ্রামে আসিলে হরেন্দ্র নিজেও কোথাও বাঁচির হয় না, অথবা তাহার নিকটও কেহই যায় না—লোকের মনে—এখনও তার ভাইয়ের প্রতি অত্যাচারের স্মৃতি জাগরুক । কখন কখন তাহার ইচ্ছা হইয়াছে কোথাও গিয়া দুই দণ্ড বসে, বা কাহারও সহিত দুইটা সুখ চঃপের আলাপ করে,—কিন্তু তাহাকে যে সকলে ঘৃণা করে, কেহই তাহাকে নিজের পাশে বসাইবে না—ভাবিতে ভাবিতে রাগে তাহার শিরাগুলি ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিত । এই জন্ত হরেন্দ্রের নাম পর্য্যন্ত তাহার সহিত না । পূজার ছুটি ছাড়া হরেন্দ্র বাড়ী আসাই প্রায় পরিত্যাগ করিল ।

হরেন্দ্র বাটী আসিলে হরেন্দ্রের খুবই ইচ্ছা হইত একবার তাহার নিকট যায়, কিন্তু কেহই তাহাকে যাইতে দেয় না । বিশেষতঃ দত্ত মহাশয়ও এমন ভাইয়ের সঙ্গে আলাপ করাতে যখন নারাজ তখন আর হরেন্দ্র যায় কি করিয়া ? তবুও পথে ঘাটে কোথাও দেখা হইলে হরেন্দ্র ছোট ভাইয়ের কুশল প্রশ্ন না

করিয়া থাকিতে পারিত না। হরেন্দ্র ইহাকে অন্তরূপ ভাবিয়া অনেক সময় মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যাইত—তাহার ভয়, কি জানি কিছু চাহিয়া বসে। হরেন্দ্র ক্ষুব্ধ হইয়া মনে মনেই কাদিত।

এবারও হরেন্দ্র বাড়ি আসিয়াছে। পাথে ছুজনের সাক্ষাৎ হাওরায় হরেন্দ্র স্বভাব হাসিতে অভিষিক্ত করিয়া স্নেহভরে জিজ্ঞাসা করিল—“এই যে করেন্ যে, কবে এসেছ ভাই?”

হরেন্দ্র দাত মুখ খিচাইয়া অত্যন্ত রুঢ়স্বরে কহিল—“কেন তোমার কিছু চাই টাই? যা মতলব, খুলে বল।”

হরেন্দ্র আর সেখানে দাঁড়াইতে পারিল না, চতাত্তিমানে মুখ নামাইয়া চলিয়া গেল। হরেন্দ্র আজ অত্যন্ত ব্যথিত হইল, মন্বাস্ত্রিকরূপে অপমানিত বোধ করিল। সে কি করিয়া বুঝাইবে যে, সে মাসিক দশটাকা বেতনেও নৈবেদ্যের চাউলে রাজার হালে আছে, তাহার কোন অভাবই নাই। যজ্ঞমানেরা এখন তাহাকে সিধায় বেশী বেশী চাউল দেয়, চুই আনার স্থলে চারি আনা দক্ষিণা দেয়—তাহাতে তাহার অবস্থা খুবই সচ্ছল, একথা হরেন্দ্র তাহার মদ্যক নিরোধে ভাইটিকে কি করিয়া বুঝায়? অথচ এত বড় একটা অপমানও সে সহ করিতে পারিতে পারিতেছিল না। ‘কিছু চাই?’ কখনও কি সে কিছু চাহিয়াছে? তাহার মস্তিষ্ক উষ্ণ হইল, শিরায় শিরায় বিস্তৃত প্রবাহ ছুটিল, কণ্ঠের নীচে ভাওভরা বিষ কেনাইয়া উঠিল—ফিরিয়া দেখিল যখন, তখন তাহার ভাই বহুদূর চলিয়া গিয়াছে—এত দূর যে আর ডাকিয়া সে বিষ নিষ্ক্ষেপ করিতে গেলে তাহাতে কল ত্রো হইবেই না, হয় ত পরিচাসের মত গায়ে লাগিয়া করিয়া পড়িবে। এইরূপ ভাবিয়া চিন্তিয়া হরেন্দ্র নিজের মনের সঙ্গে সন্ধিস্থাপন করিল। এইদিন হইতে আর যাচাতে চুইজনে সাক্ষাৎ না হয়, তারতম্য সে বিশেষ সতর্কতাও অবলম্বন করিল।

আশ্বিনের শেষাশেষি। একে ত বর্ষাকাল হইলেই গ্রামে জল ঢুকে। তাহাতে আবার খলর পাওয়া গেল দামোদরে ভীষণ বড়া। দেখিতে দেখিতে অজগ্রেও তাহার প্রতিধ্বনির মত কল কল রবে বানদেবতার স্বাগত শব্দ বাজিয়া উঠিল। চুই দিন দিনের মধ্যেই বরাবর যতদূর জল আসে তাহার শীনা অতিক্রম করিয়া গীতোজ্জ্বল ফোয়ারিত জলরাশি লোকের ছয়ানে চরানে ছড়াইয়া গড়াইয়া পড়িল।

হরেন্দ্র নকিপুত্রে নিছ কছার জন্ত একটি পাত্র দেখিতে গিয়াছিল, কিন্তু

এই অকস্মাত্ বজ্রার জ্ঞান সেখানে তিনদিন হইতে আটকাইয়া পড়িয়াছে । পেয়ার মাথিরা কোনও মতে সে তুফানে পাড়ি জমাইতে সাহসী নয় । শ্রাবণ-স্নানার মত বৃষ্টি ও তুফান যখন তিন দিনেও থামিল না—তখন স্বরেন্দ্রকে আর ঠেকাইয়া রাখা গেল না । সে জমিদারের শরণাপন্ন হইল, তাহার আদেশে মাথি একবার পেয়া বাহিতে অগত্যা স্বীকৃত হইল ।

বেলা প্রায় বারটা । স্বরেন্দ্র সারা পথ জল ভাঙ্গিয়া গ্রামে প্রবেশ করিল । কোথাও মাটি নাই—গাছ পালা, লতা, বাড়ী সব যেন জলে ভাসিতেছে । কত কত ঘর পড়িয়া গিয়াছে—সেই চাঁলের উপর হতভাগা নরনারীগণ নির্দাসিতের মত কাঁদিতেছে । গ্রামের গবাদি পশু কতক ভাসিয়া গিয়াছে, কতক মরিয়া গিয়াছে—অবশিষ্ট গুলিও এই সমাগত বিপদে মহানান্ হইয়া মরিবার জন্যই যেন অপেক্ষা করিতেছে । এই নিরঙ্গ, আশ্রয়চ্যুত, শীতলজর, বর্ষাদারার অনাচ্ছাদিত অনাবৃত পল্লীবাসীদিগের ক্লিষ্ট মুখচ্ছবি দেখিয়া স্বরেন্দ্র বড়ই বাণিত হইল । তাহার নিজের পরিবারের কথা মনে পড়িল । পড়িতেই তাহার মাথা থিম্‌থিম্‌ করিয়া উঠিল । তাহার প্রধান ভাবনা—এবার গৃহহীন হইলে কে আশ্রয় দিবে ? ক্রমশঃ স্বরেন্দ্র আপনার ভবিষ্যৎ ভাবিতে ভাবিতে এতই বিমনা হইয়া পড়িল যে, তাহার মাথার নিজের কথা ভিন্ন অল্প কোনও চিন্তারই স্থান রহিল না ।

স্বরেন্দ্র উত্তরপাড়ায় যখন পৌঁছিল, তখন দেখিল যে কেবল এই দিকেই জল আক্রমণ করিতে পারে নাই । দেখিয়াই তাহার ভয়পাখুর মুখমণ্ডলে একটা আশার জ্যোতিঃ জলিয়া উঠিল ।

স্বরেন্দ্র গৃহে পৌঁছিয়া প্রথমে স্ত্রীকন্যাগণকে দেখিয়া তাহার সমস্ত হৃদাবলার বোঝা নামাইয়া ফেলিয়া নিশ্চিন্ত ও আশ্বস্ত হইল । জলে ডিজিয়া ও পথ হাটিয়া সে যে ক্লান্ত হইয়াছিল, তাহা ভুলিয়া গেল । তখন আবার মনে হইল যে গ্রামের কি চর্দ্দশা সে দেখিতে দেখিতে আসিয়াছে । সকল দশা তাহার ভাল মনে না থাকিলেও, কুসুমি বাগ্নীকে ঘরের চালার উপর তিনদিনের অশ্রুত সন্তান কোলে করিয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়া আসিয়াছে—তাই তাহার জ্ঞান গৃহে একটু স্থান করিয়াই সে আবার তখনই বাহির হইয়া গেল ।

কুসুমি বাগ্নীকে নিজের বাড়ীতে রাখিয়া, স্বরেন্দ্র তাহার বাপের ডিটার অবস্থা দেখিতে ছুটিল । সে পথে গিয়া দেখে যে সেখানে হাঁটু ভোর জল,

ধরখানি ডুবু-ডুবু। কিয়ৎক্ষণ দূরে পাড়াইয়া সে ভাবিল যে বাড়ীপানির তো পড়িতে বেশী দেয়ী নাই। কয়েই সে বাড়ীর লোকেরা যে কোথায় এই ভ্রমোৎসাহে গিয়া পাড়াইবে, এ চিন্তা করিয়া হরেন্দ্র আর স্থির থাকিতে পারিল না। কোনও দিকে লক্ষ্য না করিয়া সে কোমর ভোর জলে নামিয়া বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইল।

নিকটেই একটি অশথতলে হরেন্দ্র, ক্ষান্তমণি, সতীশ, তাহার পত্নী, হরেন্দ্রের স্ত্রী ও তাহার চারিটি কন্যা গৃহহীন হইয়া কাদিতেছে। হরেন্দ্র সে দিকে চাহেও নাই।

হরেন্দ্রকে বাড়ীর দিকে ঘাইতে দেখিয়া হরেন্দ্র ডাকিল—“দাদা—ও দাদা—ও দিকে কোথা যাচ্ছ ?”

হরেন্দ্র চমকিত হইয়া পাড়াইয়া পড়িল। মুখ ফিরাইতেই গৃহহারা আত্মীয়-গণকে দেখিতে পাইল। হরেন্দ্র ফিরিল। নিকটে আসিলে, হরেন্দ্র তীব্র অথচ স্নেহ দৃষ্টিতে—পর্য্য অথচ করুণ, উদ্ধত অথচ আত্মসমর্পিত স্বরে ক্রিজাসা করিল—“ওদিকে কোথায় যাচ্ছিলে ?”

হরেন্দ্র এ প্রশ্নের উত্তর দিবার পূর্বেই একহাতে এক পোটলা ও অন্ডহাতে একটা বাকস মাথায় তুলিতে তুলিতে কহিল—“চল' চল' বাড়ী আগে চলত ? মায়া বাবে যে ? কতক্ষণ এমন করে' পাড়িরে আছ তোমরা ? হেঁ—সব একেবারে ছেলেমানুষ ! এস, এস ।” বলিয়াই হরেন্দ্র চলিতে লাগিল।

সাপুড়িয়ার মধ্যে মুগ্ধ সর্পের মত সকলেই হরেন্দ্রের অনুসরণ করিতে লাগিল।

হরেন্দ্র মনে মনে অনেকগুলি কথা সাঁজাইয়া ডাকিল—“দাদা—” ; কথা আটকাইয়া গেল। চক্ষু দিয়া সজোরে অশ্রুপ্রবাহ বহিতে আরম্ভ করিল। হরেন্দ্র অনেক চেষ্টা করিয়াও সে বেগ রোধ করিতে পারিল না।

হরেন্দ্র উত্তর দিল—“ভাই !”

আর কোনও কথাই হইল না।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

অন্নপূর্ণা রূপ ।

কই তব অন্নকুট,
 তরি দাও কন্নপুট,
 ধরনি,—তা জননি,—কুদায় কাতর
 পাড়াইয়া মহাকাল,
 পসিছে বাঘের ভাল,
 শ্রুতিমিত-নয়ন-বহি—শুক ওষ্ঠাধর,—
 শিক্ত-শূক্ৰ ভিক্ষাকুলি,
 মুষ্টিভিক্ষা গেছে ভুলি’—
 রুধি’ধার কানে গৃহী—ফিরে দিগধর—
 কুদায় জর্জর ।

‘দেহ অন্ন’—পাতি হাত
 ডাকিছেন ভোলানাথ,
 ভরিতে কালের কুক্ষি সাধা কাছে কার ?
 ধনী অবনত-মুখ,
 বিদরে দাতার বুক,
 অঁচলে নয়ন মুছে বধু আপনার ।
 অন্ন নাই—অন্ন নাই,
 “দেহ অন্ন—ভিক্ষা চাই,”
 অতিথি ফিরিয়া যায়,—কে করে সৎকার ?—
 রক্ত সর্ক ধার ।

কালের পরীক্ষা শেষ—
 হাসিল আবার দেশ,
 শত্রে পরিপূর্ণ হ’ল ধরার অঞ্চল ;
 মায়ের প্রিয় মুখ,
 মূরে গেল সর্ক দুখ,
 জুটিল ছয়ায়ে অর্ণা-কুদিত-বিকল ;

নহে আর বার্থ-শুভ—
 অন্নের ভাণ্ডার পূর্ণ,
 জননীর-মুখে হাসি—স্নেহ নিরমল—
 ভাঙিন উজ্জল ।

স্বর্ণ দক্ষী শোভে করে
 কুঁদিত বটন-তরে,—
 পরিপূর্ণ-অন্নপাত্র ধরিলেন হাতে ;
 দৃষ্টি ত'তে স্থধা স্নিগ্ধ,
 কি মরা সবার 'পরে ;
 পাড়াইল মল্যকাল চরাচর-সাথে ;
 অন্নপূর্ণা দিল স্থধা,
 চরিত কালের স্থধা,
 “ভগ্ন-ভগ্ন অন্নপূর্ণা”-রবে বিশ্ব নাভে—
 আনন্দ-প্রভাতে ।

ঐগিরিজা নাথ সুখোপাধ্যায় ।

রাণাঘাট

২রা চৈত্র—১৩২১

বঙ্কিমচন্দ্র-জীবনপঞ্জী।

* [একুশ বৎসর হইল এই চৈত্রমাসে বঙ্কিমচন্দ্র স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। প্রধানতঃ ত্রীবৃক্ক শতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রণীত “বঙ্কিম-জীবনী” অবলম্বন করিয়া আমি এই জীবনপঞ্জী সংকলন করিলাম। অত্যাশ্চর্য্য এবং সাময়িক পত্রিকাভিত্তিতে প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্র বিষয়ক কয়েকটি প্রবন্ধ হইতেও কিছু কিছু সাহায্য পাউয়াছি।

এই জীবনপঞ্জী নিশ্চয়ই বর্ত্ত অংশে অসম্পূর্ণ এবং সম্ভবতঃ স্থানে স্থানে ভ্রান্ত্যুক্ত। ঐহাঙ্গী বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনের এতদতিরিক্ত কোনও উল্লেখযোগ্য তারিখ বা সন অবগত আছেন, অথবা ঐহাঙ্গী এই সংকলনে কোনও ভুল প্রমাণ দেখিবেন, তাহারা যদি অগ্রগ্রহ করিয়া সেগুলি “মানসী” কার্যালয়ে লিখিয়া পাঠান, তবে অত্যন্ত অঙ্গুষ্ঠীত হইব। আনিও দ্রঃ নূতন তথ্যাদি সংগ্রহ করিবার চেষ্টায় আছি। আগামী বৎসর চৈত্রের “মানসীতে” সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত আকারে এই জীবনপঞ্জী পুনঃ প্রকাশ করিবার বাসনা রহিল।—

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

১৮৩৮—২৭শে জুন (১৩ই আশাঢ় ১২৪৫) রাতি ৯টার সময় চন্দ্রিশ পুরগণার অন্তর্গত কাঁটালপাড়ায় জন্ম।

১৮৪২—পিতা ৮বাদরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কর্মস্থান মেদিনীপুরে হাতেখড়ি।

মাতার সহিত কাঁটালপাড়ায় আগমন এবং রানপ্রাণ সরকার ওর মহাশয়ের পাঠশালায় বিদ্যাশিক্ষণ।

১৮৪৪—মেদিনীপুরে পিতার নিকট আগমন এবং জেলা ইন্সপেক্ট ইংরাজি পাঠ।

১৮৪৭—কাঁটালপাড়ায় প্রত্যাবর্ত্তন ও সুগলি কলিজিয়েট ইন্সকুলে প্রবেশ।

১৮৪৯—ফেরুয়ারি। কাঁটালপাড়ায় নিকট নান্দারগণপুর গ্রামে বিবাহ হইল।

১৮৫০—“মানস ও বলিতা” কবিতা রচনা।

১৮৫৩—চৈত্র ।—“প্রভাকরে” দ্বারকানাথ, বঙ্কিমচন্দ্র ও দীনবন্ধন কবিতা
পত্রিযোগিতা ।

চারি বৎসর ব্যাপী সংস্কৃতচর্চারস্ত—বাকরণ, « কাব্য ও
সাহিত্য অধ্যয়ন ।

১৮৫৭—মধ্যভাগে—ভগলি কলেজ হইতে সিনিয়র স্কলার্শিপ পরীক্ষায়
উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতায় গমন এবং প্রেসেডেন্সি
কলেজে আইন অধ্যয়ন আরম্ভ ।

পিতা যাদবচন্দ্র রাজকর্ম্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন ।

১৮৫৮—এপ্রিল । আইন অধ্যয়ন ছাড়িয়া, বি এ পরীক্ষা দিলেন ।

মে । বি এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন ।

২ প্রশ্নে অগষ্ট । ডেপুটি কলেজিয়ারি পদে নিযুক্ত হইলেন ।

প্রথম কর্মস্থান যশোরে গমন এবং তথায় দীনবন্ধু মিত্রের সহিত
পরিচয় ।

১৮৫৯—কার্তিক । বোড়শবর্ষ বয়সে অরোগে পতীর মৃত্যু ।

১৮৬০—জ্যৈষ্ঠয়ারি । যশোরের হটতে নাগোয়ারে বদলি (কাণিত
নিকট) তথায় কাপালিক দর্শন ।

জুন । হালিসহর গ্রামে দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ ।

একশত টাকা বেতন বৃদ্ধি হইয়া পঞ্চম গ্রেডে উন্নীত হইলেন ।
নভেম্বর । নাগোয়া হইতে খুলনায় বদলি ।

১৮৬২—কিশোরীচাঁদ মিত্র সম্পাদিত “ইণ্ডিয়ান কীল্ড” পত্র “রাজ-
মোহম্ম ওয়াটক্” নামক ইংরাজি উপজ্ঞান প্রকা-
শারম্ভ । কাগজ বন্ধ হওয়ার উপজ্ঞানপানি সম্পূর্ণ
হয় নাই ।

১৮৬৩—আরম্ভে । চতুর্থ গ্রেডে উন্নতি ও একশত টাকা বেতনবৃদ্ধি ।
“ভূর্গেশনন্দিনী” রচনা ।

* বঙ্কিমচন্দ্রের কনিষ্ঠ মহোদয় জীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ডাট্টোপাধ্যায় মহাশয় ১৯২০ সালের
“সাহিত্যে” “বঙ্কিম ঐশ্বর্য” গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

“বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যাকরণশিক্ষা ভালরূপই হইয়াছিল । ডাট্টোপাধ্যায় নিম্নোক্ত বৈয়াকরণ
“জীৱাম জায়বাপীশের নিকট তিনি ব্যাকরণ শিক্ষা করিয়াছিলেন ।” •

১৮৬৪—মার্চ। পূনরা চইতে বারুইপুরে বদলি ও পথে কয়েকদিন

কাটালপাড়ায় যাপন। +

শেষভাগে—বারুইপুর চইতে ডায়মণ্ডহার্কারে বদলি।

ডায়মণ্ড হার্কার চইতে বারুইপুরে বদলি। +

সজীববাবু আসিয়া দুর্গেশনন্দিনীর পাণ্ডুলিপি প্রেসে দিবার জন্ত
লইয়া গেলেন।

১৮৬৫—দুর্গেশনন্দিনী প্রকাশ। :

এই সময় বন্ধিমের কোঠখা (ছামাডরণ ও সজীবচন্দ্র) দুর্গেশনন্দিনীর পাণ্ডুলিপি
ভাণ্ডিয়া উঠা প্রকাশের অযোগ্য বলিয়া অভিযত দিহা থাকিবেন, এইরূপ লণ্ডীল বাবুর
অত্থান।—“বন্ধিমজীবনী” ১০০ পৃঃ

+ ঐশ্বর্য কালীনাথ দত্ত মহাশয় তখন বারুইপুর রেজিষ্টারি অফিসের হেডক্লার্ক—
তিনি লিখিয়াছেন—“এই সময়ের পূর্বে হইতে তিনি দুর্গেশনন্দিনী লিখিতেছিলেন। এ সময়
তাঁহাকে সর্বদা অস্ত্রমনা দেখা যাইত। এমন কি সাক্ষীর এজেন্টের লিখিতে লিখিতে
তিনি কলম বন্ধ করিয়া ভাবিতে ভাবিতে অস্ত্রমনা হইয়া পড়িতেন, এবং চটাই একলাল
পরিতাপ করিয়া ঘূষাভাঙুরে—তাঁহার study room এ প্রস্থান করিতেন এবং চিত্তিত বিষয়টি
লিপিবদ্ধ না করিয়া এজলাসে ফিরিতেন না।—“বন্ধিমচন্দ্র” প্রবন্ধ—“প্রদীপ” ২য় ভাগ
২১২ পৃঃ।

৩৮জন্য বহু মহাশয় লিখিয়াছেন—“দুর্গেশনন্দিনী পড়িয়া মনে হইল উহা স্বর্গের
আইবানবাহে পড়িয়া লিখিত। অনেকদিন পরে বন্ধিমবাবুকে একবার এই কথা বলিয়া-
ছিল। তিনি বলিয়াছিলেন, দুর্গেশনন্দিনী লিখিবার আগে আইবানবাহে পড়ি নাট।”

“বন্ধুবৎসল” বন্ধিমচন্দ্র” প্রবন্ধ। প্রদীপ ১ম ভাগ ২১০ পৃঃ

কালীনাথ বাবু “প্রদীপে” প্রকাশিত উল্লিখিত “বন্ধিমচন্দ্র” প্রবন্ধে বলেন—“দুর্গেশ-
নন্দিনী লেখা সমাজপ্রায় হইলে কিবা মুক্তি হইবার আকাংক্ষা আমি তাঁহার পাঠ-কালের
উপবেলে কয়েক ভুল্লম স্বর্গের ওয়েবলি উপল্যাপ সঙ্কল্পিত দেখি। তিনি কয়ত কোমল
বন্ধুকে তাঁহার দুর্গেশনন্দিনীর পাণ্ডুলিপি পাঠ করিতে দেখে, বন্ধু তাঁহাকে ivanhoe's
উপাখ্যান ভাগের সঙ্গে তাঁহার পুস্তকের উপাখ্যান ভাগের অনেক বিষয়ে সৌন্দর্য
আছে বলিয়া থাকিবেন; তাহাতে তিনি কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া সম্ভবতঃ নতন ওয়েবলি
উপল্যাপবলী বাজার হইতে ক্রয় করিয়া দেখিতে আনিয়াছিলেন। + + + ivanhoe's
জায়া লইয়া যে দুর্গেশনন্দিনী রচিত হয় নাই, ইহা বন্ধিম বাবু নিজস্বপে শতবার বাস্তব
করিয়াছেন। আমার নিজের যাহাই ধারণা হউক না, আমি বন্ধিম বাবুর কথায় বিশ্বাস
করিয়া যে ধারণাকে অপহৃত করিয়াছি। কেন না আমি তাঁহার honesty কে
unimpeachable বলিয়া বিশ্বাস করি।—প্রদীপ, ২য় ভাগ, ২১০-২২০ পৃঃ।

১৮৬৬—বেতনবৃদ্ধি ও তৃতীয় গেজে উন্নতি ।

“ দেড়নাসের ছুটিতে বাড়ী আসিলেন ।
ছুটিশেষে বাকুইপুর ফিরিলেন ।

১৮৬৭—প্রথমে । **কপালকুণ্ডলা** প্রকাশ ।

“ ছুলাই । আনলা বেতন নির্ধারণ কমিশনের সেক্রেটারি নিযুক্ত
হইয়া কলিকাতায় আসিলেন । •

সেপ্টেম্বর । আগুপুত সন্দের বদলি ।

এ বৎসর “মৃণালিনী” রচনা আরম্ভ ।

১৮৬৮—“মৃণালিনী” রচনা শেষ (রচনা কাল দশমাস)

জুন । ছয় মাসের ছুটি লইয়া কাঁটালপাড়ার গমন, তথায়
আইন অধ্যয়ন ও “মৃণালিনী” সংশোধন ।

“মৃণালিনী” ছাপিতে দিয়া কাশীযাত্রা ।

১৮৬৯—৮টি শ্রেণে আলিপুরে প্রত্যাবর্তন ।

এক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন ।

৩রা মে । “জগৎশনানিনী” তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ ।

১০ই নবেম্বর । **মৃণালিনী** প্রকাশ ।

২৯শে নভেম্বর । আলিপুর হইতে বহরমপুরে বদলি । +

•

ঐচ্ছিক অক্ষরগুলি সরকার মহাশয়ের লিখিত “পিতা-পুত্র” অবধি বর্ণিত, আইন-
শিক্ষার্থ বন্ধিমন্ডলের জেমিডেলি কলেজে যাত্রায়ান্ত সম্ভবতঃ এই সময় হইয়া থাকিবে ।

+ দে সময় ঐচ্ছিক অক্ষরগুলি সরকার মহাশয়ের পিতা বহরমপুরে সবলজ । তিনি
ভাঁহার “পিতাপুত্র” অবধি বন্ধিমন্ডলের বহরমপুরে আগমন বর্ণনা করিয়াছেন । সেই সময়
বর্ণনাটি দীর্ঘ হইলেও সমস্তই উদ্ধৃত করিবার অলোভন সঞ্চার করিতে পারিলেন না ।—

“আমার বহরমপুরে দাওয়ার কিছুদিন পরে বন্ধিমন্ডল বহরমপুরে গেল । x x x
তাত্ক্ষণিক বন্ধিমন্ডলের ত্রিভুত করিতে গিয়া ভাঁহার অদ্বৈতের কথা না বলা, যোরতর
বিড়ম্বনা । বন্ধিমন্ডলের সমাগে, সাতিতেই খোলাপ ফুল । খোলাপের কেবল পাণ্ডুর
রঙ দেখিবে, মিঠা মিঠা দৌরঙ দেখিবে, ডল ডল রূপ দেখিবে, খোলাপের বুতে যে কাঁটা
আছে তাহা কি দেখিতে লাই ? খোলাপে কাঁটা আছে বলিয়া কি খোলাপের মধ্যমা
কম ? x x x

বন্ধিমন্ডল বহরমপুরে যাইতেছেন বলিয়া, সঙ্কীর্ণ নানু পিতাকে পত্র লেখেন, আমাদের

•

বাসায় উঠিবেন বলিয়া আমাইয়া রাখেন এবং কাছারির নিকট বন্ধিন বাবুর জন্য একটি বাড়ী ভাড়া করিবার অর্থ অন্বেষণ করেন। আমি অবশ্য পাঁচটা বাড়ী দেখিয়া শুনিয়া, একটি বাড়ী দিক করিয়া আড়াইয়া কুড়াইয়া রাখিলাম; জল ভুলাইয়া রাখিলাম। একটি দিকা ঢাকরও রাখিয়া দিলাম। পূর্বেই বলিয়াছি, বন্ধিনবাবুর কপালকুণ্ডলা পড়িয়া আমি কাব্যে গুণগনায় মুগ্ধ হইয়াছিলাম। হুতরাং কেবল আতিথোত্তর নাতিতে মছে, একত ডক্তিতে, অনেক সহকারে, এই সকল কার্য্য করিয়াছিলাম। যথাকালে বন্ধিনবাবু আসিলেন, আহাঙ্গানি করিলেন, শুনি-লেন যে আমি ঘূহবাসী গজাডরণ বাবুর পুত্র, বি এল পাস করিয়া বহরমপুরে ওকালতি করিতে আসিয়াছি। আহাঙ্গের পর বিজ্ঞান করিলেন বিজ্ঞানের পর আমরা পিতাপুত্র পাড়ী করিয়া উঁহাকে উঁহার বাড়ী লেগাইতে লইয়া গেলাম। বাড়ী বেগিলেন, পছন্দ করিলেন, দিকা ঢাকর তিনখানা কেনারা বাহির করিয়া দিল, আমরা তিনজনে কণেক বদিয়া রহিলাম, বাসায় সকলে কিরিয়া আসিলাম, বন্ধিনবাবু সে রাত্রি আমাদের বাসাতেই যাপন করিলেন। পিতার সহিত কথাবার্তা চলিল। পরদিন প্রাতে উঁহার জিনিষপত্র, ঢাকর প্রাঙ্গণ লইয়া, পাড়ী করিয়া তিনি নিজ বাসায় পেলেন, আমি পাড়ী করিয়া দিলাম, পাড়ীতে ভুলিয়া দিলাম তখনকার কথা মনে পড়িলে এখন বুক ফাটে! এ পর্য্যন্ত বন্ধিনবাবু আমার সহিত একটি কথাও কহিলেন না; অধীনের প্রতি কপালকুণ্ডলাকারের করুণা হইল না। বাবা সব বুঝেন, সব জানেন, সব দেখিতেছিলেন, আমি কিরিয়া উপরে গেলে, বলিলেন “বন্ধিন গেল হে?” আমি বলিলাম “হাঁ।” “তোমার সহিত ছদ্মবে একটিও কথা হয় নাই?” আমি বলিলাম “কথা কি, আমি যে একটা জীব, এই বাসায় থাকি; সে সবর হয়ত উঁহাতে এখনও পৌঁছে নাই।” পিতা বলিলেন “তাই বটে।” বলিয়া উচ্চ হাস্য করিতে লাগিলেন। উঁহার হাসির ফোয়ারায় আমার মনের নয়না মুইয়া গেল। পিতৃগৌরবে আমি ধৌরবান্ধিত, আমিও হাসিতে লাগিলাম।

কাছারির ফেরত পিতা পুত্র দুইজনে, বন্ধিনবাবুর সুবিধা অসুবিধা কতদূর হইতেছে দেখিবার জন্য, বন্ধিনবাবুর বাসায় উঁহাকে দেখিতে গেলাম। বন্ধিন বাবু “আশ্রম” বলিয়া পিতাকে সম্বোধন করিলেন, এবার মনে হইল, পিতাকে আশ্রমের সম্বোধনে, ভ্রাতৃকটোর মধ্যে আমিও যেন আছি। আমার নিমুগ্ন সেই ঢাকর, সেইরূপ তিনখানি কেনারা বাহির করিয়া দিল; বন্ধিনবাবুর আদেশ মত পিতাকে তামাক দিল, আমরা তিনজনে বদিয়া রহিলাম। পিতার সহিত বন্ধিন বাবুর কথোপকথন হইতে লাগিল। আমি জনান্তিকে দুই এক কথার টোপ ফেলিতে লাগিলাম। বন্ধিনবাবু কিন্তু টোপ ধরিলেন না। তবে আমি এবার বুক বাঁধিয়া গিয়াছি, বন্ধিনবাবুর এই ভাব থাকে কিন্তু মানিলাম না; তবে মনে মনে এখন ভাবটা হইয়া থাকিবে যে, “কার্য্য নাথো সার হল মোর, মাজ ধরা হল না।”

এইরূপে দিন যায়। বন্ধিন বাবু নিজেই বলিয়াছেন, দিন কাহারও জন্য বসিয়া থাকে না। আমারও দিন আটকাইয়া রহিল না। যতদিন পিতা বহরমপুরে ছিলেন, ততদিন বন্ধিনবাবু মাকে মাকে একবার আসিতেন, পিতার সহিত গল্প গুজন করিয়া চলিয়া যাইতেন।

১৮৭০—১৮৭১—এপ্রিল—কপালকুণ্ডলা দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ।

শেষভাগে—বেতন বৃদ্ধি, দ্বিতীয় গ্রেডে উন্নীত হইলেন।

মাতৃবিয়োগ।

ছুটি লইয়া বাড়ী আসিলেন।

১৮৭২—১লা বৈশাখ (বাং ১২৭২) ভবানীপুর হইতে **বঙ্গদর্শন**

প্রকাশ এবং তাহাতে “বিনম্রক” আরম্ভ। প্রথম

সংখ্যা ১০০০ ভাণ্ডা হইল।†

তাহার পর পিতৃদেব চলিয়া গেলেন, আমি একা বসিয়া রহিলাম। বন্ধিমবাহু আর আসেন না, আমিও অবশ্য সাই না।

কিসের একটা মাংস দিমের ছুটি হইল। বন্ধিম বাবুও বাড়ী আসিলেন, আমিও বাড়ী আসিলাম। মলহাটীতে আসিয়া ছুইজনে দেখা সাক্ষাৎ। সাত সাত ঘণ্টা কাল, মলহাটীতে বিজ্ঞান ও কল্লিভোগ করিতে হইবে। তাহার পর হুগলি ইষ্ট ইন্ডিয়ানের বাড়ী আসিবে, নয়ত ছুই ঘণ্টা বিলম্বও আসিতে পারে। সেকেন্ড ক্লাসের বিজ্ঞানঘরে বসিয়া বন্ধিম বাবু ও আমি। দিন যায় ত কণ যায় না। বহু দিন পিঠাছে কিন্তু এবার বন্ধিমবাহু কণ কাটাইতে পারিলেন না। শুভকপে, অতি শুভকপে, বন্ধিমবাহু কথা কহিতে লাগিলেন। একথা, সে কথা, ও কথা, কোথা হইতে ক্রিয়ণ করিয়া পড়িল—রহস্যাকার রেগেন্ডের কথা। তখন ছুইজনে অসিদ্ধারে রেগেন্ডের মুণ্ডপাত করিয়া, বসিয়া ভুক্তিপূর্বক ছুইজনে সেই মুণ্ডি চিবাইতে লাগিলাম। চর্তুপের সেই রসগ্রহে, ছুইজনের ভিতরে সজদগ্ধতা অস্থির। দিন দিন সে সজদগ্ধতা ক্রমে ক্রমে অবিলম্বে বিশেষ বজ্রতায় পরিণত হইয়াছিল। × × × বন্ধিমবাহুর বজ্রবৎসলতার পরিচয় চন্দ্রনাথ দাসা যথেষ্ট দিয়াছেন। আমি আর চন্দ্রনে ব্রুজ্জি এক্ষেপ করিব কেন?”

‘বঙ্গবানী’ আসিস হইতে প্রকাশিত “বঙ্গভাষার লেখক”, ‘শিতাপুর’ প্রবন্ধ, ৪৪১-৪৪৪ পৃঃ

• ঐদৃক অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় বর্ণিত মলহাটী টেসনে বন্ধিমচন্দ্রের সহিত প্রথম বাক্যালাপ, সম্ভবতঃ এট সময়ে হইয়া থাকিলে। বন্ধিমচন্দ্র দেখা হয় ইষ্টরের ছুটিতে বাড়ী যাউতেছিলেন।

† ঐদৃক অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় লিখিয়াছেন—“বঙ্গদর্শনের আদিমুখের একটা কথা মনে পড়িল। বহরমপুরে নতুন বঙ্গদর্শন বাহির হইয়াছে, ১ম খণ্ড ১ম সংখ্যা। আমিও তখন বহরমপুরে থাকি। সম্পাদকের নিজস্ব মন্তব্য খানিতে ঐদৃক কত্রীতাক্ষরাণী সদর পৃষ্ঠায় যে বহু বহু অক্ষরে **বঙ্গদর্শন** ভাণ্ডা আছে তাহারই ‘ব’র বীড়ে কখন একটি শূন্য বসাইয়া দিয়াছেন। সম্পাদকের কনিষ্ঠা সস্তা তখন সন্মোহিত দ্বিতীয়ভাগ পড়িতেছেন তিনি সেই বঙ্গদর্শনখানি লইয়া তাড়াতাড়ি পিতার কাছে আসিয়া অগ্রদোষ করিলেন, “বাবা, তুমি যে লিখিয়াছিলে ‘বঙ্গদর্শন’, এ সে ‘রঙ্গদর্শন’?” বন্ধিম বাবু হাসিতে হাসিতে বলিলেন, “তোমার গর্ভপারিশীর গুণে রঙ্গ হইয়াছে, আমি কি করিব না?”

মহাশয় “বঙ্গদর্শন”, প্রাচীন ১৩১৪

শ্রাবণ। বঙ্গদর্শনের গ্রাহকসংখ্যা ১৫০০ হইল।

বহরনপুরে ৬নম্বের দত্ত মহাশয়ের সহিত পরিচয়।

১৮৭৩—টেল। বঙ্গদর্শনে “বিশ্ববৃক্ষ” শেষ। এই সংখ্যায় “ইন্দিরা”ও

প্রকাশিত হইয়াছিল।

বঙ্গদর্শন কার্যালয়ে ভবানীপুর হটতে উদ্ভিগা

কাটালপাড়ায় গেল। বঙ্গদর্শনে “যুগলাঙ্গুরী”

প্রকাশ।

১লা জুন। **বিষবৃক্ষ** পুস্তকাকারে প্রকাশ।

আখিন। বঙ্গদর্শনে “চন্দ্রশেখর” আরম্ভ।

বঙ্গদর্শনে “সান্য” প্রবন্ধ প্রকাশ।

(ছোট) “ইন্দিরা” পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল।

১৮৭৪—২রা ফেব্রুয়ারি। ছোট পট্টয়া বহরনপুর হটতে গুহে গমন।

এপ্রিল। ছোট শেষে বারাসতে বদলি।

১৫ই জুলাই। “ভগ্নেশনন্দিনী” পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশ।

১৫ই আগষ্ট। “কপালকুণ্ডলা” তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ।

ভাদ্র। বঙ্গদর্শনে “চন্দ্রশেখর” শেষ এবং “কমলাকান্তের
দপ্তর” প্রকাশ আরম্ভ।

আখিন। বঙ্গদর্শনে “রজনী” আরম্ভ।

অগ্রহায়ণ। বঙ্গদর্শনের গ্রাহক প্রায় ২০০০ হইল।

মালদহে বদলি।

২০শে নভেম্বর। “যুগালিনী” তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ।

২৬শে ঐ **লোকরহস্য** প্রকাশিত হইল।

যুগলাঙ্গুরী পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল।

১৮৭৫—বৈশাখ। বঙ্গদর্শনে “কমলাকান্তের দপ্তর” শেষ হইল।

১৯শে এপ্রিল। **বিজ্ঞান-রহস্য** প্রকাশিত হইল।

১লা জুন। **চন্দ্রশেখর** পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল।

২২শে জু। নয় মাস ছুটি লইয়া কাঁটালপাড়া গমন । *

“রাধারানী” এবং “কৃষ্ণকান্তের উইল” রচনা ।

২৩শে সেপ্টেম্বর। “বিদ্যুৎ” দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ ।

কার্তিক ও অগ্রহায়ণ । বঙ্গদর্শনে “রাধারানী” প্রকাশ ।

অগ্রহায়ণ । বঙ্গদর্শনে “রজনী” খণ্ড চইল ।

রাধারানী পুস্তকাকারে প্রকাশিত চইল ।

১৮৭৬—পৌষ । বঙ্গদর্শনে “কৃষ্ণকান্তের উইল” আরম্ভ ।

২রা ফেব্রুয়ারি । **কমলাকান্তের দপ্তর** পুস্তক-

কারে প্রকাশ । চই চাকার চাপা চইল ।

১০ই ফেব্রুয়ারি । “তর্গেশনন্দিনী” ষষ্ঠসংস্করণ প্রকাশ, চই চাকার চাপা চটল ।

সম্ভবতঃ এষ্ট নয়মাসের মধ্যে কোনও দিন কলিকাতায় “কলেজ রিইউনিয়নের” দ্বিতীয় অধিবেশন হইয়াছিল । ৮তমমাখ বস্ত্র মহাশয় এবং জীৱন্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় যে অধিবেশনে বক্তৃতাভঙ্গকে প্রথম বর্ণন করেন । ৮তমমাখ বস্ত্র মহাশয় লিখিয়াছেন—“আমি দ্বিতীয় কলেজ রিইউনিয়নের সহকারী সম্পাদক হইয়াছিলাম । সম্পাদক হইয়াছিলেন রাজা গৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর । সম্পাদক মহাশয়ের জ্যেষ্ঠভ্রাতার নরকতৃষ্ণ নামক এসিক উপায়ে দেবতারকার উৎসব হয় । অভ্যাগতদিগের অভ্যর্থনা করিতেছি এমন সময় একটা বিদ্রোহ সভাগৃহে প্রবেশ করিল । অপরকেও যে প্রকারে অভ্যর্থনা করিতেছিলাম বিদ্রোহকেও সেই প্রকারে অভ্যর্থনা করিলাম বটে । কিন্তু তখনই একটু অস্থির হইয়া পড়িলাম । এক বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলাম—কে ? শুনিলাম—বন্ধিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় । আমি পৌড়িয়া গিয়া বলিলাম—আমি জানিতাম না, আপনি বন্ধিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—আর একবার করবর্ধন করিতে পাইব কি ? স্থলর হাসি হাসিতে হাসিতে বন্ধিমবাবু হাত বাড়াইয়া দিলেন । দেখিলাম হাত উষ্ণ । x x x x সে দিন বন্ধিম বাবুর সহিত আমার অধিক কথাবার্তা হয় নাই । কিন্তু সম্ভার পর রাজা গৌরীন্দ্রমোহনের মূর্তিনাম রাখাদি (babbleaux vivants) দেখিবার সময় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—আপনি আপনার কোন্ উপন্যাসখানিকের সর্বোৎকৃষ্ট মনে করেন ? জ্ঞানবান্ তিত্তা না করিয়া কিছুমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া, তিনি বলিয়াছিলেন—“বিদ্যুৎ” । তখন চন্দ্রশেখর পর্য্যন্ত লিখিত হইয়াছিল ।”—“বঙ্গবৎসল বন্ধিমচন্দ্র” প্রবন্ধ, প্রবীণ ১ম ভাগ, ২১৬ পৃঃ

জীৱন্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় লিখিয়াছেন—“সেদিন লোকের আকর্ষণ পূজাপাশ জীৱন্ত গৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয়ের নিয়ন্ত্রণে তাঁহাদের নরকতৃষ্ণে কলেজ-রিইউনিয়ন নামক

মার্চ । ছুটিশেষে হুগলিতে বঙ্গলি কাঁটালপাড় হটতে
গমনাগমন । •

মিলন-সভা বসিয়াছিল । ঠিক কতদিনের কথা ভাল স্মরণ নাই, কিন্তু আমি তখন বালক
ছিলাম । সেদিন সেখানে আমার অপরিচিত বস্ত্রের নশ্বরী লোকের সমাগম হইয়াছিল ।
সেই বৃহৎসংখ্যক মধ্যে একটি ক্ষুদ্র দীর্ঘকায় উচ্চল কোঁচকপ্রকৃতিযুগ্ম গুপ্তশারী শ্রীত পুরুষ
চাপকাম পরিহিত বন্ধের উপর হুই হুই আসক্ত করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন । সেদিনআমাজেই যেন
উদ্ভাসিত সকলের হটতে স্বতন্ত্র এবং আকর্ষণমণ্ডিত বলিয়া লোক হইল । আর সকলে জন-
তার অংশ, কেবল তিনি যেন একাকী একজন । সেদিন আর কাছারো পরিচয় জানি-
বার জন্য আমার কোনও রূপ প্রয়াস হয় নাই, কিন্তু উদ্ভাসিত দেখিয়া তৎক্ষণাৎ আমি এবং
আমার একটি আত্মীয় একসঙ্গেই কোঁচকলী হইয়া উঠিলাম । সন্ধান লইয়া জানিলাম
তিনিই আমাদের বহুদিনের অভিলষিত-দর্শন লোকবিশ্রুত বন্ধিমবাবু । নতুন মাঝে প্রথম
দর্শনেই উদ্ভার মুগ্ধসীমিত অভিভাব প্রণয়তা এবং বলিষ্ঠতা এবং সর্বলোক হটতে উদ্ভার
একটি সূক্ষ্ম স্বাভাব্য্যভাব আমার মনে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল । x x x x সেই উৎসব
উপলক্ষে একটি ঘরে একজন সংস্কৃত পণ্ডিত সেনাত্তরামমূলক স্বরচিত সংস্কৃত শ্লোক পাঠ
এবং তাহার ব্যাখ্যা করিতেছিলেন । বন্ধিম একপ্রান্তে দাঁড়াইয়া শুনিতেছিলেন । পণ্ডিত
মহাশয় সহসা একটি শ্লোকে পণ্ডিত ভারতমহাদেবকে লক্ষ্য করিয়া একটা অত্যন্ত দেকলে
পণ্ডিতী নসিকতা প্রয়োগ করিলেন, সে রাস কিঞ্চিৎ বীভৎস হইয়া উঠিল । বন্ধিম তৎক্ষণাৎ
একান্ত সন্তুষ্ট হইয়া দক্ষিণ করতলে মূখের নিম্নার্দ্ধ ঢাকিয়া পার্শ্বদর্শী হার দিয়া ক্রান্তবেগে
পলায়ন করিলেন ।—“আধুনিক সাহিত্য”, ১২-১৪ পৃঃ

• এই সময় ৩৮জনাব বহু মহাশয় যাকে যাকৈ কাঁটালপাড়ায় বন্ধিমচন্দ্রের নিকট বাটতেন
প্রথম দিনের কথা তিনি এইরূপ লিখিয়াছেন—“বন্ধিমচন্দ্রের গৃহে, বন্ধিমচন্দ্রের পার্শ্বে বসিয়া
সেই আমার প্রথম আহার । আহার করিলাম—আমর । সকলেই এখন জানেন
বন্ধিমচন্দ্রের শৈশব বাড়ী জেলা ২৪ পরগণার বারাসত মহকুমার অন্তর্গত কাঁটালপাড়
গ্রামে । পূর্ববঙ্গ রেলপথে গমনাগমন কালে অনেক সে বাড়ী লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন ।
কতক আটম ধরণের, কতক নব্য ধরণের অট্টালিকা ঐ রেলপথের পূর্বদিকে নৈহাটী ষ্টেশন
হটতে ঐ ষ্টেশনের দক্ষিণ দিকস্থিত প্রথম ফটক পর্যন্ত বিস্তৃত । সদর বাড়ীতে বৃহৎ পুষ্কার
দালান ও প্রাঙ্গণ । চুর্গারাম এবং আমি বেলা ৯ ঘটটার সময় পৌঁছিয়া দেখিলাম, সেই
বৃহৎ প্রাঙ্গণে গোবিন্দ অধিকারীর বাজা হটতেছে । x x x প্রাঙ্গণে ও পুষ্কার দালানে
বন্ধিমবাবুকে দেখিতে না পাওয়া একজন ভৃত্যকে লিখাসা করিলাম, তিনি কোথায় । ভৃত্য
বাহিরের একটি ছুস গৃহ দেখাইয়া দিল । গৃহটি একতলা, চট্টোপাধ্যায় মহাশয়দিগের
শিবের মন্দিরের দক্ষিণ পার্শ্বে । উহা বন্ধিমবাবুর নিজের বৈষ্ণবানা, ভ্রমর পরিহার
পরিচ্ছন্ন, যেনন আপনি ছিলেন তেমনই । অগায়নের সুবিধার জন্য এবং অপূর্ণ লেখা লিখি-

১৮৮১—১৩ই মাঘ । পিড়বিরোধ ।

২৮শে কেক্রগারি । “সফলী” দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ ।

তথলি হইতে চাওড়ায় বদলি । *

৫ই চৈত্র । বঙ্গবন্দনে “আনন্দবন্ত” আরম্ভ ।

— ২৮শে জুন । “কপালকুণ্ডলা” পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশ ।

আগষ্ট । বেঙ্গল গভর্নমেন্টের অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি হইলেন ।

আশ্বিন । বঙ্গবন্দনে “মুচিরাম গুড়ের জীনচরিত” প্রকাশ ।

১৫ই সেপ্টেম্বর । “মৃণালিনী” ষষ্ঠ সংস্করণ প্রকাশ ।

ডিসেম্বর । “উপকথা” দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ ।

১৮৮২—জানুয়ারি । অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারির পদ উত্তীর্ণা যাওয়াতে

আলিপুরে বদলি ।

৪ঠা কেক্রগারি । “রাজসিংহ” (ছোট) প্রকাশ ।

এপ্রিল । আলিপুর হইতে বারাসতে বদলি ।

জুলাই । বারাসত হইতে যাকপুরে বদলি ।

বঙ্গবন্দনে “আনন্দবন্ত” শেষ ।

“রুকাকান্তের উইল” দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ ।

নভেম্বর । স্টেটসম্যান পত্রে হিন্দুধর্ম লইয়া ছোট্ট সাহেবের সহিত

বসীসুক ।

* সম্ভবতঃ এত সময়ের পর উক্তমাধ্য দাবী আনন্দমঠের পাণ্ডুলিপি প্রদান করিয়া-
ছিলেন । ত্রিষি লিপিগ্ৰহণ—

“বউবাজার ষ্ট্রীটের দে বাড়ীর সম্মুখের খণ্ডে এমন মুখুন্ডী কোম্পানির হোমিওপেথিক
ঔষধের দোকান দেখিতে পাওয়া যায় লিনকনতক ত্রিষি সেই বাড়ীতে ছিলেন । + + +
একদিন বৈকালে সেই বাড়ীতে পেলাম । পশ্চিমবাহু আনন্দমঠের পাণ্ডুলিপি গড়িয়া ওনাইতে
আরম্ভ করিলেন । একটা কাগজ খুব ভাল লাগিতে লাগিল । ইচ্ছা হইল ইংকার নলটা
চাঙে করিয়া বসি । বলিলাম, ‘এমন সময় একজন চাকরকেও দেখিতে পাওয়া যাইতেছে
না ।’ পশ্চিমচন্দ্র তৎক্ষণাৎ পড়া বন্ধ করিয়া উত্তীর্ণা গেলেন । মনে করিলাম যমক খামক
করিতে গেলেন । কিন্তু যে সব কিছু অনিলাম না । পাঁচ সাত মিনিট পরে আশনি তামাক
সাজিয়া কলিকার হু দিষ্টে দিষ্টে আসিয়া বলিলেন—‘পাও’ । আমি বলিলাম, ‘প্রদান
পাইব ।’ তিনি তামাক খাইতে বড় ভাল বাসিতেন, কিন্তু খুব মিঠে তামাক খাইতেন ।—”

“বঙ্গবন্দনে পশ্চিমচন্দ্র ।” প্রদীপ ১ম ভাগ, ১১৮-১২ পৃঃ

১৫ই ডিসেম্বর। **আনন্দমঠ** পুস্তকাকারে প্রকাশিত
হইল। *

- ১৮৮৩—গোস্বামী। বঙ্গদর্শনে “দেবী চৌধুরাণী” আরম্ভ।
জ্যোত্স্না। যাজ্ঞপুত্র হটতে চাওড়ায় বদলি।
১০ই জুন। “ভূগোপনানিনী” নবম সংস্করণ প্রকাশ।
১০শে জুলাই। “আনন্দমঠ” দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ।
২৯শে আগষ্ট। “মৃণালিনী” দশম সংস্করণ প্রকাশ।
১৮৮৪—মাঘ। বঙ্গদর্শন বন্ধ (দেবী চৌধুরাণী অসমাপ্ত)
১০ই ফেব্রুয়ারি। “চন্দ্রশেখর” দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ।
জ্যৈষ্ঠ। এ সময় বা ইতিপূর্বে সানকীভাঙ্গার বাসায় উঠিয়া
আসেন।
১০শে মে। **দেবী-চৌধুরাণী** পুস্তকাকারে প্রকাশিত
হইল।

মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত প্রকাশ।

১লা শ্রাবণ। “নবজীবন” প্রথম সংখ্যায় দ্বন্দ্বত্ব প্রবন্ধাবলি
আরম্ভ।

১৫ই শ্রাবণ। “প্রচার” প্রথম সংখ্যায় “সীতারাম” আরম্ভ।

১৮৮৫—প্রথম গ্রেডে উন্নীত হইলেন। বৈতন ৮০০ হইল।

মার্চ। তিনমাসের ছুটি লইয়া কলিকাতায় রছিলেন, সানকী
ভাঙ্গার বাসায়। +

“আনন্দমঠ” প্রকাশিত হইবার পর ১৮৮৫ চন্দ্র-দেব মহাশয় একদিন বৌদ্ধাজার
জীন্ডের বাসায় গিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ এবং বন্দেমাতরম্ গান সম্বন্ধে আলোচনা
করেন। সে দিনরাত্তি তৎপ্রণীত “আমার জীবন” এর ভাগ ২৩১-২৩৩ পৃষ্ঠায় ব্রূতবা।

পতীশ বাবু লিখিয়াছেন—“আমার বেশ স্মরণ আছে, সাময়িকভাঙ্গার বাড়ীতে একদিন
আমার ভগিনীপতি স্বর্গীয় কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায় মহাশয় বঙ্কিমচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,
“আপনার রচনার মধ্যে আপনি কোন পুস্তকখানিকে ‘শ্রেষ্ঠ মনে করেন?’ তিনি বলিলেন,
“তুমি বল দেখি?” কৃষ্ণধনবাবু হাসিয়া বলিলেন, “আমি বলি না, লিখিয়া রাখিতেছি।
আমি জানিতে চাই আপনার সহিত আমার মতের মিল হয় কি না।” কৃষ্ণধন বাবু লিখিয়া
রাখিলেন; বঙ্কিমচন্দ্র পর যুগে একটুও ভিড়া না করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন,
“কমলাকান্তের দত্তর।” কৃষ্ণধন বাবু কাগজ উন্টাইয়া দেখাইলেন, তাহাতে দেখা গিয়াছে,
কমলাকান্তের দত্তর।” “বঙ্কিমজীবনী”র পরিঃ “বঙ্কিমচন্দ্র” ২৬ পৃঃ

মে । ছুটিশেষে শিনাদে বদলি ।

মেথানে অন্নদিন থাকিয়া তিনমাসের ছুটি লইয়া কলিকাতায় ফিরিলেন, মানকোভাজার বাসায় ।

ছুটিশেষে শিনাদে গেলেন ।

৪ঠা সেপ্টেম্বর । পরিবর্দ্ধিত আকারে “কনলাকান্ত” ছাপানি পীড়ায় দৈনিক অল্পস্বত্ব ।

১৮৮৬—১৫ই এপ্রিল । “আনন্দমঠ” তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ ।

১৫ই জুন । ছোট “ইন্দিরা” চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশ ।

১৫ই জুন । “রাধারাণী” তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ ।

২৫শে জুন । “গুণলাঙ্গুরীয়” দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ ।

মধ্যভাগে । শিনাদে হইতে ভদ্রকে বদলি ।

একমাস ভদ্রকে থাকিয়া হাওড়ায় বদলি হইয়া আসিলেন এবং
জয়নাসের ছুটি লইয়া কলিকাতায় রহিলেন ।

১২ই আগষ্ট । **কৃষ্ণচরিত্র** পুস্তকাকারে প্রকাশ ।

২০শে ডিসেম্বর । “আনন্দমঠ” চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশ, ছুইহাজার
ছাপা হইল ।

১৮৮৭—২৬শে জুলাই । “দেবী চৌধুরাণী” চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশ । *

প্রতাপ চাট্টোয়ার গলিতে নবজীত বাটীতে উঠিয়া আসিলেন ।

ছুটিশেষে নেদিনীপুরে বদলি, তথায় জয়মাস রহিলেন ।

৪ঠা মার্চ । **সীতারাম** পুস্তকাকারে প্রকাশ ।

৪ঠা এপ্রিল । “নিম্বক” ষষ্ঠ সংস্করণ প্রকাশ ।

৭ই জুলাই । **বিবিধ প্রবন্ধ** প্রকাশিত হইল ।

ডিসেম্বর । চারিমাসের ছুটি লইয়া কলিকাতায় আগমন ।

১৮৮৮—১৫ই মার্চ । “জগৎশনস্কিরী” একাদশ সংস্করণ প্রকাশ । †

* লতাশ বাবু লিখিয়াছেন—“এই সংস্করণটা তৃতীয় কি চতুর্থ ভাষা ঠিক বলিতে পারি না ।”—“বঙ্কিমজীবনী” ১১১ পৃঃ

† “১৮৮৮ খ্রষ্টাব্দে পণন জগৎশনস্কিরীর একাদশ সংস্করণ মুদ্রিত হইয়া গৃহে আসিল, তখন বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছিলেন—‘এই পুস্তকখানির লোকের যত নিম্মা করিগ্য়ছে তত আর কোনও পুস্তকের করে নাই, তাই এ পুস্তকের বিক্রী বেশী ।’ লতাশবাবুর “বঙ্কিমজীবনী”—শেষপৃষ্ঠা ।

এপ্রিল। ছুটিশেষে আলিপুরে বদলি।

১৭ই মে। ধর্মতত্ত্ব পুস্তকাকারে প্রকাশ, দুই চাকার
চাপা হইল।

২৫শে ডিসেম্বর। “কপালকুণ্ডলা” সপ্তম সংস্করণ এবং “দেবী
চৌধুরাণী” পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশ।

৩১শে ডিসেম্বর। “সীতারাম” দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ।

১৮৯০—২৫শে ফেব্রুয়ারি। “বিষবৃক্ষ” সপ্তম সংস্করণ প্রকাশ।

১৮৯১—৩৭শে জুলাই। “কনলাকাশ” দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ (চৈকি
প্রবন্ধ এ সংস্করণে যোজিত হইল)

১লা অক্টোবর। “কবিতা পুস্তক” দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ
(এবার নান হইল, “গাথপাথ বা কবিতা-পুস্তক”)।
পাঁচশত চাপা হইল।

১৪ই সেপ্টেম্বর। রাজকাগজ হইতে অবসর গ্রহণ।†

* সপ্তাহঃ এই বৎসরের উঃ

ঐযুক্ত কালীনাথ দত্ত তাঁহার

অনেকুলিমিয়াছেন—

“হৃদয়ের অবস্থা পরিদর্শন উপলক্ষে বন্ধিমবাবু একবার আলিপুর হইতে অরুণার অঞ্চলে
আসিয়া উপস্থিত হন। + + + বাইসচাটার ও হাটপাড়ার হুঁচিক ও ভাচাতে অমাত্যের
চুত ব্যক্তির অগ্রসন্ধানান্তে বন্ধিমবাবু সেদিন মধ্যাহ্নে এগারোটার সব রেজিষ্টার দায় কমলা-
পতি ঘোষাল বাহাদুরের বাসায় স্থান আহ্বানাদি করেন। আমি বন্ধিমবাবুর সঙ্গে সেখানে
সাক্ষাৎ করি। ঘোষাল মহাশয়ের নিবাস বন্ধিমবাবুর স্বামীর, কাঁঠালপাড়ায়। উভয়ের
মধ্যে কুটুম্ব সম্বন্ধ আছে। উভয়ের কথাবার্তার মধ্যে জানিতে পারিলাম, বন্ধিমবাবু বাল্য-
কালে কমলাপতি বাবুর নিকট ইংরাজি পড়িতেন। + + + দীর্ঘই পেলন লইয়া কার্য
হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন একগু কথায় হইল। + + + এই ঘোষাল মহাশয়ের বাসায়
বন্ধিমবাবু আস্তে আস্তে বলিয়াছিলেন যে তিনি উত্তিপূর্বে কয়েক বৎসর শুদ্ধ হিন্দীয়া ভাষা
করিয়াছিলেন। দেহটা বড়ই অশুদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল, ইহাকে পরিত্যক্ত করিয়া অগ্রেজন
হওয়ায় আহ্বার সম্বন্ধে একগু প্রত্যাশা করিতে বাধ্য হন। তিনি চিত্তশুদ্ধির জন্য দেহ-
শুদ্ধির অয়োজনীয়তা এবং দেহশুদ্ধির জন্য সাধিক আহ্বারের আবশ্যিকতা উপলব্ধি
করিতেন।”—“বন্ধিনজ্ঞ” প্রবন্ধ। জলাপ ২য় ভাগ, ২৬২—২৬৩ পৃঃ

+ ৬ ঐশ্বর্য বন্ধুদত্তের মহাশয় লিখিয়াছেন—“১৮৯১ অব্দে শ্রীশরৎকালে সীতারামচি
হুঁতে কাঁচি বদলি হইবার সময় বন্ধিমবাবুকে তাঁহার কলিকাতার বাড়ীতে দেখিতে গাষ্ট।

১৮৯২—কাজিমারি । রায় বাহাদুর উপাধি প্রাপ্তি ।

২৫শে মে । "বিলিখ প্রবন্ধ" দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ, পাঁচশত ছাপা হইল ।

১১ই আগষ্ট । "কৃষ্ণচরিত্র" দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ । *

২১শে নভেম্বর । "আনন্দমঠ" পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশ ।

৩০ শে ঐ "কৃষ্ণকান্তের উইল" চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশ ।

১৮৯৩—+ ২৮শে মে । "যুগলাঙ্গুরীয়" পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশ ।

ঐ "স্বাধারানী" চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশ ।

৩১ শে মে । "সজীবনী স্তম্ভ" প্রকাশিত হইল ।

৩০শে জুলাই । ইন্দিরা পরিবর্দ্ধিত আকারে প্রকাশিত হইল ।

১০ই আগষ্ট । রাজসিংহ পরিবর্দ্ধিত আকারে প্রকাশিত হইল ।

অল্পদিন মাত্র তখন তিনি পেন্সন লইয়াছিলেন, পরীর ভাল ছিল না । পূর্বাবস্থাতে বসিয়া ছিলেন । আমি বলিলাম, "আপে বলিতেন পেন্সন লইয়া খুব লিখিব—এখন ?" যুহুঃসিয়া তিনি উত্তর করিলেন—“এখন থকায় চড়ায় হসিনামে লিখিতে পারিলেই আমার হয় । তোমরা দেখ ।” বলিলেন, ‘রমেশকে (জীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত তখন মেদিনীপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট) বলেছি দিন কতক রত্ননাথপুরের বাজুলায় বাস করব, সমুদ্রের হাওয়ায় পরীর দারভে দারে । কিন্তু সেখানে খাবার জলের কষ্ট । বেশ হল, কাঁধি চড়ে তুমি ভাল জাব পাঠাতে পারবে ।’—কিন্তু সেখানে তাঁহার যাওয়া হয় নাট ।”

“বন্ধিমবাসুর এসঙ্গ”—এদীপ ২য় ভাণ্ড, ১৭৪ পৃঃ

* জীযুক্ত কালীনাথ দত্তের সহিত বন্ধিমবাসুর “কৃষ্ণচরিত্র” সম্বন্ধে আলোচনা, ২য় ভাণ্ড এদীপ, “বন্ধিমচন্দ্র” প্রবন্ধ, ২৬৪-২৬৫ পৃষ্ঠায় হইল ।

এ বৎসর কোনও সময়ের উল্লেখ করিয়া ৬মবীমচন্দ্রে সেম মহাশয় লিখিয়াছেন—“এ সময়ে কলিকাতায় একদিন অপরাত্রে ব্রহ্মস্পন্দ বন্ধিম বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম । তিনি আমাকে একটু আন্তরিক স্নেহ করিতেন । তাঁহার আদর অভ্যর্থনায় কথা আর কি বলিব ? তাঁহার সঙ্গে নামা বিবরের আলোচনা হইল । সর্বশেষে সাপ্তাহিক ব্রহ্মস্পদের অগুরু সমালোচনা ও বিজ্ঞাপনের কল্যাণে বঙ্গসাহিত্যের বর্তমান হ্রস্বভার কথা উঠিল । আমি বলিলাম—‘আপনি বঙ্গসাহিত্যের একঘেটে সরস্বতীকে বটভদ্রার ধলা কাদা ও পৃথিবী হইতে উদ্ধার করিয়া এবং সোমেটে করিয়া অমল শুভ্রবর্ণেও

কার্তিক । নেপাল হইতে কোনও সন্ন্যাসীর আগমন ও পূজার্থ
বন্ধিমবাবুকে একটি রত্নাকরান । • • •

১৮৯৪—জ্যৈষ্ঠ। সি, আট, ই উপাদি প্রাপ্তি । +

মাঘ । সন্ন্যাসীর পুনরাগমন, “বন্ধিনচন্দ্র, এ তুমিই ডেডে

বহুলা আভরণে সজ্জিত করিয়া শত-শোভা পূর্ণ সহস্রনলে স্থাপিত • করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এখন বঙ্গসাহিত্য আবার সেই ‘কি মজার শনিবার’ ‘হৃদ মজার রবিবার’ সাত্তোড়ার দিকে পড়াইতেছে । আপনি কেনম করিয়া চুপ করিয়া চাহিয়া আছে? তিনি তিস্তাবৃত্ত বিনয় মুখে বলিলেন—“নাতি ! পড়াইতেছে কেন, পড়াইয়াছে বল । মতাই আনরা যে সটতলা হইতে তুলিয়াছিলেন, বঙ্গসাহিত্য আবার সেই সটতলায় দিয়াছে । কিন্তু কি করিব ?” আমি বলিলাম—“আপনি এখনও জীবিত, আপনার মানসিক শক্তি ও প্রতিভা এখনও পূর্ণ প্রতিভায়িত এবং বঙ্গসাহিত্যে আপনার একাদিপতা এখনও অপ্রতিহত । আপনি আবার বঙ্গদর্শনের পত্রিকা গ্রহণ করুন, আর আনরা আপনাকে বেটন করিয়া সেই পতাকার ছায়ায় ঈড়ো । আপনি একবার আনাকে বলিয়াছিলেন, যদি আনরা সাহায্য করি আপনি একখানি চারতলবর্গের প্রকৃত ইতিহাস বঙ্গদর্শনের মত পঞ্চমঃ মাসে মাসে লিখিবেন । আপনি মডেল ছাড়িয়া এ গুরুতর কার্যটিতে ততী হ’ন । আপনি ভিন্ন উচ্চ আর কাহারও দ্বারা হইবে না ।” তিনি কিঞ্চিৎ তিস্তা করিয়া বলিলেন—“তাহা পারি যদি তোমরাও কোনর সাহায্য ঈড়ো । আমি এখন বুঝিতেছি যে বঙ্গদর্শন বন্ধ করিয়া অখ্যাত কার্য্য করিয়াছিলেন । তুমি আর একদিন আসিও । এ বিষয়ে ভাল করিয়া পরামর্শ করিয়া একটা কর্তব্য স্থির করিব” + + + আমি বিষয় চটবার সময় ছাবার বলিলাম—“তুমি আর একবার আসিও । তোমার ঐ অলঙ্কৃত উৎসাহে আনরা বুড়া হাডেও বিভ্রাৎমকর করে । আর একবার সকল বিষয় পরামর্শ করিয়া কার্য্যক্ষেপে অগমর হইব ।”—বঙ্গসাহিত্যের দে হুদিন আর হইল না ।”—“আবার জীবন”, স্বর্গভাষ, ১৭৫-১৭৭ পৃঃ

* দিব্যত পিবরণ শ্রীশ বাবু “বন্ধিম জীবনী” পুস্তকে : ১০-১০৮ পৃষ্ঠায় উইয়া ।

+ ৬-জ্যৈষ্ঠ বন্ধমদার মহাশয় লিখিয়াছেন—“তাঁহার স্বর্গারোহণের বৎসর সত্বেতী পূজার বিসর্জন দিনে বীরভূম হইতে তাঁহাকে বেণিতে আনিয়াছিলেন । শৈলেশচন্দ্র আবার সঙ্গে ছিলেন । তখন জানিতাম না যে ইহজীবনে সেই শৈল সাফাৎ । রাজ-সিংহের নুতন সংস্করণের কথা তুলিয়া বন্ধিম বাবু বলিয়াছিলেন, তাঁহানু মতে তাহাই তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ উপগ্রাস এবং তুলনাথ বাবুও তাঁহাকে তাহাই বলিয়াছিলেন, কিন্তু সাধারণে বোধ হয় তাহা বুঝিতেছে না । স্নেহের শৈল চিত্তবিরূপ একমণ্ড পুস্তক উপহার দিয়া ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন যেম একটা সমালোচনা করি । আমারও দে বাসনা হইয়াছিল কিন্তু আক্ষেপের বিষয় সমগ্যভাবে নিজে আমি তাহা পূর্ণ করিতে পারি নাই । তবে সাধুনার কথা এই উপকৃত পুস্তক বানি পাঠ করিয়াই যোগ্যতর

বেতে হবে তা কি বিদ্বত হয়েছ” কখন ও দ্বারে
অর্গলবদ্ধ করিয়া তিন ঘণ্টা কাল গোপনে আলাপ ।
ফেত্রাদারি । বহুমুখ্য রোগবৃদ্ধি, শয্যাগ্ৰহণ । ক্রমে মৃত্যুনালীতে
ফোটক দেখা দিল ।

২৫শে চৈত্র । বাকুলোধ হইল, কিন্তু সজ্ঞান অবস্থা ।

২৬ চৈত্র, রবিবার, বেলা ৩টা ২৩ মিনিট । দেহান্ত ।

সমালোচক “সাদনায়” তাঁহার যথাযোগ্য আলোচনা করিয়াছিলেন । বন্ধিম বাবু তখন
অজ্ঞান শয্যাতে, সম্ভবতঃ পড়িতে পারেন নাই । এইখানে বলা ভাল যে মতবিরোধী
সমালোচনা তাঁহার ঐতিহাসিক ছিল না, এ বিষয় তাঁহার কাছে অতি বড় লাঞ্চিত্য
অথবা বন্ধুবান্ধবলোর কোনও মূল্য ছিল না । তাঁহার বন্ধুগণ সকলেই তাহা জানিতেন ।

“আমি বিদায় হইবার কিছু পূর্বে বন্ধিম বাবু বলিলেন “আবার কিছু লিখব লিখব
ভাবছি—কি লিখি বলতঃ” আমি একটু হাসিয়া উপস্থাপন লিখিতে বলিলাম । বন্ধিম
বাবু বুঝিলেন যে তাঁহার বর্ণনালোচনার চেয়ে কাব্যালোচনার আমি তখনও পক্ষপাতী ।
হাসিয়া উত্তর দিলেন, “আমিও তাই ভিন্ন করেছি, এবার একটা বৈদিক কালের স্ত্রী
চরিত্র অঁকিব, ঐ লেন খাতা বেঁধেছি ।”—আমি না যে খাতার তাঁহার অমর লেখনী
স্পর্শ হইয়াছিল কি না ।—“বন্ধিম বাবুর এসজ”—প্রণীত ২য় ভাগ, ১৭৫ পৃঃ

উৎসর্গিত পুষ্প ।

ভায় আমি নহি' শুক, নহি' গন্ধহীন,
সরস, সুরতি-ভরা, নদর, নবীন,
কুটিছে কণক আভা, স্থললিত কায়,
উথলে বিমল শোভা মুখের প্রভায়,
দেবতার পায়ে শুধু, ফণিকের তরে
অর্পণ করেছে বলে লবেনা ক মোরে ?
তাহাবীর পুত বক্ষে দিতে বিসর্জন
আনিয়াছে তাই এত করিয়া যতন !
এখনও চন্দন লেগা ললাটে ধরিয়া
অপূর্ণ সাধনা-সাধ কাদে গুমরিয়া !

ঐশীলা দেবী ।

নূরজাহান ।

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

সংসারভাগী উদাসীন সন্ন্যাসী দেক সেদিন চিত্তির শুভাশীর্ষাদের ফলে জাহাঙ্গীরের জন্ম হয় ; আকবর সাহের পরিত্যক্ত দিশাল ভারত সাম্রাজ্যের রত্নসিংহাসনে বসিয়াও তাঁহার সমগ্র জীবন সুখে গায় নাই, জীবনাপর্যাঞ্চে চিরজীবনের কাননার ধন মেহেরের প্রেতবন্ধের অকলতলে, নিরাপদ মেহনীড়ের মধ্যে, নিশ্চিত জীবনযাত্রা নির্বাহ করিবার দিন যখন সমাগত, নহুগ্যবৃদ্ধির অনদিগনা কোন্ দুরাস্তর হইতে লোকান্তরের রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ার্থ তাঁহার আহ্বান আসিল—উদাসীনের আশীর্বাদবলে হাত রাজমন্ডনের উদাসীনের হৃদয় পণপাশেই পার্শ্ববনয়ন চিরদিনের জন্ত মুদ্রিত হইয়া গেল ।

যে গেল সে ত বাঁচিয়াই গেল, অন্ততঃ পক্ষে আমরা ভাবি যে সে বাঁচিয়া গেল । যে জন্মান্তর মানে না তাহার নিকট এই রঙ্গমঞ্চেই শেষ অভিনয়ের স্থান, এ সংসারের সুখদুঃখের অভিনয় শেষ হইয়া গেলেই তাহার কাছে চিরনিবৃত্তি, আর জন্ম নাই, স্মরণঃ রোগ নাই, জরা নাই, মৃত্যু নাই, এইবার যে নিবেশপাত হইয়া গেল আর চক্ষু মেলিতে হইবে না, আর পিতা-পুত্র, স্বশুর-জামাতা, ভ্রাতা-ভগিনী সাজিয়া রঙ্গমঞ্চে চড়িয়া দশের তৃপ্তি অতৃপ্তির অপেক্ষায় প্রাণপণে অভিনয়ের উদ্বন করিতে হইবে না । এই পঞ্চভূতাম্বক দেহ যে দিন ভস্মীভূত কিংবা প্রোণিত করা হইল বা জলে ভাসাইয়া দেওয়া হইল, সেই হইতে চিরকালের জন্ত চিরনিবৃত্তির মহামোহনতার মধ্যে চিরনির্ব্বাণ পাইলাম—দেহাতিরিক্ত দেহী নাই, স্মরণঃ দেহান্তর প্রাপ্তিজন্ম পুনরায় জন্ম, যৌবন, জরার যাতনা আর পীড়া জন্মাইতে পারিবে না । বাহারা বিমল বিপুল বুদ্ধিবলে দেহাতিরিক্ত দেহীর সবা স্বীকার করিয়া লোক-লোকান্তর ও জন্ম-জন্মান্তরের কল্পনা করিয়াছেন তাঁহারা এই পার্শ্ব-দেহের নাশের সঙ্গে দেহীর নাশ স্বীকার করেন না—তাঁহাদের মতে ইহজন্মের লীলা খেলার শেষ হইলেই সব শেষ হইল না, ইহার পরেও জন্ম হইবে, মৃত্যু হইবে,—কতবার হইবে, কত সুখ, কত দুঃখ, আবার ভোগ করিতে হইবে ; এইরূপ লোক লোকান্তরে জন্মজন্মান্তর পরিগ্রহ করিতে করিতে একদিন এক শুভ মাহেন্দ্র মুহূর্ত আসিবে যখন জন্মমৃত্যু, জরাব্যাদি, সুখশোক সকলের হাত হইতে

অব্যাহতি দাত করিয়া জীবের এক আনন্দময় সবা বাতীত আর কিছুই থাকিবে না এবং সেই আনন্দলাভই জীবের পরম পুরুষার্গ। জানি না ইহা সত্য কি না, জানিবার কোন উপায়ও নাই—হয়ত সত্য, হয়ত বা সত্য নহে, কেবল চিরন্তন চুপক্ৰিষ্ট ধরণীর অক্ষম উপায়হীন নরনারীর শাস্তি ও সাহসের জন্ত মরণপরবশ বুদ্ধিমানের উদ্ভাবনী কল্পনার আশাবলি—যে আশাকে অবলম্বন করিয়া আমরা এ ধরার চুপনয় দিনগুলিকে বুক দিয়া ঠেলিয়া সরাইয়া ফেলিতে চাই, চুপথের পরে স্বপ্ন আছে এই ভাবিয়া বর্তমানকে বহনীয় ও সহনীয় করিবার উদ্দেশ্যের মধ্যে কোনমতে বাঁচিয়া থাকি ; কিন্তু হায়, প্রিয়জনের সত্তা শোক কোন সাহসনা কি মানে ? গোলাস্তরে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া স্বপ্নে আছে এট আশ্বাস নববৈধব্যের অসহ যদণার কোন উপশম কি করিতে পারে ! যার দেহের সেবা আমার দিনের কাজ, যার মনের আনন্দ-বিধান আমার দৈনিক জীবনের তপস্চরণ, আমার জিলোক যে একটিমাত্র লোকের মধ্যে সংহত হইয়া আসিয়াছে, সেই আমার একমাত্রের অভাবে যে সর্ব অভাব সন্নিবিষ্ট হয়, জীবন যে ভর্তুকি হইয়া উঠে, কোন আশা, কোন আশ্বাস, কোন সাহসনাই যে বিয়োগবিধুরার আকুল অশ্রুজোতে বাগির বাধ ও বাধিয়া দিতে পারে না ! জাঁহাপনা জাহাঙ্গীরের জীবনীকার অবসান হইয়াছে, রাজ্যের দীনতন জনের দিনও যেমন চলিতেছিল সেইরূপই চলিতেছে । শূন্য সিংহাসন পূর্ণ করিবার প্রত্যাশায় প্রতিদ্বন্দ্বীর অভাব নাই, এক দিকে দক্ষ রাজকূনার শাজাহান, মন্ত্রী আসক খা ও হুদুদ সেনাপতি মহবতের সহায়তায় রাজ্যদণ্ডের দিকে দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিয়া রাজধানী অভিযুগে সসৈন্যে অভিযান-উত্তত, প্রকাণ্ডে না হউক অপ্রকাণ্ডে রাজ্যের কোন কোন ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তি খজানন্দন ব্লাকির পক্ষপাতী, সুতরাং পরলোকগত রাজাধিরাজের মুখ্য জন্ত শোকাভিকূতের সংখ্যা নখাগ্রে গণনা করিতে পারা যায় । শূন্য সিংহাসন পূর্ণ হইবে এবং হইয়াও ছিল, রাজ্যের চোট বড় সকলেই পক্ষপাত্তি পরিভ্যাগ করিয়া ক্ষমতাপন্নের শরণাপন্ন হইয়াছিল, অশান্তি অরাজকতা দ্বিধা-বন্দ্য যুদ্ধবিগ্ৰহ সব ঘুচিয়া গিয়া, অচিরকাল মধ্যে রাজনৈতিক আকাশে নিরানন্দ শান্তির নিখিল নীলিমা বিরাজিত হইয়াছিল । এক অধীশ্বরের পরিবর্তে আর একজন আসিয়া শাসনদণ্ড ধরিলেন, রাজ্য যেমন চলিতেছিল তেমনই আবার চলিতে লাগিল, কোথাও কোন শূন্য যে ঘটিয়াছিল তাহার চিহ্নমাত্রও রহিল না কেবল এট নিতীর্ণ ভারতসাম্রাজ্যের যিনি একাদীশ্বরী

ভিলেন, যাঁহার রূপা অকুপার উপর সমগ্র সাম্রাজ্যের জীবন গরণ নির্ভর করিত, কেবল তিনিই আজ জীবনাত অবস্থায় অবস্থিত, তাঁহার হৃদয়কেন্দ্রের আনন্দ-পারিজাত আজ চিরদিনের জন্ত শুকাইয়া গিয়াছে, নগনের অগুতবর্ষি আজ হারাইয়া গিয়াছে; দেহমনের অবলম্বনশূন্য হইয়া রাজস্বাক্ষেপী আজ ধরণীর ধূলিতলে লুটাইয়া পড়িয়াছেন। পথপার্শ্বপ্রস্থতা সমুজ্জ্বল কল্লকার শিরোপরি নাগরাজ অনন্তকণা বিস্তার করিয়া আতপতাপ নিবারণ করিয়াছিল; তারপর যে দিন জীবনাপরাক্ষে অন্তরের নিগূঢ় আশা আকাঙ্ক্ষা সব নিসর্জনে দিয়া শেষ দিনের প্রভীকায় বদ্বিবার আগ্রোজন হইবে, সেই দিন মোহেরের জীবনদেবতার প্রেমের আহ্বান তাঁহাকে যোগল রাজখানার মণিময় রাজ-ছত্রতলে ডাকিয়া আনিল—আজ আবার চর দণ্ড সিংহাসন ও হৃদি-সিংহাসনের একাদীক্সর বস্ত্রভূতন প্রিয় দয়িতকে হারাইয়া—রাজরাণী এক ক্ষমিদে কেনন করিয়া কাঙালিনী হইয়াছে, এবং সেই কাঙাল হৃদয়ের আর্তি তাঁহাকে কেনন করিয়া মরণ যাক্সা করাষ্টতেছে তাহা কেনন করিয়া বলিব? সেলিম-মোহেরের প্রণয় কিশোরকিশোরী বা যুবকযুবতীর এক নিনেদের চক্ষের দেখার প্রণয় নহে, প্রণয় দর্শনে উভয়ে উভয়কে ভালবাসিয়াছিল বাটে, কিন্তু প্রণয় জীবনের সেই প্রণয় দর্শনের পরই তাহাদের মিলন সংগটন হয় নাই, বরং নানা বিচিত্র ঘটনার হুইজন জীবনের বিভিন্ন পথে যাত্রা করিয়াছিল; ইহলোকে তাহাদের হৃদয়ের আশা যে কোন দিন পূর্ণ হইবে তাহার কোন সম্ভাবনা কাহারই মনে উদয় হয় নাই। বিভিন্ন প্রকারের অবস্থার মধ্যে জীবনের অধিকাংশ সময় কাটিয়া গিয়াছিল, যখন জীবনাপরাক্ষে সমগ্র জীবনের অপূর্ণ আশা আকাঙ্ক্ষার সংহরণ করিয়া শেষ দিনের জন্ত প্রস্তুত হইবার সময় আসিয়াছে, তাহা ইহ-জীবনে পাওয়া যায় নাই জন্মান্তরে তাহা লাভ করিবার জন্ত তপশ্চরণের যখন সময় আসিয়াছে, জীবনের সেই শাস্তসম্ভায় জীবনাধিকের অপ্রত্যাশিত মিলন লাভ করিয়া কি অপরিমেয় আনন্দের মধ্যে মোহের তাহান নবজীবন গড়িয়া তুলিয়াছিল তাহা সেই জানিত; আবার নির্দয় মৃত্যু যখন সেই প্রাণতুলা প্রিয় দয়িতের জীবন অপহরণ করতঃ মোহেরের ইহলোকের সর্বস্ব কাড়িয়া নিয়া ধূলিতলে তাহার শয়ন বিছাইয়া দিল, মোহেরের সেদিনের অপরিণীত যন্ত্রণা বাক্যমনের অতীত! হৃৎকের উপর চাপ এই যে স্বামীর শেষ মুহূর্তের অন্তিম ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য করিবার শক্তিটুকুও মোহেরের ছিল না। অগচ প্রাণাধিক প্রিয়পতির শেষ-নিদেশ পালনার্থ যন্ত্রচেষ্টা না করিয়া

মেহেরের জ্ঞায় প্রণয়শালিনী পত্নীর উদাসীন থাকারও অসম্ভব । যার মেহের বলে ভারতসাম্রাজ্য মেহেরের পদতলে লুপ্তিত হইত, যাহার অকৃত্রিম প্রণয়ের প্রশ্রয় পাইয়া মেহেরই হিন্দুধর্মের প্রকৃত বাদশাহ হইয়াছিল, সে জাহাঙ্গীর আজ নাই, একমাত্র তাহার অভাবে আজ তাহার প্রেমাপ্রিতা প্রিয়তমার কি ভরদা সমুপস্থিত ! *যে মেহেরের দ্বন্দ্বগত ইচ্ছা ইঙ্গিতে প্রকাশ হইবার পূর্বেই তাহা সম্পন্ন হইয়া যাইত, আজ তাহার রাজস্বাধিকার স্বামি-দেবতার মৃত্যু-মুহূর্তের নির্দয় কার্যে পরিণত করিবার জন্য তাহাকে ব্যাকুল মননে চারিদিকে সহায় খুজিতে হইতেছে—সে সহায়ও মিলিতেছে না ।

ধরণীর অসহায় জীব, অন্তরের মধ্যে অপরিণেয় ঘেহ ও অপরিণীত ভালবাসার পুষ্পাঞ্জলি সঞ্চিত করিয়া একজনের পাদপদ্মে এমনি করিয়া নিঃশেষে ঢালিয়া দিয়া সর্বতোভাবে তাহারই জীবনে জীবন, অদৃষ্টে অদৃষ্ট, এমনি অচ্ছিন্ন বন্ধনে কেন যে বাধিয়া দেয় এবং সেই আশ্রয় এক নিমেষে টুটিয়া গেলে কেন যে এমন নিঃসহায় হইয়া ভুবুজিত হয়—কে বলিয়া দিবে ? কোন্ ঐশ্বর্যকালিক অন্তঃপটে বসিয়া অদৃষ্টে এই রহস্য স্বজন করিতেছেন, মুহূর্তে মুহূর্তে জীবের এই পতন-অভ্যুত্থান ঘটাইয়া বিশ্বব্রহ্মের কি সৌকর্য্য বিধান হইতেছে, অসহায় মানব মানবীর হৃৎসহ জদয়-বেদনার উপর কোন্ দেবতার এ নির্গম অট্টহাস্য, তাহা জানি না—জানি কেবল হঃখ, জানি কেবল একজনের অভাব হইলে, একজনকে না পাইলে, একজনকে পাইয়া হারাইলে, অপরের নিদাক্ষণ যত্না, এবং প্রাণত্যাগের পূর্ব পর্য্যন্ত তিল তিল করিয়া ত্যক্ত । মেহেরের সেই তুহানল আরম্ভ হইয়াছে, প্রতিমুহূর্তে যখন মৃত্যু যাজ্ঞা করিবার দিন আসিয়াছে, প্রিয়তমের একান্ত বিরহে যখন দেহ বহন করিয়া এ পৃথিবীতে জীবিত পাকা হঃসাধা মনে হইতেছে, প্রতি নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে যখন মনে হইতেছে এ “অজপার” কবে শেষ হইবে, সেই সময় স্বামি-নিবেশ নাথায় লইয়া জাহাঙ্গীরের সর্বকনিষ্ঠ সন্তান শারিয়ারকে সাম্রাজ্য দিবার প্রাণপণ চেষ্টা বিধবাকেই করিতে হইতেছে ; এ যে কি ভরোঁগ তাহা যাহার ভূগিতে হইয়াছে সেই জানে, অপরের অস্বভূতি সে অসহ বেদনার যথাযথ পরিমাপ করিতে পারে না ।

(ক্রমশঃ)

শ্রীজগদিস্ত্রনাথ রায় ।

মাসিক-সাহিত্য সমালোচনা ।

নারায়ণ, ফাল্গুন—

“কবিতার কথা” প্রতিভা পত্রিকায় মাঘ মাসে প্রকাশিত হইয়াছে । এবং সম্বন্ধে আমাদেব বক্তব্য পূর্বেই প্রকাশ করিয়াছি । উক্তই গ্রন্থ ‘নারায়ণ’কে নিবেদন বা করিলেই ভাল হইত ।

“ঐক্যবোধ” ঐক্য এবং জননঃ প্রকাশ ; লেখক শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল এ সংখ্যায় কৃষ্ণ-তত্ত্ব ও একতত্ত্বের ভিত্তি নির্দেশ করিয়াছেন ।

“সেকালের স্মৃতি—বাজে কথা” নথি দিয়া ঐশ্বর্যেণ সমাজপতি যে প্রবন্ধ লিপিতেছেন তাহাতে বন্ধনচন্দ্র সম্বন্ধে কয়েকটি কথা লিপিবদ্ধ হইয়াছে । অল্প বক্তব্য বিষয় লইয়া দীর্ঘ রচনা করিতে হইলে যে দোষ অনিবার্য্য তাহাই এই সাতটি পৃষ্ঠায় স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইয়াছে ; যে সব কথা বলিবার কোন প্রয়োজন নাই, লেখক তাহাও বলিতে ছাড়েন নাই । তারপর স্থানে স্থানে অব্যক্তি হইয়াও আপনাত মত প্রকাশ করিয়াছেন । আমরা কিংদংশ উদ্ধৃত করিতেছি :—

(১) “শকুন্তলা বঙ্গবিশ্রুত সমালোচক ও নবীণী আকাম্পন চন্দ্রনাথ বহুর শকুন্তলা-তত্ত্ব : বোধ হয়, না বলিলেও চলিত । কিন্তু এগনকার লেখকেরা ও পাঠক-পাঠিকারা প্রাচীন গ্রন্থকারদের কোনও গ্রন্থই ত প্রায় পড়েন না । এই জন্য এগনকার সাহিত্যের সঙ্গে তগন-কার বিশ পঁচিশ বৎসরের সাহিত্যেরও যেন কোনও প্রাণের যোগ নাই । গত পুস্তকের স্থপতিরা যে বনিয়াদ করিয়াছিলেন, তাহা পড়িয়া আছে ; তাহার উপর শৈশব ও অযাচা জন্মিতেছে । এমন যাহারা পড়িতেছেন, তাহাদের অনেকেই বালির উপর খেলা-ঘরের পতন করিতেছেন ।”

এই কথাগুলি সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ “সাহিত্য”-সম্পাদকের লেখনী-নিঃসৃত না হইলে আমরা হাসিয়া উড়াইয়া দিতাম । মায়ারণ পাঠক-পাঠিকারা সব গ্রন্থ না পড়িতে পারেন, কিন্তু লেখক প্রাচীন গ্রন্থকারদের কোন গ্রন্থই ত প্রায় পড়েন না এ কথাটা লেখকের বিজ্ঞতার পরিচায়ক নয় । “শকুন্তলাতত্ত্ব” সকলে না পড়িতে পারেন, বন্ধনবাগুর উপস্থাপ পড়েন নাই এমন লেখক ত দেখিতে পাই না । লেখকের মতে চন্দ্রনাথ যদি প্রাচীন গ্রন্থকার হন, তাহা হইলে বন্ধনচন্দ্রও তাই । বন্ধনচন্দ্রের লেখা ও সেই সব প্রাচীন গ্রন্থকারগণ যাহারা বঙ্গ-সাহিত্যের ভিত্তি নির্মাণ করিয়াছিলেন তাহাদের রচনা পাঠ করিয়াই যখন লেখকেরা বালির উপর খেলাঘরের পতন করিতেছেন, তখন বুঝিতে হইবে লেখকের অজ্ঞানটি ঠিক হয় নাই । প্রাচীন সাহিত্য পঠনের উপর আধুনিক সাহিত্যের প্রকৃতি নির্ভর করিতে পারে না । সাহিত্য নির্ভর করে মাতৃগণের উপর ; বিশ বৎসর পূর্বের মনুষ্য সমাজের সহিত আধুনিক সমাজের পার্থক্য থাকিলে সাহিত্যের প্রকৃতির ভিন্নতা অনিবার্য্য ।

(২) “সর্বত্র কাণই আমাদের অনেকের একমাত্র প্রমাণ বটে । কবিতার ও কথাই

নাই। তবে তাহা সম্ভব হওয়া চাই। যাহা কাণের জগৎই করা হয়, কাণ পণ্ডাই যাহার প্রতিশ্রুতি যাহার স্থিতি, এবং কাণেই যাহার চরম পরিণতি বা জীবমুক্তি তাহা কাণ ভিন্ন আগের অপেক্ষা করিবে না। তবে একটা কথা মনে রাখিলে মনে হয় না,—আমরা সকলেই বহিঃকর্ণের কাণ লইয়া জগৎগ্রহণ করি নাই। আমাদের কাণ, বহিঃকর্ণের কাণের অপেক্ষা একটু দীর্ঘ। তবে কুণ্ঠ-দীর্ঘ জ্ঞানও অথবা বিবর্তা নিজেই ওজনে দুনিয়ায় দান করিয়া থাকেন। তাহা না হইলে, এই কয়টা কথা বলবার জগৎ স্থান নষ্ট করিতাম না।”

এই অপ্রাসঙ্গিক কথাগুলির শেষোপে ভাবের অশ্লষ্টতা ও প্রকাশের অক্ষমতা কতদূর তাহা পাঠক সহজেই বুঝিতে পারিবেন।

“যোগী” শীঘ্র অবশেষে জৈনমুখালা দাম ওস্তা অনেকগুলি দার্শনিক কথা বলিয়াছেন। রতনায় লেনিকার ত্রিশাশক্তির ও কবিবৈদ্যের পরিচয় পণ্ডিত্য যাহ। ভাণাটি প্রাচীন ও মনোরম।

“বর্তমান হিন্দুধর্মের দেববাদ ও দেবোপাসনা” শীঘ্র অবশেষে জৈনবিদ্যাগ্রাণাল বলিতেছেন—“পূজা অর্জুনের একটা ঐশ্বর্যালিক প্রভাব আছে অর্থাৎ প্রত্যেক কাম্যাকারণ সম্বন্ধ ব্যতীত ইহার দ্বারা কোনও বিশিষ্ট কল লাভ করা যায়। দেবোপাসনার এই ঐশ্বর্যালিক দিক ছাড়া একটা রসের এবং কাব্যের দিকও আছে। আমাদের প্রচলিত ক্রিয়াকাণ্ডের এই ঐশ্বর্যালিক দিকটা নষ্ট করিতেই হইবে। না করিলে ধর্মের সত্য মন্ত্র এবং সাধনের সঞ্জীৱনী শক্তি কোনও দিনই ভাল করিয়া ফুটিয়া উঠিতে পারিবে না। কিন্তু এই সকল পূজা অর্জুনের বাহ্য ও অল্যক ঐশ্বর্যালিক প্রভাব নষ্ট করিতে নাহি উচ্চতর আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার বাধ্যনা ও রূপকল্পে এই সকল দেবদেবীর করুণা আমাদের দেশের ভক্তিসাধনের বাস্তবকে আশ্রয় করিয়াই যে ক্রমে ক্রমে সাধক-সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল, এই কথাটাও জুলিয়া গেলে চলিবে না। আমরা এই সুখে বালক-বৃদ্ধ কিংবা শিকিভ অশিকিভ নির্বিশেষে সকলেই যে এই সকল পুরাতন পৌরাণিকী রূপকের আশ্রয়ে শ্রেষ্ঠ ভক্তিসাধন করিতে পারিল, এমনটাও বলা যায় না। কিন্তু কাহারই পক্ষে এগুলি ভক্তিসাধনের সাহায্য হইতে পারে এমন কথাই বা বলিতে পারি কি? বিরোধের ও প্রতিবাদের পূর্বে প্রয়োজন আর নাই; ভাঙ্গার কাজ প্রায় শেষ হইয়াছে; এখন গড়িতে আরম্ভ করা আবশ্যক। আর এই গড়া নিত্যান্ত পন্থাভি-কার্যাপন্ন অথবা একান্ত ননগড়া হইলে চলিবে না। দেশের নৃতন সমবয়স সাধন করিতে হইবে।” বিপিনবাবু এই সব কথাই কোন দিকান্তের উল্লেখ না করিলেও তাহার উক্তিগুলি অনেক ভাবিবার জিনিস উপস্থাপিত করে।

“বৌদ্ধ-বর্ধ” জৈনপ্রদাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের রচনা। এ সংখ্যায় বৌদ্ধধর্ম কোথা হইতে আসিল ও প্রস্তার নীমাংসা আছে।

ভারতবর্ষ, ফাল্গুন—

“পোরা” ঐতিহ্যশ্রীলাল রায়ের কবিতা—বহুত, প্রাণম্পর্শী। একটু উদ্ধৃত করি,—

ও কে প্রেমে মাতোয়ারা চোখে বহে ধারা

কৈদে কৈদে মাতা কেন তাই ?

দব ঘেদ হিংসা ছুটি আসি পড়ে লুটি
ও তার গুলি মাথা ছুটি রাজা পায়।
* * * * *
ও কে যায় নেচে নেচে আপনার বেড়ে
পথে পথে শুধু প্রেম ঘেড়ে ঘেড়ে,
ও কে দেবতা-ভিখারী মানবহুয়ারে
দেখে যারে তোরা দেখে যা।”

জন শিবিল হইলেও কবিতাটির মধ্যে এমন একটি ভুল আছে যাহা সহজেই পাঠককে মুগ্ধ করে। জন ভাবান্তর।

এই গানটি ‘ভারতবর্ষে’ মুদ্রিত হওয়ায় আমরা প্রথম দেখিলাম এমন নড়ে মনে হইতেছে যেন ইতিপূর্বে “মিসল” বৈকুণ্ঠে ইহা আমরা শুনিয়াছি। আমাদের স্মৃতিশক্তি আমাদেরকে প্রত্যাহিত করিতেছে কিনা তাহা ভারতবর্ষের অভিজ্ঞাবকগণ বলিতে পারেন।

‘মেঘ-বিদ্যা’ শীর্ষক প্রবন্ধে জীআদীখর ঘটক পনার কয়েকটি বচনের বিজ্ঞা-সম্মত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পনার বচনের মধ্যে যে বৈজ্ঞানিক সত্য বিহিত আছে লেখক তাহা টানিয়া বাহির করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

জীকামিনীকান্ত মিথোপীত “আবির্ভাব” কবিতাটিতে জন ও ভাষার মাপুর্বা আছে। জনের কবিতার আবির্ভাবে যে পরিবর্তন সংঘটিত হয়, কবিত ভাষায় এখানে তাহা ব্যক্ত হইয়াছে।

“ব্যবহারিক ও প্রাতিভাসিক জগৎ” শীর্ষক প্রবন্ধে ত্রিবেদী মহাশয় বলিতেছেন—
ব্যবহারিক জগৎ অর্থাৎ কাজ-তালান জগৎ বস্তুগত। একটা নিয়মবদ্ধ জগৎ হইয়া পড়াইয়াছে।
উহাকে আমরা প্রাণের দ্বায়ে নিয়মবদ্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছি এবং সেই নিয়মের অনুগত।
সীকান করিয়া চলিতেছি। ব্যবহারিক জগৎ যেন একপান। Drama—উহার একটা Plot
আছে, একটা end আছে, গোড়ায় একটা design আছে,—সকলের পর অক্ষ, একটা উদ্দেশ্য
purpose লইয়া আসে,—কেহই মিতর্কক আসে না। আর প্রাতিভাসিক জগৎ প্রত্যেকের
perceptual world প্রত্যেকের প্রত্যক্ষলব্ধ জগৎ প্রত্যেকের immediate perception-এর
উপলব্ধ জগৎ। প্রাতিভাসিক জগৎ যেন একটা Epic poem ঘটনাবল,—বিচিত্র—
উজ্জ্বল। এই পার্থক্য মনে রাখিয়া চলিলে জগতের অনেকগুলি ছেয়ালি নৃতনভাবে নৃতরূপে
দেখা গাইতে পারে, অনেক বিস্তার অবসান হইতে পারে।” বীহারী মাধুনিক সমস্যা
লইয়া আন্দোলন করিতেছেন তাহাদের দৃষ্টি আমরা এই প্রবন্ধের দিকে আকর্ষণ করিতে
চাই।

প্রবাসী, ফাল্গুন—

শ্রীহরেন্দ্রনাথ দাস গুপ্তের “শিক্ষার আদর্শ” পাঠ করিয়া যে সারসংগ্রহ করিয়াছি তাহা
নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল—মাত্রদকে যথার্থভাবে মাপুন হইতে হইবে, এই শিক্ষাটা আর এমন

চরম উপায় বলিয়া গ্রহণ করা হয় না, বরং সমস্ত শিক্ষা বাণ্যেরটাকেই কেবলমাত্র ধনাগমের ও তৎকাল্পকীয় অস্ত্রাস্ত্র ভ্রমোগে বিশেষের উপায় বলিয়া গণ্য করা হয়। জীবনের প্রথম হইতেই নির্দোষ স্বাভাবিক প্রকৃতিগুলিকে জোর করিয়া এমন ভাবে পর্ক করা হয়, যে ক্রমশঃই বালকের সে প্রকৃতিগুলি শুকাইয়া আসিতে থাকে। বিশ্ব তাহাকে আপনায় মনীষী কবি করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, তাই তাহার অন্তরের প্রত্যেক তন্ত্রীটি সহজভাবে বিশ্বের অন্তরে রাপিত হইতে কল্পিত হইয়া উঠিতেছে। মানুষ যখন আপনায় নিজের রূপে চলিতে থাকে তখনই বিশ্বের সমস্ত রস সার্থক হয়। তাই তেলেবেলা হইতেই একদিকে যেমন তাহার প্রকৃতিগুলিকে স্বতন্ত্র ও সহজভাবে প্রস্তুতিত হইবার অবসর দিতে হইবে, আর একদিকে তেমনি বিশ্বের সঙ্গে তাহাকে সম্পূর্ণভাবে সংযুক্ত ও সংযুক্ত করিয়া তুলিতে হইবে। বিশ্ব প্রকৃতির সহিত এই মিলন-সংযোগ ও পোষন-বন্ধনটুকু জারিত করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য। যে শিক্ষায় জ্ঞানই বাড়িয়া যায় কিন্তু রসবাক্য তাহার অন্তর্গত করিতে পারে না, সে শিক্ষা যেমন শুষ্ক ও সাহসিন্দ্রী, যাহাতে রসই বাড়িয়া চলে কিন্তু জ্ঞান তাহার সঙ্গে বাড়ে না, সে শিক্ষাও ত্রুটি। লেখক শিক্ষাকে মানুষের স্বভাবের উপযোগী করিতে চান। আধুনিক শিক্ষার নিয়ম এই ভাবে প্রস্তুতিত হওয়া উচিত। লেখকের বক্তব্য প্রকাশ করিবার রীতি ভাল নয়। ভাব প্রকাশ করিবার জন্য একটা কষ্টকর চেষ্টা রচনায় অনেক স্থলে প্রকাশ পাইয়াছে।

ঐক্যবদ্ধ বনোপাখ্যায়ের “গুণী” খণ্ডটিতে একটি ভক্ত তাত্ত্বিক ও একটি চতুর বাঙ্গালীর কার্যকলাপ ও মনস্তত্ত্ব লইয়া কতকটা হাস্যরসের অবতারণা করিবার চেষ্টা পরিলক্ষিত হইয়াছে। হাস্যরসটি অনেক স্থলে ছাফাখামীর রূপান্তর হইয়া পড়িয়াছে।

“সীতাপাঠের উপসংহারে” জীবিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিতেছেন—সীতা পাঠ করিলে বেশ মুগ্ধিতে পারা যায় ঐক্য শব্দের ভিতরকার অর্থ জীবাত্মার প্রিয়তম পরমাত্মা, অর্জুন শব্দের ভিতরের অর্থ পরমাত্মার প্রিয়তম জীবাত্মা; যজ্ঞাভিষ্ঠান শব্দের ভিতরের অর্থ লোকহিতকর কার্যের অস্তিত্ব।

অর্জুন বাতীত অর্থাৎ পরমাত্মার পরম ভক্ত বাতীত ঐক্যের (অর্থাৎ প্রেমময় পরমাত্মার) নূর উপদেশবাহী কে বা পোনে—কে বা গ্রাহ করে?

“আমাদের দেশের পূর্বতম ব্রহ্মজ্ঞ আচার্য্যেরা যাহাকে বলিয়াছেন “নকল সত্য” তাহার নকল চাক দিবার জন্য পাশ্চাত্য আতিথিরের আনোপদেশের। তাহার নাম দিয়াছেন “আপেক্ষিক সত্য” (relative truth) পক্ষান্তরে, পূর্বোক্ত ব্রহ্মজ্ঞ আচার্য্যেরা যাহাকে বলেন “অন্যন সত্য”—সেই একমাত্র অদ্বিতীয় অখণ্ড সত্য শেখোক্ত আনোপদেশের মতে তাই সত্য। ইহার। বলেন পরিপূর্ণ অখণ্ড সত্য অজ্ঞেয়, হৃতরাং তাহা কাহারও কোনো উপকারে আসিতে পারে না। আপেক্ষিক সত্যকে যে কাজে লাগাও সেই কাজেই লাগে—আপেক্ষিক সত্যই কাজের সত্য। তেমনি আমার ব্রহ্মবাদী আচার্য্যেরা যাহাকে বলেন পরমার্থ অর্থাৎ পরম সত্য—অজ্ঞেয়বাদী আনোপদেশের মতে তাহা ছাই অর্থ। ইহাদের মতে কোনো রূপার অর্থই কাজের অর্থ।

প্রবন্ধের শেষভাগে লেখক বলিয়াছেন “অধ্যাত্মবিদ্যার অংশীলনের কৃপাট এবং অধ্যাত্ম-

যোগের অর্থতানের কপাট দশন যুগপৎ উল্লসিত হইবে, তখন অদুনাতনকালের বৈজ্ঞানিক ইঞ্জিনালকে ছাপাইয়া উত্তীর্ণা পৃথিবীতেলে আরো কত যে পরমাণুগা মাকলিক বাপার সকলের নিগূঢ় কপাট সকল খুলিয়া গাইবে, তাহা একপে বিদ্যা-ব্রহ্মশ্রুতিবিশেষ ঘাঘনের অঘোরে ।"

কথাগুলি সাময়িক আলোচনার উপযোগী বলিয়া আমরা এখানে উদ্ধৃত করিলাম ।

"মুক্ত" ও "ধর্ম" জীবনীপ্রনাথ ঠাকুরের দুইটি কবিতা । নবিসাবুর আধুনিক কবিতার মধ্যে অনেকগুলি ভাষার মত ও তর্ক প্রচার করিতে এতই ব্যস্ত যে সে গুলির মধ্যে কবিতা নুজিয়া পাওয়া কঠিন । এই সমস্ত কবিতার অন্তর্গত স্বল্প দার্শনিক তত্ত্বটি ক্রমশঃ স্পষ্টকৈ নিঃশেষ করিয়া ফেলিতেছে ।

সবুজপত্র, ফাল্গুন—

"জীবলাস" জীবনীপ্রনাথ ঠাকুরের পক্ষ ; নবিসাবুর ইদানীং সবুজপত্রে যে পক্ষগুলি লিখিতেছেন সে গুলি স্বতন্ত্র হইলেও তাহাদের মধ্য দিয়া একটি কপাট সূত্র বর্তমান রহিয়াছে । সব পক্ষগুলি না পড়িলে কোন একটি বিশেষ পক্ষের ভাবটুকু নিঃশেষে গ্রহণ করা যায় না । বাস্তবতা ভাষায় এ ধরণের রচনা নূতন । এই পক্ষটীতে দামিনী ও শশীশের চিত্র দুটি মনোহর হইয়াছে । যে মনস্তত্ত্বের কথা বিস্তৃত হইয়াছে তাহা অটল, ভেট পক্ষের মধ্যে তাহা স্থম্পষ্ট করিতে লেখক অসাধারণ শক্তির পরিচয় দিয়াছেন । ইহার মধ্যে সরল মাথুর্গ্য নাই । লেখকের বিচার শক্তি ও রচনাতত্ত্বী পাঠকের চিত্র এই অটল পক্ষের প্রতি উদ্যমীন হইলেও তাহাকে জোর করিয়া টানিয়া আনে । জীবলাসের উপাদেশ চরিত্র অল্প কথায় বেশ সুউজ্জ্বল উঠিয়াছে । দামিনীর প্রতি জীবলাসের যে অকৃত্রিম প্রেমের টান ছিল, নানা কথায় নানা সাবহারে তাহার অভিন্ন জীবলাস করে নাই ; উপযুক্ত মুহূর্ত্তে যে করুণী কথা বলিলে সব বলা হয় জীবলাস তাহাই বলিয়াছে । শশীশের প্রতি পূর্ব্ব প্রণয়-পালিঙ্গী বিধবা দামিনীকে বহুতরপে গ্রহণ করা জীবলাসের ভালবাসার গভীরতা ও তাহার নিষ্ঠুর চরিত্রবলের পরিচায়ক । সমাজ জোর করিয়া বমাজ্জ্বল উপর আবহমান কাল যে দুঃখ দিয়া আসিতেছে তাহার বিরুদ্ধে বিজ্ঞোহ করা যে রুদ্রওবীরীন যত্নোৎসর্গ কর্তব্য নহে । জীবলাস তাহার ভয়লেশহীন কর্তব্যের ঘরোয়া স্পষ্ট পরিচয় দিয়াছে—যে তাহার যে রুদ্রও ছিল এবং জব্বলকে সমাজের হাড় কাঠে বল দেওয়াই চরম পুরুষার্থ নহে । সংসারে জহুদজ্বল করিলে অনেক জীবলাস পাওয়া যায় কিন্তু দামিনীর একান্ত অসম্ভাব । সংসারে দামিনী যদি পাওয়া গাইত তবে বৃক্কের মধ্যে আগুণ আলিয়া সংসারের জীব এমন দগে দগে পুড়িয়া মরিত না । আপাত দর্শনে মনে হয় দামিনী চঞ্চলচিত্ত, শশীশকে প্রাণপণে ভালবাসিয়া পরিণয়ে জীবলাসকে স্বামিহে বরণ কখন করিয়া করিল । জীবলাসকে বিবাহ না করিয়া দামিনী আমরণ শশীশের প্রতি অত্যাশ্রয় শ্রুতিমাত্র সম্বল করিয়া তাহার অনান্ত ভক্তি ও প্রেমের চরিত্র দুঃখভার বহন করতঃ যদি এবারের মত সাননপাত করিয়া দিতে পারিত,

তবে ক্ৰম তত্ত্বা কাহারও কাহারও মনে দামিনীর চরিত্র আদর্শ চরিত্র বলিয়া পূজা পাইবার সোপা হইত। কিন্তু আশাদের মতে বর্তমান ঘটনাবলী ঐবিলাসকে বিনাশ করিতে সম্মত হওয়া দামিনীর পক্ষে অজ্ঞাত কার্য্য বলিয়া মনে হয় না। শতীশকে নানা ভাবে বহুদিন ধরিয়া প্রেম জ্ঞাপন করিয়া দামিনী কোন প্রতিদান পায় নাই কেবল তাহাই নহে—শতীশ দামিনীকে অবজ্ঞার সহিত প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, তাহার প্রেমের পূজা লইতে কোন একায়ে স্বীকৃত হয় নাই। দামিনী যখন কেবল শতীশের সেবা করিবার অগ্রমতি চাহিয়াছে সে আদেশও শতীশ দেয় নাই উপরন্তু দামিনী হইতে দূরে থাকিবার ইচ্ছা শতীশ স্পষ্টে স্পষ্টে নানা ভাবে প্রকাশ করিয়াছে। মারী জনদের প্রের্ত্তমান শতীশের পদতলে উৎসর্গ করিবার অল্প বাস্কুলমনে যখন দামিনী শতীশের নিকট উপপাতিকা হইয়া ধাঁড়াইল, তখন ঐবিলাস যে দামিনীকে কতদামি ভাসবানে এবং সে ভাসবান যে কত অকৃত্রিম তাহা দেখিবার দামিনীর সময় ছিল না; শতীশ কর্তৃক প্রত্যাখ্যান হইয়া দামিনী যখন তাহার চতুর্দিকে চাহিয়া দেখিবার সময় ও অবসর পাইল, তখন স্বরভাষী ঐবিলাসের হৃৎকীরণ যৌন প্রেমের প্রতি তাহার দৃষ্টি আকর্ষিত হইল। অনাবৃত্ত প্রেমের বেদনার মারীজনয় পীড়িত হওয়া স্বাভাবিক এবং সেই সময় কাহারও নিকট হইতে সত্য প্রেমের আশ্বাস পাইলে তাহা পরম উপদেশ বলিয়াই মনে হয়। ঐবিলাসের নিকট হইতে বিনাহের প্রস্তাব পাইয়া যখন দামিনী তাহাতে সম্মতি দিগাহিল, তখন সম্মতান করিবার অল্প শতীশকে নিমন্ত্রণ করিবার কথা ঐবিলাসকে সে বলে এবং শতীশ যখন আনন্দের সহিত সম্মতান করিতে সম্মত হয়, তখন দামিনী নিঃশব্দেই বুঝিল যে শতীশকে সে কোন দিনই পাইবার আশা করিতে পারে না। যদি করে তবে তাহা দুঃখ। অপরিস্রব প্রণয়শালিনী শুক্লী হৃৎকীরণ অস্বাভিক অকৃত্রিম প্রেম প্রত্যাখ্যান করিতে পারে সে দেবতা হয় হউক, এ হৃৎ-হৃৎ-মন-প্রদান-প্রের্ত্ত-প্রের্ত্ত-পরিপূর্ণ ধরলীর মানব যে নহে, হৃৎকীরণ মাননী দামিনী মনুষ্যধর্ম্মবিশিষ্ট একান্ত প্রণয়নী ঐবিলাসের অস্বাভিক প্রেমালিঙ্গনের মধ্যে নিজকে বধুরূপে ধরা দিয়া ঐবিলাসের একমিষ্ট প্রেমের প্রতিদান দিয়াছে এবং যথার্থ প্রেমের আদান প্রদানে উভয়ের তৃপ্তি জনয় সে তৃপ্তি লাভ করিয়াছিল তাহা দামিনীর যুগ্ম জন্য দীর্ঘস্থায়ী না হইলেও ঐবিলাস ও দামিনী উভয়েরই বার্থ জীবন তাহাতে বার্থক হইয়াছে। ঐবিলাসের বধু হইতে অধীকার করিয়া দামিনী যদি তাহার অনাবৃত্ত প্রেমের হৃৎকীরণ শ্রুতি লইয়া জীবন কাটাইতে বসিত এবং ঐবিলাসের অপরিস্রব প্রেমের প্রতি অনাদর দেখাইয়া তাহার জীবনও নষ্ট করিয়া দিত, তবে মানবকৃত স্ত্রীদম্যাজের কথা বলিতে পারি না, এই বিবশস্তির অগ্ররালে যে মহাপ্রক্তি সর্গ কার্য্যকারণের বিদ্যতা, তাহার আদেশ লক্ষ্যন জনিত মহাপাপ দামিনীকে স্পর্শ করিত এবং একান্ত চরমাসিত ঐবিলাসের হত্যার অপরাধে সে স্বপ্নের নিকট বাগী হইত। রবীন্দ্রবাবুর লেখনী অগ্রযুক্ত হউক, তিনি বহুদম্যাজে দামিনীর হত্যা করিয়া বাইতে পারিলে তাহার দৈনন্দিকি সফল হইবে এবং অনেক ঐবিলাসের বার্থ জীবন বার্থক হইতে পারিবে।

“দুই মারী” ঐরনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা। কবি উর্দুনাও লক্ষীতে মারীকে দুই রূপ দেয়াইয়াছেন।

একজন তপোভিক্ষ করি
উচ্চ-হাস্যে অগ্নিরসে কাস্তুরের সুরাপাত্র ভরি’
নিম্নে যায় প্রাণমন হরি,
হৃদাতে উড়ায়ে তারে বনস্তের পুষ্কিত এলাপে,
রাগরক্ত কিংস্রকে খোলাপে,
নিজাঙ্গীন ঘোবনের পানে
অরি জন ফিরাইয়া আনে
অশ্রু শিশির স্রবনে স্নিগ্ধ বাসনায়,
হেমস্তের হেমকান্ত সকল শান্তির পূর্ণতায় :
ফিরাইয়া আনে
নিমিলের আলীর্ণাস পানে।
অফেল লাবণ্যের শ্রিতহাস্যে শুভায় মগুর।
ফিরাইয়া আনে নীরে জীবন যুতায়
পবিত্র সঙ্গমভীর্ণতীরে
অনন্তের পূজার মন্দিরে।

এ শুধু মারীর কথা নয়, একুতির—একুতিরও দুই দিক—এক দিকে ভোগ, আর এক দিকে নিগুতি। একদিকে ঘোবনের পানে, আর একদিকে অনন্তের পূজার মন্দির। কবিতার ছন্দ ও ভাষা মনোহারা।

ঐপ্রমথ চৌধুরীর “অভিভাবন” উত্তর বঙ্গ সাহিত্য-দন্দিলমে পণ্ডিত হইয়াছিল। লেখক শিক্ষা এবং সাহিত্য সম্বন্ধে decontaminationএর পক্ষপাতী। বাঙ্গালা দেশে জাতীয় সভ্যসমিতি স্বতন্ত্রভাবে উন্নতি লাভ করিয়া সংসার বতাই বাড়িয়া উঠুক না কেন তাহাতে তিনি কোন ক্ষতি দেখিতে পান না। অনেকে মনে করেন এদেশবাসীরা উদার স্বদেশ-বাসীদের প্রতিবন্ধক কেননা তাহারা সংকীর্ণ, লেখক বলেন এই সংকীর্ণ মনোভাবই উদার মনোভাবের ভিত্তি। যে স্থলে কোন অংশের প্রতি জীতি নাই, সে স্থলে সমগ্রের প্রতি ভক্তির মূল কোথায় তাহা তিনি খুঁজিয়া পান না। তাহার মতে কোন একটি আচা পরি-যদের শাসনাধীন থাকিলে আদেশিক পরিষদগুলি সম্যক ক্ষুণ্ণিত লাভ করিতে পারিবে না।

এই কথাগুলি আমরা কিন্তু গ্রহণ করিতে পারি না। শাসন সম্যক ক্ষুণ্ণিত প্রতিবন্ধক নয়। সম্যক ক্ষুণ্ণিত জন্য কোন-না-কোন প্রকার শাসন নিত্য প্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে। আদেশিক পরিষদগুলি কোন আচা পরিষদের কঠোর নিয়মাবলী হইয়া ক্ষুণ্ণিত লাভ না করিতে পারে, কিন্তু তাহাদের যে কোন-না-কোন প্রকার শাসনের অধীনে থাকিতে হইবে একথা অস্বীকার করা চলে না। অংশের প্রতি জীতি সমগ্রের প্রতি ভক্তির মূল নয়। প্রথমে সমগ্রের প্রতি দৃষ্টি পড়ে, তারপর আমরা অংশের প্রতি আকৃষ্ট হই। আমরা প্রথমে Sentence বলি, তারপর শব্দের

এতি আকুই হই। শিশু এখানে অনেকের সহিত বস্তু কর, পরে বুঝিতে পারে, কোন বিশিষ্ট লোকের সহিত তাহার সম্পর্ক অধিক—তাঁহার এতি তাহার ভালবাসা তখনই প্রকাশ হয় তবে Sentence বলিবার পূর্বে শব্দ শিক্ষা করা বা অনেককে ভালবাসিবার পূর্বে এক জনকে ভালবাসা প্রয়োজনীয় হয়, তাহা শুধু Sentence বলিবার জন্য বা অনেককে ভালবাসিবার জন্য একটি শব্দজ্ঞান বা একজনের এতি প্রকৃত ভালবাসা পরেই হইয়া থাকে। গোড়াতেই যদি শব্দের এতি আকুই হওয়া যায়, বা একজনের এতি ভালবাসাকেই প্রায় দেওয়া হয় তাহা হইলে Sentence বলা বা উদার মনোভাব লাভ করা দুঃসাধ্য, এমন কি অসাধ্যও হইতে পারে। প্রদেশবাংসলাকে প্রায় দিলে উদার স্বদেশবাংসলা নিশ্চয়ই প্রতিহত হইবে।

ভাষাবন্ধে লেখক বলিতে চান—“আমরা যে লেখায় মৌলিক ভাষার পক্ষপাতী তাহার কারণ আমাদের বিদ্যাস, আমাদের মাতৃভাষা রূপে ঘোবনে তথাকথিত সাধুভাষা অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ।”

তারপর তিনি সাধুভাষার ইতিবৃত্ত প্রকাশ করিয়াছেন। “বঙ্গোপাঙ্গী প্রাচীন সাহিত্য আছে—কিন্তু সে সাহিত্য গদ্যে রচিত, খন্দো নয়। আজ প্রায় একশ বৎসর পূর্বে আমাদের গদ্য-সাহিত্য জন্মলাভ করে—এ সাহিত্য জাতীয় মন হইতে গড়িয়া উঠে নাই,—ইংরাজ রাজপুত্রদের ফরমায়েসে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ কর্তৃক নিত্যত অথচ ইহা পঠিত হইয়াছিল।”

এ কথাটা আমরা মানিয়া লইতে পারিলাম না। পুরাকালে কোন সাহিত্য-গ্রন্থ লিখিতে হইলে সকলেই সংস্কৃত ভাষার ব্যবহার করিতেন। জগদেব, কুলুকট্ট বঙ্গদেশের লোক হইয়াও সংস্কৃত ভাষায় গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে অনেকের রচনায় সংস্কৃতবহুল ভাষা দেখিতে পাওয়া যায়। বাঙ্গালা ভাষার সহিত সংস্কৃত ভাষার সম্পর্ক বড় কম নয়। কাজেই বাঙ্গালা ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিতে হইলে তাহাতে সংস্কৃত ভাষার বাহুলা থাকিবে এ কথা নিঃসন্দেহে অস্বীকার করা যায়। সাধু ভাষা ইংরাজ রাজপুত্রদের ফরমায়েসে পঠিত হয় নাই। সাধুভাষার ইতিবৃত্ত দেখিতে হইলে যত্নাভ্যাস তর্কালঙ্কারে ভাড়াইয়া আরও পিছনে যাইতে হইবে। পোশাকী ভাষা প্রাচীন কবিদের রচনায় বহুল পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। বাঙ্গালার পোশাকী ও আটপহরে ভাষা বহুদিন হইতে ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিয়া আসিতেছে। এখন তাহাদের মিলন সংঘটিত হইয়াছে ও হইতেছে। ইংরাজি ভাষারও কতকটা শক্তি এই মিলিতভাষার উপর প্রযুক্ত হইয়াছে। কথিত ও লিখিত ভাষার মধ্যে কতকটা প্রভেদ তিরকালই থাকিবে। বর্তমান বাঙ্গালা ভাষা যে কথিত ভাষা নয় তাহা পূর্ববর্তী অদর্শমানীয় লেখকদিগের রচনা হইতে আধুনিক লেখকদিগের রচনার ক্রমোন্নতি দেখিলেই বুঝা যায়। কথিত ভাষা লিপিত ভাষাকে রূপান্তরিত করে সত্য; কিন্তু লিপিত ভাষার শক্তিও কথিত ভাষার উপর স্পষ্ট হইয়া পড়ে। আধুনিক ভাষা যে শুধু কথিত ভাষায়ই পরিণতি হইবে এ কথা লেখক বলুন, আমরা বলিতে পারি না।

উপসংহারে লেখক বলিতেছেন—বাঙ্গালী জাতির জগৎয় রপ আছে, তবে যে আমাদের

সাধারণ-সাহিত্য যথোচিত নদ ও শক্তি ছইতে বঞ্চিত তাহার জন্য দোষী আমাদের পরীক্ষা। আমরা ইংরাজী ভাষায়, ইংরাজী সাহিত্যে শিক্ষিত ছই, অগতঃ ইংরাজী জীবনের সহিত আমাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বুঝে থাকুক, সাক্ষ্য-পরিচয়ও নাই, কাজেই সে শিক্ষার দৌলতে আমরা সক্ষম করি শুণু কথা। আমরা concreto এর জ্ঞান হারাই এবং তাহার পরিবর্তে পাই শুণু abstraction, শুণু abstraction লইয়া কাজ করি বলিয়াই আমাদের লেখায় না আছে দেখ, না আছে শ্রাব। আমাদের চতুষ্পার্শ্ব realityর প্রতি মনোযোগ দিলে সত্য এই abstraction-এর দাব্য ছইতে মুক্তিলাভ করিত। অহুত্বই সকল জ্ঞানের মূল।

পরীক্ষা ব্যতীত কোন সত্তারই সম্যক পরিচয় পাওয়া যায় না। এ যুগে জুল-কলেজে আমরাই পরীক্ষিত ছই, কিছুই পরীক্ষা করিতে শিনি না। ধর্ম, নীতি, নীতি, আচার, ব্যবহার, সমাজের মন, নিজের মন,—এই সকল বিষয়ই সাহিত্যের বিচারমাগে পরীক্ষা দিতে বাধ্য ছইবো। এ বিচার কেবল বর্ণনে বিভ্রান্তে নয়, নাটকে নভেলে ছইবে।

এতি জীবন্ত ভাষায়ই একটা নিজস্ব গঠন আছে, নিজস্ব ছন্দ আছে। দেই পঠন সক্ষম না করিতে পারিলে আমাদের গদ্য স্বচ্ছন্দ হয় না।

ভাষার ছায় ভাবও রচনা করিতে হয়। আমাদের ভিত্তগ্রস্ত স্বভাবই বিক্ষিপ্ত :—যাহা বিক্ষিপ্ত তাহাকেই সংক্ষিপ্ত করা সাহিত্যের কাজ। মনের ভিত্ত যাহা অস্পষ্ট তাহাকে স্পষ্ট করা, যাহা নিরাকার তাহাকে সাকার করাই আর্টের ধর্ম। এই সব কথাগুলি সবুজ পদ্যের পাঠকদের অবদিত না থাকিলেও আমরা পুনরুৎপন্ন করিবার কেননা কথাগুলি সত্য ও বিশেষরূপে আলোচনার যোগ্য।

"এবার" ও "আবার" দুইটি কবিতা সনাতনভাষার রচিত। ছুটিতেই প্রথমে প্রকৃতি তার পর আত্মার, প্রথমে স্বাভাবিক, তারপর অনন্তের অহুত্বের কথা আছে। কবিতা কবিতা-এতিয়া এখানে ক্ষুটিয়া উঠিয়াছে। তবে "আবার" কবিতাটি অস্পষ্ট।

সার্থক দান।

ক্ষুদ্র হলেও তুচ্ছ নয় সে

স্নেহের প্রেমের স্রীতির দান,

নিঃস্ব যদিও বদ্ধ তোমার

মিথ্যা নয় গো প্রাণের টান ;

শিউলি ফুলের মিধ গন্ধে

উষায় পরাণ সরস হয়,

বৃক্ষেরা ধন শ্রেষ্ঠ দান সে

ব্যর্থ নয় গো ব্যর্থ নয়।

শ্রীমুকুন্দপ্রসাদ সিংহ।

সাহিত্য সমাচার ।

বিজ্ঞানার্চ্যা অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী, এম, এ, এফ, সি, এস, প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ দ্বারা মহাশয়ের কর্তৃক প্রণীত “আয়ুর্বেদ ও নব্য-রসায়ন” ও বৈজ্ঞানিক জীবনী” নামক দুইখানি বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ প্রকাশিত হইল ।

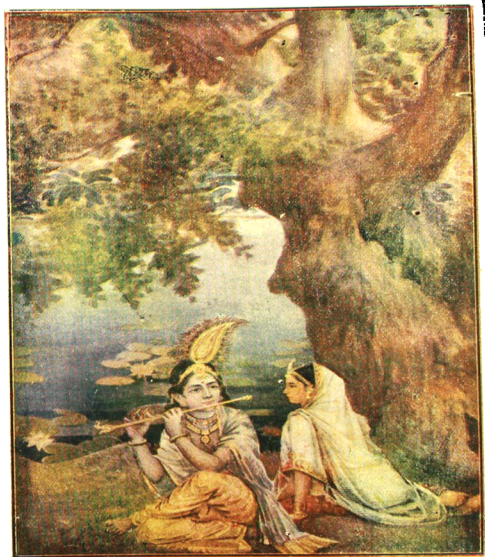
শ্রীযুক্ত হর্ষাকুনার সোম মহাশয়ের “মধুমালতী” নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে ।

শ্রীযুক্ত প্রভাতকুনার নৃপোপাধ্যায় মহাশয়ের “গঙ্গাজলি”র দ্বিতীয় সংস্করণ শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে ।

শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের “বাক্সালার ইতিহাস” এই নামেই প্রকাশিত হইবে ।

শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুনার রায় মহাশয়ের “কৈসার অস্ত্র-পুত্র-রহস্য” শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে ।

শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ঘোষের “স্মৃতি” নামক কবিতাপুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে ।



ନିହତ-ନିମନ

[ଚିତ୍ରକର, ଶ୍ରୀ ଉଦୟାନନ୍ଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ]

মানসী

৭ম বর্ষ
১ম খণ্ড

বৈশাখ ১৩২২ সাল

১ম খণ্ড
৩য় সংখ্যা

কাব্যে অলঙ্কার-শাস্ত্রের নিয়মের প্রয়োজনীয়তা । *

বর্ষার সপ্তাহব্যাপী অবিশ্রান্ত জলধারাবর্ষণে নদ, নদী, কূপ, তড়াগ, খাল বিল সমস্ত ভরিয়া এক চইয়া গিয়াছে ; জলের গতি নাই, স্রোত নাই, তরঙ্গ নাই, জল-নির্গমনের পথ নাই । সপ্তাহব্যাপী উদ্দাম ভীষণ প্রবল ঝড়বাতের ভয়-তরু, তরুশাখা, লতা, গুল্ম, তাছাদিগের ফল, পুষ্প, পত্র, কাণ্ড ও ভয় গুল-রাশির নানা অবস্থাবে সেই হ্রির নিশ্চল জলরাশি আরও নিশ্চল চইয়া পড়িয়াছে । গিরিগাত ও উচ্চভূমি দৌত করিয়া বর্ষার জল নানা প্রাণের মনমত, সুত প্রাণীত পুষ্প, শোণিত, বস্মা, মক্ষা ও দূষিত আবর্জনারাশি দ্বারা সেই জলরাশিকে ফেনিল, পঙ্কিল নলিন করিয়া ফেলে, অপূত জলপ্রণালী উচ্ছ্বসিত চইয়া উৎকণ্ঠ নলিন জলে জলরাশিকে পুতিগন্ধি করিয়া তুলে । সুতরাং এই জল পানে, স্নানে, আচমনে নানাবিধ ভূষ্টিকিৎসা রোগের সৃষ্টি করিবে, সন্দেহ নাই । এই জন্য বহিঃভেদে এইরূপ হ্রির ধীর আবদ্ধ জলের প্রশংসা নাই । আবাস যখন জল জমিতে থাকে, তখন উচ্চ চইতে যে পথে সে পথে যেদিকে সেদিকে বাহির নিম্নভূমিতে গড়িয়া যায় ; ক্রমে কীর্ণধারায় বহিয়া নদ, নদী, খাল, বিবে, খাইয়া নিশে । নিম্নভূমিতে বাধা পাইলে সেই স্থানের পরাধি আবর্জনার সহিত পড়িয়া

* উত্তরপত্র সাহিত্য-সম্মিলনের রাজমালায় চব্বিশবেশনে প্রদত্ত ।

বিসম চূর্ণাকের সৃষ্টি করে, বাষ্পাকারে শুল্বে উপিত হইয়া বিস্তৃত বায়ুকে দূষিত করে ও সেই চটে জলের অংশ ভূগর্ভে প্রবাহিত হইয়া পাতের জলে মিশিয়া পানীয় জল নষ্ট করে। আমরা স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের সহায়তায় এই সকল তরু বৃক্ষিতে পারি, বৃক্ষিমা জলের এই স্বাতন্ত্র্য, জলের যদৃচ্ছাচারিতা নষ্ট করি। যাচাতে জল মানবের স্বাস্থ্য বিনষ্ট না করে, তাহার জন্য সতর্কতা অবলম্বন করি, জলের গতিক নিয়মিত করি, দূষিত জলকে সত্বরতার সহিত দূরে অপসারিত করি, বিস্তৃত জলকে বিস্তৃত ভূমির মধ্য দিয়া স্রুত প্রবাহিত করিয়া পানীয় জলের সঙ্গে মিশাইয়া দিই, স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের সহায়তায়, জাতিয়া কৃষিবিজ্ঞানের সহায়তায় আবহকতার উপলক্ষি করিয়া স্থাপত্য-বিদ্যার সহায়তায় পূর্ণোক্ত কার্য সম্পন্ন করিতে সমর্থ হই। এই উদাহরণ এবং এইরূপ শত শত উদাহরণ দেখিয়া অবধারিত হইয়াছে যে, উচ্ছৃঙ্খলতায় জগতের উপকার হয় না। প্রভূত তাহা দ্বারা অপ্রতিহত বিপদের আচ্ছান করা হয়, ঘোরতর অনিষ্টের হস্তে আশ্ব-সমর্পণ করা হয়।

মানবের জ্ঞানবৃদ্ধি, স্বথবৃদ্ধি ও ভাংখনিবৃদ্ধির জন্য বিজ্ঞানের উদ্ভাবন। সর্বত্র আমরা এই বিজ্ঞানের প্রভাব দেখিতে পাই। প্রথম বিজ্ঞান উচ্ছৃঙ্খলতা দূরে অপসারণ করে ও শৃঙ্খলা আনয়ন করে। প্রত্যেক বিদ্যায় বিজ্ঞান শৃঙ্খলা আনয়ন করিয়াছে বলিয়া আমরা অল্প সময়ে সে সকল বিদ্যাকে আয়ত্ত করিতে পারিতেছি। পাণিনীর মহাভাষ্যে লিপিত আছে, ব্যাকরণ অধ্যয়ন ভিন্ন যদি কেহ সচস্র বৎসর ভাষা অধ্যয়ন করে, তাহা হইলেও তাহার ভাষায় কোন জ্ঞানই জন্মে না। অর্থ,—ব্যাকরণ চাইতেছে,—ভাষার বিজ্ঞান। ভাষায় যে শৃঙ্খলা আছে,—ব্যাকরণ তাহা বুঝাইয়া দিতেছে। আদি বৈয়াকরণ শব্দ-বিদ্যার তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, তিনি ভাষার গতি, ভাষার প্রকৃতি বৃক্ষিতে পারিয়াছিলেন, শব্দরাশির জাতিভেদ নির্ণয়ে তিনি সমর্থ হইয়াছিলেন, শব্দগত শব্দ শব্দ বিভিন্নতাগুলিও তাহার উজ্জ্বল অঙ্গুলীতে প্রতিভাত হইয়াছিল। এই শ্রেণীভেদের জ্ঞান, এই শৃঙ্খলার উপলক্ষিই আবাদিগকে সেই সেই ভাষার পারদর্শী করিয়া তুলিতেছে। বিজ্ঞান সর্বত্র আছে, শৃঙ্খলা সর্বত্র আছে। তর্কে আছে, দর্শনে আছে, জ্যোতিষে আছে, গণিতে আছে, চিকিৎসায় আছে, চিত্রে আছে, শিল্পে আছে, নৃত্যে আছে, গীতে আছে, বাজে আছে। এমন কি রন্ধনে, ভোজনে, শয়নে, গমনে, উপবেশনে পর্য্যন্ত আছে। ইহার মধ্যে যদি একটিতেও অসুষ্ঠাতার শৃঙ্খলা বাহ্যত হইতেছে বুঝা যায়, তাহা হইলে হয় ত তাহার সেই সেই

দৈন্য, ১৩২২ ।] কাব্যে অলঙ্কার-শাস্ত্রের নিয়মের প্রয়োজনীয়তা ।

বিষয়ে শিক্ষা নাই—অবধারণ করি, নয় ত তাহার মস্তিষ্ক অল্পপ্রকার আক্রান্ত ও অত্যাচারিত হইতেছে, কল্পনা করি ।

সর্বত্র শৃঙ্খলার সন্ধান, সর্বত্র বিজ্ঞানের আদিপতা ; কেবল কাব্যে নাই বলিতে পারি কি ? সমস্ত শিল্পের মধ্যে কাব্য যে শ্রেষ্ঠ, সমস্ত গণিতকলার মধ্যে কবিতা যে কবির অপূর্ণ সৃষ্টি । বর্ণ ও রেখার সম্মিলনে চিত্রের পরিশুদ্ধতা, অভিজ্ঞ চিত্রকর দুই একটি রেখাপাতেই যে চিত্রকে জীবন্ত করিতে পারে, স্থান বিশেষে দুই একটি রেখাপাত করিয়াই যে চিত্রে ভাবের অভিব্যক্তি করিতে পারে, ভয় বিস্ময়, উৎসাহ অম্লরাগ, ক্রোধ, হৃদয়, ক্ষোভ ও হাস্য কুটাইতে পারে ; চিত্র বিদ্যা না জানিলে চিত্র বিজ্ঞান না জানিলে চিত্রকরের জড় হস্ত কখনই চিত্রায়-ভাবের আভাস দিতে সমর্থ হয় না । আবার স্বরবিজ্ঞান না জানিলে গায়ক কখনই স্বরের সঙ্গীতী তুলিয়া রাগিনী ও রাগকে মৃতিমান করিয়া দেখাইতে পারে না । এক রাগের সঙ্গে অল্প রাগের অঙ্গ সমাবেশ করিয়া দক্ষ প্রজ্ঞাপতির সৃষ্টি করিয়া ফেলে ।

যে চিত্রবিদ্যার নিদর্শন কাব্যে দেখিতে পাই, রূপকে দেখিতে পাই, পুরাণে দেখিতে পাই, মহাভারতে দেখিতে পাই, রামায়ণে দেখিতে পাই, তপ্তে দেখিতে পাই, বেদে উপনিষদে পর্যন্ত দেখিতে পাই, সে চিত্রবিদ্যা আজ ভারত হইতে অন্তর্হিত । যে সঙ্গীতের মাহাত্ম্য সাক্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া কাব্য নাটকে পর্যন্ত প্রকটিত, সে সঙ্গীত আজ ভারতে মৃতপ্রায় । লানা তারানাতের কণায় আজ কাহারই আস্থা হইত না, যদি বরেন্দ্র-অম্বলকান-সমিতির নেতা শ্রীমান রাজ-কুমারের অর্ঘবৃষ্টি ও যত্ন-সমষ্টিতে, যোগাতন নেতৃত্বের বুদ্ধিচালনায় ভূগত হইতে শত শত প্রস্তর-নির্মিত শ্রীমুষ্টি উৎপাদিত না হইত । আজ বঙ্গ সে ভারবর্ষ কৈ ? আজ কাব্যের বিজ্ঞান-অলঙ্কার শাস্ত্রের আলোচনা না করিয়া সুকণ্ঠ গেক্ষপ ঝুড়ি ঝুড়ি কাব্যের সৃষ্টি করিতেছেন, তাহাতে আশঙ্কা হয়, কাব্যও বঙ্গ-ভাষা হইতে অচিরে অন্তর্ধান করিবে ।

বালকবালিকারাও তৃণকাণ্ডের বা অমূল্যের সহায়তায় ভূমিতে হাতী, গোড়া, কাগা, বগা অঙ্কন করে, তাই বলিয়া বলিব কি ভারতে চিত্রবিদ্যা আছে ? রাধাশ্যামের মাঠে গল্প ছাড়িয়া দিয়া গাছের তলীয় বসিয়া গলা ছাড়িয়া গান গায়, তাই বলিয়া বলিব কি ভারতে আজও সঙ্গীতবিদ্যা অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে ? বিজ্ঞানের কটিপাথরের পরীক্ষায় না টিকিলে তাহাকে আর তাহা বলিব না, কিছুই নয় বলিয়া উপেক্ষা করিব ।

উদ্দেশ্য, লক্ষণ, পরীক্ষা । প্রথমতঃ প্রতিপাত্ত পদার্থের নাম কীর্তন, ইহাকেই উদ্দেশ্য বলে। ইতর বাবস্থক ধর্মের নাম লক্ষণ, পরে সেই পদার্থের লক্ষণ নির্দেশ করিতে হয় । নামতঃ কাক জানি, কাবোর লক্ষণ কি জানা আবশ্যক । কাবোর লক্ষণ কি জানিয়া, কাবা কি, আগে বুঝ ; তারপর কাবা লিখিতে যাও ।

কাবা কি না জানিয়া কাবা লিখিতে যাওয়াও না, প্রতিমা কি, না জানিয়া প্রতিমা নির্মাণে প্রবৃত্ত হওয়াও তাই । কোন এক সময়ে একটি শিক্ষিত ব্যক্তি আমাকে বলিয়াছিলেন,—“চুলিয়া চুলিয়া যাহা পড়া যায় তাহার নাম কাবা ।” আমি বলিয়াছিলাম,—“আমি ইচ্ছা করিলে চুলিয়া চুলিয়া বোধোদয়ও ত পড়িতে পারি তবে কি বোধোদয় কাবা হইবে ?” তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিলেন । আমার আর একটি শিক্ষিত ব্যক্তি বলিয়াছিলেন,—“ছন্দোবদ্ধ বাক্যের নাম কাবা” । আমি বলিলাম,—“ধনার বচন, শুভকরের আর্থ্যাও ত ছন্দে লিখিত, সেগুলি কি কাবা হইবে ?” আর একটি শিক্ষিত ব্যক্তি বলিতে লাগিলেন,—“আপনি কি বলিতেছেন ? কাবা কি পড়িলেই বুঝা যায়, ইহা অজ্ঞ কিছু নয়, ইহা কাবা । কাবোর কোন নির্দিষ্ট লক্ষণ নাই, কোন নির্দিষ্ট লক্ষণ করাও উচিত নয় । করিলে কাবো যে একটি বাপক ভাব আছে, তাহাকে বিদূরিত করা হয় ; তৎপরিবর্তে তাহাতে সঙ্গীর্ণতা আনয়ন করা হয় । আপনাদিগের একটি বৃহৎ দোষ,—আপনারা সর্বত্র এক একটি স্বকপোলকল্পিত লক্ষণের সৃষ্টি করিয়া জিনিসকে একটি গভীর ভিতরে আনয়ন করিয়া তাহাকে ক্ষুদ্রাতি-ক্ষুদ্র করিয়া ফেলেন ; পরে সেই গভীর বাহিরে যাহা পড়িবে, তাহাকে আর সে জিনিস বলিয়া স্বীকার করিতে চাহেন না, তাহাকে বাতিল করিয়া ফেলেন । এই সঙ্গীর্ণতা আনিয়া সংস্কৃত ভাষাকে নষ্ট করিয়াছেন, বাঙ্গালা ভাষাকেও নষ্ট করিতে বসিয়াছেন । দেশ উৎসর্গে গিয়াছে, ভাষার উপরে ব্যাকরণের বাধ, ছন্দের বাধ, আবার অলঙ্কারের বাধ চড়াইতে চাহিতেছেন । বাধে বাধে একেবারে অসাড় করিয়া তুলিতেছেন । আর ভাষাতে জীবন্ত ভাব নাই । আপনারা কোন গভীরগর্ভক জ্ঞানে গড়লিকা প্রবাহে তাহার উপরে চলিয়াছেন । বাঙ্গালীক ও কাশিমীরের ভাষারই কি ভাবের সমাপ্তি হইয়া গিয়াছে ? বন্ধনগুলি সমস্ত ভিঁড়িয়া টুকরা টুকরা করিয়া দূরে ফেলাইয়া দেউন, কাবো কত নূতন নূতন ভাবের সঞ্চয় হইল । কবি-প্রতিভার কত যে নূতন ভাব সৃষ্টিতে পারে কে ধমিতে পারে ? সেইজন্য কাবোর ডেফিনিশন হইতে পারে না । ব্যক্তিগত

বৈশাখ, ১৩২২ ।] কারো অলঙ্কার-শাস্ত্রের নিয়মের প্রয়োজনীয়তা ।

স্বাতন্ত্র্য চাই, প্রত্যেক প্রতিভাবান কবির ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য আছে ও থাকিবে । কবিভায় এই স্বাতন্ত্র্য ফুটাইলে কবিতা চইল, যিনি এই স্বাতন্ত্র্যে বাধা দিতে যাইবেন, তিনি কবিতার শত্রু, কবির শত্রু, সাহিত্যের শত্রু, দেশের শত্রু । তাঁহাকে ও তাঁহার সমালোচনাকে দূরে পরিহার করিতে পারে ; সৌভাগ্য বশতঃ পাশ্চাত্য জগৎ চইতে প্রবল বেগে উদ্ভাবন তরঙ্গ তুলিয়া যে নিম্নাবলি স্রোতঃ দেশে আসিয়াছে, জনকতক লোক আপনারা তাহাকে কখনই বাধা দিতে পারিবেন না ; স্রোতের মুখে আপনারাই ভাসিয়া কোন্ অজানা দেশে গিয়া পড়িবেন । বহুভাবে পরামর্শ দি, বাধা না দিয়া সেই স্রোতে আপনারাও গা ভাসাইয়া চলুন । দেশের মঙ্গল চইবে । ভাষা স্বাধীন ভাবে আপনা আপনি আপনাকে গড়িয়া তুলিবে ।” আমি সেই পাশ্চাত্য স্রোতে গা ভাসাইয়া দিই বা না দিই তাঁহার সেই বহুতার নন্দ্য নৃশি বা না নৃশি আমি কিন্তু তাঁহার সেই বহুতার স্রোতে ভাসিয়া গেলান, আমার আর বলিবার অবসর রহিল না । বৈয়াকরণের মুখে নৈয়ামিকের মুখে চিরদিন শুনিয়া আসিতেছি গো আনয়ন করিয়া বন্ধন কর, পরে অর্থ আনয়ন কর,—বৃদ্ধের এই আদেশে অল্প বৃদ্ধ সেই কার্য্য করিলে বালক গো কি, অর্থ কি বুঝিয়া লয় । একটি গো, একটা অর্থ দেখিয়া গো ও অর্থের লক্ষণ স্থির করে ও তাহা দ্বারা নিখিল গো ও নিখিল অর্থকে চিনিতে পারে । এক্ষণে বুঝিলাম, এ প্রশ্নাদী ঠিক নয়, ইহা দ্বারা গোকে একটা গভীর ভিতরে আনা হইল, গোতে একটা সঙ্গীর্ণতা আসিল । গরুর ব্যাপক অর্থ ধরিয়া মনুষ্যকেও গরুর মধ্যে ফেলিলে মনুষ্যেরও মনুষ্যত্ব বৃদ্ধি ও ব্যাপকত্ব সিদ্ধি হয় সন্দেহ নাই ।

ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যের উল্লেখ আমার একটা গল্প মনে পড়িল । একটা ঘেসে কয়েকটা বালকের সঙ্গে একটা শিকক থাকিতেন । পাচক ব্রাহ্মণ অল্পস্থ হইয়াছে, বালকেরাই রন্ধন করিতে গিয়াছে । বর্ষাকাল, বাহিরে থাকিয়া খড়্গুণ্ডি ভিজিয়া গিয়াছে, নীচের ঘরে উত্তুন, সেঁত সেঁতে হইয়াছে । বালকেরা বহুকাণ্ডে উত্তুন ধরাইয়া দাইল চাপাইয়া দিয়াছে । কিছুকাল পরে দাইল উথলাইতে আরম্ভ করিলে একটি অভিজ্ঞ বালক সেই উথলান থামাইবার জন্য সেই দাইলে তৈল দিতেছিল, ; শিকক তাহা দেখিয়া হাত তুলিয়া বলিলেন, থবরদার, দাইলে তৈল দিও না, উথলাইতে দেও, ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য ফুটুক, দাইলের স্বাতন্ত্র্যে বাধা দিও না !” মাষ্টার মহাশয়ের আদেশে দাইলে তৈল দেওয়া হইল না, দাইল উথলাইয়া একেবারে উত্তুনটি নিবাইয়া ফেলিল । পরে

বালক ও মাষ্টারের শত চেষ্টায় আর উত্থন ধরিল না, অক্লান্ত অবস্থায় সকলের কুলে শাইতে চাইল । কবির বাকিগত স্বাতন্ত্র্য ও কবিতার সেই প্রতিভা-প্রফুরিত স্বাতন্ত্র্য বাধা না দিলে যদি দাইলের মত যুগপৎ সেই কবি ও কবির উভয়ে উৎলাইয়া সেই বহুপুরাতন দেশে দেশে উত্থনটি একেবারে নিবাইয়া ফেলে আনাদিগের চাইতেছে সেই চিন্তা ।

— স্বাতন্ত্র্য কাহাকে বলে ? স্ব শব্দের অর্থ কি ? স্ব শব্দের অর্থ যদি আত্মা হয়, তাহা হইলে বৃদ্ধিতে পারি, স্বাতন্ত্র্য শব্দের অর্থ আত্মার অধীনতা । তুমি আমি কি আত্মার অধীন ? বলিতে লজ্জা করে,— আনাদিগের প্রভু একটি ছুইটি নয়, অসংখ্য । আমরা এই প্রত্যেক প্রভুর নিকটে মত্তক বিক্রয় করিয়া রাখিয়াছি, কখনোনা কখনো প্রতিজ্ঞা প্রত্যেক প্রভুর চকুন তামিল করিতেছি ; স্ত্রী পুত্রের নিকটেও দাসপত্ন লিখিয়া দিয়াছি । বেতনভোগী ভৃত্য পর্যন্ত আমার প্রভু ; বেতন দিয়া আবার তাহারই অধীন হইয়া রহিয়াছি । আমার দেহে বাস করিয়া উদ্ভাস উদ্ভূত ইন্দ্রিয়নিচয় যে আমার উপরে প্রভু করিতেছে, একান্ততঃ আমাকে অধীন করিয়া ফেলিয়াছে, সে বিষয়ে কি মুহূর্ত্তের জঙ্কণ আমি চিন্তা করিতে পারি ? ইন্দ্রিয়দাস আমি কি করিয়া বলিব,— আমার স্বাতন্ত্র্য আছে ? স্বাতন্ত্র্য স্বাতন্ত্র্য যে বলিতেছি, সে আর কিছুই নয়, আত্মাকে একেবারে বিলুপ্ত করিয়া সেই স্থানে ইন্দ্রিয়ের আসন পাতিয়াছি । ভোগলিপ্সা চরিতার্থতাকেই স্বাতন্ত্র্য নাম দেওয়া হইয়াছে ।

সংঘনের কথাখাত ভিন্ন ইন্দ্রিয়ের শাসন হয় না, ইহার দমন হয় না । অসংঘনে ইন্দ্রিয়ের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পায় । স্ববিদ্যার সংঘনের অভ্যাসে ইন্দ্রিয়দমনের ব্যবস্থা করিয়াছেন ; স্ববিদ্যার ব্যবস্থা না মানিয়া এখনও যাহারা শতবার পরীক্ষাদ্বারা কর্তব্যের অবধারণা করিতেছেন, আবার তাহা হইতে মন ফল উৎপন্ন হয় দেখিয়া তাহার বর্জন করিতেছেন, সেই অসংঘনী ভোগবিলাসে একান্ত প্রবৃত্ত সেই সমাজের অত্মকরণ ও অত্মসরণ করা একান্ত অকর্তব্য । কোন কোন বিষয়ে ঠাহাদিগের সর্ব্বতোভাবে উন্নতি হইলেও অনেক বিষয়ে তাহারা এখনও কর্তব্যাবধারণা করিতে পারেন নাই । এজন্য সে সমাজে সেই সেই বিষয়ে স্থখ শাস্তি নাই, ইহার শত শত দৃষ্টান্ত আছে ।

নৈরাদিকেরা স্ব শব্দের সম্বন্ধে স্বাধীন । তাহার লক্ষণ করিতে যাইয়া গট, পট, মট যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে স্ব শব্দে ধরিয়া লইয়া থাকেন । ঠাহাদিগের মতে স্বাতন্ত্র্য শব্দের ভেদ বৃদ্ধিতে পারি ; গোতে গো তিন্ন পদার্থের যে ভেদ

তাছাড়াই আমরা স্বাতন্ত্র্য বলিতে পারি। এই ভেদক উপাদিটি লক্ষণ। এই লক্ষণ দ্বারা স্বাতন্ত্র্যের উপলব্ধি হয়। কাব্যে এরূপ স্বাতন্ত্র্য আমরাও স্বীকার করি। এই স্বাতন্ত্র্য বৃদ্ধিবার জন্যই ত কাব্যের লক্ষণের প্রয়োজন। অলঙ্কার-শাস্ত্রে যে অভিজ্ঞা, লক্ষণ লটরা খোরতর বিচার আছে, তাহা জানি বা না জানি, অলঙ্কার পরিচ্ছেদ পড়িয়া অলঙ্কারের নানগুলি মুখস্থ করি বা না করি; রস, গুণ, রীতি জানা চাই। কাব্যের দোষগুলি দোষ জানিয়া দূরে তাহার পরিহার করিয়া যথারীতি রসাহুগত গুণের সন্মাবে কাব্যের রচনা আবশ্যক, তাহা হইলেই সেই কাব্য হয়। নয় ত বর্ণনীয় রসের পরিপন্থী রসের সমাবেশে লিখিলে কাব্য হয় না। বর্তমান যুগের কাব্যে বর্ণনীয় রসের প্রতিদ্বন্দ্বী রসের সমাবেশ দেখিতে পাই। অলঙ্কার-শাস্ত্র না জানিয়া কাব্য লেখার এইটি ফল। এক্ষণে যে সুসভ্য ইউরোপে রোমান্টিক কাব্যের একটা ধোঁরা উঠিয়াছে, ইহা আমাদের অনেক পুরাতন কথা। ইউরোপ যাহাকে রোমান্টিক বলে তাহাকে আমরা ধ্বনি-কাব্য বলি। ইউরোপ রোমান্টিকের লক্ষণ নির্দেশ করিয়া বুঝাইতে পারে নাই, আমরা তাহা সহস্র সহস্র বৎসর পূর্বে লক্ষণ নির্দেশ করিয়া বুঝাইয়াছি। এই রোমান্টিক বৃদ্ধিতে হইলেও অলঙ্কার-শাস্ত্রের প্রয়োজন।

রসবিশেষে যেমন "ধীর সমীরে যমুনাতীরে" বলিতে হয় আবার ভিন্ন রসের অবতারণা করিতে যাইয়া "উন্মত্তলক্করেশ্বরভঙ্গানলাহুবকোদ্ধতঃ"ও বলিতে হয়। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের পঞ্চম খটখটায়মান শব্দ বলিলে চলিবে না। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ ভগবান মহত্মর শাসনে অদ্যাপি পঞ্চম ছাড়িয়াই দেবমন্দিরে প্রবেশ করিয়া থাকেন। নীরবে বাণীপূজা হয় না। উচ্চকণ্ঠে সরস্বতীর স্তোত্র পাঠ করিতে হয়; এই স্তোত্রে পূর্বপুরুষের চির অরাধিতা সরস্বতী প্রসন্ন হইলেন। গদগদ ভাবে জগৎ উচ্ছ্বসিত হয়। স্তোত্রের সেই শক্তি বর্ধনের জন্যই অলঙ্কার-শাস্ত্রের ব্যবস্থা।

এ খটখটায়মান শব্দ নিরীত ব্রাহ্মণপণ্ডিতের পড়নের নয়। এ ধ্বজ্জটী পিণাকীর তাণ্ডবের পদ শব্দ। চণ্ডী অটুট চাশ্তে সহস্র পারিতলে তাল দিতেছেন, আর সহস্র বাহুদণ্ড উর্ধ্বে উৎক্লিষ্ট করিয়া মার্চওমণ্ডলের সত্চিত সহস্র এহ নক্ষত্রকে বিপর্যাস্ত করিয়া, সপ্তসিদ্ধকে উদ্বেলিত করিয়া, সহস্র শিরা নাগরাজকে কৈশল্য গরল উদ্বমনের সত্চিত মস্তকরাশিকে চূর্ণ বিচূর্ণ ও মেদিত্তী মণ্ডলকে ধূলি-সাৎ করিয়া চণ্ডেশ্বরের জগৎবিধ্বংসকারী প্রচণ্ড তাণ্ডবের এ গভীর পদশব্দ।

এ দেশে তাণ্ডবের সত্চিত লাস্যের সমাবেশ নাই। বীণাপাণি সত্যামৃগী

সরস্বতী যখন বীণার স্বরকার তুলিয়া বৃত্তমধুর অলঙ্কারের ধ্বনি তুলিয়া নাচিতে থাকেন, সে লাক্ষ্য এ নয়, এ রৌদ্রমুখি রৌদ্রের অক্ষাণ্ড তাণ্ডব । যিনি যমুনাকূলে নীপমূলে ত্রিভুজ্যমে দাড়ীয়া মধুর মুরলীধ্বনিতে যমুনাকে উজানে বহাইয়াছিলেন, গোপাঙ্গনাদিগকে উদ্ভাদিনী করিয়াছিলেন, তিনি আবার কুরুক্ষেত্র বঁহাসমরে পার্শ্বসারথি চইয়; পাকুড়না শংখের গভীর নিম্নাদে বীর-কেশরীদিগের হৃদয় ভীতিবিহ্বল করিয়াছিলেন । একর ভট্টের সমাবেশ নাই । কুরুক্ষেত্রেও ভ্যা-কিল চিহ্নিত কঠোর হস্তে মুরলী নাই ।

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যাপক কাউএল সাহেবের প্ররোচনায় বঙ্কর ত্রীব্রত পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধি মহাশয় “কাব্যনির্ণয়” নামে বঙ্গভাষায় একখানি অলঙ্কার-গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন । পূর্বে সেই গ্রন্থখানি নন্দীলালস্বর্গে অধ্যাপিত হইত । এক্ষণে তাহার অধ্যয়ন অধ্যাপন উঠিয়া গিয়াছে । বিশ্ব-বিদ্যালয়ে বঙ্গভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে । অজ্ঞাত বিষয়ের ন্যায় বিশ্ববিদ্যালয়-চলে সম্ভ্রাছে ২৩ দিনের ক্ষুদ্র বঙ্গভাষায় লেকচারার নিযুক্ত হইয়াছেন । তিনি কি শিক্ষা দিতেছেন জানি না । যে অলঙ্কার-শাস্ত্রের একান্ত আবশ্যক তাহা কিছ উঠিয়া গিয়াছে । কালী কুটুম্ব কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যাপক ডাক্তার তিনিসের মূখে অলঙ্কার-শাস্ত্রের ভূগঙ্গী প্রশংসা শুনিয়াছি । পণ্ডিত যাকোবী সে দেশে ও এ দেশে আলঙ্কারিক বলিয়া সম্মানভাজন ; আলঙ্কারিক বলিয়াই তিনি বহু অর্থ-বায়ে এ দেশে আনীত চইয়াছিলেন । আমরা কিছ সে অলঙ্কার-শাস্ত্রের আবশ্যকতা নাট মনে করিয়া সেই শাস্ত্রের উপর অবজ্ঞা প্রশংসা করি । বিদেশী লোকের শতমূখে প্রশংসা করেন, আমরা ভারতবাসী চইয়া ভারতীয় মনীষীদিগের উদ্ভাবিত সেট শাস্ত্রের উপর সম্মান করি না । উপসংহারে আমার এইমাত্র বক্তব্য যে, আমরা সোভাগ্যবশতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন উপযুক্ত ভাইস চেন্সেলার পাটয়াছি । যাচাতে তাঁহার এই দিকে একটুকু দৃষ্টিনিক্ষেপ হয়, তাঁহার জন্য সম্মিলনের সভাপণ সমবেত চউন ।

শ্রীমদবেশ্বর তর্করত্ন ।

নববর্ষ ।

ঐ মধু মাধবের • কৃত্তমিত পানপের
 শাণে ডাকে পাণী ; নৃশি এস নববর্ষ ।
 চুপিচুপি নতকল, গিরি-শৃঙ্গ, সিদ্ধ-জল, •
 কর বাণ, রেখা-আঁকা এ ললাট স্পর্শ ।
 সে পরশে মহোৎসব করি মনে অশ্রুভব
 দীপ্তিহীন চক্ষু মুদে, অরি নব আগতে ।
 ফেড়ে মুছে আপনার চূর্ণ ধূলি বাদনার,
 জীর্ণ গৃহ-দ্বারে তারে সম্বাসিব স্বাগতে ।
 নবীনের আদরের • গড়ে ভাঙ্গী কাতরের •
 কর্তৃপল্লবি রক্ত করি, উদ্বোধিয়া তর্ক,
 বৈশাখের রৌদ্র লিপ্ত গ্রাম বিশ্ব করি দীপ্ত,
 বসন্ত রচিত কুঞ্জ এস নববর্ষ ।
 ৐বিভিন্নচক্র মহানন্দার ।

নিবেদন । *

অগ্গকার এই সভায় সকল বিষয়ে সকলের ছোট বড়ইয়া, অন্ততঃ দুইটি
 বিষয়ে আমার বিশেষ সুবিধা হইয়াছে । প্রথমতঃ আমার স্থান যে আপনাদের
 সকলের নিম্নে, এই অধিবেশনে আপনাদের আহ্বান করিতে গুণতিসাবে
 আমার যে কোনই অধিকার নাই এবং আপনারা আজ এখানে উপস্থিত
 হইয়া যে মহদন্তঃকরণের পরিচয় দিয়াছেন—এ সকল কথা বলিলে আপনারা
 আমাকে অন্ততঃ কৃত্রিম বিনয়ের কোন অপবাদ দিবেন না । দ্বিতীয়তঃ
 আজকার আয়োজনের যত কিছু ত্রুটিগ্রন্থাদ, তাহার জন্য আজ আমাকে
 মার্জনার অপেক্ষা করিতে হইবে না, কারণ সে সকল আপনারা স্বতঃই
 মার্জনা করিয়া গাইবেন । আমার কথা আজ এইখানেই সমাপ্ত হওয়া
 উচিত । তবু আপনারা অভয় দিলে অগ্গকার আনন্দ-আহ্লাদের যে অর্থে
 সার্বিকতা, তাহার স্বার্থে সংক্ষেপতঃ দুই একটি কথা শুনাইতে ইচ্ছা করি ।

* সাহিত্য-সম্মেলন পক্ষম অধিবেশনে পরিচয় ।

আমি কপাতি যে ভাবে বলিব, আধুনিক সেইভাবে কপাটা বিবেচনা করিয়া দেখিগাছেন কিনা জানি না, কিন্তু এ কথা বোধ হয় অনেকেই স্বীকার করিবেন না যে আচকার্য এই—আমোদ, আক্লাদ, আলাপ-পরিচয়, গীত-বাজনার কোন সার্থকতাই নাই।

সংসার ছুড়িয়া এই যে আনন্ডভাষে, নানাদিকে, নানাক্রমে 'চিরচঞ্চল' বিশ্বজীবন গড়িয়াছে, গড়িতেছে ও গড়িবে, ইহার আদং অংশটা 'কিন্তু চিরকালই খুব ভয়ী, নিরোক্ত'—ও 'সীট'—তাঁহা অল্প কিছুই নয়—কেবল আমাদের এই পাওয়া-নাওয়া, আপিস-বাওয়া, 'বরংসার' চলাক—এই যথাকালে মৃত্যুতে পরিস্রাব্য দিনের-পরদিনের জীবন ঠিক 'Biology'—জীববিজ্ঞান যাহাকে নিঃসংশয় জীবন বলে—এই চ-ধাতুর যত প্রকার-ঔপন্যাসিক বিকৃতি প্রচার্যার-সংসার-বিহার পরিহারবান্ অর্থাৎ মারামারির, পাওয়া-নাওয়ার, 'কটি-কাটির' চলাফেরার, চাড়াচাড়ির, এই জীবন—'বহু-প্রকৃতির'ই আমাদিগকে এই জীবনে ত্রুটিহীন করিয়াছেন এবং গাছরা এই জীবনটাই খুব 'সীকড়া'ইয়া দরিদ্রা আছেন প্রকৃতির নিয়ম-অনুসারে—জানি না—জীবন-সংগ্রামে ভয়ী হইয়া পৃথিবীর পনের আনি অংশের ভোগদশন করিতেছেন। বাকি এক অংশ অংশ গাছদের অধিকারে—যথা ভাবক, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, সংসারক—তাহার।

কিন্তু (দারিদ্র্য) নিরীক্ষণ প্রকৃতির নিয়মে কিছুতেই এসংসারে টিকিয়া থাকিতে পারিতেছেন না। কসিব মৃত্যু হয় দাতব্য চিকিৎসালয়ে, দার্শনিক না বৈজ্ঞানিককে সংসার ছাড়িয়া নিজের চিন্তারাজ্যেই বসতি করিতে হয়, আর সংসারকে সর্বকালের নিন্দা-ভাঙিয়া গাণ্ডায় লইয়া হয়ত কারাগৃহেই জীবন কাটাতে হয়। সংসারে যাহারা ভয়ী, তাহারাষ্ট পনের-আনা অংশের জীবনেই ঠিক প্রকৃতির নিয়মগত জীবন এবং সেই জীবনে ভাবের কল্পনার, আশ্রিত্যের, উচ্চের কোন স্থান নাই। সেই বরংসার চালান জীবনটাই খুব ভয়ী, নিরোক্ত ও গাঢ়।

এই কাজের জীবন আমরা কলের মতন চালাইয়া যাউ এবং এট কাজের কল চালাইতে অনেক জিনিসকে আমাদের দূর করিয়া ফেলিয়া যাউতে হয়। সেগুলি কোন কাজের মূল-মূল্য বলিয়া আমরা দূর না—তাহাতে যুক্ত এক 'কিন্তু'ই আছে না, জীবিকা-নির্ধারণের কোন উপাদানই তাহাতে পাওয়া যায় না। সে গুলিকে সাধারণতঃ আমরা বাজে জিনিস বলিয়া থাকি। এই বসন্ত-হুমুর ফাটনারপে আঁকাখেঁচ, বাতাসে, আলোয়, স্বাধারে

মিথিয়া কল্প যে অধ্যুয্য বসের আভাস জাঘাটায় ছোলে, এই কল্পময় জীবন
 তাহাকে ভেঙে একখানে একলিয়া রাখিয়া সমুখে চলিয়া যাবে। জীবনের
 প্রথম দিবসে বঙ্গক্রীড়া পরিগণতগজ প্রকৃতির আশিষ্টসমুদ্র মেঘদলনে যকের
 যোগুত বিরত বেদনা জাগিয়াছিল, কলিদাসের কাব্যে তাহা প্রতিভা লাভ
 করিয়াছে। অটে, কিন্তু বিদেশে চাকরীগত প্রাণ কেরাণীর নলে সে যথেষ্ট উঠিলে
 তাহা উপহাসের বিষয়ই হয়। ভ্রমোবন চইতে বিনারবিদ্যুৎ লাভ করিয়া
 আগের টালের যে বেদনা তাহা অভিনয়ত বাজালীর বসে যেরে তইয়া
 থাকে, কিন্তু তইলিনে চোপের জল মুছিয়া জনক জননী আশ্বর পুকেপ
 মডই বসকল্প করিয়া যান—সে বেদনাটা যের বাজে, নিত্যকল্পে কাহের
 জীবনকে কলিকের জন্ত লকরণ করিয়া মিলিয়া যায়। সংসারে তাহার
 কোন চিহ্নই রছিল না—বার্ষিক অঙ্গল চইলিনে শুকটয়া গেল। অমল করিয়া
 কত অক্ষুণ্ণ তব, কত অক্ষিপ্ত চিত্ত, কত অসম্পূর্ণ টঙ্কা যের পদপদে
 ফেলিয়া জীবনের স্রাজপথে চলিতে হয়, তাহার আর ক্ষুণ্ণ নটনা এই গুলি
 যেন আশ্বরের পুটী বোকাই মুড়িক জার—গতকাল সমুদ্র ইহা লাবণ করিয়া না
 চলিলে জীবনের পাল্লার জেতা হইবে না। তাই কলি অনেক গুণে বলিরছেন—

চৈতন্যদর, হতাহিনী লক্ষ্য

দিনরন্তে নিশবন্তে শুষ্ক পথপ্রান্তে ফেলে যেতে হয়।

এই কথাটা মনে মনে অরুণ্ডর কপি বসিয়া, আমরা নিম্নলিখিত মতো
 কত গুলি বিস্তারিত কল্পন করি। যথা, কাহের ও বাজে, সমায় ও অপবায়,
 প্রয়োজনীয় প্রাণ অতিরিক্ত। ভাত নঃ খাইলে চলে না, কিংবা কখনও
 সন্ধ্যাখনে না খাইলে ও চলে; অগিলে ক খেল চলে না, কিন্তু চিত্তাভ্যাসে খিচর
 মা করিলেও চলে; পরিবার প্রতিপালন না করিলে চলে না, কিন্তু মাটিহতার
 পুষ্টি সাধন না করিলেও জীবনযাত্রায় বিশেষ ক্ষতি নাই। ইত্যর্গদ।
 এরং যে, যুর্থ এই প্রথম প্রেমীর কাঙ্ক্ষণ অশেষ দ্বিতীয় প্রেমীর কাঙ্ক্ষণ
 গুলিকে বাড়াইয়া তোলে, তাহাকে আমরা যে অপ্রকৃতির বা পাগল বলিয়া
 গালি দেই, সে গালিটা ‘পুখই’ সত্য; কারণ প্রকৃতির অনোথ নিয়মে সংসারে
 তাহাদের স্থান নাই। তাহার কবি, ভবিষ্যৎ, পণ্ডিত, কিন্তু প্রকৃতির নাপুস
 নহেন—স্বয়ং দৈবপীড়িত এ বিষয়ে দাক্ষ্য দিয়াছেন।

কিন্তু এই বিস্তারিত মতো খেটুকু সত্য আছে, তাহার সীমা কোথায়,
 তাহাও একবার বুঝিয়া লওয়া দরকার। জীবনের কাজের কস না ফেলিয়া

দেয়, সেই ফেলানো ছড়ানো জিনিসগুলিকে মাল-মসলা করিয়া যে আর একটা জীবনের পুঞ্জ গড়িয়া উঠিতেছে, বিজ্ঞান তাহার কোন দার দারে না বটে, কিন্তু সাহিত্য তাহা লইয়াই বাস্তব । তাই এক হিসাবে সাহিত্য কেবল সংসারের দৈনন্দিন জীবনের একটা By product বতাই কেন মনে মনে কাজের জিনিসে ও বাস্তব জিনিসে দ্বিধা গড়িয়া তুলি, এই ছইটাতে কিছুতেই ছোড়াছাড়ি করা চলে না । সংসারের খাওয়া-দাওয়া ঘরসংসার চালান তুচ্ছ দৈনন্দিন জীবনের প্রবাহেই সাহিত্যের ক্ষেত্র যে উৎকর্ষ হইয়া উঠিতেছে, এ কথা তুলিলে চলিবে না । এই জীবনটাকে ক্লম করিলে, সাহিত্যের জীবনও ক্লম হইবে । এই জীবনটাকে সসৃষ্ক ও গৌরবাবিত রাখিলে, সাহিত্যের জীবনও পরিপুষ্ট হইবে । ইতিহাস হইতে তাহার কত দৃষ্টান্ত দেখাইব ? প্রাচীনভারতে ভোগবিলাস-মধুর বিক্রমাদিত্যের সময়ের কথা ভাবিয়া দেখুন, অথবা গ্রীসের Periclean Age ইংলণ্ডের Elizabeth ও Victoria র শাসনকাল ।

আকাশ-কুসুমের কেবল কল্পনাই করি ; কিন্তু আকাশের এত মেঘের রঙ্গীন লীলাখেলায় চক্ষের এত মিষ্ট মধুর আলোকে, কিবা প্রভাতের রক্তিম আভায় ও সন্ধ্যার স্নানচ্ছায়ায় কোন দিন ত আকাশে কুল কুটিতে দেখা যায় নাই ; সে কুল ত মাটির পূলা ময়লাতেই অগ্নি কুটিয়া থাকে । বসন্তের যত সৌরভ, যত গান, যত মনোমোহন আয়োজন তাহা ত এই পূলা কাদার জগতেরই মধ্যে । এই পৃথিবীর উপরিভাগটা aroplan এ চড়িয়া কিছুদূর ছাড়িয়া গেলেই বসন্তের আর কোন আভাস নাই—পাখীর গানও নাই, পাতার সবুজও নাই, ফুলের রংও নাই, চাওয়ার মুহূর্তোপলব্ধিও নাই । কথাটা যত ভাবে গুলী ফলাও করিয়া গউন, আদং বজ্রবাটা এই যে, মহিমা যেমন তুচ্ছ জিনিস হইতেই উঠে, সাহিত্য তেমনই এই খেলাধুলার দৈনন্দিন জীবন হইতেই কুটিয়া বাহির হয় ।

কবি কল্পজগতের অশরীরী মানস-প্রতিমাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছিলেন—

“কৃমি সন্ধ্যার মেঘ শান্ত সূদূর

আনার স্পর্শের সাধনা,

“মম শূন্য গগন-বিচারী ।

আমি আপন মনের বাধুরী নিশায়ে

তোমাতে করেছি রচনা ;

তুমি আনারি যে তুমি আনারি,
মন অসীন গগনবিহারী ।
মন অদর রক্তরক্তনে, তব
চরণ নিড়েছি রাঙ্গিয়া,
অগ্নি সন্ধ্যা-স্বপন-বিহারী !
তব অদর এঁকেছি সূখা বিবে নিশে
মন স্বপ্ন তথ ভাঙ্গিয়া
তুমি আনারি যে তুমি আনারি
মন বিহীন জীবন-বিহারী ।”

কবি ভাবিলেন, আনার এই স্বপনচারিণী মানসী-প্রতিমাকে কি করিয়া এমন পুলকিত জগতে তুচ্ছ কোলাহলের মাঝখানে মন্দির গুড়িয়া দিব। যেখানে বিজলীল, গ্যাসের, এমন কি তেলের বাতিও নাই, কিন্তু যেখানে অবিশ্রান্ত চক্ষু স্বর্গা গ্রহতারকা আলোক দিতেছে, যেখানে নর্ত্তার তুচ্ছ কোলাহল নাই, কেবল চিরপ্রতিষ্ঠিত নীরবতা, যেখানে ভালবৃত্ত কি চামর নাই, কিন্তু দশদিকের অবাধ উদাস হাওয়া কেবল বহিয়া যাইতেছে, এমন এক চুরাধরোহ চূর্ণম গিরিশৃঙ্গে কবি তাঁহার মানস-প্রতিমার জন্ত সোণার মন্দির গুড়িয়া দিলেন। কবি ভাবিলেন—দেবী আমার এই খানেই তুঠ থাকিবেন, এখানে নর্ত্তার সতিত তাঁহার সম্পর্ক থাকিবেন না। কিন্তু, হায় কবি, তোমার দেবী যে নিতাস্থই মানবী। সে যে এই মাহুঘেরই কোলাহলের জন্ত, বালকবালিকার খেলাধুলার জন্ত, লোকালয়ের আনাগোনা ও ঘরসংসারের জন্ত মনে মনে গুমরিয়া গুমরিয়া কাঁদিতেছে। এখানে তাঁহার মন্দির-প্রতিষ্ঠা ঠিক হয় নাই, এই সংসারেই তাঁহার ঘরচরার, বসতি।

এখন আমার এই রূপক কথার Moral এই যে, আপনাতা সান্তিত্যকে জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিবেন না। এমন একটা বাস্তবিক বিচ্ছেদ কোথাও নাই। উক্তট শ্লোককার বলিয়াছেন—কালিদাস-কবিতা নবং বয়ঃ মাহিষং দধি শর্করং পরঃ। এই যে বিরতী যকের কান্তর বেদনা, শকুন্তলার করুণ কাহিনী, রঘুবংশের উদার অঘর, দূর হিমালয়শৃঙ্গে হরগৌরীর মিলন-বাণপার, নিদ্রাঘ বসন্তাদি ঋতুপরিবর্তনের অপূর্ণ বর্ণনা—এই নানা রূপ সমন্বিত-কালিদাস-কবিতার সঙ্গে শ্লোককার মহিষের দই ও চিনিপানাটুকু যোগ করিয়া দিয়া প্রকৃত অন্তর্দর্শিতা ও রসজ্ঞতারই পরিচয় দিয়াছেন।

আমার কথার এইখানে উপসংহার। এখানে আপনারা গীতাদেশের কথা শুনিতে আসিয়াছেন, গীতাদেশের সময় আমি আর নষ্ট করিব না। পরিশেষে আপনাদের ধন্যবাদ জানাইয়া, ত্রিভি আমার প্রতি যেহ পরবশ হইয়া আজকার ব্যাপারের সকল বন্ধোবস্ত করিয়া দিয়াছেন, সেই উদারজন্য নাটোরের মহারাজকে সন্মতি ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রীশ্রীকুমার দত্ত ।

আগমন ।

বিশ্বজিৎ যজ্ঞশেষেঃ শিঃ সঃ দেঃ প্রদায়ঃ ।

আকাশে চাঁদহিরাছিল রিক্ত কর জোড়ে,

পদতলে পৃষ্ঠীভূত তাক তার পলক সস্তার;

নাগ পর্ণে পৃথ্বী ছিল ভরে

বর্ষ শেষে কাল সাক্ষ্য জোড়ে

শূণ্য শাশে, মুহূর্ত্ত অতীতের বার্থ হাতাকরি,

কাতর করিয়াছিল তবিশ্বের ভাষা আকাঙ্ক্ষারী

বিশ্ববন্ধু সমীরণ সর্কবিশ্ব ভাঙে

উদার দক্ষিণকর ভরি দক্ষিণায়,

ককরিয়া সামি গান আকাশের অব্যবহিত পথে,

আলিঙ্গনে ঘেরিল তাহার,

নিখিল আশ্বাস দিল গায়,

গেগনা বস্তল দিন, দেগা দিল পরতে পরতে

কোমি স্থান পত্রাভি, জগাইল আনন্দ জগতে!

চলিল বিগত বর্ষ স্তম্ভ হুড়ায়ে,

চারিদিকে স্রব-বস্ত্র স্রীর্ণ হুধ ভায়,

বর্ণ গন্ধ গীত শোভা, অবিহান ছিল বা স্তম্ভায়ে

কড় কপী, প্রতি অঙ্গ তার,

আজি সব শুধু স্মৃতি মায়!

চতুকের সম্মাস নিখালে, হায় সতীত রিখায়ে,

ভবিষ্য আসিছে হাসি, ইন্দ্রের আদ্যা সর্ব গায়ে!

শ্রীপ্রিয়দর্শনা দেবী ।

রোগশয্যার প্রলাপ ।

একদিন মনে হইল,—“আমাদের ইতিহাস নাই কেন? বেদ আছে, দ্বিতীয় আছে, পুরাণ আছে, দর্শন আছে, কাব্য, ব্যাকরণ, ছন্দ, অলঙ্কার, জ্যোতিষ, গণিত, আয়ুর্বেদ, সঙ্গীত-শাস্ত্র প্রভৃতি যা কিছু আবশ্যক, তা সবই আছে আর তাহা ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের প্রশংসনীয়। অবস্থান্তরে আছে, কিন্তু ইউরোপীয়েরা যাহাকে ইতিহাস বলেন, তেমন ইতিহাস নাই কেন?—তাহাতে ভাবিতে মনে হইল, আমাদের রাষ্ট্রনীতি, দেশনীতি, সমাজনীতি, পারিবারিকনীতি এবং ব্যক্তিগতনীতি এমন ভাবে ধর্মের সঙ্গে বিমুক্ত, ধর্মের শাসনে অনুশাসিত যে উহার কোরাটরটে-উরতির ক্ষুদ্র তেমন ইতিহাসের প্রয়োজন আমাদের কখন নাই, আর চটতে-চটতে—আমরা সব—ও সমস্তের এতটা পক্ষপাতী হইতে অসম্মত হইয়াছি যে, আমাদের কাছে ব্যক্তি ও কালের অবচ্ছেদন অত-হোটেই প্রয়োজনীয় নয়। বেদ ও উপনিষদ, পুরাণ ও দ্বিতীয় আমাদের সকল ইতিহাস—রাষ্ট্রীয়, সাংসারিক ও নৈতিক ইতিহাসের স্থান পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে, আর তাহাতেই ইউরোপীয় প্রণালী ইতিহাস-বিশিষ্ট কোন জাতি অপেক্ষা আমাদের ঐতিহাসিক-শিক্ষার কোন তারতম্য হইতেছে না। আমাদের পুরাণ যদি কোন এক দেশের কোন এক রাজ্য কোন এক সময়ে এই সংস্কার্য করিয়া বা এই অসংস্কার্য করিয়া এইরূপ-কলা পাইয়াছিলে—এইরূপ অস্তিত্ব পঞ্চকড়ারে উপদেশ দেয়, আমরা তাহাতে কোন সম্ভাব বা ক্ষুদ্রতা মনে করি না। কণ্ঠের কলমের লইয়া শিক্ষার উৎকর্ষ সাধিত হয়, সেই কলার নটিই যখন জানিতে পারিলাম, তখন তাহা চটতে যাহা শিক্ষার তাড়াও জানিতে পারিলাম, তখন সে-খটনা কোথায়, কবে, কখন, কেমন করিয়া ঘটয়াছিল, তাহা জানিবার কোন প্রয়োজন নাই বা তাহাতে শিক্ষার বিবেকের কোন উদ্ভাবন হইবে? না-হয় তাহা পুরাণকার বর্ণনায় সত্য কোন বাবদী কহেন নাই। লক্ষ্যগত-স্বার্থ লিখা-সম্মত আশ্রয়স্বরূপ করিয়াছিলে। আর তাহা কলার উদ্ভাবন-সঙ্গতি হইয়াছিল, এইটুকুই লৌকিক শিক্ষার বিষয়,—পূরণও কার্য ইতিহাস-বিশিষ্ট এই সমস্তটুকুই স্বকীয় করিয়া শিক্ষা-কেন্দ্র আশ্রয়-সিদ্ধি-চেষ্টা করিবে, কিসে শিক্ষার প্রাণ-হিলে, কি আশ্রয়-সিদ্ধি-চেষ্টা-হিলে।”

অথবা তিনি খুঁটেন পাঁচ ছাত্তার বা পাঁচ বৎসর পূর্বে বা পরে বস্তুমান ছিলেন, তাহার দ্বিতীয় শিক্ষান্ত রক্ষায় তাঁহার আদৌ মনোযোগী হন নাই। লোকশিক্ষায় সে তথাগুলি কোনটে সাহায্য করিবে না বলিয়া তাহা রক্ষা করিবার কোনও আবশ্যকতাটী অজ্ঞত্ব করেন নাট। পুথুপুর, বেণরাজার সময়ে বর্ণসঙ্কর জাতি-সমূহের বৃত্তিবিধান ব্যবস্থা চাইয়াছিল এবং রাজ্যদোষে বর্ণসঙ্কর জন্মাইয়া সনাতন বিপ্লব ঘটাইয়াছিল বলিয়া ব্রাহ্মণেরা তাঁহার উন্নয়ন দ্বারা তাঁহার প্রতীকার ঘটাইয়াছিলেন,—রাজ্যদোষে রাজ্যবিপ্লব ও সমাজবিপ্লব ঘটে এবং তাহার ফলাফল বর্ণনা করিয়া লোকশিক্ষায় ইতিহাসের যতটুকু প্রয়োজন, পুরাণকার ততটুকুই রক্ষা করিয়া বেণরাজের রাজ্য ও কালাকাল সম্বন্ধে কোন কণাই রক্ষা করেন নাট। পুরাণ ছাড়িয়া দিলেও আমাদের নিকটবর্তী কালেও ভারতীয় ইতিহাস রক্ষার দ্বারা আজিও ঐক্যপটে চলিয়া আসিতেছে। কালিদাসের কাব্যই শিক্ষণীয় ও পঠনীয়; তিনি খুঁটেন ৫৭ বৎসর পূর্বে কি খুঁটেন পর ৬৪ শতাব্দীতে জন্মিয়াছিলেন তাহা জানিবার আবশ্যকতা নাই বলিয়া তাহার কোন দ্রুত ও রক্ষিত হয় নাট। আর এখনকার গবেষণা বলে যদি কোন একটা বৎসর কালিদাসের জন্ম বা মৃত্যুবৎসর রচনার বৎসর বলিয়া শিক্ষান্ত হয় তবে কালিদাসের কাব্য মহিমা যে কিছু বাড়িবে, বা মৃত্যুর জ্ঞান আদর্শ রাজ্যের সংকীর্ণ সম্বন্ধে জানরা আর কিছু অধিক জানিতে পারিব, তাহা নহে। কেচ কান্মীরের মাতৃগুপ্তকেই কালিদাস বলেন, আর বাঙ্গালার বর্ণনায় কালিদাসকে বিশেষ পক্ষপাত করিতে দেখা যায়। বলিয়া কেচ তাঁহাকে বাঙালীই প্রমাণ করুন, তাহাতে মারাঠা বা দ্রাবিড়ের লোকের শিক্ষার কিছু ক্ষতি হইবে না। কান্মীর বা বাঙ্গালাদেশের লোক তাহাতে কালিদাসকে আমাদের বলিয়া গৌরব করিতে পারিবে বটে, কালিদাসের কাব্যাদিগত শিক্ষার পরিমাণ যে কিছু বাড়াইতে পারিবে, তাহা নহে; বরং গৌরব চেষ্টাতে ভ্রষ্ট হইয়া একদিন চরিত গর্বে অভিকৃত হইয়া পড়িবার সম্ভাবনা থাকিবে। বৈদিক ঋষি, পৌরাণিক ঋষি মুনি, স্মৃতির ব্যবস্থাপক ঋষি মুনি কে বাঙালী, কে উড়িয়া, কে কান্মীরী কে খোরাসানী, কে আফগান, কে পারসীক, কে বেগুচি, কে সাইবিরীয় (তিলকের মতে), কে মঙ্গোলীয় (উমেশ বিজ্ঞানস্বরের মতে), ইউরোপীয় প্রণালীতে ঐতিহাসিক গবেষণা করিতে শিগিরা, তাহা নির্ণয় করিবার ক্ষমতা আমরা এখন উঠিয়া পড়িয়া নাগিয়াছি। দেবু, দানব, যক্ষ, রাক্ষস, গন্ধর্ষ, সিদ্ধ, কিন্নর, দৈত্য, অসুর প্রভৃতি দেবদেবানিদিগকে পুরাণমতে আর

আমরা স্বর্ণ, অমৃতরীক্ষ, মতাণ্ডলোক, ব্রহ্মলোক, দেবলোকের অধিকারী বলিয়া নিশ্চিত হইতে পারিতেছি না, থিয়সফির প্লেডাই দিয়া ইংরাজীতে order of the 5th plane, order of the 7th law বলিয়া না বুলিলে তৃপ্তি পাউ না। অথচ ভূটোতেই তাঁহাদের লিখিত জ্ঞানোপদেশের বে কোন প্রমাণতা হুটোতে তাহা নহে, যে তিনিই, সে তিনিই আছি। তপতালক লোকালোকের খীন কেবল উপদেশে যাচা হইবার তাহার উত্তর বিশেষ কি পুরান কি থিয়সফি, কিছুতেই হুটোতে না,—উভয়েই বলেন সাধনা কর, তপস্থা কর, ব্রহ্মিতে পারিবে। ভারতবর্ষে বলিয়া থিয়াজেন, “কথায় কে করে প্রভাষ”—“করি দেখে ব্রহ্মিবে তখনি।” ইউরোপীয় ইতিহাসের দেশ কাল-পাত্র-সাক্ষ্য-প্রমাণবদ্ধ ঘটনাবলীর শিকড় যে পুরাতনক ইতিহাসের শিকড় অপেক্ষা আর বেশী কিছু শিকড় দিতে পারে, তাহা ত বোধ হয় না। পুরান বলেন সারথী অসাপারন শক্তিবলে, দম্ভবলে সমাগতা ধরনী চুলায় ঘাউক দ্বিলোক ভয়ও করিয়াছিলেন; কিন্তু শেষে পাণে, অচছানে, রাজেশক্তির অপব্যবহারে সংবংশ ধ্বংস হইলেন। ইউরোপীয় ইতিহাসের আলেকজান্ডারের দিগ্বিজয় ও নেপোলিয়নের ইউরোপ জয়ের ব্যাপার হইতেও তাহার অতিরিক্ত আর কি অধিক শিকড়ীয় বস্তু পাওয়া যায়, তাহাত বোধ হয় না। এই শিকড় জড় তাঁহাদের দেশকাল পাত্রের সঠিক সংবাদ যে খুব একটা বেশী কার্ণাকর হয়, তাহা মনে হয় না। আলেকজান্ডার গ্রীক না হইয়া তুর্কী বা জিপ্সি এবং নেপোলিয়ন ফরাসী না হইয়া পারসী বা ভীল হইলে এবং একজন গৃধপুং ২য় শতাব্দী বা অপর জন গৃধীয় ১৯শ শতাব্দীতে না জন্মিয়া হিন্দুর কল্পিত লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্বের সত্যার্ণে জন্মিলেই তাঁহাদের দিগ্বিজয়, রাজ্য-পালন, বীরত্ব, মহাহুভবতা, দাঙ্কিত্য, অত্যাচার, পৃথিবীব্যাপী বীরকর প্রভৃতির যে ইতিহাস আমরা আজ পাইয়া তদ্বদা হইতে রাষ্ট্রীয়, সামাজিক এবং ব্যক্তিগত শিক্ষা পাউতেছি, তাহার কি ক্ষতিবৃদ্ধি হইত, তাহা ত বুলি না। দাশরথি নামচন্দ্র কবে ছিলেন, তাহা হিন্দু ও বর্ষনাম ধরিয়া দিন স্থির করিয়া বলিতে পারে না কিন্তু “সানের মত স্বানী হউক, লক্ষণের মত দেবর্ষ হউক” এ প্রার্থনা এ শিক্ষা হিন্দু নারী ত আজও ভুলে নাই, “জয় রাজ্য নামচন্দ্র কি” বলিয়া তাঁহার মহত্ব অরণে কোন হিন্দু কোন মাত্র অত্যাচার বোধ করেনা, কিন্তু ইউরোপীয় ইতিহাসে কত শত পরোপকারী সত্যত অদর্শ পুরুষের আজন্ম-মরণের কার্যাবলী দিনমাসবৎসর ধরিয়া ইতিহাসে লিপিবদ্ধ থাকিলেও কই কেচ ত হিন্দুর জায় তাঁহাদিগকে অদর্শ করিয়া লইতে পারে নাট! তবে একটা

মনে ইহঁতে পারে দেশকাল পাত্রেয় জ্ঞান থাকিলে কেহ কেহ মনে করেন বিশ্বাসের মাত্রা অধিক এবং দৃঢ় হয় । ইহা কল্পনার কথা । উত্তর কাল-বর্তী লোকের পক্ষে পূর্বকালবর্তীর কথায় বিশ্বাস স্থাপন করা বাস্তবিক অসম্ভব । একজনের কথায় বিশ্বাস না কর, দশজনের কথায় বিশ্বাস করিবে কি প্রকারে তাহা ত বুঝিয়া পাই না !—যুক্তি ত এই, দশজনেই কি মিথ্যা কথা বলিবে ?—গ্রীকবীর হারকিউলিসের বীরত্ব-কাহিনী সত্য কি মিথ্যা, পুরাণ-কল্পিত বাপার কি না, তাহাই নির্ণয়ে ইউরোপীয় শিক্ষিত সমাজ এখন বাস্তব, কারণ হারকিউলিসের ইতিহাস দেশকালের সীমা দিয়া সংবদ্ধ করা নাই । বহুদূর অতীতকালে উল্লিখিত দেশকালের প্রতি অসঙ্গতি কল্পনের লোকের যে ক্রমশঃ শ্রদ্ধা হ্রাস হইয়া আসে, ইহা বর্তমান শিক্ষা প্রণালীর মধ্যে প্রত্যক্ষ যখন অস্বভূত চইতেছে, তখন কোন দূর ভবিষ্যতে নাপোলিয়নের বিবরণও যে পৌরাণিক জন্মনার ছায় দেশকালপাত্র দ্বারা অবচ্ছিন্ন থাকিলেও অগ্রদ্ধা লাভ করিবে না তাহা কে বলিল ? দৃষ্টান্ত স্বরূপ ইউরোপে সুবলমান রাজত্বের ইতিহাসের কথা উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হয় না কি ? সেসকল বৈশ্ব কাল পাত্রেয় সাক্ষ্য প্রমাণের কথায় হিন্দুর যুক্তি এই যে, লোক শিক্ষার্থ ইতিহাস পুরাণ রচনা করিতে বলিয়া সেই একজনেই যে মিথ্যা কথা বলিবে, এ সম্ভবই বা করি কেন ? অকিঞ্চিৎকর বলিয়া একের ব্যবহার দেশকালপাত্রের সাক্ষ্য হিন্দু ত্যাগ করিয়াছে । আর মিথ্যা ! মিথ্যার কি শিক্ষা নাই ?—এখনকার কালেও কি মিথ্যাবলম্বন শিক্ষা দেওয়া হয় না ! গল্প বলিয়া, ইন্দুর কাক বিড়ালের কথা বলিয়া শিশুশিক্ষার ব্যবস্থা কি কল্পনামূলক মিথ্যা কথা নহে ? এদেশের খাতু গড়িয়া গিয়াছে, ইহার সারসংক্ষেপে পটু, সংকপা বলিয়া দৃষ্টান্ত সহ যাহা উপদেশ দিবে, তাহাই ইহার প্রচল করে । দৃষ্টান্তের প্রমাণ খুঁজিয়া এদেশের লোক অনর্থক শিক্ষার সময় নষ্ট করে না । সূর্য্য ও চন্দ্রবংশের রাজনাম-মালায় পুরাণে পুরাণে বিভিন্নতা দেখা যায় । তজ্জন্ত হিন্দুর ইতিহাস শিক্ষায় কোন ক্ষতি হয় না । নামমালার পৌরোপার্গ্য বা নাম-স্মৃতিশাস্ত্র শিক্ষার কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হয়, হিন্দু তাহা মনে করে না । কোন রাজা কি সদস্য কর্ত্ত করিয়া কি ফলাফল পাইয়া গিয়াছেন, তাহাই পৌরাণিক শিক্ষার লক্ষ্য । সেই ফলাফলের শিক্ষার উপরেই হিন্দু-সমাজের গঠন নির্ভর করে । আদি প্রজাপতি হইতে বর্তমান কাল পর্য্যন্ত কোন রাজ-বংশাবলীর নামমালার পৌরোপার্গ্য রক্ষায় ও তাহা

ভাষণের অভ্যাস করার উপর কোন শিক্ষা নির্ভর করে না, হিন্দুর এই-রূপ বিশ্বাস। এই সকল ভাবিতেছি, এমন সময় নব প্রকাশিত গোড়-রাজমালায় একটা স্থান নজরে পড়িল। তাহাতে দেখিলাম,—আদিশুরের অস্তিত্বেই গ্রন্থকারের সন্দেহ হইয়াছে। কেন না তাঁহার অস্তিত্বের কোন প্রমাণ এখনও দেশকালপাত্র দ্বারা অবচ্ছিন্ন হইয়া লোকচকুর গোচরীভূত হয় নাই। সুতরাং বাঘ বকের গল্পের নত আদিশুরের ব্যাপ্তরটাকে গল্প কথা বলিয়া উড়াইয়া দিলে কেহ কিছু বলিতে পারিবে না; কিন্তু আদি-শুরের নামের সঙ্গে এদেশের বেদাচার্য্যরষ্ট্র অবস্থায় যে অল্প দেশ হইতে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনাহইয়া দেশাচারের সংস্কার চেষ্টা, লোক শিক্ষার ব্যবস্থা, রাজ্যোচিত প্রজ্ঞাপালন শক্তির পরিচালন প্রভৃতি শিক্ষণীয় কথার সংশ্রব আছে, সেগুলি ত্যাগ করা ইতিহাসের পক্ষে উচিত কি না এবং ত্যাগ করিলে বাঙলায় ইতিহাস শিক্ষার ক্ষুদ্রতা আসিবে কি না, তাহা ভাবিবার বিষয় নহে কি? আদিশুরকে যতক্ষণ ইউরোপীয় ঐতিহাসিক-বিজ্ঞান-বলে দেশকালপাত্রের দ্বারা অবচ্ছিন্ন করিয়া লইতে না পারিতেছি, ততক্ষণ তিনি নাই; কিন্তু তাঁহার নামে আরোপিত এই যে এক নত সংশিক্ষার ব্যাপার বিজড়িত আছে, তাহা কি ইতিহাসের বিষয়ীভূত হইয়া অন্ততঃ বাঘ বকের গল্পের ত্রায় সহপদেশ দিবারও অধিকারী নহে? ঐরূপ অবচ্ছেদের জ্ঞান না থাকিলে, এতদ্বিহিত শিক্ষাও কি ফলদায়িনী হইবে না?—এত ভাবিয়াও কি হির করিব বুলিলাম না, কাজেই দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলাম এবমস্ত।

১৩)

একদিন মনে হইল—“যখন সত্যগুণের চারিপোয়া বস্ত্রের শুল্কলা হেতাবুৎপে কয়িত হইয়া তিন পোয়ায় এবং দ্বাপরে ছই পোয়ায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, আর সেই সকল ভ্রষ্টাচার নিবারণের জন্ত, পৃথিবীকে পাপভার হইতে মোচনের জন্ত ভগবানকে যুগে যুগে অবতার হইয়া কত কাণ্ডকারখানা বাধাইতে হইয়াছে, এবং তাহা পুরাণকারের কথায় আমরা বিশ্বাস করিয়া মানিয়া আসিতেছি, তখন কলিকালের এই তিন পোয়া পাপের আক্রমণ-ভ্রান্ত ভ্রষ্টাচারের জন্ত আমরা ক্লম হইতেছি কেন? যে শাস্ত্রের কথায় সত্য ত্রেতা দ্বাপরের ইতিহাস বিশ্বাস করিয়া আসিতেছি, সেই শাস্ত্রেই যখন কলিকালের জন্ত এই ভ্রষ্টাচার বাধিত হইয়াছে, তখন তাহা বিশ্বাস না করিয়া আমরা

ইহার জ্ঞাত এত বিমর্ষ হই কেন ? তারপর সেই শাস্ত্রেই কলির ব্রাহ্মণ, কলির রাজা, কলির রমণী কেমন হইবে, তাহা যখন ভগবাকাজ্ঞে পুরাণাদিতে নিপিবন্ধ হইয়াছে, তখন তাহার অলুপা করনা কিসে কেন ? আমরা এ প্রকার পরিবর্তন করিব, বেদচীন কলির ব্রাহ্মণকে বেদশিক্ষা দিয়া আবার সত্য-যুগ ফিরাইয়া আনিব, এসকল করনা করিয়া মন্ত্রিত বৃথা পীড়িত করি কেন ? ইহা• দ্বারা কি আমাদের ভগবদ্বাক্য হেগন, ভগবদ্বাক্য অনাহু প্রদর্শন করা হয় না ? তদ্বিহীন আর এক কথা আছে ! ভ্রষ্টাচার ও পৃথিবীর পাপভার লাগবের জ্ঞাত ভগবান নিজেই অবতার হইয়া সে কার্য সম্পাদন করেন, “সমুদ্যমি যুগে যুগে” কথাটা তাহারই শ্রীমুখ নির্গত ; অতএব যাহার কার্য তাহারই জ্ঞাত রাখিয়া দিয়া আমরা যদি অনধিকারচর্চা পরি-ভাগ করিয়া সার্থক নিদ্রা ভোগ করি—বর্ণাশ্রমাচার সংস্থাপন পতিত জাতির উদ্ধার, বিধব্রা বিবাহ প্রচলন, অসবর্ণ বিবাহ প্রচলন, নিষিদ্ধ ভোজন বিচার, প্রভৃতি বড় বড় সামাজিক সংস্কারের কথা নাচিয়া না বেড়াই, শাস্ত্রানুসারেই আমাদের কোন অকর্ম করা হইবে না । ইহার নজীরও আছে । যে কলি-কালের সংস্কারের কথা আমরা ভাবিয়া আকুল হইতেছি, সেই কলিকালের অবতার-সম্পর্কেই সে নজীর পাঠয়াছি । কলিকালের বিকৃত ছোট অবতার—বৃদ্ধ ও চৈতন্য । বৃদ্ধকে পুরাপুরি অবতার বলিয়া হিন্দুসমাজ দশাবতারের শ্রেণীতে আসন দিয়া মানিয়া লইয়াছে, চৈতন্যের অবতারও এখনও “জসংগেয়ার” মধ্যে গুলাইয়া রহিয়াছে । তা' থাকুক, তথাপি আমরা দেখিতে পাই যে, ১৫০০ বৎসর পূর্বে ধর্ম্মের মান্তি উপস্থিত হইলে অর্থাৎ কলি সক্ষার অন্ধক দিন ঘাইতে না ঘাইতে স্বাপরম্ব বাবদ্বা (চাই পোয়া ধর্ম্মও) যখন বেশ সচ্ছিত হইয়া উঠিয়াছে বৃষ্টিতে পারা গেল, তখন বৃদ্ধদেব আসিলেন । তিনি আসিবার পূর্বে যাহারা ধার্ম্মিক ছিলেন, তাহারা পৃথিবীর ভ্রষ্টাচারের সঙ্গে বৃদ্ধ না করিয়া “সমাজ সংস্কারের” চেষ্টা না করিয়া যদি পত্তনে নিরাশায় বসিয়া বৃদ্ধদেবের অপেক্ষা করিতেছিলেন । তাহার পর যাহা করিতে হইল, তাহা বৃদ্ধাবতার স্বয়ং আসিয়া করিয়াছিলেন । সেইরূপ চৈতন্যাবতারের পূর্বে যাহারা “পাষাণী জনর” অত্যাচারে উৎপীড়িত এবং ধরলীকে নিপীড়িত দেখিয়া ক্লেশভব করিতেন, সেই অদ্বৈত শ্রীবাস-চন্দ্রশেখরাদি গোপনে শ্রীবাসের বা অদ্বৈতের আঙ্গিনা কুদিয়া ভিড়াইতেন । তাহারা তখনকার য়েচ্ছ-রাজের সাহায্যে সতীদাহ-প্রথা নিবারণ, গঙ্গাসাগরে পুত্রনিক্ষেপ, রাজপুত্রের কত্মহত্যা, চড়ক

পূজায় বাণকোঁড়া প্রভৃতি সমাজের অনিষ্টকর কুসংস্কারগুলির সংস্কার করিয়া কোন আইন পাশ করা হইবার জ্ঞাত বাস্তব ছিল নাই । তাহারা প্রাণের বাণায় প্রাণ তরিয়া কানিতেন, আর ভগবানের অবতার প্রার্থনা করিতেন । চইলও তাই ; সেট চৈতন্য আসিয়া যাচা করিতে হয় করিয়া গেলেন । সে আচ্ছ ৫০০ বৎসরের অনধিক কালের কথা, তখনও কলির সক্ষা কাল শেষ হয় নাই ; অর্থাৎ তখনও স্বাপনের ছায়া অতি ক্রীণভাবে কোথাও কোথাও (একায়-বর্জিতায়, পুষ্টি ও পৈয়া কার্গো, বর্ণদণ্ডে এবং আরও কোন কোন ব্যাপারে) কিছু কিছু ছিল । তখন বোধ হয়, সেই জ্ঞানই আমরা পোদার আইন নিছের চাতে গ্রহণ করি নাই । এখন কলিসংস্কার ৫০০০ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে, এখন পুরা কলিকাল আসিয়া পড়িয়াছে । এখন পুরাদমে ভাগবতোক্ত ও তত্ত্বোক্ত তদৈব প্রবল; কলি দেয়া দিয়াছে । তাই কি আমাদের সাতস বাড়িয়া গিয়াছে !

শ্রীমোগ্যতুর শশা ।

বালবিধবা ।

বদির বিশ্ব চির নিকাক উদাসীন আচ্ছ ওরে,
নরকের পথে আঁখিজল তারা পাথের দিয়েছে তোরে ;
তুই ক্ষুধার্ত দক্ষ প্রাণের করণকাছিনী নিয়া,
গলাতে কি চাম্ নিঠুর দরার পাঁচবে গঠিত হিয়া ;
উল্লাসতরা কোলাহলথেরা উৎসব মন্দিরে,
তোর ক্রন্দন পশেছে কি কভু কারো হৃদয়ের তীরে ;
তুই চিরকাল ভিখারীর মত ভিক্ষার ঝুলি হাতে,
চলেছিস্ এই অন্ধ নস্ত জনতার সাথে সাথে ;—
করুণা আশ্রয় নয়নে তাহারা চেয়েছে কি তোর পানে,
প্রাণে কি তাদের বাণা জাগিয়াছে বুক ফাটা হৃৎ গানে ।
মাহুদের সাথে সব বন্ধন ছিন্ন যে হতার আচ্ছ,
চুকায়ে দিয়েছে হিসাব নিকাশ বিশ্বের অধিরাজ !

তোথা বাস্নে কো এয়োতীনারীর মঙ্গল-শা'ণ বাজে,
 আলোক পুলকে সজ্জিত আই শুভ উৎসব মাঝে ;
 পুরনারীদের হরষ মুখর মৃচ্ গুঞ্জন-তানে,
 অকল্যাণের ছায়া আজ'ওরে ফেলিস্ না কোনো থানে ;
 প্রলয় অনল গরল ঢালিয়া করিস্ না তারে কাণো,
 নিঃশ্বাসে তোর নিভে যাবে যেরে উৎসব জ্বালা জ্বালো !

ক্ষণে ক্ষণে কেন চমকিয়া উঠি জাগাস ব্যাকুল ভীতি,
 জীর্ণ প্রাণেরে সাড়া দিয়ে আজ জেগেছে সে কোন স্বতি—
 মাস্তলিকের পুণ্যময় চন্দন ধূপ ধূম,

একদা এনি মধুর নিশাণে ভেঙ্গেছিল তোর ঘুম,
 মায়া'র সোণার রঙ্গীন স্বপন মদির আঁখির কোণে,
 গড়েছিল আসি দেবতার দূত সোহাগে সংগোপনে,
 নব গৌরবে দেখা দিয়েছিল সারাটা বহুক্ষণ,
 হরি' নিয়েছিল সোণার কাঠির পরশে প্রাণের জরা,—
 সহসা প্রাণের শাস্ত সাগরে কাল বৈশাখী ঝড়,
 তোলপাড় করে দিয়ে চলে গেল ভেঙ্গে চূরে অস্তর !
 দেবতা সে গেছে দেবতার পাশে চূপে চূপে চলে হায়,
 তুমি আছ এক সঙ্গীবিহীন বিশ্বের আশ্বিনায় !
 সারা তব্ব তব অনলে দহিছে একি জ্বালা একি তাপ,
 শূন্য পরাণে সজ্জিত শুধু বিধাতার অভিষাপ ।

শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষ ।

ছোট গল্প । *

- -

ছোট গল্প সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ লিখবার ভার আমার উপর প্রদত্ত হইয়াছিল ! তথা-কথিত, অতি অকিঞ্চিৎকর ছই চারিটি গল্প লিখিয়া যে পাণ করিয়াছি, তাহার জন্য যে এমন কঠোর প্রাশস্তিক করিতে হইবে, তাহা ত জানিতাম না । কিম্বা সে কথা বলিবার সময় নাই—সভাপতি মহাশয়ের ঘড়ি ও ঘণ্টা কতব্য বিস্তৃত হইবে না ।

যাঁহারা বড়, তাঁহারা বড় কথাই আলাচনা করিতেছেন ; আমি ছোট, তাই ছোট কথা লইয়া একটু বাগাড়ম্বর করি ।

ছোট গল্প আমাদের দেশে নূতন একটা কিছু নহে ; বেদ উপনিষদ পুরাণ হইতে আরম্ভ করিয়া ঠাকুরনার ঝুলি ও ঠাকুরনাগার পলি, সকলের মধ্যেই ছোট গল্প যুক্ত ও নিখুঁত ভাবে বিদ্যমান । তবে এখন ছোট গল্প বলিয়া যাহা আহির হইয়াছে, তাহা উহারই মধ্যে একটু রকমফের, একটু পাশ্চাত্যগন্ধী ।

এই রকমফের ছোট গল্প কোথায়, কোন্ সাত সমুদ্র তের নদীর পারে প্রথম জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, তাহার ঠিকজি বা কুলপঞ্জী লইয়া বাদামুবাদ আমার পক্ষে শোভা পায় না, তাহা ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিকগণের গবেষণার বিষয়ীভূত । তবে বংশলতা না দেখিয়াও এইটুকু বলিতে পারি যে, করাসী দেশে ছোট গল্পের যথেষ্ট বংশবৃদ্ধি হইয়াছিল ; কারণ অনেক করাসী ছোট গল্প ইংরাজীতে ভাষান্ত- রিত হইয়া আমাদের দেশে আসিয়া পৌছিয়াছে এবং এখনও পৌছিতেছে । এখন ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ইটালি, সুইডেন, নরওয়ে ডেনমার্ক প্রভৃতি সকল দেশেই ছোট গল্পের চাষ আবাদ হইতেছে ।

এই গোষ্ঠীর ছোট গল্প কবে এ দেশে আমদানী হইয়াছে, তাহার সন তারিখ না বলিতে পারিলেও মোটামুটি একটা কথা হয় ত বলিতে পারি । আমার যেন মনে হইতেছে, ‘সাহিত্য’-সম্পাদক মনসী শ্রীযুক্ত জুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় ইহা সর্বপ্রথম মাসিকপত্রের হাটে আমদানি করেন । তাঁহার সম্পাদিত ‘সাহিত্য’ পত্রে তাঁহারই লিখিত ‘প্রাইভেট টিউটর’ এই রকমফের ছোট গল্পের অগ্রদূত । সেই সঙ্গে সঙ্গেই বিশ্ববিজয়ী রবীন্দ্রনাথ এই ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন এবং সেই ‘কাবুলী ওয়ালা’ হইতে আরম্ভ করিয়া এ পর্যন্ত এই ক্ষেত্রে সর্ববাদিসম্মতি- ক্রমে সর্বপ্রধান আসন অলঙ্কৃত করিয়া আসিতেছেন । সাপ্তাহিক পত্রিকায়ও

টোকার পূর্বে ছ একটা ছোট গল্প প্রকাশিত হইয়াছিল । আমার যেন মনে হয়, 'চিন্তাবাদী' যখন প্রথম প্রকাশিত হয় তখন রবীন্দ্রনাথ এই পক্ষে সর্বপ্রথম ছোট গল্প লেখেন ।

অবিখ্যাত বাবসায়ী এনডু ইউল কোম্পানী যেমন প্রথমে বিনামূল্যে পরে অল্পমূল্যে চায়ের পেয়াল দিয়া আমাদের দেশটাকে ভীষণ চা-পোর করিয়া তুলিয়াছেন, সমাজপতি ও রবীন্দ্রনাথও তেমনই বার্ষিক চট টাকা কি তিন টাকা ছয় আনা লইয়া প্রথমে 'সাহিত্য,' 'সাধনা' ও 'ভারতী'র মারফৎ ক্রমাগত ছোট গল্প ছোপাইয়া এখন দেশটাকে ভীষণ ছোটগল্পপোর করিয়া তুলিয়াছেন । এখন বাঙ্গালা সাহিত্যে একেবারে ছোট গল্পের জোয়ার আসিয়াছে । এই জোয়ারের টানে অনেক ডিপ্রে পানসী বছরা প্রভৃতিতে পা'ল তুলিয়া দিয়া জাতির চটতেছেন ।

আমার যেন মনে পড়ে 'সাহিত্য' পত্রেই সর্বপ্রথম বাঙ্গালা ভাষায় গি দে মোণাশার ছবি ও জীবনকথা প্রকাশিত হয় এবং আমাদের আঁকের বন্ধু ও সুজন ঐগুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী ওরফে বীরবল মহাশয় সর্বপ্রথম মোণাশার একটা গল্পের অমুবাদ করিয়া 'সাহিত্য' পত্রে প্রকাশিত করেন । বীরবলের সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের পরলোকগত বন্ধু ও সাহিত্য-সখা নলিনীকান্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয় নো পাঁশার ও অজ্ঞাত লেখকের ছোট গল্পের অমুবাদ 'সাহিত্য' পত্রে প্রকাশিত করেন । তাহার পর চটতে এ পর্য্যন্ত অনেক অমুবাদ চলিতেছে ; কেহ বা অমুবাদ স্বীকার করেন, কেহ বা বলেন ছায়া অবলম্বনে লিখিত, কেহ কেহ বা বলেন আদি ও অকৃত্রিম—একেবারে ওরিন্দিমাল ।

একটি কথা এখানে না বলিলে চলিতেছে না । এখন যে সকল সম্ভব আশি পূজা বাপী গল্প ছোটগল্প বলিয়া চলিতেছে, তাহাই যদি ছোটগল্পের প্রকৃত আরতন বলিয়া স্বীকৃত হয়, তাহা চটলে আমাকে বলিতেই হইবে যে, আমি পূর্বে যাচা বলিচ্ছি তাহা ঠিক হয় নাই । তাহা চটলে সাহিত্যসম্রাট বক্সিমজের ও তাঁহার স্নাতৃগণের যুগলানুরীক্ষক, সাধারানী, মধুনতী ; নামোদের মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদিত প্রবাদ পত্রে জয়চাঁদের চিঠি, তারকনাথ বিশ্বাসের গল্পগুলি বাঙ্গালা ছোট গল্পের আদি ও অকৃত্রিম । "

কিন্তু আমি ও সকল কথা বলিতে বসি নাই ; এবং আমি যাচা বলিলান তাহাই যে একেবারে নিদুল, তাহাও বলিতে পারি না ; স্মৃতির সাহায্যে যতটুকু পারিলাম, তাহাই বলিলাম । বর্তমান বাঙ্গলা সাহিত্যের নিরুদ্দেশ করাট আমার প্রবন্ধের উদ্দেশ্য ।

প্রথমতঃ, গল্প ভ্রমিষট্টা বলিতে এই বুঝা যায় যে, উহা কোন সম্ভবপর ঘটনা-বৈচিত্র্যের বিবৃতি। উহা সত্য ঘটনার উদ্ভিতবৃত্ত নহে; তবে উহা কল্প-ঘটনার বিবৃতি, স্বাভাবিক অবস্থায় সে ঘটনা সংঘটিত হওয়া অসম্ভব নহে। সিদ্ধবাদ নাবিকের সমুদ্রযাত্রা, বা চীন রাজকুমারীর রাতারাতি বোধদ্যোপগমন, আমার এই সিদ্ধান্ত নহে গল্প নহে, আজ্ঞাবি একটা কি যেন!

ঘটনার আলোচনা করিতে হইলে অবশ্য ঘটকের সন্ধান লওয়া দরকার; ঘটকের আকার প্রকার, মনোভাব এবং কর্মকাণ্ডের বিবৃতি আবশ্যক। তাহা সাধারণতঃ দৃষ্টিগোচর বা জ্ঞানগোচর অপ্রকৃতি হইতে ঘটক তখনই হউক না কেন, একেবারে আজ্ঞাবি না হইলেই হইল। নাহয় যাহা চিন্তা করিতে পারে, বলিতে পারে, করিতে পারে, তাহা উপরিউক্ত ঘটকগণ করিয়াছেন কি না, তাহাই দেখিতে হইবে। গল্পের সাক্ষ্য সেখানেই, যেখানে অপ্রকৃতি কর্মের পরম্পরা এবং ফল হইতে অপ্রকৃতির চিত্তবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। অসামঞ্জস্য গল্পের মারাত্মক বাধি; বলা বাস্তব্যা আমরা অনেককে এখন এই বাধি-প্রদীপিত।

বড় গল্পের সঙ্গে ছোট গল্পের পার্থক্য অনেক। প্রথমতঃ বড় গল্প কেবল একটা ঘটনার অথবা ঘটনাসমষ্টির ক্রমবিকাশ অল্পসরণ করিয়া বৈচিত্র্যের শেষ সীমায় উপস্থিত হয়। দ্বিতীয়তঃ, প্রায়শঃই ইহার মধ্যে বহুভবনের এবং বহু অস্ত-ভবনের ঘাতপ্রতিঘাত জনিত জটিলতার সৃষ্টি হয় এবং তাহার বিশ্লেষণও পরিশুদ্ধ হয়। তৃতীয়তঃ, ইহাতে মূখ্য ও গৌণভাবে বহু ব্যক্তি, বহু ভাব ও বহু ঘটনার সমাবেশ করিতে হয়, ইত্যাদি—

ছোট গল্পের আকার যেমন ছোট, ইহার উজ্জলতাও তেমনই প্রখর। প্রথমতঃ ছোট গল্পে কোন একটা ঘটনা, কোন এক জোড়া নাগকনায়িকা বা ব্যক্তিবিশেষের সম্পর্কিত কোন একটামাত্র ব্যাপারের ব্যাখ্যা। উহাতে আগের বা পরের কোন কথাই নাই—তাহার আবশ্যকতাও নাই। উহা ঠিক গভীর রজনীতে পুলিশ সার্জনের চোরা লুণ্ঠনের তীর আলোকের দ্বারা আলোকিত স্থান-বিশেষের জ্ঞান। পাঠকের মন কেবল সেই আলোকিত স্থানেই নিবদ্ধ হয়, এবং তাহার চিন্তাতরঙ্গ তাহারই চারিদিকে অন্ধকারের মধ্যে নাড়িতে থাকে।

ছোট গল্প লেখার মধ্যে কায়দা, ভঙ্গী, কলা অর্থাৎ Art বর্তমান থাকি আবশ্যক। গল্প বড়ই হউক আর ছোটই হউক, উহা সফলতা হওয়া চাই ই। সফলতা হইতে হইলে উহা লিখনভঙ্গীর (style) উপর বহু পরিমাণে নির্ভর করে।

আর নির্ভর করে আত্মমনবস্তুর পরিণতির নির্দেশের উপর, অর্থাৎ ইংরাজীতে বলিতে বলিতে হয় indication of its development by way of suggestion. ছোট গল্পের কাহিনী বা কলা বা art বস্তু পরিমাণে তাহার মধোর কথোপকথন অংশের উপর নির্ভর করে। যেকোনো লম্বা বস্তুতা দ্বারা কথাটা বলাইবার লক্ষ্যে চেষ্টা না করিয়া তিনি গল্পোক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে যে পরিমাণ কথা দসাইতে পারিবেন, সেট পরিমাণে গল্প স্বন্দর হইবে এবং তাহার আঁট ও পরিস্ফুট হইবে। কিন্তু গল্পোক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে যে সে কথা বসাইলেই হইবে না তাহা হইলে ত একেবারে মাটি। যত কথা বলাইতে চেষ্টেবে সব কথার সম্পূর্ণ সার্থকতা চাই।

আমাদের দেশে অল্প ছুই চারিজন ব্যতীত যে ভাল গল্পলেখক জন্মিতেছে না, অথচ ঝুড়ি ঝুড়ি ছোট গল্পের আমদানী হইতেছে, তাহার কয়েকটি কারণ আছে। আমার সামান্য বিবেচনায় মনে হয় যে, আধুনিক বাঙালী গল্পলেখকগণ সাহিত্য তৈয়ারী করিতে চেষ্টা করেন না : তাহার ছোট গল্পের স্বভাব উপলব্ধি করেন না আর তাহাদের চারিদিকে ঘিরিয়া ছোট গল্পের যে সকল উৎকৃষ্ট উপাদান রহিয়াছে, তাহা হইতে সম্পদ আহরণ করেন না, অর্থাৎ তাহারা চক্ষু চাতিয়া দেখেন না। তাহার ফল এই হয় যে, তাহারা গল্প লিখিতে বসিয়া কল্পিত নরেন্দ্রনাথ ও কমলিনীর প্রণয় ব্যাপারটা কিরূপ ঘটা তাহাদের কল্পনা অতুলারে উচিত ছিল, তাহারই সম্বন্ধে একটা স্বদীর্ঘ দার্শনিকতাপূর্ণ ও ভাবপ্রবণ মন্তব্য লিখিয়া পাঠকের সম্মুখে পাড়া করেন।

আমাদের এই সকল বিড়ম্বনা দেখিয়াই রবীন্দ্রনাথ এক সময়ে বলিয়াছিলেন যে, এখন যে সমস্ত ছোট গল্প বাতির হয় তাহা ছোট হইতে পারে, কিন্তু গল্প নহে—ছোট গল্প ত নহেই। ছোট গল্প সম্বন্ধে আমার এই অতি ছোট প্রবন্ধটিকে সকলে আমার কবুল-জবাব বলিয়া গ্রহণ করিলেই আমার উদ্দেশ্য সকল হইবে।

সভাপতি মহাশয়ের ঘটাপ্রদান প্রবণ করিবার পূর্বেই আমার ঢকা নিনাদের মধুরতা আপনারা উপভোগ করুন।

ত্রীকলধর সেন।

ক্ষণ মিলন ।

আলোক প্রাবনে ভাঁটা পড়ে আসে
 দিবস পিছারে পড়ে,
 নয়ন 'তুলাগে জ্বালাল দরদী
 পুসর বরণ পরে' !

দিবস নিশান সন্ধি নিমেষে
 স্তিমিত আলোক পথে,
 কবিকের রেখা, চলে গেলে ছায়
 অঁধারে, আলোক হ'তে !

প্রভাত উদয়ে আলোক জোয়ার
 ভুবন ভরিবে যবে,
 তোমার বিদায় নয়ন তিমির,
 মরনে জাগিয়ে যবে !

ঔপ্রিয়দম দেবী

সামাজিক সমস্যা ।

লৌকিকতা ।

“লৌকিকতা” কথাটা আমাদের সমাজে কি অর্থে ব্যবহৃত হয় তাহা আর বোধ হয় বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া বলিতে হইবে না । হিন্দু সমাজের সকলেই এই লৌকিকতার সঙ্গে ভালরূপেই পরিচিত আছেন । তবে ইহাকে সামাজিক সমস্যার অন্তর্গত করা হইল কেন, এটা কাহারও কাহারও নিকট একটু সমস্যাপর মত বোধ হইতে পারে বটে কিন্তু, একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহার কারণ অগুসন্ধান করা কঠিন হইবে না ।

লৌকিকতাটা আমাদের প্রাচীন সামাজিক প্রথা সমূহের অন্ততম । বহুকাল হইতেই ইহা সমাজ-শরীরে আশ্রয়লাভ করিয়া বাঁচিয়া আছে । এখন এট আশ্রয় হইতে ইহাকে বিচ্যুত করিবার চেষ্টা, লৌকিকতাকে একপে সমাজ

হইতে নিম্নাসিত করিবার জন্য এক দলের চেষ্টা হইয়াছে । হুতরাং এটা একটী সমীক্ষা হইয়া দাঁড়ায় নাই কি ? সমাজে ইহা থাকাই উচিত, অথবা ইহার সম্পূর্ণ উচ্ছেদই বাঞ্ছনীয় কিংবা ইহার প্রাচীনত্ব হেতু, যে সব দোষ ইহাতে প্রবিষ্ট হইয়াছে সে গুলিকে যথাসম্ভব বাড়িয়া ফেলিয়া দিয়া ইহার সংস্কার সম্পাদনই সমীচীন এই কথাটা বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক নয় কি ? আজকাল জীবনকাল সময় মুহুর্ত নিমগ্ন-পরের এক কোণে “লৌকিকতা গ্রহণে অক্ষম” এইরূপ একটা বাক্যও দেখিতে পাওয়া যায় । যাহারা এইরূপ ভাবে লৌকিকতার হইতে মুক্তি পাইতে চাহেন তাহারা যে, লৌকিকতা গ্রহণের পক্ষপাতী নহেন, একথাটা না বলিলেও চলে ।

পূর্বে এইরূপ কথা উঠিত না—পূর্বে নিমগ্ন পত্রেও এরূপ কোন কথা লেখা থাকিত না । এইরূপ লৌকিকতা করার নিবেদন বিমিষ্টা অতি অল্পদিন হইতে প্রচলিত হইয়াছে, অবশ্য এখনও ইহার প্রচলন তাদৃশ বিস্তৃতিলাভ করে নাই । কিন্তু প্রচলকগণ ইহার প্রচলনের আবশ্যকতা উপলব্ধি করিয়াছেন ইহা ধরিয়া লইতেই হইবে । সেই আবশ্যকতাটা কি, তাহা নির্ণীত হওয়াই প্রথম কর্তব্য । কারণ, সেই কারণটা পাওয়া গেলেই তাহার উপর বিচার বিবেচনা করিবার সুবিধা হইবে ।

আমরা যথাসাধ্য ক্রমে ক্রমে তাহা এবং এতদাঙ্গসম্বন্ধি আর আর শাখা-পত্রের বিষয় আলোচনা করিয়া এ সমস্যার সমাধান করিতে চেষ্টা পাইব ।

আমি ক্ষুদ্রবাক্তি, বুদ্ধি ও বিবেচনা শক্তিতে আমার অতি সামান্য—তবে এই সব বিষয় লইয়া অনেকদিন ধরিয়া মনে মনে আলোচনা ও আন্দোলন করিয়া যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, তাহাই আমি নিবেদন করিব । যদি তাহাতে ভ্রম প্রমাদ থাকে তবে স্বীকরণ রূপাপূর্ণক তাহা প্রদর্শন করিলে কৃতার্থ হইব ।

চন্দ্র দশবিধ সংস্কারের (বিবাহ, গর্ভাধান, পুংসবন, সীনস্তোময়ন, জাত কৰ্ম্ম, নিষ্ক্রমণ, নানকরণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন) মধ্যে বিবাহ, অন্ন-প্রাশন, উপনয়ন এই তিন সংস্কারের সময় এবং স্থল বিশেষে সময় সময় শ্রাদ্ধ-ক্রিয়ার কালে আমন্ত্রিত আত্মীয় ও বনিষ্ট বন্ধুগণ কর্তৃকর্তাকে কিছু কিছু সাহায্য দান করেন, ইহাকেই আমরা লৌকিকতা বলিয়া থাকি । শারদীয়া পূজা কি এরূপ বৃহৎ কোন পূজার্কর্মের উপলক্ষেও স্থল বিশেষ যে প্রণামী দান করা হয় তাহাকেও একরূপ লৌকিকতাই বলা যাইতে পারে । তবে এই প্রণামী দান প্রথাটা

সর্বদেশে সকল সমাজে সেক্ষেপ প্রচলিত নাই। কিন্তু উক্ত ত্রিবিধ সংস্কার উপলক্ষে লৌকিকতা বাস্তবায়নের সর্বত্রই প্রচলিত আছে। বাস্তবায়নের ভিন্ন ভিন্ন দেশেও যে একবারে নাই তাও বলিতে পারি না। তবে স্থানে স্থানে প্রণালীটা ভিন্নরূপ। আমরা বর্তমান প্রবন্ধে প্রধানতঃ বঙ্গদেশের প্রচলিত প্রণালীটাই আলোচনা করিব।

এই সব লৌকিকতাকে যে সর্বদাই নগদ টাকায় দেওয়া হয় এমন নহে, বহু, অলঙ্কার, মিষ্টদ্রব্যাদিও স্থল বিশেষে প্রদত্ত হইয়া থাকে। বিবাহব্যাপারে অনেক সময়ই বহু ও মিষ্ট দ্রব্যাদি দ্বারাই লৌকিকতা করা হয়। পুত্রের বিবাহ স্থলে, বধুর মুখ-দর্শনী বাবদ লৌকিকতা প্রায়ই টাকা দিয়াই রক্ষা করা হইয়া থাকে। এইরূপ সব কার্যে আর্থীয় বন্ধুগণের উপহার প্রদান অথবা লৌকিকতা বিলাত প্রভৃতি অকলেও প্রচলিত আছে। বাহ্যর বৈরূপ সাধ্য সে সেইরূপ ভাবেই এ লৌকিকতা রক্ষা করিয়া থাকে। সে সব দেশে জন্মদিন, খ্রীষ্টমাস প্রভৃতি উপলক্ষে এইরূপ উপহার প্রদান করা হইয়া থাকে ইহা অভিজ্ঞগণ জ্ঞাত আছেন।

আবার আমাদের দেশে আর একরূপ লৌকিকতাও আছে তবে মৌভাগ্যক্রমে আমাদের স্থায় দরিদ্রগণের সে লৌকিকতার ভার বহন করিতে হয় না। কিন্তু দেশের মহারাজা, রাজা, জমিদার প্রভৃতি বড় লোকগণকে সময় সময় তাহার ভার বিশেষরূপেই বহন করিতে হয়—সেটা এ দেশস্থ ইউরোপীয় পদস্থ লোকদিগের পুত্রকন্যা প্রভৃতির অথবা নিজেদের বিবাহের লৌকিকতা; সময় সময় তাঁহাদের গৃহিনীগণের ঐ সব বড়লোকদিগের বাড়ীতে পদধূলি প্রদান উপলক্ষে লৌকিকতা। এ সব লৌকিকতা চু চারি টাকাতে হইবার নহে, ছ দশ হাজার ব্যয় করিতে হয় বলিয়া শুনিয়াছি, আর এ লৌকিকতার একটু বিশেষত্ব এই যে ইহার প্রতি লৌকিকতার আশা বড় কিছু নাই তবে সম্মিত শুল্কগর্ভ মৌখিক ধন্যবাদ কে যদি প্রতি লৌকিকতার স্থলাভিষিক্ত করা যায় তাহা হইলে সে ভিন্নকথা।

যাহা হউক আমাদের সমাজে যে এই প্রণালী বহুকাল ধরিয়া প্রচলিত আছে ইহার উৎপত্তির মূল কারণটা কি?

প্রাচীন সমাজতত্ত্ব পণ্ডিতগণ কি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হইয়া সমাজে ইহার প্রচলন করিয়াছিলেন? সমাজকে পীড়িত করিবার উদ্দেশ্যেই যে তাঁহারা ইহার প্রবর্তন করিয়াছিলেন এরূপ অসম্ভবত্ব অসঙ্গত। কারণ ইহা সমাজের প্রত্যেক

ব্যক্তির উপরই সমভাবে প্রযোজ্য স্মৃতরাং কাহারও ইহার চাত হইতে মুক্ত থাকিবীর উপায় ছিল না। একপক্ষেই তাঁহারা নিজকে পর্যাপ্ত পীড়িত করিবার অভিপ্রায়ে সমাজ-শরীরকে এই ক্ষত উৎপাদন করিয়াছিলেন একপ ধারণা সমীচীন নহে।

নিশ্চয়ই তাঁহারা সনাত্ত স্থিতি করে, ইহার একটা প্রয়োজনীয়তা ও উপ-কারিতা উপলব্ধি করিয়াই ইহার প্রচলন করিয়াছিলেন—সনাত্তের উৎসাদনের জন্ত নহে। হইতে পারে, তাঁহাদের ধারণা ভ্রান্ত, বর্তমান অর্থনীতি ও সনাত্ত নীতির হিসাবে তাঁহাদের ব্যবস্থা দৃশ্যীয় বিবেচিত হইতে পারে কিন্তু তাঁহাদের উদ্দেশ্য মন্দ ছিল, ইহা আমরা কখনই বলিতে পারি না।

তাঁহাদের এই উদ্দেশ্যট কি, তাহাই বুঝিতে করিয়া তাহার পরে তাঁহাদের ব্যবহার ওণা ওণ বিচারের প্রয়াস পাইব।

আমি এই বিষয়ে চিন্তা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, যে পারম্পরিক সাহায্যের উদ্দেশ্যেই এই লৌকিকতার প্রবর্তনা হইয়াছে। আজকাল যে Co-operative credit-এর উপকারিতার বিষয় জনগণকে নানা উপায়ে বুঝাইতে চেষ্টা করা হইতেছে, এই লৌকিকতাটাও অনেকটা সেই ভাবের উপরই প্রতিষ্ঠিত। দেশে আজকাল প্রভিডেন্ট কোম্পানির অভাব নাই; বিবাহ, উপনয়ন, অন্ন-প্রাশন প্রভৃতির ব্যয়-নির্বাহের উপায়ের জন্ত এই সব প্রভিডেন্ট কোম্পানির প্রতিষ্ঠা। তাহাতে চাঁদা প্রতিমাসে দিতে হইবে তারপর বিবাহাদির সময় উপস্থিত হইলে, প্রদত্ত চাঁদার ত্রিগুণ, বা ত্রিগুণ, কি ঐরূপ একটা মোটা রকমের টাকা পাওয়া গাইবে।

এই লৌকিকতার প্রথাও নীরবে, এইরূপ প্রভিডেন্ট ফণ্ডের কাজ অনেকটা করিয়া থাকে। আমার কন্ডার বিবাহে হাজার টাকার প্রয়োজন, আমার আত্মীয় বন্ধুবান্ধবেরা সেই ব্যয় সংকুলানের জন্ত প্রত্যেকে সাধ্যমত আমাকে সাহায্য করিয়া লৌকিকতা রক্ষা করিলেন; আমি এই ধরনের সময় কিছু টাকা এইরূপে একত্রে পাইলান, তাহাতে আমার ব্যয়ভার একটু যেন লাঘব হইল। আবার তাঁহাদের এইরূপ কার্যের সময় আমি সাধ্যমত তাঁহাদের সাহায্য করিব। এইরূপ পারম্পরিক সাহায্য এই লৌকিকতা প্রথার দ্বারা হইয়া থাকে; এই উদ্দেশ্যেই এ প্রথার প্রবর্তনা হইয়াছে।

কোন কোন প্রভিডেন্ট ফণ্ড নিয়ম আছে যে, নিয়মিত চাঁদা ব্যতীত প্রত্যেক বিবাহের উপর প্রত্যেক মেঘরকে একটা নির্দিষ্ট অতিরিক্ত চাঁদাও দিতে হয়।

আবার যাহার বিবাহের জন্ত টাকা দিতেছি বিবাহের পূর্বে যদি তাহার মৃত্যু হয় তাহা হইলে প্রদত্ত টাকার কতকাংশ নাত্র ফেরৎ পাওয়া যায় ।

কোন কোন ক্যান্ডিলি প্রভিডেন্ট ফণ্ডের নিয়ম আছে, যে মনোনীত ব্যক্তির পূর্বেই মৃত্যু হইলে, প্রদত্ত টাকার কিছুই ফেরৎ পাওয়া যায় না ।

আমাদের এই লৌকিকতার অন্তরালেও প্রচ্ছন্ন ভাবে ইচ্ছার কতকটা দেখিতে পাওয়া যায় । সনাতন এমন লোক আছেন, যাহার বিবাহ দিবস, কি অগ্ৰপ্রাশন দিবস কেহই নাই । তাঁহাকেও লৌকিকতা রক্ষা করিতে হয় ; কারণ তিনিও ত সনাতনের একজন বটে ! একরূপ স্থলে তিনি পরার্থে স্বার্থত্যাগ করিতে বাধ্য হন । অথচ তিনি ছঃঃ হইলে আর আত্মীয় স্বজনের সংখ্যা বেশী হইলে এতগুলি তাঁহাকে সময় সময় বড় বেগ পাইতে হয় সন্দেহ নাই যে বিষয়ের বিচার ও আলোচনা পরে করা যাইবে । তবে অনেক সময় ছঃঃকেও বাধ্য হইয়া সরকারী চাপে voluntary contribution অথবা স্বেচ্ছাপ্রদত্ত টাকা দানের ভাগ করিতে হয় । ইহা বোধ হয় কাহারও অবদিত নাই । মনিবের চাপে যদি হনস্ফু কি কামরাট্কার লোকদের সাহায্যের জন্ত টাকা দেওয়া চলে, তবে সনাতনের নিয়মে আপন আত্মীয় বন্ধুর ক্রিয়াকলাপে মধ্যে মধ্যে একরূপ লৌকিকতা করাটাই বা না চলিতে পারে কেন ? যাহা হউক আসল কথাটা এই যে, এইরূপ পারম্পরিক সাহায্যের উদ্দেশ্যেই এই লৌকিকতা প্রথা প্রবর্তিত হইয়াছে । ইচ্ছাধারা বিনা বিজ্ঞাপনে, বিনা নিয়মাবলীর মুসিত তালিকাতে কতকটা প্রভিডেন্ট ফণ্ডের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়া থাকে । অবশ্য একথা ঠিক, যে একজন লোকের কতই আত্মীয় স্বজন থাকে আর তাঁহারা কতই টাকা দেন, যে তদ্বারা বিশেষ একটা সাহায্য হইতে পারে । কিন্তু ইহার অন্তরালে যে প্রচ্ছন্ন মেহ-মমতার একটা প্রতির অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়, সেইটার মূল্য অনেক বেশী—তাঁহা অমূল্য ! আমার আত্মীয় এই কার্য করিতেছেন, আমি তাঁহার কার্যে সহায়ত্ব প্রদর্শন করিয়া আমার সামর্থ্যানুরূপ সাহায্য করিতেছি, এই যে, একটা আপনাআপনির ভাববন্ধন, ইহাই সমাজবন্ধন দৃঢ়তর করে এবং সনাতনের নিরপেক্ষ ভাব বুচাইয়া তথায় সাপেক্ষের ভাব প্রতিষ্ঠিত করে । সমুদ্র-বন্ধনে সামান্য কাষ্ঠবিড়ালীর নগণ্য সাহায্যও যেমন উগবান কর্তৃক সাগরে গৃহীত হইয়াছিল এইরূপ ক্ষেত্রেও বহুগণের, আত্মীয়স্বজনের স্বেচ্ছাকৃত দান তাঁহাদের জন্মস্থিত মঙ্গলাশীষদ্বারা স্বাত হইয়া অপূৰ্ণ গৌরবমণ্ডিত ভাবে প্রতিভাত হয় । এইজন্যই তাহা সাগরে গৃহীত হইয়া থাকে ।

হৃদয়দর্শী প্রাচীন সামাজিকগণ এই পারম্পরিক সাহচর্যের ভাবপ্রাণোদিত হইয়াই যখন এই লৌকিকতা প্রথার প্রচলন করিয়াছিলেন, তখন তাঁহাদের উদ্দেশ্য কেমন করিয়া আনন্দের নিম্নলিখিত বলিতে পারি ? ইহার দ্বারা অজ্ঞের কার্যে নিজেদের একটা মনোভাব পরিস্ফুট হইয়া উঠে ! ঐচ্ছারা আত্মীয়স্বজন কেবল তাঁহারাষ্ট, এই লৌকিকতা রক্ষা করেন, প্রত্যেক নিম্নলিখিতকেই তাচা করিতে হয় না । সুতরাং ঐচ্ছারা এই লৌকিকতা রক্ষা করেন, তাঁহাদের মনে কর্মকর্তার সহিত একটা বিশেষ ঘনিষ্ঠতার ভাব উদ্ভিত হইয়া তাঁহাদিগকে সাধারণ নিম্নলিখিতগণ হইতে পৃথক করিয়া দেয়—তাঁহারা সেই বাড়ীরই একজন এইরূপ একটা মনোভাব, তাঁহাদের মনে জাগরিত হয় এবং তাঁহারা বিশেষভাবে কর্মকর্তার কার্যের সুসম্পাদনের অহুতানে বাস্তব থাকেন । সুতরাং প্রথাটিরমূলে উদ্দেশ্য অসুং নচে মতই বলিতে হয় ।

অনেকদূরে চাহ আত্মীয়ের বাড়িতে এইরূপ কোন ত্রিভাঙ্গলাপ উপস্থিত হইলে, অর্থাৎ অল্প আত্মীয় তাঁহাকে কোন একটা অলঙ্কার, পরিচ্ছদ, শয্যা কি এইরূপ কোন জিনিস দ্বারা লৌকিকতা করিয়া তাঁহার তার অনেকটা লগু করিয়া দেন ; এবং পূর্ণ হইতেই কর্মকর্তাকে সে বিষয় জ্ঞাপন করিয়া তাঁহাকে আশ্বস্ত করেন, ইচ্ছাতে প্রকৃত সনবেদনা জানান হয় । আবার কর্মকর্তা স্বয়ং সম্পন্ন ব্যক্তি হইলেও সামাজিক নিয়মে তাঁহাকে মধ্যবিত্ত অপবা দরিদ্র আত্মীয়ের নিকট হইতে লৌকিকতা গ্রহণ করিতে হয়, তদ্বারা তাঁহার মনে অহঙ্কারের ভাব আসিতে পারে না । তিনি বহুলোক বলিয়া দরিদ্র আত্মীয়ের এ সাহায্য উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে পারেন না । তিনি তাহা সাধারণ গ্রহণ করিয়া প্রতি লৌকিকতা স্থলে প্রদত্ত অর্থের বা অল্প যোক্তকের দ্বিগুণ, ত্রিগুণ বা চতুর্গুণ প্রদান করিয়া দরিদ্র আত্মীয়েরও সম্মান রক্ষা করিয়া থাকেন । ইচ্ছাতে তাঁহার জন্মবস্তুর ভাব প্রকটিত হয় । তৎপরিবর্তে যদি ঐরূপ সম্পন্ন কর্মকর্তা লৌকিকতা গ্রহণ না করেন, তাহাতে তাঁহার একটা উপেক্ষার ভাব ফুটিয়া উঠে—তিনি সমাজের নিকট, নিজ আত্মীয় স্বজনের নিকট হইতে কোন সাহায্য গ্রহণ করিবার আবশ্যকতা দেখিতে পান না—এই ভাবটাই উক্তরূপ ব্যবহারে প্রকটিত হয় । আনন্দের সমাজ, নর্যাদার উপর প্রতিষ্ঠিত, অর্থের উপরে নচে । হিন্দুর সমাজে প্রত্যেক শ্রেণীর, যে সব নির্দিষ্ট শ্রেণী আছে সেই সেই শ্রেণীর অন্তর্গত ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সকলেই একই বন্ধনে আবদ্ধ । সামাজিক হিসাবে ঐচ্ছাদের কুল নর্যাদা অধিক, তাঁহারা যতই দরিদ্র

হউন না কেন, সামাজিক ব্যাপারে তাঁহাদেরই আসন সকলের চেয়ে উচ্চে ।
অতঃপর এইরূপ সামাজিক ব্যাপারে দরিদ্র আত্মীয়কে ছাঁড়িয়া ফেলিবার
উপায় নাই । যদি তাহা করা যায়, তবে অশ্রমশ্রম ভিন্ন আর কিছু লাভ হয় না ।

লৌকিকতার আদান প্রদান ব্যাপারে এই সামাজিক বন্ধনের চিত্রই আমরা
দেখিতে পাই, এবং ইহার মধ্যে সমবেদনা ও ঘেঁহের শুভ হাতছাটাই প্রতিভাত ।
অতএব ইহাকে একেবারে সমাজবন্ধ হইতে বিদূর্ণিত করা আমরা সমর্থন
করি না—কোন দেশেই বোধ হয় তাহা সমর্থন করিলে না ।

তবে যদি ইহার অপব্যবহার হইয়া থাকে, তাহার সংশোধন অবশ্যই বাঞ্ছনীয়
সন্দেহ নাই ।

সময় সময় আমরা দেখিতে পাই, যে লৌকিকতার ভারতময় অস্ত্রসারে পাতিল
যন্ত্র, ইতর বিশেষ করা হয় ।

যে আত্মীয় লৌকিকতা করিতে অপারগ তাঁহাকে যেন কিছু সঙ্কুচিত হইয়া
পাকিতে হয় এবং তাঁহাকে যেন অনেকে রূপার চক্ষে দৃষ্টি করে এটা যে
সঙ্গত নহে তাহা আর বেশী করিয়া বলিবার কোন প্রয়োজন করে না । তাঁহারা
প্রকৃত নমস্বী সেরূপ ব্যক্তি কখনই এরূপ করিলেন না, ইহা ব্রহ্ম নিশ্চয় । যদি
কোথাও এরূপ ইতর বিশেষের অস্তিত্ব হয় তাহা হইলে সৰ্ব্ব প্রযত্নে তাহা
পরিচাছা ।

অনেকস্থলে লৌকিকতার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিলৌকিকতা করার প্রথা আছে ।
একজনের পুত্রের বিবাহে, অথবা একজন লৌকিকতা করিলেন, কর্ম্মকর্ত্তা আবার
তৎপরিবর্তে বস্ত্রাদি দ্বারা আত্মীয়কে সংবর্দ্ধিত করিলেন । যে স্থলে কর্ম্ম-
কর্ত্তা সম্পন্নব্যক্তি সে স্থলে ইহাতে কোন কষ্টের কারণ নাই । কিন্তু কর্ম্মকর্ত্তা
দরিদ্র হইলে এইরূপ প্রতিলৌকিকতা করাতে তাঁহাকে বেশী দায়গ্রস্ত
হইতে হয়, আর লৌকিকতার প্রকৃত উদ্দেশ্যের বিপরীত কার্য্য হইয়া পড়ায় ।
এইরূপ সব ক্ষেত্রে কর্ম্মকর্ত্তার লৌকিকতার বিনিময় না করাই সঙ্গত । তাঁহাকে
আত্মীয়গণের বাটীর ভবিষ্য ক্রিয়াকলাপের অপেক্ষা করিতে হইবে । যখন
সেরূপ ক্ষেত্র উপস্থিত হইবে তখন তিনি তাঁহার সাদা মত লৌকিকতা
রক্ষা করিবেন ।

যেখানে লৌকিকতা নাই, সেখানে প্রতিলৌকিকতাও নাই সমাজের এই
পদ্ধতিতে সৃষ্টি হয় যে গনিষ্ঠ আত্মীয়গণের মধ্যেই লৌকিকতার ব্যবহার
প্রচলিত । নতুবা যেখানে সামাজিকতা নাই, সেখানে লৌকিকতার প্রয়ো-

জনীয়তাও নাই। কিন্তু অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায় যে চক্ষু-লক্ষ্যের পাঠের বসনাজের বহির্ভাগেও অনেককে এইরূপ লৌকিকতা রক্ষা করিতে হয়, তাহা অনেক সময়ই এক তরফা হওয়াতে দাতার পক্ষে বড়ই কষ্টকর হইয়া পড়ে। একটা দৃষ্টান্তস্বরূপ কথাটা বিশদ করিতে চেষ্টা করিব।

এক জেলার উপর একজন লোক একাকী কর্তৃ উপলক্ষে বাস করেন। তাঁহার বেতন সান্নাৎ ৪০।৫০ টাকা, কিন্তু কর্তৃহস্তে জেলার উকীল মোক্তার জজ মুনসেফ প্রভৃতি পদস্থ লোকের সহিত তিনি গনিষ্ঠ ভাবে জড়িত। সুতরাং ই সব ব্যক্তির বাসিতে কোন শুভকর্মা উপলক্ষে তাঁহারও নিমন্ত্রণ হয়। এখন ই ভদ্র লোককে যদি প্রত্যেক নিমন্ত্রণ লৌকিকতার সহিত রক্ষা করিতে হয় তবে গড়ে মাসে ৪।৫ টাকা ঐ হিসাবেই ফেলিতে হয়; যে ব্যক্তি ৪০।৫০ টাকা বেতন পায় তাঁহাকে যদি ঐরূপ লৌকিকতা কুটুংহল বাতীত অজ্ঞাত স্থলেও রক্ষা করিতে হয়, তাহা হইলে তাঁহার উপর বিশেষ চাপ পড়ে আর তিনি এদিকে একাকী। তাঁহার দেশের বাড়ীর কার্যে এসব লোককে আনয়নও করেন না প্রতিলৌকিকতার আশাও তাঁহার নাই। এইরূপ সব স্থানে ঐরূপ লৌকিকতা গ্রহণ না করা অথবা গ্রহণ করিলেও উহা প্রতিলৌকিকতা স্বরূপে প্রত্যাশন করাই সনীচিনি বলিয়া বোধ হয়। কোন কোন স্থানে যে এইরূপ করা হইয়া থাকে তাহা আমি জ্ঞাত আছি। আমার বোধ হয় ঐরূপ স্থানে গ্রহণ পূর্বক প্রণামী বা আশীর্বাদী স্বরূপে উহা কোনরূপে দাতাকে প্রত্যাশন করিলেই সকল দিকেই ভাল হয়।

আবার সময় সময় এরূপও ঘটিতে দেখিয়াছি যে লৌকিকতা করিতে অক্ষম আত্মীয় লক্ষ্যেতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতেই যান না। সেই জন্তই অনেকে নিমন্ত্রণ পত্র লৌকিকতা গ্রহণে অনন্যতা প্রকাশ করিয়া ঐরূপ ব্যক্তিগণের ননের সঙ্কোচ দূর করিতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু আবার বিবেচনায় এতদ্বয়ের মধ্যে কোনটাই লৌকিকতার প্রকৃত উদ্দেশ্যের দিকে নহে।

লৌকিকতা করিতে যিনি প্রকৃতই অক্ষম তাঁহার লৌকিকতা করিবার কোনই প্রয়োজন নাই, তিনি নিম্ন শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা, তথাবধান প্রভৃতি দ্বারা আত্মীয়কে সাহায্য করিতে পারেন। অর্থ বা যৌতুক দ্বারা সাহায্য করিতে পারিলেন না বলিয়া তাঁহার ক্ষুণ্ণ হইবার কোনই কথা নাই এবং কর্তৃকর্ত্তা নিতান্ত নীচমনা না হইলে কখন সেরূপ প্রত্যাশাই করিতে পারেন না।

কোন শুভকার্যে আত্মীয় কুটুম্বগণের সহিত একত্র আমোদ-কুরিবার ইচ্ছা সকলেরই হয়,—সেটাতে যদি লৌকিকতাই বাধা স্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়, তাহা হইলে দেহ ভক্তি শ্রদ্ধা প্রভৃতিরও উপর লৌকিকতার স্থান দেওয়া হয় । সেটা নিতান্তই অসঙ্গত মনেহ কি ?

তারপর ধনী আত্মীয়ের লৌকিকতার প্রতিলৌকিকতাতেও যদি হুঃখ আত্মীয় ধনীর সম্বন্ধতা করিতে যান তাহা হইলেও লৌকিকতার উদ্দেশ্য বার্থ হইয়া যায় । আমি মধ্যবিত্ত বা দরিদ্র অবস্থার লোক, সৌভাগ্যক্রমে আমার ২৪ জন ধনী কুটুম্ব আছে। তাঁহাদিগকে আশ্রয় কছার বিবাহে নিমন্ত্রণ করিলে কেহ একখানি অলঙ্কার দিলেন, কেহ ১০ টাকা পাঠাইয়া দিলেন ইত্যাদি । এখন ঐ সব আত্মীয় কুটুম্বগণের বাটার শুভ কার্যেও যদি আমিও ঐ অল্পপাতে লৌকিকতা রক্ষা করিতে যাই, তাহা হইলে সে লৌকিকতা আমার পক্ষে বড় বিনয় ভারই চইয়া পড়ে । সুতরাং তদ্বারা লৌকিকতার প্রকৃত উদ্দেশ্যই বার্থ হইয়া যায় । এরূপ ক্ষেত্রে আমার ছায় বাক্তির অবস্থারূপ লৌকিকতা রক্ষা করাই আমার কর্তব্য, তাহাতে সম্মুচিত বা ক্লম্ব হইবার কিছুই নাই । ধনী আত্মীয়েরও তাহাতে কোন মনের নিকার হইবার কথা নাই অন্ততঃ থাকা উচিত নহে ।

তারপর আমাদের অনেক সময় এমন সব বন্ধু থাকেন, যাঁহারা কুটুম্ব না হইলেও পরমাত্মীয় । তাঁহাদের সঙ্গে আমাদের সর্ব প্রকারে ঘনিষ্ঠতা থাকিলেও এই লৌকিকতার সম্পর্ক তাঁহাদের সঙ্গে না থাকাই ভাল । আমার যতদূর মনে হয় তাহাতে সর্গীয় পূজাপাদ ভূদেব বাবু তাঁহাদের “পারি-বারিক প্রসঙ্গে”র কোন স্থানে এইরূপ নতই প্রকাশ করিয়াছেন, হুঃখের বিষয় ঐ পুস্তক এখন আমার কাছে নাট সুতরাং তাতা চইতে উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না ।

তবে এইরূপ সব বন্ধুগণের মধ্যে যখন কোন ধর্ম সম্বন্ধের মত একটা কিছু বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হইয়া পড়ে সেরূপ স্থানে বিশেষ বিধিরূপে ইহা সহনীয় হইতে পারে, কিন্তু সাধারণ ভাবে বিদেশের বন্ধুবর্গের মধ্যে লৌকিকতার আদান প্রদানের ব্যবস্থা না থাকিলেই ভাল হয় । কারণ অনেক সময় দেখা যায় যে বাহিরে চক্ষু লজ্জার খাতিরে তাহা রক্ষা করিলেও ভিতরে ভিতরে সেটা ভার বলিয়াই বোধ হয় । লৌকিকতার নানাসিকই আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করিলাম । ইহা হইতে আমরা এই সমাধান করিতেছি যে লৌকিকতার উদ্দেশ্য মঙ্গ

নচে সূতরাং ইহাকে সমাজ হইতে নিষ্কাশিত করা অস্বাভাবিকতা । নিম্নলিখ পত্রে লৌকিকতা গ্রহণে অসম্মতঃ জ্ঞাপন করা সামাজিক দীতিবিরুদ্ধ এবং তাহা গর্হনীয় সূতরাং পরিত্যাজ্য ।

যেখানে লৌকিকতা প্রকৃতই ভারস্বরূপ সে ক্ষেত্রে উচা না করাই কর্তব্য কেহ করিলেও কণ্ডকষ্ঠার পক্ষ হইতে তাহা কোন প্রকারে প্রতাপিত হওয়া বাঞ্ছনীয়, তাহা হইলে গরীব আত্মীয়ের পক্ষে সেটা ভারস্বরূপ হয় না ।

বন্ধুভ্রাতৃসহিত লৌকিকতার সম্বন্ধ না থাকাই ভাল । তাঁহারা আনন্দিত হইবেন, আশিষ্যেন, আমোদ করিবেন, কিন্তু লৌকিকতা করিবেন না । আশা করি সুদীর্ঘায় সমাপনগুলির বিষয় বিচার করিয়া দেখিবেন ।

শ্রীযত্নমাণ চক্রবর্তী ।

কখন না ।

কই—সে মনের কথা হ'ল না বলা—

দাড়াইয়া বনপথে,

ভাবি—বদি কোন নতে

তাড়ারে কহিতে পারি—ছাড়িয়া গলা,

বা হ'বার হবে—তা' যে হ'লনা বলা ।

নে দীর প্রশান্ত মুখ চারু চাহনি,

হেরি হয় শির নত,

রেণু, কণা, অণু মত

আপনারে ক্ষুদ্র ভাবি—কেন কি জানি,

ম'রে যাই—ম'রে যাই লাভে অমনি ।

কি যে কথা—শতবার আসে তা' মনে,

“তুমি নিতা পরিপূর্ণ,”

আমি তুচ্ছ চির শূন্য,

তুমি ভোক্তিঃ নোন্ তমো আমি ভুবনে,

এ অদনে কেন দেবি, রেখেছ মনে !

“যদি করেছ এ দয়া তবে ভুল না”—

এ’কি বলা যায় কভু—

সাগরে ডুবিব তবু,

ছি’ড়ি যাক হিয়া পানি স’ব বেদনা,

এ দীনতা এ হীনতা

মনের লুকা’ন বাণা,

তারে কি জানাতে পারি—না কখন না !

শ্রীমানকুমারী

স্বচ্-বাটপাড় ।

সে দিন লেডি অলষ্টেন প্রায় স্পষ্টভাবেই বলিলেন যে, তাঁহার স্বামী জগতে অতুলনীয় । কথাটি যদিও অক্ষরে অক্ষরে সত্য নয় বাটে, কিন্তু নিত্যস্ত মিথ্যাও নয় । একটা হীরার চার বাড়ী পাঠাইবার জন্য ইটালিতে বসিয়া কেহ নিজ কোষাধ্যক্ষকে দটলাও চাইতে আনাইয়া উপদেশ দেয় না । লর্ড অলষ্টেন বলেন তাঁহার চিঠি লিখিবার সময়ভাব, আর তাহার সহিত হারটি পাঠাইয়া তিনি নিশ্চিন্ত মনে অল্প কার্যো মনোনিবেশ করিতে পারিবেন । “আর কিছু না চ’ক হেণ্ডার্সনের কাছ থেকে হারটা চুরী যাবে না ; তার ওপর গত বিশ্বাস করা যায় তত কি তোমার চাকরালীকে বিশ্বাস হয় ?” ইচ্ছাপূর্বক লর্ড অলষ্টেন সুবিখ্যাত অলষ্টেন পরিবারের বহুন্না হীরকহার জুড়ন ইটালিতে গইয়া যান নাই—ইটালির রাজসভায় নিমন্ত্রণ উপলক্ষে তাঁহার বিলাতি ঐশ্বর্যের মর্যাদা রক্ষার নিমিত্তই ওরূপ দুঃসাহসিক কার্যো ত্রুতী হইয়াছিলেন । সেই কারণেই বলিষ্ঠ বৃহৎকার হেণ্ডার্সনকে হীরকহারটি দিয়া মি লর্ড কহিয়া দিলেন “দেখ হেণ্ডার্সন, কোনও কারণে প্রাণ গেলেও এক মিনিটের মধ্যেও হার নিজের কাছছাড়া করবে না ; আর বতদিন টোণে থাকবে, ততদিন ভুলেও চোখ বুঁজবে না ; ছটো ত নয়ই, একটা কখন কখন পলক ফেলবার সময় বুঁজতে পার । বাড়ী গিয়ে খুঁত পার চোখ বুঁজে থেক, জামার আপত্তি হবে না । এই চাবি নাও, কাষ্টম্ হাউসে একবার বাস্‌টা খোলবার দরকার হবে । চাবিটা পেটালুনের একেটে রাখবে, বুঝলে ত ? টামারে ওঠবার আর নামবার

সময় বিশেষ সাবধান থাকবে ; যদি কেহ বেশী আত্মীয়তা করতে আসে ত ও ছাত দূরে তাকে বা ছাতের ধাক্কা সরিয়ে দেবে, সেটা তোমার অভ্যাস। রেডিংটনে রাত্তির কাটাতে হবে মনে থাকে যেন, কেননা সকালবেলা ও লাইনের গাড়ী আসবে। সেখানে খুব সাবধানে থাকবে।”

হেগার্সন শরীরাত্মিক বুদ্ধির পরিচালনা করিয়া স্থির করিল যে পথে কোনও রূপ বিপদ অসম্ভব। সে জীবনে কখনও ঝটলাগের বাহিরে পদার্পণ করে নাই। পথে বিদেশীয় ট্রেনগুলিতে হিংস্র ভাষায় কথিত প্রব্রুগুলিতে বেচারী বড়ই বাতিবাস্ত হইতে লাগিল। সে মনে মনে স্থির করিল যে জীবনে তাহার একরূপ বিপদ কখনও হয় নাই ; অতএব দৈর্ঘ্যের প্রামাণ্য, তাই সে প্রতি প্রব্রুই ধীরভাবে নীরবে মস্তক সঞ্চালন করিয়া টিকিট দেখাইয়া বিপদ হইতে উদ্ধার পাইতে চেষ্টা করিত। কয়েক দিবস অহোরাত্র জাগরণ ও আহার পরিত্যাগ করিয়া শরীর রক্ষা করা নিতান্ত সহজ নহে। আহার পরিত্যাগ বই কি ? একটা নাতিসূত্র চর্মপেটিকা দক্ষিণ হস্তে অহোরাত্র ধারণ করিয়া আহার কিরূপে সম্ভব তাহা বুঝিয়া লউন। বিশেষতঃ হেগার্সন জীবনে আর কখনও জাহাজে চড়ে নাই ; জাহাজের উপর তাহার অবস্থা পর্যালোচনা করিয়া অনেক গভীর-প্রকৃতি ব্যক্তিরও গাভীরা হারাইতে হইয়াছিল। জাহাজ হইতে অতি কষ্টে নামিয়া ট্রেনে উঠিয়া স্থল পদযুগল ছড়াইয়া বেচারী বলিয়া পড়িল ও ভারতীয় ওজনের একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিল “হঃ পাচশো টাকা দিলেও ফের এ রকম কাজ আর হাতে নেব না। তা প্রভু আমার হাতে দিয়ে ভালই করেছেন, নয় ত অল্প কোনও চাকরকে ওরকম ভিড়ের ভিতর বিশ্বাস কি ? আমি ছাড়া আর কেউ কি তিন রাত্তির জেগে আসতে পারত ?” তাহার চক্ষু প্রায় বন্ধ হইয়া আসিয়াছিল, এমন সময়ে এক ব্যক্তি কক্ষে প্রবেশ করিল। স্থপ্ত বুলডগ্ কর্ণধর খাড়া করিল, আহা বেচারী মনে করিয়াছিল বুকি একা থাকিলে একবার পাঁচ মিনিটের জল ডুব দিয়া জল খাইয়া লইবে ; কিন্তু বিদ্রি বাধ সাধিলেন। আগন্তুক স্নানকার, চঞ্চল প্রকৃতি ও চতুর বলিয়া অস্বীকৃত হইল। গুরুত্বপূর্ণবস্তুত, উজ্জল চক্ষুযদিবিশিষ্ট বলিয়া হেগার্সন তাহাকে দুর্জন বলতুই বলিয়াই ধরিয়া লইল, কারণ তাহার ক্ষেত্রকট দাড়ি বড়ই প্রিয় ছিল। বড়ই বিরক্তির সহিত সে অর্ধদৃষ্টিতে এক একবার আগন্তকের প্রতি চাহিয়া গুলিল “গাড়ী আর একটু হলেই ছেড়ে দিয়েছিল আর কি !”

হে।—“হু—” গাড়ি ততক্ষণ ষ্টেশন ছাড়াইয়া অনেকদূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছে।

আ।—“দেখ হেগার্সন, আমার আসাতে তুমি নোটেই সন্তুষ্ট হও নি, তা আমি জানি; না হবারই কথা, কারণ আমি এখানে তোমারই হেফাজত করতে এসেছি।” হেগার্সন অবাক হইয়া গিয়াছিল, অসন্তুষ্টও যে হয় নাই তা কেমন করিয়া বলিব?

হে।—“আমার হেফাজত করতে? অমুগৃহীত হলাম, তা বোধ হয় আমার হেফাজত আমি নিজেই করতে সক্ষম। বলি, তুমি কে হে?”

আ।—“ডিটেক্টিভ ইন্স্পেক্টার বার্ণস্, লর্ড অলষ্টেনের টেলিগ্রাম পেয়ে এসেছি। আমাকে দেখতে হুকুম হয়েছে যে তোমার হাতের ওই চামড়ার বাগটী না হারায়।” হেগার্সনের রোদ্ভদ্ব মুখখানি ঈষৎ রক্তিম হইল; অবশ্য, জগতে কাহাকেও বিশ্বাস না করা বুদ্ধিমানের কার্য্য হইতে পারে, কিন্তু এতদিন প্রাণপণ প্রভুত্ব দেখাইয়াও কি মন পাওয়া যায় না?

হে।—“আমার হাতে জিনিস থাকতে হারানটা মি-লর্ড কেমন করে সম্ভবপর মনে করলেন বলতে পারি নে।”

আ।—“তা তুমি কেমন করে বুঝবে? তোমার মত ভালনার্চুস সে কথা বুঝতে পারে না, ও সব আশাদের মত লোকেই বুঝে থাকে। মি-লর্ড ঠিক কাজই করেছেন, এতে তোমার ছঃখিত হবার কোনই কারণ নেই। তুমি কি ভাব যে, ওরকম একটা দামী হার পাঠান হ'ল, এ কথা ইউরোপের বিখ্যাত চোরেরা টের পায়নি? আর রাগ ক'রে না, তুমি ওরকম একটা চোরের সঙ্গে কখনই পেয়ে উঠবে না; আর যদি ছুতিন জন পেছনে লাগে তাহ'লে ত কথাই নেই।”

হে।—তুমি বলতে চাও কি? আমি কেমন ক'রে জানব যে তুমি নিজেই চোর নও?

আ।—আর যদি আমিই চোর হই, তাহলে আমি কি করি বল ত?

হে।—তা ঠিক বলতে পারিনে, কিন্তু তোমার কি দশা হয় তা বলতে পারি।

আ।—তুমি আমাকে আধমরা করতে চেষ্টা কর কেমন? তুমি জোয়ান বাটে, কিন্তু একবার চেষ্টা করেই দেখ না?

হে।—“বটে! দেখবে তবে?” বলিয়াই প্রাণপণে আগন্তুককে একটা মুঠামাত করিল, কিন্তু আখাতটি পার্শ্ববর্তী গদির উপর লাগিল মাত্র ও সেই সঙ্গে হেগার্সনের দেহ প্রায় উন্টাইয়া ধূলিশায়ী হইবার উপক্রম হইল।

অপমৃত আগন্তুক-মুষ্টি উচ্চ চ্যাত করিয়া কহিল “খুব চালাও, আর কিছু না হ'ক 'ঘুনীটা ত আসবে না, আরে মূর্থ। এটুকু যদি না শিখ'ব ত এসব জায়গায় আসব কেন ?” বলিয়াই ডিটেক্টিভ বার্ন্‌স চাসিয়া কহিল—“বন্ধু, যদি আমার চুরী করবার ইচ্ছে থাকত তাহলে, কি আর রেলগাড়ীতে চুরী করতে আসতাম তাহলে অত্বে কোন উপায় দেখতাম। পাঁচ ছয় রকম উপায় হতে পারে। আজ্ঞা দৈবত এ উপায়টা নন্দ কি ?” বলিয়াই বিড়ালের কায় লক্ষ প্রদান করিয়া আগন্তুক বৃহৎকার হেওর্সনের পেটে ভাঙ্কর দ্বারা আঘাত করিল ও উভয় হস্তে তাহার গুদ ধরিয়া সজোরে আকর্ষণ করিল। “ছাড়, ছাড়, গেলাম, গেলাম” বলিয়া হেওর্সন উভয় হস্ত শূন্যে আঘাত করিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। অবিলম্বে বার্ন্‌স তাহাকে ছাড়িয়া দিল। “এটা মূখ্য একটা উদাহরণ দিলাম নাকি। আমি গোফগুলো ছিঁড়ে ফেলতে পারতাম, ঠিক কি না বল, সাদাভা জ্ঞান ? ছুইছুইর জ্ঞান ? আমি তোমাকে অনেক রকম দেখাতে পারি। যাক্—আমি কেবল দেখিয়ে দিলাম যে, তোমার গায়ে অসাধারণ ক্ষমতা থাকলেও ও সব চোরের হাতে তোমার কোন ক্ষমতাই পাটবে না।”

অঙ্গী ক্রন্দনের স্বরে হেওর্সন।—“কোন সব চোর ?”

বা।—তা কেমন করে বলব ?—তাদের মন্ত দল ; কে যে আসছে কেমন করে জানব বল ? এ গাড়ীতে তারা আছে কি না, দেখবার সময় খাইনি ; বোধ হয় নেই—আর আমাকে দেখলেই সরে পড়বে। তারা কিন্তু রেভিংটনের হোটেলে রাতে একবার চেষ্টা করবে বলে বোধ হয়।”

হে। আনি যে হোটেলে থাকবে তা তুমি কেমন করে জানলে ?

সে কথার উত্তর না দিয়া বার্ন্‌স বুঝাইয়া দিল যে সেও রাতে সেই হোটেলেই থাকিবে ও দেখিবে কি উপায়ে দস্যাগণ বাস্কট অধিকার করে। সে থাকিতে সমস্ত দল আসিলেও কিছুই করিতে সক্ষম হইবে না, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। স্থানীয় পুলিশদের দেখাইবে যে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের ডিটেক্টিভদের বুদ্ধি কত অধিক। অনেকবার দলপতি তাহার হস্ত ছাড়াইয়া পলাইয়াছে, কিন্তু এবার আর নিষ্ফল নাই। পানায় সংবাদ সে নিজেই দিয়া থাকিবে, কারণ বলা যায় না মনে যদি অধিক লোক থাকে।”

ট্রেম রেভিংটনে পৌঁছিল। স্পষ্টই বুঝা গেল হেওর্সনের বার্নসের প্রতি বিরুদ্ধভাব ক্রমেই হ্রাস পাইতে লাগিল ও যেন একটু বিশ্বাস একটু নির্ভরতার ভাব তাহার ব্যবহারে প্রকাশ পাইতে লাগিল। ক্রমে জাহার মনে হইতে

লাগিল যে তাহার প্রচুর বার্ষসকে পাঠাইয়া বিশেষ অজ্ঞার আচরণ করেন নাই । কারণ নোম কি ? রক্তটি স্বদক্ষ বাটে, অধিকতর নোমায় । বিশেষ আর অধিকক্ষণ জ্ঞাত থাকিবার কমতা তাহার আছে কি না সে বিষয়ে সে বিশেষ সন্নিধান হইয়া আসিতেছিল । উভয়ে একত্রে আহার করিল ও পরে হেণ্ডার্সন হাতমুখ ধুইয়া আনিল ও উভয়ে একসঙ্গে বসিয়া গল্প করিতে লাগিল । বার্ষসের অত্যধিক বকুনিতেও হেণ্ডার্সনের চকুরয় সংযত থাকিতে অস্বীকার করিতে লাগিল ; কিন্তু সে পরমুহুর্ন্তেই চমকিত হইয়া উঠিল, কারণ শুনিয়া বার্ষস বলিতেছে “দেখ হেণ্ডার্সন, ত্রেমার তিনভাগ গুমিয়ে পড়েছে কেবল একভাগ মাত্র ছেগে আছে । তা নিয়ে কতক্ষণ বাগটিকে আগলে রাখবে বল ত ? তার চেয়ে আমার চাতে দিয়ে একটু গুমিয়ে নাও না কেন ?”

হে।—না, তা কেমন করে করি বল ? জান ত, আমার উপর জুকুন আছে যে এক মিনিটের জ্ঞাতও এটা চক্ৰান্তর করব না, আমি সে জুকুন মরে গেলেও অমাত্র করতে পারিবে জান ত ?

বা।—বলি আমার উপরেও ত জুকুন আছে যে, বাতে জিনিষটা না থোয়া যায় তা আনাকে দেখতে হবে ; আমারও ত দায়ীত্ব আছে ! তোমার যে রকম অবস্থা তাতে যে আমার দায়ীত্ব বজায় থাকে তা মনে লাগছে না । সে চোর বেটাদের চালাকি ত জান না, তারা যে কখন কার ঘরে ঢুকে পড়বে কে বলতে পারে ? যদি আমাকে দেখতে পায় তাহলে বড় ঘোঁসবে না ; কিন্তু যদি তোমাকে এই অবস্থায় পায় তাহলেই স্প্রুজুল । চকের নিম্নে বাগটা অন্তর্ধান হবে, আর তখন আমি নিজের হাত কামড়ে মরব দেখতে পাচ্ছি । এইরূপ ভাবে অনেক বুঝাইবার পর স্বচ্ছ-মস্তিকে স্বেচ্ছা সন্মতিক্রম হইল ।

অতীত দুঃখের সহিত সে অবশেষে রাজী হইল । “আমি বুঝতে পারছিলাম আমি ঠিক করছি কি না ; কিন্তু আসল কথা যে না দিলে উপায় নেই কারণ আর পাঁচ মিনিটও আমি ছেগে থাকতে পারব কিনা ভীষণ সন্দেহস্থল ।” বাগটা টেবিলের উপর রাখিয়া সে অতিশয় অনিচ্ছার সহিত কয়েক পর অগ্রসর হইয়া পুনরায় কিসিয়া আসিয়া কহিল—“দেখ মিঃ বার্ণস্ কমা ক’রো, এটা যেন কেমন কেমন ঠেকছে না ? কাজটা যেন বড়ই বোকার মত হচ্ছে বলে ভয় হচ্ছে, নয় কি ? ঠিক বলত ? তবে এ রকম অবস্থায় যদি তোমার জিনিষ কিছু জামিন রাখ, এই দায়ী জিনিষ, যদি অবশ্য তোমার অপমান বোধ না হয়—কি জান—?

এক গাল হাঁসিয়া বার্ণস্ কহিল—তাতে কেন আপত্তি করব ? এই নাও

আমার ঘড়ি, গোটা তিরিশেক টাকা দাম হবে আর আমার গণিবাগ শ' দেড়েক টাকার নোট আছে, আর তেইশ টাকা সাড়ে পনের আনা নগর আছে । যদিও চারের তুলনায় কিছুই নয়, তবে তোমার যদি এতে বিশ্বাস হয়ত নিয়ে যাও—'

হে।—হাঁ, কতকটা শাস্তি হয় বই কি । এখন মনে হচ্ছে তুমি যথার্থই আমাকে ঠকাচ্ছ না, এতগুলো টাকা কি সহজে লোকে ছেড়ে দেয় ?

ক্রান্ত পদে দোপানশ্রেণী অতিক্রম করিয়া হেণ্ডার্সন স্বীয় শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল ; দ্বারে ঢাচি বন্ধ করিল, একটি টেবিল দ্বারের নিকট সরাইয়া রাখিল ও তাহার উপর একটি সিঁকুক রাখিল ও পরে মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া শয্যাশায়ী হইল ও তখন সেই নিশ্চিন্ত বিপুলকায় স্বচ্ছমানের নাসিকাধ্বনিতে হোটেল ধ্বনিত হইতে লাগিল ।

হর্গোদয় হইলে তাহার দ্বারে সম্বোরে আঘাত হইতে লাগিল । চক্ষুদ্বয় সম্বোরে ঘর্ষণ করিয়া হেণ্ডার্সন সিঁকুকটা যথাস্থানে স্থাপন করিল ও টেবিল সরাইয়া দ্বার উন্মোচন করিল ও বোকার ছায়া চাহিয়া রহিল ; দেখিল দ্বারদেশে ভটজন পুলিশ কর্ণচারীর সম্বিত স্থানীয় পুলিশ ইনস্পেক্টার দণ্ডায়মান । হেণ্ডার্সন তাহাকে জানিত । "খুব যা হ'ক্ মিষ্টার হেণ্ডার্সন, তুমি এ রকম বোকা, তা জানতাম না । নাদক দিয়ে জল পাঠিয়ে চোরটা তোমার কাছ থেকে চুরী করে নিয়ে গেল, তুমি কিছুই বুঝতে পারলে না ? একটা রাজার রাজদ্বের দাম যে তোমার হাতে বিশ্বাস করে দেওয়া হয়েছিল তাও একবার ভেবে দেখলে না ? তুমি এত বোকা !"

বোকার ছায়া হেণ্ডার্সন মস্তক কণ্ঠন করিতে করিতে কহিল—

"কই ! ইনস্পেক্টার বার্নস্ কোথায় গেল ?"

কর্ণচারী।—খুব ইনস্পেক্টার বার্নস্ পেয়েছিলে যা হ'ক্ ; তুমি এত বোকা ? সে চোরটা যে কোথায় গেল তাই ভাবছি, সে যে আটদশ ঘণ্টা আগে সরে পড়েছে, সেইটেই বিপদের কথা । আমরা এইমাত্র টেলিগ্রাম পেয়েই এসেছি । এর মধ্যে কাজ ফতে ক'রে সে সরে পড়েছে । দোষটা কিন্তু তোমারই ; তোমার একটুও বুদ্ধি নাই ।

হে।—আমার গোড়ায়-সন্দেহ হয়েছিল বই কি । সে কিন্তু গুর বুদ্ধিমান বলেই বোধ হ'ল । :

ক।—তোমার যদি তার শতাংশের এক অংশও বুদ্ধি থাকত তাহলেই একাঙটা হ'ত না । মি-লর্ড গুনলে কি উপায় হবে বল ত ? এতক্ষণ হয়ত

হীরেগুলো সব খুলে নিয়ে হারটা গলিয়ে ফেলেছে । এখন উপায় যে কি করব বুঝতে পারছি না ।

হে ।—না, না, অতটা হয় নি, হীরে এখনও পর্যাপ্ত টিক লাগানই আছে ; তবে বাগটা থেকে বেরিয়েছে মাত্র—বলিয়াই স্বীয় কোট উন্মোচন করিয়া হেণ্ডার্সন স্বীয় বকে সেই জুহুলা মীরকজার দর্শকবৃন্দকে দেখাইল ও অজ্ঞান জোড়িতে পুলকিত হেণ্ডার্সনের চক্ষুজ্জ্বলিত; বিগুণিত হইয়া উঠিল—

“গলায় দিয়ে গুয়ে থাকতে কষ্টে বোধ হচ্ছিল বই কি । কিন্তু তবুও বুনিমে পড়েছিলাম । বাটা আনার জলে নাদক দিয়েছিল বই কি । কিন্তু মৃগ ধোবার সময় আমি সেটা বুঝে ফেলেছিলাম ; তাই বাগটা খুলে হার গলায় পরে নিয়েছিলাম । বাগটা কিন্তু জন্মের মত গেল—তবে দামের চেয়ে বেশী আদায় করে নিয়েছি । আর ঘড়িটা বক্সিসের মধ্যে হ’ল ; কি বল ? মন্দ কি ?”

অবাক হইয়া পুলিশ ইনস্পেক্টার হেণ্ডার্সনের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল ।

শ্রীশরৎচন্দ্র নজুমদার ।

বসন্ত

ঋতুরাজ বসন্তের নামে প্রশস্তি রচনা করিতে বসি নাই ; বসন্তরোগের একটা ক্ষুদ্র প্রাদেশিক বিবরণ লিখিব । প্রবন্ধটি কাব্য ত নহেই, চিকিৎসা-বিজ্ঞা ঘটিত একটা তথ্যও নহে । তবে কি ? সে কথা প্রবন্ধ পড়িলেই বুঝিতে পারিবেন ।

মধ্য প্রদেশের ছত্রিশগড় বিভাগে, সঙ্গলপুর অঞ্চলে এবং উড়িষ্যা দেশে বসন্তরোগের নাম ‘মাতা’ ; তবে বিনা টীকায় উঠিলে উহার নাম ‘উভা-মাতা’ । মাতা হইলেন বসন্তের অধিষ্ঠাত্রী দেবী রোগের নাম না করিয়া লোকে মাতাই বলে । বঙ্গদেশেও ঠাকুরাণী বা ঠাকুরণ্য ব্যবহৃত আছে । কোম ভীষণ পদার্থেরই নাম করিতে নাই ; তাই আমরা ভয়ে রাতে সাপের নাম করি না এবং অনেক রোগেরই যথার্থ নাম উচ্চারণ করি না । রোগের বসন্ত নামটাও খাটি নাম নহে ; বসন্তকালে ঐ প্রাণসংহারক মহাত্রণ দেখা দেয় বলিয়া উহার নাম বসন্ত । ভীষণ রকমের এক প্রেণীর অভিসার, বসন্ত কালে দেখা দিত বলিয়া উহারও এক সময়ে নাম ছিল বসন্ত ।

ঐ শ্রেণীর অতিশারকেই কলেরা বা বিষটিকা বলিয়া সন্দেহ হয় । কলেরা রোগে ওলা বা পেট নামান আছে এবং উঠা বা বমন আছে বলিয়া উহার সাত্ত্বিক নাম ওলাউঠা । বঙ্গদেশে ওলাউঠার একটা ওলাদেবী আছেন বটে, কিন্তু যাহার ওলাউঠা হয় সে হতভাগা দেবীর আবিভাবপূত বলিয়া কেহ মনে করে না । সঞ্চলপুর অঞ্চলে কাহারও বসন্ত হইলে গায়ে মাতা বা ঠাকুরণ উঠিয়াছেন বা আছেন বলিয়া, সে বাক্তি ত্রণ থাকা পর্যন্ত গুরুজনকে প্রণাম করে না, কিম্বা দেবীর অম্পৃষ্ঠ কোন পদার্থ আহার করে না । এখন ডাক্তারি টীকা চলিলেও ঐ নিয়নের বাতিক্রম খট নাহি । ডাক্তারি টীকা ভারতবর্ষের সর্বত্রই নূতন । উহার পূর্বে বঙ্গদেশে যে প্রকার টীকা দিবার ব্যবস্থা ছিল তাহাও সঞ্চলপুর অঞ্চলে ১৮৬২ সনের পূর্বে প্রচলিত হয় নাই ।

১৮৫০ খৃষ্টাব্দের পূর্বে সঞ্চলপুর অঞ্চলে প্রায় ৬৭০০০ হাজার বর্ষ মাইনের মধ্যে বসন্তরোগ প্রতিষেধের জন্ত টীকা প্রভৃতি দিবার কোনও ব্যবস্থা ছিল না । নাগপুরের বিজয়ী ভোসলা রাজা যখন সঞ্চলপুর, সোনপুর, এবং বোধের রাজাদিগকে বন্দী করিয়া নাগপুর, ভাণ্ডারা, চাঁদা প্রভৃতি স্থানে তাহাদিগকে রাখিয়াছিলেন (১৮০৩—১৮২০ খৃষ্টাব্দ) সেই সময়ে রাজারা বসন্তের টীকা দিবার ব্যবস্থা লক্ষ্য করিয়াছিলেন । সোনপুরের রাজা পৃথ্বী-সিংহ দেব চাঁদা সহরে টীকা দিবার সুব্যবস্থা ও সুফল দেখিয়া বন্দী থাকিবার সময়েই সোনপুর হইতে কয়েকজন লোক লইয়া টীকা দিবার পদ্ধতি শিখাইয়াছিলেন । মহারাষ্ট্র প্রভাবের অধীনে মধ্যপ্রদেশে অবস্থিত হইলেও চাঁদায় তেলেণ্ড ভাষা প্রচলিত । ঐ তেলেণ্ড গুরুর নিকট হইতেই সর্ব প্রথমে এই অঞ্চলে টীকা দিবার পদ্ধতি শিক্ষিত হইয়াছিল ।

টীকা দেওয়ার প্রথা প্রচলিত হইবার পূর্বে যে শ্রেণীর লোক দৈব উৎপাত উপশন করিত, সেই শ্রেণীর লোকেরাই ‘উভামাতা’ হইলে নর তর করিত । এই শ্রেণীর লোকের নাম ‘দেহেরি’ । দেহেরিরাই চাঁদায় গিয়া টীকা দেওয়া শিখিয়া আসিয়াছিল । সঞ্চলপুর এবং বোধ সম্বন্ধে ও এই একই কথা ।

টীকা প্রচলনের পূর্বে উভামাতা হইলে বসন্ত দেবীর পূজার জন্ত যেমন ঘট বসিত এবং পাড়ার পাড়ায় বসন্ত দেবীর পূজা হইত ; টীকা প্রচলনের সময়েও তাহা বজায় রহিল । গ্রামের বা নগরের একটি প্রধান স্থানে (সাধারণতঃ রাজবাড়ীতে) দেহেরি ঘটস্থাপন করিয়া পূজা করিত এবং

নাতার আদেশ পাইলে গো-বীজ লইয়া গ্রামে বা নগরে টাকা দিতে আরম্ভ করিত। দেহেরিদিগের এই টাকার ফল বড় ভাল হয় নাই; কারণ অনেক লোক টাকা লইবার পর অরে এবং বসন্তে মারা পড়িত।

সম্বলপুর বখন ইংরেজের জেলায় পরিণত হইল, সেই সময়ে অর্থাৎ ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে বাঁকুড়া জেলার বাঙ্গালী টাকাওয়ালারা সম্বলপুর অঞ্চলে প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল। দেহেরি টাকার পরিবর্তে এই বাঙ্গালী টাকা তখন সর্বত্র প্রচলিত হইয়াছিল এবং এই প্রথা বিপদের আশঙ্কা অত্যন্ত কম বলিয়া এই অঞ্চলে সর্বত্র স্বীকৃত হইয়া থাকে। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দেও সম্বলপুরের গড়ছাত অঞ্চলে আনি বাঁকুড়া জেলার অনেক টাকাওয়ালাকে দেখিয়াছি।

যে সময়ে প্রথমে দেহেরির টাকার আন্দানী হইয়াছিল, তখন সোনপুর নগরবাসীদিগের মধ্যে কেহ কেহ টাকা দিত; কিন্তু সাধারণতঃ সকলেই উহা অগ্রাহ করিত। বাঙ্গালী টাকার ফল অন্ততঃজনক নহে দেখিয়া ১৮৬২ খৃষ্টাব্দ হইতে লোকেরা ধীরে ধীরে দেশের মধ্যে টাকা দেওয়ার প্রথা প্রচলন করিয়াছিল। এখন লোকের বিশ্বাস, যে হাঁসপাতালের টাকা গ্রহণ না করিলে দণ্ডিত হইতে হয়; কাজেই অধিকাংশ লোকেই টাকা দিয়া থাকে। এখনও কিন্তু পলাইতে পারিলে অনেকে ছাড়ে না।

কোঠা প্রভৃতি কয়েকটা জাতির লোকেরা কখনও টাকা লয় নাই; দেওয়ার ভয় দেখাইলেও তাহাদিগকে টাকা গ্রহণ করিতে সম্মত করা অসম্ভব। কোঠা জাতীয় লোকেরা তদের কাপড় বুনিয়া থাকে। কেহই বলিতে পারেন না যে, এই সকল সম্প্রদায়ের লোক অল্প সম্প্রদায়ের লোক অপেক্ষা বসন্তে বেশী মারা পড়ে। টাকার উপকারিতার আলোচনার সময় চিকিৎসক পণ্ডিতেরা এ কথা অস্বীকার এবং বিচার করিতে পারেন।

যে শ্রেণীর লোকেরা কদাচ টাকা গ্রহণ করে নাই, বসন্ত সন্ধে তাহাদের একটি অস্থানকে এদেশের সর্বত্র প্রচলিত প্রাচীন অস্থান বলিয়াই মনে হয়। অস্থানটি এই—দৈবাং কাহারও গৃহে (যে জাতির লোকই হউক) উভামাতা দেখা দিলে (এ কালের টাকার পরে মাতা দেখা দিলেও) কোঠা জাতির স্ত্রীলোকেরা ঘানের পর নূতন কাপড় পরিয়া, কুলায় করিয়া পঞ্চপত এবং প্রদীপ লইয়া উভামাতাকে বরণ করিতে যায়। যে গৃহে মাতা আনিয়াছেন, সেই গৃহের দ্বারে দেবীর জয়-খোশগায় উল্লুখনি দিয়া বসন্ত-রোগপ্রভেদের সমক্ষে কুলা নাড়িয়া প্রদীপ ঘোলাইয়া এবং পঞ্চশত ছড়াইয়া

দেবীকে বরণ করে। এই ব্যবস্থা বসন্তরোগের প্রতিবোধের জন্ত নহে; বরং উন্টা, মাতাকে আপনাদের পাড়ায় ডাকিয়া লইবার জন্ত। মাতার আগমনে বাধা দিলে, সর্বনাশ হইবে বলিয়া অনেকের ধারণা আছে। ত্রাণক ক্ষত্রিয়ারদির মধ্যে মাতার প্রতি একরূপ ভাবের আদর ঠিক দেখিতে পাওয়া যায় না। তাঁহারা একালের ব্যবহার ঢাকা দিবার পুঙ্খও ঘট বসাইয়া দেবীর পূজা করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু মাতা কোথাও উড়া হইয়াছেন তিনিলে একেবারে সে স্থান হইতে দূরে পলায়ন করেন।

কোন নগরে বা গ্রামে সংক্রামক ব্যাধি উপস্থিত হইলেই এদেশের লোকেরা যথাসাধ্য গ্রাম বা নগর পরিত্যাগ করিয়া যায়। যাহারা ভদ্র-লোক বলিয়া গণ্য তাহারাও এইরূপ ব্যবহার করিয়া থাকে। আমি নিজের একবার সোনপুর সহরে কলেরা প্রাদুর্ভাবের সময় দেখিয়াছি যে, সহরের অধিকাংশ লোক ৩৪ দিনের মধ্যে সহর ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছিল; এবং পলায়নপরদিগের মধ্যে অনেকে অল্প গ্রামে স্থান না পাইয়া, একেবারে কিছু দিনের জন্ত জঙ্গলে গিয়া বাস করিতেছিল। পতি রোগগ্রস্ত-পত্নীকে পরিত্যাগ করিয়া এবং মাতা শিশুকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছে, একরূপ দৃষ্টান্ত এদেশে প্রচুর পাওয়া যায়।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার ।

• তিন ।

ছেলেবেলায় পড়িয়াছি—একে চন্দ্র, দুই এ পক্ষ, তিনে নেত্র। নেত্র ছাড়া অস্ত্রও যে তিনের প্রভাব বর্তমান, তাহারই সর্বক্কে অত্র কয়েক ছত্র লিখিতে বসিয়াছি।

বিজ্ঞান-জগতে তিনের মহিমা যদি দেখিতে চান, তাহা হইলে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক-চিকিৎসা-প্রণালী হোমিওপ্যাথির প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করুন। যেমন চান সওদাগরের জন্ম হইয়াছিল মা মনসার মহিমা প্রচার করিবার জন্য, সেইরূপ হোমিওপ্যাথির জন্ম রোগ সারাইবার জন্ত হউক আর নাই হউক, তিনের মহিমা ঘোষণা করিবার জন্ত বটেই। হোমিওপ্যাথিক-ঔষধের বান্ধ খুলিলেই দেখিবেন যে খালি তিন, তিন, তিন—আর কিছুই নাই। বেলেডোনা তিন, আর্শেনিক তিন, চায়না তিন—তিনে তিনে ধূল পরিমাণ। হয় তিন, না হয় তিন ছুণে ছয়,

না হয় তিন তিরিকে নয়, তিন ছয় আঠারো বা তিন দশে তিরিশ সংখ্যক ডাইলিউশনই চলিত। আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি কোন্ বৈজ্ঞানিক দ্রব্য অম্লযাত্রী দ্বিতীয় পঞ্চম, সপ্তম, বা একাদশ ডাইলিউশন এত অধন হইয়াছে? বলিতে চান কি যে, আর্শেনিক ৩০-এর এক ফোঁটাতে মরা মানুষ জীবন্ত হয়, ২৯ ডাইলিউশনে কিছুই হয় না? তারপর এই ডাইলিউশন প্রস্তুত করিবার সমস্ততেই তিনের মহিমা জ্বলন্ত। এক ফোঁটা ঔষধ তিন তেত্রিশ নিরানব্বই ফোঁটা মদের সহিত ঝাঁকাইয়া একটা ডাইলিউশন হয়। আচ্ছা আটানব্বই ফোঁটা বা পুরোপুরি একশ ফোঁটা লইলে কি মহাভারত অস্ত্রক্ষ হইয়া যাইত?

বিজ্ঞান আরও শিক্ষা দিতেছে যে প্রবা তিন প্রকার—কঠিন, তরল ও বায়বীয় (Solid liquid and gaseous); কিন্তু চোখে দেখিয়াই কোন জিনিস কঠিন, তরল বা বায়বীয় কি না তাহা ঠিক করা যে যায় না, তাহার প্রমাণ আছে—সূচি, দই ও সন্দেশ। জিজ্ঞাসা করি কাঁচাগোলা সন্দেশ কঠিন, তরল, না বায়বীয়? সন্দেশ কঠিন প্রবাত হইতেই পারে না, কঠিন হইলে বৃষ্টিতে হইবে যে প্রভূত চিনি সংযোগ হেতু উহা অখাদ্য। তরলও যে নহে—একবার মুখে পুরিলেই বৃষ্টিতে পারেন, সহজে গলাধঃকরণ হয় না, পানিকটা জল গলার ভিতর না ঢালিলে বড় সহজে নানে না। অতএব বাস্তবিক প্রমাণ অল্পসারে প্রমাণিত হইতেছে যে সন্দেশ কঠিন নহে, তরলও নহে, উহা বায়বীয়। সন্দেশের বায়বীয়ত্বের অপর প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই যে, বাটীতে আনিয়া রাখিয়া দিলে পরদিন ঠিক বায়ুরই মত সব উপিয়া যায়।

তারপর দধি তরল পদার্থ কি না? দধি জলের মত তরল হইলে গোয়ালান বা তাহার চতুর্দশ পিতৃপুরুষের কি আর রক্ষা আছে? দধি যে তরল পদার্থ নহে তাহা কলিকাতায় বসিয়া বৃষ্টিতে পারিবে না। নাটোরে যান, পাবনায় যান, রাজশাহীতে আসুন—দেখিবে দইএর হাড়ি উপড় করিলে এক ফোঁটাও মাটিতে পড়িবে না। এখানকার নিম্নগণ বাটিতে দইএর থকথকে, চাপচাপ, অঁটাধোঁটা রূপ দেখিলে “ন রাত্ৰী দধি ভোজনং” এই শাস্ত্রবচন একেবারেই মনে পাকে না। ঠাকুরমার নিকট গম গুণিতাম যে, আগে আমাদের পল্লীগ্রামেও দই যে তরল পদার্থ নহে তাহা প্রমাণ করিবার জন্ত গোয়ালাদের মধ্যে লড়াই বাধিত। বড় কাজকর্মে গোয়ালারা আসিয়া সকলের সাক্ষাতে নিজের নিজের দইএর হাড়ি দূর হইতে উঠানে ফেলিয়া দিত। যাহার দই হাড়ি ফাটিয়া গেলেও এক জায়গায় দাঁড়াইয়া থাকিত, তাহার দইএরই বায়না হইত। গোয়ালারা অবশ্য দই

সম্মুখে exposed ; তাহার যখন প্রমাণ করিতে সদাই ব্যত যে দাঁড় তরল পদার্থ নহে, তখন আপনি আমি বলিলে চলিবে কেন ? বাস্তবিক দধির বেলায় কেন, অনেক স্থানেই দেখা যায়—hinge are not what they seem.

দধি ও সন্দেশের কথাও গেল, এখন জিজ্ঞাসা এই যে লুচি এই তিন অবস্থার কোন্ অবস্থাপন্ন ? লুচি বাসি হইলে অবশ্য কঠিন হয়, কিন্তু গরম গরম হুলকে লুচির অবস্থা কি ? উহার অবস্থা চোখে দেখিতেও বেশ ভালই, কিন্তু যিনি বেশী স্নোভ করিবেন তাহার পৈটিক অবস্থা যে খুব ভাল থাকিবে একরূপ আশা বড়ই কম । সে যাহা হউক গরম লুচিতে সকলেই এই তিন অবস্থার একত্র সমাবেশ দেখিতে পাইবেন । তাহার উদরে বায়ু, বাহিরে চৰ্চবে তরল স্নাত, গায়ে পাতলা, ঈষৎ কঠিন, মোলায়েম নরদার স্তর । চুঃখ এই যে, এ হেন পদার্থ এক খণ্ডরূপে বা নিমগ্নণ বাটী ভিন্ন অল্পত বড় মিলে না ।

তারপর দেখুন এই তিনেতে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য মিলিয়া গিয়াছে । অনেকেই জানেন একজন প্রতীচ্য কবি লিখিয়া গিয়াছেন

The east is east and the west is west

The twin shall never meet.

তাহার কথা যে একেবারে ভুল তাহার প্রমাণ এই তিন । বাঙ্গালীর ছেলেরা চোর চোর খেলিবার সময় বা দৌড়াদৌড়ি করিবার সময় এক, দুই, তিন বলিয়া হাততালি দিবার পর ছুটিতে আরম্ভ করে, সাহেবদের ছেলেরাও On, Two, Three, উচ্চারণ করিয়া তবে দৌড় দেয় । বাঙ্গালীর ছেলেরা এক, দুই, তিন, চারি বলে না, সাহেবদের ছেলেরাও One Two বলিয়া থাকে না—সাহেব বা বাঙ্গালী উভয় জাতির বালকেরা এক, দুই, তিন, বলিয়া তবে ছোটে । কথাটা খুব ছোট বটে, কিন্তু বিষয়টা বড়ই গুরুতর । প্রাচ্য প্রাচ্য বটে, প্রতীচ্য প্রাচ্যও নহে, উত্তরও নহে, দক্ষিণও নহে সত্য বটে । কিন্তু তাহা বলিয়া প্রাচ্য ও প্রতীচ্য মিলিবে না কেন ? মনে রাখিতে হইবে প্রাচ্য বা প্রতীচ্য, উত্তর, দক্ষিণ, সকল দিক ও দেশবাসী এক বিশাল নানবজাতির অংশ মাত্র । এই বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যখন প্রত্যেক পরমাণু প্রত্যেক পরমাণুকে আকর্ষণ করিতেছে, অসংখ্য গ্রহ নক্ষত্র ভায়কামণ্ডলী পরস্পরকে আকর্ষণ করিয়া বিশ্বে অপূর্ণ মৈত্রীর বারতা ঘোষণা করিতেছে, তখন এক নানবাসী অপর নানবাসীকে রেচবন্ধনে আকর্ষণ করিবে না কেন ? সামান্য কালোয় কি আসিয়া যায় ? যমুনার কৃষ্ণ তোর কি গঙ্গার স্নেহ বারির সহিত মিলে নাই ? ভ্রমরকৃষ্ণ

কেশকলাপ কি স্নানরীর তরুণ অকণরগরগিত বনময় প্রলের শোভার বৃদ্ধি করে না ? তবে খেতরুধা মিশিবে না কেন ? প্রাচ্য প্রতীচ্য মিশিবে না কেন ? প্রতীচ্য নবীন, তাই যুবকের ছায় অশাশ্ব, প্রাচ্য হৃবির কিস্ত বয়ো ও জ্ঞানবৃদ্ধ। সেইমত প্রাচ্য ও প্রতীচ্য একত্র মিলিবে প্রাচ্যের মনন, প্রাচ্যের আশ্বস্তি, প্রাচ্যের নিকাম সাদনা, প্রতীচ্যের উজ্জ্বলতাকে সংগত করিলে ; অপর দিকে প্রতীচ্যের অনন্ত উদান, অসীম আশ্বনির্ভরশাশ্বতা, অনন্ত কামসাদন প্রাচ্যকে নবীনমতঃসজ্জীবিত করিবে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য মিলিতেছে, মিশিবে, মিলিয়া মিলিয়া পৃথিবীতে দ্বিতীয় প্রয়াগের স্রজন করিবে এবং এই নূতন গঙ্গাদমনার পবিত্র সঙ্গমস্থলে বিশ্বের যাত্রীরা অবগাহনপূর্ণক নিষ্কেন্দ্রের ক্ষুদ্রতা, দৈন্য ও রূপগতা মুগ্ধন করিয়া এক নবীন উজ্জল কলেশ্বর ধারণ করিবে।

ছেলেবেলায় ধারাপাতে পড়িয়াছি তিনে নেত্র। কথাটার বড় আটক লাগিত। স্পষ্ট দেখিতেছি আমার বা অপরের, এমন কি, গরু, মহিষ, বিড়াল ছাগলের চুইটা বই চক্ নাট, অগচ ধারাপাতে লিখিতেছে “তিনে নেত্র”। গল্প শুনিয়াছি একটি ছোট ছেলেকে তাহার পিতা কাছে বসাইয়া প্রশ্ন করিতেছিলেন কয়টা হাত, কয়টা পা, কয়টা অঙ্গুলি ইত্যাদি। বালকও ঠিক ঠিক উত্তর দিতেছিল। যখন তাহার পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন “চক্ কয়টা ?” বালক অগ্নান বদনে উত্তর করিল “তিনটা”। বালকের পিতা একটু আশ্চর্যগাধিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন “সে কি ? বালক তখন সত্যয়ে উত্তর করিল “কেন বাবা, ধারাপাতে পড়িয়াছি, তিনে নেত্র। গুরুমহাশয় বলিয়া দিয়াছেন নেত্র মানে চক্।” পিতা অনেকক্ষণ ভাবিলেন পরে বলিলেন “ধারাপাতে চুইএ নেত্র না লিখিয়া তিনে নেত্র কেন লেখে, বড় হইলে বুঝিবে।” গুরু মহাশয়ের কাছে তিনি যখন এই গল্পটি করিলেন, গুরুমহাশয় হাসিয়া বলিলেন “এখন থেকে আর তিনে নেত্র পড়াইব না, তিনে ভুবন (ত্রিভুবন) পড়াইব।” এই অবোধ বালকের মত আমিও ছেলেবেলায় এই “তিনে নেত্র” কথাটার নামে বৃত্তিতাম না ; ভগ্নতা ছিল যে যখন ছাপা পুস্তকে এই কথাটা লেখে, তখন তিনে নেত্র ওয়ালা কোন জীব আছেই আছে। বড় হইয়া জানিয়াছি যে শিবের কপালে এই তৃতীয় নেত্র আছে—এই নেত্রের অস্তিতে মদন ভয় চুইয়াছিল। ভগবতী যখন পাটনীকে আক্কেপ করিয়া স্বামীর পরিচয় দিতেছিলেন “কোনও গুণ নাই—তার কপালে আগুন,” তখন তিনি জুলিয়া গিয়াছিলেন যে, শিবের কপালে এই আগুন না জ্বলিলে তাঁহার নিষ্কর কপাল পুড়িত। মানুষের এই তৃতীয় নেত্র না থাকাত

মাহুঙ্গ মৃশনের এত দাস হঠাৎ পড়িয়াছে । মাহুঙ্গকে মদন ভয় করিতে হইলে শিবের মতই কঠোর সংযম ও সাধনা করিতে হইবে—তাহা হইলে মাহুঙ্গের এই তৃতীয় নেত্র বাতির হঠাৎ এবং তাহার আশ্রমে মদন যায় তাহার ফুলদল পর্গাস্ত ভয়ীভূত হইয়া যাইবে, ধারাপাতের লেখা সার্থক হইবে ।

শাপ্পে তাঁথেরে জিরাজিবাসের বাবস্থা আছে । জিরাজিবাসে পুণ্য হই কি না জানি না, কিন্তু তিন রাত্রির কমে কোনও স্থানে থাকিতে হইলে আমি ত মারা যাই । প্রথম রাত্রি রেল বা গরুর গাড়ীর আঁকানিছানিত্ত বেদনা সারা হইতে কাটিয়া যায়, দ্বিতীয় রাত্রি ঠাকুরদেবতা দেবার ভুল সমস্ত দিবস ঘুরিয়া বেড়ানর দরুন পদবৃগলের যে বেদনা হয় তাহার ঔষধ স্বরূপ নিদ্রার প্রলেপ দিতে কাটিবে । তৃতীয় রাত্রি অন্ততঃ সন্ধ্যাবেলা মোটগাটারি বাধিতে ও ডেরাডান্দি তুলিয়া অস্ত্র যটবার ভল প্রোগাম আলোচনা করিতে করিতে কাটিবে ।

একরূপে পরিশ্রমের অপনোদন হয় বলিয়াই শাপ্পে তাঁথেরে জিরাজিবাসের বাবস্থা আছে । আমার বাপমা সকলের মনঃপূত হইবে কি না জানি না, কিন্তু যখন যেনে বিদ্যালয় চতুঃসারির বাসের বাবস্থা নাট তখন আমার বাপমা ঠিক না হইয়া যায় না । বাস্তবিক আমাদের দেশে যে সকল নৈতিক উপদেশ প্রচলিত আছে, তাহার এইরূপ একটা না একটা অর্থ আছে । অনেক সে গুলি নিরর্থক মনে করিয়া ভুল করেন । ছেলে বেলায় মা বলিতেন “বাবা, গরু বাধা থাকিলে তাহার দড়ি ডিঙ্গাইয়া যাইও না, গরু মরিয়া যাইবে ।” তখন মনে হইত, হ্যা ! এ আবার একটা কথা, দড়ি ডিঙ্গাইলে গরু মরিয়া যাইবে ! মার কথা ঠিক কি না পরীক্ষা করিবার জন্য বাধা গরুর দড়ি অনেকবার ডিঙ্গাইয়া দেখিয়াছি, কিন্তু কোনওবার গরু ত মরে নাই, তাহার কোনও ব্যারান পর্গাস্ত হয় নাই । তারপর সত্য সত্যই একদিন পালে বাথ আসিল । একদিন দড়ি ডিঙ্গাইয়া যেমন যাইব, অননি গরুটা ভয় পাইয়া লাফাইয়া উঠিতেই পা আটকাইয়া গিয়া ধপাস করিয়া পড়িয়া গেলার । যখন পতন জন্য রক্ত নামক লোহিত নাগরঞ্জিত তরল পদার্থ নাসিকা হইতে ধূলীধূসরিত ওষ্ঠস্থ ও চিবুক বটিয়া মাটিতে পড়িতে লাগিল, তখন বৃষ্টিতে বাকি রক্তিল না যে অশান্ত বালককে পতনের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার ক্ষম পশুর গৃহীভূতি দেখাইয়া মাতা বালককে নিরস্ত করিতে চেষ্টা পান ।

সব, রজঃ তমঃ—এই তিনগুণ । সাধারণ লোকের বিশ্বাস ইউরোপের জাতিরা ব্রহ্মাণ্ডসম্পন্ন, ভারতের জাতিবৃন্দ সবগুণসম্পন্ন । তদোক্ত সর্বাংগে নিকট, তাহার কথা ছাড়িয়া দিলে, সবগুণ ভাল কি সর্বাংগ ভাল এ

মীমাংসা লইয়া অনেক লড়াই করিয়া থাকেন। এইরূপ তাঁকের কোনও প্রয়োজন দেখিতেছি না—তাই ভাল। সম্বন্ধের লক্ষণ কমা, দান, ত্যাগ, শাস্তি ও দৈর্ঘ্য, এবং রজোগুণের লক্ষণ—তেজ, বীৰ্য, সাহস, আকাঙ্ক্ষা ও কর্মপ্রিয়তা। লক্ষণ দেখিয়া নব্বই চর, এই চরই গুণ একত্র বিস্তার না করিলে কোনও জাতি বড় হইতে পারে না। শুধু সম্বন্ধসম্পন্ন জাতি শাস্তি অলস অপটু অকর্মণ্য হইয়া পড়িলে, অপরদিকে কেবল রজোগুণসম্পন্ন জাতি ক্রমে অশান্ত, উচ্ছৃঙ্খল ও অসংযত হইবেই। সেই জন্য কোনও বড় জাতি একগুণ বিশিষ্ট হইতে পারে না—তাহাকে দ্বিগুণবিশিষ্ট হইতেই হইবে। যাহারা মনে করেন, যে ইউরোপীয় জাতিগণের মধ্যে সম্বন্ধ নাই, তাহারা ভুলিয়া যান, যে তাহাদের মধ্যে কত অসাধারণ দান, কত স্বর্গীয় ত্যাগের দৃষ্টান্ত, তাহাদের গৌরবময় ইতিহাসকে চিরউজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। আবার যাহারা নব্বই চর ভাঙিয়া ফেলিয়া দেন, তাহারা জানেন না যে ভারতের বিভিন্ন ইতিহাসে হিন্দু, মুসলমান, শিখ, মারহাট্টা, রাজপুত প্রভৃতি কত জাতির কত তেজ, বীৰ্য, অদনা কন্ধ্যোৎসাহের গাথা স্বর্ণাকরে লিপিবদ্ধ আছে, তবে এটা ঠিক বলিয়া নব্বই চর যে ইউরোপের অশাস্তি উচ্ছৃঙ্খলতা সংযত করিতে হইলে, তাহাকে সম্বন্ধ অধিক পরিমাণে লাভ করিতে হইবে, আবার ভারতের আলস্ত, নিষ্ক্রিয়তা দূর করিতে হইলে, তাহাকে ইউরোপের দৃষ্টান্ত অমূল্যমূল্য রজোগুণের সেবা অধিক পরিমাণে করিতে হইবে।

তিন তিথির একত্র সংযোগ হইলে জাহাঙ্গীর চর—গান্ধী নাস্তি। অপর রাত্তা মেরানত হইলে সে রাত্তায় যাত্রা নাস্তি, কিন্তু তিন তিথি ক্রমপে দশদিকে No thoroughfare ঘটে তাহা বুঝা কঠিন। সে যাত্রা হউক জাহাঙ্গীর বা অন্য কোনও অন্ততবারে কোনও স্থানে যাত্রার কথা উঠিলে বাটীতে খুব জোরের সচিৎ আপত্তি উঠিতে থাকে। আমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, সাহেবদের বা মুসলমানদের ত আর জাহাঙ্গীর নাই, যে দিন জাহাঙ্গীর, সে দিন তাহারা যাত্রা করিলে, যদি তাহাদের কর্মহানি না হয়, তাহা হইলে বাছিয়া বাছিয়া কেবল হিন্দুর কর্মহানি হইবে কেন? উত্তর ও হাতে হাতে মিলিয়া থাকে—“এটা আর বুঝলে না, তাহারা যে সাহেব বা মুসলমান তা’রাত হিন্দু নয় তবে জাহাঙ্গীর তাহাদিগকে লাগিবে কেন?” ইহার উপর ত আর কথা চলে না বলিয়া শুধু তিনের নজিমাতেই যাত্রা নাস্তি ঘটিতেছে, দেখিয়া অবাক হইয়া থাকি।

টিনিটি বা ত্রিমূর্তির কল্পনা হিন্দুধর্মেও আছে, খৃষ্টধর্মেও আছে। হিন্দুর ত্রিমূর্তি হইতেছে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর। ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্তা, বিষ্ণু পালনকর্তা, মহেশ্বর সংহর্তা। এই বিশ্বরক্ষাত্ত্বের সৃষ্টি ত্রিভি লয় বাপারটা এত বিশাল যে, তাহা সূচাক্রমে সম্পন্ন করিবার জন্য তিনটা সেক্রেটারিয়েট ও তিন জন মেম্বরের প্রয়োজন বড় অজায় হয় নাই। মহেশ্বর ঠাকুরের আফিসের জগৎ দরবাড়ী উমারওর দরকার নাই, শ্রমসান তাঁহার আফিস। এ বংসর দেখিতেছি, যে এই শ্রমসানচালী ঠাকুরটির আফিসের কাজ ভারি বাড়িয়া গিয়াছে। ইউরোপপন্থে, আজ যে মহাসমুদ্রের ভীষণ লাবণ্য প্রদর্শিত হইয়াছে তাহাতে সভয়ে দেখিতেছি, কত লক্ষ লক্ষ বীরপুরুষ অকালে জীবনহানতি দিতেছে, কত মাতা পুত্রহীন হইতেছে, কত সান্থী বিধবা হইতেছে, কত শিশু অনাথ হইতেছে। হুসমুজ্জ কত জনপদ, গ্রাম, উপগ্রাম শ্রমসান হইতেছে, আর্মেন্টের মশ্বাস কাতরশ্রমি কর্ণ বধির করিয়া দিতেছে। প্রভু! তোমার কৃষ্ণ সংহারমুষ্টি সধরণ কর, তোমার এই ভীষণ Extra work বন্ধ কর, জগতে শান্তি স্থাপিত হউক।

প্রসঙ্গক্রমে কথাটার একটু আপোচনা করিব। লোকে কথায় কথায় বলে, হিন্দু তেত্রিশ কোটি দেবতা পূজা করে। আমি ত এই ত্রিমূর্তি ভিন্ন বড় জোর আর ত্রিশটি দেবতার নাম করিতে পারি। বোধ হয়, কোন ভুলে লোকে এই তেত্রিশ কোটি দেবতার স্বজুকাটা তুলিয়াছে। সে যাহা হউক তেত্রিশ হউক আর তেত্রিশকোটি হউক, হিন্দুর দেবতা বহুত। কিন্তু হিন্দুর দেবতা অনেক চটলেও হিন্দু এক ঈশ্বরের পূজা করে কি না? অনেকে বলেন, হিন্দু পাথর পূজা করে, মূর্তি পূজা করে। তাঁহারা নিশ্চয়ই ভুল বুঝেন। পাথরকে কি পূজা করা যায়? মূর্তির খড়, কাঠ, চূণ, মাটি কি কেহ সজ্ঞানে পূজা করিতে পারে? আমরা রসায়ণশাস্ত্রের অধ্যাপক, আমরা হাজ-মিগকে ডাল্টনের পরমাণুবাদ (Dalton's atomic theory) বুঝাইবার সময় চক্ষুরীক্ষিত্বের অতীত পরমাণু গুলি বিভিন্ন রংএর কাঠের বল বা গোলা দিয়া বুঝাইয়া থাকি। ভেলেরা নিরাকার পরমাণুর ধারণা সহজে করিতে পারে না, এট কাঠের গোলার সাহায্যে কিরূপে জবাব মধো পরমাণুগুলি থাকে, তাহা অনেকটুকু বুঝিতে পারে। গল্প আছে, এইরূপ বস্তুতার পর একজন ছাত্রকে শিক্ষক মহাশয় প্রশ্ন করিয়াছিলেন “পরমাণু কি?” ছাত্র না কি উত্তর করিয়াছিল “পরমাণু ডাল্টম মাদেবের আবিক্ত কাঠের গোলা।

“পরমাণু কাঠের গোলা” অর্থাৎ ছাত্রের এই উত্তর আর হিন্দু পাথর পূজা করে এই উভয় মত এক শ্রেণীরই বৃত্তি। নিরাকার পরমব্রহ্মের পূজা হিন্দুশাস্ত্রে ত নিষেধ নাই। হিন্দুর শ্রেষ্ঠ শাস্ত্র উপনিষদ এই পূজারই প্রচারক। কিন্তু নিরাকার পরমব্রহ্মের আকার যিনি কল্পনা করিতে অক্ষম তিনি যদি কোনও কল্পিত মূর্তিতে পরমব্রহ্মের পূজা করেন তাহাও মহাভারত অস্তক হইবে কেন? রামপ্রসাদ, রামকৃষ্ণ নিরাকার পরমব্রহ্মের পূজা করেন নাই; কালী মূর্তিতে ব্রহ্মের পূজা করিয়াছিলেন। তাহার কি তাই বলিয়া কম সাধক ছিলেন? আসল কথা ব্রহ্মের পূজা—তাহা সাকারই হউক বা নিরাকারই হউক—তাই-ই ব্রহ্মেরই পূজা। তবে মূর্তি-পূজার সহিত পণ্ডলি প্রভৃতি জঘন্য প্রথা প্রচলিত হইয়া গিয়াছে। সেগুলি উঠাইয়া দিউন। তাহা বলিয়া মূর্তিপূজা মারই যে নিন্দনীয়, একথা বৃত্তিমূলক নহে।

পূর্বেই বলিয়াছি পৃষ্ট মধ্যেও এক ত্রিমূর্তি কল্পিত হইয়াছে। বাইবেল বলিতেছেন যে ভগবানের তিন রূপ পিতা, পুত্র ও পবিত্র ভূত (God the Father, the Son and the Holy ghost)। এ বিষয়ে হিন্দু ও পৃষ্ঠানের মধ্যে পার্থক্য এই যে হিন্দু ভগবানকে পিতা বলিয়া বড় একটা ডাকে নাই বা বলিয়াই বেশী ডাকিয়াছে। পিতা ও মাতা উভয়ই গুরুজন বটে কিন্তু সন্তানের সহিত তাহাদের সম্পর্কের মধ্যে একটু পার্থক্য আছে। পিতার নিকট সন্তান একটু দূরত্ব অর্জিত করে—পিতা যেন বড় গম্ভীর বড় উচ্চ, বড় ছাড়াছাড়া। কিন্তু মা যে বড়ই পরিচিতা মার কাছে সন্তান, যেমন সহজে, প্রাণ গুলিয়া, মত আবদার করিতে পারে পিতার কাছে কিছুতেই সেরূপ পারে না। পিতার নিকট হইতে এই দূরত্ব ঘুচাইবার জন্য যেখানে হিন্দু ভগবানকে পিতা বলিয়া ডাকিয়াছে, সেখানেও শ্রীশানচরী শিবরূপে তাহাকে “পাগলা-বাবা” বলিয়া সম্বোধন করিয়াছে। এই দূরত্বের বাধা বাহাতে না থাকে, সেই জন্য হিন্দু চিরকাল ভগবানকে বা বলিয়া ডাকিয়া আসিতেছে। এই মা নাম যে কত মধুর, তাহা যিনি রামপ্রসাদের শ্রীশানচরীতগুলি একবার পড়িয়াছেন, তিনিই বৃত্তিতে পারিবেন। মার কাছে, রামপ্রসাদের এই শত ছায় অছায় আবদার আবেদনগুলি আমাকে অন্ততঃ বড়ই তৃপ্তি প্রদান করে। কিন্তু আধুনিক অনেক ব্রহ্মসঙ্গীতে অহ-সন্ধান করিয়াও সে তৃপ্তি পাই না। এগুলি পিতার উদ্বেগ রচিত—আমার কাছে অন্ততঃ এগুলির আন্তরিকতা স্পষ্ট নহে, কই ঐগুলিত কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশে না। শুধু ভাষার সারল্যে রামপ্রসাদের গানগুলি এত

তৃপ্তিদায়ক তাহা নহে, শৃষ্টধর্মের অহু করণে ভগবানকে পিতৃরূপে কল্পনা করার দরুণই ব্রহ্মসঙ্গীতগুলি তত মধুর হয় নাই ।

ভগবানকে পুত্ররূপে পাইয়াছিলেন—যিওজননী মেরী ও কৃষ্ণজননী যশোদা। তাঁহারা ভাগাবতী রমণী ; আপনাদের আমার সে ভাগ্য হইবে না, আমরা দুঃ হইতে তাঁহাদিগকে প্রণাম করি ।

কিন্তু ভগবানকে স্বামীরূপে পাইয়াছিলেন, শ্রীরাধিকা ও গোপিনীগণ । রাধা-কৃষ্ণের অপূর্ণ প্রেমলীলা আপনি আমি স্থলচক্ষে দেখিব জানিলে বৈষ্ণব-কবি কখনই উহার প্রচার করিতেন না । অগতের শ্রেষ্ঠ ডালবাসা প্রেম, শ্রেষ্ঠ নিবেদন সর্বস্বত্যাগ ! তাই ভারতের শ্রীরাধিকা ভগবানকে স্বামীরূপে পাইবার ভ্রাতৃ ধন জন মান, এমন কি কুল ত্যাগ করিতে এতটুকু দ্বিধা বোধ করে নাই । তাই রাধাকৃষ্ণের প্রেমকথা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া ভাগবতের চন্দ্র ধর্ম, পুরাণ, গাথা ভাসাইয়া দিয়া গিয়াছে ; তাই বৈষ্ণব কবিগণের রাধাকৃষ্ণের প্রেমকথার তুলা কবিতা অগতের কোমল সাহিত্যে আছে কি না, সন্দেহের বিষয় । আধুনিক অনেক ব্রহ্মসঙ্গীতে বৈষ্ণব কবির এই ভগবৎপ্রেমের এক নবীন সংস্করণ দেখিতে পাই । কিন্তু এগুলি যেন বড় কৃত্রিমভাবাপন্ন, এ প্রেমে যেন বস্তু নাই, যেন প্রাণ নাই । “প্রাণারাম, প্রাণারাম, প্রাণারাম” পড়িয়া যেন প্রাণে আরাম পাই না । হে জীবনস্বামী বলিতে যেন জীবনের স্বামীকে চিনিতে পারি না । এ প্রেম যেন কেবল বাক্যেই উচ্চারিত, প্রাণের গভীরতম প্রবেশ হইতে যেন উহা উঠে নাই ।

তার পর আপনি জিজ্ঞাসা করিবেন, যে holy ghost বা পবিত্র ভূতের মানে কি ? মশাই, কাজ কি পবিত্র ভূতের মানে লইয়া—আমি চিন্দু, চিরকাল ভগবানকে মা বলিয়া ডাকিয়া আসিয়াছি । মা নামেই যখন ভূপ্তি পাই, তখন অল্প কথার আমার কাজ কি ?

এখন ত্রিভুবনের কথা পাড়া যাউক । রাগ হইলে, অনেকে এক চড়ে ত্রিভুবন দেখাইবার ভয় দেখান । কিন্তু ত্রিভুবন ত বড় সহজ নয়—স্বর্গ, মর্ত ও পাতাল লইয়া ত্রিভুবন । পাতাল বা রসাতলে কি আছে কে জানে ? পুরাণকার বলেন যে সহস্রশীর্ষ নাগরাজ বাহুকি পাতালে বিরাজ করিতেছেন, তিনি একবার নাথা মাড়া দিলে, মর্ত রসাতলে যাইতে পারে । বৈজ্ঞানিকেরা বলিতেছেন বাহুকির বংশধরেরা অবশ্য পাতালের ছোট ছোট গর্তে নাস করেন বটে, এবং সন্যোগ পাইলেই কামড়াইয়া থাকেন, তবে পাতাল বিশিষ্ট

স্তরের সৃষ্টিকার দ্বারা গঠিত । নিয়ে জল আছে, খনিজ আছে, ধাতু আছে । যাচা হুঁক রদাতলে নখন কেহই যাইতে ইচ্ছুক নহেন, তখন ও বিধে বিতণ্ডা করিয়া কোনও লাভ নাই, নাগরাজের বংশধরেরা দয়া না করিলেই মঙ্গল ।

স্বর্গে ত এ জন্মে এখনও যাই নাই । যাইবার বয়স হয় নাই—বুড়া মা আছেন । তবে যাইবার জন্ত সর্বদা প্রস্তুত আছি । কিন্তু পুরাণকার যে স্বর্গের কল্পনা করিয়াছেন, সে স্বর্গে যাইবার বড় একটা লালসা নাই । এই দিগন্তব্যাপী স্থনীল নভোনগণের উপরিভাগে পৌরাণিক এক বিচিত্র সৌরভা কল্পনা করিয়াছেন, সে রাজ্যে একজন প্রবল প্রতাপাবিত রাজা আছেন—ইন্দ্র ; চন্দ্র, বরুণ প্রভৃতি দেবতারা তাঁহার সভাসদ । সেখানে সোণার ধাম, মতির আলস, হীরার রাত্রা ঘাট আছে । পানীয় অমৃতধারা । কোকিলকণী পরমা সুন্দরী অঙ্গরান্ন সর্বদা নাগরিকগণের চিত্তবিনোদন করিতেছে । পারিজাতের অতুল সুস্বাদুতে সে রাজ্যের বাস্তুর নিগত সুগন্ধি । চিরবসন্ত সেখানে বিরাজিত, যুগ্মমলয় সেখানে সত্য সত্য গঠিত । এ হেন স্বর্গ বাস্তবিক লোভনীয় বটে, কিন্তু স্পৃহনীয় নহে । এখানে ভোগের আয়োজন যথেষ্ট রহিয়াছে সত্য, কিন্তু ভোগে অবসাদ আনে ; তাহাতে সুখ আছে, তৃপ্তি নাই, যেখানে কেবল ভোগের আয়োজন সেখানে কাম আছে, মোহ আছে । কামক্রেপমোহপূর্ণ এ স্বর্গ আমি ত চাহি না । যদি যুদ্ধার পরপারে এমন স্বর্গ থাকে, যেখানে কামনার স্থমিষ্ট যাতনা নাই, যেখানে সুখও নাই দুঃখও নাই, যেখানে কেবল সন্তোষ আনন্দ বিরাজিত, সে স্বর্গে যাইতে সদাই আকাঙ্ক্ষা আছে । যুদ্ধার পূর্বে কি এ স্বর্গ দেখিবার সুযোগ নাই ? মনে হয়, নিশ্চয়ই আছে । মনে হয় এই মর্ত্যই স্বর্গ ! এই মর্ত্যই নরক ! মনে হয় স্বর্গ, নরক এই মর্ত্যই আছে, অজ্ঞত নাই । যিনি এতটুকু অপকণ্ড করিয়াছেন, তিনিই অমৃত্যুপের আশায় একটু না একটু নরক বরণা নিশ্চয়ই পাইয়াছেন । আবার যিনি একদিনও নিকানভাবে জীবের সেবা করিয়াছেন, স্বার্থভাগ করিয়াছেন, সত্যের সন্ধান করিয়াছেন, তিনি চির আনন্দময় এই স্বর্গের কিঞ্চিৎ আভাস ছদয়ে উপলব্ধি করিয়াছেনই । ত্যাগ, সেবা, সত্যই প্রকৃত স্বর্গের সোপান । যুদ্ধার পরপারে অজ কোনও স্বর্গের আকাঙ্ক্ষা নাই—আকাঙ্ক্ষা আছে—এ জন্মে ত হইল না—যেন এই মর্ত্যে গুনরাগমন করিয়া সত্য, সেবা, ত্যাগের সাধনা করিতে পারি । তাহাতে আনন্দ মিলিবে, তৃপ্তি মিলিবে, স্বর্গ মিলিবে ।

শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী

পোকা কেন অকারণে দৃঢ় করি আলিঙ্গনে *
 পুকারে করিছে বাতিবাত,
 চপলা দাদার হাতে যেন এ মধুর প্রাতে
 প্রাণ মান স্বরিয়াছে হস্ত ।
 ওদিকে বুড়ার দল করিতেছে কোলাহল
 প্রাণে প্রাণে এ যে লাল চিহ্ন,
 কোথা রঙ কোথা ফাগু কবে ধূঁয়ে গেছে দাগ
 আবির্ভবের থ'লে শতছিন্ন ।

সুদীর্ঘ বারটা নাস সন্ধ্যাছি উপবাস
 বড় আশ পাব তব দর্শ,
 স্বাগত বাধবীনাথ হুপ্রভাত হুপ্রভাত
 এস হর্ষ, এস নববর্ষ ।
 পুরাতন হও দূর, চোক আজ চুর চুর
 তব সনে বিদ্রোহের স্তম্ভ ;
 তোমার রথের ধূলি মিলনতীর্থের রূপি
 ভালে মাগি প্রেম হল দস্ত ।
 সংসারের খেলা-ঘরে মিলেছিল এক স্তরে
 কবে হয়েছিল দলভঙ্গ ।
 সে কথার কাজ নাই তাই চিরদিনই ভাঙি,
 অনাদৃত দাও পুন মগ ।
 আলি মার্জনার লাগি তোনাদের কৃপা মাগি
 চরণে দাঁড়াবে ঘোড়-হস্তে,
 আর থাকিও না সরে' কোল দাও প্রাণ ভরে'
 পদধূলি দাও ঘোর মস্তে ।

* শ্রী প্রমথনাথ রায় চৌধুরী

সাহিত্য ও মানব-হৃদয় ।

কোন কোন দেশবিনোদ সাহিত্যকর্মসম্বন্ধে সাহিত্যের রসধার বঙ্গকর্মভূতপ্রতিদ্বিগা মনোভিনোদ মত দক্ষমানদের সম্মুখস্থানের উপর ঐতলধারা চিটাগিনার কোন দেশের কোন গ্রন্থ হইতে নামিয়া আসিয়াছিল, তাহার সময় নিকটপন্য ভাসাদা, অসাদাও বোধ করি বলা যায় । ছন্দোময়ী গোণা যেমন একদিন ভাবনসম্পন্ন বিরোধবিধুরা কৌকবধুর হৃদয়বেদনায় রক্তাক্তের মানসকল্যাক্রমে এ ধরায় ছন্দোভা করিয়াছিল, সাহিত্যের প্রথম রসধারা তেমনি কোন আদিযুগে বৃষ্টি বা মানবের মর্ষপীড়ার মহৌষধিরূপে মহৌষ্যানয় স্বর্গলোক হইতে দেবতার আশীর্বাদের মত নামিয়া আসিয়া আজও বহুধরার সন্তান সমুদ্রের সন্তাপচরণের উপায় হইয়া রহিয়াছে । প্রিয়বিরহ ও অপ্রিয় সন্ধি-কনের একত্রণ আঘাতে অন্তর যখন কাঁদিয়া উঠিল, তখন এই কণবিশ্বংসি ধরার কণিক স্রবের প্রত্যাশায় ফলাফলি দিয়া সত্য শিব সূন্দরের দর্শনের একান্ত আগ্রহে মানবননে দর্শনশাস্ত্রের অন্ধুরোক্তনের সূচনা হইল ; তখন কপিক, কণাদ, গৌতম, দৈপায়ন তাহারে অপার জ্ঞানসমুদ্র মনন করিয়া স্থাপত্য আনিয়া সংসারের কৃষ্ণার্থ ওষ্ঠাধরের নিকট ধরিলেন, সে স্থান আশ্রয় সকলের ভাগে ঘটে না, তাহার তাহা পান করিয়াছেন, তাহার পরম পুরুষার্থ লাভ করিয়া অমর হইয়াছেন কি না তাহা তাহারাই জানেন । রোগের একান্ত মুক্তির অব্যর্থ মহৌষধ সকলের ভাগে সকল সময় ঘটনা উঠে না, আপাত নিবারণের উপায়টুকু যদি পাওয়া যায় তাহাট পরম সৌভাগ্য । কৃষ্ণদৈপায়ন ও অচাৰ্য্য-শকরের মত চিকিৎসককে ডাকিয়া ভ্রাসাধ্য রোগের চিকিৎসা সকলের পক্ষে সম্ভব নয় । Burrows and Wellesleyএর আবিষ্কৃত অক্টরতি অতিক্রমণটিকার মত রসময় সাহিত্যের “সর্কাসসুন্দর” বটিকার সাহায্যে চরারোগা বেদনায় আপাত বাধির উপশম করিতে পারিলেই আনন্দা নাচিয়া যাই । কোন দয়াপরবশ দেবতার করুণায় এই “সর্কাসসুন্দরের” সৃষ্টি হইয়াছিল জানিবা, তাহার নাম Burrows কিনা তাহাও বলিতে পারি না, তবে উহা যে মানবসমাজের নিকট welcome তাহাতে বিধা করিবার কোন কারণই নাই । মানব-মনের চিরন্তন অমুর্ষ মানসী

১

মূর্ত্তিবিষয়ের শোভাসৌন্দর্য্যের মধ্যে মূর্ত্তিতে মূর্ত্তিতে অবিকৃত হইয়া পরম শোভা-
ময়ী সৌন্দর্য্যময়ী প্রাণমনমোহকরী যাহুকরী মূর্ত্তিতে দর্শন দিতেছেন, তাই, বহিঃ
প্রকৃতি বহুতর সৌন্দর্য্যাসম্ভার লইয়া এমন গোভানময়ী। বসন্ত বৈতালিকের
মধুর কণ্ঠ, মলয়স্পর্শে উন্নত নাগকের পুষ্পস্বৰ্ণা, প্রান্তটান্ত গগনের নয়নাভিরাম
নির্ণয় নীলিমা, শরদাকাশের সাক্ষরকরাগ ও পক্ষ-নির্ধাণিনীর পূর্ণ শশধর,
উষাস্করীর সীমন্তের সিন্দূরশোণিমা সবই আমার শ্রান্তক্লিষ্ট মনের উপর যথা
লেপ দিবার জন্য উদ্ভূত হইয়া আছে, আমার অন্ধ নয়ন সে কিছুই বেগিতে
পারেনা; তাই যে দেবতার আধীক্ষাদবলে মানসজন্মরীর প্রথম মূর্ত্তী মানবের
কণ্ঠে আসিয়া বাণীকপে দর্শন দিয়া নয়ন উন্মীলিত করিয়া দিয়াছেন, সেই পরম,
দেবতার অসীম অহুহা ও পরম শুভাধীক্ষাদ নম্রকে দারণ করিয়া বারবার
তাহার চরণোপান্তে মানবসমাজ উদ্দেশে প্রণত হইতেছে। বাগদেবতার সেই
প্রথমাবির্ভাবের দিন হইতে আজ পর্য্যন্ত মানবমন যখনই অভাব-সত্ত্বাতে আর্ন্ত
হইয়া উঠে, আভিচারিণী মানসী অপূর্ণ শোভাসম্মানে সমন্বিত হইয়া তখনই
মানবের মানসস্বর্ণে মূর্ত্তিমতী হইয়া বেগা দেন—সে মূর্ত্তি কনি কনো, তাকব
শ্রীমূর্ত্তিতে, চিত্রকর তুলিকাসাঠাঘো চিত্রস্তনী করিয়া রাপিতে প্রয়াস পায়।
অনন্ত স্বন্দরের অথও অনানয় আনন্দের সন্ধান লাভ করিয়া আমরা জীবমুক্ত
হইতে পারি না, হুঃ-দৈন্ত-আর্ন্তি-অভাব-পরিপূরিত এই পরলীর দুর্লভলে
আমাদিগকে জীবনযাপন করিতেই হয়, সে জীবন যখন হুঃখের বেদনায়, অভাবের
তাড়নায়, বিরহবিরোগের দাতনায় ভর্তুক হইয়া উঠে, তখন মানবঅনুভাবিণী
নানারূপময়ী মানসলক্ষীর মূর্ত্ত সৌন্দর্য্য সাত্তাহি আমাদের শান্তি ও সাহসের
বিধান করে। ব্যক্তিবিষয়ের অন্তর্য্যটে প্রবৃত্তিগণের আন্দোলনে মানস
বিহারিণীর করলাসন যখন চকল হয়, রসাত্মক বাক্যের মধ্য দিয়া নানারূপ
ননোমোহিনী মধুরমূর্ত্তি তখনই উদ্ভাসিত হইয়া উঠে এবং সে মূর্ত্তি দেশকালপাত্র
নির্ধিষ্টেবে চিত্রস্তনী হইয়া সস্তাপদক মানবমনের শান্তি সম্পাদন করে।

রামগিরিপ্রবাসী যক্ষের আশ্রিত কোন কালেই ছিগ কিনা মেঘদূত পড়িবার
সময় সে কথা কাহারও মনে আসে না, যক্ষের প্রিয়তমা “তথী শ্রুতা,” “মধা-
ক্ষমা” কি শ্রোণীভারমহুরা সে দৃশ্য কাহারও মনস্তরুর সন্মুখে উদয় হয় কিনা
জানিনা, কিন্তু নববারিধরসমাগবে কেতকীকুটজগন্ধবাহী সমীরণের স্নিতস্পর্শে
কালিদাসের ব্যাকুল বিরহ যে মূর্ত্তিমান হইয়া উঠিয়াছে তাহাতে সন্দেহ করিবার
কোন কারণই নাই। বিরহী প্রবাসী মল্লারাজ্য ছন্দের মধ্যে মল্ল মল্ল উচ্চারিত

মেঘদূতের অমরশ্লোকাবলী যখন পাঠ করে, তখন কালিদাসের করুণ বেদনা তাহার চতুর্দিকে বিরহবাথার জাগ বয়ন করিয়া দেয়, একথা কে অস্বীকার করিবে ? বর্ষার দিনে, বিরহের বিপুল বেদনার দিনে, মেঘদূতের মন্মাক্রান্তা কেবল যক্ষের নয়, কালিদাসের নয়, বিশ্বের সমস্ত প্রিয়-সান্নিধ্যশূন্যজনের ভাঙ্গা-ক্রান্ত মনে কি যম যন্ত্রণার সৃজন করে, তাহা প্রিয়-বিরহ-কাতর জনেই জানে । কালিদাসের মন্মাক্রান্তার অমরশ্লোকাবলী পাঠ করিতে করিতে যক্ষবিরহ পাঠকের বক্ষে জাজ্বল্যান হইয়া উঠে, দেশকালপাত্তের সমস্ত দূরতা বিদূরিত হইয়া যক্ষের ক্লিষ্ট করুণা আনার বাস্তব বেদনার সহিত মিশিয়া যায়, কবির বেদনার ছন্দোময়ী গীতি আনারই বিরোগজ্বতনার যথাযথ অভিব্যক্তির রূপ ধরিয়া উঠে । তারকনিধনরূপ দেবপ্রয়োজনে কুমারের সম্ভব প্রয়োজনীয় হইয়াছিল কিনা বলিতে পারি না, দেবকার্য্যে দক্ষদেহ অনঙ্গের চিরসঙ্গিনী নব বৈধবাবেদনাকাতর রতির সক্রুণ বিলাপে যে বিশ্বের সমস্ত বিধবার হৃদয়বেদনা ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা অস্বীকার না করিয়া উপায় নাই । বজ্রধার আলিঙ্গনে ধূসরিতস্তনী কন্দর্প-মনোমোহিনীর নববৈধবোর অসহ বেদনার মন্ত্রভেদি-বিলাপ প্রত্যেক বিধবার প্রিয়তমের চিত্তাবহির ছঃসহ তাপ জনমের মধ্যে কেনন করিয়া জ্বালাইয়া তোলে, তাহা প্রিয়-দগ্নিত-বিরোগ-কাতরা প্রিয়ই বলিতে পারে । পৌরাণিক আখ্যানমতে গিরিরাজনন্দিনী তাহার চিরপ্রার্থিত দেবাদিদেব মহৈশ্বর্য্যময় মহেশ্বরকে লাভ করিয়াছিলেন, তারকাহরনিধনকারী দেবসেনাপতি কুমারের সম্ভবে ব্যাঘাত হয় নাই, দেবকার্য্য সুসিদ্ধ হইয়া দেবতার আনন্দনিবাস স্বর্গলোক নিকটক হইয়াছিল, সর্ব্বপ্রকার মনোভীষ্ট লাভে সকলেই সফলমনোরণ হইয়াছিলেন, কেবল কন্দর্পের চিরসঙ্গিনী, অনঙ্গের চির সাহচর্য্যের একান্ত অভিলাষিণী স্রবপ্রিয়া তাহার প্রাণপ্রিয় চির-আকাঙ্ক্ষার মানসী কাম-দেবের হরকোপানলে ভস্মাবশিষ্ট দেহাবশেষের নিকট উদ্ভুক্তকুন্তলে রোদন করিয়া চতুর্দিক শোকাফুলিত করিয়া তুলিয়াছিলেন ; সেই শোক অন্তরে অন্তরে অশ্রুভব করিয়া উজ্জয়িনীর অনরকবি তাহার বিলাপগাথায় তাহাকে চিরস্থায়ী করিয়া গিয়াছেন । রতির হৃদয়বেদনা বিক্রমসভার কবিশ্রেষ্ঠের লেখনীমুখে নিঃসৃত হইয়া আজ পর্য্যন্ত সমগ্র বিশ্বের নববৈধবাশোকাঙ্ক্ষয় সজোবিধবার অব্যক্ত নন্দবেদনার সহিত মিশিয়া রহিয়াছে ।

দাক্ষায়ণীর শব্দকুহক্রে মহৈশ্বর্য্যময় মহেশ্বরের ভাণ্ডবন্তা কবিকল্পনার কি অপূর্ণ মনোমুগ্ধকর চিত্র তাহা ভাদ্রা-প্রকাশ-করা অসম্ভব । চন্দ্রীর চর্কে

বহুধা বিভক্ত সতীদেহ যোথানেই বিকিণ্ড হইয়া পড়িয়াছে, সেই স্থানই আজ পর্য্যন্ত মহাতীর্থ বলিয়া পূজা পাইয়া আসিতেছে—এ পূজা দেবত্বের নিকট নহে—ভূজঙ্গ ও মণিমালা গীর সমদৃষ্টি, মল্লীমহেশ্বর ও নগাণো গিনি ভেদজ্ঞান রহিত, চন্দনে ও চৈত্যতন্ত্রে গাঁহার সমজ্ঞান ; বিশেষ অমৃতের গাঁহার কোন প্রভেদ নাই, সেই সর্বভাগী শ্রমণবিহারীর ঐকান্তিক একমুঠ প্রেমের নিকট দেশকালনির্ঝিমে কোটি কোটি মানবের মত্তক অবনত হইতেছে । যুগযুগান্ত পূর্ব্বের মহাকবিকল্পিত মহাপ্রেমের নিকট নানবের এই স্বেচ্ছাকৃত প্রণিপাত প্রেমমাহাম্যের অপূর্ব্ব গৌরবের অকাটা ও অবিদ্যমান প্রমাণ । এই মহাযোগী মহাজ্ঞানী মহাপ্রেমিকের* প্রেমের ধন বলিয়াই শিবানীর শব্দেহের অংশ যোথানে পড়িয়াছে, সেই স্থানই আক্তি মহানহিনময় দেবীপীঠ বলিয়া খ্যাত ।

ঐমদ্ভাগবতের ধর্ম্মসম্পদ ও কাব্যসৌন্দর্য্যের একত্র সমাবেশ সাহিত্য জগতে অপূর্ব্বদৃষ্টি—কবিরাজবাসিনী স্কন্দরী মানসীর নাধূর্য্যময়ী মূর্ত্ত্তী এমন আর কোথাও বিকশিত হইয়াছে কিনা জানি না । অগতঃ ধর্ম্মানর্থ কৃপাক্রোধ মিলনবিরহের অনেক কণা কবি অপূর্ব্ব দক্ষতার সহিত বর্ণন করিয়া গিয়াছেন ; বহুদেব দেবকীর কারানিবাসের করুণকাহিনী, নন্দ-ঘণেশদ্বার অপূর্ব্ব অপভ্রংশে, ব্রজবালকের সুধাময় সখ্য, সাকাম্যস্বপ্নের মন্থরুপী, বনমালা বিকৃণ্ডিত, পীতাম্বর, ব্রজসুন্দরের চরণারবিন্দে বৃন্দাবনবাসিনী আভীরমগীর অচলাচলিত সন্তঃকল জীবন্তু, মহারাসবিলাসিনী পদ্ম প্রেমময়ী ব্রজেশ্বরী শ্রীনতীর স্তানসুন্দরে অপূর্ব্ব অমুরাগ ভারতসাহিত্যের অমূল্য মণিদয় সম্পদ ।

বৈদিক সনয়ের উবা অরুণ ইন্দ্র বরণের স্ততিগীতি, ঔপনিষদিক যুগের কথাছলে ব্রহ্মোপদেশ, রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতির পৌরাণিক ইতিকথা, মহাশেষতা পুণ্ডরীক প্রভৃতি অর্দ্ধপৌরাণিক চরিত্রচিত্র, পুণ্যবর্ণিত দেবমানব চরিত্র অবলম্বনে শকুন্তলা উত্তররামচরিত কুমারসম্ভব প্রভৃতি কাব্য ও নাটক এবং মুচ্ছকটিক মুদ্রারাক্ষস প্রভৃতির সামাজিক অবস্থাবর্ণন—এই সমস্ত উপলক্ষ্য করিয়া কবিজগদের অপরূপ সৌন্দর্য্যদৃষ্টি হৃৎখণ্ডীর্ণ অভাবপূর্ণ মানবমনের কি অমৃতপ্রলেপ তাহা কাব্য-কুঞ্জের সাহিত্যিক ঘটপদবৃক্ষের অবিদিত নহে ।

কবিশঙ্কর অযোধ্যাকাণ্ডে কোশল্যা-দশরথের রামবাংসলা ও অযোধ্যাবাসী নরনারীর রামনির্কাসনের অক্লান্ত করুণা স্মরণ হস্তে রচনা করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু সে হৃৎখণ্ড বিস্তৃত হইতে পাঠকের অধিক সময় লাগে না ; সীতানির্কাসনের

অপার করুণা আজও ভারতবাসি-নরনারীর মনে শেলসম বিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, কালের প্রলেপ সে ক্ষত-বেদনার কিছুই করিতে পারে নাই ।

কুমারসম্ভবের উমা তাঁহার অনবস্থ সৌন্দর্য্য ও প্রণমোদ্ভিন্নযৌবন লইয়া হরযোগভঙ্গে বিফলমনোরথ তইলেও তপজ্ঞার বলে তাঁহার চিরাকাঙ্ক্ষিতকে লাভ করিয়াছিলেন, তাই তাঁহার সামগ্রিক বার্থতার বেদনা মানবের মনে চির-
—হারা হইয়া নাই, কিন্তু স্মর-সঙ্গিনীর বৈধবোর ব্যথা আমরা ভুলিতে কি পারি ?
উনবিংশ সর্গে সনাতন রথবংশের সবটুকু আমরা ভুলিয়া যাই, নবোঢ়া ইন্দুমতীর অকালবিরহে অজ্ঞের বিলাপ প্রধাবিতহিত জ্ঞানের মনে জাতমূল হইয়াই থাকে । নন্দজ্বালার বৃন্দাবনলীলা মাধুর্ঘ্যের অপার পারাবার—দাশু, সখা বাৎসল্যের তরঙ্গভঙ্গে সে সুধাসমুদ্র নিত্য লীলায়িত ; অনঙ্গবন্ধন বংশানিনাদে প্রেমোন্মাদিনী আহিরিণীর রজনীযোগে বনপথে প্রয়াণ, কুটিলকুন্তল শ্রীমুখের প্রতি অপলক দৃষ্টিদানের ব্যাঘাতস্বরূপ ক্লেশতার নয়নের ঘনপদ্মদাতা বিধাতাকে দিকার দান, গোপকানিনীর প্রগাঢ় প্রেমের কি প্রচুর প্রমাণ, তাহা গোপি-গীতার পাঠকেই জানে, কিন্তু এ সকল রসতরঙ্গ হৃদয়তটে নিত্য আঘাত করে কিনা জানি না, যেদিন আহিরিণীর মননজলে যমুনার জলতরঙ্গ বৃদ্ধি করিয়া রাধাচন্দ্রের আশালতা সমূলে উৎপাটিত করিয়া—যে দিন শ্রীহরি শ্রীমতীর শতবৎসরবাণী বিরহের বাবুলা করিয়া অক্ষুরের রথে আরোহণ করতঃ বড় সাধের ব্রহ্মধাম ত্যাগ করিলেন, “পাদমেকং ন গচ্ছামি” সত্যের মর্যাদা যে দিন তিনি ভঙ্গ করিলেন, রাধাচন্দ্রের সে দিনের করুণা, চরিত্রবিরহের সে ছঃসহ বন্ধি, মানব সমাজ আজও ভুলিতে পারে নাই, কারণ বৃন্দাবনলীলা যে নিত্যলীলা, মানবের হৃদয়কুমিই যে নিত্য বৃন্দাবনধান ।

বৈচিত্র্যময় ধরণীতলে মানবজীবন নানা সুখঃখের মধ্য দিয়া অতিবাহিত হইতেছে—কুস্র কুস্র সুখের মধ্যে, আনাদের দৈনিক জীবন বহিয়া যায়, সে সুখের স্মৃতি আনাদের মনে চিরন্তন হইয়া থাকে না, কিন্তু হঃখের সুরধার অজ্ঞে যে ক্ষতচিহ্ন রাখিয়া যায়, সে দাগ জীবনে মিলাইবার নহে । সাহিত্যের মধ্য দিয়াও যখন আমরা হঃখের বার্তা পাই, সে হঃখ আমাদের মনে চিরহারী হইয়া থাকে । অশ্রুজলের প্রস্রবণধারায় তাহা ধুইয়া ফেলিবার চেষ্টা আমাদের বুধা চেষ্টা ।

কেবল পৌরুষিক সাহিত্য নহে, নববঙ্গের সাহিত্যওরু বহুমুখ, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতিও আমাদের হঃখের চিত্র দিয়া ভুলাইতে পারেন নাই । স্বর্ধ্যমুখীর

স্বপ্নের সংসার আবার ফিরিল ; সে স্বপ্ন আমাদেরিগকে স্বপ্নী করিল ক্রিনা জানিনা, ক্ষুদ্র কুন্দের দুঃখ আমাদের মনের উপর গুরুত্বের বিক্ষাণিগির মত চাপিয়াই আছে । রবীন্দ্রনাথের আশার আশা মিটিয়াছিল, কিন্তু বিনোদিনীর বিনোদনের উপায় গ্রন্থকার কিছুই করেন নাই—বিচারীর প্রত্যাখ্যান বিনোদ ও পাঠকের মনে শেলসমই বিদিয়া রতিয়াছে ।

ভ্রমর এবং গোবিন্দলালের প্রথম জীবন স্বপ্নেই কাটিয়াছিল সে স্বপ্নের চিত্র আমাদের মনে কণস্থায়ী, তাহাদের দুঃখময় পরিণাম পাঠককে অসহায় ভাবে অভিভূত করিয়া দেয় । প্রমথনাথের হাত চইতে কেচই এ সংসারে নিস্তার পায় না, ইহারও পায় নাই, অবশিষ্ট জীবনকাল ইহার যে দুঃখে কাটাইয়াছে এবং যে দুঃসহ দুঃখের মধ্যে ইহাদের অবসান হইয়া গিয়াছে তাহা মনে আসিলে অশ্রুজলে পাঠকের কণ্ঠরোধ হইয়া যায় এবং প্রথম জীবনের সুখময় দিনগুলি নৃত্যভঙ্গীতে অতিবাহিত হইলেও সে স্মৃতি পাঠকের মন চইতে মুছিয়া গিয়া কেবল তাহাদের দুঃখেরই কথা আমাদের মনে ভারের মত চাপিয়া বসিয়া থাকে । নীতিবিৎ হয় তো রোচিণীর দুঃখে কাতর হইবেন না, কিন্তু হরলালের অর্গের লোভ এবং বিবাহের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া রোচিণী গোবিন্দলালের অজ্ঞাতসারে তাঁহার পরমোপকার সাধন করিয়াছে উহা যে প্রেমের প্রেরণায় করিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ করিবার কিছু নাই এবং সেই প্রেমপ্রসূতা রোচিণীর প্রতি গোবিন্দলালের নিষ্ঠুর ব্যবহার দেখিয়া অনেক পাঠকের চক্ষু অশ্রুভারা কুল হইয়া আসে ।

সন্ন্যাসী চন্দ্রশেখর শৈবলিনীকে ফিরিয়া পাইয়া আবার সংসারী হইয়াছিল,কিন্তু সংসারে থাকিয়াও চিরসন্ন্যাসী প্রতাপের বার্থ্যপ্রেমের পদতলে হাঁজমুখে বেচ্ছাকৃত আত্মবিনাশের সঙ্করণ কাহিনী হতভাগা পাঠককে কেমন করিয়া শোকাকুলিত করিয়া তোলে তাহা চন্দ্রশেখরের পাঠকবর্গের কাছে অবিলম্বে নাই ।

নাট্যকালের যখননাথ বঙ্গভাষার কবিতাগ্রন্থের মধ্যে উচ্চস্থান লাভ করিয়াছে—কবি দক্ষতার সহিত অনিপুণ হস্তে নানা স্বপ্নের চিত্র অঙ্কিয়ানছেন, রামলক্ষণের ভ্রাতৃবাৎসল্য, বিভাষণের জ্ঞানপরতা, সরমার সীতার প্রতি মহামুহূর্ত্তি কিছুই পাঠকের মনে স্থায়ী স্থান লাভ করে নাই । দশম সর্গে ইন্দ্রজিতের অবসানের পর বিয়োগকাতরা প্রমীলার সহমঙ্গলদুঃখ এবং দান্তিক দীর্ঘশাসী ভোগী বীরাগ্রগণা রাজাধিরাজ রাবণের শোকনস্ত্র হৃদয়ের বৈরাগ্য বাণা পাঠকের অন্তর চির-বেদনাতুর করিয়া রাখিয়াছে ।

অশান্ত আকাঙ্ক্ষা পঙ্করপিঙ্করে ঢকল বিহঙ্গের মত চির-অস্থির হইয়াই আছে, জীবনভরা তপস্যা করিয়াও প্রিয়-লাভের বাসনা আমাদের কৃপ্ত হয় না, তাই সংসারের দৈনিক জীবনে "কুস্ত্র কুস্ত্র সূত্ৰ নিতা আসে ও চলিয়া যায়, আমাদের অন্তরপটে কোন চিহ্নই রাখিয়া যাইতে পারে না । একান্ত আগ্রহ ভরে আমাদের পরমপ্রিয় পদার্থটির প্রতি একাগ্র দৃষ্টি আমরা রাখিয়াছি জীবনব্যাপী আরাধনা ব্যর্থ করিয়া দিয়া কামনার ধন যখন আমাদের প্রসারিত হস্ত হইতে দূরে প্রস্থান করে, সে ছর্ণিবার হৃৎখ আ আমাদের সমস্ত অবশিষ্ট জীবন কালকে বিবাদময় করিয়া দেয়—সাহিত্যে, মধ্যে ও যখন আমাদের হৃদয়স্থ বিবাদ বিষয়তার প্রতিচ্ছবি দেখিতে পাই, আমরা হৃদয়ের অভিযুক্তি বলিয়া উহা আমাদের অন্তরকলকে চিরমুদ্রিত হইয়া যায়, অপ্রাপ্ত-জীবন-সর্বস্বের নিবিড় বেদনা তখন নিবিড়তর হইয়া বিবাদের ঘনীভূত অন্ধকারের মধ্যে কাঙ্গাল থাকিয়াই আনাদিগকে এ জীবনের নিকট চিরবিদায় লইতে হয়—তাই

গরেই যারা যাবার তারা কখন গেছে ঘরপানে
পারে যারা যাবার গেছে পারে,
ঘরেও নহে, পারেও নহে, যে জন আছে নাশ্বতানে
সন্ধ্যাবেলা কে ডেকে নেয় তারে !
“কুলের বা'র নাইকো যার ফসল যার ফসলোনা
ছাংখের কথা ব'লতে হাসি পায়,
দিনের আলো যার ফুরালো সন্ধ্যার আলো জ্বলোনা
সেই বসেছে ঘাটের কিনারায় ।”

মহাকবির এই করুণ উক্তি পাঠ করিয়া এতাদৃশ অবহাপনের মনে কি হয় তাহা সেই জানে ।

শ্রীজগদীশ্বরনাথ রায় ।

অন্ধ আবেগ ।

গাইতে গিয়ে স্তরটিরে যাই ভুলি',
 চিন্তে লগ্না নয়ন নগন পুন্নি',—
 চারদিকেতে অঁধার-করা ধূলি
 সাগর ধাঁধাঁ, তাই তো যদি অঁধি ।
 ভাবনায়ে যাই ভুলে' ভাবতে গেলে ;
 চলতে গিয়ে দাঁড়াই চরণ ফেলে' ।
 গুমতে চাই যখন, চক্ষু মেলে'
 কেমন যেন অবাক হয়ে'ই থাকি ।
 সত্য বলে' জড়িয়ে ধরি যা'রে,
 স্বপ্নসম মিলায় অন্ধকারে ।
 মায়ায় মোহে পথটি বারে বারে
 এমনি করে' চারিয়ে ফেলি তা'ই ।
 কান্দতে চাহি, কান্না নাছি আসে
 বুকটা ভরা কেবল দীর্ঘশ্বাসে !
 জীবন-পথে শুধুই আশে পাশে
 সংখ্যাবিহীন বাধাই দেখতে পাই !
 চায়রে, এমন আপনা-ভোলা ঐগে
 কোথায় যে'তে যাব যে কোনখানে,
 কেমন করে' কইব ? কেই বা জানে—
 কোথায় গেলে শাস্ত ত'বে মন ।
 ভুলকে যতই রাখতে চাইরে দূরে
 ততই যে তা'র মাঝে বেড়াই ঘুরে' !
 কেন রে আজ আমার মনম-পুরে
 এ কা'র শুনি কিসের আবাতন ?

শ্রীদেবকুমার রায়চৌধুরী ।

বার্থতা ।

(১)

সুভাষিনী মৃত্যুশয্যায় পড়িয়া স্বামী নরেশচন্দ্রকে পুনরায় বিবাহ করিবার জ্ঞান অত্যন্ত অস্বপ্ন করিয়া যান । কিন্তু নরেশ আজ পর্য্যন্ত বিবাহ করে নাট, করিবে বলিয়া ত মনে হয় না । এক বৎসর অতীত হইল নরেশচন্দ্র বিপত্নীক হইয়াছে । এই এক বৎসর যে কেমন করিয়া অতিবাহিত হইয়াছে, তাহা নরেশের মুখের প্রতি চাহিলেই বুঝিতে পারা যায় । হাল্হময় যুবকের মুখে হাসি নাই । যৌবন-স্বলভ স্বাস্থ্য-সৌন্দর্য্যের উপর এমন একটা ইচ্ছাকৃত অঘটন ও অবহেলার বলিন ছায়া পড়িয়াছে, যাহা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে । সংসারে থাকিতে হয় বলিয়াই যেন কোন রকমে সে আছে । কোন দিক চাইতে একটা নিবিড় মেঘবন্ধন তাহার উপর অথও আধিপত্য সংস্থাপন করিতে অক্ষম জানিয়া, সে তাহার সচিব সকল সঙ্গক বিচ্ছিন্ন করিয়াছে ।

বসন্তনগর গ্রামে নরেশচন্দ্র ঐশ্বর্য্যশালী জমিদার । আজ কয়েক বৎসর হইল সে ওকালতী পাস করিয়াছে । কিন্তু কেহ তাহাকে একদিনের জ্ঞানও আদালত নাড়াইতে দেখেন নাই । বহু শাখা-প্রশাখা-বিশিষ্ট এই প্রাচীন সম্ভ্রান্ত জমিদার-পরিবার অধুনা লোকবিরল । নরেশচন্দ্র একমাত্র বংশধর ।

বহু কষ্টা অসুস্থত্বের পর সুভাষিনীকে, নরেশের পিতা ব্রজেন্দ্রভবাবু পুত্রবধূরূপে মনোনীত করেন । তিনি সম্ভবত্বাতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করিয়া নরেশের বিবাহে সমস্ত গ্রামবাসী আনন্দোৎসব করিয়াছিলেন । নরেশের বিবাহের পাচ বৎসর পর, সে বৎসর গ্রামে ভীষণ মহামারী দেখা দিল । গ্রামে হাটাকার পড়িল । ব্রজেন্দ্রভবাবু লোকের বাড়ী বাড়ী গিয়া ঔষধবিতরণ করিলেন । কিন্তু মহামারী গ্রাম ত্যাগ করিবার পূর্বে, মহামূল্য ঔষধী জীবন বলি লইয়া প্রস্থান করিল—ঠাচার নরেশের জনক-জননী ।

কল-কোলাহল-পরিপূরিত, নিত্য-মহোৎসব-মুখরিত জমিদার-ভবন এখন অভিনবাস্ত্রে রক্তমণ্ডলের মত নীরব, নির্জন ও নিরানন্দ । কশ্মচারিগণ দপ্তরখানায় বসিয়া কাজ করে অতি সার্বধানে, আশঙ্কা পাছে গোলমাল হয় । একটা ক্রমাট বিবাদমলিন, ছায়া, জমিদার-গৃহের সর্ব্বদিকেই প্রতিদিন মসীকৃতকরণে ঘনাইয়া উঠিতেছিল । অম্মাভাবে দরিস্র মগন ভিক্ষাপাত্রহস্তে একমুষ্টি অন্নের নিমিত্ত বৃকডরা আশ্বাস লইয়া দ্বারে দাঁড়াইত, তখন ত্রীহীন

জমিদার-গৃহের পূর্ব-গোরব-কাচিনী স্মরণ করিতে নগ্ন অশ্রুসিক্ত যে না চইতে, তাহা বলিতে পারি না ।

বৃদ্ধ নায়েব চরিশকর বহু বার নরেশের নিকট বিবাহের প্রস্তাব উপাধন করেন, কিন্তু কোন ফলোদয় হয় নাই । পরম আত্মীয়স্বরূপ নায়েবের সকল কথা, নরেশ নীরবে শুনিত, কিন্তু কোন উত্তর দিত না ।

(৩)

নরেশের বাটার উত্তর দিকে, প্রায় চই মশি দূরে, স্বর্গীয় নরেন্দ্রনাথের অভিভাবক-বিলীন পরিবার একখামি পতনোন্মুখ ভগ্নবাটোতে বাস করিত । নরেন্দ্রনাথ অকালে মারা যান । তাঁহার মৃত্যুকালে একমাত্র নবমবর্ষীয়া কন্যা ইন্দিরা ও স্ত্রী লক্ষ্মীমণি ভিন্ন সংসারে অপর কেহ ছিল না । যৎসামান্য চই চারি বিঘা জমিহীন ঘাটা ছিল, তাহা বন্ধক দিয়া ভগ্নতা, নান-সন্নয়ন করা করিতে অচিরেই সব প্রায় নিঃশেষিত হইয়া গেল । ক্রমে চই মুঠা অন্ন জোটাও কঠিন হইল । মুখ সুটিয়া ভিক্ষা করা বা অস্ত্রের নিকট দারিদ্র্যের কথা প্রকাশ করা, লক্ষ্মীমণির পক্ষে মর্মান্বিত । গাছের ফল বিক্রয় করিয়া ও টুপি বুনিয়া চই চারি আনা যাহা পাইতেন, কোন প্রকারে তাহাতে ইন্দিরার ভাতই অনেক দিন এক বেলায় আহার সংগ্রহ হইত । ইন্দিরা থাইতে বসিয়া যখন জিজ্ঞাসা করিত “মা, তোমার ভাত বাড়লে না”, তখন লক্ষ্মীমণি বহু কষ্টে আত্ম-গোপন করিতেন, পাছে সত্য কথা জানিতে পারিলে ইন্দিরার কোমল হৃদয়ে বাধা লাগে ; সুতরাং বলিতেন “আজ যে না মঙ্গলবার, আনাকে খেতে নাই ।” কোন দিন বা একাদশী, পূর্ণিমার নাম করিয়া কন্ডার নিকট হইতে পরিত্রাণ পাইতেন । অভ্যস্ত দুর্গের চল্লীষা প্রাচীর মধ্যস্থিত শত্রু-আক্রান্ত সৈন্তের জাগ্র দারুণ ক্ৰোধের জ্বালা, দারিদ্র্যের কঠিন নিষ্পেষণ, লক্ষ্মীমণি অগ্নান বদনে সহ করিতেন ; কাহাকেও খুণাকরে সেকথা জানিবার অবকাশ দিতেন না ।

লক্ষ্মীমণির সহিত সুভাষিনীর বিশেষ ভাব ছিল । সুভাষিনী লক্ষ্মীমণির অপেক্ষা বয়সে কনিষ্ঠা হইলেও তাহাদের মধ্যে সখীত্বের দিক চইতে কোনরূপ বাধা ছিল না ; সেটা বৃদ্ধিমতী সুভাষিনীর গুণে । সুভাষিনী যখন জীবিত ছিলেন, তখন প্রায় তাহাদের নানাক্রম সাহায্য করিতেন, ও নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইতেন । সুভাষিনী লক্ষ্মীমণিকে যথেষ্ট যত্ন করিতেন । তিনি যে জমিদারগৃহিণী আর

লক্ষ্মীমণি যে সামান্য দরিদ্র গৃহস্থবধূ, এমন একটা ভাব, কোন দিক হইতে, কোন দিন তাঁহাকে জামিনবার মোটেই অবসর দেন নাই । সে কারণ, লক্ষ্মীমণিও স্ত্রীভাষিনীর নিকট সকল অভাব, অভিযোগ, অসন্তোষে প্রকাশ যে না করিতেন, তাহাও নয় । লক্ষ্মীমণি যখন বিধবা হইলেন তখন স্ত্রীভাষিনী তাঁহার চুপ, অন্তরের সহিত উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং অনেকদিন পর্য্যন্ত কোনরূপ আনন্দোৎসবে যোগ দেন নাই ।

ইন্দিরা মেয়েটি মায়ের মত ধীর-প্রকৃতি, মুখে কথা নাই । এই অল্প বয়সে বেশ একটা সংযমের আভাস তাহার শিশু-প্রকৃতিতে পরিদৃষ্ট হইত । অনর্থক কথা বলা বা অকারণ হাত নোটেই সে পছন্দ করিত না । মায়ের সঙ্গে টুপি বুনিয়া সে তাহাদের অবস্থা বেশ উপলব্ধি করিয়াছিল । ইন্দিরাকে দেখিলে মনে হয় দরিদ্রের গৃহে ছলনা করিতে বৃষ্টি বা স্বয়ং ইন্দিরারই আবির্ভাব হইয়াছে । ভ্রমর-কৃষ্ণ মুক্ত কেশপাশ, প্রবালারক্ত অধরপল্লব, পদ্মকোরকের মত সৌন্দর্য্য । প্রফুল্লিত রক্তগোলাপের ছায়া তাহার লাবণ্য, শীতার ককারের মত তাহার কণ্ঠস্বর । এত রূপ বিধাতা কেন যে, এই নিঃসহায় দীনা বালিকার উপর মুক্তহস্তে ঢালিয়াছেন, বিধাতাই বলিতে পারেন ! কিন্তু, এত সৌন্দর্য্যসম্ভার লইয়াও ইন্দিরা সংসারে চিরচুখিনী । ইন্দিরার বিবাহের সময়, স্ত্রীভাষিনী নরেশচন্দ্রকে দিয়া অযাচিতভাবে বিবাহের সমস্ত ব্যয় প্রদান করান ।

দশ বৎসর বয়সে ইন্দিরার বিবাহ হয় । আর যে বৎসর স্ত্রীভাষিনী ইহসংসার হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করেন ; তার পর বৎসর ইন্দিরা পনের বৎসর বয়সে উপনীত হয় । যৌবন-বয়স্কের আগমনে যখন ইন্দিরা অপরিখাপ্ত সৌন্দর্য্য-সম্পদে ঐশ্বর্য্যময়ী, যখন চারিদিক হইতে একটা আনন্দের আবেশ-বিচ্ছল চাকলা, পদে পদে তার অন্তরের অবসাদ ও আগন্তুর উপর সাড়া দিয়া চলিয়াছে, তৃষ্ণাকাতর অধরোষ্ঠের নিকট হইতে সহসা স্নীতল বারিপাত্র অপচরণ করার মত যৌবন-প্রারম্ভেই বিধাতা ইন্দিরার নারীত্ব চিরজীবনের নিমিত্ত বাণ্য করিয়া তাহার স্বামীকে বিচ্ছিন্ন করিয়া গমন এবং দৈত্বের পদরা মাথায় তুলিয়া দেন । সে দিন এ চুঃসংবাদ শুনিয়া লক্ষ্মীমণি কছার ঘরের দিকে কেবল তত্ত্বিত নির্বীকভাবে চাটিয়াছিলেন চীৎকার করিয়া কানিয়া ইন্দিরাকে আরো অধিক করিয়া শোক-মাগনে ভাসাইয়া লাভ নাই বুঝিয়াছিলেন বলিয়াই বোধ হয়, তাহার নয়নপ্রান্তে এক বিন্দু অশ্রু দেখা যায় নাই । অন্তরে যে চর্মসহ সর্ষৎবেদনা অহোরাত্র তাঁহাকে স্পীড়ন করিত, তার মাঝে মাঝে লক্ষের কঠিন কারা ত্রিধীর্ণ করিয়া সকলের

অজ্ঞাতে অলমারীর কুটীরা উন্মিত, কক্ষকে ছদয়ে ঢাপিয়া সকল জালা-যন্ত্রণা বিস্মৃত হইতে তিনি গাণপথ শব্দিত প্রয়াস পাইতেন । সুভাসিনীর "মৃত্যুর পরও নরেশচন্দ্র তাহাদের সাহায্য করিতেন ।"

(৩)

সে দিন সকালে অত্যন্ত সেবা করিয়াছে । গগনস্পর্শী নারিকেল গাছগুলি যেন মেঘস্পর্শে স্তব্ধ হইয়া রহিয়াছে । নরেশচন্দ্র বাতায়নের সম্মুখে একপানি চেয়ারে বসিয়া একদৃষ্টে মেঘের একটানা স্রোত দেখিতেছিলেন । টেবিলের উপর কয়েকখানি বই পড়িয়াছিল । হঠাৎ কি ভাবিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন । গৃহভিত্তিগাত্রে স্তম্ভজিত চিত্রগুলি সচস্বেদ দৃষ্ট হইলেও এক মনে পুনরায় দেখিতে লাগিলেন । অবশেষে একটি আলমারীর নিকটে গিয়া দাঁড়াইলেন । এ আলমারীটি সুভাসিনীর । আজ দীর্ঘ চুই বৎসর আলমারী আবদ্ধ বস্ত পুতুল-পরিবার কয়েকী অবস্থায় রহিয়াছে । সুভাসিনীর স্পর্শস্বপ্ন হইতে তাহারাও নিশ্চয় ভাবে নির্বাসিত । অনেকগুলি গ্রন্থ স্কন্ধরূপে বাধান,—তাহাদের উপর সোণার জলে নাম লেখা । সেগুলি কাচের প্রাচীরের ভিতর হইতে আশ্র-পরিচয় প্রদান করিতেছে । নরেশ দেখিল একখানি ক্ষুদ্র হস্তিদন্তের পালঙ্কের উপর মধ্যমলের শয্যা—শয্যার উপর চুইটি স্কন্ধর চীনে নাটীর পুতুল শয়ান রহিয়াছে । তাহাদের কর্ণদেশে নানাবর্ণের পুঁতির মালা । সুভাসিনীর বস্ত স্তম্ভস্বপ্ন ও অপূর্ণ স্বপ্নসাধ এই আলমারী মধ্যে তাহাদের লইয়া নিবদ্ধ, তাহারা কোমল হস্তের নিপুণ কলাকৌশল ও নারী-ছদয়ের যৌবন-স্বলভ অলীক কল্পনার মানচিত্রাবলি অসম্পূর্ণ অবস্থায় পরিপূর্ণতার প্রতীকায় ব্যাকুল অন্তরে আলমারীর মধ্যে অপেক্ষা করিতেছে । নরেশচন্দ্রের মনে হইল, আলমারীটি খুলিয়া তাহাদের উপর সজিত ধূলারশি বিদূরিত করেন ; কিন্তু তাহা করিলে পাছে যেমনটি আছে, তেমনটি না হয় ; সুতরাং বাহির হইতে দেখিয়াই তিনি স্থগী হইলেন ।

এমন সময় বাহির হইতে অত্যন্ত মৃদুকণ্ঠে ইন্দিরা ডাকিল, "নরেশ-দাদা কি ঘরে ?"

চিন্তাস্রোতে বাধা পাইয়া নরেশচন্দ্র ফিরিয়া দেখিল, একখানি অত্যন্ত মলিন, বস্ত্র পরিধান করিয়া ইন্দিরা দাঁড়াইয়া । তাহাকে দেখিয়া নরেশচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল "কিরে ইন্দু ? ভিতরে আয় ! ওখানে দাঁড়িয়ে কেন ?"

ভিতরে আসিয়া ইন্দিরা মেঝের দিকে চাহিয়া কল্পিত-কণ্ঠে বলিল "মার চার পাচ দিন অর হয়েছে—কিছু খান না, অরও খুব বেশী ।"

একটা অবাধা উল্লাসের তীব্র নেশা তাকে তাহার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে কখন যে আকুল করিয়া গৃহভাঙ্গার চইতে টানিয়া বাতির করিল, তাহা নরেশ অশ্রুভব করিতে পারিল না। সেই সেই নেশায় দেখিল, যেন আজ একটা অসম্ভব সৌন্দর্যের বস্ত্র বিধের সঙ্গরানে ঢাকলা জাগিয়া উঠিয়াছে। সে বস্ত্র সকলকে ভাসাইয়া লইয়া চলিয়াছে। সে ঢাকলা সকলকে উদ্ভাসিত করিতেছে। দেখিল সহস্রবার দৃষ্ট, সেই আকাশ, সেই স্থনীল মেঘপুঞ্জ অপূর্ণ শোভাসম্ভার, অনন্তসৌন্দর্য, অধীর উল্লাসে আজ বিশ্বজয়ের জন্ত যুদ্ধঘোষণা করিয়াছে। পুষ্পবিতানেও সে আনন্দের জোয়ার লাগিয়াছে। সেখানে পুষ্পরাশিও যে পর্যাপ্ত ফুটিয়াছে। নরেশ বৃথিল না, কেন আজ তাহার সঙ্গরীর পুলকিত চইতেছে। একটা অজানা অভাব যেন মনে হইতেছে, তাহার সমস্ত ইন্দ্রিয়কে নির্জন আকর্ষণে পীড়িত করিতেছে। আজ নরেশের দৈহিক মন অকস্মাৎ নিঃসঙ্গ জীবনের বার্থতায় ক্লান্ত চইয়া উঠিল। নরেশের চক্ষে ক্ষুদ্র ৩ণটিও আজ এক অপূর্ণ রূপলাবণ্যে উদ্ভাসিত। কাশিশের উপর কপোত-দম্পতীর স্তম্ভসম্মুখে নৃধনুর্পী বসা, আজ তাহার অনাবৃত্তক জীবনে, নবীনজীবনের আলোকসম্পাত করিল। একটা অনাগত আনন্দের নবীন আলোকরাশি তাহার বিগ্রহ-বিহীন অন্ধকার জঙ্গল-নিকরে, আরতি-দীপ জালিয়া দিল। তাহার অন্তরের মাহুঘটা আজ তাহার শূন্যতাকে পূর্ণতা দান করিবার নিমিত্ত তপড়ষ্ট দেবতার মত তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। নরেশচন্দ্র অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত পুঁজিয়া পুঁজিয়া লোকবিরল পথে বেড়াইতেছিল। স্তম্ভসম্মুখে, সম্ভব অসম্ভব মৃষ্টিগুলি তাহাকে চকল করিল। সন্ধ্যার পথই মাঠ পার চইয়া পল্লীপ্রান্তরস্থিত পুকুরিণী অভিমুখে চলিল। সেই দিক দিয়া গৃহে ফিরিলে কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা নাই। তাহার কেবল মনে চইতেছে, আজ যেন তাহার সকল কাজেই তার জন্মের গোপনীর কথাগুলি আপনা-আপনি ধরা দিবার জন্ত ব্যাকুলভাবে প্রকাশ পাউতে লাগিল।

[৫]

সন্ধ্যার একটু পূর্বে ইন্দ্রিা জিজ্ঞাসা করিল “মা আজ কেমন আছ ?”

“বেশ ভাল আছি। আজ ত আর জর হয় নি,—ইন্দু, তোর পাওয়া হয়েছে ?”

“চাা মা, চইতেছে। আজ যদি আমাকে খাবার দিয়ে গিয়েছিল।”

লক্ষ্মীমণি বলিল, “ভগবান তাঁদের ভাল করুন, ওরা না থাকলে, আর যে ক্রি হ’তো, বলা যায় না।”

“তা সত্যি মা, নরেশনাথ পূর্ব ভাল লোক, কিন্তু উনি কেবল যেরে বসেই থাকেন। সে দিন দিদি বলছিলেন, কিছু কাজ কণ্ড দেখেন না। তা মা, একটা বিয়ে করা কি উচিত নয়?”

লক্ষ্মীমণি কোন উত্তর না দিয়া পাশ ফিরিয়া শয়ন করিল। অনেকক্ষণ পরে বলিল, “একটু জল দে ত মা। ইয়ারে, একাদশী কবে জানিস?”

জল গড়াইতে গিয়া ইন্দিরা দেখিল কলসীতে সামান্যমাত্র জল আছে, রাত্রে চলিবে না। তার জল না তোলা বড় জ্বল হইয়া গিয়াছে। তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে,—ঘাটের ধীরে নীল আকাশে রক্তকিরণ বিকীর্ণ করিয়া দশমীর চন্দ্র দেখা দিয়াছে। ইন্দিরা বলিল “কাল একাদশী মা!”

কাল একাদশী শুনিয়া লক্ষ্মীমণি কোন উত্তর করিল না। ইন্দিরা ভাবিল, মাকে বলিয়া এখন জল আনিতে যাইলে মা রাগ করিবেন। কিন্তু জল না হইলেও ত চলিবে না। যদি রাত্রে জল চান? আবার মনে হইল, কাল একাদশী! দিনের বেলা জল না তুলিয়া সে অত্যন্ত অজ্ঞান করিয়াছে, একপাটাই অনেকবার ইন্দিরাকে আঘাত করিল।

পাড়ার বাহিরে, মাঠের পারে, জমিদারদের “নূতন পুকুর”। যে বৎসর মহামারীতে নরেশের পিতামাতা ও বসন্তনগর গ্রামের অনেকেই অকালমৃত্যুর কঠোর আত্মান উপেক্ষা করিতে পারে নাই, সে বৎসর নরেশচন্দ্র জনকজননীর স্মৃতিরক্ষার্থ বহু অর্থব্যয় করিয়া এই পুকুরিণী খনন করান। পুকুরিণীর জল নির্মূল, স্থান্যকর। এই পুকুরিণীতে কাহারও ঘ্রান করিবার আদেশ ছিল না। পানীয় জলের জন্য ইহা নির্দিষ্ট করিয়া রাখা হইয়াছিল; সম্ভবতঃ সেই কারণে পানীয় বাহিরে, পুকুরিণীর স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছিল। ইন্দিরা দেখিল জননীর যেন অন্ন তজ্জা আসিয়াছে, তিনি চুপ করিয়া আছেন। সে আর বিলম্ব না করিয়া গামছা ও কলসী লইয়া গৃহ হইতে বাহির হইল। ইচ্ছা, মুহূর্তের ভিতরে ফিরিবে, মা কিছু জানিতে পারিবেন না। বাহির হইতেই কেমন একটা শব্দ হইল। পরক্ষণেই মনে হইল, এ কিছু নয়। এমন সময় সে দিকে ত কেউ থাকে না,—আমি যাব আর আসব। ইন্দিরা অত্যন্ত ক্রন্তবৃত্তিতে পুকুরিণীর ঘাটে গিয়া উপস্থিত হইল। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। দূর গ্রামপ্রান্ত হইতে, মাঠ পার হইয়া বসন্তের মুহুমন্দ মলয়ে আরতির শব্দঘণ্টার স্মৃতি শেষ

রেশ মিলাইয়া আসিতেছে । দশমীর চন্দ্র আর একটু মাথার উপর উঠিয়াছে ! তাহার অক্ষয় সুধারধবল শুভ রজতকিরণবস্ত্রায় বনাস্তরাল ও মাঠ ঘাট ভূবিয়া গিয়াছে । কোথাও একটু অন্ধকার নাই । বসন্তরাণী অনন্তযৌবনের অপূর্ণ সৌন্দর্য্যে, উৎকর্ণ হইয়া ব্যাকুলঅন্তরে প্রকৃতির মধ্যে কাহার পদধ্বনি শুনিবার জন্ত যেন শুক হইয়া প্রতীক্ষা করিতেছেন ! ইন্দিরা ধীরে ধীরে, ঘাটের পাষাণ-সোপানশ্রেণী অতিক্রম করিয়া শেষ সোপানে গিয়া মুহূর্ত্তের জন্ত হর্ষ-বিহ্বল অস্তরে দাঁড়াইল । সেদিন, সহসা তাহার যৌবনশ্রী স্বচ্ছ বারিদর্পণে প্রতিবিম্বিত হইয়া অস্তরের মধুচ্ছ্বাসে আবুলু হইল । বার্ণজীবনে, রূপলাবণ্যের জোয়ার নিফল বেদনায় এমনি করিয়া সর্ষ দিক হইতে মাঝে মাঝে তাহাকে অধীর করিত । ইন্দিরা যখনই তাহার নিজের বিষয় চিন্তা করিত, তখনই সে দেখিত, বিধাতা তাহার ক্ষয়চিত্রখানি অপূর্ণ বর্ণবৈচিত্র্যে অঙ্কিত করিবার সম্পূর্ণ আয়োজন করিয়া মধ্যপথে অসমাপ্ত রাখিয়া অন্তর্ধান করিয়াছেন । জলে কলসীর আঘাত লাগিবানাত্র, সহস্র তরঙ্গের মাথায় শশাঙ্কের উজ্জ্বল ভাতি নাচিয়া উঠিল ও তরঙ্গমালা তীরতটে প্রতিহত হইয়া ইন্দিরার চরণপ্রান্তে নুড়িত হইয়া পড়িল । বিশ্বপ্রকৃতির কোন স্থানে আজ দৈন্তের ক্ষীণ ছায়া পর্য্যন্ত নাই । মাঝে মাঝে, কোন অগীত সঙ্গীতে সুর মিলাইয়া বসন্তের কোকিল সজ্জপত্রের অন্তরালে থাকিয়া থাকিয়া, ডাকিয়া উঠিতেছিল । আজ শুদ্ধ প্রকৃতি, যেন রক্ত কথার দ্বার মুক্ত করিয়া দেউলে হইতে বসিয়াছে । ইন্দিরা আবেশ-বিহ্বল নয়নে পুষ্করিণী হইতে সিক্তবসনে পূর্ণকুন্ত কক্ষে লইয়া যখন ঘাটের উপর দাঁড়াইল, তখন একবার চারিদিক চকিতে চাহিয়া দেখিল ; দেখিল কেহ কোথাও নাই । তখন এখানে কাহারও আসিবার সম্ভাবনা নাই জানিয়া, সোপানের উপর কলসী নামাইয়া গাত্র-মার্জনা করিতে লাগিল । তখন নরেশচন্দ্র বেড়াইয়া অল্পমনস্কভাবে মন্তরগতিতে এই পথে, গৃহে ফিরিতেছিল । সহসা কলসী নামানর শব্দে তাহার চিন্তার স্রোত ভাঙ্গিয়া গেল । তখন ইন্দিরার সর্ষাঙ্গ হইতে জলকণাগুলি চক্রকিরণোদ্ভাসিত হইয়া উজ্জলকান্তিবিশিষ্ট সহস্র সহস্র মুক্তার মত সোপানের উপর করিয়া পড়িতেছিল । নরেশচন্দ্র চমকিয়া উঠিল । পল্লীপ্রান্তে এই লোকবিরল নির্জন পুষ্করিণীতে কি এখন কেহ আছে ? সে একটা বৃক্ষ অন্তরালে স্থির হইয়া দাঁড়াইল । দেখিল যেন সমগ্র বাগানে আজ আলোকোৎসব হইয়াছে । তরুপত্রের তিতর দিয়া চন্দ্রের রজতরাশি সহস্র খণ্ডে পুষ্করিণীর কালজলীর উপর যেতপত্রের

মত প্রণীত হইয়াছে। ঘাটের উপর নরেশের দৃষ্টি পতিত হইলে, সে নিবাত-
নিকম্প এদীপের মত স্তব্ধ হইয়া গেল। বনদেবীর মত ও কে? দেখিল বারিস্ক্র
বস্ত্রখানি যৌবনশ্রীর স্তরে স্তরে এমনভাবে বিলুপ্তিত; যেন মনে হইল স্বপ্নবস্ত্রের
উপর মণিসূত্র চলিতেছে, তাহার ভিতর দিয়া দেহের সমস্ত লাবণ্য পরিপূর্ণ
গোয়বে গলিয়া করিয়া পড়িতেছে। তারপর নরেশ কেমন করিয়া ঘাটের নিকট
আসিয়া পৌছিল তাহা সে বুঝিতে পারিলেন না, আজ তাহার নিকট বিশ্বের
সমস্ত আনন্দ ও সৌন্দর্য্য মনে হইল, যেন এই স্তন্যময়ী নারীর মধ্যে আশ্রয়
গ্রহণ করিয়াছে। সে মুগ্ধ হইল। ইন্দিরা দেখিল, কে যেন আসিতেছে, আশঙ্কায়
সে কেমন হইয়া গেল—পাষাণসোলানশ্রেণী যেন তাহার চরণপ্রান্ত হইতে অপসৃত
হইতে লাগিল—ইন্দিরা পাষাণের মত কঠিন হইয়া অপলক দৃষ্টিতে কেবল
চাহিয়া রহিল।

নরেশ নিকটে আসিয়া বিম্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, “কে ইন্দিরা? এত
রাত্রে এখানে কেন?”

ইন্দিরা দেখিল, সেদিন নরেশের দৃষ্টিতে একটা সৌন্দর্য্যমুগ্ধ বিহ্বল-বিহ্বল!
সে দৃষ্টি তাহাকে মুগ্ধ করিল। সে উত্তর করিল “জল ভুলতে ভুলে
গিয়েছিলাম, তাই নিতে এসেছি” “বলিয়া কলসী কক্ষে লইয়া প্রস্থান করিল।

নরেশ পাগলের মত আপনায় শয়নকক্ষে গিয়া প্রবেশ করিল। টেবিলের
উপর একটা বাতিনানে আলো জালিতেছিল, মালী ফুলদানীতে কখন একটা
ফুলের তোড়া রাখিয়া গিয়াছে। সূক্তবাতায়নপথে শয্যার উপর শশধরের সহস্র
কিরণধারা পড়িয়া পুষ্প-শয্যার মত স্তন্যময় দেখাইতেছিল। বড় আয়নাখানির
সম্মুখে পাড়াইবার মাত্র নরেশ আপনাকে দেখিয়া আপনি শিহরিয়া, ত্রস্তে সরিয়া
আসিল। সে কক্ষের কোন দিকে চাহিতে শক্তি হইল। আজ নরেশের
মনে পড়িল, সুভাষিনীর শেষ অহরোধ, বিবাহ করিও। সর্কদিক হইতেই
সুভাষিনীর তিরস্কার-তীব্র, অহুযোগ-পূর্ণনয়ন ছইটী যেন গৃহের মধ্যে মহলা
ভাসিয়া নরেশের দিকে নির্ধমভাবে উজ্জ্বল হইল। সে গৃহের মধ্যে কণকালের
জন্ম স্থির হইয়া বসিতে পারিল না। বারান্দায় আসিয়া পাড়াইল। তখন
পল্লী-প্রান্তের শস্য-শুভ্র মাঠ হইতে, একটা দম্ভক বাতাস আসিয়া তাহার কর্ণে
হা, হা রবে পরিহাস করিয়া, গৃহবাতায়ন দিয়া পুনরায় মাঠের দিকে চলিয়া গেল।
নরেশ বারান্দা হইতে তাড়াতাড়ি ছাদে গিয়া উঠিল। দেওয়ানেও সে এক মুহূর্ত্ত
অপেক্ষা করিতে পারিল না। দেখিল, স্তন-আলোকপ্রাধনে বিধ আজ ভূবিয়া

গেল । তারপর কখন সে ঘুমাইয়া পড়িল, তাহা সে জানিতে পারে নাই । পরদিন কিন্তু গত সন্ধ্যার কথা সে কাহারও নিকট প্রকাশ করিল না । পাছে নরেশচন্দ্র সম্বন্ধে কেহ কিছু মন্তব্য করিবার একটা অবসর পায়, ইহা ভাবিয়া ইন্দিরা কুণ্ঠিত হইল । তাহারই মত যে নরেশের জীবন বার্থও শূন্য এমন একটা করুণ নিবেদন নরেশের তরফ হইতে যে ইন্দিরার মনের নিকট ওফালতী না করিল, তাহাও নয় ।

(৭)

সেদিন সারারাত্রি নরেশের নিদ্রা আলিল না । নানা প্রকার চিন্তায় সে অধীর হইল । সে ভাবিল, ইন্দিরা কি আমার দেখিয়া কোনরূপ কিছু মনে করিয়াছে ? না, তাহা হইতে পারে না । আমি স্বপ্নেও ত ভাবি নাই, যে সন্ধ্যার পর বাগানে কেহ থাকিতে পারে ! বাগানের ভিতর দিয়া বাড়ী ফিরিব, একরূপ কল্পনাই আমার আসে নাই । ইন্দিরা কেন, কোন স্ত্রীলোক যে বাগানে আছে, জানিলে ত আমি সে দিক দিয়া কখনই আসিতাম না । ইন্দিরা তাহা জানে । তারপর ইন্দিরার অবস্থার কথা শ্রবণ করিয়া তাহার অন্তর সেদিন সহাতু-ভূতির করুণায় আকুল হইল । ইন্দিরার রূপযোবন, যেন ইন্দিরার জীবনের উপায় বিধাতার অকরণ অভিসম্পাত বলিদ্রাই নরেশকে বারংবার পীড়া দিতে লাগিল । তাহার মনে হইল, ইন্দিরা, যে দিন সংসারের সকল সৌভাগ্য, সকল আনন্দ চিরদিনের নিমিত্ত বিসর্জন দিল, সেদিন কিন্তু সে বোঝে নাই, সংসারের মধ্যে একটু স্থানও তার প্রয়োজন আছে । তখন এ সত্যটা উপলব্ধি করিবার মত সে বিজ্ঞ হইয়া উঠে নাই । সেদিন অনেক কথা বুঝিবার মত, অনেক নূতন ভাবই তাহার নিকট তখনও আসিয়া পৌঁছায় নাই । ইন্দিরা যে এত সুন্দর, নরেশ তাহা জানিত না । সেদিন, কিন্তু ছায়ালোকের মধ্যে নরেশের মনে হইয়াছিল, ইন্দিরা এ পৃথিবীর লোক নয়, সে স্বর্গের দেবী ? আজ ইন্দিরার ছুঃখ, ইন্দিরার অনাবশ্যক জীবনধারণ, নরেশকে বড় বেদনা দিল । তার বার্থজীবন করণ করিয়া সমবেদনায় ভরিয়া উঠিল ।

সেদিন, সকালে যখন নরেশ বাহিরে যাইতেছিল, দেখিল, রান্নাঘরের দ্বারে উমাশঙ্গীর নিকট ইন্দিরা দাঁড়াইয়া কি বলিতেছে । সেদিকে চাহিতেই, ইন্দিরার সহিত তাহার চোখোচোখী হইল । ইন্দিরা কবাতের দিকে একটু ঘেঁসিয়া গিয়া যেন সলজ্জভাবে প্রকাশ করিয়া চক্ষু নত করিল । এই অল্প অবসরে

নরেশ দেখিয়া লইল ইন্দিরার দৃষ্টিতে অল্প পরিবর্তন ঘটয়াছে । অল্প দিন হইলে, হয়ত নরেশ অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিত, কিন্তু সে দিন, সে আর সেদিকে তাকাইতে পারিল না । ধীরে ধীরে, বাহিরের দিকে চলিয়া গেল । উমাশশী বলিল, “হ্যাঁরে ইন্দু ঐ নরেশ গেল না ?”

“সকাল বেলা যে বেরিয়ে যাচ্ছেন, এখন বয়ে কিছু মনে করত্বেন না ত ?”

“তুই যা না, কি আর মনে করবে ?”

ইন্দিরা তাড়াতাড়ি গিয়া দেখিল, নরেশ প্রায় অন্তরমহল ছাড়াইয়া বাহিরে যান আর কি । তখন সে অগত্যা পশ্চাৎ হইতে কোমল কণ্ঠে ডাকিল “নরেশ-দাদা !”

“কিরে ইন্দু ?” বলিয়া নরেশ পশ্চাৎ ফিরিয়া পাড়াইল । ইন্দিরা অকলের খুঁট হইতে একখণ্ড কাগজ বাহির করিয়া বলিল, “এই কাগজটা দেখুন ত ? কাল ছপুরবেলা, আদালতের পেয়াদা দিয়ে গিয়েছে ।”

নরেশ কাগজের দিকে তাকাইল কিন্তু একটাও অক্ষর স্পষ্ট দেখিতে পাইল না । দেখিল যেন অক্ষরগুলি রণক্ষেত্রে আহত সৈন্তের ভায় পরস্পরের ঘাড়ের উপর পড়িয়াছে । ইন্দিরা যে আর কখনও তার সামনে এমনভাবে আসিবে এটা নরেশ মনে করে নাই । তাই প্রথমটা সে কেমন হইয়া গিয়াছিল । পরক্ষণেই সামলাইয়া লইয়া বলিল “কলেজটারে খাজনা দেওয়া হয় নাই—সেই জন্য । আচ্ছা, আমি নায়েবকে বলব এখন,” বলিয়া নরেশ ইন্দিরার মুখের দিকে চাহিল ।

ইন্দিরা মাথা নীচু করিয়া বলিল “মাকে জিজ্ঞাসা করে যা বলেন বলব । কাগজটা কি আপনার কাছে থাকবে ?”

নরেশ বলিল “তা, না হয়, নিয়ে যাও ; কিন্তু আবার আজই দিয়ে যেয়ো । বেশী সময় নেই ।”

ইন্দিরা ভাবিল, নরেশ-দাদা পরোপকারী ভদ্র, শিষ্ট জমিদার । কিন্তু, বৃদ্ধিমান হইয়াও তিনি কেন তাহার জীবন এমন বাঁকা পথে টানিতে গেলেন ? মানুষের স্বভাব, সে যখন পরের জন্য কাতর হয়, তবে, তখন পরের ক্রটিও যেন তাহার মার্কীয় কার্য বলিয়া মনে হয় । অনেক সময় পরের অক্ষরগুলিও এমনই একটা স্বাভাবিক ছর্সলতা আশ্রয়লাভ করিয়া সহনীয় হইয়া সহানুভূতির চক্ষে মোটেই ধরা পড়ে না । এই ছর্সলতারূহাত ইন্দিরাও আজ এড়াইতে পারিল না ।

“লক্ষ্মীমণি সর্কল শুনিয়া বলিলেন—“তা কাগজখানা দিয়ে এলি না কেন ?

“তুমিত তা বলনি।”

কম্পীমণি আর কিছু বলিল না, বৃন্ডিল, ইন্দিরার ইচ্ছা টাকা কয়টা দিয়া তবে কাগজখানি দিতে হইবে।

(৮)

ইন্দিরা আত্ম কাল বেশী করিয়া খাটে,—অনেক করিয়া টুপি বোনে ; ফলে পরের অল্পগ্রহের হাত হইতে মুক্তিলাভ করাই তার একান্ত বাসনা। ইচ্ছাতে তাহাদের বাহ্যিক অবস্থার উন্নতি না ঘটিলেও অনলক্ক অর্থে, মনে খুব বল পাইয়াছে। নরেশচন্দ্র যে ইহা বোঝে নাই তা নয়। অনেককোন্টাই আর তাহার সাহায্যের প্রয়োজন হয় নাই, বলিয়া তাহারাও তাহাকে অভাবের কথা জানায় না। কিন্তু এই পরিবর্তন নরেশকে একটু বিশেষ করিয়া লাগিল। মধো এমন একটা ব্যাপার না হইলে, বোধ হয়, নরেশচন্দ্র কোন দিন এতটা গৌরবাবস্থিতে পারিত কি না, সন্দেহ ; আর পারিলেও এ বিষয় লইয়া এতটা চিন্তা করিবার কারণ থাকিত না। তখন ইন্দিরা গিয়া প্রয়োজন মত সাহায্য গ্রহণ করিত, এখন নরেশ মাসে মাসে, দিনিকে পাঠাইয়া প্রয়োজন আছে কি না, জানিত। ভরসা করিয়া কোন কথা নিজ হইতে বলিতে, এখন নরেশ কুণ্ঠিত হয়। তখন ইন্দিরার কথা বড় মনে পড়িত না, এমন সদাসর্বদা তাহার বুদ্ধিমত্তা, কর্মপটুতার কথা তাহার মনে আসিত। সেই সঙ্গে সঙ্গে, ইন্দিরার পারিপার্শ্বিক সকল গুণই দীর্ঘে দীর্ঘে, নরেশের মনের মধো এমন ভাবে প্রবেশ করিত, যে অনেক সময় নরেশ দেখিত, সারাদিনের মধো অনেকখানি সময় তার অজ্ঞাতে, ইন্দিরার চিন্তায় কাটিয়াছে।

যে দিন হইতে, ইন্দিরা দেখিল এখন তাহাদের আর অন্তের সাহায্যের প্রয়োজন নাই, সে দিন হইতে, সে তার নরেশদাদার বাড়ী যাওয়ার মাত্রা একটু বেশী বাড়াইয়া দিল এবং এই অতিরিক্ত যাওয়ার মধো সে এতটুকুও সঙ্কুচিত হইত না। নরেশ গমন তখনই, ইন্দিরাকে তাহাদের বাড়ীর মধো দেখিতে পাইত। তাহার চিন্তার গতি ভিন্নরূপ ধারণ করিল। দেখিল ইন্দিরা অসন্তুষ্ট হইয়া যে সাহায্য অবতলা করিয়াছে তাহা নয়, মাহুষের স্বাভাবিক স্বাধীনতারই শরণ লইয়াছে। সাহায্য না লইয়া, সে যেন সাধারণকে তাহাদের সম্বন্ধে অল্প কোন রূপ ভাবিবার কিছুমাত্র অবসর দেয় নাই। নরেশ কোন দিন যে তাহাদের সাহায্য করিত, এমন একটা চিন্তা নানাকারণে পাছে নরেশের মনে উদয় হইয়া তাহাকে

অজ্ঞেয় নিকট হইতে বেশী প্রত্যাশা করিয়া হতাশ ও মর্দাহত হইতে না হয়, সে কারণটা যেন ইন্দিরার নিকট সৰ্ব্বপ্রধান বলিয়া নরেশের মনে চইল।

নরেশ গত বেশী করিয়া ইন্দিরার এই সকল আচরণগুলি বুঝিল, তত অধিক করিয়া দিন দিন তাহার মন ইন্দিরার চিন্তায় ভরিয়া উঠিল। এখন একদিন ইন্দিরাকে না দেখিলে, নরেশের কষ্ট হয়, কিছু ভাল লাগে না, অস্থানন্দ চইয়া বসিয়া থাকে। সমস্ত দিনটাই যেন ফাঁকা ফাঁকা ঠেকে—চোখের দেখা হইলে একটা অথও তৃপ্তি তাহার হৃদয় পূর্ণ করিয়া দেয়। আর না দেখা হইলে যেন একটা অনন্ত অবসাদ তাহার চিত্তকে উদ্ভাস্ত ও আকুল করিয়া তোলে। অনেক সময় নরেশ, ইন্দিরার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে তাহাকে দেখিয়া তাহার কথা শুনিয়া শান্তি পায়। যখন সে অন্তরের গভীরতম প্রদেশে চাহিয়া দেখে, তখন আকুল চইয়া উঠে, বেধে কখন গোপনে ইন্দিরা, সে শূন্য সিংহাসনখানি অধিকার করিয়া বসিয়াছে। একদিন আচায়ে বসিয়া নরেশচন্দ্ৰ জিজ্ঞাসা করিল “দিদি এ পিঠেগুলি চমৎকার হ’য়েছে ; আর আছে নাকি ?”

দিদি তাড়াতাড়ি গতগুলি ছিল সব গুলি তার পাতে ঢাপিয়া দিল তাহার আনন্দের সীমা রহিল না।

আজ চই বৎসর চইল নরেশ আচায়ে বসিয়া কোন ভিনিষ চইবার চায় নাই। উমাশঙ্কর মনে ইচ্ছাতে একটা আশার সন্ধার হইল। জিজ্ঞাসা করিলেন “হ্যা’রে থেতে কি ভাল হয়েচে ?”

“খুব ভাল হয়েচে। তুমি যে এমন পিঠে করতে পার, তা জানতাম না।”

যে পিঠেগুলি সেদিন নরেশের এতদিনের মৌন ভগ্ন করিয়া সমাদর লাভ করিল, সেগুলি, দিদি দেখিলেন, তাহার প্রস্তুত নয়, তখন তিনি নবন মনে ক্ষুব্ধ হইলেও নরেশের ভাললাগার জন্য ইন্দিরার উপর সন্দেহ না চইয়া থাকিতে পারিলেন না।

নরেশ বলিল, “কাল তুমি অল্প কিছু না করে, এই পিঠেই কর।”

দিদি বলিলেন “তাই করব এখন। তবে ইন্দিরাকে একবার পবর দিতে হবে ?”

ইন্দিরার নামে নরেশ চমকিয়া উঠিল ও খাবারের থালা হইতে বিষয়ে চক্ষু তুলিয়া দিদির দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল “তাকে পবর দিতে হবে কেন ?”

“সেই এগুলি গড়েছে। আহা বেচারীর জীবনে কোন সাধি আশ্বাস ত পূর্ণ হয় নি। আমি বৈকালে তোমার জন্ত গখন পাবার করছিলাম, তখন সে এসে

পেখানে বস্লে। বসে, দেখে দিদি, আমি শস্তরবাড়ী অনেক রকম খাবার করতে শিখেছিলাম কিন্তু একটাও, তৈয়েরি করবার অবকাশ পেলাম না। তার পর সে চুপ করে রইল। জানিন্ ত, যেমামাধুয়ের রান্নার চেয়ে গুণ নেই, রান্না খেয়ে, লোকে যদি স্তুখ্যাতি করে, তখন পৃথিবীর সকল স্তুখ চেয়ে, সেই স্তুখ্যাতি স্রীলোকের বড় হয়ে উঠে। আমি ইন্দিরাকে বললাম “আচ্ছা, তুই কি জানিস একটা গড় দেখি। তখন সে যেন হাতে স্বর্গ পেলে। তিনঘণ্টা পরিশ্রম করে এগুলো গড়লে। সন্ধ্যা হ'য়ে বাবার পর পাছা তবে বাড়ী গেল। বাবার সময় অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে বলে, দিদি, জানি না, কেমন হবে, অভ্যাস নেই ত ?” নরেশ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল “তাদের খাবার দিয়েছিলে ?”

দিদি করুণস্বরে মৃদ হাসিয়া উত্তর করিলেন, “বিধবাকে কি এ সব খেতে আছে রে ?”

নরেশ আর কোন কথা বলিল না সে কেমন অশ্রুমনস্ক হইয়া পড়িল।

(৯)

পর দিন ইন্দিরার জননী যখন কছার রান্নার গুণপনা শুনিলেন তখন ইন্দিরার মুখের প্রতি চাহিয়া একটা অতীতপূর্ব্ব গোরলে বিধবার চুঃখভার-পীড়িত অন্তর পূর্ণ হইয়া উঠিল। সেদিন ইন্দিরা আরও অনেক রকম খাবার করিয়া দিয়া যখন বাড়ী ফিরিতেছিল, তখন নরেশের সজ্জিত পথে তার দেখা হইলে, নরেশ তাড়াতাড়ি বলিল “ইন্দ্, কাল তুমি খাদ্য পিঠে করেছিলে, তুমি যে এসব করতে জান, তা জান্তাম না।” ইন্দ্ একটু স্তব্ধ হইয়া মাথা নীচু করিয়া দাড়াইল। অশ্রুর মুখে, এই প্রথম তার জীবনে, নিজের সম্বন্ধে স্তুখ্যাতি শুনিল। আনন্দে তাহার মুখ রক্তাক্ত হইয়া উঠিল। সে কোন উত্তর থুজিয়া না পাইয়া বলিল, “আপনার ভাল লেগেছে ?”

“সেই স্তুখ্যই ত আজ আমার তোমাকে কষ্ট দিতে ডেকে পাঠিয়েছিলাম।”

“এতে আর কষ্ট কি। এ যে আমাদের সৌভাগ্য ?”

নরেশ এত সরল ভাবে কথা কহিতে পারিলে একবার ভাবে নাই। ‘সৌভাগ্য’ কথাটা যেন তাকে বড় বাধা দিল—তাহার মন চঞ্চল যে হইতেছিল—সে তাহা বুঝিল তখন তাড়াতাড়ি বলিল; “ইন্দ্, কাল একবার সকালে এসো, আমি কতকগুলি ভাল বই আনিয়াছি তোমায় দেব।”

ইন্দ্ মাঝে মাঝে, নরেশের নিকট হইতে বই লইয়া যাইত। নিজে পড়িত এবং মাকে পড়িয়া শুনাইত।

পরদিন ইন্দিরা বই লইতে যখন আসিল, তখন নরেশ পড়িতে পড়িতে, একখানি বই মুখের উপর ঢাকা দিয়া অন্ন তন্দ্রাতুর হইয়াছিল। ইন্দিরার পায়ের শব্দে ত্রস্তে সে ভাগিয়া উঠিল। বলিল, “ইন্স এসেচ, খতোমার কি কি বই চাই বল।”

“আমি ত জানি না, আপনার কি কি বই এসেচে?”

নরেশ দশবারখানি বইএর একটি প্যাকেট তার সম্মুখে ধরিয়া দিল। ইন্দিরা মেনের উপর বসিয়া এক এক গানি করিয়া পুলিয়া দেগিতে লাগিল। ছই তিন খানি কবিতার বই ছিল, সেগুলির পাতা উন্টাইয়া রাগিয়া দিল। নরেশের চক্ষু তাহা এড়াইল না। সে জিজ্ঞাসা করিল “ওগুলো দেখলে না যে?”

“কবিতার বই, আমার ভাল লাগে না।”

এই সময় দিদি আসিয়া উপস্থিত হইলেন, বলিলেন “হ্যারে ইন্স তুই যে, সে কি বই পড়ে, শোনাবি বল্লি, তাত আর শোনালি না।”

নরেশ জিজ্ঞাসা করিল “কি বই দিদি?”

“ও ছাই, আমি কি জ্ঞাত নাম জানি! ও ইন্সই জানে।” নরেশ ইন্দিরার দিকে তাকাইলে, ইন্দিরা বলিল, “রবিবাবুর নোকাডুবি বইখানি আপনার ঘরে দেখতে পাইনি, সেজন্ত পড়া হয় নাই।”

“নরেশবাবু পড়তে নিয়ে গেছে, এনে দেবো এখন।”

ইন্দিরা ছই তিন খানি বই বাছিয়া লইল বলিল, “হ্যা, দিদি, ঘরটা এমন অপরিষ্কার হ’য়ে রয়েছে কেন? দেখলে গা নিস্পিস্ করে। ঐ দেখ না, ছবিগুলোর উপর একরাস ঝল জমেছে, অনেকদিন যেন নাছুরের হাত এ ঘরে পড়ে নাই।”

উমাশর্মা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, “তা ত পড়ে নাই বাছা। একলা সব দিক পেরে উঠিনা। ঝি মাগির কি দরদ আছে, যে দেখে শুনে, এ সব করবে। যে দিক দেখব না, সে দিকটা একবার ‘দ’পড়ে যাবে। ইন্স, তুই যদি আজ মনে করিচিস্ বাছা, তবে তুই কেন আজ দিদির হয়ে একটু পরিভ্রম কর না।”

নরেশ বলিল “এ মন্দ নয়, ও বেচারী, বই নিতে এসে বড় মুড়িলে পড়ল দেখুচি। ঘর নাই বা পরিষ্কার হলো, কেইবা দেখতে আসচে।”

ইন্দিরা আপত্তি করিয়া বলিল, “কেউ দেখতে আসবার সঙ্গে ঘর পরিষ্কার করার নিত্য সম্বন্ধ যে খুব আছে, তা ত আমার মনে হয় না, তবে যেখানে থাকতে হবে, সে খানটা পরিষ্কার করে, থাকাই হচ্ছে সংসারে ধর্ম।”

দিদির তরফে ওকালতী করিতে গিয়া, ইন্দু অনেকগুলি কথা বলিয়া ফেলিল। নরেশ শুনিয়া মনে মনে, বেশ একটু আনন্দলাভ করিল। বলিল, “আপন ইচ্ছায় যদি কেউ পরেরবোঝা দাড়ে করতে প্রস্তুত হয়—তবে অথ্রে আপত্তি করলে, সে আপত্তি টেকবে কেন।”

ইন্দিরা দ্বিদির দিকে চাহিয়া বলিল, “অজ্ঞায় আপত্তি, কোন দিন কোনখানে
• তার নিজের জেদ্ বজায় করতে পারে, বলে ত মনে হয় না।”

সেদিন ইন্দিরা নরেশের শয়নকক্ষখানি ঝাড়িয়া পুড়িয়া পরিষ্কার করিয়া দিয়া গেল। ছবিগুলিকে হানাস্তরিত করার নরেশের মনে হইল, যেন হুই এক খানি নূতন ছবি টাঙ্গান হইয়াছে।

(১০)

এমন করিয়া ইন্দিরা নরেশের সংসারে আপনার অনেকখানি করিয়া সমস্ত দিতে লাগিল। দিদিও যেন অনেকটা অবসর পাইল।

একদিন নরেশচন্দ্র বলিল, “দেখ ইন্দু, তোদের বাড়ীট! পড়ে যাবার মত হ’য়েছে, এই সময় সারাতে না পারলে, পড়ে যাবে; তখন মেরামত করতে অনেক টাকা পড়বে।”

ইন্দিরা বলিল, “ঐ রকম করে যে, কয়দিন যায়—কার জুই বা মেরামত করা?”

নরেশ বলিল “ইন্দু তুমি তোমার নিজের যুক্তি ঠিক রাখতে পার না, সেদিন তুমিই আমার ঘর পরিষ্কার যে কারণে প্রয়োজন মনে করেছিলে—আজ ঠিক সেই কারণেই বাড়ী মেরামত করা আমি উচিত মনে করছি।”

ইন্দিরা কোন উত্তর দিল না। নরেশ বাক্স খুলিয়া দশখানি দশটাকার নোট বাহির করিয়া ইন্দিরার হাতে দিতে যাইলে, ইন্দিরা সবিস্ময়ে বলিল “টাকা কিসের নরেশদাদা! মেরামত করার টাকা আমাদের জোটে, তখন করবো, না জোটে পড়ে যাবে, সেও ভাল! আমাদের এই অবস্থায় অত টাকা খরচ করে বাড়ী মেরামত করলে লোকে কি মনে করবে?” বলিয়া ইন্দিরা তাড়াতাড়ি নরেশের গৃহ হইতে চলিয়া গেল। নরেশ অনেকক্ষণ পর্যন্ত নিতান্ত অসহায়ের মত শয্যার উপর শুক হইয়া শুইয়া পড়িয়া রহিল। শেষে মনে হইল, কাজটা কি বড়ই অজ্ঞায় হইয়াছে! লোকে কি মনে করবে? লোকে কিছু মনে করতে পারে, এই চর্ভাবনয় তবে কি বাড়ী চাপা পড়ে মরতে হবে? তখন কি সমাজ বা লোক ভোনার দেখতে আসবে?” এবার নরেশের মনে পড়িল, কেন ইন্দিরা এত পরিশ্রম করিয়া টুপি নোকা বোনে? কেন সে নরেশের সাহায্য গ্ৰহণে নারাজ? টাকা দিতে

গিয়া তবে কি সে ইন্দিরার অন্তরে আঘাত করিয়াছে? অবশ্য করিয়াছে, না হইলে, ইন্দিরা তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল কেন? নরেশের ননে হইল, ইন্দিরা যেন টাকা দেওয়ার ভিতর হইতে একটা এমন কিছু অল্পমান করেছে, যাতে করে, তার এখানে বসে থাকা, সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক মনে হয়েছে।

তারপর চার পাঁচ দিন ইন্দিরা অস্থির করিয়াছে বলিয়া নরেশের স্বাভাবিক আসিয়া দিদি একদিন নিজের ডাকিতে গিয়া বলিলেন, “ইন্দি, কেমন আছিস্নে?” সে বলিল, “ভাল আছি দিদি।”

উমাশর্মা বলিলেন, “নরেশের কদিন কেমন অরুচি মত করেছে, কিছু খেতে পারে না, যা রান্ধি তাই পড়ে থাকে—আনরা হুহু সেকলে নাহুহু, নতুন রান্ধা বাঘা তত কি ছাই বেশী জানা আছে—তাই মনে করলুম—একবার বাই ইন্দিকে বলে আসিগে?”

লক্ষ্মীমণি সেখানে বসিয়া কথায় বোনা কার্খো সাহায্য করিতেছিলেন, বলিলেন “এর জন্ত আসবার কি দরকার ছিল, মেয়ে নাহুহুের রান্ধার চেয়ে বড় কাজ আর কিছু আছে বলে ত মনে হয় না। আত্মীয়স্বজনকে রেখে থাকতে পারলে ত নারীজন্ম সার্থক। তা ইন্দি যাবে এখন?”

“একটু পরে আসিস্ন বোন” বলে, দিদি চলিয়া গেলেন।

(১১)

ইন্দিরা যখন শুনিল, নরেশচন্দ্র কয়দিন মোটেই খাইতে পারে নাই, তখন তার মনে অত্যন্ত কষ্ট হইল। সেদিন অমন করিয়া চলিয়া আসিয়া, সে যেন নরেশচন্দ্রের অস্বাভাবিক বিচার করিয়াছে। তিনি ত পূর্বে অনেক সাহায্য করিয়াছেন। তখনও নির্জীবনে তাহা গ্রহণ করা হইয়াছে। সে কারণ, তার সাহায্য করিতে আসা যে খুব অসম্ভব হইয়াছিল, তাহাও ত বলা যায় না। তার দিক হইতে যথেষ্ট দোষের কারণ ছিল না, সুতরাং ভাল করিয়া বলিলেই চলিত। অতএব তাঁহার অন্তরে অমন করিয়া নির্দয়ভাবে আঘাত দিবার ত কোন প্রয়োজন ছিল না। সেই নিমিত্ত বোধ হয়, তিনি অত্যন্ত বাধিত হইয়াছেন। এই ভাবিয়া ইন্দিরা নিজের কাছেই, নিজেকে বড় অপরাধী মনে করিল।

সে দিন ইন্দিরা রান্ধিয়া গিয়া নিজেই পরিবেশন করিল। দিদি সেখানে বসিয়া থাকাইতেছিলেন। নরেশ যখন সেই তিনটি তরকারি পুনঃ পুনঃ চাটিয়া লইলেন, তখন ইন্দিরার আনন্দ রাগিবার স্থান রহিল না।

ইন্দিরা এমন করিয়া নরেশের শুল্কজীবনের মধ্যে দীর্ঘে ধীরে যেন একটা সফলতার নব অঘোষনের স্বচনা করিয়া দিতে লাগিল। তাঁর অস্ত্রের অনেকখানি শুল্কতা যেন ইন্দিরার সাহচর্য্য ভরিয়া উঠিতেছিল। কণ্ঠহীন জীবনের মধ্যে ইন্দিরা অকস্মাৎ কন্ঠ করার নেপাথ্য বেশ আন্দাজ করিতে লাগিল। এখন নরেশের সংসারের অনেক কাজই ইন্দিরার কন্ঠনিপুণ সেবা-হস্তের সচিহ্ন পরিচিত।

এমন সময়ে, একদিন দিদি অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়িলেন; লক্ষ্মীমণি যে দিন দেখিতে আসিলেন, সে দিন তিনি শয্যা হইতে উঠিয়া বসিতে পারিলেন না। লক্ষ্মীমণি দেখিয়া গিয়া ইন্দিরাকে পাঠাইয়া দিলেন। ইন্দিরা সে দিন গিয়া সম্পূর্ণভাবে নরেশের সংসারের ভার গ্রহণ করিল। এই সময় ইন্দিরাকে নরেশের সকল কাজ করিতে হইত। নরেশ দেখিল তাহার শয্যা তথ্য-ফেন-নিত গুত্র, তাহার বইগুলি স্ফন্দরভাবে টেবিলের উপর গোছান। তাহার পড়িবার বইখান পর্য্যন্ত বাসিনের পার্শ্বে রাখা হইয়াছে। ঘরের ছবিগুলি ও আলমারির ঝক ঝক করিতেছে। একখানি সমবেদনা পূর্ণ করুণ-ছন্দ, যেন সকল দ্রবোর উপর তাহার অহুরাগ-প্রতিকৃতি অঙ্কিত করিয়া রাখিয়া দিয়াছে। প্রত্যেক জিনিসটির মধ্যেই যেন, সেই মধুর অন্তরখানি নরেশের নিরাশ জীবনে স্নমধুর আশা ও আশ্বাসে উদ্বেলিত করিতেছিল।

ইন্দিরা ও লক্ষ্মীমণি দিদির যথেষ্ট সেবা গুহ্রণা করিল। নরেশ বহু অর্পণায় করিয়া ডাক্তার দেখাইল, কিন্তু, এক নামের জরেই তিনি ইহ সংসারের সকল জ্ঞান বহুবার চতু হইতে মুক্তিলাভ করিলেন। সুতরাং এমন অবস্থায় ইন্দিরা অনন্যোপায় হইয়া নরেশের সংসারের সকল ভার গ্রহণ করিতে বাধ্য হইল। ইহাতে গ্রামস্থ সকলেই লক্ষ্মীমণির বহু স্তুতি কবিল।

কর্ণের মধ্যেই স্বপ্ন—সেই কৰ্ম যখন বেশী করিয়া ইন্দিরাকে সর্কদিক হইতে পাইয়া বসিল, তখন সে, আপনার মধ্যে আপনি বিপুল আনন্দ অহুভব করিতে লাগিল। তার লগ্নের শুল্কতা সেই আনন্দে ভরিয়া উঠিল। এ বিশ্বের মধ্যে, সে যে কখনও কারো কাজে লাগিতে পারে, তাহা সে, এত দিন জানিত না, সুতরাং তাহার যে জীবনধারণের একটা প্রয়োজন ছিল, জানিয়া সে সমাজের নিকট আপনাকে চিরকৃতজ্ঞ মনে করিতে স্বিধা করিল না। এমন করিয়া যখন জমিদারগৃহের অন্তঃপুর ইন্দিরার

প্রাণপাত পরিশ্রমে উজ্জল হইয়া উঠিতেছিল, তখন একদিন নরেশচন্দ্র অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়িল। লক্ষ্মীমণি কাছে কাজেই নিজে সংসারের ভার লইল। ইন্দিরা তার নরেশ-দাদার সেবায় য্নোন্যবেশ করিল।

নরেশ যখন রোগের যন্ত্রণায় অধীর হইয়া উঠিত, ইন্দিরা তখন তাহার শয্যায় গিয়া বসিত, গায়ে হাত বুলাইয়া দিত। বেদনা-করাণ্ড কণ্ঠে অত্যন্ত আপনার জনের মত, সে বাকুল অন্তরে জিজ্ঞাসা করিত “কি অল্প করতে ? • ডাক্তার আন্তে পাঠাব কি

নরেশ কিছু ইন্দিরার কথা শুনিলে, সে যে তার কাছে বসিয়া আছে, এবং সেবা করিতেছে জানিলে *আপনাকে অনেকটা সুস্থ ও সুখী বিবেচনা করিত। শীর্ণ শ্রান অধরপ্রায়ে একটা আনন্দের ভ্রোতীঃ সমুজ্জল হইয়া উঠিত। একদৃষ্টে ধ্যানমগ্ন ব্যক্তির মত সে, সেবাশ্রুত ইন্দিরার প্রতি চাহিয়া অসহ যন্ত্রণার সময় বড় আগ্রহে তার কল্যাণভরা হাত দুইখানি আপনার ঘনস্পন্দিত উত্তপ্ত বক্ষের উপর প্রাণপণে চাপিয়া ধরিয়া শান্তি অন্বেষ করিত। তখন সংসারের কোন অভাবই এক বৃহত্তর নিমিত্ত তাহাকে কোন দিক হইতে, তাহার নিঃসঙ্গ জীবনের কথা মনে করিবার অবসর দিত না। ইন্দিরার অক্লান্ত পরিশ্রম ও যত্ন নরেশকে অচিরে আরোগ্যের পথে আনিল। নরেশ যেমন ধীরে ধীরে আরোগ্য লাভ করিতে আরম্ভ করিল, ইন্দিরাও তেমন অল্পে অল্পে, একটু একটু করিয়া নরেশের সেবা করা হইতে আপনাকে সরাইয়া লইতে লাগিল।

(১২)

সেদিন, নরেশ অনেকটা সুস্থ আছে ; চাই দিন চাইল পণ্য করিয়াছে। সমস্ত দিনের ভিতর কেবল একবার মাত্র খাবার দিবার সময়, নরেশ ইন্দিরার সাক্ষাৎ পাইয়াছিল। তারপর আর সে আসে নাই। কেন আসে নাই, তাহা নরেশ অনেকক্ষণ অবধি ভাবিল, শেষে ঝিকে ডাকিয়া বলিল, “ইন্দিরাকে এক-বার এখানে ডাকিয়া দাও।

ইন্দিরা যখন শুনিল, নরেশ তাহাকে ডাকিয়াছেন, তখন অকস্মাৎ কি ভাবিয়া তার ললাটের শিরাগুলি অল্প ফলিত হইল,—কই তিনি এমন ভাবে ত কখন ডাকেন না ?

ইন্দিরা আসিবামাত্র নরেশ একটু অভিযোগ করণ-কণ্ঠে বলিল “তুমি আজ সারাদিনের মধ্যে এ পণ্য মাড়াও নাই কেন ? চ'য়েচে কি ?”

“আপনি ভাল আছেন কি না, সে জ্ঞাত আমি। প্রয়োজন মনে করি নাট।”

“তা’ হলে দেখছি আমার ভাল না থাকই ভাল।”

ইন্দিরা ক্রমশঃ ঠাণ্ডা কুণ্ডিত করিয়া নরেশের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে কেবল চাহিল। কোন উত্তর দিল না। ইন্দিরা নিঃশব্দে অস্তর দিয়া যেন অনেক পানি দূর ভবিষ্যত দেখিতে পাইল।

নরেশ সে দিকে না তাকাইয়া বলিল, আমার মাথায় একটু ছাত ব্লাইয়া দাও।”

ইন্দিরা পূর্বের মত শয্যার উপর উপবেশন না করিয়া একপাশি চৌকি টানিয়া তাহাতে বসিল। এবং নরেশের মাথায় ছাত ব্লাইয়া দিতে লাগিল। একটা অপূর্ণ সংঘম যেন সেদিন ইন্দিরার উদ্ভিন্ন যৌবনজীবে নতিমাদিত করিয়া তুলিতেছিল।

নরেশ বলিল, “ইন্দু, একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি?”

ইন্দিরা, এক মুহূর্ত্ত কি ভাবিয়া সচন্য উত্তর করিল “না।”

নরেশ বলিল, “কেন?”

ইন্দিরা বলিল, “আর একটা কথা আপনি বিস্মৃত হবেন না, জানবেন, ইন্দিরা সকল কষ্টে অগ্নানবদনে সহ্য করতে প্রস্তুত, কিন্তু সে, কোন দিন, কোন রকমে তার নরেশদাদার জনয়ের এতটুকু দুর্বলতা কিছুতেই সহ্য করতে পারবেনা। ক্রম নরেশ তাড়াতাড়ি শয্যায় উঠিয়া বসিতেই দেখিল ইন্দিরা তখন অশ্রুভারাবনত নয়নে গৃহ হইতে দীর পথবিকেপে নিজস্ব হইয়া যাইতেছে, নরেশ ব্যাকুল কণ্ঠে পুনরায় ডাকিল “ইন্দু একটা কথা শুনে যাও।”

ইন্দিরা অত্যন্ত রেহবিহ্বল আত্মকণ্ঠে উত্তর করিল “জানি আমি, আপনি কি বলতে চান; কিন্তু আপনার কথা না শুনেই চেয়ে, যে আপনার অন্তরে কতখানি বেদনা দিচ্ছি, মনে করবেন না, যে ততখানি বেদনা বোধবার মত জনয় ইন্দিরার নাই। আজ আপনাকে এই ‘না’, বলতে আমার অন্তরের অন্তর যে কি নির্মমভাবে নিপীড়িত, তা কি আপনি অহুত্ব করতে পারছেন না? ইচ্ছার বিরুদ্ধে অনিচ্ছা প্রকাশ করা, কতখানি অত্যাচার! কতখানি মিথ্যা দিয়া যে সেই অনাবিল সহজ, সুন্দর সত্যকে চাকতে হয় এবং তার যে কি সর্ষস্পর্শী অর্ন্তশোচনা, নারী-জনয়ের পক্ষে কতখানি কঠিন! সে কথা কি নরেশদাদা তুমি—তুমি বুঝতে পার না? আজ হাঁ বলতে পারলে, আমার অপেক্ষা এ বিষয়ে যে কেউ অধিক সুগঠিত হ’তে পারে, সে

কথা ইন্দিরা কোন দিন বিধায় করতে প্রস্তুত নয় । “বার্ণতা ইন্দিরা নিমেষ মধ্যে গুচ হইতে নিশ্চয় হইয়া গেল !

(১৩)

নরেশ অনেককাল পর্যাণ্ড দ্বারের দিকে তাকাইয়া অবশেষে পুনরায় নিঃসভায় ভাবে শয়ান হইয়া পড়িল । বহুকাল অবধি সে মুদ্রিতনয়নে, পড়িয়া কত কি ভাবিল । ভাচার তরল দেহমন অকস্মৎ অধিক বেদনার অত্যন্ত কাতর হইয়াছিল, স্বহস্তে সে আর ঐক্য পাটবার কোনরূপ উত্তোষ পর্যাণ্ড করিল না । মধ্যে একবার নি আসিয়া ভ্রমের বাটী রাখিয়া গেল । নরেশ তাহা দেখিল । কিছু স্পর্শ করিল না । পরদিন ইন্দিরা, নরেশের ঘরে আসিল না, বাতির চটতেই বন্দোবস্ত করিতে লাগিল ; নরেশ রোগশয্যায় পড়িয়া পড়িয়া ইন্দিরার কণ্ঠের ভ্রমিতে পাটতেছিল, কিছু একবার তাহাকে দেখিতে পাইল না । এই সকল কারণে, অভিমান আরও বেশী করিয়া তাহাকে বিচলিত করিল । ঐক্যের শিশি টেবিলের উপর পড়িয়া রছিল, একটা দাগও কমিল না । নরেশ আর সারিয়া উঠিতে পারিল না । সারিবার ক্ষুদ্র তার এতটুকু আগ্রহ বা উৎসাহ নোটেই পরিলক্ষিত হইল না । দারুণ চিন্তাভারে তিনি দিন দিন অবসর হইয়া পড়িলেন । চতুর্থ দিন প্রবলবেগে পুনরায় অর দেখা দিল । সে কিছুমাত্র তাহাতে ক্রক্ষেপ করিল না ; এবং মনে মনে, সেদিন যেন কি কারণে অত্যধিক আনন্ডিত হইল । অনাবশ্যক জীবন অকারণ বহন করিয়া তাহার অন্তরে গভীর বেদনার সঙ্গার চটতেছে, ভাবিয়া, মুড়াপথের পথিক হইতে, সমস্ত অন্তর দিয়া সর্ব দিক হইতে একটা অনির্জনীয় পুলক স্পর্শ অসুভব করিল । রক্তশূন্য পাণ্ডুর মলিন মুখের উপর, অন্তর-অশ্রুত আনন্ডের একটা অপূর্ণজ্যোতিঃ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল ।

লক্ষ্মীমণি যখন জামিলেন যে নরেশের পুনরায় অর চইয়াছে, তখন তিনি শঙ্কিত হইয়া ডাক্তার ডাকিতে এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব করিলেন না । ডাক্তার অনেককাল পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, “রোগীর বিশেষভাবে যত্ন না হইলে, ভয়ের খুব সম্ভাবনা । অর বঁাকা পথে ধরিয়াছে ।”

সে দিন, অর নরেশ একরূপ অখোর অচৈতন্য অবস্থায় পড়িয়া রছিল । অদম্য পিপাসায় বক্ষবিশীর্ণ হইলেও একবিন্দু জল নরেশ কাহারও নিকট চাহিল না । মরিতে চইলে মাতৃস্নেহ যেমন করিয়া আত্মসমর্পণ করে, তেমন

করিয়াই সে যেন মৃত্যুকে আহ্বান করিতে উদ্যত হইয়াছে । এ সকল, ইন্দিরা তার প্রাণ দিয়া অস্বস্তি করিয়া গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল ।

ইন্দিরা নরেশের রোগশয্যায় উপবেশন করিয়া বড়ি ধরিয়া ঔষধ ও পণ্য পাওইবার তার আপনি গ্রহণ করিল । চঠাং নরেশের পুনরায় পীড়িত হইবার কারণ কি তাহা বৃত্তিতে ইন্দিরার একমুহূর্ত্ত বিলম্ব হইল না । একথা যতবার তার মনে হইতেছিল, ততবার তার ক্রুদ্ধ-জদয় পঙ্কর ভেদ করিয়া সর্ষাচত অহুশোচনার অশ্রুধারা ছুট চক্ষু বহিয়া ধরিয়া পড়িতেছিল ।

দিনের পর দিন, অস্থির কেবল বাড়িয়া উঠিতেছিল । ভ্রান্ত্যর একবারের দলে তিনবার, চারবার প্রয়োজনমত আসিতে আরম্ভ করিলেন । গত দিন গাইতেছিল, ক্রমেই একটা নিরাকরণ নৈরাশ্রের ভাব যেন সনধ্য ভ্রমিদারগৃহের মধ্যে ঘনাইয়া উঠিতেছিল । ইন্দিরা আহাঃ নিদ্রা ত্যাগ করিয়া নিবারান্তি অক্লান্তভাবে নরেশের সেবায় আপনাকে সম্পূর্ণভাবে নিযুক্ত করিল । কিম্ব, এত বয়সের মধ্যেও নরেশের প্রকৃত সুখখানি ইন্দিরার প্রণয় কাতর জদয় নথিত করিয়া একটা সন্ধ্যায় অথবাগ তার প্রতি তরুণীতে আঘাত দিয়া ফিরিতে ছিল । ইন্দিরার সেদিনকার, আচরণ তার নিজের কাছেই আজ সম্পূর্ণ অজ্ঞান ও অববেচনার কাজ বলিয়া বারংবার মনে হইতে লাগিল । ইন্দিরার নিত্য চুঃখভার-পীড়িত জীবন, সত্যের অসম্মাননা করার নিমিত্ত, আপনার বিরুদ্ধে গভীর অভিযোগে নিজেকে পীড়িত করিয়া যেন কতকটা শাস্তি ও তৃপ্তি অস্বস্তি করিল । সে অনিচ্ছায় ভাবিল, “যদি মারা যান, তবে ?” ইন্দিরার নরনপন্নব সিন্ধু করিয়া গওস্থলে অশ্রু গড়াইয়া পড়িল । সে মনে মনে নানাদেবতার পূজা নানসিক করিল । ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিয়া গল-লয়ীকৃতবাসে, অশ্রুপূর্ণ আর্দ্রকণ্ঠে বলিল, “ঠাকুর এবার পাঁচাও, আমাকে, নিদ্রা তার প্রাণে দক্ষা কর ।”

এমন করিয়া ইন্দিরা যখন তার অস্তরকে, অববেচনার জন্য সহস্রবার অপ-রাধী করিতে এতটুকুও কুণ্ঠিত হইল না, তখন নরেশ অত্যন্ত প্রসন্নতার সহিত বাধির সকলী গল্পগা অবহেলা করিয়া আনন্দমুগ্ধ । এক মুহূর্ত্তের জন্য সেযুগের কথা প্রকাশ করা দূরে থাক ; এমন ভাবও প্রকাশ করিল না, যাহাতে কেহ অস্ব-স্তি করিতে পারে—সে সে পীড়িত । একবার হুঁলিয়া ও গায়ে গাত ব্লাইয়া দিবার নিমিত্ত অস্বস্তি করিল না । এত প্রসন্নতা, এত আনন্দ, আজ সে চঠাং কোথা হইতে আনিল ? সকল প্রিয়-সখকের সকল অজ্ঞেয়া বন্ধনের দ্বাতিরে পাড়াইয়া

নির্দিষ্ট উপাসনীয় ব্যক্তির মত যখন প্রতিদিন টিকে মহানন্দে সে তার মৃত্যু দিনের নিকটে অগ্রসর করিয়া আনিতেছিল, ইন্দ্রিয়ার তখন তার সমস্ত হৃদয়, সমস্ত জীবন, সকল আশা আশ্বাস দিয়া যেন তার পদরোধ করিয়া করণকণ্ঠে বলিতেছিল, “ওগো এবার তুমি সার, তারপর তুমি না আদেশ করবে, তাই আনি পাগন করব ।”

নিহৃত অস্ত্রের এই নিতান্ত অসহায় কাঙ্গাল অহরোধ মৃত্যুপথের পথিকের মনে, মধুর সঙ্গীত জাগাইয়া তুলিতেছিল, তাহা উৎসবময়ী বাসর-রজনীর মহাবতের বংশীরব অপেক্ষাও মধুর । ইন্দ্রিয়ার অগ্নি যখন অশ্রুজল হইয়া আসিত, অবাক বেদনাময় অকরণ ভবিষ্যত যখন সুকীর্ষিক হইতে অনন্ত অন্ধকারের ছবি ঘনাইয়া তুলিত তখন ইন্দ্রিয়া হিরণ্যটিতে নরেশের মুখের প্রতি তাকাইয়া কি দেখিত, তাহা সেই জানে ? দেখিতে দেখিতে, নিস্তকতা ভঙ্গ করিয়া হঠাৎ উবেগ-আকুল কণ্ঠে ডাকিয়া উঠিত, “নরেশ-দাদা !” তারপর তার অল্পস্পর্শ করিয়া দেখিত, গা গরম আছে কি না ?

নরেশ, তার আনন্দদীপ্তনয়নদুটি ইন্দ্রিয়ার শঙ্কাকুল, জন্তু নয়নের উপর সংস্থাপন করিয়া সাধনার কি মধুর বাস্তা ইন্দ্রিয়ার নিহৃত হৃদয়ে বহন করিয়া দিত কিম্বা, ইন্দ্রিয়ার আকুল মন কোন সাধনাই মানিত না ।

প্রাণপণ শক্তিতে ইন্দ্রিয়া নরেশের সেবা করিল । ইন্দ্রিয়ার অশ্রুভারাক্রান্ত করুণাপ্রার্থী অকলঙ্ক নয়ন, যখন নরেশের অহুজ্জ্বল লক্ষণু দৃষ্টির সহিত মিলিত হইত তখন ইন্দ্রিয়া যেন নীরব আবেদন জানাইয়া কেবলই বলিত “ওগো, তুমি সব জান, এক মুহূর্তের ভুলের জন্য, একপ নিশ্বাসভাবে আমার বিচার করিও না ।”

নরেশ যে ইহা অশুভব করিত না, এমন নয়, তাহার অস্ত্রের মধ্যে যে প্রবল ঝড় বহিতেছিল, যদিও বাহিরে তাহার কোন লক্ষণ প্রকাশ ছিল না, তথাপি তাহার মৌনচিত্ত অস্ত্রের শূন্য মন্দিরধারে ব্যাকুল কণ্ঠে কাদিয়া কাদিয়া লুপ্তিত হইতেছিল । নরেশ অনেকবার ইন্দ্রিয়ার মুখের দিকে চাহিল, কিম্বা একটা ক্ষুদ্র সাধনার কথাও তাহাকে বলিল না । এই নিশ্বাস নীরবতাই ইন্দ্রিয়ার ঋণীহৃদয় বিজ্বল বেদনায় ব্যাকুল করিয়া তুলিতেছিল । ইন্দ্রিয়া অন্যতরে দেবতার পাদ-পীঠতলে হত্যা দিয়া পাড়িয়া কাঙ্গাল প্রার্থনা জানাইয়া, কিম্বা, সেদিন বুঝি বা মানব হৃদয়ের আশ্রিত আবেদন সে সিংহাসন সমীপে পৌছিল না ।

অনাদৃত প্রণয়ের নীরব বেদনা সহ করিয়া প্রয়োজনহীন প্রাণ কতদিন এ সেহে থাকিতে পারে ? দেহমনের সকল আশ্রিত গুচাইবার জন্য কোন লোক

গোষ্ঠান্তর হইতে, কোন করণাময়ের করণ আত্মান আজ নরেশের কাণে পহুঁছিয়াছে ; তাই তাহার ভক্তুর দেহপিঞ্জরের দ্বার গুলিয়া তাহার প্রাণবিহঙ্গ কোন বেদনাবিহীন নিরাময় উগ্ৰু আকাশতলে উড়িয়া যাইবার জন্য আজ প্রাণপণে ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে, তাই এ পৃথিবীর দারুণপ্রভরনয় দেবতার অকরণ পদতলে ইন্দিরার বাকুল নম্রবেদনা ও আকুল নিবেদন কোন ফলই প্রসব করিল না । দিনদেবতার অন্তগমনের সঙ্গে সঙ্গে, নরেশের জীবনপ্রদীপ তিমিত হইয়া আসিতে লাগিল, গৃহে যখন সন্ধ্যাদীপ জালিবার সময়, তখন ইন্দিরার অন্তরবাহির বিষম অন্ধকারে নিমজ্জিত করিয়া তাহার ইচ্ছাকেন্দ্র একমাত্র আলোকবর্তিকা চিরদিনের জন্য নিবিয়া গেল । ইন্দিরার নৃষিতে কিছুই বাকি রহিল না, বাক্যহীন পাষণপ্রতিমার মত নরেশের শয্যাঘর বসিয়া শবদেহের পা ছপানি প্রাণপণে নৃকে চাপিয়া ইন্দিরা একবার আঁঠুকণ্ঠে ডাকিল—“নরেশ—দাদা, নরেশ, প্রাণেশ”,—তারপর সব নীরব হইয়া গেল । হায়, ইন্দিরা—একদিন আগে যদি এমনি করিয়া একবারও ডাকিতে ?

ঐতর্য্যিকপ্রচল চট্টোপাধ্যায় ।

নূরজাহান ।

পূর্বপ্রকাশিতের পর ।

শারিয়ার কম্পপটু নহে, সক্ষম বীরপুরুষ বলিয়া কোন দিনই তার খ্যাতি ছিল না, পিতা জাহাঙ্গীরের কাশ্যচুগত হইয়া চিরজীবন ব্যপন করিয়াছে, সেই জন্য এবং কনিষ্ঠপুত্র বলিয়া পিতার স্নেহ তার প্রতি সর্বাদিক ছিল ; সাজাহান পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করায় পিতৃস্নেহে বঞ্চিত হইয়াছিল, এই সব কারণে জাহাঙ্গীর মৃত্যুকালে শারিয়ারকে সিংহাসন দিবার কল্পনা করেন ; জীবনে কুলায় নাই, তাই তাঁর মৃত্যুর পরে নূরজাহান স্বামীর নিদেশ পালনে যত্ববতী হইয়াছিলেন । কেচ কেচ বলেন—শারিয়ার নূরজাহানের জামাতা, তিনি রাজ্য পাইলে নূরজাহানের আধিপত্য অক্ষুণ্ণ থাকিবে এই উদ্দেশ্যে নূরজাহান শারিয়ারের সিংহাসনপ্রাপ্তির সহায়তা করিতে উদ্বৃত্ত হইয়াছিলেন । একবার স্বপক্ষে বিপক্ষে আমরা কিছুই বলিতে পারি না, তবে শারিয়ারকে সিংহাসন দিবার ইচ্ছা জাহাঙ্গীরের ছিল এবং মৃত্যুকালে সে ইচ্ছা তিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন, ঐতিহাসিক সত্য ; অতরাং নূরজাহানের পক্ষে

गान्धी—



শারিয়ারকে সাহায্য করিবার অল্প যে কোন কারণেই থাকুক না ; পতিনির্দেশ যে তাঁহার একতম কারণ—ইহা ইতিহাসবিৎ কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

নূরজাহান জানিতেন—সাজাহান দীর্ঘপুত্র, বস্তুতঃ স্বয়ং লিপ্ত থাকিয়া, বাদশাহী সৈন্য চালনা করিয়া, রণপাণ্ডিত্য তাঁহার জন্মিয়াছিল? বস্তুপ্রদেশে রাজপ্রতিনিধিরূপে প্রবাদারের কার্য করিয়া রাজকার্যে তিনি সুনিপুণ হইয়াছিলেন ; উদয়পুর প্রভৃতি চিল্ রাজপুত রাজগণের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব স্থাপন হইয়াছিল, মন্ত্রী আসফ খাঁ তাঁহার খন্ত, স্ততরাং তাঁহার সহায়তা সাজাহান লাভ করিবে, সেনাপতি মহাবৎ খাঁ মহাবীর, সেই পলাতক মহাবৎকে আশ্রয় দিয়া সাজাহান তাঁহার সহিত আত্মগতা স্থাপন করিয়াছে এই সমস্ত কারণে কেবল তাঁহারি সহায়তায় শারিয়ার সাজাহানের সঙ্গে বন্দ করিয়া সিংহাসনলাভে সক্ষম হইবে না—একথা এতদিন রাজকার্য পরিচালনা করিবার পর বুদ্ধিমতী সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের জানিতে অধিক বিলম্ব হইবার কথা নহে। সাজাহানের সহিত শারিয়ারের সংঘর্ষে পরাজয় সুনিশ্চিত, দার্মনোন্নয়ন হইতেই হইবে, সাজাহানের বিরুদ্ধাচরণ করিলে ভবিষ্যতে তাঁহার বিমুদ্রীতে পড়িত হইবে—ইহা জানিয়াও চক্ষুপাতের পক্ষে যে নূরজাহান অবলম্বন করিয়াছিলেন স্বানিনির্দেশে কর্তব্যের প্রেরণাই তাঁহার কারণ এবং নূরজাহানের পূর্বাপর জীবনচিহ্ন ভুল করিয়া পর্যালোচনা করিলে এই মীমাংসাতেই সকলকে আসিতে হয়।

সিংহাসনের জন্ত চই ত্রাতার বন্দ উপস্থিত হইয়াছিল এবং সেই বন্দে পরাজিত শারিয়ারের জীবনীলার শেষ হওয়ার ভাববিবোধভীতি আর সাজাহানকে উৎকণ্ঠিত করিতে পারে নাই। দাক্ষিণাত্য হইতে সৈন্যে রাজধানী পত্নহিতে জামাতা সাজাহানের বিলম্ব হইবার সম্ভাবনা এবং ততদিন সিংহাসন শূন্য থাকিলে সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের বুদ্ধিবলে শারিয়ার তাহা অধিকার করিয়া বসিলে তাঁহার ক্ষমতার বৃদ্ধি হইবে এবং সিংহাসনাধিকৃত সম্রাটকে ত্যাগ করিয়া রাজ্যের অনেক পদস্থ আমীর ওমরাহ সাজাহানের পক্ষ অবলম্বন না করিতেও পারে—এই সকল বিবেচনা করিয়া শারিয়ারের পথরোধ ও ভগিনী নূরজাহানের সক্ষম বিফল করিবার জন্ত মন্ত্রী আসফ খাঁ খন্ডনন্দন বুল্লাকীকে সাজাহানের সৈন্যে আগমন কাল পর্যন্ত সিংহাসনে বসাইয়া দেয়। আসফ জানিত সাজাহানের বীর্ষের নিকট বালক বুল্লাকী অচিরে পরাস্ত হইবে এবং অধিক-

তর কমতানাল সাজাহানের পদতলে সাম্রাজ্যের অবনত হইতে অধিক বিলম্ব হইবে না। ফলেও তাহাই হইয়াছিল, সাজাহান সৈমধ্যে রাজধানীর নিকটবর্তী হওয়াবাত্র বালক বৃন্দাণী ভীত হইয়া সিংহাসন ত্যাগ করতঃ পলায়ন করে এবং তাহার পরিণাম কি হইয়াছিল তাহা ইতিহাসজ্ঞ মাত্রেই অবগত আছেন। প্রতিবিশ্বিক্তিীন সিংহাসন সাজাহান নিকটকে অধিকার করিয়া বসিলেন, সাময়িক উপলব্ধ বাহা রাজ্যে গড়িয়াছিল, তাহা অল্পকাল মধ্যে মিটিয়া গেল, ভারতসাম্রাজ্যে পুনরায় শান্তি বিরাজ করিতে লাগিল, একমাত্র নরসাহানকে সমস্ত চঃপের ভার নাথান লইয়া অসৌভাগ্যের শাস্তিটীন সাধনাবিহীন দীর্ঘ দিন বহুকাল ধরিয়া কাটাষ্টতে হইয়াছিল।

প্রিয়সম্মিলন যখন একেবারেই অসম্ভব বলিয়া মনে হইল, তখন আশীষ স্বজন বাহার হাতে মেহেরকে তুলিয়া দিয়াছিল, মেহের তাহারি সঙ্গে রাজধানী ত্যাগ করিয়া স্বদুর বঙ্গদেশের পল্লীগাম বর্ধমানে আসিয়া দিন যাপনের জন্ত সংসার পাতিয়া বসিল। সে সব দিন জুড়ে কি চঃপে গিয়াছে তাহা অস্বপ্ন কল্পিত নহে, অস্ত্রের একান্ত কামনার চিরবাঞ্ছিত জনকে একত্রে আর পাইবই না মনের এই অবস্থা লইয়া দিনাতিপাতের যে আয়োজন সে আয়োজন কি জুপের হইতে পারে? শরীর থাকিলে আহারনিদ্রা করিতে হয়, মেহেরও করিত, একজনের গৃহিণী হইলে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় অনেক কাজের ভার বন্ধে আসিয়া চাপে, সে গুলি না করিলে সংসার চলনা; সুতরাং মেহের, আলীকুলীর গৃহিণী হইয়া তাহার সংসারও চালাইত, কিন্তু প্রণয়িণী গৃহিণী হইলে সংসারের দিনগুলি যেমন নৃত্যের লাস্তলীলায় চতুর্দিকে আনন্দভরঙ্গ তুলিয়া লবুপদে দ্রুত চলিয়া যায়, আলীমেহেরের সাংসারিক দিন তেমন করিয়া অতিবাঞ্ছিত হয় নাই। স্বপ্নচঃপের মধ্য দিয়া জীবনের সে অধ্যায় শেষ হইল, হিসাব-নিকাশ চুকাইয়া যখন একান্তে বসিবার সময়, তখন জীবনাধিকের ব্রেজ-আহ্বান মেহের উপেক্ষা করিতে পারে নাই, এক সময়ে পায় নাই বলিয়া সময়ান্তরে যে আনন্দ আপনি আসিয়া মেহেরের করতলগত হইয়াছিল, তাকে প্রত্যাখ্যান করিবার মত নিষ্কৃতি মেহেরের হয় নাই, আজীবনসংকীর্ণ অস্ত্রের ব্রেজস বাহা যুহুর্থে যুহুর্থে উজ্জ্বলিত হইয়া মেহেরের মনে বিপুল বেদনার সঞ্চার করিতে ছিল, ব্রেজকাঙাল রাজভিখারীর বিস্তৃত ছই হস্ত সেই ব্রেজে ডরিয়া দিয়া মেহেরের নারীজীবন সে সফল করিয়াছিল এবং রাজাধিরাজও হিন্দুহানের

সম্পদশালির উপর বসিয়া যে বাণিজ্যের বেসনায় চিরকাতর ছিলেন, তাঁর সে বাণ্য জীবন ও জন্ম দত্ত হইয়াছিল। রাজকান্তের যেহেতু অক্ষকীর জীবন মেহেরের সেবা-সোভাগের মণিদীপপ্রোক্তি পাটয়া ভায়াচ্ছয় আশু-অপরাজে উজ্জল হইয়া উঠিয়াছিল এবং সেই যেহেতুককার স্রিধু আলোকের মধ্যে যখন তাঁহার নয়ন চিরমুদ্রিত হইয়া গেল তখন জীবনের বার্থতার জন্ম শোকসমুদ্রত উদয় লইয়া তাঁহাকে বিদায় চাইতে হয় নাট কিন্তু যার বুকভরা মেহের দান হাত ভরিয়া নিয়া রাজনন্দন দত্ত হইয়াছেন, সেই ভাচাকীরের দেহান্তের পর তাঁর জদয়নিধি, চিরকামনার স্পর্শমণি, তন্মজ্জমাস্ত্রের আশা ও বাসনার আকাঙ্ক্ষিত ধন, মেহেরের ভঃপের দিন বিদ্যাচালের মত অচল হইয়া কেমন করিয়া তাহার বকের উপর চাপিয়া বসিয়াছিল, তাহা দেগিবার তখন হো আর কেহই ছিল না, দিনারন্ত হইতে দিনান্ত এবং দিনশেষ চাইতে অরুণোদয় পর্য্যন্ত আশাটীন উত্তমটীন প্রয়োজনবিটীন দেহ ও প্রাণ বচন করিয়া যেহেতুশুভ দয়গীর নীরস ধূলিতলে আশ্রয়পন কি ভঃসহ ভঃপের ভোগ তাহা প্রিয়-বিরহ-কাতর জনেই জানে দিনমানিনীর অবিচ্ছেদ সাহচর্য্যে প্রিয়তমকে পাটয়া, কৈশোরের মনোচোর কে প্রৌড়ের পরিণত প্রণয়ের প্রগাঢ় পরিবেশের মধ্যে ধরিয়া যাচার আনন্দ-মহোৎসবে দিন কাটিয়া গিয়াছে, নিরালস্য, নিঃসঙ্গ, নিরাশ্রয়, বৈধবোর দিন তাহার কি কাটে ? ভঃখদীর্ণ জীবন যে দীর্ঘ হইয়াই চলে। প্রাণপণে শেষের দিনকে ডাকিলেই যদি আসিত, তবে একা মেহের কেন পৃথিবীর আদিস্রষ্টির দিন হইতে আজ পর্য্যন্ত কত কোটি কোটি নরনারী গলবস্ত্র হইয়া সূর্যাস্তের শরণ যাচিয়া বাগ্ন প্রতীক্ষায় কাণ কাটাইত সুখের গুহস্থলী ভাঙ্গিয়া দিবার জুইই রবিনন্দনের অঙ্গুচরের আবির্ভাব হয়, ভঃপের দিনে তাহার দর্শন তুলত হইয়া উঠে। সেলিম মেহেরের কেবল মঙ্গপুত্র স্বামী ছিল না, সে যে তাহার জদয়পুষ্পের আসবলোপুপ প্রিয়মধুকর ; হোমধূমের অঙ্গ-আরম্ভের মধ্যে তাহাদের বিবাহিত জীবন আরম্ভ হইয়া বৈধবোর দিনে উভয়তঃ সে অঙ্গর শেগ হইয়াছিল এমন নহে, উভয়ে উভয়ের যে পরম যত্নে অচরিত অমূল্য নিধি, তাই এ বিয়োগে যে বিধবার প্রাণবিয়োগের সমতুল ; যে জীবনাদিক প্রিয়ধন, যাচার চরণতলে স্বেচমন সমর্পণ করিয়া জীবনও ও জন্ম সফল করিয়াছি, যাচার সঙ্গে একাত্ম হইয়া অথও আনন্দের মধ্যে জীবনের সব সার্থকতা লাভ করিয়াছি, অনন্তমনে বহুবর্ষ অহুধ্যান-জনিত পূণ্যবলে যে একান্ত প্রিয়লাভে ধত্ত হইয়াছি, তাহার ক্ষণিক বিরহই ধম-যাতনা দেয়—এ জন্মের মত তাহার সহিত চিরবিরহ যে কি ভঃসহ বেদনা তাহা ভূক্তভোগীট অস্তুরে অস্তুরে অহুভব করে।

ক্রমশঃ

শ্রীজগদিস্তনাথ রায়।

উল্কা ।

(১)

কলেজ খুলিলে ভই বন্ধুতে তল্লি বাধিয়া বাড়ী ফিরিলাম । সেদিন পূজার ছুটির শেষদিন, টেপে অত্যন্ত ভিড় । অনেক খুঁজিয়া একখানি গালি কামরায় আগরা বিছানা পাতিয়া যখন শুইয়া পড়িলাম, তখন আমাদের কোনরূপ অসুবিধা হওয়া দূরে থাক, সুনিদ্রারও বাধাত ঘটে নাই । কিন্তু যশোবন্তনগরে গাড়ি থামিলে একজনের ঠেলাঠেলিতে হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠিয়া দেখিলাম আকস্মিক বজাপ্রাবনের মত আমাদের কামরাট যাত্রীতে ভরিয়া উঠিয়াছে । আমাদের চকনের মধ্যে বন্ধু শৈলেন চিরনির্ধিকার । কোন অবস্থাতেই কেহ তাহাকে বিচলিত হইতে দেখে না । কিন্তু আমার প্রভাব ঠিক ইহার বিপরীত । নিদ্রাভঙ্গকারীরা প্রতি চটয়া বলিলাম “ডাকলেই ত চ’তো মশাই, ভ্রমণোক্তের গায়ে হাত দিয়ে ঘুমভাঙ্গান—এ কি রকম ভদ্রতা ?

ভ্রমণলোকটি বয়সে প্রবীণ, কিছুমাত্র অপ্রতিভ না চইয়া উত্তর করিলেন, “ছেলেবয়স কিনা, ঘুমটা কিছু গাঢ় । এত গোলমালেও কিছু হুচে না দেখে ডাকে ফল হবে না বুঝেছিলান । রাগ করবেন না, কোমরে বাত, পাড়াতে পারি কি বেশিকণ !”

আমি একটি লোক কোন্ সময় কোন্ ট্রেনে গাড়িতে উঠিয়া আধখানি বেঞ্চ অধিকার করিয়া নিদ্রা দিতেছিলেন, তাহা জানিতেও পারি নাই । তিনি এই গোলমালে জাগিয়া উঠিয়া আলস্ত ভাবিতে ভাবিতে কহিলেন “গোড়া থেকে আরম্ভ হোক, মশাই, গোড়া থেকে আবার আরম্ভ হোক, সব শোনা হয়নি ।”

আমি ক্রুদ্ধভাবে উঠিয়া গিয়া একপাশে বসিলাম । শৈলেন নিজে চইতেই মানে মানে বিছানা শুটাইয়া লইয়া জায়গা ছাড়িয়া দিয়াছিল ।

গাড়ি ছাড়ে ছাড়ে,—এমন সময় একটি বৃদ্ধ একটি ময়লাকাপড়ে বাধা প্রকাণ্ড বোচকা, বোচকার গায়ে দড়ি দিয়া খুলান একটি থেলো ছঁকা এবং অপর হস্তে একখানি চাঁচাবীশের লাঠি ধরিয়া হাঁকাইতে হাঁকাইতে সেই কামরার দরজার কাছে আসিল । তাহার সঙ্গে একটা মেয়ে । বৃদ্ধ ব্যাকুলভাবে বলিয়া উঠিল “কাল থেকে পড়ে আছি মশাইরা, সঙ্গে এই সমর্থ মেয়েটা রয়েছে, একেবারে নাহাক্ হয়রান্ হয়ে গেলুম । দয়া করে একটু জায়গা দিন ।”

বালিকা একটি পিতলের গটি ছাতে করিয়া সভর সন্দেশে বুদ্ধের পিছন হইতে গাড়ির মধ্যে চাহিয়া দেখিতেছিল। উদ্বেজনায় ও দোড়াদোড়িতে তাহার মুখপানি রান্না হইয়া উঠিয়াছে।

গাড়ির ভিতর হইতে একটি বাবু ফুঙ্কুরের দ্বার খুলিতে উত্তর বুদ্ধকে দ্রব্য দাকা দিয়া কহিয়া উঠিলেন “এই বুড়ো, দেখতে পাচ্চনা, এটা তোমারগে থার্ড কেলাস নয়। একুশি গাড়ি ছেড়ে দেবে, যাও, অল্প জায়গায় যাও।”

বুদ্ধ একেবারে অসহায়ভাবে চেঁচাইয়া উঠিল “সব গাড়ি ছোট লোকে ঠাসা মশাই, কোথাও একটু তিল ধরবারও স্থান নেই। সঙ্গে যে এই নেয়েটা রয়েছে। হনো হনো মিন্বেগুলো ছদিক থেকে চেপে ধরে; এ চোক জটো থাকতে তা দেখি কেমন করে? এই জগুই বলেচে পথে নারীবিবাহিতা।”

তাহার শাস্ত্রব্যাখ্যা শুনিয়া সকলেই হাসিল, কিন্তু কেহই তাহাদের সাহায্যের জ্ঞান অগম্য হইল না। কিন্তু হঠাৎ একজনের চিত্ত—তাহার না হোক, বোধ হয় তাহার সহযাত্রিনীর চক্ষে আর্জ হইয়া আসিল, সে বলিল “একটি অসহায় বুদ্ধ একটি যুবতী কন্যাসঙ্গে এমন করিয়া অরক্ষিত অবস্থায় ট্রেনে পাড়ে থাকবেন, আর আমরা এতগুলো ভদ্রলোক জোয়ান দিবি আরাম করে যাব? এই জগুই তো আমাদের এমন দশা!” এই বলিয়া শৈলেন্দ্র তৎক্ষণাৎ দ্বার খুলিয়া বুদ্ধকে ডাকিয়া বলিল “এস তুমি আমাদের এই কামরায়।” বলিয়াই নিজে তাহার ভাগি মোটটা ভিতর দিকে টানিয়া লইল। ইতিমধ্যেই তাহার বসিবার জায়গাটুকু বেদখল হইয়া গিয়াছিল, এবং চারিদিক হইতে তাহার এই অবিমূঢ়াকারিতার সম্বন্ধে মুক্তি প্রদর্শন করিয়া ভদ্রবাস্তিগণ তাহাদের মধ্যে জুইটা ময়লা কাপড়পরা ‘ছোট লোককে’ স্থান দেওয়ার জ্ঞান তাহাকে দিকার দিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

বুদ্ধ ও মেয়েটিকে গাড়ীতে উঠাইয়া আমার স্থানে তাহাদের বসিবার স্থান করিয়া দিয়া আমরা দুজনেই পাড়াইয়া পাড়াইয়া অপর যাত্রীদিগের সহিত ভূমূল তর্ক জুড়িয়া দিলাম। অবশেষে শৈলেন্দ্রের কাজটাকে অভ্যস্ত-জনক বলিয়া যখন সাব্যস্ত হইল না, তখন একজন তাহালাভরে তাহাকে ছোট করিয়া দিবার চেষ্টায় কহিয়া উঠিলেন “সারাপথটি বুন দিতে পেলে আমিও এমন ভদ্রতা করতে পারি ইয়া, ঢের দেখেচি এমন দয়ালু।”

অপর এক ব্যক্তি কহিলেন “একেই বলে বক পরমার্থার্থিক; রেলকোম্পানির চপান টিকিট যে ভাচ্ছুরি করা হলো সেটি?”

আমি সক্রোধে বলিলাম “সে সংসাহস আমাদের আছে । সে জন্ত আপনাদের মত মাথাব্যথার দরকার নাই । আমরা দাম দিয়ে দেবো ।”

অনেকক্ষণ পরে গোলমাল তর্ক বিতর্ক মিটমাট হইয়া কক্ষ নিষ্কর হইলে আমরা ভাল করিয়া আমাদের আশ্রিতদিগের দিকে চাতিয়া দেখিবার অবসর পাইলাম ।

বাবুদের বিবাদ দেখিয়া ও নিজেদেরই ইচ্চার উপলক্ষ্য বুঝিয়া আগন্তুক দুজন কিছু ভীত ও কতকটা সঙ্কচিত হইয়াছিল । আমাদের চাহিতে দেখিয়া বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিল “হ্যাঁ বাবু, এ গাড়ীতে কি গরীব মানুষদের উঠতে নেই ? গেছো মানুষ জানিনেতো কিছু । এইবারই এই মেয়েটার দায়ে পথে বের হয়েচি, এর আগে এতটা বয়স কোন দিন আমাদের নওগাঁর ওদারে পা দিই নি ।”

শৈলেন্দ্র তাহাকে আশ্বাস দিয়া শান্ত করিল, আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম “কোথায় যাবে তুমি ?” বলিতে বলিতে গাড়িওদ্ধ লোকের দৃষ্টি অল্পসরণে আমারও কোঁতুলন দৃষ্টি তাহাদেরি অহুকরণ করিতে গিয়া ভেঁমনি করিয়াই সেই মেয়েটির মুখের উপর আবদ্ধ হইল । এই দীন দরিদ্রের সাথী এই মেয়ে, এ কোন সেবতার চলনা—না আনার দৃষ্টিবিভ্রম । সেই রাঙ্গাপাড়-ওখলা মলিন সাড়ি, মোমবাতির মত ভ্রুপানি গোলগাল হাতে দুগাছি কালো কাচের চুড়ি, রক্ত হস্ত অবিস্মৃত কেশজালে তাহার সেই মেঘাবৃত চাদের মত অর্ধাবরিত মুখ, যাচা এখনও গুরু পরিশ্রম, ভয় ও সব চেয়ে এত-ওখলা অচেনা পুরুষের কুঠাহীন প্রশংসা দৃষ্টিতে লজ্জাসন্ধোচে আরক্ত হইয়া আছে, এইসব ওলাই যেন তাহাকে সমধিক উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছিল । আমি বি এর কোর্সে কালিদাস পড়িয়াছি ; মনে পড়িয়া গেল, ‘সঞ্চারিণী পল্লবিণী লভেব ।’ আনার প্রপ্রোত্তরে বৃদ্ধ করিল “আর মশাই সে কথা কেন কেন ? সে যেমন চব্বার, নাচাক্ হয়েরণ চয়ে এসেচি, বাড়ী আমাদের কাটোয়া জেলা—নওগাঁ, নন্দীগ্রাম চক্ষে গায়ের নাম মশাই, বঝলেন ত ? হ্যাঁ, গাটন নাম নওগাঁও বলে নন্দীগ্রামও বলে, তা ও একই কথা ; এ নাম লিখলেও চিঠি টিঠি দায়, ওতেও যায় । তবে হ্যাঁ, জেলাটি স্পষ্টকরে লিখতে হবে । বঝলেন ত ? ঐ নওগাঁ আরও নাকি আছে । হ্যাঁ, তাই জন্মে ঐ জেলার নামটা, বঝলেন ত ? হ্যাঁ, তা সেই নন্দীগ্রামে মশাই আমাদের বাস । সে আজকের বাস নয় মশাই, আমার পো ঠাকুদার ঠাকুদা থেকে আমরা এই ক-পুরুষ এখানে বাস করচি, বঝলেন ত ? হ্যাঁ, সেই গায়েরী পুরুষ আমি ।

তা ছোটখাট গাটি বটে, তবে নেহাৎ যে ছোট লোকেরই বসতি, তা নয় । এখনও ছাঁদশবর বায়ুনকায়েতের ঘরে সেখানে সাঁজসন্ধ্যা পড়ে, বুঝলেন ত ? হ্যাঁ, তা আছে এখনও গায়ে ছাঁদশবর ভদ্রলোক । আমারও ঐ বিদেশটা সিধোটাআসটা কুড়িয়ে চলে যায় এক রকমে । তা ব্রাহ্মণীরও কাল হয়েছে, ঘরেও আর বেশী কেউ খেতে মাথতে নেই, চলবে নী কেন বলুন না মশাই ? হ্যাঁ, একটা পেট বইত নয় । তা দেগুন, এট যে মেয়েটি দেখছেন, এটি আমার এক শিষ্যিকণ্ঠে । রামহরির বউ নরদকালে একে আমার হাতে সাঁপে গিয়েছে, বুঝলেন ত ? হ্যাঁ, না দিয়ে করে কি মাগি ? আর ত কেউ কোথাও নেই ক তার । তার বেটা, বউ তারা ত অনেক দিন আগেই মরে গেছিল । একেই বুকে আঁকড়ে মাগি এতদিন কুঁড়ের মধ্যে পড়ে সেই বিষম শোকে অরে ছিল । একদিন পটু করে পটল তুলে, বুঝলেন ত ? হ্যাঁ তা আমার অনেক করে বলে গেছে যে হরিদ্বার কনথলে এর দাদামশাই, মাতামো' দাদা আছেন । কি করি মশাই, বুঝলেন ত ? কাজেই এই বেরিয়েছি । পরের দায়, এ যে মহাদায় বুঝলেন ত ? তাতে বেয়ে বড়ও হয়েছে, এখন এর ডিকে সিকে করে বিয়ে দিলেও আর তাতে কণ্ঠে দানের ফল হবে না । গৌরীদানের ত হবেই না । বুঝলেন ত ? হ্যাঁ ! এ মহুর বিধান ! আইন এ সব । এও আর অমান্ত করা চলে না । তা এখন আর সবাই মানছে না, বেজ্ঞাচার করছে । হ্যাঁ, তা গিয়ে মিথো হয়রাণি ! সেখানে এখন আর তিনি থাকেন না ; সন্তের নবর গণেশ মহম্মার কাশীধামে এসে রয়েছেন । বুঝলেন ত ? হ্যাঁ তাই যাচ্ছি আবার সেখানে ।”

বুদ্ধের কাহিনী এতক্ষণ সকলেই সকৌতুহলে শুনতেছিলেন । বুদ্ধের কথা শেষ হইয়া গেলে একজন মন্তব্য করিলেন “মেয়েটি যেন রাজকণ্ঠে ! চমৎকার মেয়ে !”

শুনিয়া মেয়েটি নতদৃষ্টি ভুলিয়া একবার বক্তার পানে চাহিয়াই আবার - বিশাল সরল নেত্রদ্বিটি আরও একটু নত করিল । সেই চকিত কটাক্ষটুকু যেন সরমে কুঁকড়িয়া মিনতি করিয়া বলিল “কেন তোমরা আমার পানে চাহিয়া আছ ? কেনইবা বিরক্তি এবং সহাস্ত্রভূতি জানাইতেছ ? কিছু কাজ নাই ; শুধু তোমাদের মন ও দৃষ্টি এখান হইতে সরাইয়া লও—তা হইলেই আমি ষাটি !” বুদ্ধ আবার আরম্ভ করিল “গরীব মানুষ, কোথা কি পাব বলুন ? রামহরির কুড়েটুকুম বেচে গাই গোব্বাটা গরদাকে পোষানী দে, বিধে পাচ

সাত খু ফেত জগী ছিল সে সব দাহজ্বানের ব্যাটা রাজজোন'কে জমা খরিয়ে দে, সেই ঘর বিক্রির সচৌদগড়া টাকা নিয়ে বেরিয়েছি। বুঝলেন ত ? হ্যা, তা তার মধ্যে এই ত একগই প্রায় কুড়ি টাকা সাড়ে বার আনা খরচ হয়ে গেছে। মোট নির্জের শুদ্ধ জড়িয়ে সড়িয়ে হাতে আছে চৌত্রিশ টাকা আট আনা এক পাই। উহা, তাথেকে আবার আধলার তানাক আর আধলার টিকে কিনেচি, বুঝলেন ত ? হ্যা, তা'হলে ওটা পুরোই আট আনা, তা যা এখনও খরচ হয়, যা বাচবে ওরই অ'চলে বেধে দে আসবো। গরীববাট বটে নশাই, কিন্তু চোর কি জোজোর নই। ও গচ্ছিত ধন আমার প্রক্ষরক্ত ! বুঝলেন ত ? ও প্রক্ষরক্ত ! ছুঁয়েছি কি গেছি ! হ্যা, তা ওকে আর ওর টাকা পয়সা ক'টা একবার তাঁর কাছে পৌছে দিতে পারলেই নিশ্চিন্তি হই নশাই, বাড়ের বোঝা নেমে যায় আমার ! বুঝলেন ত ? এ মহা দায় ! পরের দায় মহারায় ! তা এ থেকে একেবারে নিশ্চিন্তি হয়ে ঘরে ফিরে যাব। একবার গিয়ে পড়তে পারলে হয়। সেখানে গেলে আর কোন ভাবনা নেই। নন্তলোক তিনি, খুব নামডাক তাঁর, সন্ধ্যাই চেনে, শোনে,—বুঝলেন ত ? হ্যা, সে খুব সুবিধে হবে তখন।" ইতিমধ্যে নূতন রসাবাদে সিন্ধু হইয়া কখন বিবরমানগণের অন্তর্তাপ নীতল হইয়া গিয়াছিল বোধ হয়। আমরা ঠেলিয়া ঠেলিয়া তাহার ভিতরেই একটু জায়গা করিয়া লইয়া বসিয়া পড়িয়াছিলাম। শৈলেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল "কি নাম তাঁর ? কিছু কাজটাজ করেন ?"

"তিনি কি করেন ? কিছু না। লোকে তাঁকে খুব মানে। নন্তলোক, নন্তলোক। খুব নাম, বুঝলেন ত ? হ্যা, খুব নাম। তাঁর নামটি হচ্ছে সীতাপতি ভট্টাচার্য্য। পিতার নাম শ্রীধরনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, পিতামহের নামটি শোনা হয়নি ; রামহরির বউও বোধ হয় জানত না। আদ' বাড়ী জেলা যশোর, গ্রাম কালিয়া। কুলের মুখটি, তিনপুরুষে, পিতামহ সাতগায়ে বৃন্দাবন রায়ের ঘরে ভগ্ন হন। সেই থেকে সাতগেয়েই বাস করছিলেন। ঐ এক কণ্ঠে, রানহরির পুত্রবধূ—ঐ একটি কণ্ঠে তাঁর, বুঝলেন তো ? হ্যা, তা ঐ এক কণ্ঠে বলে আর অন্তত মানেনু নি, পাঁচ পুরুষে রামহরির ব্যাটা, তারও ঐ একটি ব্যাটা নশাই, সবেধন নীলমনি, তা নামেও তাই, কাজেও তাই। ঐ ওর সঙ্গে বে দিয়ে, জমাইকে নির্জের কাছে নিয়ে বিগ্ধে শেখাতে আরম্ভ করে দিলেন। শিখেছিলও খুব। বুঝলেন ত ? হ্যা, তা খুব একজন দেশের মধ্যে নামওয়া হত, বেঁচে থাকলে। তা থাকবে কেন ? কুপীনের

মেয়ে কখনও অকুলীনে নয়? সইল না মশাই সইল না, পট করে আগে মেয়েটা মল, তারপর নীলমাধবও ছ'মাস যেতে না যেতে—বাদ্দ! বুঝলেন ত? হ্যাঁ, তা থাক্ সে সব কথায় আর কাজ কি মশাই? মেয়েটা এখনি হয় ত কেঁদেই ফেলবে। দেখেনি জানেনা বটে; হাজারও না দেখুক তবু তা বাপ না।”

আমারও আর সীতাপতি ভট্টাচার্য্যের ‘কুলজী’ শুনিবার ল্পহা অধিক ছিল না। সম্পূর্ণ সায় দিয়া তাই এ কাহিনী সনাত্তির পোষকতা করিয়া বলিলাম “আহা, সেত ঠিকই কথা! বলেন কি বাপ, না! এমন কি কেউ আর আছে।”

শৈলেন হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিয়া বলিল “যদি তাঁকে কানীতেও না পাওয়া যায় তা হলে একে নিয়ে কি কর্কেন পুরুষ ঠাকুর?”

বুদ্ধ তৎক্ষণাৎ প্রশান্তমুখে কহিয়া উঠিল “আমার ঘরে কিরিয়ে নে’ যাব। কার কাছে কোথায় দেব না লক্ষ্মীকে আমার! বাপ্পে! তাকি পারি? বুঝেছেন ত? হ্যাঁ, এ যে আমার গচ্ছিত ধন, কি বলেন?”

“মেয়েটির নাম কি ঠাকুর? বড় লক্ষ্মী মেয়ে। আহা ভগবান ঠেকে স্থখী করুন।” শৈল এই কথা বলিয়া তাহার নম্র নত মুখখানির দিকে প্রশংসার দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। আনরা কিন্তু কেহই এই কৈশোরোত্তীর্ণপ্রায় কুমারীকে এমন সহজ ভাবে নিজেদের মধ্যে গ্রহণ করিতে পারি নাই। একটু লজ্জা, কিছু কুষ্ঠা, কি যেন অপরাধী ভাব সকলেরই চক্ষে প্রকাশ পাইতেছিল। সকলেই সকলকে গোপন করিয়া এই অপূর্ণ সৌন্দর্য্য-স্বধানেত্র দ্বারা পান করিতে উৎসুক। কেহ কাহাকেও এদিকে জানাইতে ইচ্ছুক নহেন যে এই নারীটি তাহার কোন প্রকার আগ্রহ আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছে। এনি করিয়াই বাঙ্গালী বুঝার অপরিচিতা রমণীদের সর্বাঙ্গনা করিতে অভ্যস্ত। শুধু আমরাই বা কেন, অনেকেই এই পথের পথিক, এ কথা আমার বিশেষ জ্ঞান আছে। তা আমাদেরই বা সব দোষটা দিলে এখন চলিবে কেন? মেয়েরা যেখানে লজ্জায় ঢাকা মুখের বজ্রিণ হাত ঘোমটা কৌতূহলের তাড়নায় উঠু করিয়া ধরিয়া তাহার মধ্য হইতে থেমটা নানক এক জাতীয় নাচ নাচিতে থাকেন, আবার লোকে দেখিলেই যেন কি কাণ্ডই ঘটিল, এমনই করিয়া ছুড় ছুড় ছুড় শব্দে ছুটির পাগান; কাজেই একজনকে ইহার বাতিক্রম করিতে দেখিলেই আমরা তাহা কি অপূর্ণবর্ণন বোধে গিলিয়া ফেলিতে চাই। আর তাহারাও আমাদের বেহারা বলিয়া গালি দেন। মারাত্মক মেয়েদের মতন হির ধীর নির্ভীক ভাব দেখিলে কি কেহ

তাহার দিকে চোরাকটাকে চাহিতে সাহস পায় ? অথচ তাঁদের সেই ঘোমটার উঁকিঝুঁকি না থাকে সবেও ত কেহ কখনও নিলজ্জিত আরোপ করিতে সাহসী হয় নাই । আমরা যে কাজ নিজে না করিতে পারি, তাহা অপরকে করিতে দেখিলে, হয় তাহার প্রশংসা করি, না হয় অধিকতর এইটাই হয়,— তাহার নিন্দা করি । শৈলেনকে আজ একটু নিন্দাই করিলাম । মনে মনে লজ্জিত হইয়া ভাবিলাম ছিছি, ওটা হলো কি ? অত বড় মেয়ের নাম জিজ্ঞাসা করা কেন ? সাহেবরাও ত এমন করে না ।

বৃদ্ধ কিন্তু খুব প্রসন্ন মনেই একগাল হাসিয়া উত্তর দিল, “নাম ওর সুবর্ণলতা, লক্ষ্মী লক্ষ্মী করে আমরা সবাই ডাকি । ঐ নামটাই থেকে গেছে । আসল আর কেউ ধরেও না, চলেও না ।”

ছনাস্তিকে আমি শৈলেনকে কহিলাম “কি হে কোর্টশিপের মতলাবে আছ না কি ? তোমার ত চিরদিনের ওটা একটা সাধ ।”

সে হাসিয়া তেমনি চুপিচুপি উত্তর দিল “না, ঘটকালির চেটায় আছি ।”

“তুমি ত সরস্বতী চাও না, তাই দেখছিলুম লক্ষ্মীর যদি পেঁচাটি করে দিতে পারি ।” ছদ্মনেই হাসিলাম । কথাটা এইখানেই চুকিয়া গেল । না কোর্টশিপ, না ঘটকালি, কিছুই আর অগ্রসর হয় নাই ।

(২)

পড়াশোনা চুকাইয়া ওকালতির সনদ লইবার পরই হঠাৎ একদিন বালাবন্ধু শৈলেনের নিকট হইতে এক নিমন্ত্রণ পত্র আসিয়া পৌছিল । “বহুকাল দেখা সাক্ষাত নাই, একবার এই অবসরে বাঁকিপুরটায় বেড়াইয়া যাও না ।”

না আসিলে চঃপিত হইবে, এবং মনেও অনেক রকম ভাবান্তর উপস্থিত হইতেও পারে । এমনি সব অনেক রকম ভীতি-প্রদর্শনও সে করিয়াছিল ।

আমার পক্ষে এমন কিছু বাধাও বর্তমান ছিল না যে, এ আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করি ।

শৈলেনের সঙ্গে সেই তার বিবাহের সময় শেষ দেখা হইয়াছিল । তারপরই সে বাঁকিপুরে । এই বড় রকম চাকরিটা পাইয়া সেখানে চলিয়া যায় । স্ত্রীও তাহার নিত্যান্ত বালিকা ছিলেন না, সেই হইতে তিনিও তাহার কাছে । কাজেই আর সে বড় একটা আমাদের এমিক পানে পা বাড়ায় নাই । এখন তাহাদের একটি সন্তান জন্মিয়াছিল, ছেলেটির নাম অমিয়কুমার, সকলে ডাকে তাহাকে ‘মণ্টু’ বলিয়া । ষ্টেশনে নামিয়াই আমি সর্ব-প্রথম শৈলেনের কাল হইতে তাহার

ছেলে কাড়িয়া লইয়া তাহাকে চুপন করিলাম। এমনি হুম্মর মুখখানি যে দেখিলেই যেন বুক জুড়াইয়া যায়। বন্ধু হাসিয়া বলিলেন “ওরে অকৃতজ্ঞ! ও কি তোকে এখানে এনেছিল? এদিকে যে বাবুর একেবারে লক্কাট হ’লো না।”

আনি ছেলেকে আবার আদর করিয়া কহিলাম “নিশ্চয়! কোন অজ্ঞাত আকর্ষণ-মাহু্যকে তার উচ্ছ্বাস অনিচ্ছায় টেনে নিয়ে যায়, কে তার খবর রাখে? হয় ত ওরই এই হুম্মর মুখখানির চরণ নোড়াটাকে কোন রকমে স্পর্শ করেছিল।”

শৈল উচ্ছ্বাসি হাসিল, কহিল, “ঠিক ধরেচ! তোমার অলৌকিক শক্তি-বিশ্বাসের ভিত্তি দেখচি এখনও তেননি দৃঢ়ই আছে। কিন্তু এবার আমিও তোমার এই চৌর্যকাকর্ষণ ব্যাপারটির সমর্থন করি। তবে সে চুপকটি এখন কোথায় সে তর্কটা এখন নাট তোলা গেল সে পরে দেখা যাবে। এস!”

ছেলেটা কিন্তু এমনি অকৃতজ্ঞ, আমার স্নেহভরা চুমাগুলি সে একান্ত অবহেলার সচ্ছিত্তই গ্রহণ করিয়া কান্দ কান্দ মুখে বাপের কাছে নালিশ রুজু করিয়া দিল “বাবা, কাকা ছান্নকো ঝুটা কর দিয়া!”

শৈলেনের বাড়ীখানি বড় হুম্মর সাজান। ঝকঝকে তক্তকে গুঠখানি যেন গুঠলক্ষ্মীর নিপুন হাতখানিকে গৌরবান্বিত করিয়া রাখিয়াছে। সামনে বেশ একটুখানি ফুলবাগান। সিঁড়ির দুধারে টবে পাতাবাহার গাছ সাজান। মধোর হলে ঘনজোড়া কার্পেট, টানাপাখা, টেবিল, চেয়ার, মেওয়ারে গৃহিণীর চিত্র করা, ব্যান করা কতকগুলি চিত্র প্রভৃতি কিছুই অভাব ছিল না। সর্বত্রই আধুনিক রুচির একটা পূর্ণ সামঞ্জস্য দেখীপামান। এতটা আমি আশা করি নাই, একটু যেন কেমন কেমন বোধ হইল—একেবারে দিশী মাহুব কিনা!

শৈলেনের স্ত্রী তড়িতা হালকাসাদনে শিলাপ্রাপ্তা একালের মেয়ে। স্বামীর মেজাজের সঙ্গে তাহার বেশ মিশ খাইয়া গিয়াছিল। খাওয়া দাওয়ার পুরা সাহেবিদানা শৈলের ছিলনা, তাছাড়া আর সব বিষয়ে সে খুবই রাজপদাঙ্কাসরণে চলিত। এই একটি অসুবিধায় আমার যা পড়িতে হইল, এ ছাড়া আর কোন বিষয়েই তাহাদের যত্ন আদর মেহের এক বিন্দু ত্রুটি খুঁজিলেও মিলিত না। প্রথম দিন নিজের ট্রাক হইতে পঞ্চপত্র বাহির করিয়া একজন হিন্দু চাপরানীর কল্যাণে প্রাপ্ত গঙ্গোদকটুকু লইয়া নিজের ঘরের একপাশে সন্ধ্যাহ্নিকটা সারিয়া সবেমাত্র গীতার প্রথম অধ্যায়ের পঞ্চদশ শ্লোক শেন করিয়াছি, এমন সময় বোদির প্রেরিত ভৃত্য আসিয়া জানাইল ‘আচার্য্য প্রস্তুত।’

বোধ হয় আমার বিলম্ব দেখিয়াই শৈলেন নিজেই আমার ডাকিতে আসিয়া-
ছিল, কেননা এমন লোভনীয় সংবাদ কর্ণগোচর হওয়ার পরও আমি গীতার
প্রথম অধ্যায় শেষ না করিয়া উঠিবার রুচ্য বাস্তব হই নাই। আমার হস্তে
গীতা দেখিয়া শৈল সাংগো বলিয়া উঠিল “কি ভয়ানক ! এখানে ছদ্মিনের জন্ম
এসেছে, ভাও ওই ‘কন্তং গচ্ছং’ ! তুই বড় জ্বালালি ভাই ! আর আর উঠে আর,
ভাতগুলো ওদিকে গীতালভ, অর্থাৎ গীতাভক্তের জায় নিবাগতি লাভ করচে।”

আমি ঈষৎ বিরক্ত হইলাম। কিন্তু তাহা প্রচ্ছন্ন রাখিয়া সংক্ষেপে উত্তর
দিলান “একটু সেরি আছে। তুমি যাও, আমি যাচ্ছি।”

আহারে বসিয়াও নানা গোলযোগ। আমি মাছ খাওয়া ছাড়িয়া দিয়াছি
শুনিয়া একসঙ্গে ছইজনই ছই ধার হইতে গর্জিয়া উঠিলেন। একজন
বলিলেন—“যা যা, খুব হয়েছে, আর অত বাড়াবাড়িতে কাজ নেই ! মাছ খাবেননা,
এই বয়সে চোক চুটোর মাথা খাবেন ? ভা—রী ধার্মিক হয়েছেেন দেখছি যে !”

অপর্য কহিলেন “দাও ঠাকুর, তুমি মাছ দিয়ে যাও, শুনচ কেন ঠর কথা।”

এক জনকে ধনক দিলান, অস্ত্রের কাছে হাত জোড় করিলাম ; কিন্তু ছদ্মিনের
একজনও আমার এ পথরক্ষাকে স্নানার দ্বারা সম্বন্ধ করিয়া লইলেন, এমন কোন
প্রমাণ তাঁহাদের কাছ হইতে পাওয়া গেল না। বৌদি অতি গভীর বিনম্রমুখে
কেবলনাত্র নম্রা করিলেন “এ বেলাটাই নষ্ট হল, কি দিয়েই খাবেন, আমি ত
জানতুম না !”

হাসিয়া একটু রসিকতা করিয়া ফেলিলাম, এমন বড় একটা করিনা, আজ
তাঁহার কাছে সত্ত্ব অপরাধের অভিমান বিদূরিত করিবার চেষ্টায়ই বলিলাম,
“তোমার এমন মিষ্টি মিষ্টি কথাগুলি শুন্তে শুন্তেও যদি ভাত না ওঠে তবে
সংসারশুদ্ধ কালিয়া কোর্মা ঢেলে দিলেও উঠবে না।”

বৌদি মৃদু হাসিয়া লজ্জার মুখ নত করিলেন। শৈলেন হাসিয়া
তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিল “দেখচ তড়িৎ ! সাথে কি বলি তোমার
নানটা রাখা সার্থক হয়েছে, ও তাড়িতের সামনে কারও আর রক্ষা নাই। মছ
কিছুদিন এইখানে তুই থাক, তারপর দেখবো কোথায় তোর ও সব যোগ
বাগ তদ্রমত্ত থাকে।”

“আম্ববৎ সূর্যকূতেষু যঃ পশ্চতি স পণ্ডিতঃ ! শৈলেন তুই ভাই তব্ব একটা
পণ্ডিতের মত কথা বলি।”

এ আলোচনাটা হাসির মধ্যে শেষ করিয়া দিয়া আমরা উঠিয়া পড়িলাম।

কারণ বন্ধু-মিলন, ও আচার ও অনাচারের তর্কের চাটতে শৈলেনের উপর ওয়ালা সাহেব নিজের আফিসের কাজে তাহার সময়ে উপস্থিতি বেশি প্রয়োজনীয় মনে করাই সম্ভব, এমনি একটা আশঙ্কা তাহার মনে বর্তমান ছিল। আর আবারও মনে এ সম্বন্ধে এতটুকু সন্দেহ ছিল না।

(৩)

তা যাই হোক এদিকে দিন ভালই কাটিতেছিল। বন্ধুর সংসারটি বেশ সুখের সংসারই বলিতে হইবে। তিনটি প্রাণীতে তাহার তাহাদের এই ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডটিতে বেশ সুখেই থাকে। শৈল যেন প্রাণ চালিয়া দিয়া তাহার জীকে ভাববাসিত। এমন গভীর প্রেম, এমন পত্নীপ্রাণতা আর কখনও দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। তাহার স্রীতি যে এই অনন্তসাধারণ ভাল-বাসার মূল, এ কথা বোধ হয় না বলিলেও চলে। এমন সান্নীদ্য স্ত্রীলা পত্নী লাভ জগতে অল্পলোকেরই ভাগ্যে ঘটিতে দেখা যায়। আধুনিক শিক্ষা দীক্ষা তাহাকে অপরিবর্তিত রাখিয়াছিল—এতটুকু স্বার্থপরতার নেশা ডুবাটোতে পারে নাট।

একটা বিপর আবার গোথে যেন কেমন একটু বিসদৃশ ঠেকিত; সেটা হঠক শৈলেনের জীর প্রতি একটা অত্যন্ত সতর্ক সাবধানতা। বোধ হয় সেটুকু বুঝিতে পারিয়াই একদিন সে আপনা হইতে তাহার স্রীর অল্পপস্থিতি কালে ইহার প্রকৃত কারণ আমাকে গোপনে জানাইল। সে কহিল, তাহার স্রীর বাহুমুষ্টির সহিত ভিতরের আদৌ মিল নাই। বাহিরে এমন দেখাইলে কি হয়, ভিতরটা তাহার অত্যন্ত ভরল। সন্তান জন্মের পর জীবন মৃত্যুর মহা-সময়ে সেবারের মত জরী হইয়া উঠিয়াছে বটে, কিন্তু বিচক্ষণ ডাক্তারেরা বলিয়া রাখিয়াছেন প্রতি মুহূর্তেই তাহার রূপিণ্ডের ক্রিয়া স্রীর কার্য পরিভাগ করিতে পারে; এমনি তাহার অবস্থা। কথাটা শুনিয়া আমি শিহরিলাম। এই সুখের বাসা বাধিয়া এই ছুটি প্রাণী যে এত বড় একটা আনন্দের রাজত্ব স্থাপন করিয়া বসিয়া আছে।

কিন্তু শৈলেনের মনে এ সম্বন্ধে তেমন ভাবনা ছিল না। সে দিবা আশাদীপ্ত নেত্রে আমার দিকে চাহিয়া বলিল “তারা বলেন কোন রকমে মনে একটা ভীত আঘাত লাগিলে, অথবা অধিক পরিশ্রম করিলে চঠাং মারা পড়িবে। কিন্তু আমি সে ছটোর সম্ভবই মনে করি না। শ্রমের ওর কোন দরকারই হবে না। আর মনে আঘাত? ভগবান নিজে যদি না

যেন তাহলে আমার কাছে ত কখন এতটুকুও পেতে হবে না, এ আমি শপথ নিয়ে বলতে পারি ! আমি সন্তোষকরণে ভগবানের নিকট কেবল এই প্রার্থনা করি, যেন তিনি এর পরে কখনও কোন দৈবাঘাত না করেন । তড়িং আমার গেলে আমি আর একদণ্ডও এ পৃথিবীতে থাকব না । ও যে আমার কত জন্মের তপস্কালক পুরস্কার, তা কেউ জানে না !”

বলিতে বলিতে তাহার মুখে চোখে যেন একটা সগর্ভ হর্ষের জ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠিতে লাগিল । সুখে বেদনায় বিজড়িত একটা নিখাস ফেলিয়া সে চূপ করিল । আমি তাহাদের অটুট শাস্তি কামনা করিয়া কহিলাম “এ যেন ভাঙ্গা ঘরে বাস করা শৈল, বড় ভয়ে ভঁয়ে পাকা ।”

সে সহজভাবেই হাসিয়া উত্তর দিল “ভয় কিদের ? সাবধানে থাকি উচিত বলেই থাকি । নৈলে আমি ঠিক জানি আমার তড়িং আমার ছেড়ে কোথাও যাবে না । সেই বিয়ের কনে এসেচে, আজ চারবছর একদিন এক মুহূর্তও কোথাও যায় নি ।”

আমি বিশ্বাসের দৃঢ়তা বড় পছন্দ করিতাম, গুমী হইলাম । কিন্তু পছন্দ করিলে কি হয়, মনে মনে গোপনে গোপনে সকল বিষয়েরই মত এ বিষয়েও কতকটা সন্দেহান ছিলাম । তাই মনের মধ্যে ঈষৎ অবিশ্বাসে একটু ঘাড় নাড়িয়া আপনা আপনি বলিলাম, “যাই বল ভাই ও সব পেয়ালের কথা ত নয় ! গতিক বড়ই মন্দ ! সফ হত্যার সমস্ত টুকুই ঝুলছে ।”

যাহাদের ভবিষ্যৎ চিন্তা আমাকে চিন্তিত করিয়াছিল, তাহারা কিন্তু সে নিকে এতটুকু উদ্বিগ্ন বা অশঙ্কিত চিহ্নও দেখিতে পায় নাই । হাসি-গুমী গল্প-গানে যেন পরস্পরকে লইয়া সারা বিষ বিন্ধত হইয়াছিল, অতীত এবং অনাগত কাহাকেও দৃকপাত না করিয়া তাহারা স্বগময় বর্তমানকে উপভোগ করিতেই ব্যস্ত ।

বৈকালে শৈলেন্দ্র অফিস হইতে বাড়ী ফিরিলে আমরা তিনজনে বাগানে বেড়াইতে বেড়াইতে গল্প করিতাম । গল্প প্রায়ই তর্কে পরিণত হইয়া পড়িলে কোন দিন বাগানের মধ্যের চাতালে, কোন দিন বারান্দার চৌকিতে আমরা বসিয়া পড়িতাম । যে দিন আমাদের তর্কটা খুব বেশি রকম পাকিয়া না উঠিত, সেদিন জগৎপরে বৌদিদির পাকা হাতের যন্ত্রধ্বনি আমাদের কক্কশ কণ্ঠের স্বরলহরীর প্রতিধ্বনিতে প্রহত গৃহাকাশকে শীঘ্রই শীতল প্রলেপ বুলাইয়া জুড়াইয়া দিত । গলাটিও তাহার বেশ মিষ্ট, তা' আমিও অস্বীকার

করিতে পারি না। যদিও জীলোকের সঙ্গীত-সাধনা, বিজ্ঞাচর্চা, স্বাধীনভাবে উদ্ভান-ভ্রমণ, এ সবই আমার চোকে বিসর্জনই ঠেকে, তথাপি ইহাকে এ সকলের মধ্যেও যেন আমার গুল বেপার ঠেকিত না—যেন এই ভাবেই একে বেশ মানায়।

আর যে দিন আমাদের তর্কের রোগ এবং গলার স্বর উভয়ই চড়িয়া উঠিতে থাকিত, সেদিন বেচারি তড়িতা কোন্ সনয় এ অঞ্চল হইতে সরিয়া পড়িত। শেগটা আমাদের নাপাঠাঙা হইয়া আসিলে হাঁস হইত, শৈলেন বাস্ত হইয়া উঠিয়া গিয়া গণপরে মানমুখে আসিয়া বলিত “কি পাষও আমি—নিজের খেয়ালেই চেষ্টায়েছি। তড়িতের ত কোন রকম গোলমাল সহ হয় না, তার বুকটা কেমন করচে। অবশ্য সে তা স্বীকার করলে না, কিন্তু মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে ত? না ডাই, তোমার মতই হয়ত ঠিক; থাক ও সমক্ষে আর কখন আমি তর্ক ভুলবো না।”

তার পর আর দুচার দিন তর্ক তোলা হইত না; তড়িতার গান শোনা হইত, মন্টুর খেলা দেখা হইত, ছাত্রজীবনের কত স্থখস্থিতি চিত্ত-চিত্র-শালা হইতে বাহির করিয়া আলোচনা করা হইত। আবার একদিন আচম্ভক্য কোথা হইতে কি উপলক্ষ্যে হুসু হাঙ্গরের মত হাঁ করিয়া সেই না-তোলার প্রতিজ্ঞা করা তর্কটা তুলিবার অপেক্ষা না রাখিয়া আপনা হইতে উঠিয়া উপস্থিত! এই জন্তই কথায় বলে যে ‘স্বভাব যায়না মলে।’

তর্কটা কি লইয়া জান? শৈল পুরা “মেট্রিগালিটে”—আর আমি বেশি রকমই “স্পিরিচুয়ালিটে।” কাজেই দুজনের মধ্যে একটা অসামঞ্জস্য ত থাকিবেই। তা’ছাড়া আসল বিবাদ ছিল এই পানেই যে;—শৈল বলিত তাহাকে যাহা বলা হয় সে ঠিক তা নয়। ঈশ্বর সম্বন্ধে তাহার কোনপ্রকার বিবেচ অথবা আগ্রহ নাই। সে মানুষের নৈতিক জীবনকেই মূখ্য মনে করে। প্রেমই মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য, চরম উৎকর্ষ—এই তাহার বিশ্বাস। মনুষ্য যদি ভালবাসা দিতে এবং ভালবাসা পাইতে পারে, তবে তাহার অপর আর কোন সাধনারই আবশ্যক করে না। এ প্রেমের পরাকাষ্ঠা অবশ্য মার্স্‌জোনী ভালবাসা বা বিশ্বপ্রেম। আমার মত অত সহজ নয়। মানুষকে আমি খুব উদারভাবে দেখিতে সাহসী নই। অতি দুর্বাস্ত পত্তর চাইতে মানুষ কোন অংশেই ভাল নয়। তাহাকে হাতে পায়ে শিকল লাগাইয়া চাকুরের পর চাকুরী মারিতে থাকিলে তবেই সে যা একটু স্নেহেরতা থাকিবে।

একটু এলাকাড়া দিয়াছে, কি অমনি উদ্ধাম হইয়া উঠিয়াছে। আমার মত তাই প্রত্যেক নরনারীকে অতি শৈশব হইতে একান্ত কঠোরতার সহিত পালন করিতে হইবে। বৌদ্ধ অথবা রোমান ক্যাথলিক পুরোহিতগণের ‘পেনিটেন্স’ বা আত্মদোষাত্মসন্ধান আমার আদর্শ ছিল। জগতের প্রত্যেক নরনারীরই ঐক্যপাপক্ষালন চেষ্টা করা আমার মতে অবশ্য কর্তব্য। বিবাহ আমার চক্ষে স্বার্থপরতা। বিবাহদ্বারা মানবচিত্ত সঙ্কীর্ণ হইয়া যায়। বিশ্বপ্রেমের যে আদর্শ বন্ধু দেখাইতে চাহেন তাহা এই সীমাবদ্ধ প্রেম দ্বারা গণ্ডিতই হয়। মন ভগবৎভক্তি গ্রহণ করিতে পারেই না। সন্তান এবং সন্তান-জননীর স্নেহ স্বাভাৱ্য গুণ্ডিত্তে উৎক্লেশ চিত্তে কোনও ভ্যাগের ভাব আসিতেই অসমর্থ। এই সকল অকাটা গুণ্ডিত্ত্বা আমি বহুবার প্রমাণ করিয়াছি যে, মাগুবকে আদর্শ মানব হইতে হইলে তাহার চারিপাশে জ্ঞানের, ধর্মের, ভ্যাগের অতি ভীষণ বহিঃশালাইয়া রাখিতে হইবে, অর্থাৎ ব্রহ্মচর্যা, শাস্ত্রাধ্যয়ন আচার, নির্ভা সর্কদা পালনে-নিরত হইতে হইবে। এই সকল বর্ষাবৃত থাকিলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র-দোষকলা তাহার মধ্যে প্রবেশ করিতেই পারে না, এবং তাহারই পক্ষে জগতের সমস্ত ঐশ্বর্য্য তুচ্ছ করিয়া পরমপদপ্রাপ্তি সম্ভব। প্রেম! প্রেম বলিয়া বস্তুতঃ কোন সামগ্রী জগতে নাই। উহা মোহেরই সংজ্ঞান্তর। প্রেমে মানবচিত্তকে সংসারে বিজড়িত করে, ইহারই নাম মায়া। ভ্যাগই প্রকৃত ধর্ম। সমস্ত বিশ্ব হইতে নিজেকে সযত্নে সরাইয়া রাখিবে, দেন কোনখানে একটু ঠেকা-ঠেকি হইয়া পড়ে না, তা হইলেই সব গেল।

শৈশব হাসিত, বলিত “ও তোমার ভুল! শাস্ত্র কখনও অমন কথা বলিতেই পারে না, তুমি বোধ হয় ঠিক বুঝিতে পার নাই।”

আমি রাগিয়া যাইতাম। “ও চিরকালই এসব বড় কথায় হাসে।” শাস্ত্র আমি যেমন বুঝিয়াছি এমন—স্বয়ং বেদব্যাসও বুঝিয়াছিলেন কি না জানি না। তবে শব্দরাচার্য্য বোধ হয় বুঝিয়াছিলেন। আমার সঙ্গে তাঁর কতকটা মতের মিল আছে দেখিতে পাই। তা, শৈশবের দোষই বা দিব কি? ইংরেজি পড়িয়া কয়জনই বা মাথা ঠিক রাখিতে পারে? আর না পড়িয়াই বা কয়জন যথার্থ ধর্মচর্চা করিতেছে?

চঠাৎ একদিন এক বিদ্রোহী ঘটিল। শৈশবের কাছারি ফেরৎ একেবারে আমার ঘরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল “মহু, তোমার শিরোমণিটুক মনে পড়ে?”

“কে শিরোমণি ?” এরকম নাম কোন দিন শুনিয়াছি এমন সন্দেহও করিতে না পারিয়া উত্তর দিলাম “কই না, মনে ত নাই।”

শৈলেন্দ্র গায়ের কোট্টা গুলিতে গুলিতে কহিল “মনে নাই ? সেই যে একবার পূজার ছুটিতে আমরা দ্রুতবে বেড়িয়ে গিরছিলাম। টেনে একটি লোক ও একটি মেরেকে আমরা তুলি—মনে নাই ? মেরেটি খুব স্থলরী, নাম তার লক্ষ্মী। ওরই যজ্ঞনানের মেরে, কেউ নাই বলে উনিই অভিভাবক হয়ে—”

মনে পড়িয়া গেল,—না তা ঠিক নয় মনে ছিলই, যে জন্তু প্রথমে বৃষ্টিতে পারি নাই তাহাই বলিলাম। কহিলাম “ও বৃষ্টিয়াছি, আর বলতে হবে না। সেই ‘বৃষ্টিছেন ত’ না ? তা তার নাম ত শুনি নি। কি হয়েছে তার ? এখানে তার কেউ আছে নাকি ? তুমি তার খবর কোথায় কি পেলে ?”

তাহাদের খবর পাইতে আমার দুর্দম মনটা এক একবার দারুণ উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিয়া ফেলিত। সে জন্তু সে অপরাধী ক্যাপলিকের মত কতবার নিজেই প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছে। তবু রোগের যে জড় মরে নাই, তাহা বৃষ্টিতে পারা গেল।

শৈলেন আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল “ভাতা আজ এক বৎসর প্রায় আমার আশ্রিত। এখানে কিছু দূরে কুলাবেড়ের কাছে ‘মানিক তলাও’ বলে এক দীঘি আছে ; তা’রই শিবমন্দিরে পুরোহিতের দরকার ছিল। হঠাৎ কেন কে জানে আমার ঠার নামটা মনে পড়ে গেল। ঠিকানাও জানা ছিল। তখনই একখানা চিঠি লিখেছিলুম ; চিঠি পাবে কি আসবে, এতও আশা করিনি। হঠাৎ একদিন ভোরে দেখি মেয়ে সঙ্গে শিরোমণি এসে উপস্থিত। সেই অবধি এই থানেই তারা রয়েছেন।”

আমার বৃকের ভিতর জোরে জোরে কি যেন দোলা দিয়া উঠিল। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম “মেয়ে সঙ্গে ? সেই মেয়েটাই নাকি ?”

শৈল আবার আমার মুখের উপর দৃষ্টি স্থির করিয়া উত্তর করিল “হ্যাঁ, সেই লক্ষ্মী। শিরোমণির আর কেউ-ই নেই।”

“তা সে ওর কাছে থাকে কেন ? মাতামহের কাছে যায় নি যে ?”

“মাতামহ মারা গেছিলেন, দেখাও হয় নি। কোথা যাবে, তাই ওর কাছেই আছে।”

“বসন্তবাড়ী গার না কেন ? এ বগসে স্বামীর কাছে থাকাই উচিত ত।”

“বসন্তবাজী থাকিলে ত থাকে । তুমি এঁড়ে গরুকে টেনে দোহার ব্যবস্থা করিয়া দিলে ।” বলিয়া শৈলেন হাসিল ।

আমি ঈষৎ অপ্রতিভ হইয়া বলিলাম “বৃথাচি, বিধবা হয়েছে । তার ঠাই দেয় না ।” শৈলেন্দ্রের পোশাক বদলান হইয়াছিল ; ভাতের হস্তে প্যান্টুলেনটা ছাড়িয়া দিয়া সে একটা চৌকি টানিয়া বসিয়া কহিল “বোঝ নি ; সে বিধবা নয়, কুমারী । আজও তার বর জোটে নি ।”

আমি ভৌতিক ও আধ্যাত্মিক-শক্তি সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিতেছিলাম । এতক্ষণ সেটার পিন গাথা কাগজ নাড়াচাড়া করিতেছিলাম, এবার সেটা সবেগে টেবিলের উপর আছড়াইয়া ফেলিয়া সঙ্গে সঙ্গে টেবিলের উপর একটা সজোরে মুঠাঘাত করিয়া কহিয়া উঠিলাম “ঐ দেখ ! সমাজ আমাদের একেবারে অধঃপাতে যাচ্ছে ! ধর্ম বলে আর কিছু ভারতে রৈল না ।”

শৈলেন ঈষৎ বিস্মিত হইয়া আমার দিকে চাহিল ; জিজ্ঞাসা করিল “কোথায় কি অধর্ম দেখলে ?

“ওঃ হ্যাঁ তা অধর্ম বই কি । গরীবের মেয়ে বলে অমন মেয়ে কেউ নিতে চায় না । আবার এদিকে সবই নিজেদের হিন্দু হিন্দু, বলে চোঁচিয়ে গলা কাটান ! এ গুলো খুব অধর্ম বই কি—একশো বার ।”

“না নেওয়া অজায় বটে, কিন্তু বিয়ে দেবই মনে করলে কি আর বিয়ে এতদিন হয় না । সে রকম ধর্মের ভয় থাকলে কোন্ কালে বরও জুটে যেত । ভাল শিক্ষিত পাত্র বড় লোকের ছেলে এসব গুলোই সহজে জোটে না । জাত থাকে ভয় রেখে যেমন ছোক পাত্র দিয়ে ফেলতেই গড়া গড়া জুটে যায় ।”

“তবে তোনার মত কি অপাত্রে ছোক কুপাত্রে ছোক হিন্দুর মেয়ের নির্দিষ্ট বয়সে বিয়ে দিতেই হবে ? মজুরও কি ঐ মত ছিল ?”

“ছিল বই কি, মজু বলেচেন……কত্না দ্বাদশ বাহিকী, তারপর ত বিয়ে হতেই পারে না । ঐ বয়সেই বিবাহের শেষ সীমা ।”

শৈলু বলিল “তা বলচি না । মজু কি অপাত্রে দেবার কথাটাও বলে গেছেন কোথাও ? যে মজু বলেচেন বালাবিবাহ উচিত, তিনিই ব্যবস্থা করে গেছেন “দেয়া বরায় বিষ্ঠা” বিধান বর না পেলে যাকে তাকে ধরে দিতেই হবে এমন বলেন নি । মজু, শাপ্ত পড়তে হয় ত পানিকটা পড়ে ছেড়ে দিতে নেই, বা কিছু মনে রেখে কতকটা ভুলে যাওয়া ভাল নয় ।”

তাহার শেষ মন্তব্যে একটু চটিলাম । কারণ প্রতিবাদ করিবার কিছু

পাইলাম না। তাই একটুখানি উজ্জ্বল প্রকাশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম “তা এখন আমার তাঁদের খবর নিয়ে কি করতে হবে? আমার ত ঘটকালির ব্যবসা করা অভ্যাস নাই।”

শৈল এবার পূর্ব পানিক হাসিয়া বলিল “তোমার না থাক, আমার আছে। আমিই এবার ও কাজটা করিব নবন করিয়াছি। ভূমিত পূর্ব হিন্দু, ব্রাহ্মণকে জাতিপাত হইতে রক্ষা কর। শাস্ত্র সফল হোক, তুমি লক্ষীকে দয়া করে বিবাহ করিয়া সুখী কর। কাজটা এখন নিঃস্বার্থভাবে করিলেও পারে হৃদয়ঙ্গম আদায় হইবে, একথা আমি বড় গলা করিয়াই বলিতেছি। নিজে যা আছে তার লক্ষণগুলি সুখী না হইয়া থাকিতে পারিবে না দেখিও।”

আমি প্রথমটা তানাসা মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহার কথার স্বরে শেষ দিকটায় বুঝিলাম, সে সত্যই আমার এই অসঙ্গত অসম্ভব অশ্রুতোপ করিতেছে। মনে বড় অভিমান হইল। আমার এতটা খেলো করিয়া দেখিল! এতদিনের সঙ্গর আমি এখন চাড়িলেও চাড়িতে পারি, এমনি তাহার বিশ্বাস হইয়াছে। বিরক্ত হইয়া বলিলাম “আর বর পাইলে না? মেয়েটির বয়স এখন বোধ হয় কুড়ি পার হয়েছে? আর বছর দশেক সবুর কর, তখন বরং পারি ত দেখা যাবে। অত ছোট মেয়ে আমার সঙ্গে ত মানাবে না।”

শৈল মুহু মুহু হাসিতেছিল, কহিল “ভূমিত খোকা নও, তোমার বয়স ছাঙ্কিশ বৎসর হ’ল ত? লক্ষী এই সন্তের বছরের,—নববছরের তফাৎ কিছু কম নয়। যদি এখন তোমার কারও সঙ্গে মানায় ত ওর সঙ্গেই মানাবে। না সতি, অমন মেয়ে সংসারে সর্বদা জন্মায় না। ননি, হাতের লক্ষী পারে ঠেলো না ভাই,—সে সতিই লক্ষী।”

শৈলেনের মুখ প্রশংসায় আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। আমি জোর করিয়া লোভ দানবটাকে গলা টিপিয়া কানু করিয়া একপাশে সেটাকে ঠেলিয়া ফেলিলাম। তাগাই মাহুষের সবচেয়ে বড় শক্তি। সেই মহাশক্তির সাহায্যে নিজেকে জয়ী করিয়া স্বচ্ছন্দভাবে হাসিয়া উত্তর দিলাম “বটক ঠাকুর! ক্ষান্ত হন, এ ভবী ভোলবার নয়, ঠেল কুল চাপিয়ে করবেন কি? বরং যদি একটা চাঁদার খাতাটাতা খোলা হয় তাতে কিছু দিতে টিতে পারি। আজকাল সবচেয়েই ত চাঁদা ওঠান হয়, এতেই বাঁ বাদ যায় কেন? আমার মতে সেটা খুব মন্দ নয়। মেয়ে বড় করে রাখার চেয়ে সেও ভাল।”

শৈল একটু ছাপিতভাবে কহিল “আচ্ছা তোমার ভাগের পাতিরেও এ বিয়ে করতে পার ত ; নিজের স্বর্ণ, রূপ, সঞ্চয় পরের হস্তে ভাগ কর । এর চেয়ে বেশি কে কি ভাগ করতে পারে ?”

আমি বিজয়ী বীরের ছায় সগর্বে কহিলাম “কামিনী-কাঞ্চনই সর্বপ্রদান তাম্রা । ওঁ কথা যাইতে দাও । আমি ত একশো টাকা বড় জোর ভাগ করিতে পারি ।” শৈলেন্দ্র আর কিছুই বলিল না সে বিশেষ ক্ষণ হইয়াছে বলিয়া মনে হইল । আমিও বোধ হয় একটু ক্লান্ত হইলাম,—কিন্তু কি করা যায়, উপায় কি ?

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅনুরূপা দেবী ।

স্বগত ।

এই আমাদের পৃথিবীকে কত ভালবাসি, কত ভালবাসি ! শম্পমণ্ডিত এই শ্রাম প্রান্তর, আকাশের অনন্ত আলোক-প্রসার, বাতাসের অশেষ জীবনানন্দ, সব আমাদের মুগ্ধ করে, সবাই আমাদের প্রলুব্ধ করে, আমার মনপানিকে টেনে নিয়ে চলে ! ভাগ্যে মন একপানি বস্ত্র, একটা বস্ত্র, একটি মাত্র পাত্র নয় । অনন্ত-বিগুক্ত অনন্তত্বীনের গাত্রী সে—অসীম নিয়েই তার স্তম্ভ । তাই সে সব পেলাতেই যোগ দিতে পারে । আকাশের বৃকে ছড়িয়ে পড়ে, পৃথিবীর কোমলভায় আশ্রয় লাভ করে, বাতাসের আনন্দ-উৎসব-নৃত্যের সঙ্গী হয় । কা'কে আমি সব চেয়ে অধিক ভালবাসি ? আকাশ, আলোক, বাতাস না পৃথিবীকে ? সকলকেই বাসি, অথচ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে এক এক জনকে বেশী ভালবাসি, বিশেষ করে, সেই তখন আমার বন্ধু, সঙ্গী, আমার প্রিয়তম হয় । আকাশের বর্ণচাতুরী, মেঘের নরমলীলা, আলোকের প্রেম-অভিজ্ঞান, নক্ষত্রের পত্রলেখা, রক্তরশ্মির অগস্ত-রাগ, আর চন্দ্রকিরণের কোতুক তান্ত্র্য, আমাকে কত মুগ্ধ করে ! আবার আকাশ যখন সব বিলাস পরিহার করে' একেবারে ধার্মী অমিতান্ত হয়, তখন যে আমি তার সঙ্গে একেবারে মিশে, যেতে চাই । বাতাস হিম্মোল ডুলে, পত্র পল্লব ছলিয়ে, পুষ্প গন্ধ বহন করে, যখন চারিদিক হ'তে ছড়িয়ে ধরে, ভালবাসে, আসন্ন করে, চুলের উপরে নিঃশ্বাস ফেলে, বৃকের মধ্যে প্রবেশ করে, তখন তাকে

কি প্রত্যাখ্যান করা যায় ? কিন্তু যখন সে প্রায়শ্চিন্ত বাক্যে, তাড়ন-
নৃত্যে ছুটে আসে, সমুদ্রের তরঙ্গ সব আছড়ে পড়ে, অরণ্য উত্ততবাহু
হয়ে হাঁহাকার শব্দ করে, 'আকাশ-পৃথিবীর ব্যবধান ভরে' ওঠে, তখনই তাকে
আমি যথার্থ ভালবাসি। তখনই আমার সমস্ত মন নিঃশেষে তার সঙ্গে
মিশে যায়। পৃথিবীর বুকের উপর ধাতুসজ্জী যখন স্থান বিলাস উন্মিলিত
হ'তে থাকে, চুর্নাকুণ্ডে রোমাঞ্চিত হয়, সিঁদু হরিত-লাবণ্যে চক্ৰচুটি ছড়িয়ে
যায় ; তখন হেসে, মুখ নেড়ে, ঠেলা দিয়ে তাকে বলতে ইচ্ছা করে, 'চল
অনুসন্ধান, খবর ভালত ?' ভই সপির মত, পা ছড়িয়ে, চুল এলিয়ে, বোসে
পিঠ দিয়ে বসে মনের কথা কইতে সাধ যায়। কিন্তু যেদিন গ্রীষ্মের
নিবারণ নিঃখালে, তার শম্পমাধুরী শুকিয়ে ওঠে, স্থানলতা পাণ্ডুলিখে
পরিণত হয়, যেদিন সে ধূসরে পরিবাসনা, এক-বেণী-দরা বিরচিনী, সেই
দিন সে আমার অন্তরের সমস্ত মহাহুঁকুতি আকর্ষণ করে নেয়। পঞ্চতপা
যে করেছে, সেই তাপিতের বাণা জানে, স্মৃতি যে, সে কি সে কথা বোঝে ?

চড়কের উদ্বেগন করে' গ্রীষ্ম আসে। চৈতালি শুকিয়ে ওঠে, চম্পকের
ভীত গঞ্জে আকাশ স্তম্ভিত হয়, কঁদুরশ্মিতে আকাশের কটাত্তে, বাসনার সব
দাসস্বীয় পাণ্ডু হয়ে আসে। বোমাকেশের জটীর মধ্যে গঙ্গার প্রচুর দাগাও
ক্ষীণ হয়ে যায়। তখন শব্দিত চিত্রে, কম্পিত হস্তে, জপমালা গুলিয়ে কেবলই
বলি, শিবশস্ত্রো, শিবশস্ত্রো। যিনি একান্ত মনে সে সময় পঞ্চতপা করেন,
তারই জীবনে পরে পতিতপাবনীর পূর্ণা প্রাচীন অব্যাহত হয়। আকাশের
উদাস ভয়রাগ ধূমে দিয়ে, নিবিড় সিঁদু নীলিনার মাধুরী জেগে ওঠে ; কেতকী
সৌরভে কাননপথ, মিলন মুখা রাধিকার মত নিরন্তর রমনীয় মনে হয়
আর পয়বনে কলহংসের সঙ্গীত, নিকুঞ্জবনে নৃত্যপরিচয় নরতর মৃচ্ছ-
সংবাদিনী কেকার, রাগিনী আলাপ স্বকৃত হয়।

শীতের দীর্ঘ রাত্রিতে যদি ভয় হয়, গ্রীষ্মের সুদীর্ঘ দিন ত' আরও
চরম। তার আলময়ী তীব্রতা কেমন করে সহ্য হবে ? শীত ত দূর্য্য করে
আসে, কুয়াশা টেনে দিয়ে, স্বপ্ন দেখবার অবসর নেয়। কুয়াশা করণার
মত মনের মধ্যে হুমধুর স্পর্শস্থখ সঞ্চার করে, চন্দ্রালোক দানবের মত
স্বপ্নভীত, তার কোড়কুড়িও সমাদি-স্তম্ভিত হয়ে আসে।

শীতের স্বদীর্ঘ রাত আর গ্রীষ্মের স্বদীর্ঘ দিন শুটুই মনে বিভীষিকা সঞ্চার করে, কেমন করে রাত কাটাবে, কি উপায়েই না দিনটি ভরে উঠবে ? রাতের ব্যাকুলতার মধ্যে একটি মায়াবী আভে, নিশ্চল অন্ধকার মনকে উদ্বাস করে, চঞ্চল করে না। আকাশের কাল চোখের গভীর শাস্ত নতদৃষ্টি, স্নেহের আশ্রয়ের মত মনকে ক্রমে অনলগ্নন এনে দেয়। জেগে জেগে চারিদিকেই কেমন এক অ'কুট সঙ্গীত শোনা যায়। যুগস্থ পাণী এক একবার জেগে উঠে, নিদ্রিত, অতি মৃদু স্বরে গান করে, আবার কণিকের মধ্যে সে টুকু দূরিয়ে আসে। মনে হয় যেন জেগে-ওঠা ছেলেকে না যেমন কপালে হাত দিয়ে আন্তে আন্তে স্পর্শ করে' বুকের কাছে টেনে নিয়ে, আবার যুগ পাড়িয়ে দেন, এসেও যেন কেউ তেয়ি করলে। শুন্তে পাই বাগানের মধ্যে ইন্দুর আনা-গোনা করছে, অতি ভীত ভাবে, অতি চকিত পদক্ষেপে, ক্রমে তাও আর শোনা যায় না। রাত্রি যত গভীর হয়, পৃথিবী তত অধিক নীরব হ'তে থাকে—মনের মধ্যকার বাণী, অশান্তি, ব্যাকুলতা যেন প্রসারিত হয়ে কোন স্তরে মিলিয়ে যায়। যেখানে গিয়া তার শেষ হয়, সেখানে অশেষ নীরবতা, অনন্ত ধ্যান, অনির্বচনীয় শাস্তি। তখন কে আমার আছে, কে আমার নাই, কি পেয়েছি, কি পাইনি, কি হ'তে পারত তা হয়নি, সে সকল কোন কথাই মনে থাকে না। মনে হয় হৃষ্টের আদিম রহস্যের কাছাকাছি গিয়া পৌঁছিয়াছি—হর্গোদয়ের সঙ্গে পৃথিবীর জাগরণ আসবে, আমারও জাগ্রত স্বপ্নের অবসান হবে।

আর দিনের ব্যাকুলতা, নিঃসঙ্গতার কষ্ট বড় ভয়ানক, চারিদিকে যখন জীবন-উচ্ছ্বাস জাগ্রত, শত শত তরঙ্গ আকোষে তটভূমিতে আঘাত করছে, চারিদিকে প্রাণের নৃত্য, বাতাস ছুটে চলেছে, গাছপালায় অশ্রান্ত নর্যর, সূর্য্যালোকের অজস্র প্রপাত, পাণীর গান অবিরত মধুর, কত ডাকাডাকি, জানাজানি, কত পরিচয়ের পরিপূর্ণতা, তখনও যে পরিতাপ, বার্থ, অনাদৃত তার কি যন্ত্রণা! কল্পা পাতাও যখন উড়ে চলে, সে যে তখনও সমাধিত, নিশ্চেষ্ট, শ্রিয়মান; লালকারে তার সমস্ত মন ভরে ওঠে, অথচ চোখের জলের লেখা দিয়ে সে ভাষা সে প্রকাশ করতে অক্ষম। হয় এই শুধু নিরাশ উপায়তীন অবস্থা বড় ভয়ানক!

মানসী ।

প্রতি-স্মৃতি

প্রথমেই বলিয়া রাখি রাজপ্রাসাদে আমার জন্ম হয় নাই এবং জন্ম উপলক্ষে দান, ধান, পুন্ডা, ন্যেংসব, সে সব কিছুই হয় নাই—দরিদ্র ব্রাহ্মণের পর্ণকুটারে আমি জন্মিয়াছিল। আমি পিতামাতার একাদশ সন্তান—আমার জন্মে তাহার আনন্দিত হইয়াছিলেন কি না একথা বলা কঠিন নয়—দরিত্রের গোষ্ঠী পূর্ব আনন্দদায়ক কি না সে বিষয়ে শাস্ত্রকারগণ যৌক্তিক রচনা করিয়া তাহাদের মতামত দিয়া গিয়াছেন, সুতরাং আমার মতামতের কোন আবশ্যক এখানে নাই। নাটোর রাজবংশে পুত্রসন্তান না থাকায় পোন্ডপুত্র রাণিয়া বংশধরকার ব্যবস্থা করা হয় এবং জ্যোতির্বিদদের গণনায় আমি দীর্ঘজীবী; আমার জন্মসময়ে বৃহস্পতি একাদশ, শনি তৃতীয় এবং রাহু তুর্নী থাকায়, রাজবংশের উপযুক্ত বংশধর আমিই—এইরূপ সাবাস্ত হইয়া গেলে আমার চৌদ্দ বাস বয়সের সময় মহাসমারোহে পুত্রোত্তি যাগ করিয়া আমাকে রাজসংসারে আনা হইয়াছিল, এইরূপ শুনিয়াছি। এক নিমেষে দরিত্রের সন্তান আমি রাজমন্ডল হইয়া গেলাম। আমার রাশিচক্রের সঙ্গে মিলাইয়া অনন্ত এহ নক্ষত্রাদির সংস্থান, কোণায় কিরূপ ছিল কে জানে, তবে রাজধানীর জ্যোতির্বিদ্র জনবহু আচার্য্য আমার রাহু তুর্নী বলিয়া আমাকে এক মুহূর্তে অরুণোদয়ী রাজপ্রাসাদের তুল্ল শিখরে চড়াইয়া দিল। সেই অবধি ব্রহ্মময়ী, সর্বসহা, সম্প্রীর্ণা ধরিতরী স্রুথময় স্পর্শ হইতে আমি বঞ্চিত হইয়াই আছি। আজও তাহার সুদর্শনতল অধরে শুইয়া চক্ষু বজ্রবার অবসর আমার হইল না! শৈশবের অনেক কথা লোকবশে শুনিয়াছি, তবে শোনা-কথা আদালতে চলে না, প্রামাণ্য নয়; ইতিহাসেও শোনা-কথা আজকাল চলিতেছে না শিলালিপিতে বাহা উৎকীর্ণ হয় নাই, তাহা বিখ্যাত মহে এই নত আশ্চর্য্য কাল চীৎকার করিয়া সকলে জ্ঞাপিত করিতেছেন। তাই আমার শিলাকঠিন মনের উপর যে কথাগুলি ধোদিত হইয়া আছে, তাহাই লিপিবদ্ধ করিতেছি। অতি শৈশবের চ'একটি কথা মনে থাকে, আমারও আছে—রাজধানীর কুপুত্রোদিত বশিষ্ঠের স্থলাভিষিক্ত চন্দ্রকান্ত বিখ্যাত্রয় মহাশয় আমার পঞ্চম বর্ষ বয়সের সময় সন্ন্যাসী পুণ্ডার দ্বন্দ্ব ক্রন্দন করিয়া আমার 'হাতে খড়ি' দিয়াছিলেন, সে কথাটি আমার মনে আছে। হৃৎ-কথা লোকে শীঘ্র ত বিস্মৃত হয় না।

বাঙ্গালা দেশের প্রথা ত্রীপক্ষমীর দিনে কুহুম ফুলে রঙান কাপড় পরে সবাই পরে, ত্রী-পুরুষ-নির্ধ্বিণেবে পরে । আমিও মা'র কাছে কাঁদিয়া আবদার করিয়া, (উপদ্রবও বৃষ্টি বা করিয়াছিলাম) 'ছিলি-পচুমি'র দিনে পীতাম্বর পরিয়া আমার খেলার সাথী ছোট্টদিদির কাছে গরুভরে আনার পীত-ত্রী দেখাইতে ছুটিয়াছিলাম, তখনও জানি না পুরোহিত ঠাকুর আনার হিতের ভুল 'হাতে খড়ি'র ব্যবস্থা সেই দিনেই করিয়াছেন । ত্রীপক্ষমীর দিন অনদ্যায় চিরপ্রথা—নিষিদ্ধ দিবসে বিজ্ঞাতৃগণ মহাশয় কেন আমার বিজ্ঞানস্তুত করাইলেন বলিতে পারি না—ভয়ত বা তাহারই ফলে বাগ্‌দেবতার করুণা আমার প্রতি হইল না—জ্ঞানের আলোক মনের মধ্যে জলিয়া উঠিল না—পাঁচবৎসর বয়সে মনের আঁধার যেনন ছিল, তদপেক্ষা আজ কিছু কমিয়াছে এমন ত মনে হয় না, বরং অন্ধকারের পর অন্ধকার মনের মধ্যে আরও পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিতেছে—সে আঁধারে পথ চলা হুঃসাধ্য ! জীবন-পথ লে বড় বন্ধ !

হাতে প্রকাণ্ড একখানা চা-খড়ি দিয়া পুরোহিত ঠাকুর আনার হাত ধরিয়া 'ক' হইতে 'ঙ' পর্য্যন্ত পাচটি বর্ণ সেদিনকার মতঃশিখাইয়া দিলেন । বিজ্ঞানস্তুতা যত সহজে নিষ্পন্ন হইল, বিজ্ঞাটা অত সহজে আয়ত্ত করা বন্দি যাইত, তবে বৃষ্টি বা আঁধারও বিজ্ঞা হইতে পারিত । লোকে কথায় বলে আরস্তুটাই কঠিন, একবার আরস্তু হইয়া গেলে শেষ কোনমতে হইয়াই যায়—সব বিষয়ে এ কথা খাটে না, অস্তুতঃ আমার বিজ্ঞাশিক্ষা বিষয়ে এ কথাটা নোটেই খাটে নাই—আরস্তুটা আমার অতি সহজেই হইয়াছিল, কিন্তু শেষের দিকটা বড় কঠিন হইয়া আসিয়াছিল, সে কথা মণীহানে যথোপ-যুক্ত সময়ে আমার পাঠকপাঠিকাদিগকে শুনাইব । পাঁচবৎসর বয়ঃক্রমের এই একটি কথাই মনে আছে, আর কিছু মনে নাই ।

তার পর ছ' এক বৎসর গেলে আমার অভিভাবকবর্গ আমার বিজ্ঞাশিক্ষার নিমিত্ত বিশেষভাবে বন্দোবস্ত করিবার নানাবিধ আয়োজন করিতে আরম্ভ করিলেন । বাড়ীতেই একটি ছাত্রগৃহস্থ স্কুল স্থাপিত হইল এবং নিকটস্থ কয়েকখানি গ্রামের 'ভদ্রসন্তান'—সংখ্যায় প্রায় পাঁচ সত্তর জন হইবে—ঐ স্কুলে আসিয়া ভর্তি হইল ; আমরা সকলে যথাকালে প্রতিদিন স্কুলঘরে সমবেত হইতাম, বেতন দিতাম, বেতও খাইতাম—দিনগুলি, মাসগুলি, বৎসরগুলি, যত শীঘ্র অগ্রসর হইতে লাগিল আমার বিজ্ঞা তত শীঘ্র অগ্রসর হইতে

পারিল না। সন্ধ্যা তিন চকলা, সরস্বতী যে পক্ষ সে তথা আমিই বোধ হয় প্রথমে আবিষ্কার করিলাম। যে কয়টি শিক্ষক আমাদের শিক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহাদের শিক্ষা কতদূর হইয়াছিল সে পরিণাম করিবার মত কন্যতা আমাদের ছিল না, তবে তাঁহাদের শিক্ষা দিবার প্রণালী এবং শাস্তির বিধান আমাদের মননস্ত মোটেই নয়—বালকের প্রসারিত দক্ষিণ হস্তের তালুর উপরে জলস্ত অঙ্গার রাখা, পড়া না পারিলে ভীমকল দিয়া হস্তভাণ্ডা বালককে কানড়াইবার ব্যবস্থা করা, সর্ব্বক্ষেত্রে বিচুটি ঘসিয়া দেওয়া এই সব অভিনব অথচ স্মৃতি বাহ্য সবুজ রক্ষা করিবে এক্ষণ শাস্তি তাঁহারা অনেক জানিতেন। এই সমস্ত কারণে স্কুলের ছাত্রসংখ্যা ক্রমে কন হইতে আরম্ভ করিল, ছাত্রবেতন যথারীতি এবং উপযুক্ত পরিমাণে সংগ্রহ আর হয় না। অত্যাশ্র ছাত্রের অভিভাবকেরা যখন এই পণ্ডিতনামধারী রবি-মন্দনের অমুচরদিগের মায়াবনমতার সঠিক খবর পাইতে লাগিলেন, তখন নিজ নিজ সম্ভ্রামণিকে তাঁহাদের পক্ষপন বর্ষে পদাৰ্পণ করিবার বহু পূর্বেই স্কুল ছাড়াইয়া নিলেন—“দশবর্ষানি তাড়য়েৎ” এই নীতিবাক্য মানিয়া চলিবার মৈত্র্য আর তাঁহাদের রহিল না—সমস্ত স্কুলের নদ্যা রহিয়া গেলান আমি এবং ঐ পাঁচটি শিক্ষক। আমার পলাইবার উপায় নাই এবং শিক্ষক মহাশয়দের ঘাইবার আর দ্বিতীয় স্থান ছিল না, স্মৃত্যু আর এবং আমার পক্ষ শিক্ষক মুখোমুখী হইয়া দাঁড়াইলাম, পরীক্ষা চলিতে লাগিল—এক ছাত্রের পাঁচ শিক্ষক হইলে ছাত্রের প্রতি সরস্বতী এবং ধর্ম্মরাজের নদ্যা কার দয়া আগে হয়। এই সমস্তার কোনরূপ সম্ভ্রামণক নীমাংসা হইবার পূর্বেই এক অভাবনীয় ঘটনা ঘটিল—আট বৎসর তিন মাস বয়ঃক্রম কালে আমার ছোট চক্ষুই অন্ধ হইয়া গেল, সেই রক্ত নাষ্টার মহাশয়েরা তার পরে কোথায় গেলেন, তাহা সঠিক বলিতে পারিব না, কারণ এই রূপময়ী নগনদীগ্রাম-নগর-শোভিতা শঙ্কল্পশালিনী বসুন্ধরা আমার চক্ষুর উপর হইতে কোথায় সরিয়া গেল, অনন্ত জ্যোতিষমণ্ডিত সৌর জগৎ যেন নিমেষে নিবিয়া আমার চতুঃপাশে এক অন্তহীন অন্ধকারের সৃজন করিল, আমি সেই অন্ধকারে ভুবিয়া গিয়া কি ভাবিলাম সব কথা এখন মনে নাই।

ঠিক উহার অব্যবহিত পূর্বে আমার উপনয়ন হয়, আত্ম আর উপনয়নের পর দ্বাদশবর্ষব্যাপী গুরুগৃহবাসের ব্যবস্থা নাই, দ্বাদশ দিবস একটি ঘরে বদ্ধ থাকিয়া গার্ব্বজীটা কোন মতে শিখিয়া লইতে পারিলেই বেদাধ্যয়ন,

ত্রক্ষবিজ্ঞা লাভ সবই হইয়া যায়—আনিও উপনয়নের পর একঘরে বদ্ধ হইয়া হবিষ্যার ভোজন করিয়া এবং গায়ত্রী মুখস্থ করিয়া আমার গুরুসেবা বৈশ ও ত্রক্ষবিজ্ঞা সব শেষ করিলান। ফলান্ন মাসে আমার উপনয়ন হয়, সেই সময় দোলবাড়া—আমাদের গৃহদেবতা জ্ঞানহুন্দরের কল্মষোৎসব খুব মনোরোহেই সেই সময় নিশ্চয় হইত, আবার, শুণালের চড়াচড়ি নাটোর সহরের রাস্তাঘাট সব একমাস পর্যন্ত লালে লাল হইয়া থাকিত, লোকের পরিষেয় বস্ত্রের রঙ উঠাইতে রজকের প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ উপস্থিত হইত—পঞ্চম দোলের দিন আমার নিভৃত বাসের যন্ত্রণার অবসান হইল—একে একাকী একঘরে দ্বাদশদিন বসবাস করা আমার মত লোকের পক্ষে স্বকঠিন, তার উপর দোলের উৎসবে যোগ দিতে না পারায়—আবীরে আপাদমস্তক লাল করিয়া আনন্দের উদ্দামনার মধ্যে দিব্যরাত্রি অতিবাহিত করিতে না পারায়, আমার যে কষ্ট উপস্থিত হইয়াছিল তাহা ঐ বয়সের বালক ভিন্ন অপরের বুঝা সহজ নয়। যে দিন ছাড়া পাইলাম সেই দিন পঞ্চম দোল, সেই দিনই আমাদের বাড়ীর দোলের শেষ উৎসব—আমি ছাড়া পাইবামাত্র আমার কাপড়ের পুঁটে আবীর ও কুঙ্কম লইয়া বাহির হইলান, ঘনানাহারের সময়েও সেদিন আনাকে ধরা এক কষ্টসাধ্য বাপার হইয়াছিল।

চক্ক-উৎসব ত নিটিয়া গেল কিন্তু তাহার পরদিবস আমার দুই চক্ক লাগ হইয়া উঠিল, সকলে বলিল আবীর চ'পে গিয়া ওরূপ হইয়াছে, আনলকীর জল বা গোলাপ জল দিয়া চক্ক ধুইয়া দিলে ভাল হইয়া যাইবে। না সেইরূপষ্ট করিলেন, কোন ফল হইল না। সে পর্যন্ত আমাদের বাড়ী ডাক্তারী চিকিৎসা প্রবেশ লাভ করে নাই। আমার পিতামহী, না, সকলেরই ধারণা ডাক্তারী ঔষধনাহেই মস্তের সংশ্রব ছাড়া হয় না, হুতরাং ডাক্তার ও ডাক্তারী ঔষধের সংস্পর্শে যাহাতে বাড়ীর কেহ না আসিতে পারে - তৎপ্রতি তাঁহাদের সতর্ক দৃষ্টির অভাব ছিল না। আনাদের বাড়ীর প্রাচীন কবিরাজ ঐশ্বরচন্দ্র সেন মহাশয় আয়ুর্ক্বেদনতে আমার চক্কর চিকিৎসা আরম্ভ করিয়া দিলেন, কত প্রকারের পুট, প্রলেপ, বস্তির ব্যবস্থা হইল, কিন্তু ব্যাধি কোন বাধাই নানিল নী। তাহার পূর্ণ প্রকোপের ফলে একদিন প্রাতে উঠিয়া চক্ক চুড়িয়া দেখি আমার পরিচিত পৃথ্বী কে গেন একখানি স্বপ্ন জাল দিয়া আবরণ করিয়া দিয়াছে, সবই আমার চক্ষে দোয়ার মত বোধ হইতেছে। শীতের কুয়াসা স্বর্ণোষ্যে দূর হইয়া যায়, কিন্তু এ কুয়াসা দূর

হইল না। তিন চারি দিনের মধ্যে আমার দৃষ্টিশক্তি একেবারে বিলুপ্ত হইল, কিছুই আর দেখিতে পাউ না। অপরের সাহায্য বাড়ীত এক পাও নড়িবার সাধা নাট। মা আচান করাইয়া দিতেন; যেখানে বসাইয়া রাখিতেন, সেইখানেই নিরুপায় হইয়া বসিয়া থাকিতাম। মাষ্টরের আনাগোনা পরশকে অশ্রুমান করিয়া নিতে হইত, উয়ার অরুণোদয় ও সন্ধ্যার সূর্যাস্ত বিচক্ কাকলিতে আমার কলনার বিষয় হইয়া উঠিল; বৈচিত্র্যময়ী ধরণীর সমতুলান, চোক-জুড়ান বিচিত্ররূপ আমার চকুর সমুপ হইতে কে যেন মুছিয়া ফেলিয়া দিল। এইভাবে আমার দিন কাটিতে লাগিল; প্রাতে, সন্ধ্যায় জালাবদধাময় ঐশ্বর্য মা আমার চক্রে দিয়া দেন, তিনিই আচান করাইয়া বেন, আর দিবসরাত্রি নিবিড় অন্ধকার আমার চুই চক্রেত ভরিয়া নিয়া আমি নিশ্চলভাবে একস্থানে বসিয়া থাকি। রোগের কোন উপশম দেখা গাইতেছে না তথাপি চিকিৎসার পরিবর্তন হইল না, সে ক্ষুদ্র বালক আমি, আমার মনে কোবরূপ ভংগ কষ্ট অধৈর্যের লেশমাত্রও ছিল না, বসন্ত যনের দোসর মাষ্টার পণ্ডিতের কাছে পড়ার জন্ত নির্ধন প্রহর পাইতেছি না সে ক্ষুদ্র মনে আনন্দ একটু হয় নাট এমন কথা বলিতে পারিব না। ইতিপূর্বে অনেকবার জরজানা হইয়াছে ও সারিয়া গিয়াছে, এ পীড়াও সারিবে সে বিষয়ে আমার মন নিঃসংশয় ছিল, তবে যত বিলম্বে সারে সেই ভাল শিকার জন্ত শিককের অনাশ্রয়িক তাড়না বালকের মনে কি বিভীষিকারই স্ফূর্তন করিয়াছিল যে তাহার পরিবর্তে আফ্রাও তাহার কাছে রাখা মনে হইয়াছে। আমার জনক তখনও জীবিত ছিলেন। কার্যান্তরে তিনি স্থানান্তরে যান, সেই সময়ে আমার এট চক্ষুরোগের সূত্রপাত হয়। তিনি বাড়ী ফিরিবারাত্রই আমার জননী বলিলেন “ব্রজের চকুর পীড়া হইয়া চুই চক্ষুই প্রায় নষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছে, সে কিছুই দেখিতে পায় না, তুমি একবার রাজবাড়ী গিয়া তাকে দেখিগা আইস এবং যাহা করা উচিত কর; তুমি বাড়ী ছিলে না, তোমার বিনামূল্যে ব্রজকে দেখিতে আমি রাজবাড়ী যাউ নাই।” এইখানে বলিয়া রাণি, অন্নপ্রাশনের সময়ে পিতামাতা আমার নাম “ব্রজনাথ” রাখিয়াছিলেন এবং তাঁহারা যত দিন জীবিত ছিলেন আমাকে ঐ নামেই ডাকিতেন। আজ আমি গাঠার অকৃত্রিম স্নেহের স্ফূর্তিকণে জীবনকে বচনীর বলিয়া মনে করি,— কেবল একমাত্র সেই স্থান হইতেই এই স্নেহের ডাক পাই, আর সকলে রাজধানীর প্রদত্ত আমার “জগদ্বিজ” নামই জানে। পিতা আমার জুনীর মূগ হইতে এই নিদারুণ ভঃসংবাদ পাইয়া তখনই রাজবাড়ী আসিলেন; আমি যেখানে স্থান

মত বসিয়া থাকিতাম সেইখানে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন “এজ, তোমার চক্ষু কেমন, কিছুই কি দেখিতে পাওনা ?” তাঁহার কণ্ঠস্বর বিকৃত মনে হইল, তখনও বুঝিতে পারি নাই তিনি কষ্টে রোদন সত্তরগ করিতেছিলেন, তাই তাঁর কণ্ঠ অমন বিকৃত শুনাইয়াছিল। যখন উত্তর শুনিলেন “আজ্ঞা না, কিছুই দেখিতে পাই না, আপনাকেও দেখিতে পাইতেছি না”, তখন সেই বয়স্ক, জ্ঞানী, তেজস্বী, নির্ভীক, প্রোঢ়পুরুষ, তাঁহার সর্লকনিষ্ঠ পুত্র এই নিতান্ত হুর্ভাগাকে বকে চাপিয়া ধরিয়া বালকের মত কাঁদিয়া উঠিলেন। বয়স্ক লোককে কাঁদিতে সেই আমি প্রথম দেখিলাম, তখন আশ্চর্য্য হইয়াছিলাম, আজ আমার সে সংস্কার দূর হইয়াছে, আজ বুঝিয়াছি বয়স্ক লোককেও কাঁদিতে হয়, এবং সে কাঁদা বড় মন্থভেদী।

কবিরাজী চিকিৎসায় ফল হইতেছে না, স্ত্রীরাঃ ডাক্তারী মতে চিকিৎসা করাইয়া একবার দেখা উচিত, এই প্রসঙ্গ লইয়া আমার পিতামহীর সহিত আমার জনকের বচসা হয় এবং তিনি আমার পীড়ার যথারীতি চিকিৎসা যাহাতে হয় সেই বাবস্থা করাইবার জন্ত জেলায় ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট তৎক্ষণাত্ রওনা হইয়া যান এবং আনুপুঙ্খিক মনস্ত ঘটনা তাঁহাকে বলিয়া সিভিল সার্জেনসহ ম্যাজিষ্ট্রেটকে নাটোরে সঙ্গে করিয়া আনিয়া আমার চক্ষু পরীক্ষা করিয়া দেখান। সিভিল সার্জেন মত প্রকাশ করিলেন যে পীড়া পূর্বে সামাজ্যে হইয়াছিল, যথারীতি চিকিৎসা না হওয়ায় এবং অথেষ্ট চক্ষু এখন নষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছে; অবিলম্বে কলিকাতা গিয়া চক্ষুরোগের প্রসিদ্ধ চিকিৎসকের দ্বারা চিকিৎসা করাইলে অপেক্ষাকৃত উপকার হইতে পারে। সিভিল সার্জেন এর মত অল্পসারে ম্যাজিষ্ট্রেট আদেশ দিলেন ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বালককে কলিকাতা পাঠান চউক—কোম্পানী বাহাদুরের হুকুম অনাঙ্গ করিবার শক্তি কাতারও নাই, বিশেষ ম্যাজিষ্ট্রেট নাটোরে বসিয়া রহিলেন, আমার কলিকাতা যাত্রা দেখিয়া তবে জেলায় ফিরিয়া যাইবেন—এমন অবস্থায় আর উপায় কি ? ডাক্তারী ঔষধে মণ্ডের প্রক্ষেপই থাকুক, আর রেলপথে গমনাগমনে ত্রাস্কেণের জাতিনষ্টই হউক এই অন্ধ, ব্রাহ্মণ বালককে, কলিকাতায় পাঠাইতেই হইল।

সে দিনে নাটোর পর্য্যন্ত রেল হয় নাই, পাকী, নৌকা প্রভৃতি যানের সাহায্যে কুষ্টিয়া আসিয়া তবে রেল পাওয়া যাইত। রাজধানীর প্রাচীন দেওয়ান বাদবচস্র মৈত্রেয় এবং পুরাতন শি বামা ও চাকর রামলালকে সঙ্গে দিয়া আমার পিতামহী ও মা আমাকে কলিকাতা পাঠাইলেন। সেই আটবৎসর চরমাস

বয়সের সময়ে আমার আত্মীয়-সম্পর্ক-শুভ্র বিদেশবাসের ঘটনা হয় ; পরোপদ্রষ্টার সঙ্গে সঙ্গে বিদেশই আমার দেশ, অনাধীন্যট আমার আত্মীয়ের বাড়ি হইবে! পাড়াইয়াছে। বিচিত্র ঘটনাময় জীবনকাহিনী যখন লিপিতে আরম্ভ করিয়াছি তখন কেমন করিয়া যে

“পর কৈলু বাড়ির, বাড়ির কৈলু ঘর.

পর কৈলু আপন, আপন কৈলু পর।”

সে কথাও আমার পাতক পাঠিককে ভুনাটবার ইচ্ছা রহিল-- বাঁচিয়া যদি থাকি তবে সব কথাই ভুনাটব।

চিকিৎসার্থ কলিকাতা আসিবার সব বন্দোবস্ত যখন স্থির হইল তখন এ অন্ধ-বালকের মন কলিকাতা দেখিবার আনন্দে উৎকল হইয়া উঠিল। কলিকাতার অনেক কাহিনী লোকমুখে শুনিয়াছিলাম, কখনও দেখিবার সুযোগ ঘটে নাই তাই এ আনন্দ ; কিন্তু হায় চরমুঠ ! বর্শনেক্রিয়চারী হইয়া সমস্ত পৃথিবী যে বহা-প্রলয়ের তমঃসংগরে নিমজ্জিত হইয়া গিয়াছে, হর্বোৎকল বালকের মনে সে ভাবনা একরাত্রও উদয় হইল না ! কোথায় আজ সে সুখময় শৈশব, কোথায় সে অদ্ভুত বাড়ির, যার মোহমগ্নে শত জংগের মধ্যেও আশা, আকাঙ্ক্ষা ও আনন্দ পাণ্ডকের কৃক নন্দনের চিত্তানন্দ নিভাবিকশিত করিয়াষ্ট রাখিয়া দেয় !

ক্রমশঃ

ঐজগদিস্বন্দ্যুপাধ্যায় দ্বার।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

ভারতী চৈত্র—

প্রথমটি জীবিতজ্যোত্স্ন মফস্বতীর “বর্ষ-বিশায়”। দশটি কবিতা কতকগুলি মিল সংগত করিতে পারিলেই যদি কবিতা লেখা হয়, তাহা হইলে এটিও কবিতা। রচনাটি পড়িলেই বেশ হয় বাজালীর কবিতা লিখিবার প্রবৃত্তি সহজাত রচনা ভালই হোক অথবা মন্দই হোক, তাহাকে কবিতা লিখিতেই হইবে। তাহা না হইলে আজ বিজয় বাবু তাঁহার উপযুক্ত রচনা ভাড়িয়া জ্বলের নবীন তরুণ ছেলেদের উপযোগী পদ্যে হাত দিলেন কেন ? কবিতাটিতে নুতনও একটুও নাই

“প্রাণীনে আজ দাও গো বিদায়

বর্ষ হল অবসান

নবোৎসবের বিশ্ববাসে

এম প্রভু তপস্বাম।”

এখানে কবির আর্থনা পূর্ণ হইয়াছে বা হইবে কিনা জানি না, তবে “অজু ভদ্রবান” যে কবির ৬শটি স্তোর করিয়া মিসাইয়া দিয়াছেন তাহা স্বক্ষে দেখিতেছি। উক্ত অংশটুকু পাঠ করিলে যুটান পাঠ্রীণের বক্তব্যই মনে পড়িয়া যায়। অনর্থক লক্ষ-প্রয়োগের উদাহরণ কবিতায় দেখেই আছে।

জ্যোতির্বিজ্ঞানঃ মানুষের “আধুনিক ভারতবর্ষ” স্থাপিত। বাঙ্গালা সাহিত্যের জন্ম ঐহারা দীরবে অংশসা ও আদরের অপেক্ষা না করিয়া প্রকৃত পরিশ্রম স্বীকার করি-
য়াছেন, জ্যোতিবাসু তাঁহাদের মধ্যে একজন। বাঙ্গালা সাহিত্যকে মৌলিক রচনার
ধারা ও নানা দেশ হটতে অলঙ্কার সংগ্রহ করিয়া তিনি যে ভাবে সম্বদ্ধ করিয়াছেন
সেজন্য অনেকেরই পায়ের নাই। বাঙ্গালা সাহিত্য তাঁহার নিকট চিরকল্পী থাকিবে।
জ্যোতিবাসু এখনও তাঁহার উপযুক্ত আদর ও সম্মান লাভ করেন না, ইহা তাঁহার হৃদয়
কি বেশবাসীর হৃদয়, তাহা বলিতে পারি না। হাই হোক “কালোহাং নিরবধিবিপুল
চপুখী” এমন একদিন আসিবে, যখন তিনি যাপনার প্রাণ বিনা চেষ্টায় আদায় করিতে
পারিবেন।

“বজ্রচক্র ও দীনবন্ধু” ঐক্য প্রবন্ধে ঐপূর্ণচক্র চট্টোপাধ্যায় বজ্রচক্র ও দীনবন্ধুর
সম্বন্ধ কয়েকটি কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এরূপের অনেক কথাই পূর্বে প্রকাশিত
হইয়াছে। লেখক নতুন কথা যোগ বলিয়াছেন, তাহারোম্বিকাংশই বজ্র ও দীনবন্ধু
দ্বারা জীবনীতে স্থান পাইবে না। লেখকের কয়েকটি কথা আমরা এখানে উদ্ধৃত
করিয়া দিলাম—

(১) সর্বদাই উভয়ে উভয়কে পর নিধিতেম গরের ধারা বিজয় করার অভিযান
তাঁহাদের তিনদিনই ছিল। দীনবন্ধু একবার কাছাড়ের এক জোড়ী হুজাপা জুতা বজ্র-
চক্রকে পাঠাইয়াছিলেন ও তাহার সহিত একখানি তিন কপাল পত্র লিখিয়াছিলেন “বজ্র
কেমন হুতা ?” বজ্রচক্র লিখিয়াছিলেন “তোমার মূলের মতম।”

(২) বজ্রচক্র যখন বেণুয়া (কাঁথি) মহকুমায় ছিলেন, তখন একজন সন্ন্যাসী
কাপালিক মধ্যে মধ্যে নিশীথে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিত। এই ঘটনাই তাঁহাকে
“কপালকুণ্ডলা” লিখিতে প্রবৃত্ত করে।

(৩) দীনবন্ধুর নীলাবতীতে বজ্রচক্র স্থানে স্থানে লিখিয়াছিলেন।

(৪) পরোপকার দীনবন্ধুর জীবনের রত্ন ছিল। সাধারণ কাজে কর্মেও তাঁহার
এই গুণটি প্রকাশ পাইত। একবার তিনি একটি মাতালকে ধামা হটতে উঠাইয়া
সবুদ পদ্মবা স্থানে পাঠাইয়া দেন। এই মাতালট “সমবার একদশীর” ভোলা মাতাল।

নারায়ণ চৈত্র—

ঐপূর্ণচক্র ঐক্যোপাধ্যায়ের “পৌরানিকী কথা” এবার তন্ত্র ও ভক্তিসূত্রের কথা
যায়ে। লেখকের বিজ্ঞতা ও পাণ্ডিত্যের উদাহরণ এরূপের অনেক স্থলেই পাওয়া যায়।
লেখক বলিতেছেন—পুরাণে তাত্ত্বিক সিদ্ধান্ত অসুসারেই বহু ঐশ্বর্য্যিক এবং উপাধ্যায়
রচিত হইয়াছে। বিদ্বৎসম্মত এবং দেববাসী আশ্রয় মিলনচৌ হইতেই উপা-

সময় উৎপত্তি। উপাসকের কার্যসিদ্ধির অগ্রট চিত্রয় জাননয় অধীতীয় অথও অশ্রীতী
 রত্নের রূপ কল্পনা করা হইয়া থাকে। আত্মই দেবতাকে পরিহার করিয়া যে বাহিরের
 দেবতার উপাসনা করে সে ত্রাস্ত একথাও তত্ত্ব বলিয়াছেন। সৰ্ব্বাঙ্গে দেহেই আত্মাকে
 চিনিতে পারিলে বাহিরের বিখ্যাতকে ঠিকমত চেনা যায়। ইহায় অগ্র দীক্ষা আবশ্যক।
 যন্ত্রের দ্বারা দীক্ষা হয় যন্ত্রকণের এভাবে চিত্তবৃত্তির নিরোধ হয়, তত্ত্ব বলিয়াছেন “অপাৎ
 দিচ্চিঃ।” এসম্বন্ধেই লেখক বলিয়াছেন “আমাদের বাঙ্গালা দেশে আজ কালি যেমন গুপ্তদ্বী
 প্রতিমা পড়াইয়া পূজা করা হয় পূর্বে এমন ছিল না। পূর্বে বাঙ্গালার হিন্দু যন্ত্রের
 পূজা করিতেন। রাজা জগজ্ঞান রায়ের সময় (১৪৭ শতাব্দী) হইতে বাঙ্গালা আধুনিক
 এগারমত ঘূর্ণোৎসব প্রচলিত হইয়াছে। বৃহত্তর বৃহৎ কালী পড়াইয়া পূজা আগমবাণীণ
 কৃষ্ণানন্দ (১৬ শতাব্দী) ঢালাইয়া থিয়ারেন। জগজ্ঞানী পূজা মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের
 সময় হইতেই প্রচলিত হইয়াছে। প্রতিমা পড়াইয়া সরস্বতী পূজা বোধ হয় সত বৎসরের
 অধিক হইবে না। তারপর লেখক বলিয়াছেন মাতীর মূর্ত্তি আরম্ভা নিষ্ঠাণ করি বটে, কিন্তু পূজা
 করি আত্মার—আত্মশক্তির। ঐশ্বর্যবাদ, ঐশ্বর্যবাদ, বিশিষ্টঐশ্বর্যবাদ ঐশ্বর্যঐশ্বর্যবাদ—এমন
 কত বাদই আছে; পুরাণ সকল বাদের সমাহার; যে বাদের অঙ্গকূল বচন চাহিবে,
 উহাতে তাহাই পাইবে। পুরাণ সভা মিথ্যা লইয়া চিত্তিত মনেন; পুরাণের কেবল দুটি
 সিদ্ধান্তের দিকে, রসোন্মেষের দিকে, তথা নির্ণয়ের দিকে। পুরাণ লোকশিক্ষার গ্রন্থ;
 সমাজ শাসনেরও গ্রন্থ। পুরাণে প্রধানতঃ এই কয়টি বিষয়ের আলোচনা আছে;—
 (১) ঐশ্বরের বিশ্বাস (২) একনিষ্ঠা (৩) ঐশ্বরে মহাব্যবহার আরোপ (৪) ঐশ্বরে
 ইষ্টদেবতার সাধকের সর্গস্ব নিবেদন (৫) সমাজগর্ভ বা সমাজশরীরের ধর্ম কেমন
 হওয়া উচিত, তাহার বাধ্য (৬) ফলকৃতি।

“অন্তর্গামী” কবিতাটি অশ্রুটি। অল্পকথায় অধিক ভাব ব্যক্ত করা পদ্যে প্রশংসনীয়
 হইতে পারে, কিন্তু কবিতায় তাহা একান্ত অপ্রয়োজনীয়।

পথগামি মাথি আণ ইতি উতি চায়,

পথের না দেখা পেয়ে কোঁদে উভরায়।

কোথা পথ, কোথা পথ, কোথা পথগামি

সে পথ বিছনে যেণো, সব মিছা মাঝি।

এদিকে ওদিকে চাই, চকিত পরাণে,

পাপলোর মত ধাই পথের সজ্ঞানে,

এই পথ দেখি ভাবি পেয়েছি পেয়েছি,

এ পথ দে পথ নয়, এ পথে গুণসেতি।

ইহা পদ্য বটে, কিন্তু কবিতা নয়। কাশীরাম কবিতারদের আনন্দের চক্ষু ও ভাষা
 লেখক বেশ অঙ্কুরণ করিয়াছেন।

জীহবাসাদ শাস্ত্রী “বৌদ্ধধর্ম” শীর্ষক গ্রন্থেই বলিতেছেন “বৌদ্ধধর্মের মতামত, আচার-
 বাসনার অনেকটা পূর্বসিদ্ধি হইতেই আসিয়াছে। বুদ্ধ পূর্বসিদ্ধির লোক। এইখানেই
 আত্মত্যাগ, হস্তিগত, জ্ঞানগত, অর্থগত, সাংগত উৎপন্ন হয়। আত্মগত ঘন

হুসনা বেশ আকর্ষণ করিয়া তাহার রাজা, সমাজ, আচার, ব্যবহার, নীতিনিতি সব ভাঙ্গিয়া তাহারিগকে আর্ঘ্যসভ্যতা দান করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন, সেই সময়ে তাহাদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন বর্ষসম্প্রদায় উঠিতে লাগিল। শেষে সব বর্ষ উঠিয়া গিয়া এক বৌদ্ধবর্ষই পূর্বভারতের অতীত গৌরবের সাক্ষী দিতে লাগিল। সাহায্যে বুদ্ধের বর্ষ এত বড়, সাহায্যে বুদ্ধের নাম এত বড়, সাহার জন্ম বুদ্ধের সংসারে এত সম্মান, সাহার জন্ম সকল বর্ষ অপেক্ষা তাঁহার বর্ষ এত উপর, সেটি তাঁহার মর্যাদা প্রতিপন্ন করণ যথাসম্মান চল, বাড়ানো করিও না।" Aristotle তাঁহার উদ্ভাবিত Golden Mean এ এই মর্যাদা প্রতিপদের আভাস দিয়াছেন। তিনি বুদ্ধের বহুপূর্বের আদৃত হইয়াছিলেন। কাজেই এই মর্যাদা প্রতিপদের উপর বৌদ্ধবর্ষের আসন নির্মাণ করিলে বিশ্বের বর্ষ ইতিহাসে তাহা খুব উচ্চ বলিয়া পরিগণিত হয় না। আশা করি শাস্ত্রমতায় বৌদ্ধবর্ষের মহত অল্প দিক দিয়াও দেখাইবেন।

"আরও কিছু আমার কথা" শ্রীজগদ্বা দেবীর প্রবন্ধ। আজকাল বাজালা দেশে লেখিকাদের নামের সংখ্যা বড় অর্ধ নয়। তাঁহাদের মধ্যে অনেকের লেখনীয়তা সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সুতরাং গ্রীসোকের রচনা সমালোচিত হইবার দিন আসিয়াছে একথা আমার মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি। এই প্রবন্ধটির ভাষা অপরূপ, কোথাও কথোপকথনের ভাষা, কোথাও সাধুভাষা—রচনা লিপিল, উচ্ছৃঙ্খল, অসংযত। ইহাকে পদ্য বলিব কি পদ্য বলিব, তাহা ঠিক করিতে পারি না। ভাষার কতকটা নমুনা তুলিয়া দিতেছি—“আজ আমার মুখখীতে এক অলৌকিক স্নিগ্ধ আভা দেখে, কে যেন অনিবেশ নয়নে আমায় নির্দীপ্ত করছেন, তার আমি হ্রীবিজিতা মুষ্কার মত জীড়ানত হয়ে এক অপরূপ আত্মপ্রসাদ জন্মদ্রব করছি। আমি তাই আজ রূপের উপঘাতিকা, পরশের পরিচারিকা, রসের নবনাটিকা। আজ মোবন আমার কদবিহারী, গন্ধ আমার মনোহারী, শব্দ আমার ভাণ্ডারী আর আমি চণ্ডে আছে আমার চুরারের ভিখারী, দূরে ঠাঁড়িয়ে অভিমান ‘হরিচন্দ্র ওমরি’।”

আরও একটু উদ্ধৃত করা অবশ্যক মনে করি—

“কে একে এমন বেওয়ারিসি খাল করে দিলে? তার যখন উজ্জ্বল আছে যায় : একে ভালে, গড়ে, পাঁপে, লোড়ে, সাফায় গোফার, ফের দেখনা দেখতে চায়। না করে এরা আমার আপত্তে হিজাম। না জানিয়ে যায় যাবার বেলা! ছাতি যেন একটা সাক্ষী গোপাল পড়ে। আমার ছিল একখানা খুঁসে পর, ছিলাম আমি তাতে পরীবা হালেতে, না তা হোলনা কর, কর, একে বড় কর, কর কর, একে মনোহর কর সাজাও দিয়ে মৌলিক সাজে, পাও হাক লাগিয়ে সবায় আক।”

এই অদ্ভুত রচনাটি উদ্ধৃত করিবার লোভ সামলাইতে পারা যায় না। যাক্ একথা। এই রচনার মধ্যে লেখিকা কতকটা দার্শনিক কথা (সমুজ্ঞপ্ত বাহা যানে যানে ফুটাইয়া তুলিতেছে) প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। প্রকৃতির একটা স্বতন্ত্রতা আছে, এই স্বতন্ত্রতাকে যদি কেহ জাগাইয়া তোলে তাহা হইলে সে দেখিতে পাঠবে জ্ঞানের সহিত প্রকৃতির বিরোধ নাই, প্রকৃতিকে যে বাদ দেয়, সে মুর্থ। পেনিকী উত্তম পুরুষের প্ররোপ করিয়া, প্রকৃতির কথাগুলিই প্রকাশ করিয়াছেন। কোষমত্রে ভাষায়-জাল ছিন্নকরিত

পারিলে ভাবে আসিয়া ঠেকিতে হয়। ভাবটি অনেক স্থলে অস্পষ্ট, বেশ হয় লেনিকাও তাহা সম্যক্ জনপ্রসন্ন করিতে পারেন নাই। এ ধরণের রচনা বঙ্গভাষায় আজকাল সংখ্যায় বাড়িয়া উঠিতেছে। যাহারা সাহিত্যরসী উদ্বোধক এসকলকে অশ্রয় দিতেছেন, যত নাহাতে এমন রচনা একটা সত্যক পথ অবলম্বন করিতে পারে, তাহার উপায় নির্দেশ করিতেছেন না। ফলে কতকগুলি উজ্জ্বল, অসংগত রচনা বাচিত হইতেছে, যাহাতে সাহিত্যের কোন উপকার হওয়ার চেয়ে অসুকার হওয়ারই সম্ভাবনা বেশী। রচনার মধ্যে যতটুকু দার্শনিক কথা থাকে না কেন, অলংকার শাস্ত্রে ক্ষণি বলিয়া একটা জিনিষ আছে যাহাকে হাজার বার পদপলিত করিলেও তাতা বাঁধা তুলিয়া কাড়াইতে যায়। লেনিকা তাহা ধরিতে না পারেন, আমাদের দেশের সম্পাদকেরাও যদি এ বিষয়ে উদাহরণকে একটু সাহায্য করেন তাতা চইলে বাঙ্গালার মাসিক পত্র এত অশাঠী রচনা প্রকাশিত হয় না।

“বংশীধ্বনি” ঐক্ককল্পের রায় চৌধুরীর কবিতা। কবি পিঙ্গমিস্বর্ণাচম করিয়াছেন ভাল, তবে বড়ই চণ্ডের পিঙ্গম যে এমন বস্তু লইয়াও তিনি এ কবিতায় একটুকু বাধুর্গ প্রকাশ করিতে পারেন নাই। বীজকে কবি বাক্য উদ্ভাদনা বলিয়াছেন। বৈদ্যন কবিতার কেহ জীবিত থাকিলে আধুনিক কবির এই বাণ্যায় মিথ্যেই মুগ্ধিত হইতেন। কবিতাটি অত্যন্ত দীর্ঘ। চন্দ্র লালিত্যের অভাব।

ঈশ্বরকৃষ্ণ দোশাল “বাঙ্গালার আদি নাটক” শীর্ষক গ্রন্থে বলিতেছেন “বাঙ্গালা ভাষায় আদিনাটক “ভদ্রার্জুন” মহাভারতের ভূতভাষ্যের কাহিনী লইয়া রচিত। নাটকখানির সূত্র সূত্রে ক্রিয়া (action) কিছুই নাই। নাটকের পাশ্চাত্তী প্যায়াদি ফল্ট কথোপকথন করিতেছে, অতি অল্প স্থলেই খন্দো কথোপকথন আছে। একখানি কাব্যের পংক্তিগুলি কথোপকথনজালে লিপিলে ঘেরণ হয়, নাটকখানির অধিকাংশ স্থলই সেইরূপ। নাটকেতিত ক্রিয়া বা কীদন্ত চরিত্র সৃষ্টি ভদ্রার্জুনে নাই। চরিত্রের মধ্যে বসদেবের অভিমান, ভীমেও ক্রোধ ও মারদের কমচ-পরায়ণতা প্রদর্শিত হইয়াছে। ভৌপলী চরিত্র আদৌ ফুলে নাই। সভ্যভাষা ও কল্পিনী চরিত্রের মধ্যে ষাতস্ত্র লক্ষিত হয় না। কেবল রমণীধনের কথোপকথন ও ক্রিয়াকলাপ অঁকিতে থিয়া নাট্যকার সেখানে উদ্বোধন সমসাহয়িক বঙ্গমহিলাভিত্তি আকিয়া ফেলিয়াছেন, সেই স্থলগুলি এই হিসাবে চুই হইলেও বেশ স্বাভাবিক হইয়াছে।” ইহার পর লেখক “ভদ্রার্জুনের” বিশদ সমালোচনা করিয়াছেন।

“ঐক্ককতবে” লেখক এবার বুঝাইয়াছেন “ভাব ও ভাষার মধ্যে যে নিগূঢ়, মিথ্য বাস্তবায়ন, অজ্ঞানীসম্বন্ধ দেখিতে পাই, তবে ঐক্ককের সঙ্গে পৌরাণিকী কল্পনার ঐক্ককেরও সেই সম্বন্ধ। পুরাণের ঐক্কক কল্পিত বটে, কিন্তু অসত্য নহে।”

ভারতবর্ষ, চৈত্র—

“অজন্তা” ঈশ্বরলালদাস বন্দোপাধ্যায়ের গ্রন্থ। লেখক প্রত্নবিদ্যার দিক হইতে অজন্তার কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। অজন্তার চিত্রগুলির বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। সাহিত্য-রস না থাকিলেও প্রত্নতত্ত্ব-অভ্যুসন্ধিভূর নিকট ইহার আসর হইতে পারে।

ঐগিরিলাভাধ মুশোপাধ্যায়ের “বার্ঘপ্রভাত” ও “বার্ঘসন্ধ্যা” শীর্ষক কবিতা দুটির মধ্যে সর্বদা মাধুর্য্য আছে । ভাবের নূতনত্ব না থাকিলেও ইহার সহজ ভাবটি অত্যন্ত স্পর্শ করে ।

“মধু-স্মৃতি” শীর্ষক এক্ষেত্র ঐগিরিলাভাধ নামে মধুসূদনের অনেকগুলি ইংরাজী কবিতা প্রকাশ করিয়াছেন । কবিতাগুলি পূর্বে Madras Circulator পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল । “১৮৮৮-৮৯ খৃষ্টাব্দে Circulator পত্রে তাঁহার ‘A Vision, Captive Lady’ প্রভৃতি কবিতাবলী প্রকাশিত হয় ; সে সকল কবিতায় তিনি নিজ নামের পরিবর্তে, “Timothy Poupoeum Esq. এই চন্দ্রনাম ব্যবহার করিতেন ।” লেখক কয়েকটি ভিন্ন কবিতাও উদ্ধৃত করিয়াছেন—তন্মধ্যে একটি কলিকাতার লিখিত প্রেমশিলাসামূর্ণ কবিতা, আর একটি সাদির পারস্য কবিতার অনুবাদ মগর দুইটি চতুর্দশশতী কবিতা । “মাস্ত্রাজে থাকিতে ‘Anglo-Saxoa and the Hindus এবং মগর দুই তিন খানি ক্ষুদ্র গদ্যকাব্যও তিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন । ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে ইংরাজী সমিতির দ্বারা “রিভিউ” নামক একখানি নাটকও তিনি লিখিয়াছিলেন, কিন্তু প্রকাশ করেন নাই । এই ইংরেজী কবিতাগুলিতে মধুসূদনের কবিত্বশক্তি কতটা স্পৃহিতলাভ করিয়াছে তাহা লেখক কর্তৃক উদ্ধৃত কবিতাগুলি পাঠ করিলে অনুমান করিয়া লওয়া হুঃসাধ্য নয় ।

ঐতিহাসিকভিত্তি বিদ্যাভূষণ “কবি রাজশেখর” নামক এক্ষেত্র আতীত সংস্কৃতকবি রাজশেখরের সংকিত্ত পরিচয় ও তাঁহার প্রচলিত নাটকগুলির উপস্থাপনভাণ্টুকু প্রকাশ করিয়াছেন । আশা করি লেখক ভবিষ্যতে কবির নাটকগুলি সমালোচনা করিয়া পাঠকগণকে সুখী করিবেন । লেখকের ভাষা কিছু ভারাক্রান্ত । একটু মন্থতা তুলিলান—

“পাঠক, নিশ্চয়মানে শুকতারার উচ্ছলতা কি লক্ষ্য করিয়াছেন, কৃষ্ণগন্ধের ঘোর অন্ধকার ; পাছের কোল, মদীর কূল, বনের পথ, প্রকৃতির সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ,—সকল শোভা দেওয়া সাধিয়াছে ; এমন সময় শুকতারার উদ্ভিত তইয়া অন্ধকারের নিবিড়তা অগম্যায়িত করিয়া কিরণে প্রকৃতির হাস্যময়ী শোভা প্রকাশিত করে, তাহা লক্ষ্য করিয়াছেন ? রাজশেখরও সেইরূপ অলৌকিক কবিত্বের কিরণজটায় সংস্কৃত সাহিত্যাকাশে অলৌকিক করিয়াছিলেন ।”

লেখক যে লিখিয়া দেন দেওয়া ধনা হইয়াছেন, আশা করি আধুনিক বাঙ্গালার পাঠকেরা তাহা দেবতার দৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হন নাই । আজকাল অল্প কথাকে ফেনাইয়া লিখিবার বা পাঠকসাধারণকে জ্বলের জ্বলের মত সুখাইবার দিন কাটিয়া গিয়াছে ।

গৃহকল্যাণী ।

ভূষণহীন নলিন-দীনা এস আনার প্রিয়া,
সিঁছা নাহি লক্ষ্য কিসের কান্তর কেন দিয়া ?

গন্ধতলে কেশে তোমার

টেঁকা খোঁপা চাইনা আঁরাব,

এলোকেশে, অমনি এসে দাঁড়াও রমণীয়া,
আনতা অঁকা, সাবান মাখা নেই বা চলো প্রিয়া !

গয়না পরা আজ হবেনা আসতে হবে পুলি',
শুনতে না চাই ঠৈরীকরা ময়নাপড়া পুলি ।

সত্য কথা,—সরল কথা,
শুনতে প্রাণের ব্যাকুলতা,
বুঝতে তুমি পাবে নাক গায়ের পায়ের ধূলি,
গয়না যদি থাকে ধায়ে আসতে হবে পুলি' ।

সাজ করাও মইবনাক সোণার দেহময়
অরুন্ধতীর বেগমসাজা সহ নাহি হয় ।

রঙীন-করা ফুলের দেহ,
ভাল কি চায় বাসবে কেত ?
হরির ভোগে 'আমিন চেরে' অঙ্গ শিহরয় ;
কোন ছেগে গো গোপনকরা আপন পরিচয় ?

রাশ্মিগয়ের চলুদমাথা, ময়লা ভেলে ছলে,
আটপত্তরে কাপড় পরে' অমনি এস চলে'
নথ গেছে ক্ষয় বাটনা বেটে,
কুটনা কুটে, আঙুল কেটে—
চুন-থয়েরে দাগ পড়েছে তোমার করতলে ।
জাকবী ত হবেই মলিন বিশ্বসেবার ফলে ।

তুলসী তলার মণ্ডলীতে, দেব-দেউলের নায়ে,
হাত জ'খানি কঠোর হ'ল গৃহের শত কাজে ।

পবিত্রতার গুণা পরশ,
দেবা ব্রতের ধল হরম
পঙ্কজাজেই সফলতা শক্ত হয়েই রাজে,
গৌরবে আজ চলে এস—মলিন কেন লাঞ্জে ?

হরির পায়ের তুলসীসন মতীর লোহা হাতে,
চকলা সে লক্ষ্মীদেবী পড়লো বাধা যা'তে,

অঁধার চিরে অরণ-লেপা,
সীথে তোমার সিঁদুররেখা,
সতীমায়ের রাঙা পায়ের বন্ধধূলি মাথে
চড়াক ভেগতি, সঞ্চারতি কুটীর আড়িনাতে ।

• ছন্নদেশে নৃত্যে বণে চিন্ধ নাক আমি ?
পলক দিয়ে করলে সোণা আনার নায়ে নাহি
ভাগ্যবতীর পরন রতন,
আয়তীর প্রাণের বচন,—
কত খাঁধার দপণে যে চিন্ছি দিব্যানী
জানি না কোন্ পৃথাকলে তোমার আমি স্বামী ।

ধূপ ত আছে নাই বা হলো সোণার ধূপাধার
চন্দ্রাবতীন বারাগসী, পূণ্য বেশা যার
কাড়াল পতির কাড়াল বদ
রূপ না থাকক—আছে নধু,
সোণার চাপা কি হবে, নাই গন্ধমধু যার
কড়া কিসের কর্তে যদি নাটক্য পাকে তার ।

শ্রীকালিদাস রায় ।

সাহিত্য-সমাচার ।

বংশোত্তর খ্যাতনামা ঐতিহাসিক লেখক শ্রীযুক্ত গ্রামলাল গোস্বামী পণ্ডিত
ঐতিহাসিক উপন্যাস “নরুজাহান” পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে ।

সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত রাণালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ প্রণীত
‘বাল্লালার ইতিহাস’ প্রকাশিত হইয়াছে ।

• ———
শ্রীযুক্ত নকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নূতন গল্পের পুস্তক ‘পরিকণা’
এই মাসেই প্রকাশিত হইবে ।

गान्धी—



आगलिनी
(अकिलिया)

মানসী

৭ম বর্ষ
১ম খণ্ড

জ্যৈষ্ঠ-১৩২২ সাল

১ম খণ্ড
৪র্থ সংখ্যা

শ্রুতি-স্মৃতি

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

নৌকা পাকী রেল এই নানাবিধ যান-বাহনের সহায়তায় কলিকাতায় আসিয়া পহুছিলাম। শোনা ছিল রেলগাড়ী দ্রুত চলে, আগার নিকট তখন রেলের প্রচণ্ড শব্দ ছাড়া গতি যে কিছু আছে তাহা বোধ হইল না, ইহার কারণ যে কি তাহা আমার তখনকার শিশু-মনে ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছুই স্থির করিতে পারি নাই, আজ বৃদ্ধিতেছি রেলে চড়িয়া যখন বাহিরে চাওয়া যায়, বাহুবস্তর কামনিক বিপরীত গতি যখন দেখি, সেই সময়েই আমাদের দ্রুত বা বিলম্বিত গতির অহুত্ব হই। আমি অন্ধ, সুতরাং সে জ্ঞান তখন নওয়া আমার অসম্ভব, রেলগাড়ীর স্পর্শমাত্রই পাইলাম, রূপ দেখা আমার কপালে তখন ঘটিল না। আমাদের সেই চিরশরণীয় ছাত্রবৃত্তি স্কুলে ভূগোল পড়াইবার ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু অনেক বালক ভূগোল আরম্ভ করিবার পূর্বেই শিক্ষকের তাড়নায় গোল আরম্ভ করিয়া দিল, তাহাদের অভিভাবকেরা বিনা গোলে তাঁহাদের বংশধরগণকে স্কুল ছাড়াইয়া নিয়া গেলেন, সুতরাং সে সব বালকের আর ভূগোল পড়া ঘটিল না। সর্বসহা ধরিত্রীর সম্ভান আমি, সব উপদ্রব সহ করিয়া, ছই হাতে অশ্রু মুছিয়াছি, আর এই বহুকারার নগ, নদী, নগর, সহর, ব্রহ্ম, তড়াগ, দ্বীপ, উপদ্বীপ অন্তরীপ প্রভৃতির নাম মুখস্থ করিবার প্রাণপাত চেষ্টার ফলটি করি নাই। সেই সময়ে শিখিয়াছিলাম আমাদের দেশের নাম ভারতবর্ষ এবং সেই ভারতবর্ষের রাজধানী কলিকাতা। রেলগাড়ী হইতে

যেখানে রামলাল দাদা আমাকে কোলে করিয়া নামাইল, শুনিলাম সে স্থানের নাম শিয়ালদহ, নামটা আমার শিক্ত-কর্ণে মিষ্ট লাগিল না। সে কথা কাহাকেও বলি নাই, ভাবিয়াছিলাম, যেখানে কলিকাতার রেল থামে তাহার নাম হয় ত শিয়ালদহই হওয়া উচিত, এবং তাহাই হইয়াছে, আমার কাণে মিষ্ট লাগুক আর নাই লাগুক তাহাতে কিছু আসে যায় না—মাষ্টারের প্রহারও আমার মিষ্ট লাগে নাই, তাই বলিয়া তাহার রদ রহিত ত কেউ করেন নাই, আমার ইচ্ছায় শিয়ালদহ নামই বা বদল হইবে কেন? এখন বৃক্ষিতেছি আমার শিক্ত-মন শিয়ালদহ নামের সঙ্গে আপোষ করিয়া কে ভাবে তা'কে গ্রহণ করিয়াছিল, এ সংসারের সবই আমাদিগকে সেই ভাবেই গ্রহণ করিতে হয়, আমার ভাল-লাগা মন্দ-লাগার জন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একটি তৃণ পর্য্যন্তেরও পরিবর্তন সম্ভব হয় না।

পূর্ব হইতেই ভবানীপুরে বাসা স্থির ছিল, সেই বাসায় গেলাম, এখনকার যান ঘোড়গাড়ী, সেই আমার জীবনে প্রথম ঘোড়গাড়ী চড়া। এই সব অভিনব বস্তু দেখিবার কি বাগ্ৰতা বালকের মনে উপস্থিত হয়, তাহা নিজ নিজ বালা-জীবনের দিকে একবার ফিরিয়া চাহিলে সকলেই বুঝিবেন; কিন্তু আমার কোতুলক যত বড়ই কেন হউক না, সে কোতুলক পরিতৃপ্ত করিবার উপায় ছিল না—আমি যে অন্ধ! অভিনব সকল বস্তুর উপরেই হাত বুলাইয়া তাহার রূপ অল্পতবে বুঝিবার চেষ্টা করিতাম। ঘোড়গাড়ীর ভিতরে যখন আমাকে বসাইয়া দিল, আমি আমার চারি পার্শ্বে হাত বুলাইয়া যথাসম্ভব মোটামুটি তাহার রূপটা দেখিয়া লইলাম। ঘোড়ার গায়ে হাত বুলাইবার দরকার হয় নাই, কারণ পল্লীগ্রামে আমার জন্ম এবং বাস, গরু ঘোড়া ভেড়া বাদর অনেক দেখিয়াছি—আজ সহরেও অনেক দেখিতে পাই, তবে সে কথা সাহস করিয়া বলি না।

যে দিন কলিকাতায় পহুছিলাম সেই দিনই বন্দোবস্ত করিয়া তার পর দিন কলিকাতা মেডিকেল কলেজের সুপ্রসিদ্ধ চক্ষুরোগের চিকিৎসক Dr Jonesকে আনান হইয়াছিল, তিনি আসিয়া সে দিন কি একটা ঔষধ কয়েক ফোটা চক্ষুঃদ্রব্য গেলেন, বলিলেন পরদিন চক্ষু পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন। ডাক্তার সাহেব অবশ্য ইংরাজীতে কথাবার্তা কহিয়াছিলেন, আমার ছাত্রবৃত্তির পাঠ্যের সঙ্গে যদিও ইংরাজী শিক্ষার সূচনা হইয়াছিল, কিন্তু প্যারিচরণ সরকারের Second Book of Reading, Beginner's grammar

আর Blookman's Geography বলে খাটি ইংরাজের অঙ্কশূট উচ্চারণে ভ্রুণা বার্তা বলিবার ইংরাজী ভাষা বুঝিতে পারি এ পরিমাণ জ্ঞান আমার হয় নাই, ডাক্তার সাহেবের সমস্ত কথাবার্তার ভাবার্থ প্রাচীন সেওয়ান বাদব মৈত্র মহাশয়কে রাজধানীর ইংরাজী সেরেস্তার “কেরানী” রামকানাই তলাপাত্র বাঙ্গালা করিয়া বুঝাইতেন, আমি সেই সময়ে এসব তথ্য সংগ্রহ করিতাম এবং Dr Jones-এর সঙ্গে তখন কলিকাতার ইংলিশ চঙ্ক-টিকিংসক বাঙ্গালী লাল মাধব ডাক্তারও আমার চিকিৎসায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহার কাছেও ডাক্তার সাহেবের মতামত সব শুনিতে পাওয়া যাইত। পর দিবস ডাক্তার সাহেব বেলা দুইটার পর আসিয়া প্রায় দুই ঘণ্টাকাল আমার চঙ্ক নানা ভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে লাগিলেন, পরীক্ষার এই “নানা ভাব” অবশ্য আমি চঙ্ক দিয়া ত দেখিতে পাই নাই, তবে আমার চক্ষেরই যখন পরীক্ষা, কখন আমাকে দাঁড় করাইয়াছে, বসাইয়াছে, হাত ধরিয়া বারান্দায় নিয়াছে, আবার অন্ধকার কক্ষে প্রচণ্ড একটা প্রদীপের নিকট বসাইয়া আলোর দিকে আমার চঙ্ক দিয়া চক্ষের সম্মুখে কি একটা ধরিয়া তীব্র আলো আমার চক্ষের উপর ফেলিয়াছে, যাহার তীব্রতায় আমার অন্ধ চঙ্ক হইতে অবিরল জল পড়িয়াছে। এইরূপ প্রায় দুই ঘণ্টা পরীক্ষার পর ডাক্তার সাহেব চলিয়া গেল, সে দিনের মত আমি নিষ্কৃতি পাইলাম। পরীক্ষান্তে লালমাধব বাবু মৈত্র সেওয়ানের নিকট সাহেবের মতামত বাঙ্গালায় যখন ব্যাখ্যা করিতেছিলেন, সেই সময়ে আমার কক্ষে আমি একাই বসিয়াছিলাম, কারণ রামলাল দাসা এবং বামাদিদিও আমার প্রতি রেহবশতঃ লালমাধব বাবুর মুখে আমার ভবিষ্যৎ অদৃষ্টলিপি শুনিতে গিয়াছিল। অন্ধের প্রবণ ও স্পর্শশক্তি প্রথর হয় ইহা বোধ করি সকলেই জানে, কিন্তু সে বিষয়ে আমার যেরূপ জ্ঞান, আশা করি, আমার পাঠকপাঠিকাদের মধ্যে কাহারও সেরূপ জ্ঞান নাই এবং প্রার্থনা করি সেরূপ জ্ঞান যেন তাঁহাদের কাহারও না জন্মে। চঙ্ক রোগের সূত্রপাত হইতে প্রায় ছয় মাসের অধিককাল হইয়া গিয়াছে, এই সময়ের মধ্যে আমার প্রবণেন্দ্রিয় বিলক্ষণ প্রথর হইয়া উঠিয়াছিল। কক্ষান্তরে অশুটস্বরের কথাবার্তা আমার কাণে গেল, আমি শব্দ লক্ষ্য করিয়া হাতড়াইয়া একটু অগ্রসর হইয়া কি কথা তাই শুনিতে গেলাম, এমনু কোতূহল আমার প্রায়শঃ হয় না, কিন্তু সে দিন কি খেয়াল হইল, কি কথা হইতেছে জানিবার একটা প্রবল ইচ্ছা আমার যেন পাইয়া বসিল। দৃষ্টিশক্তি যত হ্রাস হইতেছে

শ্রবণক্ষমতা তত প্রবল হইয়া উঠিতেছিল, আমি স্পষ্ট শুনিতে পাইলাম আমার পীড়ার কথাই হইতেছে, মনঃসংযোগ করিয়া শুনিলাম লালমাধব বাবু বলিতেছেন “বড় বিলম্বে এখানে আনিয়াছেন, এখন সম্পূর্ণ আরোগ্যের ডরসা কেহই দিতে পারে না, স্নেহর এ বালকের ভাগ্যে কি লিখিয়াছেন তিনিই জানেন, কিছু দিন পূর্বে আসিলে নিশ্চয়ই এ পীড়া আরোগ্য হইতে পারিত, এ বালক যদি আপনাদের বিবেচনার ক্রটিতে অন্ধ হইয়াই থাকে তবে কি পরিতাপের বিষয় হইবে ভাবিয়া দেখুন।” এই কথা শুনিবার পর দেওয়ানজির মনে কি ভাবের উদয় হইয়াছিল জানি না, আমার মনে হয়, সেই দিন প্রথম আমার এই পীড়ার ভাবনা প্রবেশ করিল, কি এক অজ্ঞাত ভয়ে আমার সমস্ত অন্তর কাঁপিয়া উঠিল, চক্ষুরোগ হইবার পূর্বে একদিন আমাদের খিড়কির পুকুরে ডুবিয়া যাইবার মত হইয়াছিলাম, তখন ঘাটে আমার সমবয়স্ক একজন বালক বাতীত বহুকলোক কেহ ছিলনা, আমি কি ব্যাকুলতার সাহায্যপ্রার্থী হইয়া সেই বালকের দিকে আমার আঁঠুচক্ষু ও বাগ্রবাহু বাড়াইয়া দিয়াছিলাম তাহা আজও আমার মনে আছে। সে দিন লালমাধব বাবুর মুখে চির-অন্ধতার সম্ভাবনার কথা শুনিয়া আমার যেন ঝারোধ হইবার উপক্রম হইয়া আসিল, শুধু বাহু অগতের অন্ধকার নহে, অন্তরের অভ্যন্তরেও কি এক হিম-নীতল অন্ধকারের স্তূপ চাপিয়া বসিল, যাহার নিপীড়নে আঁঠুরে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিতে আমার ইচ্ছা হইল, ছুইবাহু বাড়াইয়া অসহায়ের যিনি সহায়, গতিহীনের যিনি গতি, অশরণের যিনি শরণ, ঐহারি চরণের কৃপা বাচিয়া এ বালকের মন কেমন করিয়া কি প্রার্থনা জানাইল, তাহা প্রকাশ করিবার ভাষা আছে বলিয়া আমি জানি না। চন্দ্র-স্বর্ঘ্যের উদয়ান্ত, দিগন্তের হরিত শোভা, প্রাকৃট পুষ্পের অপক্কপ স্নেহমা, নয়নাভিরাম পূর্ণচন্দ্রের অমৃতময় চম্রিকাপ্লাবন, কিছুই আর দেখিতে পাইব না! সংসারের একান্ত মেহমরী জননীর মুখও দেখা আমার ভাগ্যে আর ঘটিবে না! এসকল কথা এমনি করিয়াই তখন মনে আসিয়াছিল ঠিক তাহা নহে, তবে যাহা মনে আসিয়াছিল তাহার সারমর্ম ঐরূপ। উদয়-অরুণিমা চারুপূর্ণিমা, প্রাকৃট প্রহনের অপূর্ণ লাবণ্য অপেক্ষাও শোভা-সৌন্দর্য্যবন,—প্রিয়ং প্রিয়তর আর একখানি মুখ দেখিবার সৌভাগ্য ভবিষ্যতে আমার হইবে এবং অত্য়করণে না হইলেও কেবল সেই অস্তই আমার চক্ষু রোগের উপশম হইতেই হইবে লেখা তখন জানি না।* লালমাধব বাবুর

মুখে যে দিন চির-অন্ধতার সজাবনার কথা শুনিয়া মনের মধ্যে বিষম বিভীষিকার সঞ্চার হইয়াছিল, তার বছবৎসর পরে এক দিনের এক শুভসন্ধ্যায় উজ্জল সাধনাক্ষত্রের মত, গুরুা একাদশীর নয়নাভিরাম শশিকলার মত আমার পরম প্রিয়দর্শনকে দেখিয়াছিলাম, সেই দিনের সে অমৃতপ্রলেপ যথার্থ আমার দেহমনের অন্ধতা দূর করিয়াছিল, সেই দিন সত্য সত্যই আমার চক্ষুরোগের উপশম হইল, ধরাভ্রমরীর মধুময় রূপ সে দিন আমার চক্ষে অপূর্ণ মাধুর্য্যে ভরিয়া উঠিয়াছিল ; আমার সোভাগ্য যে শৈশবে চক্ষুরোগ হইয়া শৈশবেই তাহার উপশম হইয়াছিল, তাহা না হইলে যৌবনের প্রথম সমাগম সময়ে এক শুভসন্ধ্যায় মাহেন্দ্রলগ্নে, নয়নাভিরাম, পরমপ্রিয়, আমার অদৃষ্ট বিধাতার, আমার-জীবন দেবতার দর্শন লাভ করিয়া জীবন আমার কেমন করিয়া ধস্ত হইত ? যার দর্শন লাভে জীবন ধস্ত হইয়া গিয়াছে তাহাকে না দেখিয়া আমার অন্ধনয়ন ও অন্ধকার জীবন লইয়া কি প্রয়োজনে বাচিয়া থাকিতাম ?

চক্ষু-পরীক্ষার পরদিবস হইতেই ডাক্তারী চিকিৎসার আরম্ভ হইল— সে কি ভীষণ যন্ত্রণা ! চক্ষুর কোঠায় জ্বলন্ত লাগাইয়া রক্তমোক্ষণ, রগে এবং কপালে ফোঁকা তোলা, রগ ফুঁড়িয়া হুতা বাকিয়া সপ্তাহ কাল ঐ হুতা ধরিয়া টানাটানি, নানাপ্রকার আলায়ন্ত্রণার ঔষধ চক্ষুর মধ্যে দেওয়া, এই প্রকার নানা রূপ আত্মরিক চিকিৎসা চলিতে লাগিল। প্রথম কিছু দিন কোন উপশম নাই অথচ চিকিৎসাও মুহূর্ত্তর হয় না, হুতরাং অন্ধ বালকের নিকট ভিষক্ এক বিভীষিকা হইয়া দাঁড়াইল। এইরূপে দিন রাত কাটে—আর সকলের দিন রাত, কিন্তু আমার পক্ষে কেবলি রাত্রি—‘‘অন্ধ জাগ কিবা রাত্রি কিবা দিন,’’ আমার সেই অবস্থা। আনাজ প্রায় একমাস পরে একটু যেন আবছায়া গোছ দেখিতে পাই, সাদা কাপড় পরা মানুষ দাঁড়াইলে বোধ হয় যেন চক্ষুর সম্মুখে একটা কিছু আছে, জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথর রৌদ্রে একটু আলো যেমন দেখা যায় এমনি বোধ হইতে লাগিল, রাত্রে ছোট্ট কেরোসিনের আলো প্রকাণ্ড একটা আকোরহীন অদিকাগের মত যেন বোধ হয়। তখন আমার মনে আশা হইল এই পুরাতন পৃথিবীকে আবার চক্ষে দেখিয়া তাহার সহিত স্নেহঃখের সন্ধ দাঁড়াইবার দিন বৃদ্ধি আসিবে ; তখন আর কাটা, কোঁড়া, বেধা, জ্বোক, বেলেস্তারা কিছুতেই ভয় নাই, একবারে একস্থানে তিনবার বেলেস্তারা দিলে উপকার যদি শীঘ্র গীত হয়, তবে তাহাই করুক আমার মনে এমনি একটা ধরা

উপস্থিত হইল । নিরমিত চিকিৎসা চলিতে লাগিল, ক্রমে একটু একটু অধিক উপকার যেন বোধ হয় এইরূপে একবৎসরের অধিককাল অতিবাহিত হইল । ঔষধের ঔণে চক্ষুর উপরের সাদা পর্দা (ছানি) কাটিয়া গেল, কিন্তু পরিষ্কার দৃষ্টিশক্তি তখনও আসিল না, সোজা পথে মাহুদ যখন ঐপ্সিত ফল পায় না তখন তাহার মন নানা অপূর্ণ পথের আবিষ্কারে নিমুক্ত হয় ; কবিরাজী ডাক্তারী ছই মতেই যখন পীড়া সম্পূর্ণ আরোগ্য হইতেছে না দেখা গেল তখন আমার সঙ্গী অভিভাবকগণ অবধূত, সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী প্রভৃতির দত্ত ঔষধের অমুসন্ধানে ফিরিতে লাগিলেন, ঝাড়া-হুঁকাও চলিতে লাগিল । স্কুল কলেজের নব্য বিজ্ঞার মততা আসিয়া তখনও আমার মনকে অধিকার করে নাই, দৈবশক্তিতে বিশ্বাস তখনও হারাই নাই, স্ততরাং ময় পড়িয়া ঝাড়িয়া যখন বলে “বল, নাই” তখন প্রাণপণ বিশ্বাসে, তেমনি জোরেই বলিতাম “নাই” । কখনও কখনও বিশ্বাসের বলে মনে হইত সত্য সত্যই বুদ্ধি পীড়ার অনেক উপশম হইয়াছে, বুদ্ধি সত্যই ঝাড়া দিবার পূর্বে এবং পরে দৃষ্টিশক্তির অনেক তারতম্য দেখা যাইতেছে । ডাক্তারী ঔষধ চলে এবং তার সঙ্গে সন্ধ্যা সকালে ঝাড়া-হুঁকা মন্ততন্ত্র জল পড়াও চলিতেছে, এইরূপে কিছু দিন গেল । তার পর কালীঘাটের এক সন্ন্যাসীর প্রদত্ত ঔষধ আবিষ্কার হইল, তাহা চক্ষে দিতে হয় । চক্ষুতে অজ্ঞাত ঔষধ দেওয়া উচিত কি না এই লইয়া মৈত্র দেওয়ান ও ইংরাজীনবিশ রামকানাইয়ে খুব তর্কবিতর্ক কিছু দিন চলিল, তারপর স্থির হইল রামকানাইকে গোপন করিয়া সন্ন্যাসীর ঔষধই দেওয়া হইবে । সন্ন্যাসী-প্রদত্ত ঔষধ আমার চক্ষুতে দিবার একান্ত ইচ্ছা মৈত্র দেওয়ানের মনে কেন হইয়াছিল সে কথা তাঁর মুখে এ ঘটনার বহুদিন পরে শুনিয়াছিলাম । রাজধানীর জ্যোতির্বিদ জগবন্ধু আচার্য্য আমার “ঠিকুজি” দেখিয়া দিন ফল কোণী প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহাতে যে বয়সে আমার চক্ষুরোগ হইয়াছিল, সেই বয়সেই গ্রহের ফলে চক্ষুরোগ আমার হইবে সে কথা কোণীতে লেখা ছিল, স্ততরাং আমার কোণী যে ভ্রমশূন্য একথা দেওয়ান মহাশয় নিঃসন্দেহে জানিয়াছিলেন । কোণীর শেষাংশে লিখিত আছে অতীষ্টলাভে বিফলমনোরথ হইয়া দুঃসহ মনঃপীড়ার ফলে আমি গৃহত্যাগ করিয়া যাইব এবং সেই অবস্থাতে বার্কবহীন বিদেশের পাহ-নিবাসে আমার চক্ষুর শেষ নিমেষপাত হইয়া যাইবে । কোণী নিভূর্ণ, (কারণ একটি ফল মিলিয়াছে) আমাকে সন্ন্যাস যখন গ্রহণ করিতেই হইবে তখন সন্ন্যাসীর ঔষধে আমার উপকার হইবার কথা, ভূত এবং ভবিষ্যৎ সন্ন্যাসীর মধ্যে কোন প্রকার

যোগাযোগ থাক। বিভিন্ন নহে ইহাই ঘেহশীল বৃদ্ধ সাধু দেওয়ানের মন স্থির করিবার অকাটা হেতু। অতীষ্টলাভ আমার ভাগ্যে আছে কি না জানিনা, সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে হইবে কি না, তাহাও এখন বলিতে পারি না, তবে একান্ত বিশ্বাসপরায়ণ ঘেহশীল সাধু বৃদ্ধ দেওয়ান যে ইচ্ছায় সন্ন্যাসীর ঔষধ আমার চক্ষে দিয়াছিলেন, তাহার সে মনঃকামনা সিদ্ধ হইয়াছিল। সন্ন্যাসীর ঔষধ পদ্ম-মধুর সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া পাশরার পালক দিয়া আমার চক্ষে প্রয়োগ করা হইল, সপ্তাহকাল অতীত হইবার পূর্বেই আমার দৃষ্টিশক্তি দিন দিন বৃদ্ধি হইতে লাগিল, তারপর যে দিন অপরের সাহায্যবাতীত কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে যাইতে পারি, মাগুষ চিনিতে পারি, পাণ্ডবস্ত দেখিয়া নিজেই আহ্বান করিতে পারি, সে দিনে আমার কি আনন্দ! সে দিন বিশ্বের সবই আমার বন্ধু, চিরপরিচিত চন্দ্র-সূর্য্য, গ্রহ-তারা, বৃক্ষ-লতা, ফুল-পল্লব, দিন-রাত্রি, এ ধরণীর নিত্যন্ত অগ্রাঙ্ক ধূলিকণা পর্য্যন্ত আমার চক্ষে মধুর হইয়া উঠিল। তখন দিনে কত-বার করিয়া যে অকারণে কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে যাইতাম, রাত্রে নক্ষত্র দেখিবার জন্ত কতবার যে বারান্দায় বাহির হইয়া কত দীর্ঘ সময় দাঁড়াইয়া থাকিতাম এবং তারার আলো আমার অন্তরে যে কি আনন্দের আলোক বিকীরণ করিত, তাহা কি ভাষায় বলিয়া বুঝাইতে পারি? আমার পাঠকপাঠিকার মধ্যে যদি কেহ প্রায় দুই বৎসর কাল একেবারে অন্ধ হইয়া দৈনন্দিন জীবনযাত্রার তুচ্ছতম ব্যাপারের জন্তও পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকেন, যাহা না দেখিলে প্রাণ বাচে না, অথচ দেখিবার কোন উপায়ই নাই, এমন দুর্দশায় পড়িয়া থাকেন, তবে তিনিই আমার চক্ষুদানের দিনের অনাময় নিরাবিলু পরম আনন্দ ও গভীর সুখের ধারণা করিতে পারিবেন, সে কথা বলিয়া বুঝাইবার ক্ষমতা আমার নাই। সে দিনের সে আনন্দস্মৃতি আজও আমার মনে স্পষ্ট হইয়া রহিয়াছে। তেমন আনন্দ জীবনে আর একটিবার মাত্র পাইয়াছিলাম, সে দিনও তেমনই ভাবেই সারাবিশ্ব আমার বন্ধু মনে হইয়াছিল, সে নববসন্তের প্রথম সমাগম দিন লক্ষ বসন্তের শোভাসৌন্দর্য্যে ভরিয়া উঠিয়াছিল; নন্দনের সুধা কি তা'ত জানিনা, কিন্তু সে দিন মনে হইয়াছিল, যে আনন্দ-সুধায় আমার আকর্ষণ ভরিয়া উঠিয়াছে, তাহার নিকট মহিত সাগরের সুধাভাও তুচ্ছদ্রুপি তুচ্ছ; সে সুধাভাওের অধিকার লইয়া সর্প বিহঙ্গ দেব দানব যার ইচ্ছা বিবাদ করুক আমার তাহাতে প্রয়োজন নাই, আমার সুধীপাত্রধানি আমারি অধরোষ্ঠের কাছে অক্ষয় হইয়া থাকুক, আমি আমার এই অন্তরের আনন্দ উৎসব এবং পুলকাকিত দেহ লইয়া ব্যক্তি লাভের গৌরবের মধ্যে চিরনির্লিপ লাভ করি।

(ক্রমশঃ)

শ্রীজগদ্বিশ্বনাথ রায়।

কিশোরী

আজিকে বাহুপাশে রচিয়া শ্রামরায় মনে যে পড়ে বহু কথা ;
কৈমনে লুকাতাম গোপন স্বপনের, কিশোরী-হৃদয়ের বাণা,

সেটা কি আজ বধু, করিল বাঁধাতান

কানের পথ দিয়ে মরমে আনচান ?

তখনি করেছিহু এ নারী-হৃদি দান সে কথা বুঝনি কি, প্রভু !

সে কথা বুঝাইতে এতেক আয়োজন ব্যর্থ হয় না ত কতু ।

প্রভাত প্রায় শেষ নিশার হিমময় হৃদিটি কমলের কলি,

মরমে জাগিয়াছে গন্ধনধূরস, আসিতে বাকী শুধু অলি,

যমুনা উছলিলে হৃদয় উছলিত,

কদমসহ দেহ তখনি কাঁটা দিত,

অঁাখি সে তখনি-ই গোপনে সূধা পিত, চাপিয়া রহিতাম জাগি'

তোমাকে লুকাবার ছিল না সাধ প্রভু, তোমাকে ছানাবার লাগি' ।

বুঝনি কি গো সখা, যমুনাভল হ'তে ফিরিতে কেন হ'ত দেবী ?

কেন না আসিতাম গোধন গোঠ হতে গৃহেতে ফিরিতে না হেগি ।

যমুনা তীরে যদি করিতে ভূমি কেলি,

কলসে সাধ করে' দিতাম কেন ঠেলি ?

সে শুধু ভূমি দেখি সকল খেলা ফেলি' সঁাতারি' দিবে ভুলি' বলে

কেন বা যেতে যেতে থমকি' পাড়াতাম সখীরে ডাকিবার ছলে ।

• গাছের শাখা হ'তে কলটি ছিঁড়িবার শক্তি ছিলনাক যেন

গোকুলে কেহ কি গো ছিল না ডাকিবার, তোমারে ডাকিতাম কেন ?

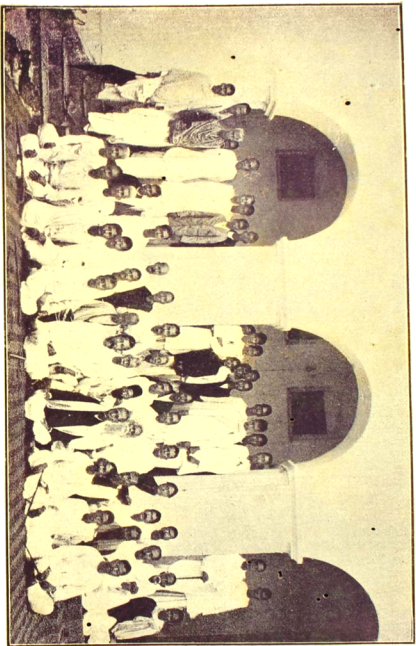
তোমার পাশ দিয়ে যাইতে কেন মোর

• বেতসডালে শুধু বাধিত বাসডোর

বিধিত পথে যেতে, চাহিলে ভূমি চোর, কুশের কাঁটা কেন পায় ?

অন্তরবাণী তব শুনাতে মোরে যেন খেয়লি তাড়া দিত হয় ।

शालाजी—



सन् १९०८ ई. में छात्रों की शालाजी में एकत्रित होने की तस्वीर

বাণীটি শুনি তবে দিতাম ধারে সাজ তোমারি ধ্যান হতে আগি',
 যে পথে তুমি, তথা যেতাম শতবার নয়নে পড়িবার লাগি'
 তোমারে হেরিতাম এমন ঠাঁয়ে স্বামী,
 কেহ না দেখে মোরে দেখিতে পাই আমি,
 আপনা সামলাই যদিও দিবাধামী, সমুখে তব আলু থালু, *
 ভটিনী যত চাহে ঢাকিতে বাহিরিত ততই সৈকত বালু !

মুখ সে মুক হয় বুকেরি মত হায়, এমনি কিশোরীর প্রেম
 আশা সে ভাষাহারা নীরব ধ্যানপারা গোপনে জপ করে কেম ।

দীর্ঘশ্বাস তা'ও শুনিতে পায় পাছে

ফেলিতে, হেরিতাম কেহ কি কাছে আছে ?

চাপিয়া রাখিবারে হৃদয় কাঁপিয়াছে, দু'পিয়া গুমরেছে প্রাণ ;

জীবন এইরূপে গোয়ান কি কঠিন তুমিই কর অহুমান ।

এ সব কথা কি গো বুঝনি তুমি জ্ঞান নিচুর এত কি গো হবে ?

এত যে আয়োজন ছলের আবরণে লাজের অভরণে রবে ?

জাগিত হৃদিকথা গও শোণিমায়

আঁখির ভাষা হতে বেশী কি বলা যায় ?

ছিল না সংশয় কিশোরী অবলাগ, কেহ তা' দেখিত না চাহি'

যদি না বুঝে থাক তুমি গো তাহা তবে রাখিতে হুখ ঠাঁই নাহি ।

ঐকালিদাস রায় ।

প্রাচীন যৌধেয় জাতি । *

পুরাণ মহাত্ম্যের প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে কত অসংখ্য জাতি, জনপদ ও নৃপতিবর্গের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় ; কিন্তু সেই অতীত যুগের ইতিহাস আমাদের নিকট অন্ধকার সমাচ্ছন্ন ; সুতরাং এই সমুদয় আমাদের নিকট একটা নীরস নামের তালিকা মাত্র বলিয়াই প্রতীত হয় । যদি দৈবাৎ ইহাদের কাহারও বিশিষ্ট ইতিহাস অল্প উপায়ে জানা যায়, তাহা হইলে দেখিতে পাই, কত গৌরবময় স্থিতি, কত অভিনব তত্ত্ব, কত অপূর্ণ বীরস্বকাহিনী এই সকল নামের পশ্চাতে লুপ্তায়িত রহিয়াছে—সভ্যতার কত বিভিন্ন দিক-বিশেষ

* উত্তর-বঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলনের রাজসাহী অধিবেশনে প্রণীত ।

ইহাদের দ্বারা পরিষ্কৃত ও পরিপুষ্ট হইয়াছে। এইরূপ একটি জাতির কাহিনী আজ আমাদের আলোচনার বিষয়। এই জাতি ইতিহাসে যোধেয় নামে পরিচিত।

যোধেয় জাতির পুরাতত্ত্ব ছুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে—পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক। পুরাণকারগণের মতে যযাতির পুত্র অণু হইতে যোধেয় জাতির উৎপত্তি; কিন্তু পুরাণোক্ত যোধেয় কাহিনীর আলোচনা নিম্নপ্রয়োজন। আজকাল বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালীতে যাহারা ইতিহাস অধ্যয়ন করেন, তাহাদের মতে পুরাণ প্রভৃতির কোন ঐতিহাসিক মূল্যই নাই। বিগত কলিকাতা সাহিত্য-সম্মিলনীতে প্রাচীন ভারতে সাম্রাজ্যবাদ সম্বন্ধে যে তর্ক বিতর্ক হইয়াছিল, তাহাতে বঙ্গদেশের একজন বিখ্যাত প্রত্নবিদের মুখে শুনিয়াছিলাম—ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধীয় কোন বিষয়ে নামাযণ, মহাভারত বা পুরাণ প্রভৃতি দ্বারা কোন উক্তি সমর্থন করিতে যাওয়া বৃথা; কারণ ইহাদের কোন ঐতিহাসিক মূল্যই নাই। বিষয়টি অত্যন্ত গুরুতর, সুতরাং এতৎসম্বন্ধে ছুই একটি কথা বলিয়াই আমি যোধেয়গণের ইতিহাস আলোচনার প্রবৃত্ত হইব।

বর্তমানকালে আমাদের অনেক জ্ঞান বিজ্ঞানই ইউরোপীয়গণের নিকট হইতে লব্ধ, প্রত্নতত্ত্ববিজ্ঞানও তাহার অন্তর্গত। আর ইউরোপেও এ বিজ্ঞান পূর্ব আধুনিক। বিগত শতাব্দীতে ইজিপ্ট, অ্যাসিরীয়া বাবিলন প্রভৃতির পুরাতত্ত্ব উদ্ধারের চেষ্টাতেই এই বিজ্ঞান উদ্ভব হইয়াছে। এই সমুদয় দেশে প্রাচীন ইতিহাসের গঠনের উপকরণের মধ্যে ছিল কেবল শিলালিপি ও প্রাচীন ভাস্কর্য্য-নিদর্শন প্রভৃতি। এই সমুদয় উপকরণ কাজে লাগাইয়া যাহাতে অতীত ইতিহাস গঠন করা যায়, তাহার চেষ্টায় ইউরোপের দীক্ষিত নিয়োজিত হইল—তাহার ফলে জগতে Archeology বা প্রত্নতত্ত্ব বিজ্ঞান সৃষ্টি। ইহারই অমুকরণে ভারতবর্ষে প্রত্নবিজ্ঞান সাহায্যে অতীত ইতিহাস উদ্ধারের চেষ্টা আরম্ভ হয় এবং এখন পর্য্যন্ত সেই চেষ্টা অবিরাম গতিতে চলিয়াছে।

দেশকাল পাত্র বিবেচনা না করিয়া অন্ধ অমুকরণে প্রবৃত্ত হইলে তাহা অনেক দোষের আকর হয়। প্রত্নবিজ্ঞান এই যে অমুক্তিকীর্ণ আমাদের মধ্যে জাগিয়া উঠিয়াছে—তাহা একদিকে যেমন অশেষ উপকার সাধন করিয়াছে, অপর দিকে তেমন কতকগুলি দোষেরও সৃষ্টি করিয়াছে। ইউরোপ যে উপায়ে প্রত্নবিজ্ঞান সাহায্যে মিশর, বাবিলন প্রভৃতির অতীত ইতিহাস গঠন করিতে সফলকাম হইয়াছে, আমরাও যখন সেই উপায়গুলি অবলম্বন আমাদের অতীত ইতিহাস গঠনে প্রবৃত্ত হইলাম—তখন এ কথা মনে রাখিলাম না যে, মিশরের

ইতিহাসের যে শ্রেণীর উপকরণ বিজ্ঞান ছিল, ইউরোপীয় প্রত্নবিজ্ঞা কেবলমাত্র তাহারই প্রতি প্রযোজ্য—কেবলমাত্র সেই শ্রেণীর উপকরণই উক্ত প্রত্নবিজ্ঞান সাহায্যে অতীত ইতিহাস গঠিত করিতে সমর্থ। ভারতবর্ষের ইতিহাসের যে সমুদয় উপকরণ বিজ্ঞান, তাহার কতকংশ এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বটে এবং তাহাদের প্রতি ইউরোপীয় প্রত্নবিজ্ঞা সম্পূর্ণভাবে প্রযোজ্য ; কিন্তু ভারতবর্ষের ইতিহাস গঠনের আর এক শ্রেণীর উপকরণ আছে, তাহা উপরোক্ত শ্রেণী হইতে সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন—সুতরাং তাহার প্রতি ইউরোপীয় প্রত্নবিজ্ঞান মূলমন্ত্রগুলি প্রযোজ্য নহে। এই উপকরণ আমাদের বিরাট সাহিত্য-সম্ভার, বেদ পুরাণ মহাভারত প্রভৃতি। মিশরে বাবিলোনীয়ায় এই শ্রেণীর উপকরণ তাদৃশ বলবৎ নহে—সুতরাং সেখানে প্রত্নবিজ্ঞান সাহায্যে শিলালিপি প্রভৃতির দ্বারাই ইতিহাস সংগঠন করিতে হইয়াছে ; কিন্তু আমাদের দেশে এই সমুদয় উপকরণের অভাব নাই—কাজেই এই উপকরণ কাজে লাগাইতে না পারিলে ইতিহাস গঠনের চেষ্টা সম্পূর্ণ সফল হইবে না। কিন্তু উপকরণ থাকিলেই কাজে লাগান যায় না, তাহার ব্যবহারের নিয়ম জানা চাই। এই নিয়ম আবিষ্কারের চেষ্টা আমরা কখন করি নাই, পরন্তু ইউরোপীয়গণ যে নিয়মে শিলালিপি প্রভৃতি উপকরণ কাজে লাগাইয়া ইতিহাস গঠন করিয়াছেন, আমরাও এই সম্পূর্ণ ভিন্ন শ্রেণীর উপকরণ সম্বন্ধে ঠিক সেই নিয়মই অবলম্বন করিয়াছি। ইষ্টকালয় নির্মাণ করিতে হইলে মৃত্তিকার ছোট ছোট ঢোকা খণ্ড প্রস্তুত করিয়া তাহা আঙনে পোড়াইয়া লইতে হয় ; কিন্তু বিশাল শালকাষ্ঠ প্রভৃতির সাহায্যে গৃহ নির্মাণ করিতে যিনি প্রস্তুত হইবেন, তিনি যদি উপকরণের প্রভেদ ভুলিয়া পুরোঁক নিয়ম প্রণালীরই অনুসরণ করেন, অর্থাৎ কাষ্ঠকে খণ্ড খণ্ড করিয়া তাহা আঙনে পোড়াইয়া লন—তবে গৃহ নির্মাণ ত হয়ই না—পরন্তু ভগ্নাবশিষ্ট কাষ্ঠের অবস্থা দেখিয়া ইহা যে প্রণালীভেদে গৃহ নির্মাণের উপযোগী উপকরণ হইতে পারে এ প্রস্তাবও সমস্ত স্থগাভরে প্রত্যাখ্যান করেন। আমাদের অবস্থাও ঠিক তাহাই হইয়াছে। যে মূল সূত্রগুলি অবলম্বনে থুটমোসিসের শিলালিপির ঐতিহাসিক মূল্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তাহারই সাহায্যে আমরা পুরাণ মহাভারত প্রভৃতির ঐতিহাসিক মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে বসিয়াছি। ঐ নিয়মে ব্যক্তিবিশেষের একখণ্ড দলিলের মূল্য যাচাই হইয়াছে—ঠিক সেই নিয়মেই এতটুকি বিরাট জাতির, জাতীয় সত্য ও সভ্যতার আধারভূত মহাভারত প্রভৃতির মূল্য যাচাই হইতেছে, এবং এই শালকাষ্ঠ চোকা করিয়া আঙনে পোড়াইয়া যখন পাইতেছি তখন,

তখন উচ্চৈঃস্বরে কলরব করিয়া বলিতেছি, এসব ত ভয় ভয় ! ইহার আবার ঐতিহাসিক মূল্য কি ? মজুরের মূল্য কত তাহার পরিমাপ তাহার দৈহিক শক্তি, খাটিবার সামর্থ্য দ্বারা নির্দ্ধারিত হয় । পণ্ডিতের মূল্যেরও যদি ঐ পরিমাপ হয় তবে তাহা একটু আতঙ্কের কথা—অথচ উভয়েই মালুম । মহাভারত ও অশোকলিপি উভয়েই writt n doenment বা লিখিত বিবরণ হইলেও ইহাদের মূল্য নিরূপণে বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে ।

আমার বক্তব্য কতদূর আপনাদের বোধগম্য করিতে পারিয়াছি জানি না ; কিন্তু পুরাণ মহাভারতের কোন ঐতিহাসিক মূল্য আছে কিনা এবিষয়ে আমার মত ব্যক্ত করা এখন অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে । পূর্বোক্ত উদাহরণ অনুসারে বলিতে পারি কাষ্ঠ যেমন গৃহনিৰ্ম্মাণের উপকরণ—কিন্তু তাহার ব্যবহারের প্রণালী ভিন্নরূপ, মহাভারত প্রকৃতিরও তেমনই যথেষ্ট ঐতিহাসিক মূল্য আছে বলিয়াই আমার বিশ্বাস ; তবে এক্ষেত্রে মূল্য নির্দ্ধারণ বিষয়ে বিভিন্ন প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে । এ প্রণালী একদিনে আবিষ্কৃত হইবার নয় ; কিন্তু যাহারা প্রকৃত পণ্ডিত, দীপ্তিমান তাঁহারা প্রকৃতভাৱে এই সমুদয় গ্রন্থ সম্বন্ধে আলোচনা করিলে কালে এই প্রণালী আবিষ্কৃত হইতে পারিবে । প্রত্নবিজ্ঞা আমাদের দেশে অশেষ উপকার সাধন করিয়াছে এবং ক্ষেত্রে অর্থাৎ প্রাচীন লিপিমুদ্রা প্রকৃতির সাহায্যে আরও উপকার করিবে এবং কালে এই বিজ্ঞা ভারতের প্রাচীন ইতিবৃত্ত মন্দিরের স্মৃৎ স্তম্ভ নির্মিত করিতে পারিবে ; কিন্তু স্তম্ভ মন্দিরের একাংশ মাত্র । এই স্তম্ভের উপর ভর করিয়া যে ছাদ গঠিত হইলে মন্দিরের সম্পূর্ণতা সাধিত হইবে তাহারও যোগাড় আবশ্যক । মিশরের পুরাত্তন মন্দির এখনও মাল মসলার অভাবে ছাদহীন রহিয়াছে ।—কিন্তু ভারতবর্ষে এই মাল মসলার অভাব নাই ; তবে তাহার ব্যবহারের প্রণালী উদ্ভাবন করা চাই । ইহাও আমাদের লক্ষ্য রাখা আবশ্যক ।

কথার কথায় অনেকদূর আসিয়া পড়িলাম । এইবারে মূল বিষয়ের ঐতিহাসিক কাহিনীর আলোচনা করা যাউক । এই আলোচনার উপাদান বৌদ্ধেরাণের প্রচলিত মুদ্রা ও তিনখানি শিলালিপি—যথা কল্পদামনের গির্গার শিলালিপি, * সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ স্তম্ভলিপি, † ও বৌদ্ধেরাণের বিজয়গড় শিলালিপি । ‡ এই সমুদয় আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, বৌদ্ধেরাণের সম্বন্ধে

* E. I.—VIII.

† CII—III.

‡ Do,

প্রথম ও প্রধান কথা এই যে ইহারা প্রজাতন্ত্রমূলক শাসনের অধীনে বাস করিত। অর্থাৎ ইহারা একটি Republic গঠন করিয়াছিল। ইহাতে বিশ্বয়েব বিষয় কিছুই নাই; কারণ প্রাচীন ভারতবর্ষে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রজাতন্ত্র শাসিত দেশ ছিল। যৌধেয়গণও যে এইরূপ তন্ত্রের অধীনে ছিল তাহাদের প্রচলিত মুদ্রাই সে বিষয়ে প্রধান প্রমাণ—সাধারণতঃ রাজার নামেই মুদ্রা প্রচলিত হয়, কিন্তু যে জাতির রাজা নাই সে জাতির মুদ্রায় জাতির নামই দেখিতে পাওয়া যায়। যৌধেয় জাতির মুদ্রায় দেখিতে পাই কেবলমাত্র “যৌধেয়গণ” বা “যৌধেয়-গণস্ত জয়” অথবা কুল দেবতার নাম “ভগবত স্বামিন ব্রহ্মণ্যদেব যৌধেয়”। এই একটি প্রমাণের উপরই আমাদের সিদ্ধান্ত নির্ভর করা যাইতে পারে; কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় আরও প্রমাণ আছে। লুধিয়ানার নিকটে কতকগুলি মুদ্রায় মুদ্রার সিলমোহর আবিস্কৃত হইয়াছে—তাহাতে লিখিত আছে, “যৌধেয়াণাং জয়মঙ্গধরাণাং”—এখানেও যৌধেয় জাতিরই প্রাধান্য পরিলক্ষিত হইতেছে, কোন রাজার উল্লেখ নাই। রিস্ ডেভিড্‌স্ বৌদ্ধগ্রন্থ হইতে প্রজাতন্ত্রশাসিত রাজ্যের কতক বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন—তিনি বলেন যে, এই সমুদয় দেশে একজন “রাজা” নির্বাচিত হইতেন, কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত তাঁহার হস্তেই প্রধান কর্তৃত্বভার ভার থাকিত—সদ্বাগারে মিলিত হইয়া জাতীয় প্রতিনিধিগণ রাজ্য কার্য বিচার করিতেন। তিনি তাঁহাদের সভাপতি স্বরূপ থাকিতেন এবং তাঁহাদের অহুমোদিত প্রণালীতে দেশ শাসন করিতেন। স্মতরাং নামে রাজা হইলেও ইহারা প্রকৃত পক্ষে গ্রীসদেশের আর্কন, রোমের কনসাল বা বর্তমান Republic সমূহের প্রেসিডেন্টের সমকক্ষ ছিলেন। নির্দিষ্টকালের অবসানে তাঁহার পদে অন্য রাজা নির্বাচিত হইত। রিস্ ডেভিড্‌স্ বৌদ্ধ গ্রন্থ হইতে এই যে বিবরণ সংগৃহীত করিয়াছেন, ইহা যে যৌধেয়গণের সম্বন্ধেও প্রযোজ্য তাহার আভাস আমরা বিজয়গড় শিলালিপিতে প্রাপ্ত হই। হুংথের বিষয় এই শিলালিপিতানি ভগ্ন, প্রথম পঙ্ক্তির যেটুকু অবশিষ্ট আছে, তাহা এই যৌধেয়গণ “পুরুতস্ত মহারাজ মহা সেনাপতে” অর্থাৎ যে মহারাজ মহা সেনাপতিকে যৌধেয়গণ দলপতি নির্বাচিত করিয়াছে (who has been made the leader of the Yudheya tribe.) তাহাদের ইত্যাদি এই লিপি হইতে দেখা যায়। মহারাজ মহা সেনাপতি প্রকৃতি প্রধান কর্মচারিগণ যৌধেয়গণ দ্বারা নির্বাচিত হইতেন। বর্তমান Republic বলিতে আমরা যাহা বুঝি, যৌধেয় রাজ্যও যে তাহারই অনুরূপ ছিল, অতঃপর বোধ হয় সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ থাকিবে না।

যৌধেয়গণের মুদ্রা ও শিলা-লিপিতে দেশ ও রাজাকে অতিক্রম করিয়া এই যে জাতির মহিমা ও প্রাধান্য কীর্তন, ইহা আমাদের অতীত ইতিহাসের একটি অতিনব ব্যাপার। এইরূপ একটি জাতীয় ভাবের উদ্বোধন প্রাচীন ভারতবর্ষে বিद्यমান ছিল, এ তথ্যটি আমাদের নিকট একটি অমূল্য সম্পত্তি। মালব ও অর্জুনায়ন জাতির মুদ্রায় দেখিতে পাই মালবাহু (মালবানাং) জয়, অর্জুনায়নাং জয়ঃ। যে ভাবের প্রেরণায় উনবিংশ শতাব্দীতে ফরাসী ও বেলজিয়ামের রাজাকে King of the French ও King of the Belgians এই পরিবর্তিত উপাধি ধারণ করিতে হইয়াছিল—‘যৌধেয়গণ জয়ঃ’ প্রভৃতির মূলেও তাত্ত্বিক অঙ্গরূপ ভাব বর্তমান কি না, স্থদীর্ঘগবে তাহার বিচার করিবেন।

পূর্বেই বলিয়াছি ভারতবর্ষে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রজাতন্ত্র-শাসিত দেশ ছিল; কিন্তু ‘যৌধেয়গণ প্রজাতন্ত্র-শাসিত হইলেও তাহাদের দেশ নিতান্ত ক্ষুদ্র ছিল না। বর্তমানে যে সমস্ত স্থানে যৌধেয়গণের মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে প্রাচীন যৌধেয় রাজ্যের পরিমাণ মোটামুটি ঠিক করা যায়। অবশ্য এরূপ অসুস্থান ভ্রম-প্রমাদ-শূন্য নহে। কারণ ব্যবসায় উপলক্ষে বা অন্য কোনও কারণে মুদ্রাসমূহই এক স্থান হইতে অন্য স্থানে নীত হয়, অতরাং মুদ্রাপ্রাপ্তি স্থান মাত্রই যৌধেয় রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল, এরূপ অসুস্থান অসম্ভব হইবে। কিন্তু তথাপি যে যে স্থানে বহুল পরিমাণে যৌধেয় মুদ্রা পাওয়া যায়—সেই সেই স্থান যৌধেয়-শাসিত দেশ বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে এবং যদি ইহার বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ না থাকে এবং সমর্থক প্রমাণাবলী পাওয়া যায়, তবে যৌধেয় রাজ্যের পরিমাণ সম্বন্ধে মোটামুটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। কানিংহাম, ক্যাপ্তেন কটলী প্রভৃতি মূলতান, ভাওয়ালপুর, কাংড়া প্রদেশ, দেপলপুর, সাতগড়া, অমুধান, ভাটেনের, আভোর, সিবলা, কাঠোর, পানিপথ, শোণপথ প্রভৃতি স্থানে প্রাচীন যৌধেয়গণের শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সমুদয় হইতে প্রাচীন যৌধেয় রাজ্যের সীমা নিম্নলিখিতরূপে নির্দিষ্ট করা যাইতে পারে—পশ্চিমে যরা এবং বিপাশা নদী, পূর্বে যমুনা নদী। কাংড়া হইতে সাহারানপুর, এবং ভাওয়ালপুর হইতে ভরতপুর দুইটি কাল্পনিক রেখা টানিলে তাহাই যথাক্রমে উত্তর ও দক্ষিণ সীমা। এই বিস্তৃত ভূভাগের পরিমাণ-কল ৬০০ হাজার বর্গমাইলেরও অধিক—অর্থাৎ প্রাচীন গ্রীসের তিন গুণ, বর্তমান বেলজিয়ামের ছয় গুণ, এবং ইংলও ওয়েলস্ অপেক্ষাও বৃহত্তর। এই বিস্তৃত ভূভাগে যৌধেয়গণ কতকাল রাজ্য করিয়াছিল, তাহা সঠিক

জানিবার উপায় নাই। পাণিনির ব্যাকরণে যৌধেয় জাতির উল্লেখ আছে তবে পাণিনির ব্যাকরণ কেবল রচিত হইয়াছিল, সে বিষয়ে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ একমত নহেন। এ বিষয়ে গোল্ড ষ্ট্রুকার ও ভাণ্ডারকর যে যুক্তি-প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাষ্ট আমার নিকট সমীচীন বোধ হয়। তাহাদের মতে পাণিনি ব্যাকরণ খৃষ্ট পূর্ব সপ্তম শতাব্দী বা তাহার পূর্বে রচিত হইয়াছিল। হুতরাং অন্ততঃ খৃষ্ট পূর্ব সপ্তম শতাব্দীর পূর্বেই যে যৌধেয়গণ একটি বিশিষ্ট জাতীয়-জীবন গঠন করিয়াছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া গেল। অরুণ রাণা কর্তৃক যে, পরবর্তী কালে গ্রীস ও রোম জাতির উৎপত্তি বিষয়ে যে কাল্পনিক ইতিহাস সংগঠন করিয়াছিল, তাহাতেও তাহাদের জাতীয় জীবনের আরম্ভ খৃষ্ট পূর্ব অষ্টম শতাব্দীতে অর্থাৎ ঐতিহাসিক যৌধেয় জাতির অনধিক এক শত বৎসর পূর্বে মাত্র হইয়াছিল বলিয়া বর্ণিত আছে। অপর দিকে সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ স্তম্ভে এবং বরাহমিহিরের বৃহৎ সংহিতায় যৌধেয় জাতির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, অন্ততঃ খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর পরেও তাহারা বর্তমান ছিল। এই স্বদীর্ঘ তের শত বৎসর কালই যে তাহারা সমানভাবে বিক্রমশালী ছিল বা পূর্বোন্নিখিত বিস্তৃত ভূভাগ অধিকার করিয়াছিল তাহার অবশ্য কোন প্রমাণ নাই। প্রায় এক শত বৎসরকাল তাহারা কুশাংগণের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিল। ব্রহ্মদামন একবার তাহাদিগকে পরাজিত করিয়াছিল। সমুদ্রগুপ্ত তাহাদিগকে খ্রীষ শাসনাধীনে আনিতে সক্ষম হন নাই, তবে তাহার সভা-কবির মতে “যৌধেয়গণ, সর্লকরণান আত্মাকরণ ও প্রণামাগমন প্রভৃতি দ্বারা গুপ্ত রাজ্যের পরিতোষ সম্পাদন করিত। আর ইহাও বড় বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই। জয়-পরাজয়, উপান-পতন সব জাতিরই ঘটে, যৌধেয়গণেরও ঘটয়াছিল; কিন্তু তথাপি সহস্র বৎসরেরও অধিক কাল যে এই যৌধেয় জাতি বীরবিক্রমে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই।

যৌধেয় জাতির বীর বিক্রমের সুবিস্তৃত পরিচয় জানিবার উপায় নাই। তবে কয়েকটি ঘটনা দ্বারা তাহার একটি মোটামুটি ধারণা করা যাইতে পারে। ৬৮৬ বিক্রম দিগ্বিজয়ী নরপতি সমুদ্রগুপ্ত তাহাদিগের রাজ্য আত্মসাৎ না করিয়া কেবলমাত্র কর গ্রহণেই নিরস্ত ছিলেন—ইহাতে প্রতীতি হয় যে, যৌধেয়গণ নিতান্ত ক্ষীণবল ছিল না। কার ষ্ট্রাফেন নামক সাহেব লুদিয়ানার

নিকটে সোণাইত গ্রামে কতকগুলি দৃঢ়-মৃত্তিকা-নির্মিত মূর্ত্তা প্রাপ্ত হন। ইহাদের একটির উপরে খোদিত আছে “যোধেয়ানাম জয়মন্ত্রধরানাম”— শত্রু জয় করিবার মন্ত্রধারী অর্থাৎ অবহেলায় শত্রু জয় সাধনকারী যোধেয়গণ— এই উপাধির পশ্চাতে কতটা বীরত্বের গর্ভ লুক্কায়িত আছে, তাহা সহজেই অনুধাবন করা যাইতে পারে। কিন্তু যোধেয়গণের নিজকৃত বলিয়া এই গর্বোক্তি সর্বথা বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া গৃহীত না হইলেও হইতে পারে। সৌভাগ্যের বিষয় তাহাদের পরম শত্রু রুদ্রদামন স্বয়ংই ইহার সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। তাহার গির্গার লিপিতে লিখিত আছে যে, ভারতবর্ষের সমুদয় ক্ষত্রিয় জাতির পরাজয়সাধনপূর্ব্বক স্বীয় বীরত্ব-খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত করিয়া যোধেয়গণ গর্বিত হইয়াছিল। এই গির্গার লিপিতেই যোধেয়গণের প্রবল পরাক্রমের অসংখ্য প্রমাণ আছে। রুদ্রদামনের সভা-কবি লিখিত অঙ্কশাসনেই প্রকাশ যে যিনি অবহেলে অল্প আনন্দ, সুরাষ্ট্র সিংহ গোবীর প্রভৃতি অধিকার করিয়া ‘স্বয়মধিগত মহাক্ষত্রপ’ অর্থাৎ মাত্র নিজের বাহুবলে মহাক্ষত্রপ উপাধি লাভ করিয়াছিলেন, সেই রুদ্রদামনও সহজে যোধেয়দিগকে পরাজিত করিতে পারেন নাই।

যোধেয়গণের মূর্ত্তা ও শিলা-লিপি সম্বন্ধে কতকগুলি কুট প্রশ্ন আছে। কিন্তু বহুক্ষণ আপনাদের সময় ও দৈর্ঘ্য নষ্ট করিয়াছি—এইগুলি উত্থাপন করিয়া আর অপরাধের মাত্রা বাড়াইতে চাই না। তবে যোধেয়গণের সম্বন্ধে আর একটি প্রশ্নের আলোচনা বিশেষ প্রয়োজনীয় মনে করিতেছি। তাহার উল্লেখ করিয়াই আমি এই প্রবন্ধ সমাপ্ত করিব। কাহারও কাহারও মতে বর্ত্তমান কালের জোড়িয়া রাজপুতই যোধেয় জাতির বংশধর। ইহা অসম্ভব নহে—তবে নিশ্চিতভাবে এখনও বলা যায় না; কিন্তু আজকাল প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে যে, রাজপুত জাতি আদৌ ভারতবর্ষীয় নহে—সুতরাং রাজপুত জাতির গোরবে ভারতবর্ষের গোরব করিবার অধিকার নাই। রাজপুত জাতি কোথা হইতে আসিল, সে বিষয়ে নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করিতে পারা যায় নাই; কেহ বলেন মিডিয়া, কেহ বলেন পারস্য, কেহ বলেন মধ্য এশিয়া—কাহারও বা মতে শক, হুন, পল্লব, তাতার,* যবন প্রভৃতি যত বিদেশী আক্রমণকারী ভারতে আসিয়াছে, সকলের সংমিশ্রণে রাজপুত জাতির উৎপত্তি। যোধেয়গণ অবশ্য খৃষ্ট পূর্ব্ব সপ্তম শতাব্দীতেই ভারতবর্ষে বর্ত্তমান ছিল; শক যবন প্রভৃতি তাহার বহুপরে ভারত আক্রমণ করে—কিন্তু ধাহারা ভারত-গোরব শাক্যসিংহকে

শক জাতীয় বলিয়া প্রতিপন্ন করেন, তাহারাই এই সব তর্কে দমিবার নহেন—
 তাহারাই বলেন খৃষ্ট পূর্ব দ্বিতীয় তৃতীয় শতাব্দীতে শক যখন প্রভৃতি ভারতবর্ষে
 আসিয়াছিল, ইহা আমরা জানি ; কিন্তু ইহার পূর্বে যে তাহারাই আসে নাই তাহার
 প্রমাণ কি ? টড সাহেব বিশ্বাস করিতে পারেন নাই যে, চর্যাপুত্র রাজপুত্র বীর
 ও নিরীচ মেঘতুলা অজ্ঞাত হিন্দু সম্প্রদায় এক জাতির অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে ।
 তাই তিনি প্রথমে সিদ্ধান্ত করেন যে, রাজপুত্র ভিন্নজাতীয় এবং টড সাহেব
 সেই যে স্থর তুলিলেন তাহার ফলে নানা পণ্ডিতমণ্ডলী বিচার প্রমাণ সাহায্যে
 প্রত্যক্ষভাবে আমাদেরগকে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছেন যে, রাজপুত্র জাতি হিন্দু
 নহে—হিন্দু হইতে পারে না এবং পরোক্ষভাবে ইঙ্গিত করিতেছেন যে, তাহা-
 দিগের বীরত্ব-গাথা লইয়া আমরা যে গর্ব করি, তাহা ভ্রান্ত ধারণার উপর
 প্রতিষ্ঠিত । এই সব গুরুতর বিষয়ের মীমাংসা করিবার সাধ্য আমার নাই ।
 আমার বক্তব্য এইমাত্র যে, একটি জাতির আদিম বাসস্থান কোথায় ছিল
 তাহাই তাহার পক্ষে গুরুতর কথা নহে, কিন্তু যে সভ্যতার সংস্পর্শে ও সাহচর্যে
 এই জাতীয় জীবন উদ্বোধিত ও বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া কালে তাহার
 অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছিল, তাহাই সেই জাতির সম্বন্ধে প্রধান জ্ঞাতব্য কথা ।
 ফলে জাতির আদিম নিবাসস্থলই তাহার গৌরবের অধিকারী হইতে পারে
 না, পরন্তু যে সভ্যতার ফলে তাহার জীবন গঠিত হইয়াছে, সেই সভ্যতা ও যে
 স্থানে সেই সভ্যতার উদ্ভব ও বিকাশ, সেই স্থান—ইহারাই মাত্র সে গৌরবের
 অধিকারী । সকলেই জানেন যে একাদশ শতাব্দীর পর হইতে ইংলণ্ডে নর্মান
 জাতির প্রভু প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল—কিন্তু সে ক্ষুদ্র ইংলণ্ডের গৌরব ফ্রান্স বা
 নরওয়ে ডেনমার্কের প্রাপ্য নহে । ইংরাজ ঐতিহাসিকগণের মতে হেনরির
 সহিত ম্যাটিঙার বিবাহই ইহার কারণ । তাহা হইলে ত সাক্ষ্যহীন প্রভৃতি
 মোগল সম্রাটগণের গৌরবও হিন্দুগণেরই প্রাপ্য ; কিন্তু প্রকৃত কারণ এই
 যে, নর্মান সভ্যতা ইংরাজ সভ্যতার উপর প্রাধান্য স্থাপন বা তাহা হস্তে হস্তান্তর
 রক্ষা করিতে পারে নাই, বিরাট ইংরাজ সভ্যতার সহিতই মিশিয়া গিয়াছে ;
 সেইরূপ বৈদিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতবর্ষের যাহা কিছু গৌরব—
 কোণ ভীল প্রভৃতি জাতি ভারতবর্ষের আদিম অধিবাসী হইলেও তাহা তাহাদের
 প্রাপ্য নহে, এবং মধ্য এশিয়া জাতীয় আর্যগণের আদিম বাসস্থান হইলেও এই
 গৌরবের অধিকারী নহে । ভারতবর্ষই এই গৌরবের অধিকারী, কারণ এই
 সভ্যতার প্রতিষ্ঠা ভারতবর্ষেই হইয়াছিল ।

আমাদের মূল প্রশ্ন ছিল, যোধেয়গণকে আমরা ভারতবাসী বলিয়া বিবেচনা করিতে পারি কিনা এবং তাহাদের গৌরবে গৌরবান্বিত বোধ করিবার দাবী আমাদের আছে কিনা । পূর্বে যাহা বলা হইয়াছে তাহাতে আমি এইটুকু বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, এই প্রশ্নের উত্তর, যোধেয়গণের আদিম বাসস্থান কোথায় ছিল তাহার উপর নির্ভর করে না, কিন্তু কোন সভ্যতার সংস্পর্শে যোধেয়গণের জাতীয় জীবন গঠিত হইয়াছিল, তাহা দ্বারা ইহার মীমাংসা করিতে হইবে । এই প্রবন্ধের প্রারম্ভে আমি মহাভারত পুরাণ প্রভৃতির ঐতিহাসিক মূল্য সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, এখানে তাহার একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে । পূর্বেই বলিয়াছি পুরাণকারগণের মতে যযাতির পুত্র অণু হইতে যোধেয় জাতির উৎপত্তি । যযাতি বলিয়া কোন রাজা কখন ছিল না, বা থাকিলেও অণু নামে তাঁহার কোন পুত্র ছিল না, এবং এই দুইজন থাকিলেও যোধেয় তাঁহাদের বংশোদ্ভব নহে—এ সমস্তই মানিয়া লইলাম ; কারণ সে বিষয়ে প্রমাণাভাব—কিন্তু পুরাণকারগণের এই প্রত্যেক উক্তি ভ্রান্ত হইলেও ইহার মধ্যে একটি অমূল্য সত্য নিহিত আছে, তাহা এই যে যোধেয়গণ আদৌ ঘাটাই থাকুক না কেন ভারতবর্ষের সভ্যতার আশ্রয়েই তাহাদের জাতীয়-জীবন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে । এই যে ভারতের প্রাচীন রাজবংশের সহিত সম্বন্ধ স্থাপনের চেষ্টা—পরিণত সভ্যতালালী কোন জাতির পক্ষেই ইহা স্বাভাবিক বা সম্ভব নহে । এই চেষ্টা দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে, যোধেয়গণ প্রথম হইতেই ভারতবর্ষের সভ্যতার সংস্পর্শে জাতীয় জীবন লাভ করে এবং ভারতবর্ষের সভ্যতার অতিরিক্ত কোন জাতীয় জীবন থাকিলেও তাহা নিতান্ত নগণ্যই ছিল—তাহাদের মুদ্রায় ভগবান ব্রহ্মদেবের নাম ও মূর্তি, ও তাহাদের প্রস্তর-লিপির ভাষা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত করে যে ধর্ম ও ভাব্য তাহারা হিন্দুই ছিল—এবং পুরাণকারগণের উক্তি হইতে আমি যে, সিদ্ধান্ত করিয়াছি, তাহাও এইরূপ ভিন্ন প্রমাণের দ্বারা সমর্থিত হয় । পুরাণের ঐতিহাসিক মূল্য কি এবং যোধেয়গণের গৌরবে আমাদের গৌরব করিবার অধিকার আছে কিনা এ উভয় প্রশ্নের বিচারের ভার আপনাদের উপর অর্পণ করিয়া আমি এই সুদীর্ঘ নীরস প্রবন্ধ সমাপ্ত করিলাম ।

জীরমেশচন্দ্র মজুমদার ।

চিত্রপট

ওধু একখানি ছবি ছায়া চিত্রপট,
এই নিয়ে কেটে গেল সারাটা জীবন ;
তাঁহারি সম্মুখে হাপি' অর্জুনার ঘট
দীন পূজকের মত করিহু যাপন ;
জীবন প্রভাত সন্ধ্যা মধ্যাহ্ন আমার,
অনিমিষে চাতি' নৃপ চিত্র-দেবতার
হাতে লয়ে প্রেম অর্ঘ্য বদ্ধ কৃতাজ্জলি,
বিনীত ভক্তের মত চরণের তলে
জালাইয়া চারিদারে ভক্তি-দীপাবলী,
মুখনেত্র্যে ক্ষণেকের রূপা পা'ব বলে',
আপনা জুলিয়া বসি' আছি আশা ধরি',
শত জন্ম-জন্মান্তর করুণা ভিখারি ।
জানিনা সে কতদিনে দয়া হবে তার
চিত্র তাজি' দিবে দেখা সম্মুখে আমার ।

শ্রীমুগ্ধরী দেবী ।

মোনি

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

“বুঝলে সেজদি ? আর এই নতুন চাকরটাকে নিয়ে অগে পুড়ে থাক
হয়ে যাচ্ছি । এই দেখ না ? ওরে শশে, আমার মাথা খেয়ে এটা কি
নিয়ে এলি ? খোল্ দেখি ওর ভিতরে কি আছে ? দেখলে সেজদি, দেখলে
একবার লম্বীছাড়া বেটার আকোল ! ওর আফিসের টিকিন বাকটা “কি না
একেবারে উপরের ঘরে নিয়ে এসে হাজির ! বেরো, শিগ্গীর বেরো । ওটাকে
আবার ফেলে গেলি কেন ? নিয়ে যা বলছি এখুনি, যেখানে ছিল সেই-
খানে রেখে আয় । অ ঝি, ও তারশের মা, এইদিকে এস, এই খানটার
গোরব জল ছড়িয়ে দাও । ও ওলো ওঁর আফিসে থানা খাবার জিনিস,
আমি তাই ওপরে তুলতে দিই না । কেটা বাড়ী গিয়ে অবধি যে আলাতন

হজ্জি, তা আর তোমার কি বলব। সে সেক্টি পিনকে সিটপিটিন বলত, এসেম্পকে সিন্‌সিন্ বলত, কিন্তু তাহলে কি হয়, সব জিনিস পত্র চিনে গিয়েছিল। অনেক দিনের পুরাণো চাকর কি না। আমার স্বত্তরের আমল থেকে আছে।

“তুমি নোননি বুঝি ? তার বুড়ো বয়সে ভীষ্মরতি হয়েছে। টলির পরে আমার যে মেয়েটা হয়ে রইল না, সেটাকে কেষ্ঠা বড় ভালবাসত ; সে পোড়াকপালীর মেয়েও কেষ্ঠাকে ছেড়ে থাকত না। সেটা যখন গেল, তখন উনি দিন কতক পাগলের মত হয়েছিলেন, আমার কুখাত ছেড়েই দাও। যে রাত্তিরে সে গেল, সেই রাত্তির থেকে কেষ্ঠে নিরুদ্দেশ। তার পর তিন চার মাস কেষ্ঠার কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না, উনিত ভেবেই অস্থির—”

“এটা আবার কি নিয়ে এলি ? ওমা দেখলে ? এটা যে বাবুর আগিসের বাগ ? এতে সব মকদ্দমার কাগজ পত্র রয়েছে। কাগজ পত্র ছড়িয়ে রেখে আসিল নি ত ? তাহলে মরবি মার খেয়ে। সেজদি, জলে পুড়ে গেলুম। উনি বলেন যে ভাল দেখে একটা মুসলমান খিদমদগার এনে রাখি। তা ভাই হিছুর ঘর, কি বলে মোছলমান ঢুকতে দিই বল দেখি। ওরা বাইরে যা খুসী করুন, কিন্তু বাড়ীর ভিতর অনাচার ঢুকতে দিলে কি আর রক্ষা আছে ? উনি যেদিন রাত্তিরে খানা খেতে যান, সেদিন কিন্তু আমি সে কাপড়ে বাড়ীর ভিতরে আসতে দিই না।

“শশে, ও শশে, একেবারে জন্মের শোধ গেলি বাবু। তোকে একবার বলে দিলে চিনে রাখিতে পারিস না কেন ? এখন থাক্, বড় থোকা আনুক স্থল থেকে তার পর তোকে দেখিয়ে দেবে এখন। তুই নীচে যা, সদর দরজাটা যেন খুলে রাখিস নি।

“তার পর কি বলছিলুম সেজদি ? সেই কেষ্ঠার কথা। তার পর হুমাস বাদে তার দেশ থেকে এক চিঠি এসে হাজির, সে শুঁকে নিমন্ত্রণ করেছে—তার বিয়ে। উনি ত হেসেই গুম, বড় থোকা ত হেসে লুটোপুটি। উনি বলেন যে কেষ্ঠার বয়স পঞ্চাশ বছরের একশট্টা কম নয়, তার আবার বিয়ে ? শূঙ্গুররা কিন্তু ভাই, সবাই বুড়ো বয়সে বিয়ে করে। উনিত ভাল করে ভাবি আর একছড়া সোণার হার গড়িয়ে পাঠিয়ে দিলেন ; বলেন অনেক দিনের পুরাণো চাকর, কোলে পিঠে করে মাছুব করেছে। সে যখন বিয়েই করতে বসেছে বুড়ো বয়সে, তখন তার বৌকে একখানা

সোণার গয়না দেওয়া উচিত । দিতে খুতে উনি বড় ভালবাসেন, আমি তাতে কখনও বাধা দিই না । ঔর পয়সা, উনি দিবেন আমি কেন নিমিত্তির ভাগী হতে যাই ? তার মাস খানেক পরে কষ্টেচন্দর এসে হাজির ; তখন তার বিয়ে টিহে হয়ে গেছে । দিন কতক থেকে যেমন কাজকর্ম করত তেমনি করতে লাগল । হঠাৎ একদিন একথানা চিঠি নিয়ে বাবুর কাছে এসে হাজির ; বল্ল যে তার স্বস্তর চিঠি লিখেছে, তাকে তখনি বাড়ী যেতে হবে । কেষ্ঠা সেই যে গেছে আর দেখা নেই ।

“শশে, ও শশে, তিনটে বেজে গেছে, স্কুলে গাড়ী নিয়ে যেতে বস্ । বসনা ভাই ? কতদিন পরে এসেছিস একটু খানি বস্ । বাবা গিয়ে অবধি আর ত দেখা তুমো হয় না । বড় পোকা স্কুল থেকে এলে সেই গাড়ী তোকে দিয়ে আসবে এখন । তোরা নিজের গাড়ী ফিরিয়ে দে ভাই । উনি ? উনি ট্রামে না হয় ভাড়াটে গাড়ী করে আসবেন । রাগ করবেন না, আরও কিছু ? কতদিন এমন হয়েছে ।

কি বলছিস, ভাল করে বল না ? তোরা ইকড়ি মিকড়ি চাম চিকড়ি কথা আমি বুঝতে পারি না বাবু ? কি বলে সেজদি, তুইত ভাই মুখুজ্জ মশায়ের সঙ্গে অনেক দিন উড়েদের দেশে ছিলি ? পুরাণো চাকর এসেছে, কে বল দেখি ? জুফ ? জুফ কি ভাই ? ওমা ভাই বৃষ্টি ? কেষ্ঠাকে জুফ বলে ? মুখে আগুণ পোড়ার দেশের কথা । কই ? কোথায় সে, শিগ্গীর তাকে এই খানে নিয়ে আয় । ও কেষ্ঠ, তুমি কখন এলে ? বস, এখন কি বেড়াতে এসেছ । বৌ কেমন আছে ? মরে গেছে ?—আ—হা—কি হয়েছিল ? আর ? আহা, বড় বয়সে আবার শোক পেলে ? তোমার বিয়ে না করলেই হত ভাল । তুমি কাজ করবে তাহলে ত বাঁচি, নতন নতন চাকরগুলো হাড় মাস জালিয়ে খেলে । না, ওকে ছাড়াব কেন ? ও থাকবে, ও বড় ধোকার সঙ্গে স্কুলে যাবে । বাচলুম বাবু, বাবু বলছি দাদা । ঔর বড় অবস্থা হয়েছিল, কাল পশ্চিমে বেড়াতে যাবেন, তারি জন্তে অকুলপাথর ভাবছেন । তুমি এলে, আমি বাচলুম ; ঔর সঙ্গে তুমি গেলে আমি নিশ্চিন্তি । এস নীচের, বসগে, তোমার ঘরে সেই অবধি ঢাবি লাগান আছে, উনি কাউকে ঢুকতে দেননি ।

“এই কেষ্ঠ—সেজদি ! ও এল আমি বাচলুম, নিশ্চিন্তি হয়ে থাকব । পোড়া কপাল আমার, ও আবার আমার গিলি বলবে ? ঔকেই সময়ে সময়ে নাম

ধরে ডাকে, তবে নেহাৎ লোকজন থাকলে “আপনি” “আজ্ঞে” বলে। বুড়ো বয়সে কেন সাত তাড়াতাড়ি বিয়ে করতে গেল বল দেখি, কেবল শোক পাবার জন্যে।

“ওরে বড় খোকা, কে এসেছে দেখ দেখি? আরও একজন এসেছে, কে একজন এসেছে, কে বল দেখি? কেউ এসেছে। আমাদের কেউ নয়ত আবার কাদের। ও সেহুদি আর একটু বস, তোমার পায় পড়ি আমার মাথা খাও, মুখুন্ডে মশার রাগ করবেন না, আমি কাল বুঝিয়ে বলে আসবো।”

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ :

ডালহাউসী

এই অক্টোবর ১২০৩

মহারানী !

কতদিন পরে তোমায় পত্র লিখিতেছি বল দেখি? তুমি ভুলিয়া গিয়াছ, কিন্তু মুখে কখনই স্বীকার করিবে না যে, সত্য সত্যই ভুলিয়া গিয়াছ। আজ দশ বৎসর পরে তোমায় পত্র লিখিতে বসিয়াছি। এই দশবৎসরের মধ্যে কি তোমায় একখানিও পত্র লিখি নাই? খুব কম করিয়া এক হাজার চিঠির কাগজ জীবন-যাত্রার অত্যাশঙ্কক সংবাদ বহন করিয়া আমার কাছ থেকে লেফাফা বন্ধ হইয়া তোমার নিকট গিয়াছে, কিন্তু সে শুভা ত পত্র নয়। শেষ পত্র কবে লিখিয়াছি তাহা আমার এখনও বেশ মনে আছে। তোমার মনে জ্বাছে কি? লক্ষ্যে হইতে ফিরিয়া যখন কলিকাতায় ওকালতী করিতে গেলান সেই সময়ে। সে আজ দশবৎসরের কথা। দশবৎসর পরে সত্য সত্য লিখিতে বসিয়াছি, সেই জন্ত দশবৎসর পূর্বে পত্রে তোমাকে যাহা বলিয়া সম্বোধন করিতাম, আজও তাহাই বলিয়া সম্বোধন করিতেছি।

মহারানী! এই দশবৎসরে আমাদের কতটা পরিবর্তন হইয়াছে বল দেখি। তুমি হয়ত বলিবে যে তুমি এখন গৃহিণী হইয়াছ, এখন যৌবন গিয়াছে, এখন আর তুমি সেইরূপ পাগলামি করিতে প্রস্তুত নহে। যৌবন গিয়াছে বিশেষতঃ তোমার, ও কথা আমি কখনই স্বীকার করিতে পারিব না। বড় জোর বলিতে পারি যে প্রথম যৌবনের বসন্ত-চঞ্চলতা অতীত হইয়াছে। কথাটা মনে পড়িল কি? কবে কোন সময়ে কোন মিশুগ শিল্পী

পরিণত বয়সের রচনা পড়িতে পড়িতে ছুইট অপরিশ্রুত বয়সের চামিটকে জল আসিয়াছিল বলিতে পার ?

মিণু! সেদিন এতই দূর ? আমার কাছে ত ইহা কালিকার কথা বলিয়া মনে হয় । আরও মনে হয় যে, যৌবনে অকারণে অকাল বার্কক্য টানিয়া আনিয়া জীবন গুরুস্তার হইবার পূর্ণ হইতেই আমরা তর্জি ভাষাক্রান্ত করিয়া ফেলি । তুমি পচিশ বৎসর বয়সেই প্রবীণা গৃহিণী সান্নিধ্য, কিন্তু কেন সাজিলে বল দেখি ? মাথার চুল কঁকড়াইয়া চুল বাধিতে তোমার লজ্জা বোধ হয়, পাছাপেড়ে কাপড় পরিতে তোমার লজ্জা বোধ হয় । তুমি বল এখন আর ঐ সব ভাল দেখায় না, লোকে কি বলিবে ? কিন্তু মেজবোদিদি কি করেন বল দেখি ? তিনি ত আমার স্বাভাবিক অপেক্ষা বড় বই ছোট নহেন, তাঁহার বেশকুশাটা একবার মনে কর দেখি ? মেজবো-দিদির মোহিত্রীর বিবাহের বয়স হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার কেশবিন্যাস, তাঁহার পোষাক পরিচ্ছদ, চাল চলন, অলঙ্কার ব্যবহার সমস্তই যৌবনের উপযোগী অগত তাঁহার যৌবন যে গত হয়েছে সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই । মেজমাকে দেখ দেখি, তাঁর জামাই রবি—থান পরে, দাদা উড়ানী ব্যবহার করে, কিন্তু মেজমা এখনও দিশি কালাপাড় মুতি, গিলাকরা টিলা আভিনের জামা, আর কোঁচান মিছি উড়ানী ভিন্ন অস্ত্র কিছু ব্যবহার করেন না । আমার স্থির বিশ্বাস হয়েছে যে আমরা দুজন যথেষ্ট যৌবনসম্বোধ গত-যৌবন হয়ে পড়ছি । আমাদের আবার নতুন করে তোমার সঙ্গে লাগতে হবে দেখছি । তোমার এই অকালবার্কক্যের চিহ্নগুলো দূর না করিলে আমার মনে আর শান্তি হইবে না ।

তুমি হয় ত বলিবে যে, এককাল পরে তোমার উপর নজর পড়িল কি করিয়া । নজর চিরকালই ছিল, সমান ভাবেই আছে । ফুল-শস্যের দিনে তুমি ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলে, জানালা দিয়া জ্যোৎস্না আসিয়া তোমার স্বপ্নের মুখখানি আরও স্বন্দর ফরিয়া তুলিয়াছিল, আমি সে সৌন্দর্য্য দর্শনে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলাম, সে রাত্রিতে ঘুমাই নাই । রাগিও না আমার কথাগুলো শির চইয়া শোন । তাহার পর কত রাত্রি সেই একই কার্য্যে একই ভাবে কাটিয়াছে, তাহা কি তুমি জান ? এখনও,—ভাল,—লিখিব নু । তোমার কথা মনে পড়িয়া গেল, কেমন করিয়া জান ? অথবা! ষ্টেশন দিয়া আসিতে আসিতে । সেই কথা, সেই দিনের কথা, তাহা তুমি কখনই তুলিয়া যাও নাই । সেই

কথায় মনে পড়িয়া গেল। অস্থানা ষ্টেশন এখনও তেমনই আছে, কিছু মাত্র পরিবর্তন হয় নাই। তুমি যখন বলিলে যে, অত গোরা দেখিয়া একা ওয়েটিং রুমে থাকিতে তোমার বড় ভয় করে, তখন তোমাকে লইয়া যে স্থানটিতে বসিয়াছিলাম, তাহা এখনও তেমনি আছে। কক্ষও সঙ্গে আছে, নাই কেবল তুমি। তুমি কেন আসিলে না? তুমি যদি উপস্থিত থাকিতে, তাহা হইলে সেবারকার মত পুরস্কার—ভুল হইয়া গেছে, গুরুদেব, এমন কথা আর লিখিব না। তুমি কেন আসিলে না? তোমার সংসার? সেটা সঙ্গে উঠাইয়া আনিলেই হইত। মুসৌরীতে এবং সিংলায় তোমার সংসার কে চালাইত? যে দাসদাসীগুলি তোমার বকলমে তোমার সংসার চালাইয়া থাকে, এখানেও তাহারাই চালাইত।

কক্ষও সেই কথা বলে। সে কাল বলিতেছিল যে থোকাবাবুদের লইয়া আসিলে তাহার দিন কাটিত ভাল। দেখ, কক্ষ একেবারে বদলাইয়া গেছে, তাহার দেহে আর তেমন শক্তি সামর্থ্য নাই। তোমার মনে আছে কি? যে বৎসর বড় পোকার অল্পখের জন্য আমরা মুসৌরী যাই, সেবার সে রাজপুর থেকে হাটিয়া মুসৌরী গিয়াছিল, কিন্তু গিরীশ ঠাকুরকে ডাঙি চড়িতে হইয়াছিল। সে আর কতদিনের কথা! কিন্তু এখন আর কক্ষ চলিতে পারে না, একটা বড় লাঠি না হইলে, পাহাড়ে উঠিতে পারে না। বুড়া বয়সে শোক পাইয়া সে একেবারে বসিয়া গিয়াছে। এত দিনে কক্ষ সত্য সত্যই বুড়া হইয়াছে, তাহার চুলগুলো একেবারে সাদা হইয়া গেছে, প্রায় সমস্ত দাঁতগুলো পড়িয়া গিয়াছে, হাত-পা কাঁপিতে আরম্ভ করিয়াছে। সে কিন্তু এখানে আসিয়া ভাল আছে। আগে বাবার সঙ্গে বৎসর বৎসর গীতকালে পাহাড়ে যাইত, আমার সঙ্গে প্রতিবৎসর অন্ততঃ একবার করিয়া দার্জিলিং যাইত; কিন্তু বিবাহ করিয়া দেশে গিয়া অবধি সে আর পাহাড়ে আসে নাই। কক্ষ বলিতেছে যে, এখানে আসিয়া তাহার পাওয়া বাড়িয়াছে। তবে একটা অসুবিধা, এখানে মোটে মাছ পাওয়া যায় না; তুমি যদি এখানে কখনও আস, তাহা হইলে বড়ই বিপদে পড়িবে।

যখন তোমাকে পত্র লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম, তখন কত কথাই যে বলিব ভাবিয়াছিলাম; কিন্তু চিঠি ত শেষ হইয়া আসিল, অথচ কোন কথাই বলা হইল না। এবারে বুঝিতেছি বিরহ বহুবিধ, যথা—আহারের সময়ে বহু দাসদাসী সঙ্গে গৃহিণীর বলয়-শোভিত হস্তের তালবৃত্ত বাজন, সময়ে সময়ে

তৈল ঘৃত অনভাবজনিত স্বাস্থ্য বাঞ্ছন লাভ, নিত্য অনাবশ্যক সংবাদ প্রাপ্তি এবং ভবিষ্যৎ জীবনের কল্পিত চিত্র, যথা বড় পোকা বড় হইলে তাঁহার বিবাহের সময়ে কি কি করিতে হইবে ইত্যাদি ইত্যাদি। এখন আমি এই সৰ্ব্ববিধ বিরহ একা একই সময়ে ভোগ করিতেছি জানিবে।

বড় ধোকাকে বলিও যে, তাহার জন্ত রাওলপিণ্ডির নাগরা ছুতা ও শিলাগকোটের বাট লইয়া যাইব, ছোট পোকাকর জন্ত দিল্লী হইতে ঢকি সেট লইয়া যাইব।

তোমার চির দাসাশ্রয়

পনি।

পুনঃ—পনি ঠিক সেই রকমই আছে, কেবল তাহার কোঁকড়া চুল, যাহার জন্ত তাহার পনি নাম হইয়াছিল, তাহা বিরল হইয়া আসিতেছে। লাহোর ষ্টেশনে তোমার শিশির দাদার সঙ্গে দেখা হইয়াছিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

কৃষ্ণচন্দ্র কোথায় গেল? আজ সকাল থেকে তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া দাইতেছে না। বৃন্দাবনে আসিয়া অবধি আলাতন হইতেছি—ধূলা মশা মাছি এবং বানর এই চারিটার আশায় অস্থির। অবশ্য যমুনার কচ্ছপের উপদ্রব আছে। সকাল বেলায় কেশবের পুরাতন মন্দির দেখিতে গিয়াছিলাম; তখনও রোদ্ভ উঠে নাই, কিন্তু তখনও কৃষ্ণকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। যখন ফিরিয়া আসিলাম তখন বেলা দশটা, কিন্তু তখনও কৃষ্ণ ফিরিয়া আসে নাই। সে কোথায় গেল?

এক ঘণ্টা বসিয়া থাকিয়া আর পারিলাম না, কৃষ্ণকে খুঁজিতে বাহির হইলাম। ঐবৃন্দাবনে অবশ্য সকলেই ঐকৃষ্ণচন্দ্রের অন্বেষণে আসিয়া থাকে, কিন্তু আমার কৃষ্ণান্বেষণ নূতনতর। ইহা সকাম অন্বেষণ, কারণ কামনা এই যে কৃষ্ণ আসিয়া আর কিছু করুক আর না করুক জিনিষত্রগুলা ত আগলাইতে পারিবে। ইহা শরীরী কৃষ্ণের অন্বেষণ; আমার উদ্দেশ্য বস্ত্র হস্ত-পদ-চক্ষু-কর্ণ-নাসা বিশিষ্ট এবং সত্য সত্যই বস্ত্র, যাহাকে স্পর্শ করিলে অমূল্য হস্ত। অপরের কৃষ্ণান্বেষণ জন্ম জন্মান্তরেও শেষ হয় না, কিন্তু আমার অন্বেষণের শেষ আছে, কারণ সন্ধ্যার পূর্বে খুঁজিয়া বাহির হইয়া আসিতে পারিলে পুলিশে সংবাদ দিতে হইবে।

বৃন্দাবনে একজন অপরিচিত বৃদ্ধ বাঙ্গালীকে খুঁজিয়া বাহির করা অসম্ভব । কারণ যে করজন বঙ্গবাসী ঐ বৃন্দাবনে বাস করিতে আসেন, তাহারা সকলেই বৃদ্ধ । যৌবন গত না হইলে কোনও পুরুষ ঐ বৃন্দাবনে বা ৬বারাণসীতে বাস করিতে আসেন বলিয়া বোধ হয় না । যেখানে বাঙ্গালী মাঝেই বৃদ্ধ, সেখানে যে কোনও ত্রুজবাসীই বৃদ্ধ কৃষ্ণচক্রে সন্ধান বলিতে পারিবে না, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি ? বেলা বাড়িয়া চলিল, ঐ বৃন্দাবনে ঐ কৃষ্ণচক্রে দেখা পাইলাম না, যোসে পুড়িয়া তিন ঘণ্টা পরে বাসায় ফিরিলাম এবং দেখিলাম যে, বানরে নূতন বুটজুতাচোড়ার একখানা লইয়া গিয়াছে ও পাণ্ডা ভাত লইয়া বসিয়া আছে ।

আহার সারিয়া পুনরায় বাহির হইলাম । পাণ্ডাকে বহিয়া গেলাম যে কৃষ্ণ যদি ইহার ভিতর ফিরিয়া আসে তাহা হইলে সে যেন পানায় গিয়া সংবাদ দিয়া আসে এবং বুটটার সন্ধান করিতে পারিলে নগদ এক টাকা বত্খিস পাইবে । বাহির হইয়া সারা বৃন্দাবন খুঁজিয়া বেড়াইলাম, কিন্তু কৃষ্ণের সন্ধান ত মিলিল না । হয়রাণ হইয়া সন্ধ্যাবেলায় পানায় ফিরিয়া আসিলাম । দারোগা বলিল যে কেহ আমাকে সন্ধান করিতে আসে নাই, হুতরাং বুঝিলাম যে কৃষ্ণ সমস্ত দিনের মধ্যে একবারও বাসায় আসে নাই । কি করিল পানায় কৃষ্ণের নাম ধাম চেহারার বিবরণ সমস্ত লিখাইয়া দিয়া আসিলাম । দারোগা বলিল যে সময়ে সময়ে যমুনায় স্নান করিতে নামিলে কচ্ছপে ধরিয়া লইয়া যায়, হুই তিন দিন পরে লাশ পাওয়া যায় । বড়ই স্বেখর ; ইহা প্রাপ্ত হইয়া যথোচিত জট মনে থানা হইতে বাহির হইলাম ।

মনে করিয়াছিলাম যে আজ রাত্রির ট্রেনে দিল্লী ফিরিব । লালা দেওয়ান-চাঁদ আমার পুরাতন মকেল, তাহার স্বন্ধে আরোহণপূর্ব্বক হুই এক দিন দিল্লীতে বাস করিয়া যাইব । দেওয়ানচাঁদকে একখানা টেলিগ্রাম করিয়া দিয়াছিলাম যে, সকাল বেলায় পৌছিব, হুতরাং আর একখানা টেলিগ্রাম করিবার জন্ত ষ্টেশনে ছুটিতে হইল । বৃন্দাবন ষ্টেশনে শুনিলাম যে, টেনসন হইতে এক মাইল দূরে একজন লোক রেল কাটা পড়িয়াছে । তখনই রেলের সাত্তা ধরিয়া চলিলাম । সেখানে গিয়া দেখিলাম যে লোকটা কৃষ্ণ নহে । ফিরিবার সময়ে রেলের ডাক্তারের সঙ্গে ট্রলিতে আসিলাম । দেওয়ানচাঁদকে ভার করিয়া দিয়া যখন ষ্টেশন হইতে বাহির হইলাম, তখন রাত্রি নয়টা বাজিয়া গিয়াছে ।

কৃষ্ণ কোথায় গেল? ইহা ত বিবম সমস্তা, সমস্তা পূরণের কোনও উপায় দেখিতেছি না। সমস্ত বৃন্দাবন খুঁজিয়া আসিয়াছি, তাহাকে যখন পাই নাই, তখন সে নিশ্চয়ই বৃন্দাবনে নাই। ব্রজধামে যত গণ্ডগ্রাম আছে, আর যত ভিন্ন ভিন্ন বন আছে যথা কাম্যাবন, খদির বন, নিধু বন, নিকুঞ্জ বন, বৃন্দাবন ইত্যাদি, সে সমস্ত খুঁজতে গেলে তিন চারি বৎসর লাগিবে। অথচ কৃষ্ণকে ছাড়িয়াও যাইতে পারিতেছি না, কেমন করিয়া যাইব? সে অনেক দিনের লোক, মা'র বিবাহের পূর্বে সে আমাদের বাড়ী চাকরী করিতে আসিয়াছিল। আমি জন্মবার পরে সে আর দেশে যাইতে চাহিত না, মা জিজ্ঞাসা করিলে বলিত “থোকাকে ছেড়ে যেতে পারি না মা, বড় কষ্ট হয়।” আমি যখন বড় হইয়া উঠিলাম, তখন সে আমাকে চকুর অন্তরালে যাইতে দিত না, ঘূলে সে ছায়ার মত আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকিত। তাহার কণ্ঠ পিতার কাছে তিরস্কৃত হইত, তথাপি সে আমাকে ছাড়িত না। আমার জীবনের প্রথম পঁচিশ বৎসর সে কখনও আমাকে পরিত্যাগ করে নাই। বড় থোকা, টলি এবং ছোট থোকা জন্মিলে সে তাহাদিগকে লইয়াই বাস্ত থাকিত, তখন আর সে আমার কাজ করিবার অধিক সময় পাইত না।

পাঁচ বৎসর পূর্বে আমার একটি এক বৎসরের মেয়ে মারা গিয়াছে। কৃষ্ণ তাহাকে বড়ই ভাল বাসিত, তাহার প্রাণে ওরফতর আঘাত লাগিয়াছিল, তাহার পরেই সে মিরুঙ্গেল হইয়া যায়। কিছু দিন পরে কৃষ্ণ ফিরিয়া আসিল এবং জানাইল যে, সে বিবাহ করিয়াছে। তখন তাহার বয়স প্রায় পঞ্চাশ বৎসর। ইহার পরে কিছু দিন আমার নিকট থাকিয়া কৃষ্ণ দেশে চলিয়া যায়, তাহার পরে অনেক দিন আসে নাই। আমি এই বৎসর পূজার ছুটিতে বেড়াইতে বাহির হইবার পূর্বের দিন কৃষ্ণ আসিয়া উপস্থিত।

কৃষ্ণকে সঙ্গে লইয়া বিদেশে বাহির হইলাম। সে চিরকাল যেমন ভাবে আমার সেবা করিত, এখনও তেমন ভাবেই আমার সেবা করিতে লাগিল; কিন্তু সে সর্বদাই বিমর্ষ হইয়া থাকে, এবারে আর তাহাকে সদা হান্তময় প্রফুল্লবদন দেখি নাই। তাহার কারণ আছে, কৃষ্ণ আসিয়াই বলিয়াছিল যে তাহার স্ত্রীর মৃত্যু হইয়াছে। সে বৃদ্ধ বয়সে বিবাহ করিয়াছিল, সেই জন্তই বোধ হয় শোকটা তাহার অধিক লাগিয়াছিল। সে দেশ বেড়াইতে, চিরকাল ভালবাসে, তাহার মন প্রফুল্ল করিবার অল্প ভালহাউসীতে না থাকিয়া বানাহানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। কিন্তু এবারে যেন তাহার কিছুই ভাল লাগিতেছিল না।

সেই জন্তই সে হারাইয়া যাওয়াতে এবার অধিক ভাবনা হইতেছে, অল্প সময়ে তাহাকে খুঁজিয়া না পাইলে হয়ত এত ভাবিতাম না ।

রাত্রি দশটার সময় বাসায় ফিরিলাম, কোনই খবর নাই । ঘরে আলো নাই, বিছানা পাতা নাই, কাপড়গুলো যেখানে ফেলিয়া গিয়াছিলাম সেইখানে সেই ভাবেই পড়িয়া আছে । যাহা কখনও করি নাই তাহাই করিতে হইল ; নিজের শয্যা নিজেই পাতিয়া লইলাম, যতদূর পারিলাম কাপড়গুলো গুছাইলাম । এমন সময়ে পাণ্ডা খাবার লইয়া আসিল । সে বলিল যে কক্ষের কোনই সন্ধান পাওয়া যায় নাই, বুটের তিনটুকুরা পাওয়া গেছে আর এক টুকরা কাল প্রাতে পাওয়া যাইতে পারে ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আগা

৩রা নবেম্বর ১৯০৩ ।

মহারাজী !

আবার তোমাকে পত্র লিখিতে বসিয়াছি । কয়দিন যাবৎ বড়ই ব্যস্ত ছিলাম, সেইজন্ত পত্র লিখিতে পারি নাই । বৃন্দাবন থেকে বড় থোকা ও টলিকে যে পত্র লিখিয়াছিলাম তাহা বোধ হয় তাহারা এতদিনে পাইয়াছে । প্রায় সেড়মাস তোমাদের ছাড়িয়া আসিয়াছি, ইহারই মধ্যে অনেক পরিবর্তন হইয়া গেছে । প্রতি মুহূর্তে জগতের পরিবর্তন হইয়া গেছে, তাহা অদৃশ্য ; কিন্তু সম্প্রতি যে পরিবর্তন হইয়াছে, তাহা আমাদের মধ্যে আমরা জগতের যে ক্ষুদ্র অংশটুকু অধিকার করিয়া আছি তাহারই মধ্যে এই পরিবর্তন হইয়াছে, তাহা প্রত্যক্ষ । কক্ষকে খুঁজিয়া পাইয়াছিলাম, কিন্তু যখন পাইয়াছিলাম তখন তাহার জীবন শেষ হইয়া আসিয়াছে ।

সে হারাইয়া যাইবার দুইদিন পরে মথুরায় আসিয়া শুনিতে পাইলাম যে হাসপাতালে একজন বৃদ্ধ বাক্সালী আসিয়া অজ্ঞান অবস্থায় পড়িয়া আছে । কেচ তাহাকে চিনেনা এবং কেহই তাহার পরিচয় বলিতে পারে না । কোনও উচ্চ স্থান হইতে পড়িয়া গিয়া তাহার মস্তকে সাংঘাতিক আঘাত লাগিয়াছে, বোধ হয় চৈতন্যস্বার ফিরিবে না । সেই কক্ষ ।

হাসপাতালের ডাক্তার বাক্সালী । তাহাকে কক্ষের পরিচয় দিয়া তাহার অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করিলাম । তিনি বলিলেন যে, জীবনের কোন আশাই

নাই, তবে জ্ঞান চাইলেও চাইতে পারে। তাহার শেষ বৃহত্তর প্রতীকায় মথুরায় এ কয়দিন অপেক্ষা করিতেছিলাম। এখন সে আর নাই, তাহার জালা বঙ্গার অবসান চাইয়াছে, তাহাকে যমুনার জলে ভাসাইয়া দিয়া আসিয়াছি। তাহার চৈতন্য কিরিয়াছিল, মৃত্যুর পূর্বে সে আমাকে কতকগুলি কথা বলিয়া গিয়াছে, তাহাই তোমাকে লিখিতেছি। তাহা শুনিয়া তোমার কোমল মনে বাধা লাগিবে, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি ; তথাপি তোমাকে লিখিতেছি, কেন জান, সে কথাগুলি চির-পুরাতন অথচ বড় নূতন।

সে যাহা বলিয়া গিয়াছে তাহা নূতনতর বলিয়া তুমি বুঝিতে পারিবে, অথচ তুমি তাহা স্বীকার করিবে না। তাহা তোমার মনের কোমলতর কোণে আঘাত করিবে, অথচ তুমি তাহা বোধ করিবে না, বরঞ্চ তুমি সেই উদারমুদর বৃক্ষ উত্থাকে কুকাণ্ড বলিতে আরম্ভ করিবে। কখনই ইহার অগ্রথা হইবে না, ইহা সুদীর্ঘ সমাজ-বন্ধনের ফল। ভারতবর্ষে এ কথা যে শুনিবে সেই বলিবে যে কৃষ্ণের মত নির্দোষ মূৰ্খ ইহার পূর্বে জন্মায় নাই, কিন্তু পাশবিক সমাজের বাহিরে যেখানে মানুষ আছে, সেখানে তাহার কথা অমর কীর্তি লাভ করিবে।

দেহে যে বাস করে তাহার নাম প্রাণ, কেমন ত ? নিশ্চয় একজন সেখানে বাস করে, কারণ সে যখন ছাড়িয়া যায় তখন সেই বাসস্থানের অবহান্তর হয়। পরিত্যাগের সময় জড় বাসস্থান বড়ই কষ্ট পায়। কক্ষ যখন তাহার অর্ধ শতাব্দীর অধিক কালের বাসস্থান ছাড়িতেছিল, তখনই সে এই কথাগুলি বলিয়াছিল। মরণ-কাতরের জীবনব্যাপী হতাশার কথা দীর্ঘ অসম্পূর্ণ অনাবশ্য-কতা মিশ্রিত,—একরূপ প্রলাপ মাত্র। সেইজন্য তাহা তোমার জন্ম সাজাইয়া গোছাইয়া লিখিতেছি। মনে রাখিও যে ইহা কৃষ্ণের কথা। কৃষ্ণ বলিল—

“মোলি যখন গেল, তখন আমার বক্ষের অবশিষ্ট পঙ্কর কয়খানা ভাঙ্গিয়া গেল। সে অনেক দিন ধরিয়া ছশিকিংশ রোগে কষ্ট পাইতেছিল, আর জন্মাবধিই বড় রুগ, বড় দুর্বল। তাহার দুর্বল রোগক্লিষ্ট মূর্তিখানি দেখিলে আমার বড় কষ্ট হইত। তোমার অশ্রু সন্তানগুলির দ্বারা সে সুন্দর সুগঠিত নহে বলিয়া তোমরা তাহাকে তেমন ভালবাসিতে না। তাহার মাও তাহাকে তেমন ভালবাসিত না। সেইজন্য সে নিতান্তই আমার অসুখত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহাকে তোমার ভাল মনে আছে ; সে কাল ছিল, তাহার টলির দ্বারা চম্পকবিনিমিত্ত বর্ণ ছিল না, তাহার হস্তপদগুলি নীর্ণ ছিল, তোমার জ্যৈষ্ঠ পুত্রের দ্বারা সুগঠিত ছিল না। বহুদিন রোগ ভোগ করিয়া তাহার কক্ষ

চুপুগুলি অবিলম্বে উড়িয়া বেড়াইত। তোমরা কেহ তাহাকে লইতে চাহিতে না। তোমাদের সম্মান, তোমরা তাহাকে হারাইয়াছ, আমি তোমাদের মনে বাধা দিতে চাহি না ; কিন্তু সে তোমাদের নিকট বড়ই অনাদরে দিন কাটাইয়া গিয়াছে। তাহার ভাল করিয়া কথা ফুটে নাই, কিন্তু সে আধ আধ কথায় আমাকে যাহা বলিত, তাহা হইতে বৃকিতাম যে, সে তাহার অনাদর বৃকিত। রোগের যন্ত্রণায় যখন সে অস্থির হইয়া উঠিত, তখন তাহার মাতাকে সে ডাকিয়া পাইত না, মাতৃহস্ত-স্পর্শের যে অনির্বচনীয় শান্তি তাহা চিরদিন তাহার নিকট হ্রাসিত ছিল। তুমি পিতা, তুমি অর্ণের স্মৃতি দিব্যরাত্রি ঘুরিয়া বেড়াও, তুমি রোগক্লিষ্টা মরণাচতা শিশু কঙ্কার দিকে একবারও কি চাহিয়া দেখিতে ? কাহারও নিকট শান্তি না পাইয়া সে আমার নিকটে আসিত আমি যদি ঘুমাইয়া থাকিতাম, তাহা হইলে সে তাহার শীর্ণ উত্তপ্ত চাতখানি দিয়া আমাকে ডাকিত, আমি উঠিয়া বলিয়া তাহাকে কোলে টানিয়া লইলাম।

তাহার রোগ বাড়িয়া উঠিল, ডাক্তার আসিত, বৈজ্ঞানিক আসিত, কিন্তু তোমরা কি তখনও তাহাকে দেখিতে ? তোমার বোধ হয় মনে পড়ে যে, আমি তখন তোমাকে ছাড়িয়া দিব্যরাত্রি তাহার নিকটে থাকিতাম। হাবু, তোমাকে আমি জগ্নিতে দেখিয়াছি, তোমাকে আমি হাতে করিয়া মাছুষ করিয়াছি, তোমা অপেক্ষা কি তোমার সম্মানের উপরে আমার মায়ার অধিক হইতে পারে ? কিন্তু তুমি এখন বড় হইয়াছে, পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইতে শিখিয়াছ ; সে দুর্বল, রোগ-ক্লিষ্ট। আমি তোমাকে ছাড়িয়া তাহাকে পাইলাম। আমি বৃকিতে পারিয়া-ছিলাম যে সে বাচিবে না, কেমন করিয়া তাহা বলিতে পারি না। কে যেন আমাকে বলিয়া দিয়াছিল যে সে অধিক দিন এ জগতে থাকিবে না।

তাহার রোগ বাড়িতে লাগিল, যখন তাহা চিকিৎসকের চঃসাধা হইয়া উঠিল, তখন তোমরা শোকে আকুল হইয়া উঠিলে। সে দিব্যরাত্রি আমার নিকট থাকিত, আসন্ন মরণের যন্ত্রণায় সে যখন অস্থির হইয়া উঠিত, তখন সে তাহার মাতাকে ছাড়িয়া আমার নিকটে আসিত। আমি তাহাকে প্রবেশ দিবার চেষ্টা করিতাম, তাহাকে ভুলাইবার চেষ্টা করিতাম ; আমি মনে কষ্ট পাইব বলিয়া সেই অস্বাভাবিক শিশুও স্নেহের স্মৃতি শাস্ত হইল, কিন্তু মৃত্যু-যন্ত্রণা অসহ্য হইয়া উঠিলে কাদিয়া উঠিত।

তোমাদের সংসারে দীর্ঘকাল কাটাইয়াছি, বহুকালের অভ্যস্ত কার্যগুলি ছাড়িয়া দিয়া তাহাকে লইয়া যখন এদেশ ওদেশ ঘুরিয়া বেড়াইতাম, মিরকোদ

পিতা মাতা তোমরা ভাবিতে যে, তোমাদের শিশু কন্যা ভাল আছে, কিন্তু হাবু, তাহার যত্নণা অপেক্ষা আমার যত্নণা অধিকতর অসহ্য হইয়াছিল। আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছিলাম, যে, তিল তিল করিয়া মৃত্যু তাহাকে গ্রাস করিতেছে ; তাহাকে প্রাণপণে বন্ধে জড়াইয়া ধরিয়া আছি, অথচ কাহার অদৃশ্য শক্তি আসিয়া তাহাকে আমার বুক চইতে কাড়িয়া লইয়া যাইতেছে। আমার দেহের, আমার মনের, আমার চন্দ্রের, আমার বাহুর সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিয়া তাহাকে রাখিতে পারিলাম না, তাহার যত্নণার কণামাত্রও শাস্ত করিতে পারিলাম না। হাবু, ইচ্ছা অপেক্ষা অসহ্য যত্নণা জগতে আর কিছু আছে কি না বলিতে পারি না।

সকলে মিলিয়াও তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিলাম না, সে চলিয়া গেল। তাহার ক্ষুদ্র দেহখানি বস্ত্রের আবরণে আচ্ছাদিত করিয়া যখন গৃহ চইতে বাহির করিয়া লইয়া গেল, তখন সে গৃহে আশি আর তিষ্ঠিতে পারিলাম না। জিশবৎসর পরে তোমাদের সংসার পরিত্যাগ করিলান। মনে চইল যেন সমস্ত বাধন ছিড়িয়া গেছে, আর কেন থাকিব, কিসের চর্য থাকিব ? তখন তোমাকে মনে পড়িল না, হাবু, তুমি আমার বৃকের একখানি পঙ্কর, তোমাকে রাখিয়া আমি মরিতেছি, বড়ই শাস্তিতে মরিতেছি, কিন্তু তখন তোমাকেও মনে পড়িল না। কোথায় যাই, কোথায় গেলে শাস্তি পাই, এই কথাই মনে হইতে লাগিল। বহুকাল পরে দেশের কথা মনে পড়িল, তোমাদের বাড়ী আসিয়া অবধি দেশে যাই নাই, দেশে আপনার বলিতে যাহারা ছিল তাহারা বহুকাল চলিয়া গিয়াছে ! হাবু, মোলিকে ছাড়াইয়া দীর্ঘকাল পরে দেশে ফিরিলাম।

দেশে আসিলাম, বহুকাল পরে দেশে আসিয়া দেখিলাম যে পৈতৃক ভিটার বন জন্মিয়াছে, কেহই নাই। আত্মীয় কুটুম্ব আমাকে প্রথমে চিনিতেই পারিল না, তথাপি দেশেই রহিয়া গেলাম। তোমার পিতার তোমার পিতামহের সেবা করিয়া যে অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলাম, তাহাতে আমার অবশিষ্ট দিন-গুলি স্বচ্ছন্দে কাটিয়া যাইতে পারিত। সেই অর্থের সঞ্চয় পাইয়া জ্ঞাতি কুটুম্বের দল আমাকে পাইয়া বসিল ; সকলেই বলিতে আরম্ভ করিল, বিবাহ করিয়া সংসারী হও। আমি যে তখন সীমান্তে আসিয়াছি তাহা কেহ দেখিয়াও দেখিল না।

পরেশ ঘোষ আমার প্রতিবাসী, তাহার পিতা আমার খেলার সাথী ছিল ! তাহার কঙ্কাটির বিবাহের বয়স হইয়াছিল, তাহার মুখখানি দেখিতে

ঠিক মোলির মত । অবলম্বনহীন জীবন সাবলম্বন করিয়া তুলিব ইহাই অভিপ্রায় ছিল । পরেশের কন্যাকে পাঁচশত টাকা পণ দিয়া বিবাহ করিয়া বধু ঘরে আনিলাম, সে কেবল তাহার মুখখানি মোলির মত বলিয়া । মোলি যে দিন যায় সে দিন সে দারুণ যন্ত্রণায় মুখে “মা, মা,” বলিয়া ডাকিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার রোগশীর্ণ রক্তশূন্য তপ্ত মুখখানি কেবল আমার বুকেই লুটাইতেছিল । ভাবিয়াছিলাম তাহাকে পাইয়া ভাবিব মোলি ফিরিয়া আসিয়াছে, সেই স্তম্ভই বিবাহ করিয়াছিলাম ।

তাহার মোহ আমাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল, আমি যেন যাতুরের মায়ায় মোহিত হইয়া পড়িলাম । চারিদিকে ঐখানে সে বসিয়া থাকিত, সে পাড়াইতে শিখিয়াছিল, কিন্তু দুর্বল বলিয়া পাড়াইতে পারিত না, ক্রমশঃ সে পাড়ান তুলিয়া গিয়াছিল । বারান্দায় ঐখানে সে বসিয়া থাকিত । আমি যদি কোন কারণে কোথাও চলিয়া যাইতাম, তাহা হইলে তাহার নিশ্চিন্ত কাতর নয়ন দুইটি আমাকে চারিদিকে খুঁজিয়া বেড়াইত, আমি আসিলে তাহার রোগক্লিষ্ট পাতুর ক্ষুদ্র গুঁঠ দুইখানিতে আনন্দের হাসি ফুটিয়া উঠিত । ফিরিয়া আসিয়া মনে হইত ঐ বৃক্ষ সে বসিয়া আছে, —আমি চলিয়া গিয়াছি বলিয়া তাহার কাতর নেত্রদ্বয় আমাকে বৃক্ষ খুঁজিয়া বেড়াইতেছে । ঐ সে বসিয়া আছে, ঐ সে আমাকে দেখিয়া হাসিয়া উঠিল—না । ছায়া ? তাহার ছায়া ধীরে ধীরে মিলাইয়া গেল । সে আবার আসিবে মনে করিয়া বসিয়া থাকিতাম । তাহার মোহ-মদিরা আমাকে দিবানিশি মত্ত করিয়া রাখিত । এমন করিয়া কিছুদিন কাটিয়া গেল । দেশ হইতে পরেশ ঘোষ পত্র লিখিল যে তাহার কন্যাকে অধিকদিন পিত্রালয়ে রাখা উচিত নহে, জ্ঞাতি কুটুম্বেরা নিন্দা করিবে ।

তখন বড়ই বিপদে পড়িয়া গেলাম, কোথায় থাকি ? কোথায় যাই ? শুকনুখে বারান্দায় বসিয়া থাকিতে দেখিতাম, প্রতি প্রভাতে তাহার কাতর নিশ্চিন্ত নেত্রদ্বয় আমাকে যেন বলিত “আমাকে ছাড়িয়া যাইও না, আমাকে, আর কেহ ভালবাসে না, আর কেহ দেখিতে পারে না । আমি আর অধিকদিন এখানে থাকিব না, এখন আমাকে ছাড়িয়া যাইও না ।” ছই একদিন অন্তর পরেশ পত্র লিপিতে লাগিল “আমার কন্যাকে লইয়া যাও, লোকে নিন্দা করিতেছে ।” অবশেষে তোমাদের ছাড়িয়া দেশেই ফিরিলাম ।

দেশে আসিয়া নূতন করিয়া সংসার পাতিলাম, লইয়া আসিলাম,

তোমরা ভাবিলে যে পুরাতন কুতা বিনা কারণে ছাড়িয়া গেল । প্রথম প্রথম দিন কতক মন্দ কাটিল না । যাহাকে বিবাহ করিয়াছিলাম তাহাকে মোলি মনে করিয়া মোলির মতই তাহাকে পালন করিতাম, শুল্কহদয় পূর্ণ হইত, সে বিক্রী বিধন অভাবের ভাব দূর হইয়া গিয়াছিল । বেশ ছিলাম, মনে করিতাম ক্রমে মোলি বড় হইয়া উঠিয়াছে, সে মরে নাই, সে আমাকে পরিত্যাগ করিয়া যায় নাই, সে আমারই আছে, আমার নিকটেই আছে ।

কিন্তু তাহার বয়স যত বাড়িতে লাগিল, যৌবনশ্রী কুটিয়া তাহার মূৰ-শ্রী ততই পরিবৰ্ত্তিত হইয়া যাইতে লাগিল । মোলির মূৰের যে ছায়াটুকু তাহার মূৰে দেখিতে পাইতাম, তাহা যেন ক্রমশঃ মিলাইয়া যাইতে লাগিল, তখন আর আমার তাহাকে ভাল লাগিত না । ধীরে ধীরে তিল তিল করিয়া সে আমার মন হইতে দূরে, বহুদূরে সরিয়া গেল । মন তখন, আবার বহুদিন পরে মোলির অভাব অনুভব করিতে লাগিল । সে আমার স্ত্রী ; যখন প্রাথমিকস্থল নবপুষ্টিত যৌবন-শ্রী লইয়া কাস্তুর কামনা করিত, তখন আমি ভাবিতাম যে সে কলিকাতায় তোমার গৃহের বারান্দায় বসিয়া নিশ্চিন্ত কাতর নেত্রে আমার প্রতীক্ষায় পথ চাহিয়া আছে । এই ভাবে এক বৎসর গেল, দুই বৎসর গেল, কিন্তু এমন করিয়া কতদিন চলিতে পারে ? একদিন শুল্ক অগচ্ জনাকীর্ণ গ্রামাপথ, শুল্ক শব্দ মূৰ্ছিত দৃষ্টিগস্তে গুরিয়া আসিয়া দেখিলাম যে, গৃহ শুল্ক ।

শুল্ক গৃহ দেখিয়া মনে বড়ই আনন্দ হইল যে, সে গৃহ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে, সে যেন আমাকে লৌহ শুল্কে বাদিয়া রাখিয়াছিল, আমি যেন কারাগারে আবদ্ধ ছিলাম । সে চলিয়া গিয়াছে, আমি মুক্ত । আমার কারাগৃহ রক্ষীহীন, মুক্তির যে কি অপার আনন্দ, তাহা তুমি কি বুঝিবে ? সে চলিয়া গেল, তখন আত্মীয়-স্বজন, জ্ঞাতী-কুটুম্ব যাহারা দয়া করিয়া আমার চরণে লৌহ-নিগড় পরাইয়া দিয়াছিল, তাহারই প্রণমে অশ্রুতরয়ে, তাহার পর উচ্চৈঃস্বরে নিন্দা করিতে আরম্ভ করিল । আমি তখন বিপুল হরষে হরষিত, আমি তাহা গ্রাহ্য করিতাম না ।

আরও একবৎসর কাটিয়া গেল । কে যেন অলক্ষিতে আমাকে আকর্ষণ করিতে লাগিল । অদৃশ্য ব্যক্তি আমাকে কোথায় কোন্ দেশে লইয়া যাইতে চাহে তাহা বুঝিতে পারিতাম না । কিন্তু কে আমাকে ডাকিতেছে, কে আমাকে টানিতেছে, কে আমাকে কোথায় লইয়া যাইতে চাহে, ইহা অনুভব

করিয়া মনে বড়ই আনন্দ হইত, কেন হইত তাহা বলিতে পারি না। আরও এক বৎসর পরে আর দেশে থাকিতে পারিলাম না, তোমার নিকট চলিয়া আসিলাম।

তোমার সঙ্গে কত দেশে ঘুরিয়া বেড়াইলাম, কিন্তু কোথাও শান্তি পাইলাম না, অশুভ তখনও আমাকে অজ্ঞাত দেশে গিয়া যাইবার জ্ঞান আকর্ষণ করিত। যেদিন বৃন্দাবনে আসিলাম, তুমি ক্লান্ত হইয়া শুইয়া পড়িলে। সেদিন বড় গরম, আমি বাহিরে বেড়াইতে গেলাম। বৃন্দাবনের সঙ্গীর্ণ দীপালোকিত গলিপথে বেড়াইতে লাগিলাম। এমন সময় দেখিলাম একদল বাঙ্গালী স্ত্রীলোক আরতি দেখিয়া ফিরিতেছে। তাহাদিগের মধ্যে একজনের মুখ দেখিয়া চমকাইয়া উঠিলাম, তাহার মুখ মোলির মত কিছুর মত মোলি নয় ? কিছুর তাহার মুখ পরিচিত ! সেই—সে !

তাহার সঙ্গে, তাহার ফ্রোড়ে একটি ক্ষুদ্র শিশু, সে তাহাকে মা বলিয়া ডাকিল। সে আমার সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল, আমি পান্থ মূর্তির দ্বারা নিশ্চল হইয়া রহিলাম। সে যখন কিছু দূর অগ্রসর হইয়া গেছে, তখন আমি তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিলাম। সেই জনাকীর্ণ দীপালোকদীপ্ত পথ দিয়া স্বরাবিষ্টের মত ভ্রমত অবস্থায় চলিতে লাগিলাম। নগর ছাড়িয়া, রাজপথ ছাড়িয়া তাহারা দ্ব্যোত্থা-দ্ব্যোত গ্রামাপথ অবলম্বন করিল। ভূমি দিকে নবকর্ষিত ক্ষেত্র ধীরভাবে গোদুম শীর্ষের জ্ঞান অপেক্ষা করিতেছে। তাহারা সূর্যশ্রমদ্বারা শান্ত গ্রামগ্রামে আসিয়া পরস্পরের নিকট বিদায় লইয়া চলিয়া গেল, আমি তখনও তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে আসিতেছিলাম। এতক্ষণ সে পিছন ফিরিয়া চাহে নাই, তাহার সঙ্গিনীগণের সহিত কথা কহিতে কহিতে পথ চলিয়া আসিয়াছে। একা পড়িয়া সে বোধ হয় পদশব্দ শুনিতে পাইল, শুনিতে পাইয়া সে পশ্চাৎ ফিরিয়া চাছিল, আমি তখন দশ পদ দূর।

সে আমাকে চিনিতে পারিল, চিনিয়া ভয়ে ও বিস্ময়ে পথের মাঝে স্তম্ভিত হইয়া পড়াইল ; তাহার পরে অশ্রুট চীৎকার করিয়া উঠিল, তাহার শিশুও কাঁদিয়া উঠিল, আমি শিহরিয়া উঠিলাম। তাহার মুখ ঠিক মোলির মত ; যৌবনোদগমে যে আকৃতিগত সাদৃশ্য পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছিল, যাহা তাহা আবার কিরূপে আনিয়াছে। চন্দ্রালোকে তাহাকে অবিকল আমাদের মোলির মত দেখাইতেছিল। তাহাকে কেবল নিমেষের জন্যে দেখিয়াছিলাম,

তাহার পরেই সে তাহার কুটীরে প্রবেশ করিয়া অর্গলবন্ধ করিয়া দিল। আমি ফিরিলাম।

সেখানে আমার কোন আবশ্যক নাই বলিয়াই ফিরিলাম। তখনও স্বপ্নাঘিষ্টের মত চলিতেছি, কোণায় যাইতেছি তাহা বলিতে পারি না। তখন আমার মনে বিন্দুমাত্র কষ্ট বা হুঃখ হয় নাই, কেন তাহা বলিতে পারি না। চারিদিকে জনশূন্য প্রান্তর; শরদিন্দুকিরণধবলিত চারিদিকে কি বিশাল নীরবতা, শুষ্ক পত্রের মর্ম্মর ধ্বনিও কাণে আসে না। কতক্ষণ চলিয়াছি তাহা বলিতে পারি না। অনেকক্ষণ পরে দেখিলাম সম্মুখে পথ বন্ধ, তখন কেশবের পুরাতন মন্দিরের সম্মুখে আসিয়াছি।

স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল, দেখিলাম বহু দূর আসিয়া পড়িয়াছি, মগ্না নীরব নিশ্চল। আর চলিবার ক্ষমতা নাই, অন্ধকারে পুরাতন জনশূন্য মন্দিরে প্রবেশ করিয়া বসিয়া পড়িলাম। রাজি তখন কত চাইবে? বোধ হয় তৃতীয় প্রহর শেষ হইয়া আসিয়াছে। বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম, তাহাকে দেখিয়া হয় আবাত লাগিয়াছিল, মন তাহাতে ঝড় হইয়া গিয়াছিল, এতক্ষণে চিন্তাশক্তি ফিরিয়া আসিল।

সে—সে আমাকে ছাড়িয়া আসিয়া হুণে আছে, সে নূতন সংসার পাতিয়া বসিয়াছে, সে তাহার কলঙ্ক ভুলিয়া আশ্ব-বিস্মৃত হইয়াছে, আমাকে তাহার কোনই আবশ্যক নাই। সে—সে—তাহার মুখপানি মোলির মুখের মত। আমি ত সেই ক্ষুদ্রই তাহাকে চাহিয়াছিলাম—কিন্তু সে যে পরিবর্তিত হইয়া গেল—তখন আর আমি তাহাকে চাহি নাই। আমাকে দেখিয়া সে চিনিয়াছে, সে বুঝিয়াছে আমি তাহাকে চিনিয়াছি। তাহার নূতন সংসার টলিয়াছে, তাহার সাধের গৃহ এইবার তাহার ঘরের মত পড়িয়া যাইবে। তাহার মুখের ভাব কেমন? বর্ত্তিত হইয়া গেছে, তাহার নয়নদ্বয়ে সেই সেই পুরাতন নিম্ভত কাতর নেত্রের করুণ চাহনির ভাব ফিরিয়া আসিয়াছে,—মোলির মত—সে আবার মোলির মত হইয়াছে।

না। আমি যাইব না—তাহার কাছে যাইব না, তাহার পথভ্রান্তির কণা জগতে প্রকাশ করিব না, তাহা হইলে তাহার শিশুকে লোকে জারজ বলিবে—সে মনে ব্যথা পাইবে, আবার তাহার নেত্রদ্বয়ে অসহায়তার কাতর ভাবটি ফুটিয়া উঠিবে। —না—আমি তাহা সহ করিতে পারিব না, আমি তাহা দেখিতে পারিব না—আমি যাইব না।

এমন এই কথাটি মনে আসিল অননি মনে হইল যে মন্দিরের অন্ধকারে কে যেন হাসিয়া উঠিল। আবার কে হাসিয়া উঠিল—সে হাসি কাহার? তাহা যেন কোথায় গুনিয়াছি।—কাহার?—কাহার?—কে সে? সে যখন তোমার গৃহের বারান্দায় বসিয়া থাকিত, যখন সে অসহায়ের মত চারিদিকে অবেষণ করিত, তখন আমাকে দেখিতে পাইলে এমন করিয়াই হাসিয়া উঠিত। এ যে তাহারই হাসি—আমি অনেকদিন গুনি নাই বলিয়া ভুলিয়া গিয়াছিলাম।

সে আবার হাসিয়া উঠিল—সেইবার দিক্ ঠিক করিলাম! সে যে উপরের বারান্দায়? কেমন করিয়া উপরে উঠিলাম, তাহা বলিতে পারি না, উপরে উঠিয়া দেখিলাম, সেই—সে—সেই হাসিতেছিল—সেই মৌলি। সে ত—মথুরা নয়—সে কলিকাতায় তোমার গৃহের বারান্দা—সে পূর্বের মত সেইখানে বসিয়া আমার প্রতীক্ষা করিতেছিল। তাহার পরে সে একটা গোলাপী মেঝে ভাসিয়া উঠিল। অন্ধকার দূর হইয়া গেল—ঈশ্বর রক্তামরলবণ সিদ্ধ আলোকে জীর্ণ মন্দির পূর্ণ হইয়া গেল—মেঘের উপরে বসিয়া সে উজ্জ্বল উঠিতে লাগিল—সঙ্গে সঙ্গে আমাকে আহ্বান করিতে লাগিল, সে যখন ভ্রমণ করিতে বাইত, তখন যেমন করিয়া আহ্বান করিত, তেমনি করিয়াই ডাকিল। হাবু, আমি আর থাকিতে পারিলাম না, তাহার অগ্ৰ আমার সর্করণীর কাঁপিয়া উঠিল, আমি তাহার রক্তাভ মেঘ ধরিয়া তাহার সঙ্গে তাহার নৃতন বেশে যাত্রা করিলাম। ইহাই কৃষ্ণের শেষ কথা।

মহারাণী! কৃষ্ণ চলিয়া গিয়াছে, বোলির নিকটই চলিয়া গিয়াছে। আমি জানিতেছি যে পত্র পড়িয়া তুমি কাদিবে, তোমার তাহার কথা মনে পড়িবে, তথাপি লিখিলাম। কাল দেশে ফিরিব, টলি, বড় থোকা, ও ছোট থোকাকে বলিও যে তাহাদের অগ্ৰ কিছু কেনা হইল না। মঙ্গলবার সকালবেলায় বাড়ী পৌছিব।

তোমারই

পুরাতন

পনি।

শ্রীকাকনমালা দেবী।

কর্ণ

(১)

নাভবক পরিত্যক্ত অভ্যাগা সন্তান
হায় কর্ণ ; শৌর্য্য-রাজ্য যশোধন মান
কিছুতে ছিলনা তৃপ্তি বিরহ বিধুর
তব শূন্য ক্ষদয়ের, হাহাকার দূর
হয় নাই কোন দিন, হায় অভাজন
মাতৃভ্রাতৃ-পীড়ন-বঞ্চিত ; অশুশ্রুণ
তুমাতুর বক্ষে তব তাই দ্রব্ধমানল
আলিঙ্গাছে দীপ্তবল্লিশিখা অচঞ্চল
মক-মরীচিকা সম, অব্যর্থসন্ধান
তাই বৃহস্পতি তব হিংসাক্ষিপ্ত বাণ
অভিমত্যা-ক্ষদয়ের তরুণ বদির
পান করেছিল স্নেহে, কর্তব্যো বদির
বিমুগ্ন স্নেহের করি' সৰ্ব্ব অবিচার
প্রতিশোধ ; পূর্ণ করি' বিধি বিধাতার ।

(২)

পিতৃধনে ধনী তুমি ওগো মতিমান
দাতাকর্ণ নাম ধর, তপন সন্তান
তব দান নিষ্কিচর, ধনী দীন জনে
তৃপ্ত করিয়াছ তুমি অকুণ্ঠিত মনে
মুক্ত হস্তে, সমদৃষ্টি তাহারি মতন
স্বত-অদিরেণে তাই ভক্তিনয় মন
পূজিয়াছ অহুদিন, দাত্রী নাভকায়
পুত্রের অধিক স্নেহে যতনে সেবা
দিয়াছ গোরব, দৃষ্টভেজে পূর্ণ হিয়া
রক্ষার কবচ খুলি শত্রুকরে দিয়া
ক্ষুধ নহ তবু, পুত্র দিলে বলিদান
রাধিতে অতিথিরূপী দেবতার মান
হাস্তমুখে, কর্ণ তুমি তপনতনয়
ধর্মসম যুজ্যয়ী অশোক নির্ভয় ।

শ্রীপ্রিয়দা দেবী

কাশী-স্মৃতি ।

সাহিত্যিক উদ্বেগ লইয়া কাশীতে যাই নাই । কিন্তু মাঝে মাঝে গলিতে
গলিতে যেন একটা প্রাচীন ভাবরাজ্যের আব-হাওয়ার স্নেহে কম্পন
অবহৃত হইত । ঘাটের পর ঘাট, মন্দিরের পর মন্দির, মাহুঘের গায়ে
নাহুস যেন ধাক্কা দিয়া চলিয়াছে ;—হঠাৎ ভ্রম হয় যেন এমিতর অনাদিকাল
হইতে চলিয়াছে, সমস্ত দৈনন্দিন সংসারকে ছুই হাত দিয়া সরাইয়া দিয়া
চলিয়াছে । 'সহরের বৃকের উপর,—বড় রাস্তায় মুখায় খুটানের প্রকাণ্ড
গির্জা যেন এই জীবনপ্রোতের মাঝখানে হঠাৎ থমকিয়া পাড়াইয়া গিয়াছে,
যেন এখানে তার করিবার কিছুই নাই, নূতন বাগী ওনার্হবার কিছু নাই ।
প্রাচীন বিদ্যেধর-মন্দির ভাঙ্গিয়া কালাপাহাড় যে মসজিদ নির্মাণ করিয়া-

ছিল, তাহাও কক্ষচ্যুত উপগ্রহের ছায় পড়াইয়া আছে যাত্রা ! মুসলমান হার মানিল, পৃষ্ঠান সমস্তমে দূরে পড়াইয়া রহিল ।

রেলিংএ ঘেরা জ্ঞানবাপী*। কালাপাহাড়ের কবল হইতে রক্ষা করিয়া তন্মধ্যে শিবলিঙ্গ নিমজ্জিত করিয়া রাখা হইয়াছিল । ব্রাহ্মণ আবার তাহাকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিলেন । চিরদিনইত আখ্যাবর্তের ব্রাহ্মণ জ্ঞানবাপীর পার্শ্বে একাগ্রচিত্তে তপশ্চরণ করিয়া আসিতেছেন । গুহামধ্যে অবস্থিত ‘রসো বৈদ্যঃ’ ; সাধনা পূর্ণ হইলে তাহাকে আবিষ্কার করা যায় । যুগে যুগে এই রকমই হইয়া আসিয়াছে । আজও ব্রাহ্মণ সেই সনাতন সত্যটি আঁকড়িয়া ধরিয়া আছেন ।

অন্নপূর্ণা-বিশ্বেশ্বরের দৈত্যবৈধত রহস্তে কাশীধাম পরিপূর্ণ । মানববুদ্ধি মনীষা (intellect) এক্ষণে সচকিত, পরাকৃত ; তাহার পিছনে যে নিত্য-বস্তু—যে চিরজাগ্রত ভাবুক আত্মা (spirit)—আছেন, তিনি আজ ঢকল ।

সন্ধ্যার ঘনাককারে শরতের পরিপূর্ণ গঙ্গা উত্তরবাহিনী হইয়া চলিয়াছে । সারি সারি সারি জলন্ত প্রদীপ বনের উপর ভাসিতেছে । বিশ্বেশ্বর, অন্নপূর্ণা গঙ্গা ;—মাহুঘ এখানে এই তিনে-এক, একে-তিন, দেবতাটিকে পূজার অর্ঘ্য দিতেছে । অন্নপূর্ণা ও গঙ্গা এখানে সতীন । কিন্তু সেই গানটি মনে পড়ে । মাতা মেনকাকে কহা অন্নপূর্ণা বলিতেছেন—

হর আমার ছন্দে রাখে,
সে ছটায় লুকায়ে দেখে ;
সে আমার প্রিয়তমা স্বথের স্থধিনী,
তোমার অধিক ভালবাসে স্তরধুনী

এ সব চরিত কেবলমাত্র ভাবের উচ্ছ্বাস । উপায় নাই ;—বুদ্ধির বিচার (intellect) এখানে পরাকৃত ।

কিন্তু অনতিদূরে, সারনাথে, মনীষা (intellect) জাগ্রত হইয়া কোত্-হলী হইয়া উঠে । আড়াই হাজার বৎসর পুর্বেকার ইতিহাসের যবনিকা যেন একটু সরিয়া যায় । অসংখ্য স্তূপ পরিবৃত্ত অশোকস্তম্ভ, বৌদ্ধমঠের চিহ্নবিশেষ আরও কত কি পাঁচখণ্টা ধরিয়া দেখিলাম । প্রতীত্য সমুৎপাদ-তত্ত্বের আবিষ্কারের পর যখন বুদ্ধদেবের সম্বোধিত হইল, তখন তিনি পৃথিবীকে সাক্ষী রাখিবার জন্য অশ্রুত দিয়া পৃথিবীস্পর্শ করিলেন । যাহ-যারে (museum) এর মধ্যে সেই ভূমিস্পর্শ স্মারক একখানি প্রতিষ্ঠিত আছে ।

কাশীতে গেলে একটি কথা বড় বেশী করিয়া মনে পড়িতে থাকে । যে পবিত্রতার পুণ্যত্ব (sacredness) এর (idea) ভাব যুরোপে নাই বলিয়া আজ সেখানে মহাশ্রম—সেখানে ধর্ম (church) জীবন (life) আত্মসম্মান (honour) কিছুই শ্রদ্ধাযোগ্য (sacred) নয়—সেই জিনিষটার আভাস এখনও আমাদের তীর্থস্থানে অলুভব করা যায় । রবীন্দ্রনাথ যে ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যকে অতিরিক্ত মাত্রায় মর্যাদা দান করিয়া গল্পচ্ছলে ইউরোপীয় ছাঁদে নরনারী চিত্র আঁকিতেছেন উহা এ সমাজের পক্ষে হিতকর কি না কে জানে ? তাহাতে ভাঙ্গা যায়, ভোঁড়া যায় না । যে পাদপে বিংশ শতাব্দীর বাংলায় সবুজ পত্র গজাইতেছে, সেই পাদপের মূল শত শতাব্দীর নিম্নতম স্তরে প্রোথিত । যুগে যুগে কত সবুজ পত্র তাহাতে গজাইয়াছে, পীত পত্রে পরিণত হইয়া ঝরিয়া পড়িয়া গিয়াছে, তাহার পবন কে রাখে ? সেই পাদপের তলে কত ঋণের আশ্রয়, কত গুরুশিষ্য সংবাদ, কত হোমধেয়, আশ্রয় যুগ ঋণবালক ও ঋণিকুমারীর মিলন, কত রাজসি লক্ষ্মীর অভ্যাস ও তিরোভাব ! তখনকার সবুজপত্র বিস্ময়টী হইয়া অল্পমাত্র হইত কি ? অথবা—

‘অগ্নি হুগ্নি দিত আনি’

অর্থের পল্লবদলে করিয়া বীজন

মূহ স্বরে’ ?

শারদ পূর্ণিমায় কলকলনাদিনী উত্তরবাহিনী গঙ্গার তটে দশাশ্বমেধ ঘাটে বসিয়া সেই অগ্নিহুগ্নির সন্মান করিয়া যায় ।

অসংখ্য নরনারীর কলকণ্ঠস্বরে মুখরিত ঘাট হইতে বিধেবরের অন্নপূর্ণা মন্দিরের আরতিতে লোকসমাগম দেখিলে মনে হয় যেন মদনভস্মের পর একটা স্ত্রীপুরুষভেদবিরহিত মানবাত্মা (sexless) ধূস্রটিজটাজ্জট গঙ্গোদকে অবগাহন করিয়া মহাযোগী বিধেবরের দ্বার হইতে অন্নপূর্ণা-মন্দিরে যায় ; এবং সেখানে কুলবিধবলের নির্মালা মস্তকে ধারণ করিয়া মহাদেবের সহিত একাত্ম হইতে চাহে ।

ঐ তীর্থবাহিনী ।

উদ্ধা ।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(৪)

সেদিন হইতে শৈলেন আনার আর লক্ষী সপক্ষে কোন কথা বলিল না বটে, কিন্তু আনার পাপিষ্ঠ মনটা তাহার চেয়েও বোধ হয় আমার বেশি শরু ; তাই সে সেই দিন হইতে যখন তখন আনার মধ্যে দেখে এক অতীত দিনের চিত্র ফুটাইয়া তুলিয়া কত কি যেন অবোধা অম্পষ্ট ভাব, ভাষা প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিয়া দিল । যখন পূর্বে লক্ষীকে দেখিয়াছিলাম, তাহার ছাংখে সহাস্রভূতি করিয়াছিলাম, তাহার রূপের প্রশংসা করিয়াছিলাম, নারী মূর্ত্তি কল্পনায় মন তাহাকেই যেন আদর্শ করিয়া রাখিয়া দিয়াছিল ; কিন্তু তা ছাড়া আর কিছুই ত নয় । কিন্তু সে দিন শৈলেনের ঘটকালীর পর, তাহার সঙ্গফটা যেন কতকটা বদল হইয়াছিল । এখন গীতাপাঠ শেষে হঠাৎ এক সময় হয় ত মনে হয় এই বইটাই গুলা গুছাইয়া রাখিবার একজন থাকিলে, বড় মন্ব হইত না । পুজার কল সাজাইয়া দিতে খাট খাট শুভ আশ্রুলগুলি বেশ মানায় ! এনি এনি একটা আনছায়ার মত তরুণ কল্পনা মনে উঁকি-ঝুকি মারিতে গেলে যদিও মার খায়, তবুও সেটা স্বক্ষে ভর করা ভূতের মত সঙ্গ ছাড়িতে রাজী হয় না ।

শৈলেনেরও এ ক্ষেত্রে কিছু অপরাধ ছিল । আমি তাহাকে বিবাহ করিতে না হয় সম্মত হই-ই নাই ; তা বলিয়া তাহার কথা শুনিতেও ত আমার কোন বাধা থাকিতে পারে না ; আর তাহাকে কিছু বলিতেও মানা করি নাই । তবে হঠাৎ একবার করিয়া আমাকে বিবাহের বর সাজাইয়া দিয়াই পরক্ষণ হইতে তাহার কোনও কথা সপক্ষে একেবারে জিহ্বা বদ্ধ করিয়া ফেলিল কেন ? বোধ হয় সে আমার বিরক্তির ভয় করিত ? সে হয় ত মনে করিয়াছিল, বারে বারে এ অপ্রিয় প্রশঙ্গ উত্থাপন করিলে আমি এখানে থাকিতেই চাহিব না । ভালই করিয়াছিল বোধ হয় । কিন্তু তাও ঠিক বলিতে পারি না । যেখানে তোষামোদ ধারক সেখানেই অনিচ্ছা । সেটি ফুরাইলে অনিচ্ছাও সঙ্গেসঙ্গে ফুরায় । শৈলেন অনেক লেখা পড়া শিখিয়াছে, বড় কাজও স্বখ্যাতির সহিত সম্পন্ন করিতেছে ; কিন্তু এ সব শিখিলে কি হইবে, মানব-প্রকৃতির গুপ্তরহস্য সে কোনদিনই আমার মত স্বপ্নদর্শন—শক্তি

প্রয়োগ দ্বারা অল্পধাবনপূর্বক পাঠ করে নাই। এ বিষয়ে তাহার অতিজ্ঞতার লেশও ছিল না। আমি তাহার, এই মানব চরিত্রানভিজ্ঞতার জন্ত মনে মনে কহুনি তাহার উপর একটুপানি অসম্বুধ হইয়া রহিলাম। আমি হইলে আমার কখনও এমন-ধারা ভুল হইত না! আমি ঠিক বুদ্ধিতে পারিতাম যে, বিবাহ করুক আর নাই করুক, মনে মনে সে লগ্নীকে যে প্রশংসা না করে, তাহার সম্বন্ধে ছ' একটি কথা যে, জানিতে ইচ্ছুক হয় না এমন কখনও হওয়া সম্ভব নয়। অন্যের সহিত আমার ঠিক এইখানেই প্রভেদ! এই জন্যই আমার সহিত কাহারও মনের মিল হয় না। শৈলেন্দ্রের সঙ্গে আমার মনের মিলের সীমা ছিল না, কিন্তু মতের মিল যে নাই, তাহা পূর্বেই দেখাইয়াছি।

এমন করিয়া দিন যাইতেছিল, আমারও সেদিনকার আলোচনা বড় একটা আর স্মরণ ছিল না। আজকাল মূগ শরীরের অলৌকিক শক্তি সম্বন্ধে আমাদের ঘন ঘন আলোচনা চলিতেছিল। শৈলেন্দ্রের অস্বাস্থ্যের দ্বারা আমার রোধ চড়াইয়া দিয়াছিল। আমি প্রাচ্য পাশ্চাত্য লিখিত অলিখিত সমুদয় সম্মানিত অসম্মানিত ব্যক্তিগণের বর্ণিত প্রমাণ প্রয়োগ করিয়া, নিজের পক্ষ সমর্থন করিতেছিলাম। আজকাল কালের সবটুকু সময় এই এক ভর্কেট কাটিয়া যায়। আমি মূগ শরীরভাগী-সম্বন্ধে বিবিধ অদ্ভুত কার্য প্রণালীর বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছিলাম। যে জীনিতাবস্থায় যে বিষয়ে বিশেষ আগ্রহ-সম্পন্ন বা বিদ্বেষ-ভাবাপন্ন থাকে মৃত্যুর পর তাহার অপেক্ষাকৃত মূগ ভৌতিক শরীর প্রবল শক্তি লাভ পূর্বক জীবিতের পক্ষে অসম্ভব সেই সকল কার্য সম্পাদন করিয়াছে, এ সম্বন্ধে আমি অনেক বড় বড় পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরও মত প্রদর্শন করিতেও ক্রটি করি নাই। শৈলেন্দ্রের মতে সেই বিপাত পণ্ডিত-গুলির মস্তিষ্ক চিকিৎসা-বিজ্ঞানের অল্পশীলনের যোগ্য হইয়াছে। সে কেবলি হাসে ও বিপরীত যুক্তি বাহির করে। ইহার মতো একটা যুক্তি এই যে, মূগ শরীর হুলের সাহায্য ব্যতিরেকে স্বয়ং কৰ্ম-ক্ষমতা লাভ করিতে পারে না। ইহার সম্পূর্ণ ভাবেই পরম্পরাশ্রয়ী।

একদিন এই আলোচনার মুখে তড়িতা হঠাৎ হাসিয়া কহিলেন “আমি মরে যদি মূগ শরীর হয়ে বেড়াই, তা হলে কি করি, জান ঠাকুরপো?”

এ কথায় তিনি আমার সপক্ষতা বা বিপক্ষতাচরণ করিতেছেন, বুদ্ধিতে না পারিয়া আগ্রহ বা অনাগ্রহনুল্লামনি আত্মা ভাবে জিজ্ঞাসা করিয়া “না, কি কর?”

“তা হলে আমি আমার এই বাসার মধ্যে অদৃষ্টভাবে, বাস করি, না যাই স্বর্গে, না যাই নরকে। লোকে আমার দেখতে না পেলেও আমি সবাইকে দেখতে পাই, সব শুন্তে, সব জানতে পারি ! আঃ, তা হলে কি যে আমার স্বথ হয়, সতি ঠাকুরপো ! আমি তাহলে তোমায় কত যে তখন আশীর্বাদ করছি।” বলিতে বলিতে তাহার হাসি মুখখানি সেন একটা আনন্দের দীপ্তিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি স্বামীর দিকে হর্ষবিকশিত নেত্রে চাহিয়া বলিলেন “কিন্তু যদি দেখি তুমি আমার জন্য অত্যন্ত কাতর হয়ে আছ, অথচ আমি তোমায় জানাতে পারব না যে আমি কোথাও যাইনি এই এইখানেই তোমার কাছেই আছি, তা হলে কি ভয়ানক যন্ত্রণাজোগ করতে হবে ? সেই ভেবেই যা ভয় হয়, না হলে, হ্যা ঠাকুরপো ! হৃদয়বীরধারীরা কি মানুষের মত কথা কইবার শক্তি পায় না ?”

বউদিদি যে সবটাই তামাসা করিতেছেন না, সে পরিচয় তাহার দ্বিজ্ঞাসার দরণে ও কণ্ঠস্বরের ব্যগ্রতায়ই প্রকাশ পাইল। কিছুই আশ্চর্য্য নয় ! একজন পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলিয়াছেন, সকলকার সকল বিষয় বিশ্বাস করিবার শক্তি থাকে না। আমি তাহার স্ববুদ্ধির পরিচয়ে শুধু তাহার পরেই নয়,—শিক্ষিতা মেয়েদের প্রতি যে মাত্রায় বিরক্তি পোষণ করিতাম, তাহারও কতকটা বিশ্বস্ত হইয়া এই শ্রেণীর মহিলাদের উপরেও সন্দেহ হইয়া, প্রথমে শৈলেনের দিকে চাহিয়া বলিলাম “মেয়েদেরও যদি বুঝাইয়া দেওয়া যায়, দেখিতেছি, অনেক পুরুষের চাইতে তারা বেশি বুদ্ধিতে পারেন।” গৃহিণীর দিকে চাহিয়া বলিলাম “তা বাবে না কেন ?” গুব্ব যায়। তবে শুনিয়াছি সে ভাষা ঠিক এই জীবিত আমাদের মত হয় না।”

ভড়িতা হাসিয়া স্বামীর বাণিত মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন “তবে আমি মনেও তোমার কাছ-ছাড়া হব না ; সে বেশ হবে।”

‘আমি তৎক্ষণাৎ একটু ব্যঙ্গ করিলাম, এরূপ ব্যঙ্গ বোধ হয় সাধারণ লোকে সচরাচর করে না ; কিন্তু আমার মতে, সত্যের আভাষ সকলেরই দেওয়া চলে, ইচ্ছাতে সঙ্কোচ করিবার আবশ্যক দেখি না। “কহিলাম আর যদি দেখে যবে সতীন আসিয়াছে ?”

এই কথায়, স্নেহস্রোতঃ ভড়িতার সহাস্য মুখে, বেক্রোধের মুখের মত যন্ত্রণা, ভয়ের আর্তি চিহ্ন সেন প্রকট হইয়া উঠিল। সে চেনকিয়া স্বামীর দিকে করুণ চক্ষে চাহিয়া, ভীত শিশুর মতই তাহার দিকে একটুখানি সরিয়া

গেল। যেন আততায়ীর হস্ত হইতে আশ্রয়কার জন্য একটা দারণ ব্যাকুলতা সেই মুহূর্তে তাহাকে একেবারে অধীর করিয়া তুলিয়াছে। শৈলেন্দ্রও শিহরিয়া বিবর্ণমুখে ত্রীর ভয়াবহ মুখের দিকে চাহিল। তারপর সে ক্ষোভ ও ব্যথার সহিত আমার দিকে গিরিয়া কড়িয়া উঠিল “ও সব কথা ছেড়ে দাও তোমরা। তড়িৎ বেশ ভালই জানে, সে ভয় তার নাই। তাছাড়া সে আনাগ ছেড়ে গেতেই পারবে না। কোথায় যাবে? না না, সে যে আমার সর্বস্ব! এ পৃথিবীর সবটুকু আকর্ষণের হেতুই যে আমার তড়িৎ। না ভাই, ও রকম কথা আর আমি কখনও তোমাদের কইতে দিব না।”

বৌদিদির ‘সপত্নী’-সম্ভাবনার স্মৃতিতেও এত বড় বিচলিত ভাব দেখিয়া আমিও নিজেস্বরূপ অসাবধানতায় কতকটা গজ্ঞা পাইয়াছিলাম। তাহার এ সম্বন্ধে এত বড় অসহ্য ভয় ভাবনা আমার বিস্মিতও করিল। মৃত্যুর পর তাহা-হীন গৃহেও নারীর প্রবেশ-কল্পনা, তাহার স্বামীর প্রতি অপরের অধিকার স্থাপন-চিন্তা, এটুকুও তাহার প্রাণে সঞ্চে না? কি প্রবল সপত্নী-বিশেষ ত্রীলোক পোষণ করে! যাক্ এ আলোচনা এইখানেই সমাপ্ত করা গেল। কিন্তু তাহার পরও দু’ একদিন পর্য্যন্ত যেন বৌদিদিকে কেমন অস্বস্তি বোধ হইতে লাগিল। বোধ করি তাহার দুর্বল বক্ষ প্রবল স্পন্দনের বেগে অনেকখানি দমিয়া পড়িয়াছিল। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলাম আর কখনও কোন গেরেমানুষের মাগাতে সতীনের কথা উল্লেখ করিব না।

(৫)

শৈলেন সে দিন আমাকে মানিকতলাও দাঁড়ির কেশব শিরোমণির সাগ্রহ নিমন্ত্রণ গ্রহণের সপক্ষে অশেষবিশেষে বিবিধ বৃত্তি প্রদর্শন করিয়া যখন কৃতকার্য হইতে পারিল না, তখন সে নিজেই একটু ক্ষুণ্ণমনে বাহির হইয়া গেল। বলিল “শিরোমণি আমার আশা করবেন; কেউ না গেলে তাঁকে অপমানিত করা হয়।”

যাইবার সময় আমার আর কিছু বলিল না, কিন্তু ঠিক সেই সময়টিতেই আমার মনে হইতেছিল, আচ্ছা না হয়, তা একবার যাওয়াই যাক; কিন্তু সে বুদ্ধিমান হইলেও এটুকু স্বল্প বোধশক্তি “তাহার মধ্যে ছিল না যে, চিত্তরহস্তের এ গোপন লেখা পাঠ করিতে পারে।

শৈলেন চলিয়া গেলে মনটা একটু খারাপ হইয়া গেল। না হয় আমি

যাইব না-ই বলিয়াছিলাম, তা সে আর একটু ক্ষেদ করিলেও ত পারিত! শৈলেনের ঐ কেমন দোষ, সকল কাজেই হয়!

একা একা পানিকক্ষণ বসিয়া থাকিয়া আর ভাল লাগিল না। মনেও একটু কোহুচল জাগিল, ভাবিলাম ইহাতে আর দোষই বা কি? মাহুধ কি আর মাহুধের বাড়ী বেড়াইতে যায় না।

হুপুরবেলা চারিদিকে রোদ ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে; দীঘির কাণোজলে মাঝে মাঝে ভালগাছের ছায়ার সঙ্গে রোদ চিকমিক করিতেছিল। কেহ কোথায়ও নাই। ছোট্ট শিব মন্দিরটির পাশে চালা ঘরখানিতে শিকল দেওয়া, একপাশে মাটির ডাবা'র মাথা 'জান' সামনে করিয়া একটি ক্ষুদ্রপুটে 'পাট-নায়ে-গাই', ডাবডেবে চোক মেলিয়া আমার দিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল। ইচ্ছা থাকিলেও হয়ত ভাবার অভাবে সে তাহাদের এই নূতন অতিথির অভ্যর্থনা করিতে সমর্থ হইল না।

বড় লজ্জা করিতে লাগিল। একবার ভাবিলাম এখনও আমায় কেহ দেখিতে পায় নাই, এই সময় না হয় ফিরিয়া যাই। কিন্তু ওই যে 'কিন্তু' শব্দটাই মাহুধের চির বিষয়।—সে বলিল, এতদূর আসিয়া শুধু গ্লা পায়ের ফিরিবে? শিরোমণির সহিতও না হয় দেখাটা করিয়া ফেল। মনও যায় দিল, বলিল “বুদ্ধ ব্রাহ্মণ বৈত নয়। দেখা করার জন্ত অপেক্ষা করিলে কিছুই দোষ হইবে না। বৃদ্ধের প্রতি আকর্ষণ, মোহ পদবাচ্য নহে।” কথাটা বৃক্তিসঙ্গত। কাজেই রহিয়া গেলান।

দীঘির তলা পর্য্যন্ত সানবাধান; চারিদিক বেড়িয়া বেড়িয়া বাধান সিঁড়ি। জল হির স্বচ্ছ, গভীর।

এদিক ওদিক ঘুরিয়া মাহুধের সাড়া না পাইয়া একটু আশ্চর্য হইলাম। মনে সন্দেহ হইল তবে বোধ হয় শিরোমণির বাসা এখানে নয়, আর কোনখানে; নইলে শৈলেনেরও ত এখান এখানে থাকা সম্ভব ছিল। ফিরিব মনে করিতেছি, এমন সময় কতকগুলো শর গাছের শিছনে কোপের পাশ হইতে মনুষ্য-কণ্ঠ শোনা গেল—‘আমি তোমায় স্তম্ভী করিবার জন্ত দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়াছি। কতদিন আর এ অবস্থায় দেখিব? বল লক্ষ্মী, না মা তুমি আমায় কিছু সঙ্কোচ কর না। তুমি জার্ম না লক্ষ্মী, আমি তোমায় সেই প্রথম দেখা থেকেই বড় ভালবেসেছি।’

এ কি শুনিলাম! এ যে শৈলেনের গলা? সে লক্ষ্মীকে ভালবাসে? আমার

পিঠে কে যেন চাবুক মারিল। একি সভাই আমি স্বকর্ণে শুনিলাম না আমার এ মিথ্যা কল্পনা ? শৈলেন নিজের মুখে এই নির্জন কানন মধ্যে অরক্ষিতা গুবতীকে বলিতেছে “তুমি জানি লস্কি, আমি সেই প্রথম থেকেই তোমায় বড় ভালবেসেছি।” ছি ছি কি লজ্জার, কি পরিতাপের কথা ! অমন দেবপ্রতিম শৈল, তার এই পরিণাম ! এ শুধু তাহাদের আধুনিক শিক্ষা, সংসর্গ ও উচ্ছৃঙ্খলতারই ফল। তাহার দোষ কি ?

কিন্তু সভাই কি শৈলেন এমন হীন, এত নীচাশয় হইয়াছে ! এ যে বিশ্বাস করিতে পারা যায় না ! সে যে পত্নীগত-প্রাণ ! সেই অকৃত্রিম দাম্পত্য-প্রেমেও কি তাহার এত বড় চাতুরী থাকা সম্ভব ? না, এ আমি কি ভাবিতেছি ! সে সব কিছুই নয়। তবে এটাও স্বীকার করিতে হইবে যে, শৈলেনের স্বাধ একজন নৃণা পুরুষের পক্ষে এমন একাকী, নির্জনে একজন তরলীর কাণে ভালবাসার কথা শোনানটা ভাল দেখায় না।—তা সে ভালবাসা যেমনই হোক।

“কে মন না ?” বলিতে বলিতে শৈলেন সহাস্ত মুখে সিঁড়ি নামিয়া আমার পাশে নাড়াইল। বলিল “ওহে ও সব কাবোর ভাবটাব আমার ঢেরজানা আছে। চণিত বাঙ্গালার এরই নাম “পেটে ফিধে মুখে লাজ ?”

তাহাকে একটুকুও অপ্রতিভ হইতে না দেখিয়া আমার কেমন বিরক্তি বোধ হইল, একটা অস্ত্রায় কাজ করিয়া ফেলিয়া মানুষ তৎক্ষণাত্ অহুতপ্ত হইবে, আশ্চর্যান্বিতে মরিয়া যাইতে চাহিবে—তবেই সে ক্ষমার্ক ; কিন্তু যে নিজের অপরাধ বুঝিতেও পারে না, সে অবিজ্ঞাশ্রু, অন্ধ-তমসাচ্ছন্ন-লোকে তাহার স্থান। আমি শৈলেনের জ্ঞান মনে মনে কিছু তুঃখও অহুতব করিলাম। বলিলাম, দেখিতেছি আসিয়া ভাল করি নাই।”

“তা মনই বা কি করেছ ? এসো, শিরোমণি মশাই কোথায় হঠাৎ এক প্রাণশ্চিত চাক্ষুসের ডাকে গিয়েচেন। তা তাঁর মেয়ে আছে ; সে অতিথি সংকারে কুণ্ঠিত হইবে না”—বলিয়া শৈল হাসিয়া ফেলিল।

অপর স্ত্রীলোক লইয়া যথেষ্ট আলোচনার পোষকতা, আমার স্বভাব-বিরুদ্ধ। স্ত্রীলোক নিতান্ত কাঁচের হুঁকা বাসন ; তাহা সম্বর্ণপূর্ণ তুলিয়া রাখিতে হয়, এ লইয়া সর্করা নাড়াচাড়া করা কেন ? রাগ করিয়া বলিলাম “যার যেমন রুচি। আমার মেয়েদের দোরে অতিথ হওয়া অভ্যাগ নাই।” চম্ভাম।—

“আপনি যেন না খেয়ে চলে যাবেন না, আমি দিদির কাছথেকে নিখে

আপনার ভ্রাতৃ সম্বন্ধ তৈরি করেছি ।—” নৃশঙ্করাল হইতে যেন ভাস্কর-রচিত কনক-প্রতিমা এই কণা বলিতে বলিতে আমাদের সম্মুখে আবির্ভূতা ও মুহূর্তে আমার উপর দৃষ্টি পতিত হইবামাত্র তিরোহিতা হইয়া গেল ।

দহস্য অপ্রত্যাশিত আবেগে বিশ্বদে, আর যে কিসে তা ঠিক বলিতে পারি না—স্বামীর সর্ব্বশরীরে যেন রোমাঞ্চ হইয়া গেল । বৃক্কর মধ্যে জোরে জোরে কে যেন নাড়া দিয়া দিল,—এমনই বেগে রক্তটা উছল পাছল করিতে লাগিল । মনে হইল যেন কোন অলৌকিক মূর্ত্তি যেন মানবী ভিন্ন আর কিছু এইমাত্র আমাদের সম্মুখে অকস্মাত আবির্ভূতা হইয়াছিলেন ।

এই সেই লক্ষি ! এই লক্ষ্মীকেই আমি সেদিনমাত্র প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলাম ? তাহার বিবাহ কুটে নাই, সে বিধবা হয় নাই, বলিয়া নিন্দা করিয়াছিলাম, ? না না বেশ হইয়াছে ।—বিবাহের ভ্রাতৃ এ মেয়ের আবার ভাবনা কি ? বলিলে আজই যে কত ভাল ভাল বর, লোকালের রাজাদের নত কাড়াকড়ি করিয়া, বৃক্ক জিতিয়া একে নিজের করিতে সম্মত হইয়া যায় ।

শৈল বোধ হয় আমার বিশ্বাস বৃদ্ধিতে পারিল ; সে মুহু হাসিয়া কহিল “তুমি চাঁদার খাতার কত সই করিতে রাজী আছ বল ?”

চাঁদার খাতার কথার আমার ভাল লাগিল না । অসন্তুষ্ট চিত্তে উত্তর দিলাম “এক টাকা ।”

ক্রমশঃ

শ্রীঅম্বরূপা দেবী ।

আশ্বাস ।

উৎসব আজি চলে গেছে শেষ—অতীত পূজার লগ্ন,

অতল গগন-সিন্ধুর তলে তরণ ইন্দু মগ্ন ।

অঞ্জলি ভরি' দেবতার পদে সঁপিয়া পুষ্প অর্ঘ্য,

পূজা শেষ করি' একে একে ফিরে' গিয়াছে শুক্লবর্গ ।

এখন নীরব শব্দের রস—প্রাঙ্গণ জনশূন্য,

এবে কোথা চ'তে মন্দির-পথে কে গো তুমি হীনপূণ্য !

২

“আশ্রয়হীন অক্ষয় দীন চিরাগত আমি পাশ,
দীর্ঘ দিবস বৃথা পথে পথে ঘুরিয়াছি পথ-ভ্রাস্ত ।
নাচি পুজিবার কোন উপচার—নির্ঘল ফুল শুভ,
শুধু সখল নয়নের জল—বার্য বাসনা তুচ্ছ ।
তাই এ নীরব নিশীথে যখন আঁধারে নিশিছে বিশ্ব,
বহু দূর হতে’ মন্দির-দ্বারে আসিয়াছি আমি নিঃশব্দ ।

৩

“জানি, মোর তরে মন্দিরে তব দ্বার হয় নাই বন্ধ,
দূপের ধূম উঠেনা যদিও—এখনো ভাসিছে গন্ধ ।
নাচি নীপাবলী, দেবালয় কোণে আছে ঘ্রাতদীপ দীপ্ত,
আছে ছ’চারিটি শুক কঙ্কম—চন্দন অছলিঙ্গ ।
নিশ্চিত দর্য ; আশ্বাস-চারা নচে তব মোর চিত্ত—
নিভৃত নিশায় দেবতা আমার জাগিয়া আছেন নিত্য ।”

শ্রীমণীমোহন গোস্বামী ।

ফুলের কথা ।

(চৈত্র)

উষার আকাশে বাষ্প স্নকুমার আলোকের আভাস, যখন চারিদিকে সঞ্চারিত হইতেছে, তখন বিহগফুলের অকৌচ্ছারিত রহস্তনয় কাকলি শুনিয়া মনে হয় নাকি যে তাহারা আপন কুলায়-সঙ্গীসের নিকট ফুলের কথা আলোচনা করিতেছে ? মাহুমে যখন হইতে কাব্য-সৌন্দর্য্য সন্ভোগ করিতে শিখিয়াছে, তখন হইতেই ফুলের সমাদর আরম্ভ হইয়াছে । ফুলের নিয়ত আশ্র-বিস্তৃত মাধুর্য্য, বাক্য-হীন বলিয়াই সৌরভে বাহার পরিচয়, ইহা ভিন্ন বিকাশোন্মুখ তরুণী বোড়শীর চন্দয়ের তুলনা আর কোথায় খুঁজিয়া পাওয়া যায় ? আদিম মানব প্রথম যে দিন তাহার প্রেরণীকে পুষ্প উপহার প্রদান করিল, সেই শুভ দিন হইতেই সে পশুদের সীমা অতিক্রম করিয়াছে । দৈনন্দিন তুচ্ছ কৃপা তৃষ্ণার তাড়নায় উর্ধ্বে আপনাকে স্থাপনা করিয়া, লম্বয়মান মানবের শ্রেষ্ঠ পদবীতে উন্নীত হইয়াছে । যে দিন চটতে মাহুমে অনাবগ্ৰকীয়ের মর্যাদা বৃদ্ধিতে শিখিয়াছে,

সেইদিন চাইতেই শিল্প-কলার দৌন্দর্য্য রাজ্যে প্রবেশাদিকার লাভ করিয়াছে ।

আমাদের কথা বিবাদে ফুলই আমাদের চিরস্বপ্ন । আমাদের নিমন্ত্ৰণ-সভা, পানগোষ্ঠী, নৃত্যগীতের মজলিস, আমাদের প্রণয়-খীলার উৎসব কোন স্থানেই তাহাদিগকে ভিন্ন চলে না—তাহাদের দিবা স্পর্শ বাতীত মরিতেও আমরা সাহসী হই না । স্নিগ্ধ সুরভি লিলি ফুলের সহায়তায় পূজা করিয়াছি, কমলের সাহায্যে পানতঃপর চট্টগ্রাচ্চি—গোলাপ এবং চন্দ্র মল্লিকার (Chrysen hamon) গৌরব রক্ষার জন্য চন্দ্রীর সমরে অগঙ্গার চট্টগ্রাচ্চি । এমন কি আমরা ফুলের ভাবায় জন্মের কণাও বাস্তব করিতে চেষ্টা করিয়াছি । ফুল ছাড়া চট্টগ্রা কেহ কি কখনো বাচিতে পারে—ফুলের দৌন্দর্য্যবিহীন রিক্ত পৃথিবী যে আমাদের মনে শ্রমোন্মাদের বিভীষিকা সঞ্চার করে । শীতের শয্যা-পার্শ্বে স্বকোমল সুরভি-পুষ্প কত না সাহসনা বহন করিয়া আনে, সংসারজ্বালান্থ শ্রান্ত অক্ষকার জন্মে, কেমন মানন্দের আলোক জাগ্রত করিয়া তোলে । তাহাদের প্রশান্ত কণ্ঠা, স্বপ্নের শিশুর অপলক দৃষ্টির দ্বারা বিশ্ব ব্যাপার সম্বন্ধে আমাদের মনের ক্ষীণমান বিশ্বাসকে আবার উদ্বুদ্ধ করে । চারাগ আলোকে ফিরাইয়া আনেন—আমরা যখন নাটির সঙ্গে নাটি চট্টগ্রা নিশিগ্ধ হাই, অঙ্গ-শিল্পিত-সিক্ত নভু নেত্রে তাহারাই আমাদের সমাধির পার্শ্বে বিলাপ করিতে থাকে । বলিতে লজ্জা হয়, তবুও না বলিয়া উপায় নাই, এমন অতুলন স্বপ্নের নিত্য অনবস্থ ফুলের নিয়ন্ত সঙ্গ লাভ করিয়াও, আমরা পশু স্বভাবের অধিক উর্ধ্বে উঠিতে পারি নাই । বাহিরের যুগচক্রে স্পর্শ করিতে না করিতে অন্তরের হিংস্র শার্দূল লুপ্ত করিয়া ওঠে । প্রবাদ আছে মানব শিশু দশম বর্ষে জন্ম, বিংশে বাতুল, ত্রিংশে উদ্ভ্রান্ত, চত্বারিংশে প্রতারণার আকর এবং পঞ্চাশে দোষী আসামী । আজীবন পশুদের সীমা অতিক্রম করিতে পারে না বলিয়াই বোধ হয়, পঞ্চাশে দোষী আসামী হইয়া পড়ায় । আমরা ত ক্ষুধা ভিন্ন আর কোন কিছুকেই বাস্তব বলিয়া জানি না, নিজের উচ্ছ্বাল বাসনা ভিন্ন আর কিছুকেই পূণ্য পবিত্র মনে করি না । আমাদেরই চক্ষের উপরে কত মন্দিরের পুর মন্দির ধূলিসাৎ হইয়া গেল, চিরস্থায়ী হইয়া আছে কেবল আমাদের অচক্ষুরের বেদিকা, সেই দেবাদিদেবের সম্মুখে আমরা নিরন্ত ধূপ দীপ পুষ্পপত্রাদি পূজা করিয়া থাকি । আমাদের বিগ্ৰহ ত বড় কম নছেন—দন সম্পদ ঈশ্বরট অংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে—ইচ্ছার

অবতার । ইহার নিকট বলি উপহার দিবার অল্প প্রকৃতিকে আমরা ধ্বংস করি । জড় পরমাণুকে জয় করিয়াছি বলিয়া, আমরা বৃথা গর্ব করিয়া থাকি, কেন না তাহারাই আমাদের সর্ব্বতোভাবে পরাভব করিয়া রাখিয়াছে ; হায় সভ্যতা এবং স্বকুমার ক্রটির দোহাই দিয়া আমরা কতই না পাশব অভ্যাসের করিয়া থাকি ! আকাশের নক্ষত্রের অশা-বিদ্যুত মত কোমল স্নন্দর ফুলগুলি, আমাদের একবার বল দেখি, ধরণীর উচ্চানে দক্ষিণ সমীরণে গীবা দোলাইয়া, যখন মধুপের মুখে মিশ্র শিশির ও আতপ্ত বর্ষাকালের কথা শুনিতে থাক, তখন কি কখনও তোমাদের ভয়ানক পরিণামের কথা একবারও মনে কর ? না, না, ভাবিয়া কাজ নাই,—যুগ্মল বসন্তকুপবনর আন্দোলনে যতক্ষণ সম্ভব খেলা কর, সুখস্বপ্নে বিভোর হইয়া থাক । কঠোর নিষ্ঠুর চুইখানি হাত কাল হরত, তোমাদের নিশ্বাস রোধ করিয়া দিবে ; আশ্রয় কুন্ত হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া, পেলব অঙ্গ প্রত্যঙ্গ খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া কোণায় লইয়া যাইবে । এ নিষ্ঠুর কাজ যে করিবে, সে হয় ত নিরাপমা স্নন্দরী, দেখিতে তোমাদেরই মত স্বকুমার—তোমাদের তরুণ জীবনের পীড়িত রক্ত ধারায় তাহার কোমল হাতচুখানি যখনও আর্দ্র আছে, তখনও সে তোমাদের রূপের বাগ্যান করিতে ভুলিবে না । হায় এই কি কল্পনা, স্নেহসিক্ত রূপের সহানুভূতি ? অদৃষ্টবশতঃ তোমরা যে রমণীর চূর্ণ কৃকিত কুন্তলের শোভা বর্ধন করিবে, তাহার মত নির্মাণিক রূপ অতি অল্পই দেখা যায়, যে পুরুষের উত্তরীয়াবলের সুরতি বর্ধন করিয়া তাহাকে গৌরবান্বিত করিবে, যদি তোমরা মহা কল্প পরিগ্রহ করিতে পারিতে, তাহা হইলে সে নরাদমের, তোমাদের দিকে চক্ষু তুলিয়া চাহিবার সাহসও হইত না । ভাগ্যবৈগুণ্যে কোনও দিন তোমাদিগকে সন্নিবিষ্ট পাত্রে আবদ্ধ থাকিয়া, আসন্ন মৃত্যুর উদ্ব্রান্ত অপরিণীত তৃষ্ণার যন্ত্রণা, বিরস, বহুদিনের পুরাতন, গলিত সলিলেই মিটাইতে চাইবে । অতুলন স্নন্দর ফুলগুলি, তোমরা যদি একবার আমাদের মিকান্ডোর দেশে আসিতে—তাহা হইলে কোনও সময়ে কাঁচি আর ক্ষুদ্র কনাত হস্তে একটি ভয়ানক মানুষকে দেখিতে পাইতে—তিনি আপনাকে “ফুলের প্রভু” আখ্যা দিয়াছেন । তিনি একজন ভিক্—তাহাকে দেখিবামাত্র স্বতই তোমাদের মন স্বপ্নায় মগ্ন হইয়া উঠিত—কেন না তোমরা তা জানই, হস্তগত রোগীর যন্ত্রণা সমধিক দীর্ঘস্থায়ী করাই বৈদ্য এবং চিকিৎসকের বিশেষ বাবসায় । কাটিয়া থাকাইয়া, মোচড়াইয়া, যতপ্রকার অসম্ভব অবস্থায় নানা প্রকারে

বিপর্যাস্ত করিয়াই, তিনি তোমাদের সমাক্ উন্নতি সাধন করিতেছেন, ইহাই প্রতিপন্ন করিবেন। অস্থি-বিজ্ঞাবিশারদ বৈজ্ঞানিকের জ্ঞান, তিনি অতি সহজেই তোমাদের পেশা বিরুদ্ধ, অস্থি স্থানচ্যুত, ছিন্ন অঙ্গের শোণিত-স্রাব রোধ করিবার জ্ঞান অল্প অল্পে তোমাদিগকে দক্ষ, সর্কাজে রক্ত প্রবাহের ক্ষতি বিধান করিবার জ্ঞান দেহের সর্কাজ উদ্ধ শল্যকা প্রবেশ করাইয়া, কর্তব্য সুসম্পন্ন জানে প্রীতি লাভ করিবেন। তোমাদের জ্ঞান লবণ, তিনিগার, ফটকিরি এমন কি Vitriol পর্য্যন্ত ব্যবস্থা করিবেন। যদি দৈবাৎ মুচ্ছাপন্ন হও, তবে পাদদেশে ফুটন্ত উষ্ণ সলিল নিষেক করিয়া তোমাদের সজীবিত করিয়া দিবেন। তাহারই চিকিৎসার সাহায্যে তোমরা এক পক্ষ কাল অধিক জীবিত আছ, সর্কাজই তিনি এ কীর্তি প্রচার করিয়া ফিরিবেন। এই চিকিৎসা-বিভীষিকার হস্তে আত্মসমর্পণ করা অপেক্ষা, বহু পূর্বে যে দিন তোমায় বন্দী করা হয়, সেই দিনই মৃত্যু কি শ্রেয়ঃ ইহঁত না? হায়, জন্ম-জন্মান্তরের কতই না পাপের ফলে এ যন্ত্রণা তোমাদের ভোগ করিতে চাইল?

আমাদের প্রাচ্য দেশে সূলের প্রতি যে চর্কাবহার করা হয়, তাহার তুলনায় পাশ্চাত্য অত্যাচার আরও ভয়ানক। ইউরোপ আমেরিকায় প্রতিদিন “থানা—কামরা” এবং নাচঘর (Ball-room) সাজাইবার জন্য, যে সংখ্যাতীত পুস্ত-জীবনের সর্বনাশ করিয়া, পরদিন প্রভাতে তাহাদিগকে আবর্জনা স্বরূপে বিসর্জন দেওয়া হয়, তাহা ভাবিলে প্রাণ শিহরিয়া উঠে—সেই সূলগুলিকে একত্র গ্রথিত করিলে একটি সমগ্র মহাদেশকে মালার বাধনে বাধা যাইতে পারিত। এই নিতান্ত নির্কিঁচর নির্মম ব্যবহারের তুলনায় আমাদিগের পুস্ত-চিকিৎসকদিগের অপরাধ, দয়ার মতই প্রতিভাত হয়। তাহার। অস্বস্তঃ প্রকৃতির গৃহীণপনার সম্মান রক্ষা করেন, অনেক বিচার বিবেচনা করিয়াই বলি সংগ্রহ করেন এবং পূজাশ্রমে মৃতের যথাযোগ্য সৎকার করিতে বিমুগ্ধ করেন না। পাশ্চাত্য জগতে পুস্তসম্ভার এই প্রাচুর্য্য, ঐশ্বর্য্যের বিকারগুণ্ড আড়ম্বর মাত্র; লক্ষপতির এক লহমার খেলা। নিশীথের নৃত্যগীতোৎসবের পরে, এই অকুনার সূলগুলির কি দশা হয়! পথের প্রান্তে ধূলিধূসরিত দেহে তাহাদিগকে পড়িয়া থাকিতে দেখা, বড়ই ক্লেশকর দৃশ্য।

হায় সূল কেন এতদূর, সূলের অগচ্ এমন অসহায় চাইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিল! কীট পতঙ্গও দংশন করিতে জানে, মৃত্তম স্বভাবের জীবও বিপদের তাড়নায়

যুদ্ধ করিতে উত্তম হয় । যে পাখীর পালক লইয়া পাশ্চাত্য সভ্য রমণী আপনার টুপি সাজাইয়া থাকেন, সেও উড়িয়া পলাইতে জানে, যে রোমশ ভক্তুর মস্তক অঙ্গুষ্ঠদণ্ডি তাঁহার বিশেষ আকাঙ্ক্ষার বস্তু, সেও পদশব্দ শুনিবানাত্র পলাইতে পারে । একমাত্র ফুলের প্রতিক্রম পতঙ্গম, রেণু পরাগবর্ণ স্বভাব্য নমোদর প্রজাপতি, ফুলেরই মত স্বকুমার হইয়াও সে উড়িতে জানে, পলাইবার উপায় তাহার আছে, কিন্তু আর সকল ফুলই নিকৃপায়, একান্ত আশ্রয়ণ্য অসমর্থ । যদি তাহারা মুক্তাঘূর্ণিতে তীর আর্তি চীৎকারও করে তবে নির্দয় মানবের শ্রবণে সে বিলাপ প্রবেশ করে না । নীরবে নম্র জদয়ে গাঢ়ারা আমাদের দ্রেক সেবা করিতে অভ্যস্ত, চিরদিনই আমরা তাহাদের প্রতি নির্মম ব্যবহার করিতে দ্বিগা মাত্র করি না—কিন্তু হায় এমন দিন আসা বিচিত্র নয়, যে চক্ষুদৈ সেই পরম বন্ধু সকল চিরদিনের মতই আমাদেরগকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে ।

দেখ নাই কি বন্ধু, বনফুল দিন দিন ভূলভ হইয়া উঠিতেছে, হয়ত বা পুষ্পরাজ্যের কোনও সুদূরদৃষ্টি বিজ্ঞময়ী তাহাদিগকে বলিয়াছেন, মানব সমাজে যত দিন না মেহ, করুণা, সহানুভূতি প্রসর লাভ করে, ততদিন হোমরা আর আসিও না—দূরে চলিয়া যাও । তাই বৃষ্টি তাহারা দেবতার নন্দন বনে উপনিবেশ স্থাপন করিতে গিয়াছে । যে ব্যক্তি ফুলের চিকিৎসা করেন, তাঁহার অপেক্ষা যিনি তাহার উৎকর্ষ চর্চা করেন তিনি যে শ্রেষ্ঠতর, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই । কত আগ্রহের সহিত তিনি আকাশে মেঘ সকার ও স্বর্গলোকের প্রসার নিরীক্ষণ করেন, বিপ্লবকারী কীট পতঙ্গদের সহিত যুদ্ধরত হয়েন, ভূষারপাত ও শিলাবৃষ্টির আশঙ্কায় কতই না কাতর হইয়া উঠেন । আবার যখন কোমল কোরকাবলীর আবির্ভাব হয়, তখন কি রেহশকী-মন লইয়া দিনে দিনে তিনি তাহাদের পূর্ণবিকাশ প্রতীক্ষা করিয়া থাকেন, তরুণ কিশলয়ের অরুণ রাগ তাঁহাকে কতই না আনন্দবিহ্বল করে । আমাদের এই প্রাচীনদেশে, “ফুলের ফসল” ফলাইবার শিল্প ও ব্যবসায় বহুপ্রাচীন ; কবিও তাঁহার প্রিয় তরুণতার প্রেমকাহিনী, কত কবিতা কতনা সঙ্গীতে কীৰ্ত্তিত হইয়াছে । সম্রাট বিশেষের সময়, চীমা মাটির কারু কার্য যখন উন্নতিলাভ করিতে আরম্ভ করে, তখন সখের গাছগুলিকে যত্নে রাখিবার জন্ত কত সুন্দর আশারের সৃষ্টি হয়, অনেক সময়ে কাচ পাত্র যথেষ্ট মনে হইত না তখন বহুরূপতীত সুবর্ণ কিম্বা রক্তাধারে

তাহাদিগকে রক্ষা করা হইত। পুণ্ড্রহুন্দরীদিগের পরিচর্য্যার জন্ত বিশেষ তৃত্তা নিয়োজিত থাকিত, তাহারা প্রহরে প্রহরে শশক রোমের অতি সুকোমল কুর্চ দ্বারা প্রাণুটিত দলগুলিকে পরিষ্কার করিয়া দিত। লিখিত আছে, আজ্ঞাশুল্কস্থিত-সুকেশী, সুনন্দী, তরুণী, সুসজ্জিত চইয়া পিউনি penny ফুলের আলিবাগে ঝলসেচন করিলে, তবে তাহার সম্যক উৎকর্ষ সাধিত হয়, নিয়ম কাম-বুধ, কুশতরু বৌদ্ধপুত্রোহিত প্রায় গাছের পরিচর্য্যা করিবেন ইত্যই শাস্ত্রীয় বিধান। নবোদগত সুকুমার কোরকের রক্ষাকল্পে সবিশেষ যত্ন করা হইত। কোনও সম্রাট পক্ষীদিগের উপদ্রব নিবারণের জন্ত বাগানের গাছের ডালে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বর্ণ-ঘটিকা টাঙাইয়া দিয়াছিলেন—বসন্ত ঋতু যখন আনন্দ সনারোহে দিগ্বিদিক উল্লসিত করিয়া তুলিত তখন তিনিও রাজসভার বীণকারের সঙ্গে প্রমোদ উদ্ভানে যাইয়া, রাগিণীর সুরধ্বনি আলোপে তাহার কুহুদ-প্রোদসীদিগের চিত্ত বিনোদন করিতেন। অতীতের অন্ধকার গর্ভ হইতে হু' একখনি তাম্রলিপির আবিষ্কার চইয়াছে—তাহার অহুশাসন পাঠ করিয়া হাসিব কি কাঁদিব বুঝিয়া ওঠা যায়। ফুলের অপরূপ রূপলাবণ্যের বর্ণন করিয়া, লেখক বলিয়াছেন যদি কোন নির্ভুর ইহার একটি শাখা ডগ্ন করে, তবে তাহার পরিবর্তে, আপনার একটি অঙ্গুলি কাটিয়া দিতে হইবে। আচরকালকার এই নির্দিষ্টাচার অভ্যাসের দিনে, রাজা যদি ফুলের অপব্যবহার এবং চাক শিল্পের অবমাননার শাস্তিস্বরূপ, এমনি বিধান প্রচার করাইতেন তবে তাহা অবিধি মনে করিতাম না।

ক্রমশঃ

শ্রীপ্রিয়দর্শনা দেবী ।

মায়ার খেলা

দয়াল 'আনার তুকুন' শব্দক্ষেতে

তুমিই তো সেই বরণ-আশীষ ঢালো,

অশীর্ষ যবে বিশ্ব-কক্ষখানি

তুমিই তো তার অরণ-প্রদীপ আলো!

জীবন জোড়া বিরাট স্বপনধানি
 আড়াল সম দিচ্ছ কেবল টানি'
 দশাই যদি না দাও, হে সাবধানি,
 বুঝতে যে পাই—সেই ভোঁ আমার ভালো,
 না তিমির, আকাশ ভরা তারায়
 ছিন্ন পথেই দেখছি যে ওই আলো !

খেগতে দিয়ে, খামখেয়ালী, হঠাৎ
 আপন দাঁত আপনি লগগো ছিনে,
 বহু সাড়ায় ভয় দেখিয়ে, আবার
 জোয়া'রা রেতে জীবন লগয়ে জিনে' !
 সূলের হাসে, পাখীর প্রণয় গানে
 প্রভাত বায়ে, নদীর তরল তানে
 স্বপ্নের প্রাবল্য জাগিয়ে সকল খানে
 নাতিয়ে তোল ক্ষণেক হৃদয়হীনে ।

কন্দ-কন্দায় আগাত করে'ই নিরূর,
 তুমিই আবার কাঁদাও গো সেই নীনে !
 এমনি করে'ই দারায় জীবন সনাই
 করছ তুমি রক্তরসের খেলা ।
 অভিমানের ধার ধারিনে ঠাকুর,—
 সেই না কেন ঘটই ছল কি হেলা !
 যখন ডাক, এগিয়ে কাছেই আসি,
 আঘাত কর, তা'ও সে ভালবাসি ;
 হাসাও হাসি ; আবার দীর্ঘশ্বাসি'
 কাণ্ডে বসি স্বতির সন্ধ্যাবেলা ।
 এমনি করে নয়টি রসের রূপে
 চলছে তোমার গোপন মায়ার খেলা !

ঐদেবকুমার রায় চৌধুরী ।

সংখ্যা-সম্বন্ধে কয়েকটি কথা । *

সংখ্যা বলিলে আমাদের মনে প্রথমতঃ এক, দুই, তিন প্রভৃতির কথাই উদ্ভিত হয়। বস্তুতঃ সংখ্যা-শব্দে প্রথমতঃ এক, দুই, তিন প্রভৃতিতেই বুঝাইত। মানবের আদিম অবস্থাতে তাহার মনে প্রথমতঃ অল্প কোনও ভাব আসে নাই। যোগ বলিতে প্রথমতঃ এক, দুই প্রভৃতির স্থায় একটি রাশির সহিত তদনুরূপ অল্প কোনও রাশির যোগ বুঝাইত। বিয়োগ বলিলে কেবল বড় রাশি হইতে ছোট রাশির বিয়োগ বুঝাইত। পূরণ কেবল যোগেরই একটি শাখামাত্র ছিল। ভাগ বলিতে কেবল বড় সংখ্যাকেই ছোট সংখ্যা দ্বারা ভাগ বুঝাইত। এমন কি সকল সময়ে ভাগফলকে একটি সংখ্যা দ্বারা প্রকাশিত করা যাইত না। ক্রমে, ছোট সংখ্যাকে বড় সংখ্যা দ্বারা ভাগ করা যায় কিনা অথবা বড় সংখ্যাকে ছোট সংখ্যা দ্বারা ভাগ করিলে ভাগ ফলকে সকল সময়ে একটি সংখ্যা দ্বারা প্রকাশিত করা যায় কিনা, এই প্রশ্ন গণিতজ্ঞগণের মনে উদ্ভিত হইল। এই অধ্যয়নের ফলে গণিতজ্ঞগণ ভগ্নাংশের (fraction) আবিষ্কার করিলেন। এবং তাঁহারা সংখ্যার এইরূপ সংজ্ঞা (definition) করিলেন যে তদ্বারা অখণ্ড রাশি (whole number) এবং ভগ্নাংশ দুইই বুঝাইবে। ভগ্নাংশের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে এই লাভ চইল যে, এখন আমরা ছোট রাশিকে বড় রাশিদ্বারা ভাগ করিতে পারি এবং বড় রাশিকেও ছোট রাশি দ্বারা সকল সময়ে ভাগ করিতে পারি এবং উভয় স্থলেই ভাগফলকে ভগ্নাংশের সাহায্যে একটি রাশি দ্বারা প্রকাশিত করিতে পারি। কিন্তু আর একটি প্রশ্ন এখনও অসীমাংশিত রহিয়া গেল। সেই প্রশ্নটি এই, ছোট রাশি হইতে আমরা বড় রাশি বিয়োগ করিতে পারি কিনা। ইহা নিশ্চিত যে, সংখ্যা দ্বারা যদি আমরা অখণ্ড রাশি এবং ভগ্নাংশ উভয়ই বুঝি তবে আমরা বড় রাশি হইতে ছোট রাশি বিয়োগ করিতে পারি। পূর্বের স্থায় এবারও গণিতজ্ঞগণ দেখিলেন সংখ্যার অর্থের সংস্কার আবশ্যক। তাঁহারা দেখিলেন এই সংস্কার এইরূপে করিতে হইবে যেন ছোট রাশি হইতে বড় রাশি বিয়োগ করা যায়। এই উদ্দেশ্যে তাঁহারা এখন গণিত-শাস্ত্রে নূতন এক প্রকার রাশির আনয়ন করিলেন। ইহাদিগকে আমরা এখন ঋণ সংখ্যা (negative number) বলি। অতএব দেখা যাই-

* বঙ্গীয় সাহিত্য সমিতির অষ্টম অধিবেশনে পঠিত।

তেছে যে, সংখ্যা বলিতে প্রথমতঃ অণ্ড দন—সংখ্যা (positive integer) বুঝাইত। তাহার পর সংখ্যা বলিতে অণ্ড দন-সংখ্যা (positive integer) এবং ঋণ দন-সংখ্যা (positive fraction) বুঝাইত। তৎপর সংখ্যা-শব্দ অণ্ড দন-সংখ্যা, ঋণ দন-সংখ্যা, অণ্ড ঋণ-সংখ্যা (negative integer), এবং ঋণ ঋণ সংখ্যা (negative fraction) এই চতুর্বিধ অর্থে গণিত শাস্ত্রে ব্যবহৃত হইতে লাগিল। অবশ্য প্রত্যেকবারই গণিতজ্ঞগণ পূর্বে যাহা ছিল তাহা অল্প রূপিয়া সংস্কার করিলেন। এই সংস্কারের পরও গণিতজ্ঞগণ আর একটি অভাব অল্পভব করিলেন। তাহারা দেখিলেন কেবলমাত্র উপসূক্ত চতুর্বিধ রাশির সাহায্যে সকল রাশির বর্গমূল (square root), ঘনমূল (cube root) প্রভৃতি বাহির করা যায় না। এবার তাহারা গণিত শাস্ত্রে অসমগুণনীয়ক (incommensurable or irrational) রাশির অবতারণা করিলেন। প্রাচীন হিন্দুগণ ও প্রাচীন গ্রীকগণ এই অসমগুণনীয়ক সংখ্যা-সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা করিয়াছিলেন। এখানে মনে রাখিতে হইবে দশমিক ভগ্নাংশ (decimal fraction) তিন প্রকার :—

(১) সসীম দশমিক (terminating decimal); যথা—৩৪।

(২) পৌনঃপুনিক দশমিক (recurring decimal); যথা—৪৩৫.৭৩।

(৩) আর এক প্রকার দশমিক ভগ্নাংশ আছে যাহা সসীমও নয় অথবা পৌনঃপুনিকও নয়; যথা—২এর বর্গমূল অথবা কোনও বৃত্তের (circle) পরিধি (circumference) এবং ব্যাসের (diameter) অনুপাত (ratio)।

বর্তমান সময়ে অসমগুণনীয়ক সংখ্যার সমস্তা গণিতজ্ঞগণের নিকট আবার নূতন ভাবে উপস্থিত হইয়াছে। প্রাচীনগণ অসমগুণনীয়ক সংখ্যা শুলিকে প্রায় সমগুণনীয়ক (nearly commensurable) বলিয়াই সম্বোধিত ছিলেন। কিন্তু এই প্রাচীন মতাদ্বসারে একটি অসমগুণনীয়ক সংখ্যা বহু সমগুণনীয়ক সংখ্যার সমান বলা যাইতে পারে মনে করুন ২এর বর্গমূলকে আমরা ১৪, ১৪.১, ১৪.১৪ প্রভৃতি বহু সমগুণনীয়ক সংখ্যা দ্বারা বর্ণনা করিতে পারি। তবে একটি অসমগুণনীয়ক সংখ্যা কি একটি সংখ্যা নহে? একটি অসমগুণনীয়ক সংখ্যাকে বহুসংখ্যা বলিয়া স্বীকার করিলে $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^3} + \frac{1}{2^4} + \dots$

প্রভৃতি অনন্তসংখ্যক রাশির (infinite series) যোগ ফলকৈ এক মূল্য (having one value) না বলিয়া বহুমূল্য (having many values) বলিতে হয়। অতএব বর্তমান সীমা-তত্ত্ব (theory of limits) অনুসারে এগুলিকে একমূল্য না বলিলে

চলে না। এইরূপে গণিতজ্ঞগণ পদে পদে সংখ্যার প্রাচীন সংজ্ঞায় (old definition) দোষ লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। অতএব তাঁহারা একগে আবার সংখ্যার নূতন সংজ্ঞার আবশ্যকতা বোধিলেন। এ বিষয়ে Richard Dedekind (রিচার্ড ডেডেকিণ্ড) এবং গির্দর্গ কান্টর্ (Georg Cantor) নামক দুইজন জার্মানদেশীয় গণিতজ্ঞ বহু প্ৰবেশনা করিয়াছেন। এখানে আমরা কেবল Dedekind-এর অধ্যাচরণ করিব। Dedekind বলেন সকল সমগুণনীয়ক সংখ্যাকেই আমরা বহু প্রকারে ক এবং খ নামক একরূপ দুই শ্রেণীতে ভাগ করিতে পারি যেন খ শ্রেণীর অন্তর্গত প্রত্যেক রাশিই ক-শ্রেণীর অন্তর্গত প্রত্যেক রাশি অপেক্ষা বড়। এইরূপে শ্রেণী বিভাগ আবার দুই প্রকার। প্রথম প্রকারে ক এর মধ্যে একটি বৃহত্তম সংখ্যা আছে অথবা খ এর মধ্যে একটি ক্ষুদ্রতম সংখ্যা আছে। যথা—ক শ্রেণীর সকল রাশিই ২ এর কম এবং খ-শ্রেণীর সকল রাশিই ২ এর বেশী। ২কে আমরা ক-শ্রেণীর অথবা খ-শ্রেণীর যাহার মধ্যে ইচ্ছা ধরিতে পারি। দ্বিতীয় প্রকারে ক এর মধ্যে একটি বৃহত্তম সংখ্যা কিম্বা খ-এর মধ্যে একটি ক্ষুদ্রতম সংখ্যা নাই। যথা :—আমরা একরূপ একটি বিভাগ করনা করিতে পারি যে, ক-শ্রেণীর মধ্যে সেই সকল রাশি আছে যাহাদের বর্গ ২ হইতে ছোট এবং খ এর মধ্যে সেই সকল রাশি আছে যাহাদের বর্গ ২ অপেক্ষা বড়। Dedekind বলেন সকল স্থলেই ক-শ্রেণী এবং খ-শ্রেণীর মাঝখানে এমন একটিমাত্র জিনিস আছে যাহা ক শ্রেণীকে খ শ্রেণী হইতে হইতে পৃথক্ করিয়া দেয় অর্থাৎ যাহা ক এবং খ এর সন্ধিস্থলে অবস্থিত। সেই জিনিসটিকে আমরা সংখ্যা বলিব। ক এবং খ প্রথম প্রকারের হইলে সংখ্যাটিকে আমরা সমগুণনীয়ক (rational) সংখ্যা বলিব আর ক এবং খ দ্বিতীয় প্রকারের হইলে সংখ্যাটিকে আমরা অসমগুণনীয়ক (irrational) সংখ্যা বলিব।

অতএব এপর্যন্ত আমরা যে অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছি তাহাতে দেখা যাইতেছে সংখ্যা দ্বিবিধ :—সমগুণনীয়ক (rational) এবং অসমগুণনীয়ক (irrational) সমগুণনীয়ক সংখ্যাগুলি আবার দ্বিবিধ :—ধন(positive) এবং ঋণ(negative)। ধন এবং ঋণ—সংখ্যাগুলি আবার প্রত্যেকে দ্বিবিধ :—অখণ্ড(integral) এবং খণ্ড(fractional) অথবা ইহা এখন সহজেই বুঝা যাইবে যে অসমগুণনীয়ক (irrational) সংখ্যার মধ্যে অখণ্ড রাশি (integer) নাই, কিম্ব উচারা ধন (positive) এবং ঋণ (negative) উভয়ই চইতে পারে। উচারা সৰ্ব্বদাই খণ্ড (fractional)

এবং উহাদিগকে অসীম (non-terminating) অপোনঃপুনিক (non-recurring) দশমিক দ্বারা বর্ণনা করা যাইতে পারে।

কিন্তু এখনও আমরা সম্পূর্ণরূপে সংখ্যার অর্থ নির্দেশ করিতে পারি নাই। গণিতের আরও একটি অভাব রহিয়াছে, যাহা আমরা এখন পর্যন্ত সংখ্যার যেকোন সংজ্ঞা (definition) করিয়াছি তদ্বারা দূরীভূত হয় না। ঋণ সংখ্যার (negative number) বর্গমূল পূর্ণোক্ত সংখ্যার সাহায্যে ব্যতির করা যায় না; কারণ কোনও সংখ্যাকে সেই সংখ্যা দ্বারা পূরণ করিলে ঋণ সংখ্যা পাওয়া যায় না। এইজন্য আমাদের কাছে বাদ্য হইয়া আর এক প্রকার সংখ্যার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। আমাদের কাছে $\sqrt{-১}$ নামক একটি বস্তু মানিয়া লইতে হয়। ইহার সংজ্ঞা (definition) এই যে $\sqrt{-১}$ কে $\sqrt{-১}$ দ্বারা পূরণ করিলে পূরণ ফল -১ হয়। ইহাকে আমরা কাল্পনিক একক (imaginary unit) বলিতে পারি। যেমন ৪ বলিলে আমরা প্রকৃত এককের চতুর্গুণ বুঝিয়া থাকি, সেইরূপ ৪ $\sqrt{-১}$ বলিলে আমরা $\sqrt{-১}$ এর চতুর্গুণ বুঝিয়া থাকি। $২\sqrt{-১}$ এবং তদন্তরূপ রাশিকে আমরা কাল্পনিক রাশি (imaginary quantity) বলিয়া থাকি। ১, ২ ইত্যাদি কিংবা $\sqrt{২}$, $\sqrt{৩}$ প্রভৃতি রাশিকে আমরা প্রকৃত রাশি (real quantity) বলিয়া থাকি। একটি প্রকৃত রাশির সহিত একটি কাল্পনিক রাশি যোগ করিলে আমরা আর এক প্রকার রাশি পাইয়া থাকি। ইহাদিগকে আমরা মিশ্ররাশি (complex number) বলি। কখনও কখনও আমরা এই মিশ্ররাশিগুলিকেও কাল্পনিক রাশি বলিয়া থাকি। ষোড়শ শতাব্দীর ইটালীয় (Italian) গণিতজ্ঞগণের আছেই প্রথমতঃ কাল্পনিক রাশির উল্লেখ দেখা যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে সুইজারল্যান্ডদেশীয় গণিতজ্ঞ অয়লারই (Euler) প্রথমতঃ কাল্পনিক রাশির তত্ত্ব জগতের সমক্ষে পরিষ্কাররূপে প্রচারিত করেন। কশি (Cauchy) প্রভৃতি গণিতজ্ঞগণও এ বিষয়ে বহু গবেষণা করিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রিডার (reader) পণ্ডিত প্রবর আণ্ড্রু রাসেল ফোরসাইথ (Andrew Russell Forsyth) এ বিষয়ে Theory of Functions of a complex variable নামক একখানা পুস্তক লিখিয়াছেন এবং ১৯১৩ সনের প্রথমভাগে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় মন্দিরে এ বিষয়ে বোলটি বক্তৃতা দেন।

এক্ষণে আমরা কাল্পনিক রাশির উপকারিতা সম্বন্ধে কয়েকটি উদাহরণ দিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব। পূর্বে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করিত-২, -৩ প্রভৃতি রাশির বর্গমূল কত তবে আমাদের কাছে বলিতে হইত ইহাদের বর্গমূল নাই।

এখন আমরা বলিতে পারি ইহাদের বর্গমূল আছে কিন্তু উহারা কাল্পনিক রাশি । পূর্বে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করিত $x^2 - ২x + ২ = ০$ এই বার্গিক সমীকরণের (quadratic equation) মান (root) কত তবে আমরাদিগকে বলিতে হইত এই সমীকরণের মান নাই । কিন্তু এখন আমরা বলিতে পারি ইহার মান দুইটি:— $১ + \sqrt{-১}$ এবং $১ - \sqrt{-১}$ । পূর্বে বলিতে হইত ১ এর চতুর্থ মূল (fourth root) দুইটি:— $+১$ এবং -১ ! এখন বলি ৪টি:— $+১, \sqrt{-১}, +\sqrt{-১},$ এবং $-\sqrt{-১}$ । আরও বলিতে পারি প্রত্যেক রাশির পাঁচটি পঞ্চম মূল (fifth root,) ছয়টি ষষ্ঠ মূল (sixth root,) ইত্যাদি । প্রত্যেক rational integral equation-এর degree যত, মান সংখ্যাও তত । এগুলি সামান্য উদাহরণ মাত্র । এইরূপে কাল্পনিক রাশির অস্তিত্ব স্বীকার করায় গণিত শাস্ত্রের যে কত উন্নতি হইয়াছে তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না ।

উপসংহারে আমার বক্তব্য এই যে, সংখ্যা-শাস্ত্র ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে । এই ক্রমবিকাশের ফলে আমরা সংখ্যার বর্তমান অবস্থায় উপনীত হইয়াছি । কে বলিতে পারে আবার নূতন অভাবের বোধ হইবে কি না এবং সেই অভাব সংখ্যার বর্তমান সংজ্ঞাবারা পূরণ হইবে কি না ?

ঐশ্বেমচন্দ্র সেন গুপ্ত ।

অলঙ্কার ।

আমি বৈদ্যাকরণিক নহি, স্বর্ণকার নহি, রত্নগীও নহি, স্তব্ধতাং অলঙ্কার সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিবার আমার আদৌ অধিকার আছে কি না তাহাই প্রথম প্রতিপাত্ত । অলঙ্কারের প্রয়োগ, নির্মাণ বা ব্যবহার না করিলেই যে তাহাতে অধিকার জন্মে না ইহা আমি স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি । কোন্ অলঙ্কার-কল্পণ, তাহার গঠনে কি কি বৈচিত্র্য আছে, তাহার সহিত অন্ত কোন্ অলঙ্কারের ঠিক কতটুকু সাদৃশ্য আছে ইত্যাদি দ্রুত বিষয়ের নিরাকরণ করিতে না পারিলেও আমরাই যে, অলঙ্কার লইয়া মধো মধো নাড়াচাড়া করিতে হয় তাহা নিশ্চিত । তা ছাড়া অলঙ্কারের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ধরিতে গেলে আমিও কিছু কিছু অলঙ্কার ব্যবহার করিয়া থাকি । আমার বেশভূষাই আমার অলঙ্কার । আর যদি অলঙ্কারকে তাহার সাধারণ সংকীর্ণ অর্থেই

এহণ করা যায়, তাহা হইলেও আমি নিরলঙ্কার হই না। আমিও কখন স্বর্ণাঙ্গুরীয়, কখন স্বর্ণের বোতাম, কখন স্বর্ণদণ্ডসংলগ্ন কাচের ব্যবহার করিয়া থাকি। আমি এখানে সাধারণ পুরুষজাতির প্রতিক্রমক, স্তত্রাং ইহাও বলা যাইতে পারে যে, প্রাচীন যুগে এই ভারতবর্ষেই আমি অঙ্গদ কুণ্ডল প্রভৃতি ধারণ করিয়া আসিয়াছি, আমার নিজের স্বচি অঙ্গুরারে আমার দেবতাকেও কেয়ুরবান্, কনককুণ্ডলবান্, কিরীটী, হারী করিয়াছি এবং এখনও আমি উৎকলবাসিরূপে কটদেশে চন্দ্রহার ও রাজপুত্ররূপে প্রাকোষ্ঠদেশে বলয় ধারণ করিয়া থাকি। তা ছাড়া হার যে, আমার একটি কবিপ্রসিদ্ধ অলঙ্কার তাহা “ঘূনামঙ্গলু হারং” ইত্যাদি শ্লোকে সাহিত্য-দর্পণকার স্পষ্টই বলিয়াছেন।

তবে চিরদিনই রমণীর তুলনায় পুরুষের অলঙ্কার ব্যবহার করা স্বাভাবিক। রমণীর অলঙ্কার-ব্যবহার বহুল, নিত্য ও চিরপ্রসিদ্ধ। রমণী যেরূপ অলঙ্কার দিয়া কথা বলিতে পারেন আমাদের কবি ও বৈদ্যাকরণিকও সেরূপ পারেন কি না সম্ভেদ, রমণী যেরূপ অলঙ্কার ভালবাসেন ও গঠনতাত্ত্বিক বুদ্ধি স্বর্ণকারও বোধ হয় সেরূপ ভালবাসেন না বা বুদ্ধি নাই এবং রমণী যেরূপ অলঙ্কার ধারণ করিয়া থাকেন, কোন পুরুষই সেরূপ অলঙ্কার ধারণ করিয়া আপনাকে বিভূষিত করিতে সাহসী হন না। অলঙ্কার সম্বন্ধে তাঁহাদিগের জ্ঞান স্বাভাবিক ও সংস্কারগত, আমাদের জ্ঞান তাঁহাদিগের আভ্যুগত্যের ফল। তাঁহাদিগের আলঙ্কারিক জ্ঞান লোভমূলক ও ভোগের উপর প্রতিষ্ঠিত, আমাদের আলঙ্কারিক জ্ঞান তীতিমূলক ও ত্যাগের উপর প্রতিষ্ঠিত।

কিন্তু যেরূপ ভাবেই তাহা উৎপন্ন হউক এবং যতই তাহা অসম্পূর্ণ হউক না কেন আমাদের যে, অলঙ্কার সম্বন্ধে একটা জ্ঞান আছে তাহা নিশ্চিত। স্তত্রাং অলঙ্কার সম্বন্ধে ছই এক কথা বলা আমার অধিকারের বহির্ভূত নহে।

জগতের সকল যুগে ও সকল দেশেই রমণী পুরুষাণে অলঙ্কারের অধিক পক্ষপাতিনী ইহার কারণ কি? রমণী বলিবেন “আমাদের কিছু দৌলার্য আছে বলিয়াই আমরা তাহার উৎকর্ষ সাধনের চেষ্টা করি; তোমাদের কিছুই দৌলার্য নাই, তোমরা কিসের উৎকর্ষ সাধন করিবে? যাহার কঠোর স্বর শ্রবণতই মধুর সেই সঙ্গীত শিক্ষা করে, যাহার কিছু সন্মান আছে সেই সন্মান রক্ষার জন্য ব্যতিব্যস্ত”

কিন্তু এরূপ সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ অযৌক্তিক । পুরুষের সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে রমণীর অনেক স্বীকারোক্তি এখনও লিপিবদ্ধ আছে এবং সেই সকল স্বীকারোক্তি অলঙ্কার প্রদানের আবাবহিত পরবর্তী নহে বলিয়া ইহাই অস্বত্ব্য যে, রমণী পুরুষ অপেক্ষা সর্ব্বতোভাবে সৌন্দর্য্যহীন এবং সেই নিমিত্ত অলঙ্কার ধারণে এত মনোযোগিনী । ‘কিমিব হি মধুরীনাং মণ্ডলং নাকুতীনাম’ এ কথাটি বড়ই সত্য । একটি উদাহরণ দিলে ইচ্ছা আরও স্পষ্ট বৃত্তিতে পারিবেন । যতদিন দেহের সৌন্দর্য্য অক্ষুণ্ণ থাকে ততদিন রমণী যেরূপ অলঙ্কার ব্যবহার করেন, দেহের সৌন্দর্য্য হ্রাস হইতে আরম্ভ করিলে তদপেক্ষা ব্যবহার করেন, অর্থাৎ ভূষণ সাহায্যে নষ্ট-সৌন্দর্য্যের যতটা সম্ভব পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেন । সুতরাং এই সত্যানুসারে ইহা অবশ্য বলা যাইতে পারে যে, মনুষ্যজাতির মধ্যে পুরুষ-ভাগ রমণীভাগ হইতে স্নন্দরতর বলিয়াই রমণীভাগ কৃত্রিম উপায়ে স্ফূর্ণকৃত সৌন্দর্য্য দ্বারা পুরুষের সমকক্ষ হইবার চেষ্টা করিয়া থাকে ।

রমণীর অলঙ্কার-প্রাচুর্য্যের আরও দুইটি কারণ আছে বলিয়া মনে হয় । প্রথমতঃ জগতের সর্ব্বত্র সকল সমাজেই রমণীকে অস্বাভাবিক মাত্রার পুরুষের উপর নির্ভর করিতে হয় । যাহার উপর নির্ভর করিতে হয়, তাহার মনোরঞ্জন করা আবশ্যক । কিন্তু রমণী আপনার মানসিক গুণের দ্বারা পুরুষের চিত্তাকর্ষণ করিতে ততটা সমর্থ হইবে না বুলিয়া শারীরিক সৌন্দর্য্য দ্বারা ঐ উদ্দেশ্য সাধনে যত্নবতী । দ্বিতীয়তঃ রমণীর কর্ম্মজীবন পুরুষের কর্ম্মজীবন অপেক্ষা অপ্রশস্ত ; সুতরাং পুরুষদিগের অপেক্ষা অলঙ্কার পারিপাট্রো সময়ক্ষেপ করিবার তাহাদিগের অবসরও অধিক ।

এক্ষণে দেখা যাউক অলঙ্কার জিনিষটা কি ? যাহা দ্বারা কোন বস্তুকে সুশোভিত করা যায় অর্থাৎ যাহা দ্বারা একটি বস্তু স্বভাবতঃ যত স্নন্দর তদপেক্ষা অধিক স্নন্দর করা যায় তাহাই অলঙ্কার । যাহা আছে তাহা অলঙ্কার নয়, যাহা আচরণ করা অসম্ভব তাহাও অলঙ্কার নয় । কেশ-বেশও মনুষ্য-দেহের অলঙ্কার,—কিন্তু চতুঃপদাদি নয় । বৃক্ষের অলঙ্কার পুষ্প, কারণ সকল সময় বৃক্ষে পুষ্প থাকে না, এবং পুষ্পিত বৃক্ষের সৌন্দর্য্য পুষ্পহীন বৃক্ষের সৌন্দর্য্য অপেক্ষা অধিক । এইরূপ নদীর অলঙ্কার জ্যোৎস্না, মেঘের অলঙ্কার বিহ্বল, আকাশের অলঙ্কার তারকা—কিন্তু পৃথিবীর অলঙ্কার তারকা নয়, কারণ তারকা পৃথিবীর উপর কৃষ্টিতে পারে না ।

প্রকৃতি আপনার প্রাজেক্স সকল যন্ত্রকেই অস্বাভাবিক অলঙ্কারে বিভূষিত

করিয়া থাকেন কিন্তু মনুষ্য আপনার সঙ্কত বস্তুগুলিকে সেক্ষেপভাবে অলঙ্কৃত করিতে শেখেন নাই। আমরা প্রাসাদকে কারুকার্য দ্বারা, কক্ষাভ্যন্তরকে চিত্র দ্বারা, ভাবাকে অহুপ্রাসাদির দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া থাকি বটে কিন্তু এখনও আমাদের অনেক বস্তুই অলঙ্কৃত আছে। আমাদেরিগের সৌন্দর্যাদৃষ্টি যদি সেইরূপ প্রথর ও সৌন্দর্য্যবুদ্ধি সেইরূপ হ্রস্পন্ন হইত, তাহা হইলে আমাদেরিগের নিশ্চিহ্ন, রচিত ও উদ্ভাবিত অনেক বস্তু অতি নীরস পশ্চের ভায় ভয়াবহ হইত না, তাহা হইলে বোধ করি প্রতি পদক্ষেপে, প্রতি দৃষ্টিপাতে আমাদেরিগের এত বিষয় ও নেত্র এত ব্যগিত হইত না এবং জীবন-যাত্রা অনেক অধিক পরিমাণে প্রীতিপ্রদ হইত।

আমাদেরিগের আর এক দোষ এই যে, আমরা অনেক অলঙ্কারকে অলঙ্কার নামেই অভিহিত করি না। গাছা ভায়ার ও দেহের শ্রী সম্পাদন করে কেবল তাহাদিগকেই আমরা অলঙ্কার বলি, কিন্তু দয়া-দাক্ষিণ্যাদি গুণকে মনের অলঙ্কার বলি না, ফল, পুষ্প, পক্ষী ও নবকিসলয়কে বৃক্ষের অলঙ্কার বলি না, সোপান, কমল ও বৃহৎ মংস্তকে সরোবরের অলঙ্কার বলি না। শুধু কি তাই, হারকে কর্ণের অলঙ্কার বলিলেও সৌন্দর্য্যকে কর্ণের অলঙ্কার বলি না, যাহা স্নন্দর করে তাহাই যদি অলঙ্কার হয় তবে কেবল দৃশ্য বস্তুই অলঙ্কার হইবে কেন? শ্রবণযোগ্য, দর্শনযোগ্য বা আশ্রয়যোগ্য বস্তু অলঙ্কার বলিয়া পরিগণিত হইবে না কেন? আমরা কি স্নন্দর গন্ধ, স্নন্দর রস, স্নন্দর স্পর্শ প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করি না? যদি আমি কোন বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়াতে আমার মুখমণ্ডলকে কমলস্নরতি করিতে পারি বা ঐক্লপ কোন উপায়ে আমার অঙ্গুলির অগ্রভাগে শর্করার মিষ্টত্ব আনয়ন করিতে পারি, তাহা হইলে সেই স্নগন্ধ ও সেই মিষ্টত্ব কি আমার দেহের অলঙ্কার হইবে না?

যে অলঙ্কার ভায়ার ব্যবহৃত হয় সে অলঙ্কার সম্বন্ধে আমার বিশেষ কিছু বক্তব্য নাই। তবে সে সব অলঙ্কারের মধ্যে কোন কোনটিতে কেবল অর্থের প্রাক্ক হয় বলিয়া বোধ হয় তাহাদিগকে অর্থালঙ্কার বলে এবং কোন কোনটিতে ধ্বনির তুলনার অর্থ প্রায় থাকে না বলিয়াই তাহাদিগকে বোধ হয় ধ্বজালঙ্কার বা শব্দালঙ্কার বলে। অহুপ্রাস একটি ধ্বজালঙ্কার, উহা রূপার সিজিনির মত 'রিগি ঝিনি' করিয়া বাজে বটে কিন্তু অলঙ্কার হিসাবে উহার মূল্য বড়ই কম এবং ভাব না থাকিলে সে 'রিগি ঝিনিতে' মন বড় জড়ালে না; তবে কোন তরুণবয়স্ক ভাবুকর পক্ষে যদি সে ধ্বনির মধা হইতে স্বতঃই কোন ভাব

নির্গত হয়, তাহা বলিতে পারি না । তা ছাড়া প্রতি চরণে অমৃতপ্রাসের স্বকার বহুভালও তুমার না । তখন ‘সিগি সিনি’র পরিবর্তে ‘কমরকমান্ কম’ই বোধ হয় কর্ণে বেশী বাজে । উপমালঙ্কার একটি অর্থালঙ্কার, উহা মুক্তাহারের মত ধ্বনিশৃঙ্খল বটে কিন্তু অতিশয় মূল্যবান ও প্রভাবযুক্ত । উহা শ্রবণেন্দ্রিয়কে স্পর্শ নুনা করিয়া একেবারেই হৃদয়স্বক স্পর্শ করে । আবার কোন কোন অলঙ্কারের অর্থ ও ধ্বনি উভয়ই আছে বলিয়া বোধ হয় তাহাদিগকে ধ্বন্যর্থালঙ্কার কহে । যমকালঙ্কার একটি ঐ শ্রেণীর অলঙ্কার । উহা সোনার চুড়ীর মত মূল্যবানও বটে এবং মাঝে মাঝে হৃদয়গাহারি ‘টিং টাং’ শব্দও করিয়া থাকে । বুড়া কপিলও তাহার সাংখ্য-স্বত্রে ‘কুমারী-কঙ্কণবৎ’ উদাহরণটি দিয়া সেই ‘টিং টাং’এর মাধুর্য্যোপলব্ধির পরিচয় দিয়া গিয়াছেন ।

যে অলঙ্কার মহুদ্যদেহে প্রযুক্ত হয় এক্ষণে তাহার সম্বন্ধে হু এক কথা বলিব । অলঙ্কার সাধারণ নাম । সামান্য সামান্য অর্থভেদে ইহা আভরণ, ভূষণ ও প্রসাধনের বস্তুরূপে বুঝাইয়া থাকে । অলঙ্কারের সংখ্যা এত অধিক যে, তাহার প্রত্যেকটির নামোল্লেখ করা অসম্ভব, বিশেষতঃ পুরাতন ও প্রচলিত সকল অলঙ্কারের নাম করিতে গেলে একখানি প্রকাণ্ড পুস্তক হইয়া পড়ে । তবে অলঙ্কার প্রধানতঃ যে কয় শ্রেণীতে বিভক্ত তাহাই সম্প্রতি নির্দেশ করিব ।

প্রথমতঃ—দেহের দৈহিক অলঙ্কার

তাহার মধ্যে (১) সমগ্র দেহের অনায়াসসাধ্য অলঙ্কার, যৌবন, যাহাকে কালিদাস “অসমুতং মণ্ডলমঙ্গযষ্ঠৈঃ” বলিয়াছেন ।

(২) দেহের কোন একটি বিশেষ অঙ্গের অলঙ্কার যথা—রত্নগীর কেশ । সুদীর্ঘ বিশস্ত কেশকলাপই একটি সুন্দর অলঙ্কার, নচেৎ পার্শ্বভীর আলুলায়িত কেশপাশ দেখিয়া চমরীরা আপনাদিগের পুচ্ছের প্রতি শিথিলয়েহ হইত না ।

তার পর ক্রমোন্নতির পর্যায়ে চূর্ণালক বেশী, কুণ্ডল প্রভৃতি সমস্তই এক একটি সুন্দর অলঙ্কার ।

দ্বিতীয়তঃ—দেহের বহির্জাগতিক অলঙ্কার

তাহার মধ্যে (১) দেহের বর্ণোৎকর্ষবিধায়ক অলঙ্কার যথা অলঙ্কৃত, অঙ্গন,

• চন্দন, কুঙ্কম, হরিত্রাতম্ব, লোহ পুষ্পের পরাগ, স্নজ, পাউডার, লাক্ষী, তানাখা প্রভৃতি । •

প্রাচীন কালে চন্দন দ্বারা রমণীরা বক্ষস্থল ও পুরুষেরা প্রকেষ্ঠদেশ অঙ্কলিখত করিতেন। “ন লুপ্তং লপি চন্দন স্তনতটে” এবং “ততঃ প্রকেষ্ঠে চরি-চন্দনাঙ্কিতে” প্রভৃতি শ্লোকই তাহার প্রমাণ।

- (২) দেহের চিত্রবৈচিত্র্যবিধায়ক অলঙ্কার যথা, অলঙ্কা-
তিলকা, পত্রলেখা, ত্রিপুণ্ড্রক ও দেহলেখা (উচ্চি)।

পত্রলেখা একটি প্রাচীন অলঙ্কার। কালিদাসের কবিতায় অনেক স্থলেই ইহার উল্লেখ আছে। “ভূজে শচীপত্র বিশেষকাক্ষিতে স্বনাম চিত্রং নিচণান শায়কম্” এবং “গীতাস্তরেণু শ্রমবারিলেদৈঃ কিঞ্চিৎ সমুচ্ছাসিত পত্র-লেখকম্” প্রভৃতি শ্লোক ইহার অস্তিত্বের নিদর্শন।

- (৩) প্রাণীদেহজ অলঙ্কার যথা—অস্থি, পশুগোম, পশুচৰ্ম্ম, পাখীর পালক প্রভৃতি।

এই অলঙ্কারগুলি প্রকারভেদে অসভ্য ও স্বসভ্য উভয় সমাজেই প্রচলিত।

- (৪) উদ্ভিদেহজ অলঙ্কার যথা—পত্র ও পুষ্প।

পুষ্পের ছায়া স্নানর বস্ত্র জগতে অতি অল্পই আছে বলিয়া প্রাচীন যুগ হইতেই ইহার এত সমাদর। বিলাসীর পক্ষে এক্ষণ অলঙ্কার আর নাই। তাই কালিদাস তাঁহার আদর্শ সৌন্দর্য্য রাজা অলঙ্কার আদর্শ স্নানরী যল বধু-দিগকে এইরূপভাবে সাজাইয়াছেন—

“হস্তে লীলাকমলমলকে বালকুন্ডাহবিদ্ধং
নীতা লোম্য প্রসব রজসা পাণ্ডুতাম্রমণ্ডনে স্ত্রীঃ
চূড়াপাশে নবকুরুবকং চারু কর্ণে শিরীষং
সীমন্তে চ বহুপগমজং যত্র নীপং বধুনাং ।”

পুষ্পালঙ্কারের নিকট স্বর্ণ মুক্তা হীরকাদি খচিত অলঙ্কারও যে নিকট—
তাহাও কালিদাস পার্শ্বতীর অঙ্গে নিম্নলিখিত অলঙ্কার দিয়া সূচিত করিয়া-
ছেন :—

“অশোক নিত্যং সিত পদ্মরাগমাকৃষ্ট হেমছাতি কর্ণিকারম্
মুক্তাকলাপীকৃত সিদ্ধবারং বসন্তসুখাতরণং বহস্ত্রী ।”

- (৫) স্তব্ধরঞ্জিত মণিমুক্তাদি নির্ধিত অলঙ্কার।

- (৬) বস্ত্রালঙ্কার বা বেশ।

উপরে যে সকল বিভিন্ন শ্রেণীর অলঙ্কারের কথা বলা হইল তাহাদিগের

মধ্যে কোন্টি কোন্ সাময়িক স্তরে, কোন্ সভ্যতার যুগে ক্রমোন্মুক্ত হইয়াছিল তাহা নির্ণয় করা এখন হুঃসাধ্য। তবে ইহা নিশ্চয় যে মহুয়ের সৌন্দর্য্য-জ্ঞান ও অলঙ্করণেচ্ছা বাহু প্রকৃতি দ্বারাই সর্বপ্রথম উদ্বোধিত হয়। একদিকে যেমন বহির্জগতের অতুলনীয় শোভা দ্বারা মহুয়ের মন আকৃষ্ট হইতে লাগিল, অপর দিকে সে তেমনি নিজের দীনতা অঙ্কুর করিয়া নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যকে অপচরণ করিবার ও সেই অপচৃত সৌন্দর্য্য দ্বারা আপনাকে বিভূষিত করিবার পরিকল্পনা করিতে লাগিল। ঐ যে আপেলটি খুলিতেছে। ঐ যে গোলাপ ফুলটি ফুটিয়া রহিয়াছে, ঐ যে ময়ূর তাহার বিভিন্ন বর্ণের পুচ্ছ বিস্তার করিয়াছে ইহাদিগের কোন্টি না স্নন্দর? ইহাদিগকে আশ্বাস্য করিতে পারিলে বৃক্ষি আমিও ঐরূপ স্নন্দর দেখাইব, এইরূপ সে চিন্তা করিতে লাগিল। কিন্তু সে কোন্ স্নন্দর বস্তুটিকে অগ্রে আশ্বাস্য করিবে? যেটি তাহার পক্ষে সর্বাপেক্ষা স্নলভ অর্থাৎ যেটি আচরণ করিতে তাহাকে সর্বাপেক্ষা অল্প পরিশ্রম ও ক্রেশ স্বীকার করিতে হয়। সে দেখিল পুষ্প বৃন্তচ্যুত হইয়া থসিয়া পড়ে, ময়ূর তাহার বই পরিয়া যায়, নানা বর্ণের স্নত পতঙ্গ ও প্রস্তরাদি ভূমি হইতেই কুড়াইয়া লওয়া যায়। সে প্রথমতঃ সেই সমস্ত লইয়া আপনায় দেহ অলঙ্কৃত করিতে লাগিল। কারণ যত অল্প ক্রেশস্বীকারে যত অধিক তৃপ্তি বা স্নখ অর্জন করা যায় তাহাই আমাদের বাহ্যনীয়—এই মূল সূত্রটি অর্গনীতি ও সমাজ-নীতির পক্ষে যেকোন সত্য, অসত্য ক্ষেত্রেও সেইরূপ। তবে মহুয় অল্প ক্রেশ স্বীকারে যে পরিমাণ তৃপ্তি অর্জন করিতে পারে, তদপেক্ষা অধিক পরিমাণ তৃপ্তি অর্জন করিবার জন্য তদধিক ক্রেশ স্বীকার করিতেও প্রস্তুত,—যদি ক্রেশ অপেক্ষা তৃপ্তির পরিমাণ অধিক হয়। এই নিমিত্ত মহুয় ক্রমশঃ প্রকৃতি রাজ্যের চরমিগম্য প্রদেশসমূহ হইতে অতিমাত্র ক্রেশ স্বীকার করিয়াও উৎকৃষ্ট অলঙ্কার সকল সংগ্রহ করিতেছে যেকোন হীরক, মুক্তা ইত্যাদি; এবং পূর্বে যে পরিমাণ ক্রেশ স্বীকার করিয়াও যে পরিমাণ তৃপ্তি অর্জন করিতে পারিত না, এখন সভ্যতা বৃদ্ধির জন্য তদপেক্ষা অনেক অল্প ক্রেশস্বীকার করিয়া তদপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণ তৃপ্তি অর্জন করিতে পারিতেছে।

যাহা হউক কিছুকাল প্রাকৃতিক বস্তুকে অলঙ্কাররূপে ব্যবহার করিতে করিতেই মহুয় ঐ সকল বস্তুর অলঙ্করণে কৃত্রিম অলঙ্কার সকলও নির্মাণ করিতে শিখিল এবং আজকাল আমাদের আদিকাংশ উৎকৃষ্ট অলঙ্কারই এই

শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত—যেমন ভাষাভাষা, বৃত্তিক হার, কার্পেটের ছতা, লেস ইত্যাদি ।

কিন্তু প্রকৃতিরাজ্য হইতে গ্রহীত বা প্রাকৃতিক বস্তুর অতীতকরণে নির্মিত অলঙ্কার ব্যবহার করিতে হইলে প্রথমতঃ আমাদের দেহের কোন কোন অংশকে ঐ সকল অলঙ্কার ধারণের উপযোগী করা আবশ্যক । এই নিমিত্ত ওঁরাও, কোল, ভীল প্রভৃতি অসভ্য জাতিদেরা অলঙ্কার ধারণের জন্য এইরূপ ভীষণভাবে কর্ণবেধ ও নাসিকাবেদন করিয়া থাকে যে, তাহা দেখিয়া আমাদের হাত সঞ্চরণ করা দুঃস্থ হইয়া উঠে । কিন্তু তাহা হইলেও উহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই, কারণ ঐ সকল স্থলেও ক্রেশ শ্রীকার অপেক্ষা তৃপ্তি লাভের পরিমাণ অধিক । স্বপ্নভা সমাজেও অলঙ্কারধারণের নিমিত্ত ক্রেশশ্রীকারের পরিমাণ ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিতেছে কিন্তু তাহা প্রত্যক্ষভাবে নহ; পরোক্ষভাবে অর্থাৎ শারীরিক ক্রেশশ্রীকারের বিরুদ্ধ অগ্রগাতে । হিন্দুস্থানী রমণীরা এখনও যেরূপ পৈরী ধারণ করিয়া থাকেন, সেরূপ একখানি অলঙ্কার যদি কোন বঙ্গ ললনাকে ধারণ করিতে হয়, তবে তিনি বঙ্গ উগ্রুখল ধারণ করিবেন, তথাপি অলঙ্কার ধারণ করিবেন না ।

দ্বিতীয়তঃ—প্রাকৃতিক অলঙ্কার ব্যবহার করিতে হইলে আমাদের দেহেরও কোন কোন অংশের উন্নতি-সাধন দ্বারা তাহাদিগকে অলঙ্কাররূপে পরিণত করা আবশ্যক, এবং সেই সকল শারীরিক অলঙ্কার বাতীত বাহ্যিক অলঙ্কারের সৌন্দর্য্য সম্যক্ বিকসিত হয় না । রমণীর কবরী তাহার একটি শ্রেষ্ঠ উদাহরণ । সূচাগ কেশের উপরে গোলাপ পুষ্প সন্নিবেশিত করা অপেক্ষা রমণীর কবরীতে সন্নিবেশিত করিলে তাহা যে অল্পেক অধিক সুন্দর দেখায় তাহা রমণীদেবী ব্যক্তি বাতীত সকলেই স্বীকার করিবেন ।

এইরূপে কেশনষ্টাদি শারীরিক অলঙ্কারের সহিত পুষ্পমণিরত্নাদি বাহ্য অলঙ্কারের ব্যবহার চলিতে লাগিল । কিন্তু বহির্জাগতিক অলঙ্কারের মধ্যে বর্ণোৎকর্ষ-বিধায়ক এক প্রকার অলঙ্কার আছে । সৌন্দর্য্য বলিলে-মহুধ্য প্রথমে দেহের বর্ণকেই বুঝিত । পরে দেহের গঠন ও অবশেষে-সুগঠনের সহিত সুললিত অঙ্গভঙ্গীও সৌন্দর্য্যের অঙ্গীভূত হইয়াছে । পুষ্পালঙ্কার ও বস্ত্রালঙ্কার গঠনোৎকর্ষ-বিধায়ক অলঙ্কার—কিন্তু স্নানাহুলেখ্যনাদি বর্ণোৎকর্ষ-বিধায়ক অলঙ্কার, এবং এই শেষোক্ত প্রকার অলঙ্কারই যে প্রথমোক্ত তাহাতে সন্দেহ নাই । কিন্তু মহুধ্য আপনার স্বকের উপরিভাগ যে সকল বর্ণে রঞ্জিত করিত বা তাহাতে যে সকল চিত্র অঙ্কিত করিত তাহাদিগকে চিত্রহাসী করিবার

জন্মই বোধ হয় দেহলেখার উদ্ভাবনা হইয়াছিল। কিন্তু এক প্রকার দেহলেখা যতই স্নন্দর হউক না কেন তাহা কিছুকাল পরে অশোভন হইয়া পড়ে বলিয়াই বোধ হয় দেহলেখার প্রচলন বর্তমান স্নন্দর সমাজে প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। এক্ষণে চিরস্থায়ী অলঙ্কারের পক্ষপাতী আমরা কেহই নহি; যে প্রকারের অলঙ্কারকে শীঘ্রই ধারণ ও উন্মোচন করা যায় তাহাই উন্নত প্রণালীর অলঙ্কার বলিয়া বিবেচিত হয়।

অলঙ্কারের দ্বারা যে প্রয়োজনীয়তা সংসাধিত হয়, তাহা প্রথমতঃ কেবল সৌন্দর্য্য-নিবন্ধই ছিল, অর্থাৎ সৌন্দর্য্যসাধনই অলঙ্কারের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। ক্রমে পরিবর্তনীয়তাও ঐ উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত হইল। ক্রমে স্বাস্থ্য ও স্বচ্ছন্দতাও উহার অপর একটি উদ্দেশ্য হইয়া গাঁড়াইল। পরিচ্ছদ দ্বারা যে, কেবল সৌন্দর্য্য সংসাধিত হয় তাহা নহে, উহা স্বাস্থ্য ও স্বচ্ছন্দতারও অঙ্গুল এবং উহাকে ইচ্ছামত পরিবর্তন করা যায়। এই নিমিত্ত আধুনিক স্নন্দর সমাজে ক্রমশঃ স্বর্ণরৌপ্যাদিনির্মিত অলঙ্কারের পরিবর্তে এই শ্রেণোক্ত প্রকার অলঙ্কারেরই সমধিক প্রচলন চাইতেছে।

অলঙ্কারের প্রথম প্রয়োজন সৌন্দর্য্য চাইলেও এমন অলঙ্কার আছে যাহা স্নন্দর চাইলেও স্বাস্থ্যের অঙ্গুল নয়। ইউরোপীয় রমণীরা যে ‘কর্সেট’ পরিধান করেন তাহা এক প্রকার গঠনোৎকর্ষ-বিধাৎমক অলঙ্কার কিন্তু তাহা যে স্বাস্থ্যের অঙ্গুল নয় তাহা স্থিরীকৃত হইয়া গিয়াছে। আবার অনেক অলঙ্কার আছে যাহা কেবল স্বাস্থ্যের জন্মই প্রথম ব্যবহৃত হইত, এবং স্বাস্থ্যের অঙ্গুল বলিয়াই ক্রমশঃ অলঙ্কারের পদবী লাভ করিয়াছে। ভূটিয়া রমণীগণ মুখমণ্ডলে যে লাক্ষার প্রলেপ দিয়া থাকে, তাহার আদিম উদ্দেশ্য শীত নিবারণ এবং আন্দানানবাসিগণ সর্বাঙ্গে যে লোহিতবর্ণ মুক্তিকা লেপন করে তাহার আদিম উদ্দেশ্য মশকের হস্ত হইতে পরিজ্ঞান লাভ, কিন্তু তাহা হইলেও ঐ দেশবাসীদিগের চক্ষে ঐ উভয় বস্তুই অতি রমণীয় অলঙ্কার হইয়া গাঁড়াইয়াছে।

সভ্যতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যেরূপ একদিকে রমণীগণ অতিশয় মূল্যবান ও চম্পাপা অলঙ্কার ধারণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, সেইরূপ অপর দিকে তীহাদিগের ব্যবহৃত অলঙ্কারের সংখ্যা, আয়তন ও গুরুত্বের হ্রাস হইতেছে। ইহাতে আশঙ্কা হয় যে, পরিশেষে স্নন্দর সমাজে প্রায় অধিকাংশ রমণীকেই অলঙ্কারহীনা হইতে চাইবে এবং বিবাহ-কালে অগ্নি কেহই ‘সালঙ্কারা-কল্পা’ পাইবার প্রত্যাশা করিতে পারিবেন না। কিন্তু তাহাতেও পুরুষ জাতির বিশেষ ক্ষতি নাই কারণ অনেক স্বামীই পত্নীকে অলঙ্কার দিবার দায় হইতে অব্যাহতি পাইবেন।

শ্রীমতীশচন্দ্র গটক ।

নূরজাহান ।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আজ মেহেরের সেই চিরবিরহের দিন সম্প্রতি । এ বিরহ কণিকের নয়,—যতদিন দেহ থাকিলে, অবশিষ্ট জীবনের প্রত্যেক দিনের প্রতি মুহূর্ত প্রিয়তমের বিরহ-বেদনার ব্যাকুল অশ্রু তাহার চুই নয়ন অঙ্গ করিয়াই গাণিবে । এ জীবনে প্রাণাধিক প্রিয়কে চির-সান্নিধ্যের মধ্যে পাওয়ার সৌভাগ্য সকলের হয় না ; তাহাকে দিনান্তদর্শনের সৌভাগ্যটুকু যদি থাকে, তাহার প্রিয় মুখখানি দেখিয়া প্রাণপ্রিয় ধন আমার হৃদয় আছে, হৃদয়ে আছে জানিয়াও আমার বুদ্ধিকৃত প্রেমের মর্শ্বণাতী বেদনার কণকিৎ উপশম হয় ; কিন্তু এ জীবনের লীলা শেষ করিয়া প্রেমাপ্রিত জনকে চিরবিরহের দুঃসহ দুঃখের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া প্রিয়-দয়িত যখন লোকান্তর যাত্রা করে, বিধবার সে দিনের বন্ধ-বেদনা কেবল দুঃসহ বলিলে যে তাহার যথাযথ বর্ণনা হয় না । নিঃশ্বাস চলে বটে, কিন্তু তাহাকে প্রাণধারণ বলা যায় না । শ্রবণ, নয়ন প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গ্রাম তাহাদের কার্য্য হয় ত বা করিয়া যায়, কিন্তু সে কার্য্যের ফলভোগী মন কি তাহার সংবাদ সব সময়ে লইবার মত অবস্থায় থাকে ?

একজনের জীবিতকালে তাহার স্নেহ-ব্যাকুল বাহুর বেষ্টনের মধ্যে কান্ধন পূর্ণিমার রক্ত-কিরণধারায় দ্বান-সিদ্ধা মেদিনীর অপরূপ সৌন্দর্য্য মালক-বিতানোখিত মল্লিমালতীর মনোমদ গন্ধ, আশ্রমজরীর স্ফোরসতৃপ্ত বসন্ত-বৈতালিকের মনোমোহন কণ্ঠ যেমন করিয়া দেহ-নন-ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিবিধান করে, সেই স্নেহ বাহু'টি যখন কালের অকারণ হস্ত আসিয়া আমার কণ্ঠ হইতে পুঁজিয়া দেয় তখনও চিরদিনের এই বসন্তবধীশরদধিষ্ঠিতা প্রবীণা ধরণী বর্ষে বর্ষে তেমনি করিয়াই নবীনা হইয়া ওঠে, মলয়াচলসম্পৃক্ত মন্মানিল বর্ষে বর্ষে বসন্তের পুষ্পবাটিকায় তেমনি করিয়াই অতিথির বেশে উপস্থিত হয়, ছায়ামকান্তি নবজলধরের স্নিগ্ধকান্ত মনোমোহন মৃষ্টি আবাড়ের প্রথম দিবসে নিদাযের যজ্ঞানল তেমনি করিয়াই নির্ঝাপিত করিবার জজ পরিপূর্ণ শান্তি-কুস্ত হস্তে গভীর মস্ত্রে অভয়া মন্ত্র উচ্চারণ করে, কিন্তু হায় একজনের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে যাহায় সবই চুরাইয়া গিয়াছে তাহার পক্ষে প্রকৃতির এই আনন্দ আয়োজন যে বার্থ অপেক্ষাও বার্থ !

যাহার চক্ষে জগত দেখিতাম সে চক্ষু আজ নিমীলিত, যাহার মনের আনন্দ-আলোক বিচ্ছুরিত হইয়া আমার অন্তরের সব অন্ধকার দূর করিয়া দিত, সে মন যে আজ তাহার দেহের সঙ্গে সঙ্গে ধূলী-ভয়ে পরিণত হইয়াছে, তাই প্রিয়বিরহঃখকাতরা প্রিয়ার অন্তর বাহির সব যে অমানিশার অন্ধ অন্ধ-কারে নিমগ্ন ।* হৃথ, আনন্দ, শান্তি ও সাধনা সব সেই পরলোক প্রেবাসীর পদপ্রান্তে যাইয়া বারম্বার লুপ্ত হইতে থাকে, ইহলোকের কিছুই আর তাহার দেহ-মন-ইন্দ্রিয়কে ক্রমিক তৃপ্তিও দিতে পারে না ; হুনিয়ার মালিকের মুকুট-মণি রাজসাজেশ্বরী সর্বদম্পদের একাধিকারিণী আনন্দময়ী মেহেরনিসা জীবন থাকিতেও আজ প্রাণহীনা—রাজকান্তের বিয়োগঃখবিধুরা, জগদালোকরূপিনী, রূপময়ী নেতের বৈধব্যের শুভ্রাবরণমণ্ডিতা পাষাণ-প্রতিমা হইয়া গিয়াছে—প্রাণ থাকিলেও সে প্রাণে আজ আনন্দম্পন্দনের একান্ত অভাব ।

স্বামিসঙ্গময় দিনের অকুওকার্য্য, অকথিত বাণী, অঙ্গ-সেবা ও সাহচর্য্যের শত ক্রুতীর কথা আজ মনে আসিয়া পতিহীনতার অন্তর কি ব্যাকুল বেদনায় অধীর করিতেছে তাহা সেই সর্বসৌভাগ্যবক্তিতা বিয়োগবিধুরা বিধবাই বলিতে পারে !

এত দুঃখের মধ্যেও স্বামীর শেষ আদেশ পালনের প্রাণপণ চেষ্টা না করিয়া নূরজাহান নীরবে থাকিতে পারেন নাই । ভ্রাতা আসক কর্তৃক বৃলাকীর রাজ্যান্তির্য্যেকের কথা শুনিয়া সমস্ত অবস্থা বুঝিতে মেহেরের জ্ঞান বুদ্ধিমতীর বিলম্ব হয় নাই ।—স্বামীর আদেশ নাথায় লইয়া—নূরজাহান শারিয়ারকে সম্মুখি বলিয়া ঘোষণা করিলেন এবং লাহোরের রাজধানী অধিকার করিয়া বৃলাকীর অভিযানের প্রতিরোধমানসে লাহোর দুর্গে সৈন্য সমাবেশ করতঃ দুর্গ, নগর ও রাজ-সিংহাসন স্ফুট করিবার চেষ্টায় কায়মনে যত্ন করিতে লাগিলেন । কিন্তু হায় ! অদৃষ্টনেমী কাহার অদৃষ্ট হস্তে নিয়নিত হইয়া তাহার আবর্তন পূর্ণ করে কে জানে ! কিন্তু ইহা জানি যে, অসৌভাগ্যের দিনে সহস্র চেষ্টাতেও ভাগ্যদেবতার প্রসন্ন হাত লাভ করা যায় না । পর্ত-শিখর হইতে অবতরণ আরম্ভ হইলে শিখরীর পাদমূলে আসিয়া পতন অনিবার্য্যই হয়,—তৃণ, গুল্ম, প্রস্তর, বৃক্ষ, বল্লরী যাহাই কেন আশ্রয় করি না, কিছুতেই আর অধঃপতন নিবারিত হয় না, আশ্রয়কে লইয়াই ভূমিশায়ী হইতে হয় ।—অন্তগমনোন্মুখ স্বর্গদেব সহস্র করে আকাশ আশ্রয় করিয়াও উর্দ্ধে আসন ব্রক্ষা করিতে পারেন না, দিক্চক্রবালের অন্তরালে পড়িয়া তাঁহাকে দৃষ্টাগো

আশ্বগোপন করিতেই হয়,—ইহাই জগতের নিয়ম! কেবল নূরজাহানের ভাগ্যে অশ্রুৰূপ হইবে—ইহা কি সম্ভব? কত ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ পাত হইয়া গিয়াছে, যে নিয়মে বিশ্বচক্র জাযানান্ তাহার অণু পরিমাণ ব্যতিক্রমও হয় নাই, হইবেও না। মেহেরউল্লিসাকে তবুও ভাগ্যবতী বলিব; জীবন থাকিতে সে তাহার জীবনাধিকের স্নেহ-সান্ধ্য-সারিধা পাইয়াছে, তাহার প্রাণপ্রিয় দয়িতকে সেবা, সহায়ভূতি, শান্তি, সুখ দিতে পারিয়া নিজে নারীজন্ম সার্থক করিয়া গিয়াছে। কিন্তু হায়, এমন চরদুঃখের সৃষ্টি জগতে হইয়াছে যে, যে দিন হইতে জীবনের আনন্দ-স্পন্দন সে অশ্রুভব করিয়াছে, জীবনের সাফল্য কিসে এবং কোথায় জানিতে পারিয়াছে, সেই দিন হইতেই বার্থতার বিদ্যাগিরিভার তাহার বৃকে চাপাইয়াছে, নিঃশব্দে দুর্ভাগার জীবনান্ত দিনের ত্রিমিতনেত্রে অশ্রু-বিন্দুর মধ্যে তাহার জীবনের শেষ যবনিকা পড়িয়া গিয়াছে, তখনও তাহার আরাধ্য সার্থকতা বহু—বহু দূরে!! স্পর্শমণির ক্ষণিক স্পর্শ ছোড়করে ঘাচিয়া ঘাচিয়া জীবন শেষ হইয়া গেল, ভাগ্যমোতার প্রসন্নতা লাভ অদৃষ্টে ঘটিল না, চুই হস্ত প্রসারিত করিয়া রূপার দানভিক্ষা মাগিয়া সমগ্র জীবন কাটিয়া গেল, অনন্ত পথের অনির্দেশ যাত্রার দিনে রিক্তমুষ্টি লইয়াই বিদায় হইতে হইল—এমন দুঃখী জীবনের দৃষ্টান্ত জগতে বিরল নহে। দিনেকের সার্থকতার দুঃখ ও আনন্দ ক্রয় করিতে অবশিষ্ট জীবনের সব পরমায়ু আনন্দে দিতে পারিত—তবুও সে ক্ষণিকের সাফল্য লাভ অদৃষ্টে ঘটিল না। এমন ভাগ্যহীনের সংখ্যা জগতে কম নয়। সেই সকলের তুলনায় মেহেরকে সুখী বলিতেই হইবে। সুখ দুঃখ যে আপেক্ষিক শব্দ, তুলনায় ইহার পরিমাপ হইয়া পাকে, মেহের নিরবচ্ছিন্ন দুঃখই পায় নাই,—সুখের মুখ দেখিয়া জীবন ধন্য করিবার সোভাগ্য তাহার হইয়াছিল।

শাহরিয়ারের সিংহাসনোত্তরণের ঘোষণা ব্লাকীর নিকট পৌঁছিলে সঙ্গে সঙ্গে ব্লাকী কেমন করিয়া তাহাকে পরাজিত করিয়াছিল, কেমন করিয়া নৃশংসের কৃতকার্য্যে শাহরিয়ারের চক্ষু উৎপাটন করিয়া তাহাকে এই চির-পরিচিতি স্নেহময়ী ধরণীর শোভাসৌন্দর্য্য দর্শনের সুখ হইতে চিরবঞ্চিত করা হইয়াছিল, কেমন করিয়া ব্লাকির দয়ার্জ্জ্বল করণায় অন্ধ রাজকুমারের জীবন রক্ষা হয়—সে সব কথা মোগল ইতিহাস-পাঠকের অবিন্দিত নাই। শাহরিয়ারের পরাজয়ের পর সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের শরীররক্ষী* সেনা ভিন্ন আর সহায় ছিল না, প্রায় সকলেই তাহার বিরুদ্ধাচরণের অস্ত্র উৎসুক হইয়া

উদ্বিগ্নাছিলেন । অনেকের আশ্রয় সম্রাজ্ঞীকে যখন কারাবদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে
অহুষ্ঠান চলিতেছে, তখন নূরজাহান তাঁহার আশ্রয়লাভে একটিনাত্র
পদাতিক সৈন্যও নিকটে না রাখিয়া বুলাকীর হাতে সর্বতোভাবে আশ্রয়
সমর্পণ করিলেন ।

৭ম নূরজাহান তদানীন্তন ভারতের হুদাঙ্গ সেনাপতি রণপণ্ডিত মহাবতের
বিরুদ্ধে ছত্রভঙ্গ সেনাদলের অবশিষ্ট লইয়া নানা প্রতিকূল ঘটনার মধ্যে
যুদ্ধোত্তম করিতে ভীত হন নাই, ইত্যন্ততঃ করেন নাই বরং বাদশাহী সেনা-
নাগকনের ও ভ্রাতা আমলের ভীততার জন্য ভীত ভৎসনা করিয়া স্বয়ং সৈন্য-
চালনার ভার লইয়া বর্ষাঘাত চরিত্র তরঙ্গিনীর মৃত্যু-তরঙ্গের মধ্যে হস্তীসহ
অঁপ দিয়া পড়িয়াছিলেন—সেই নূরজাহান আজ বুলাকীর নিকট আশ্রয়সমর্পণ
করিলেন কত বড় হুঃখ—তাহা হৃদয়বান পাঠক একবার চিন্তা করিলে বুঝিতে
বিলম্ব হইবে না । জীবনের সব হুঃখ, সব আনন্দ যাহার অবসানের সঙ্গে সঙ্গে
মিটিয়া গিয়াছে, যার নেত্র নিমীলনের সঙ্গে জীবনের প্রয়োজনবোধও
মুঁড়াইয়াছে সে হুঃখসার জীবনে কোন প্রলোভনে আর কণ্ঠের উচ্চয় করিবেন !
স্বামীর শেষ আদেশ পালন ও আমাতা শারিয়ারকে হিন্দুহানের বাদশা করিয়া
কছার স্বথ-কামিনার যেটুকু কর্তব্য বাকী ছিল তাহাতে অকৃতকার্য হওয়ার
পর আর বর্ষাদসী বিধবার কি কর্মস্পৃহা থাকিতে পারে ?

হরশ্রুতঃখের মধ্যে পথপার্শ্বে জন্ম লাভ করিয়া জীবনে কত বিচিত্র ঘটনা-
বলীর মধ্য দিয়া কোথায় আগ্রা, কোথায় স্বদূর বঙ্গদেশের পল্লী বর্ধনানে আসিয়া
জীবনের একাংশ স্নেহে হুঃখে কাটিয়া গিয়াছে—তারপর রক্তমহলের দাসীহুতি
করিয়া কিরূপে হৃদয়ভরা স্নেহের বলে বলভতন প্রাণপ্রিয় দয়িত লাভে তিনি
কৃতার্থ হন, সাম্রাজ্যের স্বপ্নরক্ষা যখন স্বীয় হস্তে গ্রহণ করিতে হইয়াছিল তখন
কত প্রতিকূল ঘটনা তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়াছে, স্বামীর পানপ্রিয়তা নিবারণ
কল্পে কত লাজুনাই তাঁহাকে ভোগ করিতে হইয়াছে, মহাবতের হস্তে পতিত
ভগ্নতি নিবারণ করিতে গিয়া প্রাণদণ্ডের আক্রা পর্যন্ত নতশিরে বহন করিতে
হইয়াছে, স্বামী বিয়োগের পরে অষ্টাদশবর্ষব্যাপী বৈধবা কি বিপুল ব্যাধায় কাটিয়া
গিয়াছে ! সবকথা মনে করিলে নূরজাহানের বৈচিত্র্যময়ী জীবনকাহিনী হৃদয়ের
মধ্যে আলোচনা করিলে পাষণ্ডও বুঝি দ্রব হইয়া যায় !

আজ সে ভুলনবিধাতা মোগল সাম্রাজ্যও নাই, সে দিনও নাই, সে দিনের
নীতিও আজ কত পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে । আজকার দিনের ইউরোপীয় সমাজ

ও নীতিশাস্ত্রের মূলমাত্র মনে করিয়া প্রাচ্যদেশের তিনশত বৎসর পূর্বের নারী চরিত্রের বিচার করিতে বসিলে হয়ত বা নূরজাহানের চরিত্রে তাই একটি দোষ দেখা যাইতে পারে, তবে সে বিচার জায় বিচার চাইবে বলিয়া মনে হয় না। বিধবার বিবাহ মুসলমান শাস্ত্র ও নীতির বিরোধী নহে; জাহাঙ্গীরের অল্প পত্নী বিস্ত্রমানে তাঁহার পত্নী চাইতে স্বীকৃত হওয়া নূরজাহানের চরিত্রের কলঙ্ক নহে, কারণ একাধিক পত্নী এককালে গ্রন্থ প্রাচ্যদেশে চির প্রচলিত প্রথা; আজও সেইরূপ ঘটনা ঘটিতেছে এবং ভবিষ্যতে ঘটিলেও তাহা দোষাবহ চইবে না। প্রাচ্যদেশে সামাজিক নিয়ম যাহারা প্রবর্তিত করিয়াছিলেন তাঁহারা হেতু, কারণ, দেখিয়াই একাধিক পত্নীগ্রহণ পুরুষের পক্ষে নিষেধ করেন নাই; আজ ইউরোপ আমাদিগকে মগ্নগুতা একটি মাত্র পত্নী গ্রহণ করিতে শিখাইয়াছেন, প্রাচী ও প্রতীচির মধ্যে দেশগত, সমাজগত, প্রকৃতিগত কত বিভিন্নতা বিস্ত্রমান আছে সে কথা আমরা ভুলিয়া গিয়া সর্ব বিষয়ে ইউরোপের অনুকরণ করি,—ঠিক করি কিনা কে জানে?

নূরজাহানের সামসনয়িক, তাঁহার পূর্বের ও পরের নানাদেশের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, যে সকল রমণীকে সিংহাসনে বসিয়া সামাজ্য পরিচালনা করিতে হইয়াছে বা যাহাদিগকে নিজ নিজ সম্রাট স্বামীকে রাজকাৰ্য্যে সহায়তা করিতে হইয়াছে তুলনায় নূরজাহান তাঁহাদের কাহারও কাৰ্য্যপটুতা বা অত্যন্ত গুণে হীন ছিলেন না। নারীর সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান আকর্ষণ তাহার রূপ। বিধাতা নূরজাহানকে রমণীরূপের আদর্শ করিয়া সৃজন করিয়াছিলেন। যে সকল ঐতিহাসিক নিজ নিজ কল্পনাবলে নূরজাহানের নানারূপ দোষ ও অকীর্তির অথবা প্রচার করিতে ইতস্ততঃ করেন নাই, তাঁহারাও নূরজাহানকে কুরূপা বলিতে সাহসী হন নাই। দিল্লীর রঙ্গমহলকে রমণী-রূপের হাট বলিলেও অত্যাধিক হয় না। জর্জিয়া, সারকেশিয়া তুরস্ক, পারস্য, আফগানিস্তান এবং ভারতের নানা প্রদেশাহরিত পরমহুন্দরী রমণীগণ বাদশাহের আজ্ঞার রঙ্গমহলে স্থান পাইত। আকবরশাহের পুত্র কন্দর্পকান্তি কুমার সেলিমের চিত্রবিনোদনের জন্য হুন্দরী রমণীর অভাব ছিল না, তথাপি প্রথম দর্শনমুহূর্ত্তে রাজকন্দনের জন্যে যে কিশোরী তাঁহার অচল আসন প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, তাহাকে রূপবতী বলিলে তাঁহার যথার্থ বর্ণন বোধ করি হয় না, তাহার কুপমাধূর্য্য যে অনন্ত-সাধারণ ছিল, একথা স্বীকার করিতেই হয়। তৎকাল প্রচলিত প্রথা অনুসারে মোগল ও পারসিক রমণীদিগকে নানা যন্ত্রে শিক্ষা দেওয়া হইত—এ কথার প্রমাণ

নানা ইতিহাস হইতে দেওয়া হইতে পারে। নূরজাহানের পিতা গিয়াসবেগ কছাকে পরম যত্নে হুশিকিতা করিয়াছিলেন—সে কথা সকলেই জানেন এবং নানা দেশ হইতে কবিগণ বেগম নূরজাহানের নিকট সমস্তা পুরণের দ্বন্দ্বযুদ্ধে আসিতেন—এই একটি মাত্র ঘটনায় বোঝা যায় যে, নূরজাহান কেবলমাত্র শিক্ষিতা ছিলেন না—তিনি স্নকবিও ছিলেন। তাঁহার হুচী ও চিত্র শিল্পে নৈপুণ্য সর্বজন-বিদিত, রঙ্গমহলের দাসীবৃত্তির ছাংময় সময়ে ঐ শিল্পনৈপুণ্যই তাঁহার জীবনোপায় ছিল। নৃত্য, গীত ইত্যাদি কলাবিজ্ঞায় তিনি বিলক্ষণ পারদর্শিনী ছিলেন—কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে, পারসিকদিগের প্রথা অনুসারে গিয়াসতবনে আনয়িত রাজকুমার সেলিম যে, মেহেরের নৃত্যকুশলতায় মুগ্ধ হইয়াছিলেন, এই সংবাদ নানা অসম্ভব কাহিনীতে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। রাজাশাসনকালে নূরজাহান সর্ববিষয়ে কি পরিমাণ দক্ষতা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা ইতি-পূর্বে বহুবার বলিয়াছি, তাঁহার কার্যকুশলতায় রাজস্ব ও সাম্রাজ্যের আয়তন বৃদ্ধি হইয়াছিল, ইহা ঐতিহাসিক সত্য তথা। স্বাস্থ্য ও জীবন রক্ষার অল্প জাহাঙ্গীরের পানাসক্তি তিনি কত পরিমাণে কন করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ জাহাঙ্গীরের বরচিত জীবনচরিতেই যথেষ্ট পাওয়া যায়। আপদগত স্বামীর উদ্ধারকল্পে অত্যাশ্রয়, হইয়াও অগ্রদারণাপূর্বক সৈন্তচালনার ভার স্বীয় হস্তে স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়াছিলেন—ইহা তাঁহার সাহসিকতা ও পতিপ্রেমের অমর উদাহরণ।

অথৈ-অথৈ, উৎসবে-বাসনে তাঁহার পার্শ্বচরী হইয়াছি, তাঁহাকে জীবনের চিরসঙ্গীত্বে, জীবনদেবতাক্বে, ছদয়ের মধ্যে বরণ করিয়া স্বামী বলিয়া স্বীকার করিয়াছি তাঁহার জীবিতকালের যাবতীয় কর্ণে ও নর্ণে, তাঁহার শয়নে ভোজনে ভ্রমণে, বিশ্রামে তাঁহার মৈনলিন জীবনঘাতার প্রত্যেক তুচ্ছতম কার্য্যেও যদি আনন্দবিধান করিতে না পারিলাম তবে নারীত্ব, পত্নীত্ব ছুইই বার্থ—ইতিহাস নুরুকণ্ঠে স্বীকৃত করিতেছে মেহেরের নারীজীবন ও পত্নীজীবন কিছুই বার্থ হয় নাই।

(ক্রমশঃ)

শ্রীজগদিশ্রনাথ রায়।

সন্ধ্যা

দিবসের শ্রান্ত আলো বিধবার হাসি সম মান,
 নীড়ে-ফেরা বিহগের বন্ধ হুল আনন্দের গান,
 মুমূর্ষু আশা সম শেষ আলো পড়িয়াছে তেলি
 সন্ধ্যাসতী নামে ধীরে অন্ধকার অঞ্চলটি মেলি,
 বিরতীর দীর্ঘ-স্বাস কাঁপাইল হির তর শির
 বৃহিল সমীর !

নেবু-ফুল গন্ধ আসে, সন্ধ্যার দে অলকের বাস,
 কুমল উঠেছে ফুটি পৃথিবীর বাগ নব আশ ;
 কামিনীর স্বরা দলে পূর্ণ আত শ্রাম তরুণীণি,
 জীবনের অবসানে এ যেন গো শৈশবের স্মৃতি !
 গোলাপ উঠেছে ফুটি শিশুর সে প্রাণখোলা হাসি
 সৌরকররাশি ।

পশ্চিমের লাল আলো—শিশু দেখে মার বেহ মুখ,
 তারই তলে আছে যেন মায়েরই ঘটন ভরা বুক,
 আকাশের তারা দেখে মানবেরে সোদরের মেতে,
 অশ্রুগিরি স্পর্শ যেন বুলাইয়া দেয় সর্ক দেহে !
 কণা কণা রেছাশীষ ঝরিতেছে সঁঝের আলোকে
 ছালোকে ভুলোকে !

যে কৈসেছে সারাদিন সন্ধ্যাদেবী মুছাবে সে অঁখি
 যাহার লেগেছে ধূলা সে ধূলা আপনি লবে মাগি,
 শাস্তিহারা কদরেতে ঝিল্লীরবে বলিবেরে ‘বুমা’—
 শোক-পাত্ত অধরেতে দিবে অঁখি কি নিবিড়:চুমা,
 আশ্রয়-তীনেরে লবে কোলে তুলি, দিবে দোল ধীরে
 শ্বেহাঙ্কলে ঘিরে ।

ঐনিকপমা দেবী ।

কুসুমাজ্জলিকার উদয়নাচার্যের পরিচয় । *

প্রথ্যাতনামা উদয়নাচার্য্য ভাঙড়ী মহোদয়ের বংশধরগণের এবং এতদ্দেশীয় আরও বহুলোকের দৃঢ় বিশ্বাস যে, উদয়নাচার্য্য ভাঙড়ী মহাশয় জ্ঞান কুসুমাজ্জলি প্রভৃতি জ্ঞান প্রকাশকার সুবিখ্যাত নৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্য । এই সিদ্ধান্তের প্রমাণ স্বরূপে ঐতারা বলেন যে—“ভাঙড়ীবংশের বংশাবলী” নামক গ্রন্থে আছে—

“রহস্যভিত্তঃ শ্রীমান্ ভুবিবিখ্যাতমঙ্গলঃ

ধর্ম সংস্থাপনার্থ্য বৌদ্ধবিধ্বংস হেতবে ।

বিখ্যাত উদয়নাচার্য্যো বহুব শঙ্করো যথা ।

ব্রহ্মত্ব প্রকাশায় চক্রে কুসুমাজ্জলিং ।

স এবোদয়নাচার্য্যো বৌদ্ধবিধ্বংস কোতুকী ।

কুপ্লকং ভট্টমাশ্রিত্য ময়ুর ভট্টকং তথা ।” ইত্যাদি

এই শ্লোক গুলিতে পাওয়া যায় যে, উদয়নাচার্য্য ভাঙড়ী মহাশয় শঙ্করাচার্য্যের জ্ঞান ধর্মসংস্থাপনের জন্য অবতীর্ণ । তিনি কুসুমাজ্জলি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, এবং বারেন্দ্র কুলগ্রন্থেও ঐ কথা আছে, এবং লালমোচন বিজ্ঞানিদির সুপ্রসিদ্ধ “স্বধ্বক্ষনির্ঘর” গ্রন্থেও উদয়নাচার্য্য ভাঙড়ী মহাশয়কে ঐরূপে পরিচিত করা চইয়াছে । সুবিখ্যাত মহাকোষ “বিশ্বকোশে”ও প্রথমতঃ একটু সংশয়ের সূচনা করিয়া শেষে উদয়নাচার্য্য ভাঙড়ী মহাশয়কেই কুসুমাজ্জলিকার মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্য বলিয়া সময় করা চইয়াছে ।

এখন আমার বক্তব্য এই যে, প্রবাদমূলক বা স্বেচ্ছাকৃত কতিপয় আধুনিক সংস্কৃত কবিতার প্রতি নির্ভর করিয়াই ঐরূপ একটা সিদ্ধান্ত স্থির করা তবনির্গোপ-দিগের কোনমতেই কর্তব্য নহে । পূর্বোক্ত শ্লোক গুলির মাহাত্ম্যট যদি ঐরূপ করা যায়—তাহা হইলে “ভক্তিমাহাত্ম্য” গ্রন্থের—

“ভগবানপি ভট্টৈব মিথিলায়াং জনার্দনঃ

শ্রীমহাদেবনাচার্য্যরূপেণাবততারহ ॥

বৌদ্ধসিদ্ধান্ত মুক্তানাং স্থথায় চিত্তকারিণীঃ ।

ব্যাতেনে বিভ্রাং প্রীতৈশ্চ বিমলাং ফিরণাবলীঃ ॥

অজ্ঞাপি মিথিলায়াস্ত তদয়য় ভবাধিভাঃ ।

বিশ্বাংসঃ শাস্ত্রসম্পন্নাঃ পাঠয়ন্তি গৃহে গৃহে ॥”

এই শ্লোকগুলিকেই বা কি বলিয়া একেবারে উপেক্ষা করা যায়? উদয়নাচার্য মিথিলায় অবতীর্ণ। অত্য়াপি তাহার বংশধরগণ মিথিলায় অধ্যাপনা করিতেছেন, একথা ঐ শ্লোকগুলিতে স্পষ্ট রহিয়াছে। কিম্বদন্তী ইতিহাস সংগ্রহের একটা প্রধান উপকরণ বটে, কিন্তু কিম্বদন্তীর নির্দিষ্ট-বিশ্বাস সত্য নির্ণয়ের অহুকূল নহে পরস্তু প্রতিকূল।* পরস্তু কিম্বদন্তী সৰ্বত্র একমুষ্টিতে হ্রিৎভাবে অবস্থান করিলে তাহার মূলটি স্পষ্ট, ইহা মনে করা যাইতে পারে; কিন্তু নানাস্থানে নানামুষ্টিতে অবস্থান করিলে তাহার মূলের স্পষ্টতা নাই ইহা সুনিশ্চিত। মিথিলামণ্ডলে কিম্বদন্তী আছে—উদয়নাচার্য মিথিলাতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। উদয়নাচার্য মিথিলার “করিবন” নামক গ্রামে আবির্ভূত হইয়া জ্ঞানকুসুমাজ্জলি প্রভৃতি গ্রন্থ নিৰ্মাণ করিয়াছিলেন; মৈথিল নৈয়ায়িকগণ স্মৃতিরকাল হইতে ইহা সিদ্ধান্তের জায় বলিয়া আসিতেছেন।

আমি কিন্তু এসব কথা আমার সিদ্ধান্তের প্রমাণরূপে উপস্থিত করিতেছি না। কিম্বদন্তী বা ঐতিহ্য নিরপেক্ষ প্রমাণ নহে। প্রমাণ-বিরুদ্ধ হইলে এবং কোন প্রামাণিক তত্ত্বের প্রতিপাদক না হইলে উহা অপ্রমাণ ইহাই প্রমাণতত্ত্ব দার্শনিকদিগের সিদ্ধান্ত। মহর্ষি গৌতম প্রমাণ-ঐতিহ্যকে শব্দ-প্রমাণের মধ্যে পরিগণিত করিয়াছেন। ঐতিহ্যমাত্রই প্রমাণ নহে। স্মৃতিরূপে এখন আদরা প্রতিপত্তা বিষয়ে প্রমাণের অহুসন্ধান করিব! কুসুমাজ্জলিকার উদয়নাচার্য “লক্ষণাবলী” নামে একখানা গ্রন্থ নিৰ্মাণ করিয়াছেন, ইহা পণ্ডিতগণের অবদিত নাই। ঐ গ্রন্থ অনেকদিন মুদ্রিত হইয়াছে। উহার শেষে আছে—

“তর্কাস্বরাক প্রমিতেষু তীতেষু শতান্ততঃ।

বর্ষে দুয়নশ্চক্রে সুবোধঃ লক্ষণাবলীং॥”

ইহার দ্বারা বুঝা যায় উদয়ন ২০৬ শকাব্দ অতীত হইলেই “লক্ষণাবলী” নিৰ্মাণ সমাপ্ত করিয়াছেন।

১৩১১ সালের সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যায় “গৌতমের প্রতিভা” শীর্ষক প্রবন্ধের লেখক কুসুমাজ্জলিকার উদয়নাচার্যের সময় হ্রিৎ স্বরিত না পারায় ঐ প্রবন্ধের সম্পাদকীয় মন্তব্যে পূর্কোক্ত লক্ষণাবলীর শেষ শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়া কুসুমাজ্জলিকার উদয়নাচার্য ২০৬ শকাব্দ অর্থাৎ ২৮৪ খ্রীষ্টাব্দ অতীত হইলেই লক্ষণাবলী রচনা করেন—এই কথা প্রকাশিত হইয়াছিল। স্মৃতিরূপে কুসুমাজ্জলিকার উদয়নাচার্যের সময় সম্বন্ধে আমার ব্যাখ্যা কেবল আমারই ব্যাখ্যা নহে।

সকলেই জানেন রাজা বল্লালসেন কর্তৃক কৌলীন্দ্ৰ-মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহার অনেক পরে উদয়নাচার্য্য ভাট্টা মহাশয় বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের পরিবর্ত-মর্যাদার প্রতিষ্ঠা করেন । বল্লালের পূর্বে ভাট্টা উপাধির সৃষ্টিই হয় নাই । বল্লাল সেনের “দানসাগর” গ্রন্থের শেষে আছে—

“নিখিল নৃপচক্রতিলক জীবল্লালসেনদেবেন ।

পূর্ণে নবশশিনশমিতে শকান্দে দানসাগরো রচিতঃ ॥”

ইহার দ্বারা নিঃসংশয় বুঝা যায় বল্লালসেন ১০১৯ শকান্দে দানসাগর গ্রন্থ রচনা করেন । বল্লালের সময় সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও তিনি ১০৬ শকান্দের পরবর্তী এবিষয়ে কাহারও বিবাদ নাই । এখন এই বল্লালের পূর্ববর্তী ১০৬ শকান্দের গ্রন্থকার উদয়নাচার্য্য কিরূপে বল্লালের অনেক পরবর্তী উদয়নাচার্য্য ভাট্টা হইতে পারেন ইহা স্থগীর্ণ চিত্তা করিয়া দেখুন ।

অনেকে বলিতে পারেন লক্ষণাবলীর ঐ শ্লোকটি প্রক্ষিপ্ত । কারণ এমন সহজ উত্তর আর নাই ; কিন্তু প্রক্ষিপ্ত বলিয়া নিশ্চয় করিতে হইলে তাহার প্রমাণ চাই । কিম্বদন্তী বা তদুলক কবিতাগুলি স্বতঃ প্রমাণ হইতে পারে না, ইহা পূর্বেই বলিয়াছি এবং তাহা উভয়পক্ষেই আছে । বলবৎ প্রমাণের সচি্ত বিরোধ দেখাইতে না পারিলে কাহাকেও প্রক্ষিপ্ত বলিয়া নিশ্চয় করা যায় না । পূর্ব-মীমাংসা দর্শনে মহর্ষি জৈমিনিও প্রত্যক্ষ প্রতীর সহিত বিরোধ হইলেই স্মৃতির অপ্রমাণা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, কারণ সেখানে বলবৎ প্রমাণের সচি্ত বিরোধ হইয়াছে । পরন্তু প্রক্ষিপ্ত বলিতে গেলে সেখানে প্রক্ষেপকারীর একটা ছুরতি-সন্ধির কল্পনা করিতেই হইবে । উদয়ন ১০৬ শকান্দে লক্ষণাবলী রচনা করিয়াছেন, এই কথায় প্রক্ষেপ করিয়া কাহার কোন স্বার্থসিদ্ধি হইয়াছে, তাহা ভাবিয়া দেখিতে হয় । উদয়ন বাঙ্গালী ছিলেন না, ইহা প্রতিপন্ন করিবার জন্ত বিদেশীয় পণ্ডিত ঐরূপ প্রক্ষেপ করিলে তাহাকেই প্রক্ষিপ্ত বলিতে হয় ।

কারণ ঐ শ্লোকে আর কোন পরিচয় লিপিবদ্ধ হয় নাই । কেবল তাহার রচনাকালই বিশেষতঃ লিপিবদ্ধ হইয়াছে । তাহাতে তিনি উদয়নাচার্য্য ভাট্টা না হইতে পারিলেও ১০৬ শকান্দের উদয়ননামা কোন বাঙ্গালী পণ্ডিত বলিয়া বলিলে—প্রক্ষেপকারীর ইষ্টসিদ্ধি হয় কৈ ? ফলতঃ কুসুমাজ্জলিকার উদয়নাচার্য্যকে নিজের দেশের লোক বলিয়া পরিচিত করিবার এত ইচ্ছা হইলে প্রক্ষেপকারী এমন অনেক শব্দ প্রয়োগ করিতে পারিতেন, যাহাতে আর তাহার উপরে বজবালী আর কোন তর্ক করিতে পারিত না । বলা বাহুল্য সত্যবাদী সরল অপেক্ষায়

কুটিল প্রবন্ধকগণ অনেক বেশী সাবধান ও চিন্তাশীল। ফলতঃ লক্ষণাবলীর ন্যেকটি প্রকৃষ্ট বলিয়া নিশ্চয় করা যায় না। প্রকৃষ্ট বলিয়া সংশয় করিলেই ঐ সংশয়ের প্রকৃত কারণ দেখাইতে চাইবে। ঐরূপ সংশয় হইতে পারিলে উদয়নাচার্য্য ভাঙ্ড়ীই কুম্ভমাঙ্গলিকার উদয়নাচার্য্য কি না এইরূপ সংশয়ই বা কেন হইবে না। তাহার মৈথিল্য স্বত্বক্ৰেও প্রবাদ ও সংস্কৃতম্বোকে পাওয়া যায়। কুম্ভমাঙ্গলির প্রাচীন টীকাকার বাঙ্গালী রামভদ্র সার্কভোম ও উদয়নাচার্য্যকে মৈথিল বলিয়া করিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। নবদ্বীপের নৈয়ায়িক গুরু-মণ্ডলীও তাহাই বলিতেন। নবদ্বীপের হরিদাস তর্কীচাৰ্য্য কুম্ভমাঙ্গলিকারিকার যে ব্যাখ্যা বা টীকা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তিনি একস্থানে উদয়নের নিজকৃত একটি মূলকারিকার স্বতন্ত্র ব্যাখ্যান করিয়া ঐ কারিকটিকে গ্রহণ করিয়া হইতে সংকলিত প্রণাণের ছায় উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাঁহার নিকটে বা তৎকালে নবদ্বীপে অস্ত্র কাহারও নিকটে কুম্ভমাঙ্গলিকার মূল আদর্শ পুস্তক থাকিলে- তাঁহার কখনই ঐরূপ ভ্রম বা বিশ্বাসিত হইয়াও সম্ভব ছিল না। এজন্য নবদ্বীপাদি প্রদেশে স্মৃতিরকাল হইতে প্রবাদ রহিয়াছে যে, হরিদাস তর্কীচাৰ্য্য মিথিলা হইতে গুরুমুখে কুম্ভমাঙ্গলিকারিকা ও তাহার ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া আসিয়া তাঁহার স্মৃতির সাহায্যে উহা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। তাই তাঁহার টীকা অস্ত্রাশ্র বঙ্গীয় নৈয়ায়িকগণের টীকার ছায় সমীচীন ও পরিপূর্ণ হয় নাই এবং এই জন্যই কোন একস্থানে তাঁহার বিশ্বাসিত পরিচয় পাওয়া যায়।

বিখ্যাত লিখিয়াছেন যে, উদয়নাচার্য্য ভাঙ্ড়ীর “লীলাবতী” নামে এক অতি বিদ্বৎ কন্যা ছিল। বঙ্গভাচার্য্যের সহিত তাহার বিবাহ হয়। ঐ কন্যা পতিশোকে নিতান্ত কাতরা হইয়া এক সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন। উহার অঙ্কলিপি অস্ত্রাপি খরীর ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগের গৃহে আছে। ইহা সত্য হইলে উদয়নাচার্য্য ভাঙ্ড়ী মহাশয়কৃত কুম্ভমাঙ্গলি প্রভৃতি নানাগ্রন্থ অথবা তাঁহার কোন একখানা গ্রন্থ অথবা তাঁহার কোন একটা চিত্র তাঁহার বংশধরদিগের গৃহে থাকে না কেন? সে ত বড় বেশী দিনের কথা নয়। তৎকালের হস্তলিখিত পুস্তক এখনও ত মিলিতেছে। আমি কিন্তু এগুলিকে আমার প্রতিপাত্ত বিষয়ের প্রমাণরূপে উল্লেখ করিতেছি না। আমি বলিতে চাই যে লক্ষণাবলীর ন্যেক প্রকৃষ্ট বলিয়া যাহারা সংশয় করিতেন তাহারা উদয়নাচার্য্য ভাঙ্ড়ীই কুম্ভমাঙ্গলিকার উদয়নাচার্য্য কিনা এ সংশয় কেন করেন না? সে বিষয় একেবারে স্পষ্ট নিশ্চয় থাকার কারণ কি? সংস্কারেরও প্রচুর কারণ উল্লেখ করিয়া দেখাইলাম। ফলতঃ এ

বিষয়ে কোন সংশয় না করিয়া কেবল লক্ষণাবলীর স্রোতের প্রক্ষিপ্ততার সংশয় করি। কোন বিচারের কথা, তাহা অধীগণই বিচার করুন ।

আমার দ্বিতীয় কথা—

নৈষধীয়চরিত ও খণ্ডনখণ্ডকার শ্রীহর্ষ তাহার খণ্ডনখণ্ডকার গ্রন্থে উদয়নের কোন একটি কুহুমাজ্জলিকারিকা উপহাস করিয়া তাহার খণ্ডন করিতে গিয়াছেন । সুতরাং কুহুমাজ্জলিকার উদয়ন শ্রীহর্ষের পূর্ববর্তী ইহা স্থানান্তরিত । ঐ শ্রীহর্ষের কালসম্বন্ধে তিনটি মত আছে ।

প্রথম মত এই যে কানাকুজ চইতে গোড় সমাগত পঞ্চব্রাহ্মণের অগ্রতম শ্রীহর্ষই নৈষধীয়চরিতাদি গ্রন্থকার শ্রীহর্ষ । সম্বন্ধনির্ণয়কার প্রভৃতি অনেক প্রাচ্য ঐতিহাসিক এই মতের গায়ক ।

এই মতে উদয়নাচার্য্য ভাঙ্কড়ী কোন মতেই কুহুমাজ্জলিকার উদয়নাচার্য্য চইতে পারেন না, ইহা আর বেশী করিয়া বুঝাইতে চইবে না । কারণ বঙ্গ ব্রাহ্মণগণের অনেক পরে উদয়নাচার্য্য ভাঙ্কড়ীর জন্ম হইয়াছে । তিনি শ্রীহর্ষের পূর্ববর্তী চইতে পারেন না ।

দ্বিতীয় মত এই যে, নৈষধীয়চরিতকার শ্রীহর্ষ গোড়সমাগত পঞ্চব্রাহ্মণের অগ্রতম শ্রীহর্ষ নহেন । নৈষধীয় চরিতকার শ্রীহর্ষের পিতার নাম “শ্রীহরী”, ইহা তিনি নৈষধীয়চরিতেই লিখিয়াছেন । কাণ্ডকুজ চইতে গোড়সমাগত ঋষিক্ শ্রীহর্ষের পিতার নাম, “নেপাতিণি” ; ইহা কুলগ্রন্থে লিখিত আছে । ঋষিক্ শ্রীহর্ষ কাণ্ডকুজ চইতে গোড় আসিয়াছিলেন । নৈষধীয়চরিতকার শ্রীহর্ষ তদানীন্তন কানাকুজাধিপতির সভায় প্রত্যহ উপস্থিত থাকিয়া চইটি তাম্বুল ও একখানা আসন পাইতেন ইহা তিনি নিজেই লিখিয়া গিয়াছেন—

“তাম্বুলপ্রদানসং লভতে যঃ কানাকুজেশ্বরঃ”

নৈষধীয়চরিতকার শ্রীহর্ষ কানাকুজাধিপতি জয়ন্তচন্দ্রের সভাপতি ছিলেন । জয়ন্তচন্দ্র খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর লোক, ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ আছে । তৈলপণ্ডিত রাজশেখর হরির “প্রবন্ধকোষে” তাহা বিশদ বর্ণিত রহিয়াছে । মূলকথা নৈষধীয়চরিতকার শ্রীহর্ষ খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর লোক । তিনি গোড় সমাগত শ্রীহর্ষ নহেন । এই মতের উদ্ভাবক এবং সমর্থক বুনার সাহেব ।

তৃতীয় মতের উদ্ভাবক এবং বিশেষ সমর্থক আমাদিগের পরম প্রীতিভাজন শ্রীমান্ রমাপ্রসাদ চন্দ্র । ইনি বহু গবেষণা দ্বারা স্থির করিয়াছেন নৈষধীয় চরিতকার শ্রীহর্ষ খৃষ্টীয় দশম বা একাদশ শতাব্দীর লোক । তাঁহার মতের প্রমাণাদি

প্রদর্শন বাস্তবভায়ে আমি পরিভ্রাণ করিলাম। অহুদন্ধিস্থ তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করিয়া দেখিবেন। এখন আমি বলিটুকুছি যে, ত্রীচর্চ কাহারও মতে পৃথিবী দ্বাদশ শতাব্দীর পরবর্তী নহেন; সে বিষয়ে কিছুমাত্র প্রমাণ নাই; পরন্তু বিরুদ্ধ প্রমাণই প্রচুর আছে। উদয়নাচার্য্য ভাটড়ী মহাশয়ের অদ্বন্দ্বন পুঙ্খবহর হিসাব ধরিলে এবং কুলগ্রন্থের আলোচনা করিলে উদয়নাচার্য্য ভাটড়ী মহাশয় বড় জ্যেষ্ঠ পৃথিবী অদ্বাদশ শতাব্দীর লোক হইবেন ইহা নিশ্চিত। বাস্তবভায়ে ইহা বুঝাইয়া দিতে পারিলাম না। উদয়নাচার্য্য ভাটড়ীর সময় জানিতে গেলে কোন নতেই তিনি দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্ববর্তী বলিয়া প্রতিপন্ন হইবেন না ইহা বিশেষ করিয়া জানিয়াছি। তাহা হইলে দেখুন, পূর্বোক্ত ত্রীচর্চ (অর্থাৎ যিনি দ্বাদশ শতাব্দীর পরবর্তী নহেন—ইহা সর্বসম্মত;) যাহার গ্রন্থের সমালোচনা করিয়াছেন তিনি উদয়নাচার্য্য ভাটড়ী কোন মতেই হইতেই পারেন না। এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে তবে কুলগ্রন্থে ঐরূপ নিশ্চিত আছে কেন, এদেশে ঐরূপ জনশ্রুতি আছে কেন? ঐ জনশ্রুতির কি কোন মূল নাই? ‘নহু মূলকন-শ্রুতিঃ’ এতদ্বারা আমার এখন বক্তব্য এই যে উদয়নাচার্য্য ভাটড়ী মহাশয় মহাপণ্ডিত ও মহাশক্তিশালী ব্যক্তি ছিলেন। ছায়কুসুমালি গ্রন্থ এদেশে প্রচারিত হইলে তখন তাহা উদয়নাচার্য্যাকৃত ইহা জানিয়া পরবর্তী কুলগ্রন্থে উদয়নাচার্য্য ভাটড়ী মহাশয়ের পাণ্ডিত্য ও শক্তির পরিচয় স্বরূপ করিয়া ঐরূপ লিখিয়াছেন। আবার অনেক সময়ে বিশিষ্ট ব্যক্তিকে বড় করিবার জন্য পূর্বতন কুলগ্রন্থে কাল্পনিক ইতিহাসও লিখিতেন, ইহা অসত্য কথা নহে। কাল্পনিক ইতিহাস কোন উদ্দেশ্য-মূলকই হইয়া থাকে। ভোজপ্রবন্ধ, শব্দ-দিগ্বিজয় প্রভৃতি গ্রন্থে যে সমস্ত কাল্পনিক ইতিহাস দেখা যায় তাহা সর্বথা প্রমাণ-বিরুদ্ধ। তাহা কোন ব্যক্তিই বিশ্বাস করেন না, করিতে পারেন না। উহা লেখকের কোন উদ্দেশ্যমূলক নবীন সৃষ্টি। কুলগ্রন্থের পর হইতে তদনুসারে ঐরূপ জনশ্রুতি প্রচারিত হইয়াছে। আমার দ্বিতীয় বক্তব্য এই যে, উদয়নাচার্য্য ভাটড়ী মহাশয় বঙ্গদেশে কুসুমালিকর্তা বলিয়া কীর্তিত হইতে পারেন। পাবনার অন্তর্গত শালিখা গ্রামের সুপ্রসিদ্ধ বিচারক মহাপণ্ডিত গোবিন্দ বিষ্ণুভূষণ মহাশয় যে লঘুভারতগ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে আমরা দেখিতে পাই—

“স এবোদয়নাচার্য্য বিষ্ণুকার কুসুমালিকঃ

তীর্থ পর্য্যটনে ন বধঃ তস্মাদ্ গোড়ৈ প্রকাশিতঃ।”

অর্থাৎ তিনি বলিয়াছেন যে উদয়নাচার্য্য তীর্থপর্য্যটন করিতে যাইয়া কুসুমালি গ্রন্থ প্রাপ্ত হন। তৎপূর্বে তাহা গোড়দেশে ছিল না; তিনি গোড়দেশে তাহা প্রকাশিত করিয়াছেন। এখন সুদীর্ঘ সব কথাগুলি চিন্তা করিয়া দেখিয়া সিদ্ধান্ত করুন—আমি এইখানেই নিবৃত্ত হইলাম।

শ্রীকবিরূপ তর্কবাগীশ।

প্রথম পাপ ।

কোন নিম্নে মনেচ চটলে জাহারা বহুজা মতাময়কে জিজ্ঞাসা করিতাম । তিনি যেমন সচুস্তর দিতে পারিতেন, অজ কেচ তাহা পারিত না । তাঁহার কথাগুলি বেশ সরল । বহুজা মতাময় খুব বুদ্ধ, এবং তাঁহার আচার ব্যবহার খুব শুদ্ধ । তিনি প্রায় অশীতি বর্ষ বয়ঃক্রমের লোক । অনেক দেশের পুরাতন কাহিনী তাঁহার জানা ছিল ।

নরেন জিজ্ঞাসা করিল, “পাপপুণ্য তিনিমটা কি ?”

বহুজা মতাময় বলিলেন যে পাপ পুণ্য ধর্মশাস্ত্রের কথা ; কিন্তু টকারও গল্প - আচ্ছ । আমাদের ধর্মশাস্ত্রে কিংবা পুরাণে কে প্রথমে পাপ করিয়াছিল তাহা কোন গল্প নাই, কিন্তু অজ্ঞাত দেশে কিঞ্চিৎ আছে । তাহার মধ্যে ‘প্রথম পাপের’ গল্পটা মনে নয় । আমাদের দেশেও তাহার আভাষ পাওয়া যায় ।

প্রথম পাপের গল্পের সার এই যে, বেশী বুদ্ধি হওয়া মতাপাপ । ছেলে পুতেদের যত বুদ্ধি বাড়িতে থাকে, ততটু পাপ করিতে থাকে, ক্রমে বুদ্ধি হইয়া যখন বুদ্ধি পরিপক্ক হয়, তখন চুল পাকিয়া এবং দাঁত পড়িয়া তাহার জীবন সীলা সংবরণ করে । সেই সময় তাহাদের মেহের উত্তাপ কমিয়া গিয়া অজুতাপ বাড়ে । উত্তাপ যেমন গরম, অজুতাপ তেমনি বরফের মত ঠাণ্ডা । যাহার শরীর খুব শীতল, সে সচরাচর বুদ্ধ । অরু চইলেও তাহার ১০০ ডিগ্রীর বেশী থার্মোমিটারে উঠে না । অনেকে মনে করে সেটা সামান্য অরু, কিন্তু তাহা নয় । তাহার পক্ষে ১০০ ডিগ্রীই ভয়ানক । সরিয়া ভূত চইলে এ উত্তাপটুকুও থাকে না ।

বহুজা মতাময় এইরূপে কথটা পাড়িয়া নরেনকে প্রথম পাপের গল্প বলিতে আরম্ভ করিলেন ।

বহুজা মতাময় বলিলেন যে, এ গল্প সৃষ্টির প্রাকালের কথা । অতএব কিঞ্চিৎ চরুহ । বিধাতা প্রথমে একটা ছেলে ও একটা মেয়ে সৃজন করিয়া নন্দন-কাননে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন । ছেলেটি পশুদিগকে চরাইত । মেয়েটি পক্ষী-গণকে দেখিত ।

এটা কেবল নমুনার জন্ত । তোমরা জান বোধ হয় যে, কোন জিনিসের

পেটেন্ট লইতে হইলে প্রথমে একটা নমুনা কিংবা আদর্শ তৈয়ারি করিতে হয় । সেটা দশজনের পছন্দ হইলে সেই ছাঁচে পরে অনেক সংখ্যা বাচ্চির হয় । এই যে প্রণয় ছেলে ও মেয়ে তাহারা মাহুঘের ছাঁচে সৃষ্ট হইয়াছিল ।

ছেলেটির নাম বুঝকেতু এবং মেয়েটির নাম স্নেহতারা । এই রকম নাম দেওয়ার তৎপর্য্য এই যে, ছেলেটি বড় বোকা । কিন্তু মেয়েটি বড় চালাক । একজনকে বোকা এবং অল্পটিকে চালাক করিবার তাৎপর্য্য এই যে, চুইজন বোকা কিংবা চুইজন চালাক কখন একস্থানে বাস করিতে পারে না । গুনাগুনি করে ।

আবার মনে করিয়া দেখ, যদি স্ত্রীপুরুষের মধ্যে একজন বোকা হয়, এবং আর একজন যদি চালাক হয় তবে একজন তাহার মধ্যে নিশ্চয় স্বামী এবং অন্য একজন স্ত্রী । অনেকবার সৃষ্টি করিয়া বিধাতার এসব কথা জানা ছিল । আমি যে গল্প বলিতেছি তাহাতে বুঝকেতু পুত্র বোকা এবং স্নেহতারা পুত্র চালাক ছিল । কিন্তু চালাক হইলে কি হয় ? তখনও তাহাদের বুদ্ধি হয় নাই । বুদ্ধি কাচাকে বলে ? কথার মানে জানার নাম বুদ্ধি । প্রথম সৃষ্টির সময় কথার প্রচার হয় নাই । অভিধান ছিল না । এট সকল অভাববশতঃ ছেলেটি সেট মেয়েটির দিকে, এবং মেয়েটি সেই ছেলেটির দিকে চাচ্ছিল থাকিত । ছেলেটি ভাবিত ‘কি স্নেহরী মেয়ে ।’ মেয়েটি ভাবিত “কি বোকা ছেলে !”

নন্দন-কানন অতিশয় মনোহর স্থান । সবুজ পুত্রে পরিপূর্ণ বৃক্ষলতা । শীতগ্রীষ্ম সকলই মৃদল, অতএব বসন্ত চিরবিরাজমান । একটু গ্রীষ্মের আতিশয়া হইলে মঘর এবং দর্দীর মন্মথর রাগিনী গাচ্ছিল মেঘের সঞ্চার করিত । একটু শীতের আতিশয়া হইলে সিংহ এবং গজ দীপক রাগিনী তাঁজিয়া দিন-রাত্রে প্রথরতর করিয়া তুলিত । সারা সৃষ্টির সৌবদ-মদগর্জিত রসাল ডাব । বোধ হইত সকলেরই এক বয়স । মাহুঘের, গাছের, পর্ব্বতের, বায়ু ভল্লকের, মশা এবং মক্ষিকার । সকলেই সমবয়সী এবং পরস্পরের মধ্যে পুত্র ভাব, কারণ কাহারও আত্মপরিজ্ঞান ছিল না । ব্যাধি, জরা, মরণ ছিল না । অন্নচিন্তা ছিল না ।

এইরূপে কিছুদিন কাটয়া গেলে, একদিন স্নেহতারা বনভ্রমণ করিতে করিতে পরিশ্রান্ত হইয়া একটা প্রকাণ্ড আশুর বৃক্ষের নীচে বসিয়া পড়িল । বুঝকেতু একটা অশ্বগুরুকে নিচে ঘুমাইতেছিল ।

সেই নন্দন-কাননে অনেক বৃক্ষ ছিল, তাহার মধ্যে এই আশ্রয়বৃক্ষ সর্বোপেক্ষা লতানো এবং বিস্তৃত । সেই বৃক্ষের মধ্যে সৃষ্টির যত বুদ্ধি লুকায়িত ছিল । সেই জন্য তাহার ফল বড় রসাল । বিধাতা সেই ফল সকলকে খাইতে মানা করিয়া দিয়াছিলেন, কারণ, বেশী বুদ্ধি হওয়া মহাপাপ । সেট আশ্রয় বৃক্ষের নাম শল্যার্থ-প্রকাশিকা !

২

সেই অভিশপ্ত পাদপের নিকট কোন জীব যাইত না । বৃক্ষের ডালে পাখী বসিত না । বৃক্ষের তলে ভ্রমেও কেমন পশু বিচরণ করিত না । কিন্তু অদৃষ্ট এমন ভদ্রানক জিনিষ যে, সেদিন সূচতুরা সে কথা ভুলিয়া গিয়াছিল । কাহারও কাহারও মতে, সে বিচার পূর্বক বৃক্ষের তলে অগ্রসর হইয়াছিল । বিচারটা এই রকম—

‘যদি ফল খাইতে বারণ, তবে ইহাতে বিষ আছে । নন্দন কাননে বিষ নাই, অতএব এ ফলে বারণ থাকিতে পারে না ।’

কিংবা ‘ভয়ত এই ফলে, বিষ আছে কিংবা নাই,

যদি বিষ নাই তবে খাইতে দোষ কি ?

যদি বিষ থাকে তবুও খাওয়া উচিত, কেন না এ রকম একত্রে জীবন ভঃসহ ।’

নরেন বলিল—‘এগুলো ‘সিলজিস্ম্ ।’

বসন্তা বলিলেন—‘ঠিক’ ।

এই রকম নানা প্রকার ‘হাইপোটেকেল’ কিংবা ‘ডিস্‌কন্‌কটিভ’ সিলজিস্ম্, কিংবা একটা ‘ডাইলেমা’ মনের মধ্যে গঠন করিয়া সূচতুরা সেই গাছের দিকে তাকাইতে লাগিল ।

নাশ্যস্ত্র বড় ভদ্রানক জিনিষ । বিশেষতঃ ছেলেপুলেরা যত নাশ্যবাগীশ বৃক্ষেরা তত নয় । বিধাতা-পুরুষ যখন তাহার নিষেধ প্রচার করেন তখন সাধারণকে নাশ্য বিচারের স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত করেন নাই । তোমরা কলেজের ছেলে সীমিত বুদ্ধিতে পারিবে । অর্থাৎ ডিস্‌কন্‌কটিভ সিলজিস্মের সূত্র মনের মধ্যে আওড়াইয়া সূচতুরার ইন্‌ডক্‌টিভের দিকে দৃষ্টি গিয়াছিল । কথাটা সত্য কি মিথ্যা তাহা পরীক্ষা করিবার যোর প্রবৃত্তি হইল ।

এ প্রবৃত্তি সং কি অসং তাহা বলিবার দরকার নাই । গুরুজনের নিষেধ বাক্য অন্ধের মত বিশ্বাস করা কি মহাঘাৎ ?

স্বচতুরার মনের মধ্যে এই যে একটা মহাবিপ্লব ঘটিতেছিল, তাহা সেই বৃক্ষের গুণে । মলয়পবন সেই বৃক্ষের কচিপাতা যতই দোলাইতে লাগিল, স্বচতুরার কৌতুহলও ততই বর্ধিত হইতে লাগিল । ক্রমে সেই বৃক্ষের পাতার ভিতর দিয়া সর্পের মত মুখ ও পক্ষীর মত দেহ সম্পন্ন একটি অদ্ভুত জীব বাহির হইয়া স্বচতুরাকে নমস্কার করিল ।

সেটা মনুষ্য, কিংবা পশু কিংবা পক্ষী কিছুরই মত নয় । স্বচতুরা চালাক মেয়ে হইলেও একটু ভীতা, এবং বিস্মিতা হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, “আপনি কে ?”

সেই অদ্ভুত জীব বলিল “আমার নাম ‘ঠান্দিদি’ । কেহ কেহ বলে আমি ‘মামা’, কিন্তু বাস্তবিক আমি তোমাদের ঠান্দিদি ।”

ঠান্দিদি ! কি মধুর নাম । ঠান্দিদির বিমর্ষ মুখ দেখিয়া স্বচতুরার হৃদয় করুণায় ভরিয়া গেল । স্বচতুরা ঠান্দিদির নিকটে গিয়া সাদরে জিজ্ঞাসা করিল “ঠান্দিদি ! তুমি এত দুঃখিতা কেন ?”

ঠান্দিদি বলিলেন “সে দুঃখের কথা শুনিয়া কি হইবে ? তবে তোমাকে না বলিলে বলিব কাহাকে ? তোমাদের পিতামহ (বিধাতা প্রজাপতি) আমাকে ছচক্ষে দেখিতে পারেন না । ভালবাসেন না ।”

স্বচতুরা ভাবিল ‘ভালবাসা কি ?’

ঠান্দিদি বুঝাইয়া বলিলেন “বাছা, কোলে আয় । তোকে সব কথা বলি । ঐ যে বিধাতা, তিনি পুরুষ মানুষ । পুরুষ স্বভাবতঃ বড় নিষ্ঠুর । এই যে সৃষ্টি এ সব আমার মেহনত । তিনি কেবল চক্ষু উল্টাইয়া চিরকাল আরাম করেন এবং সৃষ্টিটা হইয়া গেলে আমাকে এই আঙ্গুর গাছে বাধিয়া রাখেন । ইহার নাম ভালবাসা ।”

স্বচতুরা বলিল ‘এটা ভারি অত্যাচার ।’

বৃক্ষা মায়াময়ী ঠান্দিদি বলিলেন “তাই বিচার করিয়া দেখ বাছা ! এটা পুরুষ মানুষের ভালবাসা । আর, আমাদের ভালবাসা বুঝিয়া দেখ । এই সংসার ঠিক এক রকম থাকে না । প্রত্যহ মাসে মাসে, যুগে যুগে, বদলায় । আচ্ছ যে বাচিয়া আছে, কণা সে মরিয়া যাইবে ! তোমার ঠাকুরদা, রোজ একটা করিয়া রূপ ধরেন, আমি কাঁদিয়া সারা হই । আমার কত শত ছেলে-পুলে হইয়াছিল তাহার সংখ্যা নাই । তিনি সকলকে খাইয়া বসিয়া আছেন । কতবার নূতন সংসার, নূতন দেশ, নূতন গিরিদ্বন্দ্ব ও উপবন এবং নূতন ধরে নূতন গান হইয়া গিয়াছে, কিন্তু কিছুতেই আমার দুঃখ মিটে নাই ।”

স্বচতুরা জিজ্ঞাসা করিল, ‘কেন ?’

ঠানদিনি বলিলেন “তাদের বুদ্ধি ছিল না। জড়-ভরতের মত সব থেলা করিয়া আবার অদৃশ্য হইয়া যাইত।” কেবল আমার চুঃখের জ্ঞান।”

সুচতুরা। এ বুদ্ধি হয় কিসে ?

ঠানদিনি সুচতুরার মুখে এক শুষ্কপালা আঙ্গুর দিয়া বলিলেন “খাইয়া দেখ।”

সুচতুরা উত্তমতঃ চাহিল। একটি আঙ্গুর উপ্ করিয়া মুখে ফেলিয়া দিল। তাহার আশ্বাদ অতি চমৎকার ! ক্রমে চুইটি, তিনটি, এবং বিশ পচিশটি আঙ্গুর খাইয়া তাহার বুদ্ধির ক্রমে বিকাশ হইতে লাগিল।

সুচতুরা দেখিল যে নন্দন-কানন, তাহা ঠিক এক রকম নয়। পশু এক রকম, পক্ষী এক রকম, গিরিনদী এক রকম, এবং বৃষকেতু আর এক রকম। সে নিজে কোন রকম নয়। সকলের বয়সও এক রকম নয়। কেহ ছোট, কেহ বড় ! বৃষকেতু বড়, সে ছোট। তাহাতে তাহার একটু লজ্জা হইল। আবার দেখিল সে নিজে খুব বুদ্ধিমতী এবং বৃষকেতু বেয়াকুফ। তাহাতে তাহার একটু চুঃখ হইল। এই যে মূর্থ বৃষকেতু, সে অমর নয়। তাহার জীবনের আধার কি ? ভেলেবেলা চুইতে, সুচতুরা বৃষকেতুর সঙ্গিনী, অথচ কখন একথা ভাবে নাই।—কি আশ্চর্য্য ! অসম্ভবতলে সুশু বৃষকেতুকে দেখিয়া ক্রমে সুচতুরার মায়ার সকার হইতে লাগিল।

ঠানদিনি তাহার কানে কানে বলিলেন ‘ইটাই প্রণয়।’ সুচতুরা ঠানদিনিকে আর কোন ভাব গোপন না করিয়া তাহার বৃকে মুখ লুকাইল। ঠানদিনি বলিলেন “নাভুনি ! তোর বিবাহের বয়স হইয়াছে।”

নন্দন-কাননের সে বিবাহ আমাদের দেশের বিবাহের মত নয়। কল্যাণ বরকে আবাহন করিয়া আঙ্গুর বৃকের নীচে লইয়া আসিল, এবং আঙ্গুর খাইতে দিল।

বৃষকেতু নিচয়িয়া উঠিলেন।

‘সুচতুরে ! এ কাণ্ডটা কি ভাল হ’চ্ছে ?’

সুচতুরা। তুমি যদি আঙ্গুর না পাও, তবে আর আমাকে দেখিতে পাইবে না। বৃষকেতু ভাবিল কি ভয়ানক কথা ! চিরসঙ্গিনীকে দেখিতে পাইব না ! তাহা হইতে আঙ্গুর পাওয়াই ভাল। কিন্তু এ আঙ্গুরে যদি গরল থাকে ?

সুচতুরা বলিল, ‘তবে চুঃজেনেই মরিব।’

বৃষকেতু। যদি চুইজনে এক সঙ্গে না মরিতে পারি ?

ঠানদিদি বুঝাইয়া বলিলেন ‘মাহাদের বুদ্ধি বেশী, তাহার আশে মরে (যেমন জীলোক) । যদি চঠাৎ পুরুষ অগ্রে মারা যায় তবে সহমরণ বলিয়া একটা প্রথা আছে ।’

অতঃপর চিরসঙ্গিনীর প্রণয়বন্ধ বৃথকেতু চন্দ্র, সূর্য্য এবং বনস্পতি, গিরি, নদ, নদী, পশু এবং পক্ষীর সমক্ষে একটি আত্মর কম্পিতহস্তে গ্রহণ করিয়া মুখে ফেলিয়া দিলেন । বিধাতার প্রতি এই যে বিদ্রোহ, তাহার চিন্তায় আত্মরটি গলায় বাধিবার উপক্রম হইয়াছিল ; কিন্তু আত্মর গলায় বাধিবার জিনিষ নয় । গলাধঃকরণ হইলে বৃথকেতু মচন্দ্রের জলপানপূর্ব্বক একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন ।

নন্দনকাননের যত পশু, বৃথকেতুর বরণাত্রী এবং যত পক্ষী, সূচতুরার পক্ষে কল্যাণাত্রী হইয়া বিবাহের আসর দীপ্ত এবং উন্নত করিয়াছিল ।

কিন্তু সেদিন এবং তার পরদিন কি তফাত ! তার পরদিন সূর্য্যের রশ্মি খরতর হইল, নিদাঘে পিপাসায় পশুপক্ষীকুল কাতর হইল । পরস্পরের সহিত দাঙ্গা হাঙ্গামা আরম্ভ করিল । ক্রোধ বাড়িয়া রোগের সঞ্চার হইল । সেই মনোহর নন্দনকাননের মধ্যে একটা চিড়িয়াখানা এবং পশুশালায় মত কোলাহল শ্রুত হইল ।

বিধাতা-পুরুষ পূর্ব্বকই জানিতেন যে, এই রকম একটা কাণ্ড হইবে । তিনি ধীরে ধীরে লগুড় চক্রে একটি গিরিগুহার সম্মুখে আসিলেন । সেখানে বৃথকেতু সূচতুরার সঙ্গে প্রেমের অভিধান খুলিয়া নূতন নূতন কথাবার্তার মত্ত ছিলেন । বিধাতাকে দেখিয়া উভয়ে ত্রস্ত হইয়া উঠিল ।

বিধাতা বহুবরে বলিলেন ‘তোরা আত্মর খেয়েছিল ?’

সূচতুরা ভড়িতের ছায় বৃথকেতুর দিকে কটাক্ষপাত করিয়া বুঝাইয়া দিল ‘বল, যে খাই নাই ।’

বৃথকেতু বলিল ‘না ।’

বিধাতাপুরুষ পুনর্বার বহুনিমানে বলিলে ‘সত্য কথা বল মানব ! সত্যের কল্য তোদের সৃষ্টি ।’

বৃথকেতু বিধাতার অগ্নিমূর্ত্তি দেখিয়া ভয়ে আবার বলিল, ‘আমি খাইয়াছি, সূচতুরা খায় নাই ।’

তখন সূচতুরা গলবস্ত্রে জাহ্নু পাতিয়া আতঁস্বরে কহিল ‘আমিই খাইয়াছি, উমি খান্ মাই ।’

• বিধাতা পুরুষ হাসিয়া বলিলেন ‘হে চরুণ এবং চরুণে ! তোরা উভয়ই মিথ্যাবাদী । স্বর্গ হইতে দূর হইয়া যা !’

• নরেন এবং আমরা গল্প শুনিতে শুনিতে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিব মনে করিয়াছিলাম । এখন খানিকটা অবসর পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম ‘বহুজা মহাশয় ! পাপ কাহার হইয়াছিল ।’

বহুজা বলিলেন ‘সে কথা এখনও বলি নাই । মিথ্যা কথা বলার মত পাপ নাই, তাহা তোমরা শুনিয়াছ । কিন্তু পাপের শাস্তি নহিলে, পাপ কি পুণ্য তাহা বুঝা যায় না । পরে যাহা হইল তাহাতে সেটা অনেকটা বুঝিতে পারিবে ।’

গলা টিপিয়া যখন বিধাতাপুরুষ বৃক্ষেত্বে এবং তাঁহার জ্ঞী সূচত্ব্যাকে স্বর্গ হইতে তাড়াইয়া দিলেন, তখন তাহাদের বয়ঃক্রম পূর্ণ হইতে টের বেশী । যত বৃদ্ধি বাড়ে তত বয়সও বাড়িতে থাকে । হয় ত তোমরা ভাবিতেছ যে ঠান্দিদি গেল কোথায় । বলা বাহুল্য যে ঠান্দিদি তাহার পুরাতন পুজিপাটা লইয়া সেই পেটেন্ট মহুয়া-বস্ত্রপতীর সহিত ভ্রমণে অবতীর্ণ হইলেন । অনেক জীবজন্তু যাহারা বরযাত্রী হইয়া গিয়াছিল, তাহারাও ক্ষীর সমুদ্রের মধ্যে সত্তরণ করিয়া মহুয়া-যাত্রীর নৌকার পশ্চাতে আসিতে লাগিল, কারণ নৌক আছে যে “মহাজন যেন গতঃ স পদ্ম” । এই প্রকারে বহু যাত্রী সমুদ্রের পরপারে আসিয়া বিজীর্ণ দেশ স্থাপন করিল । তাহাদের সন্তান সন্ততি হইয়া পড়িল । তাহার কারণ, এখন বয়ঃক্রমের তারতম্য হওয়াতে, সকলে মিলিয়া ঘোড়ের উপর সমবয়স্ক হইবার উত্তম বাড়িয়া গেল ।

• নরেন বলিল “এ কথাটা বুঝিলাম না ।” •

বহুজা মহাশয় বলিলেন, “ইহাই মাল্‌থুস্ সাহেবের লোক-সংখ্যার সমস্যা ।” যদি বৃদ্ধি বাড়িয়া মানবের আয়ু কমিয়া যায়, তবে অনেক নিরেট মূর্থ জন্মগ্রহণ করিয়া সেটাকে ‘ব্যালেন্স’ করিয়া ফেলে । মনে কর কোন দেশে জ্বীলোকগণ যদি বোকা হয়, তবে তাহাদের আয়ু বাড়িয়া যাওয়াতে, বুদ্ধিমান পুরুষবর্গের সংখ্যা কমিয়া যাইবে এবং ব্রহ্মবিবাহ প্রচলিত হইবে । যেমন একালের ভারতবর্ষ । আবার দেখ যদি জ্বীলোকদিগের বৃদ্ধি বাড়িয়া আয়ু কমিয়া যায়, তবে হয় ত পুরুষের আয়ু কিংবা পুত্রসন্তানের সংখ্যা বাড়িতে থাকে, যেমন এখনকার

ভারতবর্ষ। ফলে, বিশ্ব এমনই পদার্থ যে সকলকে একতানে জড় করিলে সংখ্যায় কাটাকাটি হইয়া কেবল ১ থাকিয়া যায় যেমন :—

$$\frac{৩০ \times ১৭ \times ২৫ \times ৮ \times ২ \times ৪}{১৫ \times ৫১ \times ৭৫ \times ১৪} = ১$$

কেবল কাটাকাটি মাত্র। পশু, পক্ষী, মানব, স্থাবর, জঙ্গম সকলে এইরূপ পরস্পরকে টুকটাক্পূরক কাটিয়া এককে সাব্যস্ত করে। এই জন্ত শাস্ত্রে বলে—একমেবাদ্বিতীয়ং।

এই যে একত্বের ‘সর্বসর্গ’ চিন্তা, তাহা সকলেরই আছে। সকলে মনে করে আমিই ‘সর্বসর্গ’।

এখন গল্পের অবশিষ্ট ভাগটুকু বলি। বৃষকেতু মর্ত্যে আসিয়া ঠান্দিদিকে জিজ্ঞাসা করিল ‘জীবিকানির্ভারের উপায় কি?’

ঠান্দিদি বলিলেন ‘লেখাপড়া শেখ। তুমি লিখিতে থাক, এবং হুচতুরা পড়িতে থাকুক।’ সেই পরামর্শ গ্রহণ করিয়া বৃষকেতু কেরানীগিরি আরম্ভ করিল, এবং হুচতুরা অভিধানের সাহায্যে নবেল নাটক প্রভৃতি খত রকম পুস্তক পাঠ আরম্ভ করিল। যখন অফিসে হইতে বৃষকেতু বাটা ফিরিয়া আসে, তখন হুচতুরা কথাগুলি আওড়াইতে থাকে এবং বৃষকেতু বাড় নাড়িয়া তাহা অশ্রুমানন করে। এই রকম, ছেলেপুলেরাও কেহ লিখিতে লাগিল, কেহ পড়িতে লাগিল। তাহাদের ছেলেপুলেরাও সেই ব্যবসা আরম্ভ করিল। অভিধানের বহু সংস্করণ বাতির হইল। সকলেরই বুদ্ধি প্রথর হইতে লাগিল।

একই কথা অনেক রকম করিয়া সকলে বলিতে আরম্ভ করিল। তাহা লইয়া কথায় কথায় কাটাকাটি হইতে লাগিল। যেমন, ‘ভাই’কে অনেকে বলিল ‘হারামজাদা’, অনেকে তাহার নাম দিল “পাজি” এবং ‘পাজি’ কাটিয়া অনেকে সাধুভাষায় তাহাকে ‘হতভাগা মূর্থ’ বলিয়া প্রতিপন্ন করিল। গুরু-জনের নাম হইল ‘গোমূর্থ’, কিংবা “অধঃমণ্ডলাকারং”। ‘আর্য্যপুত্র’ সূত্রধর যুগের শব্দ বলিয়া প্রতিপন্ন হওয়াতে চিঠিতে তাহার নাম হইল ‘প্রাণেশ্বর’ এবং রাশিনাম “ওগো”।

হাজার হউক হুচতুরা নন্দনকাননের আদিম জীলোক। সেই গওগোলের মধ্যে যে একটা অমিত্রাকর ছন্দের মত ঘর বাঁধিয়া সকলকে চালাইয়া লইয়া যাইত। সকলে বস্তিত ‘গিরী বড় বুদ্ধিমতী; ঠান্দিদি ভাণ্ডার ঘরে বসিয়া চরণা কাটিতেন।

৫

বংশ বৃদ্ধি হইলে ঘর সংসার খুব জমকাণো হয় । খরচপত্র বাড়িলেও সে অভাবটুকু সহিয়া যায় । কারণ—আনন্দ লইয়াই সংসার । কিন্তু আনন্দ কমিয়া গেলে, জীবন চঃসচ হইয়া পড়় ।

বৃষকেতু একদিন আপিস্ হইতে আসিয়া একটা মন্তব্য প্রকাশ করিল । তাহার মর্ম্ম এই যে, সংসার বড় জাঁলাষদুগ্ধাময় ।

সুচতুরা । কিসের জাঁলাষদুগ্ধাময় ?

বৃষকেতু ঠিক তাহার উত্তর দিতে পারিল না, কিন্তু তাহার জনয়ের মধ্যে একটা সঙ্গীনের ভাবের নিশ্চয় উৎপত্তি হইয়াছিল, তাহার কোন সন্দেহ নাই । যে রকম কথাবার্তা, আচার ব্যবহার, এবং নানা প্রকার লক্ষণ চতুর্দিকে প্রকাশ শাহিতেছিল, তাহাতে সংসারে আনন্দের যে লেশমাত্র নাই, তাহা বৃষকেতু বুঝাইতে চেষ্টা করিল ।

অতএব বৃষকেতু বলিল যে, বাজীর মধ্যে সন্ধ্যার পর বাসা না করিয়া, পানিকটা বাড়িতে গিয়া রোজ বেড়াটীয়া আসিলে ভাল হয় । নন্দনকাননে বরঞ্চ এ সম্বন্ধে স্বাধীনতা ছিল । নতুন সংসারে আসিয়া সে স্বাধীনতাটুকু চারানো গেন কেনন কেমন বলিয়া বোধ হইল ।

সুচতুরা ইহাতে বাধা দেওয়াতে বৃষকেতুর আহার কমিয়া গেল । বৃষকেতু স্পষ্ট করিয়া একদিন বলিয়া বলিল যে, তাহার মনে স্নেহ নাই । এরকম আপদ বোধ হয় নন্দনকাননে থাকিয়া গেলে হইত না ।

সুচতুরা । তোমাকে কেহই এ সংসারে আসিবার চ্ত্র সাধে নাই ।

বৃষকেতু । (হাতপূরক) বোধ হয় আমি আস্তুর পাইতে স্বীকৃত হই নাই । কাণ্ডটার গোড়াই তুমি ।

সুচতুরা । তোমার নতিভ্রম হইয়াছে । যদি তোমার মনে এত ছিল, তবে তুমি না পাইলেই পারিতে ।

বৃষকেতু । কিন্তু তুমি বলিয়াছিলে যে অন্তথা তোমাকে দেখিতে পাইব না, সেই অন্ত অনেকটা বাধা হইয়া পাইতে চইয়াছিল ।

সুচতুরা বলিল, তাহা জানিলে সে তৎক্ষণাৎ সেখানেই প্রাণত্যাগ করিত, কিন্তু স্বামীস্ব প্রবক্তৃনাবাক্যে সে পথে যায় নাই ।

এই রকম তর্ক বিতর্ক হওয়াতে অভিধানের নতুন নতুন কথা লইয়া সুচতুরা স্বামীকে পরাণ্ড করিতে বলিল, এবং বৃষকেতু অনেক নতুন কথা লইয়া তাহাকে গালি পাড়িল ।

সাহিত্যে বৃষকেতু এত দক্ষতা লাভ করিয়াছিল তাহা সূচতুরা জানিতে পারে নাই । সূচতুরা বলিল ‘এ সব কথা কি ?’

বৃষকেতু । ঠিক জানি না, কিন্তু বোধ হয় কথার পৃষ্ঠে কথা জন্মিয়া যায় ।

সূচতুরা । প্রথমে যে কথাগুলি বলিতে, সেগুলির মধুরতা বোধ হয় মনে নাই ।

বৃষকেতু । তুমি বোধ হয় প্রথম প্রণয়ের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ ? তখনও যাহা ভাবিতাম, এখনও তাহাই ভাবি । কিন্তু বোধ হয় তোমার সংকে যাহা এখন ভাবি, সে আমার এক রকম । আমার বোধ হয় তুমি একটা প্রকাণ্ড দময়ন্তী পদার্থ । চেতন, অচেতন, এবং উদ্ভিদ কোনটাই নও ?

বলা বাহুল্য যে, এই নিদারুণ কণাতে সূচতুরার অর হইল, এবং অর হইতে বিকার হইল, এবং বিকার হইতে বাকরোধ হইল । বাকরোধ চলিলে মানুষ আর বাঁচিতে চাচে না, কারণ কথা কহিতেই সকলে জগতে আসে ।

ঠানদিদি বলিলেন ‘বৃষকেতু, এ আর বৃষ্টি বাঁচিবে না’ । বৃষকেতু বলিল ‘মরা বাঁচা কেবল সমসাময়িক ব্যাপার । একজন মরে, আর একজন বাঁচে । কিন্তু বাস্তবিক আত্মা মরে না, তাহা সর্ব্বশাস্ত্রেই লেখে ।’

বৃষকেতু ইমানীং গীতা পাঠ করিত, এবং বেশ ইচ্ছাছিল যে আত্মীয়-স্বজনের মরণে শোক প্রকাশ করা চর্তুকির লক্ষণ । অতর্ক্য সে চুপ করিয়া থাকিল ।

প্রথম সংসার এই রকম করিয়া ভাঙিয়া গেল । সূচতুরা দেহ রক্ষা করিতে পারিল না । সকলে বলিল সে স্বামী রক্ষণে আত্মরক্ষা করিয়া স্বর্গে চলিয়া গিয়াছে । জীবের আত্মরক্ষা করিবার এই অসাধারণ ক্ষমতা বিধাতা দিয়াছেন বলিয়াই সংসার প্রতিমূহুর্তে নিশ্চল ও শূন্যে লীন হইয়া পড়ে না । হুঃখে শোকে, কষ্টে জীব বস্তুগতের মধ্যে একের সহিত মিশাইয়া যায় । সূচতুরার মৃত্যুকালে সে জ্ঞানটুকু নিশ্চয় হইয়াছিল, কিন্তু প্রকাশ না করিয়া কেবল শেষ অশ্রুবারির মধ্যে তাহা রাখিয়া গেল ।

সেই সঙ্গে ঠানদিদিও অন্তর্হিত হইলেন ।

৬

নরেন জিজ্ঞাসা করিল ‘গল্প শেষ হইয়া গেল নাকি’ ?

বহুজ্ঞা বলিলেন ‘না, এখনও দ্বিতীয় ভাগ বাকী আছে ।’

একটা প্রাচীন বস্ত্র অস্ত্রহিত হইলেও তাহার চির শীত্র যায় না । নিউ-জিলও প্রভৃতি স্থানের মৃত্তিকা খনন করিয়া যে সকল প্রথম যুগের নরকপাল পাওয়া গিয়াছে, তাহার দ্বারা প্রমাণ হয় যে তখনকার মনুষ্যের তিনটি চক্ষু ছিল । তাহার মধ্যে একটা চক্ষু কপালের অভ্যন্তরে । ইহা হইতে অনুমান হয় যে ইহাই আসল দিবা-চক্ষু, এবং পরবর্তী যুগে মানুষের দৃষ্টি-ক্ষীণতার দোষে আরও দুইটি চক্ষুর উৎপত্তি হইয়াছিল, কারণ তখন চক্ষু প্রচলিত হয় নাই ।

ঠাণ্ডা স্ত্রী-বিয়োগের পর বৃষকেতু দিবা-চক্ষুর দ্বারা বৃত্তিতে পারিল যে সংসারে সে একাকী । আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব, সমাজ এবং দেশ একের মধ্যে হইলেও, বাস্তবিক সে একাকী ।

বৃষকেতু একটা ঘোর শূন্যতা অনুভব করিয়াছিল, তাহার প্রমাণ এই যে, সে ভাণ্ডার ঘরের মধ্যে গিয়া স্বচতুরার জীবন-সংকীর্ণ দ্রব্যগুলি লইয়া নাড়াচাড়া করিত । দ্রব্যগুলি বিশেষ যে বহুমূল্য তাহা নয় । গোটাকতক ছিন্ন কপা, জীর্ণ বস্ত্র, পুঙ্খা অর্চনার পুঁগি, সিন্ধুরের কোটা এবং শাঁখা । হিন্দু-দর্শন-শাস্ত্র মতে ইহাই স্ত্রীধন, এবং স্ত্রীর অবর্ত্তনানে স্বামীই তাহার উত্তরাধিকারী ।

ঠান্দিদি তাহার পেটটার মধ্যে যাহা রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহা একটি শুষ্ক আত্মর মাত্র । সেটা পাকিয়া ‘মুনকায়’ পরিণত হইয়াছিল । সেটাতে একটা টিকিট মারা ছিল—“জান” ।

দশজন বন্ধুবান্ধব আসিয়া বৃষকেতুকে বলিল ‘এই মুনকা তোমার পাওয়া উচিত, কারণ তুমিই আইনমত ইহার উত্তরাধিকারী’ ।

বৃষকেতু বলিল ‘একবার আত্মর খাইয়া ঠকিয়াছি’ ।

সকলে বলিল, ‘মুনকা খাইয়া দেও । আত্মর এবং মুনকায় অনেক তফাৎ । মুনকার রস পরিপক এবং ফল পুষ্টিকর ।

বৃষকেতু মনে ভাবিল যে কথটা মন্দ নয় । আত্মর খাইয়া যে ঘোষ জন্মিয়াছিল তাহা হয় ত মুনকার গুণে খণ্ডিত হইতে পারে । অতএব সে ইতস্ততঃ দেখিয়া শুনিয়া সেট প্রাচীন মুনকা গলাধঃকরণ করিল ।

মুনকা খাইয়া বৃষকেতুর অদৃষ্ট পলিয়া গেল । সে পূর্ণাপেক্ষা রোজগার বেশী করিতে লাগিল । দূর সম্পত্তি বাড়িয়া গেল । ছোট বাটা বড় এবং দ্বিতল হইয়া গেল । দ্বিতলের উপর বৃষকেতু বাস করিত । একতলে ছেলে-পুত্র আত্মীয় স্বজন থাকিত ।

নগরেন বহুজ্ঞা মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিল ‘বৃষকেতুর বয়স তখন কত ?’

বহুজা মহাশয় বলিলেন ‘তোমাদের একটা মহা ভ্রম আছে। নন্দনকাননের ফেরতা লোকের বয়সের কোন ইয়ত্তা নাই। মরণকাল পর্য্যন্ত সকলেই মনে করে যে সে ‘চিরকুমার’।

তবে একটা কোন ঘোর পরিবর্তন হইয়া গেলে লোকের দৃষ্ট্যভাব হয়, যেমন একটা উৎকট রোগ কিংবা স্ত্রী-বিয়োগ। এটা অবস্থা স্বীকার করিতে হইবে যে বৃষকেতু পুতাপাঠের বহিঃ লইয়া বসিত এবং গভীর ভাবে চক্ষু মুদ্রিয়া ভক্তিতরে মধো মধো কাঁদিয়া ফেলিত।

এটাকে সকলে কুলক্ষণ মনে করিয়া প্রতিবাসিগণ রটাইয়া দিল যে, তাহার সন্মার পরে দ্বিতলের ছাতে ভূতের মত কিছু দেখিতে পাইত।

দশজনে একটা কথা বারংবার বলিলে সকলে তাহা বিশ্বাস করে। বাটার লোকেও তাহা বিশ্বাস করিল। বৃষকেতুরও একদিন মনে হইল যে কথাটা অনেক সত্য। হোমযজ্ঞাদির অর্ঘ্যদান করাতেও সেই ভূতের ভয় ~~গেল~~ ~~সকল~~ ~~ক্রেমে~~ আতঙ্ক বাড়িয়া যাওয়াতে একদিন বৃষকেতু কোন বন্ধুকে বলিল ‘বাস্তবিক আমি যাহা দেখিতে পাই তাহা আমার ভূতপূর্ব্ব স্ত্রীর আবছায়ার মত।’

বহুবর বলিলেন ‘ভূতের ভয় কেবল ভবিষ্যতের সাহসে বিদূরিত হয়। আজকালকার প্রাজ্ঞাদিতে তেমন দলোদয় হয় না। প্রথম পক্ষের স্ত্রী-ভূতকে তাড়াইতে দ্বিতীয় পক্ষে স্ত্রী-ওঝাই কেবল ভবধামে সক্ষম।’

(৭)

বৃষকেতু প্রথমে স্বীকার করিল না, কিন্তু ভূতের উৎপাত উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হওয়াতে কেবল তাহারই নিবারণার্থ দ্বিতীয়বার ঘর পরিগ্রহ করিল।

বাসরবরেই বৃষকেতু তাহার নবীনা স্ত্রীকে বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিল যে, বিপদে না পড়িলে কেহ দ্বিতীয়বার বিবাহ করে না। স্বামীকে বিপদ হইতে রক্ষা করাই স্ত্রীর দণ্ড, অতএব ভূতের উৎপাত হইতে বাহাতে সে সর্ব্বদা বাঁচিতে পারে, তাহাই কাত্যায়নীর (দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর) সর্ব্বতোভাবে জটব্য।

পতিভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া কাত্যায়নী সেই ব্রত গ্রহণ করিল।

তোমরা বোধ হয় জান গে, ধূষকেতুর একটা পদার্থ আছে, যাহা বারা গৃহ মাজ্জিত হয় এবং সময়মত ভূতও তাড়ানো যায়। কিন্তু সেকালের ভূতের সহিত একালের ভূতের অনেক পার্থক্য। সেকালের ভূত অনেকটা শরীরী ছিল, একালের ভূত সম্পূর্ণ অশরীরী, মনোময় স্বপ্ন পদার্থ, অতএব সম্ভারজনীর প্রভৃতির দিকে না গিয়া কাত্যায়নী অস্ত্র কতকগুলি স্তবনোবস্ত করিল।

কাত্যায়নী । তোমার অবসর ভাব—ভূতের ভয়ে অবসরভাবটা কোন্ সময়ে বেশী হয় ?

বৃষকেতু । সন্ধ্যার পর ।

কাত্যায়নী কহিল যে, সেই সময় বন্ধুবান্ধবকে লইয়া একটু গান বাজনা কর্য উচিত, এবং দিনমানের আহার, কমাইয়া দেওয়া উচিত । প্রথমতঃ, বেশী ব্যয়ে অধিক আহার করা বৃথা, কারণ পরিপাক হয় না । দ্বিতীয়তঃ পূর্নকথা ক্রমাগত শ্রবণ করিতে মাতুল নিতান্ত অকাম্য হইয়া পড়ে ।

পরিমিত আহারের দ্বারা ও মনসংযমের দ্বারা, এবং বন্ধুবান্ধব লইয়া গান করিয়া ভূতের উপদ্রব পূর্নাপেক্ষা উপশম হওয়াতে বৃষকেতুর আনন্দের পরিসীমা রহিল না । তদন্তপূর্নক ছিন্ন হইয়াছিল যে, পুরাতন ভাণ্ডারগরহই ভূতের আবাস । বৃষকেতু সে গরে বাইত না । কাত্যায়নী তাহাতে তাগা বদ্ধ করিয়া দিল ।

ভাণ্ডারগৃহের পার্শ্বেই শয়নগৃহ । একদিন পূর্ণিমার তিথির সময় বৃষকেতুর দ্বিপ্রহর নাক্রিতে নিদ্রাতপ্ত হওয়াতে সে দেখিল কাত্যায়নী ছাতের শেষ ভাগে বসিয়া কাদিতেছে ।

গভীর রজনী । পবনের সঞ্চার একেবারেই নাই । বৈশাখ মাস, অতিশয় গ্রীষ্ম । বৃষকেতু কাত্যায়নীর দুঃখের কারণ নির্দিষ্ট করিতে না পারিয়া বাহিরে আসিল ।

কাত্যায়নী স্বামীর পদসঞ্চারের শব্দ শুনিয়া ক্রম্ভাবে ছাত হইতে ভাণ্ডার-গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া অর্গল বদ্ধ করিয়া দিল ।

গ্রীষ্ম কোন দুঃখ উপস্থিত হইলে স্বামীর সহানুভূতি স্বতঃই সঞ্চারিত হয় । বৃষকেতু ঘরের পার্শ্বে গিয়া বলিল ‘দুয়ার খুলিয়া দেও, তোমার দুঃখের কথা আমি শুনিতে চাই । আমি তোমাকে প্রাণের সঙ্গে ভালবাসি ।’

কাত্যায়নী তাহা শুনিয়া সভয়ে বলিল ‘আমি ভয় পাইয়াছি ।

বৃষকেতু । কেন ?

কাত্যায়নী । তুমি তোমার স্ত্রীকে দেখিয়া যেমন ভয় পাইয়াছিলে, আমি তোমাকে দেখিয়া ততোধিক ভয় পাইয়াছি । আমার বোধ হয় তুমি একটি বৃদ্ধ ভূত ।

বৃষকেতু শপথ করিয়া জামাইল যে সে মিস্টারই ভূত নহে, জিহ্বস্ত মানুষ । কাত্যায়নী তাহা স্বীকার করিল না । সে বলিল ‘তোমার মধ্যে জীবনের লেশ

মাত্র নাই। তোমার শরীর একেবারে শীতল। তোমার ভালবাসার কথা শুনিয়া বোধ হয় যে বৃদ্ধিভুক্ত একেবারে লুপ্ত। বোধ হয় তুমি ইতিপূর্বে ধরাধাম ছাড়িয়া গিয়াছ। আমি না জানিতে পারিয়া তোমার বাগার পাটিতেছি।

ইহা বলিয়া কাত্যায়নী তারপরে চীৎকার আরম্ভ করিল। বৃষকেতু অত্যন্ত ভীত হইয়া বলিল ‘চীৎকার করিও না, কণাটা ভাল করিয়া বুঝা উচিত।’

কাত্যায়নী বলিল, ‘আমি ভাল করিয়া বুঝিয়াছি। এই ভাণ্ডারঘরে একখানা অভিধান দেখিয়াছি, তাহাতে স্পষ্ট লেখা আছে যে, যুগাকরেও দ্বিতীয় পক্ষে দার পরিগ্রহ যে করে সে ভূত, এবং তোমার বাস্তু খুলিয়া যে সকল চিঠিপত্র দেখিলাম, তাহাতে বৃষ্টিতে পারিলাম যে তুমি পূর্বে যাহাকে ‘প্রাণ’ বলিয়া অভি-বিক্ত করিয়াছিলে, সে নাই। তুমি প্রাণহীন জানোয়ার ভূত’

বৃষকেতু ভাবিল কাত্যায়নীকে ভূতে পাইয়াছে। আবার ভাবিল বাপারটা ভাল করিয়া পরীক্ষা না করিয়া লোকজনকে ডাকা লজ্জার কথা। অতঃপর শরন-গৃহেতে ফিরিয়া গিয়া বৃষকেতু নিজের চেহারা আদিত্তে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিল।

কণাটা মিথ্যা নয়। দেহ রক্তহীন পাণ্ডুবর্ণ, মস্তকের কেশ তুবানের মত ধবল, চর্ণ্যলোল। চক্ষু জ্যোতিহীন।

গ্যামোমেন্টর দ্বারা স্বীয় দেহ পরীক্ষা করিয়া বৃষকেতু দেখিল যে তাপমান যন্ত্রের ৯৫ ডিগ্রী পর্যন্ত পারদ উঠে না।

বৃষকেতুর একটা ঘোর অহুতাপ আরম্ভ হইয়াছিল তাহা নিশ্চয়। দর্পণের মধ্যে তাকাইয়া দেখিল যে এই ধরাধামের পরই একটা সমুদ্র। তাহার পরপারে একটা বিস্তীর্ণ রমা কানন। সেই কাননের এক প্রান্তে পরলোকগতা সূচতুরা একটা পর্ণকূটারের সম্মুখে ঠানদিদির পার্শ্বে বসিয়া চরখা কাটিতেছে।

বৃষকেতু চেঁচা করিয়া দেখিল যে, সে সমুদ্র পার হওয়া হুকঠিন। পথ রুদ্ধ তাহার দেহ নিঃসাড় অচল। বৃষকেতু কাঁদিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িল।

প্রায় চই তিন ঘণ্টা পরে তাহার বোধ হইল যে বলিতেছে ‘ভাল করিয়া অগ্নি দেও, উত্তাপ না পাইলে আত্মা দেহের মধ্যে ভূত হইয়া থাকিয়া যায়।’

এটা নিশ্চয় সংস্কারের কথা। নিশ্চয় কোন শ্রমশানে মরলোকে তাহার অগ্নি সংস্কার আরম্ভ হইয়াছিল, এবং নিশ্চয় তাহার হিতাধী উত্তরাধিকারিগণ জগতের মঙ্গলার্থ বৃষকেতুর আত্মাকে পরলোকের পুণ্যময় গল্বে: অগ্রসর করিয়া দিতেছিল।

দ্রুতকেতু তাহাদিগকে মনে মনে আশীর্বাদ করিল। আবার সেই নন্দন-কানন। আবার একটা আদমি আত্মা কুমারবেশে এবং একটা আত্মা, কুমারীবেশে। পরিশ্রান্ত পান্থদ্বয় জলপানার্থে নিকরিলীর তটে উপবিষ্ট। সম্মুখে বিধাতা-পুরাণ।

বিধাতা পুরুষ জিজ্ঞাসা করিলেন—‘তোমরা কোথাকার লোক হে?’

পান্থদ্বয় জাহ্নু গাড়িয়া বলিল ‘নরলোকের’।

বিধাতা। সেখানকার খবর কি?

পান্থদ্বয়। একই রকম। নূতন কিছুই নাই।

বিধাতা। লড়াই ঝগড়ার খবর কি?

পান্থদ্বয়। খবরের কাগজে ঠিক কথা জানা যায় না, তবে এ যাত্রার সংগ্রাম কিছু ঘনতর।

—বিধাতাপুরুষ তখন তাহাদিগকে পান্থনিবাসে পাঠাইয়া দিলেন।

নরেন জিজ্ঞাসা করিল ‘পাপ হইয়াছিল কাহার?’

বহুজ্ঞা মহাশয় বলিলেন ‘সেটা মতামতের উপর নির্ভর করে। যদি কর্মের অবসানে অহুতাপ হয় তবে সেটা পাপ এবং যদি অহুতাপ না হয় তবে পাপ নয়। বিচারের ভার কর্মীর উপর। একজনের ধর্মশাস্ত্র পড়িয়া অত্যন্ত অহুতাপ হইয়াছিল, অতএব বৈশী বৃদ্ধি হওয়াও একটা পাপ।’

প্রথম পাপের এই গল্পটা করিয়া বহুজ্ঞা মহাশয় ঘুমাইয়া পড়িলেন। আমাদের বোধ হইল তিনি ননে মনে হাসিতেছিলেন, কারণ গুমস্ত অবস্থাতেও তাহার আনন্দভাব মুখমণ্ডল ছাইয়া ছিল।

শ্রীহরেন্দ্রনাথ মজুমদার।

বিশ্ব রূপ ।

বিশ্ব গেছে লুপ্ত হয়ে তোমার ছায়ায়—

চেন্ন তারা দিবা কর, পৃথ্বী আর নীলাশ্বর,

চন্দ্রাতপ শিরোশোভা হীরক মালায় !

সকলি গিয়াছে ঢাকা, শুধু তব চিত্র আঁকা

দূরে কাছে প্রকৃতির মোহন লীলায় ।

ভ্রামল পার্শ্বপ অঙ্গে, পল্ল লাল ফল নঙ্গে,

সমীরণ পরশিয়া আনন্দে দোলায় ।

বৃক্ষ শাখে বসি' নিতি বিচগের মধুগোঁড়
 প্রভাতের বৈতালিক,—সন্ধ্যারতি সব,
 নিশীথের শুক্লতায় ধরণী গুমায় যায়,
 আবার জাগিয়া ওঠে কল কল রব,
 দিবসের জাগরণে চেতনায় সন্ধ্যারনে
 পুরাতন দৃশ্যগটে তেরি অভিনব,
 তোমার মাধুরী বিরে উদয় অচল শিরে
 বিকাশিছে রবিকরে তব মূর্তি তব !
 দূর সীমান্তের গায় রৌদ্ররূপ প্রতিভায়
 তুমিই উঠিছ ভাগি' বিশ্ব দরশিয়া,
 পরিপূর্ণ চিত্রময় স্বাবরজঙ্গমচয়
 সচস্র কিশলয়ধারে আশ্রয় প্রকাশিয়া',
 জল স্থল শূন্য দেশে 'নেতারি' অপূর্ণ বেবে,
 অলিয়া নিবিয়া যাও পরিভূপ হিয়া,
 শুধু চন্দ্রমার কর স্তম্ভমাগ চরাচর
 জ্যোৎস্না তরঙ্গে চোটে ছবি বিভাসিয়া,
 একি থেলা একি রঙ্গ, একি মোহ ভাব ভঙ্গ !
 তুমি বিশ্ব, তুমি মায়ী, তুমিই সংসার,
 আলোকে তোমার হাসি তমসায় পরকাশি'
 পূর্ণিমা নিশীথে যেন জীবন সফার,
 কভু জলসের গায় ইন্দ্রধনু শোভা পায়
 নানা বর্ণে উজলিয়া সৌন্দর্য্যে অপার,
 এই নেত্রে সমুজ্জল বিশ্ব জ্যোতি অচঞ্চল
 বিচিত্র বরণ ছটা নবীন আকার,
 এতলীলা, এত প্রাণ, চারি ধারে মূর্তিমান—
 হরিয়া লয়েছ অঙ্গে জগতের সার ।
 যশোরার প্রাণ চরি' নবনীত চুরি করি'
 পড়শীর ঘরে যবে তুলিল ক্রন্দন,
 উদ্‌বল নাভা হায় ! কোধবশে শ্রাম রায়
 একদিন করেছিল কঠোর বন্ধন,

হাতের বেদনা ভরে ত্রকাণ্ডের রূপ ধরে'
 বদন মাঝারে রাগি' মাতারে দর্শন—
 করাইয়া, ভগবান জননীরে দিবা জ্ঞান
 দিয়াছিল, শুনিয়াছি অতীত-ঘটন ।
 পুত্র মূগ্ধ হেরি বিশ্ব নব অপরূপ দৃশ্য
 মাতা' গশোমতী তাহে বখিল অন্তরে,
 বাণ-রূপী-নারায়ণ করিয়াছে আগমন
 ভবাবর্ণবে তরাইতে অশ্রুধার ঘরে ।
 তেমতি কি গেছে নোর আবির্ভাব বাজা তোর
 ত্রিভুবন লুপ্ত করি' বিশ্বরূপ ধরে ?
 উজ্জ্বল নীচে আশে পাশে তোনারি মুরতি ভাসে
 আমি তাহা নিরপিতা বাচিয়াছি নরে !
 ৐ প্রসন্নময়ী দেবী ।

সাহিত্যিক-সম্মিলনে ।

পাবনা সম্মিলনে রবিবাবু বলিয়াছিলেন—“সাহিত্য-সম্মিলনগুলি যেন মেঘ—
 দেশে দেশে গুরিয়া গুরিয়া বারি বর্ষণ করে,—দেশ ফুলফলে হাসিয়া উঠে ।”
 বঙ্গবর চন্দ্র সূর্য্যকেনে চিঠির উপর চিঠিতে জানাইতেছিলেন যে পোদ তিমালয়ের
 পাদদেশস্থিত দেবমাতৃক দেশের নিজস্ব মেঘ এবার রাজসাহীতে বরিবে ।
 শুনিয়া মুখ হাসিতে ভরিয়া গেল । কাঁচাগোলা, পাকাদদি, কাটারী-
 ভোগের চাউল, নাটোর, রাণী ভবানী, বরেন্দ্র অমূল্যকান-সমিতি, পাথরের মূর্তি,
 পাবলিক লাইব্রেরী, ধীমান বীতপাল, উমাপতি ধর, প্রভাসেন্দ্র, জগদ্বিজনাথ,
 শরৎকুমার ইত্যাদি প্রাচীন আধুনিক দৃশ্য অদৃশ্য ব্যাপারগুলি মস্তিষ্কের মধ্যে
 তাণ্ডব নৃত্য জুড়িয়া প্রলয়কাণ্ড বাধাইয়া দিল ।

শুনিলাম এখানকার এক মাননীয় অধ্যাপক একবার রাজসাহী যাইতে
 বিষম লাঞ্ছনা ভোগ করিয়া লিখিয়াছিলেন—“এরোপ্পেন ছাড়া রাজসাহী অগম্য
 হওয়া কঠিন ।” তাই ভাবিলাম “বিহারে বিধোরে যদি একা চড়িতেই হয়,
 তবে একা একা চড়া কোন কাজের কথা নহে, সঙ্গী চাই ।” তখন রবিবাবুর
 নিবন্ধের মত খুঁজিতে বাহির হইলাম—“কে কে যাবি, কে কে যাবি—কে তোরা
 যাইবি আয় ।” দেখিয়া আশ্চর্য হইলাম যে যাইবার জন্ত অনেকেই সাজিয়াছে ।

রাজসাহীবাসিগণ ভয় না পায় তাই একান্ত বিনয়ভরে শুধু আটকনের নামমাত্র পাঠাইয়া দেওয়া চলে। বিদ্যম আগ্রহভরে বর্ণচর্চা পরিধান চলিতে লাগিল,—গোটা রাজসাহীটাই তুলিয়া লইয়া না আসি। যোববংশাবতঃস বন্ধুবর্গি—তারদ্বয়ে রাস্তার চৌমাথা ছইতে ডাকিয়া বলিয়া গেলেন যে তাকে যেন কিছুতেই ফেলিয়া না যাউ। সাজালবংশপাবন সম্পাদক অ—সবাক্ষরে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাউবেন বলিয়া শাসাইতে লাগিলেন। তীক্ষ্ণাগ্রনাসিক তীক্ষ্ণবুদ্ধি কামিনীলাভনকণ্ঠ স্বকীয় সেনকুলধুরন্ধর সমস্ত সাজিতে লাগিলেন, তাঁহার প্রবন্ধগুরুত্ববাহে রাজসাহী-সম্মিলনে গভীর স্তুতিপত্র বিরাজ করিবে এই বিষয়ে কাছারও সন্দেহ রহিল না। কিন্তু যাইবার সময় মেপা গেল যে,—যোব একেবারে নির্ধোষ, সবাক্ষবগ্নী বান্দবীর মায়াতে একান্ত আবদ্ধ, এবং কামিনীলাভনকণ্ঠ সেনের কুস্তলাগ্রও মেপা গেল না! টেনে উপস্থিত হইয়া তাই চতুষ্পদে বেঞ্চে বসিয়া পড়িলাম, মনটা মাতালের মত উলিতে লাগিল—একবার টেশনের বাহিরে বাঁসার দিকে—আর একবার প্লাটফর্মস্থিত তৈয়ারী ট্রেনের দিকে। তার উপর আবার টিকিটবিক্রেতা বাবুর সঙ্গে ঝগড়া করিয়া মনটা আরও বিকল হইয়া গেল—উক্তব্যু সদর্পে রেলওয়ে গেজেট বাহির করিয়া দেখাইয়া দিল—নাটোর টেশনের টিকেট করিলে সম্মিলন কনসেশন কিছুতেই দেখিবে না—কারণ কনসেশন রাজসাহীর জন্ত, নাটোরের জন্ত নহে। আমি তাহাকে যথাসাধ্য বুঝাইয়া ও যখন নাটোরে আনিতে পারিলাম না, সে রাজসাহী আঁকড়িয়াই পড়িয়া রহিল—এমন কি টেশন মাষ্টারকে পর্য্যন্ত সে গেজেট দেখাইয়া হাঁকাইয়া দিল—তখন অত্যাশ্রয়ী সমিতির কর্ণধার বেচারী কেন্দ্রবাবুকে অভিসম্পাত দিয়াছিল। একথা গোপন করিয়া কোন লাভ দেখিতেছি না। পরে জানিতে পারিরাছিলাম—সর্বস্থানাগত প্রতিনিধিবর্গকেই এই উৎপাত ভোগ করিতে হইয়াছে। নাটোরে নামা যাত্রীদের স্তুতি, তাহারা কেহই নাটোরের কনসেশন পান নাই।

তখন সঙ্গী অভাবে স্তিমমান হইয়া ধীরে ধীরে ট্রেনে গিয়া আরোহণ করিলাম। সহসা এক দেখি! গাড়ীর বেঞ্চে আলো করিয়া প্রতিভার “গায়কপাণী” পূর্ণচন্দ্র বসিয়া! অল্প দিকে চক্ষু ফিরাইতেই দেখি দৈবদত্ত গুপ্ত অক্ষয় আনন্দের মত বাঁজালার অধ্যাপক অক্ষয়দত্ত গুপ্ত হুখে সমাদীন! একদিকে পূর্ণচন্দ্র অল্প দিকে অক্ষয়—আর ভাবনা কি? মুখোমুখী হইয়া বসিয়া মহা উৎসাহে আলাপ ছড়িয়া দিলাম—এমন-কি যখন জানিতে পারিলাম যে পূর্ণ কয়েক টেশন পরেই কল রিক্ত করিয়া যাইবেন ও অক্ষয়ের জলপাইগুড়িতে অল্লেশ

মন্দিরেরই কাছাকাছি কি একটা বিশেষ অঙ্গুলক্ষ্য আছে তাই মেলের চুটিতে তাড়াতাড়ি চলিয়াছেন—তখনও হিম্মা গোলাম না !

ময়মনসিংহে সন্ধ্যা হইল । প্রাটেকর্মে নামিয়া পাথচারি করিতেছি, এমন সময় “ধুবতারার” নিপুণ শিল্পীর সহিত দেখা হইল যতীন্দ্রমোহন কিছুদিন পূর্বে বদলি হইয়া ময়মনসিংহ আসিয়াছেন শুনিয়াছিলাম—সহসা অপ্রত্যাশিত ভাবে টেশনে একপ সাক্ষাৎ হওয়াতে ভারী আনন্দলাভ করিলাম । নববিবাহিতা রোরুদ্রমানা “কল্যা স্বামীর” সহিত চলিয়াছে তিনি টেশনে উঠাইয়া দিতে আসিয়াছেন । এই স্বকরণ বিদায়দৃশ্য রেলওয়ে টেশনের ইতর কর্মবাস্তবতাকে ও যেন কোমল করিয়া তুলিল । ট্রেন ছাড়িয়া দিল ।

চল্ল উঠিয়াছে—নির্মল জ্যোৎস্নায় চারিদিক হাসিতেছে । ট্রেন অবিশ্রাম ছুটিতেছে । চইদারে স্বক গাছগুলি নিশ্চল দাঁড়াইয়া ভগবানের আশীর্বাদের মত অজস্র জ্যোৎস্নাধারা মাথা পাতিয়া লইতেছে—তাদের তলায় আঁদারে যেন দ্যানময়তা গুনাটয়া আছে ।

কিছুক্ষণ পরে জ্যোৎস্নামণ্ডিত রক্তপূরবৎ চইদারে অজস্র হীরকচূর্ণ ছড়াইয়া থেয়া জালাজ আমাদিগকে লইয়া অগ্রসর হইল । স্বপ্নেন্নে জলের দেই জ্যোৎস্নালোকিত অনন্ত বিস্তারের দিকে চাটিয়া রহিলাম । নদীবক হইতে পাতলা কুয়াসা উঠিতেছিল—দূরে তাহা একখানা পর্বতর মত পড়িয়া এক রচস্ত-ময়তার আভাসে দৃশ্যকে উদ্ভাস্ত করিয়া তুলিতে লাগিল ।

বাগটী দাদার কবিতা মনে পড়িতে লাগিল—

আজ, কাণ্ডনী কাদের জ্যোৎস্না জোয়ারে ভুবন ভাসিয়া যায়
ওরে সপন-দেখের পরী-বিচরী পাণা মেলে উড়ে যায় ।

নাটোর যখন পৌছিলাম তখন পূর্বে উবার আলোক দেখা দিয়াছে এবং পশ্চিমে চল্ল-মুখ মলিন করিয়া কেমন এক রকম কাঁকাসে ভীতিজনক হাসি হাসিতেছে !

“রাঙ্গসাহী যাত্রী নাটোরে কে নামিবেন । শীঘ্র নামুন—চাটিয়া দেখি অক্লান্ত-কর্মী বন্ধুর হুরেগ্রবাবু । আমি শীঘ্রই নামিলাম ; কিন্তু জলপাইগুড়ির কীংকায় হুরেগ্রবাবু ততটা শীঘ্র নামিতে পারিলেন না, কারণ রেলের অদ্ভুত বুদ্ধিশালী কর্মচারীগণ প্রাটেকর্মে দিকের সমস্ত দরজা আটকাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিল । অনেক ডাকাডাকি করিয়াও যখন চাবিওয়ালাকে পাওর গেল না, তখন এক

ভারী বীররসের অভিনয় হইল। বজ্রবর হুরেন্দ্রবাবু মালকোচা নারিয়া পাড়াইয়া কহিলেন—“কুচ পরোয়া নেচি—নায়েন আপনি আনার চাতের উপর পা দিয়া, তখন নং ১ হুরেন্দ্রবাবুর বিস্থত হইতে নং ২ হুরেন্দ্রবাবুর এক পাদক্ষেপ ও সম্পূর্ণ ভর দেওয়া, নতুন জুতা মণ্ডিত দ্বিতীয় পার হাঁটু গাড়ীর কক্ষ দরজায় প্রতিহত হইয়া রক্তাক্ত হওয়া ওণ্টানানানিতে মুক্ত হইয়া ভীমবেগে নং ১ হুরেন্দ্রবাবুর ললাটের সহিত সঙ্গদ্বাপন,—গাড়ীর সন্দর্ভগতিতে প্রস্থান, নং ২ হুরেন্দ্রবাবুর “আমার বিছানা রহিয়া গেল” বলিয়া বিষম ক্রোধ আবেদন ইত্যাদি নিমেষে ঘটয়া গেল।

গাড়ীর আড্ডায় যাইয়া দেখি রাজসাহী যাত্রী সাহিত্যিকবৃন্দ অনেকেরই সেখানে সমবেত হইয়াছেন তাহার মধ্যে ও কে? পরীক্ষার চূড়া যেন সহসা প্রকাশ—বরফমণ্ডিতমস্তক কাকনজ্জ্বার মত প্রকাণ্ড গুত্র পাগড়ী নাথায় ভীম লগুড় হস্তে পাড়াইয়া বজ্রদার বৈষ্ণনাথ বাবু কক্ষ ঘন উড়িয়া চাকরের সজ্জিত তামাকে ধুম উল্লসিত আবেগগিরিবৎ প্রতিভাত হইতেছেন! আর একধারে কীর্ণদেহ এক তদ্রলোক পাড়াইয়া; এমন কীর্ণ যে দেখিয়া ভ্রান্তি বা মায়া বলিয়া অনার্য্যসে উড়াইয়া দেওয়া যায়। গায়ে বিপুল কাশ্মিরী কোটুদেখিয়া তখনই চেনা উচিত ছিল, কিন্তু তিনি নাই—পরে পরিচয় হওয়াতে জানিয়াছিলাম—ইনি সেই বিখ্যাত অধ্যাপক বনমালি বেদান্ততীর্থ।

পশ্চাতে চাহিয়া দেখি প্রসঙ্গদান প্রভাস বাবু কোটপ্যাণ্ট পড়িয়া অটল হইয়া পাড়াইয়া আছেন। আমি আনন্দে শীতে নাটোরের টমটনের রূপদর্শনে পাড়াইয়া শিহরিতে ও কাঁপিতে লাগিলাম।

কিঞ্চিৎ গাড়ী বিজ্ঞাটের পর মোটরকারে চড়িয়া আমরা সকলে রাজসাহী রওনা হইলাম এবং প্রায় ১২টার সময় যাইয়া রাজসাহী পৌছিলাম। বদান্ত শরৎকুমারের কনিষ্ঠ ভ্রাতা হেমেন্দ্রকুমার বিদেশাগত প্রতিনিধিবর্গের বাপের জ্ঞাতা তাঁহার অকসম্য প্রকাণ্ড প্রাসাদ ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। সেখানেই যাইয়া আমরা উঠিলাম, স্নেহস্বাদেবকবৃন্দ ধরাধরি করিয়া আমাদের জিনিসপত্র উপরে লইয়া গেল। আমরা কাপড়চোপড় ছাড়িয়া বিছানা ঘণাঘানে রাখিয়া ভাড়াভাড়ি গন্ধার যাইয়া ঘান করিয়া আসিলাম এবং আহার সমাপনাতে (যদিও যত সংক্ষেপে লিখিয়া গাইতেছি ত্রুটি বজ্রবর হেরণ কবুর অত্যাচারে আহারব্যাপারটা তত্ত্ব সংক্ষিপ্ত হয় নাই) সভা অভিমুখে চলিলাম। রাজ-

সাহী রঙ্গগৃহে সম্মিলনের স্থান করা হইয়াছিল—যাইরা দেখি রঙ্গগৃহ উৎসববেশে সজ্জিত হইয়া অপূর্ণ ঐ দারণ করিয়াছে । প্রতিনিধিবর্গের স্থান রঙ্গমঞ্চে করা হইয়াছিল—আমরা সমগ্রমে যাইরা সেইখানে উপবেশন করিলাম ।

১৬ই ফাল্গুন রবিবার অপরাহ্ন ৩৫০ টার সময় সভা আরম্ভ হইল । ঐশ্বর্য্য রায়েজলাল আচার্য্যের 'বরেন্দ্রমঙ্গল' নামক সঙ্গীতে সভার উদ্বোধন হইল । আচার্য্য মহাশয়কে স্বাগতপত্রের আসনে দেখিয়াছি—পূজারীরূপে সহসা তিনি চারুণরূপে মৃদঙ্গনির্ঘোষে 'বরেন্দ্রমঙ্গল' গাহিয়া যে নূতন মূর্তিতে প্রকাশিত হইলেন—তাহার জ্ঞা কেহই প্রস্তুত ছিল না । বরেন্দ্রমঙ্গলে বরেন্দ্রের অতীত গৌরবকাহিনী অনেকেরই চন্দর স্পর্শ করিয়াছিল । অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি নাটোরাধিপতি ইঞ্জপ্রতিম জগদিস্ত্রনাথ অতঃপর তাহার অভিভাষণ পাঠ করিলেন । ভাষার সেই চিরপরিচিত হিলোলিত ললিত স্রুতি, বর্ণনার সেই মধুর ভঙ্গী—সকলকে মুগ্ধ করিল । অধিক পরিচয় অনাবশ্যক পাঠকগণ সম্পূর্ণটাই পড়িয়া রসাস্বাদন করিতে পারিবেন ।

সভাপতি নির্বাচনের প্রস্তাব করিলেন ঐশ্বর্য্য অক্ষয় বাবু । সন্তঃ মাতৃচীন অশোচগ্রস্ত মলিনবেশধারী নম্রপদ পুরুষসিংহকে দেখিয়া আমার হৃদয় সঙ্গতভূতিতে ভরিয়া গেল । গতবার এমনি দিনে মাতৃশ্রাদ্ধ সমাপ্ত করিয়া মুণ্ডিত মস্তকে যাইরা কলিকাতা সম্মিলনে যোগদান করিয়াছিলাম ।—যাক্ ।

অক্ষয়বাবু তাঁহার চিরমধুর ভাষায় গভীর স্বরে যাহা বলিলেন তাহার মর্ম্ম এইঃ—সমস্ত দেশের সাহিত্যিকবৃন্দ আজ রাত্ৰসাহীতে সমবেত হইয়াছে, বড়ই আনন্দের দিন । তাই অশোচগ্রস্ত হইলেও তিনি বাণীপূজার আবাহনে উদাসীন থাকিতে পারেন নাই । অশোচগ্রস্ত শ্রশানবাসী, তাহাকে সভাপতি নির্বাচনের ভার দেওয়া হইয়াছে । চিরদিন শ্রশানই তাঁহার স্থান, বরেন্দ্রের লক্ষ শ্রশান চইতে পূর্বে গৌরবের ভাস্মাবশেষ খাঁটিয়া ধূলি, ভস্ম ও অস্থিকণা সংগ্রহ, দেশবাসীর ঘরে ঘরে সেই পূতকণিকা বিতরণ করাই তাঁহার কার্য্য । এমন চিরশ্রশানচারী যদি সভাপতি নির্বাচন করেন, তবে শ্রশানেশ্বর প্রমথনাথ ভিন্ন আর কাহাকে করিবেন ? ১১ বৎসর পূর্বে রবিবাবুর পঞ্চভূতের ডায়েরী "সাধনা"র বাহির হইয়াছিল ; সেই পঞ্চভূতের সভায় সভা ছিল লোকেন্দ্র, জগদিস্ত্র, প্রমথ, অনাথ এবং বক্তা স্বয়ং আর রিপোর্টার স্বয়ং রবিবাবু । সেই যে সাহিত্য সাধনার বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছিল, তাহাই আজ সবুজপত্র মেলিয়া কবিতাকুসুমেরে অশোভিত হইয়া

রবির কিরণপাতে মনোহর রক্তিমাতা ধারণ করিয়া গগনতলে উন্নত মস্তকে ঠাড়াইয়াছে । তাঁহাকে আজ সভাপতিরূপে পাইয়া উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন ধৃত হইল ।

অক্ষরবাবুর প্রস্তাব শীতলাইর জমীদার যোগেন্দ্র বাবু ও কোহিপুর সম্পাদক সমর্থিত করিলেন । কোহিপুর সম্পাদক প্রসঙ্গক্রমে বুঙ্গালী মুসলমান দের বাঙ্গালাভাব্য চর্চ্চায় উদাসীনতা, আরবী পারসী এডের বাঙ্গালার অধ্ব-বাদের আবশ্যকতা, মুসলমান লেখকদিগকে উৎসাহদান ইত্যাদি বিষয়ে কিছু বলিলেন ।

অতঃপর সভাপতির হৃদীয় বিতর্কসঙ্কুল অভিভাষণ,—সবুজপত্র প্রকাশিত হইয়াছে । কায়েই বিবরণবাহুল্য নিশ্চয়োজন, বিচারবাহুল্যের স্থানান্তর । প্রমথবাবুর স্বভাবসিক ওজস্বিতার সহিত অভিভাষণে তিনি এত প্রয়োজনীয় বিষয়ের অবতারণা করিয়া এমন নিপুণ ভাবে বিচার করিয়াছেন, যে তাহার বিচারনৈপুণ্যো বিন্মিত হইতে হয় ।

সভাপতির অভিভাষণের পরে অগ্রাশ্র কার্যের পর ৬টায় সভাভঙ্গ হইল ।

সন্ধ্যা ৭৪০টায় বিষয়-নির্বাচন-সমিতির অধিবেশন বসিল । বিশেষ বর্ণনা আর কি করিব, সে এক বিষয় নক্ষুবজ বাপার ও তাণ্ডব নৃত্য—প্রবন্ধ নির্বাচন অক্লান্তকন্ধ্যা রম্যপ্রদান বাবুই করিয়া রাখিয়াছিলেন—তাহা নিগা কোন গোলমালই হইল না । উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন পরিচালনের নিয়মাবলি নির্দেশ লইয়াই যত গোলমাল । গত বৎসর পাবনা সম্মিলনেও এই প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছিল, কিন্তু যথেষ্ট সময় বিবেচনার ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই বলিয়া প্রস্তাবটি স্থগিত থাকে । এইবার সেই প্রস্তাব পুনরুত্থাপিত হইল । নধুর চাকে ঢিল ছুড়িলে যে অবস্থা হয়, এই প্রস্তাব উত্থাপিত হইবামাত্র সেই অবস্থা হইল । কলিকাতা হইতে আগত এক দেশমাত্র দার্শনিক প্রস্তাব করিলেন “উত্তর বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের গঠনপ্রণালী বিধিবদ্ধ করিবার পূর্বে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন বর্তমানে উত্তরবঙ্গে আর একটা পৃথক সম্মিলন থাক। কর্তব্য কিনা তাহার বিচার করুন ।” তখন মহাকুরুক্ষেত্রের ব্যাপার বাধিয়া গেল । ব্যবহারজীবী সভাপতি ব্যবহারজীবী দার্শনিক প্রস্তাবকারীর সহিত আইনের হুম্মাতিহুম্ম বিবেচনায় লাগিয়া গেলেন, যদবেশ্বর জীমুতমজ্ঞে গর্জ্জন করিতে লাগিলেন, সিরাজগঞ্জের এক উকিল তারহরে অধ্যবসায়ের সহিত চুঁচাইতে লাগিলেন, বাধুরঘাটের বন্ধুবর নগিনীবাবু হুহুকার করিয়া উঠিলেন, রাইগঞ্জের এক ভদ্রলোক

মৃগীরোগগ্রস্তের মত হাত পা ছুড়িতে লাগিলেন—চন্দ্র তাঁহার প্রবন্ধের ব্যাগ সামলাইতে লাগিলেন ইত্যাদি ।

মোটকথা মীমাংসা কিছুই হইল না । এখন লেখকের বক্তব্য এই যে, উত্তরবঙ্গের প্রত্যেক জেলা ও প্রত্যেক মহকুমা হইতে উত্তর বঙ্গ সন্মিলন-পরিচালন সমিতির সভা নিৰ্ব্বাচিত করিয়া তাহাদিগকে একস্থানে সন্মিলিত হইয়া হাতাহাতি করিবার অবসর না দিয়া পত্রযোগে তাহাদের মতামত লইয়া সন্মিলন পরিচালনের নিয়মাবলি বিধিবদ্ধ করিয়া ফেলিলেই ত হয় । সৰ্ব্ববঙ্গের মতামত লইতে যাইয়া প্রত্যেক বৎসর এই বীভৎস ব্যাপারের পুনরাভিনয় করাইবার কিছু মার্থকতা আছে কি ?

পরদিন ভোরে ৭টায় সভা বসিবার কথা ছিল, কিন্তু কর্ণধারগণ বিলম্ব করায় ৮টায় সভা আরম্ভ হইল । প্রথমে পড়া চইল মহামহোপাধ্যায় যাদবেন্দ্রের “অলঙ্কারাদ্বয়ের নিয়মপালনের আবশ্যকতা ।” মহামহোপাধ্যায় সমস্ত দেশ-বাসীর প্রক্ষেপ, কিন্তু তিনি যদি যা’ তা’ লিখেন ও যা’ তা’ বলিয়া নিজকে হাজ্ঞাপন করিয়া তুলেন, তবে আমাদের বড়ই দুঃখের কারণ হয় ।

অধ্যাপক শিবপ্রসাদ তট্টাচার্য্য লিখিত পরবর্তী প্রবন্ধ—“সংস্কৃত নাটকের জন্মকথা—” অতি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ, সুখবন্ধটুকু বাদে সমস্তটাই মূল্যবান । পরবর্তী প্রবন্ধ কথাসাহিত্য লেখক প্রসিদ্ধ জলধর দাস । গল্পের নানা বিভাগ আছে—তাহার মধ্যে এক বিভাগে জলধর দাসের শ্রেষ্ঠ আসন, কাজেই গল্পের বিষয়ে তাহার বক্তব্য অত্যন্ত শ্রোতব্য হইয়াছিল সন্দেহ নাই ।

পরবর্তী প্রবন্ধ “জ্ঞানদাসের পদাবলি”—লেখকঃ প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবসাহিত্যে বিশেষজ্ঞ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায়, এম এ । তিনি গত বৎসর পাবনাতে “নিহানন্দ দাসের পদরসসার পাঠ করিয়া পাবনা সন্মিলন রসিয়ে তুলেছিলেন ।” এবারের প্রবন্ধে সেইরূপ রসাদিক্যা না থাকিলেও হৃদয়ঙ্গম বিচারনৈপুণ্যে তাহার অত্যন্ত উপভোগ্য হইয়াছিল ।

অতঃপর বোম্বেকেশ বাবুর প্রাচীন পুঁপির বিবরণ দিয়া সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধাবলি শেষ চইল ও সভাপতি মহাশয় সমস্তগুলির মোটামুটি একটা সমা-লোচনা করিলেন ।

অতঃপর জংকম্পকারী দর্শনবিষয়ক প্রবন্ধাবলি পঠিত হইতে লাগিল ও জড়পড় হইয়া শুনিতে লাগিলাম । প্রথমে শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বেদাস্ততীর্থের “বৈষ্ণবদর্শন”—নিয় কঠোর বশতঃ কিছুই শ্রনা যায় নাই । তৎপরে সভা-

পতির অহুরোধে ভীয়েজ্ঞবাবু বেদান্তদর্শন বিষয়ে কিছু বলিলেন ও বৈতবাদ অধৈতবাদ ও বিশিষ্টাধৈতবাদ এই তিনের প্রভেদ বুঝাইবার জন্ত বিস্তর বাণীভাব আরম্ভ করিলেন । কিন্তু দলবৃদ্ধিপ্রযুক্ত আমাদের নিকট তিনটা এক রকমই বোধ চটতে লাগিল এবং মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম যে নিশ্চয়ই কতকগুলি ভুল পণ্ডিত মিলিয়া এতগুলি বাদ সৃষ্টি করিয়া ভীয়েজ্ঞবাবুকে কান্দী দিয়া অনর্থক একটা পরিশ্রম করাষ্টয়া লইতেছে । সভাপতি ও উঠিয়া এই বিষয়ে কি যেন কি বলিলেন দেখিয়া অবাধ হইয়া গেলাম ! শ্রীযুক্ত পীতাম্বর তর্করত্ন মহাশয় “চার্লসকদর্শন” ওনাইতে উঠিয়া আশ্রয় করিলেন—কিন্তু দর্শক এবং শ্রোতৃগণ চার্লসকদর্শনে এত পণ্ডিত যে, তর্করত্ন মহাশয়ের প্রবন্ধ শুনিয়া সে জ্ঞানলাভ করা বাহুলা মনে করিয়া কলরব করিতে লাগিলেন । অতঃপর মহামায়া দেবী নান্দী এক বিদ্বাঃমহিলার সভার সহিত সভাস্তুতি-জ্ঞাপক একপানা সংস্থত চিঠি পাঠায়ে তখনকার মত সভা ভঙ্গ হইল ।

অপরন্ত ২১০টায় আবার সভা আরম্ভ হইল । নিয়ে পণ্ডিত প্রবন্ধাবলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া গেল ।

১। আর্গামের আদি নিবাস নিরূপণ । লেখক প্রক্লেয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নলিনীকুমার দত্ত এম এ, শ্রীযুক্ত তিলকের Arctic Home in the Vedas নামক বিখ্যাত গ্রন্থে প্রকাশিত মতের প্রতিবাদ । ঐক ক্ষুদ্র প্রবন্ধের আধাতে তিলকের মতবাদ ভূমিসাৎ হওয়া অসম্ভব । নলিনীবাবু পণ্ডিত বাক্তি, বিশেষ বিচার বিবেচনা করিয়া এই বিষয়ে একখানি গ্রন্থ যদি তিনি রচনা করেন তবেই ভাল হয় ।

২। সেনরাজগণের রাজ্য পরিমাণ—শ্রীযুক্ত প্রসন্ননারায়ণ চৌধুরী লিখিত ।

৩। গুপ্তরাজাদের সময়ে বাঙ্গালা দেশ—শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক ।

৪। কুম্ভমাঙ্গলি প্রণেতা উদয়নাচার্যের কাল নিরূপণ । লেখক শ্রীযুক্ত ফকীর নাবু । মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত যাদবেন্দ্র এত প্রবন্ধের প্রতিবাদ করেন ।

৫। প্রাচীন যোধের জাতি । লেখক শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মহম্মদুর এম এ, পি আর এন্স । যোধের জাতির মধ্যে সাধারণতঃ শাসনপ্রণালী প্রচলিত ছিল তাহারই পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রতিপাদন ।

৬। ভারতবর্ষের রাষ্ট্রনীতি—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র ঘোষাল ।

শ্রীযুক্ত নলিনীকুমার দত্ত মহাশয় এই বিষয়ে মৌখিক কিছু বলিয়াছিলেন ।

৭। প্রাচীন ভারতে গুরুপ্রসঙ্গ । শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র রায় ।

৮। মহাস্থান ও পৌণ্ডবন্ধন । শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র সেন বি এল । বর্তমান মহাস্থানই যে প্রাচীন পৌণ্ডবন্ধন তাহাই প্রতিপাদ্য । মহাস্থানের পক্ষে যাহা যাহা বলা যায়, প্রভাস রাব্ নিপুণ উকিলের মত তাহা ওড়াইয়া বলিয়াছেন ।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় ঐতিহাসিক প্রবন্ধাবলির একটা মোটামুটি সমালোচনাস্করিতাঃ ঋতুশ্রীতিসঙ্গতঃ বিশেষভাবে কিছু বলিলেন । অতঃপর অক্ষয়বাবু, মহারাজা নাটোর, পাঁচকড়ি বাবু প্রভৃতি সাহিত্যিকগণ নানা বিষয়ে কিছু কিছু বলিলেন । অতঃপর প্রচুর হাঙ্গরসের অবতারণা করিয়া মহারাজাপাধ্যায় যদিবেশ্বর অক্ষয় বাবুকে পক্ষানন না সভানন অভিহিত একটা উপাধিঃ দান করিলেন এবং অক্ষয় বাবু তাহা মাথা পাতিয়া লইলেন । গৌড়াটির পন্ননাথ বাবুও লক্ষ্মীনা সরস্বতী নামে একটা উপাধি পাইলেন ।

সন্ধ্যায় বরেন্দ্র অম্বুসন্ধানসমিতির প্রাঙ্গণে সাহিত্যিক ও অসাহিত্যিক সমস্তকে মিঠাইমণ্ডা দিয়া অভ্যর্থনা করা হইল । কুমার শরৎকুমার মূর্ত্তিমান সৌজ্ঞ্য ও বিনয়ের মত সকলের স্তম্ভ হ্রবিধা দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলেন । শরৎ বাবুর হাত ছাড়াইয়া বাতির চইয়াছি, এমন সময় স্থানীয় হরিসভার পাণ্ডাগণ আসিয়া পাকড়াও করিলেন, হরিসভায় কনদাবাবুর বক্তৃতা চট্টনে তাহা শুনিতে যাউতে চট্টবে ! কেন্দ্র রকমে তাহাজের হাত কাটাষ্টয়া আমরঃ পঞ্চবন্ধ যাষ্টয়া গল্পার ধারে বসিলান । তখন তিন দণ্ড রাত্রি চইয়াছে ।

দোলপূর্ণিমা ! কাক্তনী চাঁদের জ্যোৎস্না জ্যোয়ারে ভুবন ভাসিয়া যাউতেছে । সম্মুখে গঙ্গা তরল অনন্ত স্রোতের মত প্রবাহিত । পরপারে দিগন্তবিস্তৃত শুভ্র বালুকারাশি স্তব্ধ চইয়া জ্যোৎস্না-স্থান করিতেছে, আর এপারে আমরা পঞ্চবন্ধ শুদ্ধপরিপূর্ণদয়ে বসিয়া । স্নিগ্ধ মলয়-সঙ্গীতঃ গাছের পাতায় যেন মধুর নৃপুত্র বাজাউতে লাগিল—আমরা যেন জদয়মধো চুইটি অনাদি কিশোর-কিশোরীর লীলান্দোলিত নৃপুত্রমস্তক মধুর পদক্ষেপ অহুতব করিতে লাগিলাম । সেই গল্পার ধারে ঘাসের উপর বসিয়া কি আনন্দই অহুতব করিয়াছিলাম—তাহা বর্ণনার অতীত ।

রাত্রি প্রায় ১১টার সময় বন্ধুর অধ্যাপক নৃপেন্দ্রবাবুর বাসায় আকর্ষ্য আহার করিয়া বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলুম ।

পরদিন সকালবেলা ৭।০টায় সভা বসিল । নিম্নলিখিত প্রবন্ধাবলি পঠিত হইল ।

১। কলকতক্কন—ঐবিনোদবিচারী রায় । জ্যোতিষিক শ্রবন্ধ ।

- ২। ছড় ও অণু। শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকৃষ্ণ অমিকারী।
- ৩। স্বাস্থ্যতত্ত্ব—শ্রীযুক্ত দেশবল্লভ বসু।
- ৪। চর্কণ ও পোষণ। শ্রীযুক্ত নগিনীকান্ত বসু।
- ৫। পর্ণায় রত্নশালা—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সরস্বতী। মূল্যবান প্রবন্ধ।
- ৬। সার। বঙ্কিমচন্দ্র শ্রীযুক্ত বৈষ্ণবনাথ সাক্ষাৎ।

অতঃপর সভাপতির সমালোচনা। পরে পঞ্চাননবাবুর বৈজ্ঞানিক গবেষণা বিষয়ে কিছু বক্তৃতা, পরে রমাপ্রসাদ বাবু বাকী প্রবন্ধগুলির সম্বন্ধে পাঠ করিলেন। পরে অক্ষয়বাবু শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সিকান্দ্রবাগীশ লিখিত রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব নামক এক কোকৃহলোক্ষীপক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। বঙ্গাক্ষরের উৎপত্তি বিষয়ক এক প্রবন্ধ পাঠ হট্টল ও রাধাগোবিন্দ বসাক মহাশয় এই বিষয়ে কিছু বলিলেন। মহামহোপাধ্যায় যাদবেন্দ্র ও এই বিষয়ে কিছু বলিলেন।

অতঃপর সুরেন্দ্রবাবু কার্যবিবরণ পাঠ করিলেন। একটি মুসলমান ভ্রম-লোক 'প্রণামি তারে দেই বিশ্বপতি' বলিয়া মধুরকণ্ঠস্বরে বিশ্বপতির স্তোত্রগান করিলেন।

তারপর একেবারে বাসায় ঘাইয়া উঠিলাম।

অতঃপর বিজয়া দশমীর পালা বর্ণনা অনাবশ্যক। তবে শেষ করিবার পূর্বে রাজমহাশী সম্মিলনের পরিচালকদিগের আশীর্বাদ স্বরূপে কলেজের ছাত্র-স্বৈচ্ছাসেবকগণের আশীর্বাদ কার্যতৎপরতা ও সজ্জদয়তা আমাদিগকে মুগ্ধ করিয়াছিল এই কথা জানাইয়া বিদায় গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি। উত্তরবঙ্গের এষ্ট বার্ষিক মহাযজ্ঞ বর্ষে বর্ষে নবীন সাফল্যে সমাপ্ত হইয়া উঠুক।

শ্রীনগিনীকান্ত ভট্টশালী।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

সবুজপত্র চৈত্র—

এবার সবুজপত্রে নূতনত্ব আছে—লেখক এক। রবীন্দ্রনাথ, সম্পাদক মুগ্ধপত্রে নামাবশেষ হইয়াই আছে। সেদিন একজন বন্ধু বলিতেছিলেন “সবুজ পত্রের এমন সম্পাদক আমিও হইতে পারি, কিন্তু মুগ্ধপত্রে নামটি ছাপিতে রাজী নই।” অনেক শ্রম করিবার পরও বন্ধুবর কথটার অর্থ আমাকে ভাল করিয়া বুঝাইলেন না।

“বসন্তের পালা” নাম দিয়া যে কয়টি কবিতা একাশিত হইয়াছে তাহার কৃমিকায় লেখক বলিতেছেন “এগুলি কাণে করিয়া লইলে খেয়াল নাটকের (অর্থাৎ পরে একাশিত

‘ফাঙ্কনী’ শীর্ষক নীটকের) চেহারাটি পরিবার সুবিধা হইতে পারে ।” বাহাতে আমাদের মত পাঠকেরা মাটকটি বুঝিতে পারি সেই অন্তই “বসন্তের পালা” লিখিত চট্টগ্রামে কিংবা টাঙ্গা একটা স্বতন্ত্র রতনা তাহা বুঝিয়া ওঠা কঠিন ।

‘বেণুবন’ ‘দমিন ভাওয়া’য় মাতিয়া উঠিয়াছে । সূত্রমের প্রকে বর্ণে পানীও মাতিয়ায়াস “ফুলত” পথে প্রকৃত্তরে তুলি ভারাউয়াছে । ননী পাথলের মত চট্টিয়া চলিয়াছে ; কিন্তু “ফুলতলাচ” বলিত্ত চায়—

আমি সদা অচল পাকি
 গভীর চলা গোপন রাশি
 আমার চলা নবীন পাঠায়
 আমার চলা ফুলের শাখা ।
 ওখো নদী, চলার বেগে
 পাথল পাতা
 পথে পথে বাহির করে
 আশন হারা ।
 আমার চলা দায় না বলা
 আলোর পানে আগের লো
 অক্ষয় বোঝে আমল তার
 বোঝে নিশ্চয় নীরব তার ।

এইরূপে আত্মপ্রকাশের পর ‘পানীর পলায়’ ‘বহুল তলায়’ নবীনময় চরিত্র আগ
 • জাতিয়া উঠিল । নবীন বসন্ত অরণী শীতকে ছাড়িতে চাহিল না । নব যৌবন শীতকে বসন্তের বন্দীত্বলায় বন্দী করিতে চাহিল । শীত তাহার কথায় উদ্ব্যস্ত হইয়া উঠিল । বসন্ত তাহার কথা চানিয়া উড়াইয়া দিলে আসন্ন মিলনের পান জমিতে বিলম্ব হইল না । নবীন জিভিল । নবযৌবন শীতের জনগণ্যে ক্রিয়া আসিলে অরণী শীতে নবীন রূপে নৃতন আশা জাতিয়া উঠিল । অরণীে নবীনে বোঝাপড়া শেষ হইলে অরণী নবীনের বিরূপে বিস্তিত হইল । তারপর উৎসবের পান—

আগ রে তব, মাত রে সবে আমলে
 আজ নবীন আগের বসন্তে ।
 শিউন পানের বীধম চতে
 চল্ টুটে আজ বক্তান্তোতে
 আপনাকে আজ দমিন ভাওয়ায়
 চড়িয়ে কে রে দিগন্তে
 আজ নবীন আগের আমলে ।

সকল বীধম ধীর কর ; যখন অকূল আগের সাগরতীরে উপস্থিত হইবে তখন কয়কতি অগ্রাহ না করিও থাকিতে পারিবে না ; অনন্ত তোমার সম্মুখ হইবে

না আছে রে সব নিরে তোর

কঁপা নিয়ে পড় অমতে

আজ নবীন আগের বসন্তে ।

“বসন্তের পালা”র কবি সাগনন্দমহীম অল্প পুস্তক নবীনকে রাজতীকা দিরাছেন । এ নবীন প্রবীণকে ভাণ করিতে চায় না, বরং তাহার জীর্ণ আশ পরিত্যক্ত করিয়া তুলিতে চায় । প্রবীণ তাহাকে প্রথমটা ঝুঁপা করিতে পারে, কিন্তু তাহার ক্ষমতা দেখিয়া ভিত্তিত না হইয়া তাহাকে আলিঙ্গন না করিয়া থাকিতে পারে না ।

আমাদের দেশ বেলাচাপলজড় ; আধ্যাত্মিকতা ইহলৌকিক বিষয়ে আমাদের অমাত্রা আনিয়া দিয়াছে । আমরা একটিকে মাত্র বলিয়া উড়াইয়া দিই । নবীন প্রাচ্যাত্মকে পদদলিত করিয়া আমরা বার্কিকাট্টেই জেষ্ঠ আদম দিয়া থাকি । সেই অস্ত্র আমরা তুচ্ছ ; আমাদের দেশও তুচ্ছ, অক্ষম । সেই অস্ত্র রবীন্দ্র বাবু আমাদের মধ্যে নবীনতা অবিনেচন । এতগুলি কতকগুলি শিশুহুল্লভ পত্রিয় উদ্বোধন করিয়া অস্থিমজ্জাপিত বার্কিকাকে দূরীভূত করিতে চান । তবে এই বার্কিকা জ্ঞানজমিত বলিয়া কবি ইচ্ছাকে একেবারে তাড়াইবার কথা না বলিয়া বলিতেছেন—নবীনতা ও প্রবীণতায় একটা সম্পর্ক আছে—নবীন আগমার বশে চলিয়া প্রবীণের পথেই আসিয়া পড়ে—নবীন প্রবীণে মিলন আভাবিক তাহার পরম্পর বিরোধী নয়, বরং নবীন প্রবীণকে সাজাইয়া তুলিয়া করিয়া তাহার মধ্যে আগপণ্ডি জাপাটয়া তোলে ।

“কালুধরী” নাটকেও দেখিতে পাও—ঘরছাড়ার দল বসন্ত সাগন করিতে বাহির হইয়াছে । ইহাদের “দাদা” অকালবৃদ্ধ, তত্ত্বজ্ঞানের মাত্রা উচ্চাতে ত্রিষ্টু অধিক । ঘরছাড়ার দল ইহাকে উপহাস করিয়া বেড়ায় । কিন্তু চন্দ্রহাস দাদার কথা শুনিতে রাজী । ঘরছাড়ার দলের এক সর্কার আছে সে একুটির মত, সর্কারি করেনা, অথচ ঘরছাড়ার দল তাহার বশে চলিয়া থাকে । সে গুহার মধ্যে তত্ত্বজ্ঞানের মত ‘দে মাছাতার আনলের বুড়ো তুলিয়ে থাকে, খরবার নাম করে না’ তাহাকে অবিশ্বাস করিতে চায় । একদিন তাহার অতৃপ্তের সর্কারের এই অবিশ্বাসটার বিরোধী হইয়া ঠাঁড়াইল । সর্কারের প্রতি সগম সন্দেহের সূত্রপাত হইল সর্কার তখন একটা মৃতল পেলা অবিশ্বাস করিতে চাহিল । বুড়োকে লইয়া বসন্ত উৎসবের পরামর্শ গ্রিক হইয়া পেল ।

সকলে বুড়োর সম্মানে চলিল । কিন্তু কেহই তাহাকে ধরিতে পারিল না । গুণগণে আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া সে কোথায় অন্বেষণ করিল । জ্ঞান ও বার্কিকোর পথ বহিষ্য তাহার । কিছুই গ্রিক করিতে পারিল না । তাহাদের ভয় বাড়িল, মনে হইল কেবলই তাহার কুল করিতেছে । হঠাৎ তাহাদের শ্রদ্ধা আসিল অকালবৃদ্ধ দাদার উপর । সর্কারের উপর তাহাদের সন্দেহ ক্রমশঃ ঘনীভূত হইয়া আসিল । কলে তাহার বেলাদে ছিল, সেইখানেই রহিয়া পেল ; উন্নতি দাই, অবনতি লাই এমন একটা বাড়িই অবস্থা ঘাটিয়া লইতে হইল ।

এবং সময়ে চন্দ্রহাসের হাসি শোনা পেল । একুত বাত্ম সে—ঘরছাড়ার দলের মত

সে কখনও একত্বিকৈ অঙ্গিকা করিয়া আপনাদি স্বাক্ষরকে পদবলিত করে নাই। সে বুড়ার সঙ্কাম লাভ করিয়াছিল। তাহার শব্দসম্বন্ধ ছিল একটি অক্ষ বাউল।

সকলে চঞ্জহাসের শিষ্টে পিষ্টে যন্ত্রের মত চলিল। কিন্তু চঞ্জহাস অক্ষ বাউলকে লইয়া তাহাদের চাড়াইয়া চলিয়া গেল। ঘরছাড়ার দল এখন একত্বিক দিকে চাহিয়া তাহাতে মাতিয়া বুলিল—শুধু বসন্তের হাসি নয়—সমুদ্রপারের দীর্ঘনিঃশ্বাসেও যজিতে পারা যায়। একত্বিকমতে চলিল শুধু একত্বিক নয়, জ্ঞানও সরস শেলার সামগ্রী হইয়া পড়ে। বাউল অক্ষ, গান করিয়া আগের প্রেরণায় সে পথ ঠিক করিয়া লয়। ঘরছাড়ার দল হঠাৎ তাহাকে দেখিয়া মাতিয়া উঠিল। বাউল অক্ষ আগের মতই গান বলিল।

সব যারে সব দিতেছে

তার কাছে সুব দিয়ে ফেলি

কবার আগে চাবার আগে

অপনি আমার পেন ফেলি,

নেবার বেলা ফেলম স্বপ্নী

ভিড় করেছি, ভয় করিনি

এখনো ভয় করব নারে

দেবার শেলা এবার খেলি।

অচািত তারি সোণা নিয়ে

বেরিয়ে পড়ে নেচেছুঁড়ে

* সঙ্কাম তারে অশায় করে

সব সোণা তার দেয়রে শুধে।

ফোটা ফুলের আমল রে

ফরা ফুলেই ফলে ধরে

* আপনাকে ডাই ফুরিয়ে দেওয়া

চুকিয়ে দে ভুই বেলা বেলি।

চঞ্জহাস ফিরিল না। সে বুড়াকে জয় করিয়া আসিতে গিয়াছিল। সকলে চঞ্জহাসকে খুঁজিতে গেল। কিছুক্ষণ পরে চঞ্জহাস তাহাদের দিকটে আসিয়া বলিল "সে বুড়াকে ঘরিয়েছে।" বুড়া এখন দিকটে আসিল তখন সকলে দেখিল সে সর্কার। একত্বিক জ্ঞান এখন একই জিনিস বলিয়া প্রতিপন্ন হইল না। নবীনে এভাবে বস্তু বুঝিয়া গেল।

ফাল্গুনীর* কথাংশ আমার। একালিত করিলাম; পাঠকেরা এখন ইহার মূল তথ্যটি বহিতে পারিবেন। পাছে ইহার কাব্যবংশের কিছু কতি হইয়া পড়ে সেই সন্ত তথ্যটি বিশেষরূপে একাল করিতে আমরা রাজী নই।

এই হৈয়ালি নাট্যে সবীপ্রবাবু একটা নৃত্য দরশন অবলম্বন করিয়াছেন। তাহার কবিতা লক্তি কোথাও ফুরে হয় নাই। কথোপকথন সংক্ষিপ্ত, অথচ সারস্বত। গানগুলি স্থানে স্থানে প্রাপ্যশব্দী। জিনিসটিকে হৈয়ালীর আকার দান করিলেও তাহা পরিপূর্ণ।

কিন্তু তত্ত্বটি খুব দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া মনে হয় না। হিন্দুধর্মের অকৃত্তিক যে স্থান দিয়াছেন রবীন্দ্রবাবু তাহা উচ্ছিন্ন করিতে চান। তিনি আত্মী ও অকৃত্তির সম্পর্কটা খুব দৃঢ় প্রমাণ করিয়া ইউরোপের সভ্যতার স্রোত এদেশে আনিতে চান—যে আধ্যাত্মিকতা, তত্ত্বজ্ঞান শাস্ত্রীয় বচন তাঁহার মতে আমাদের অকাল বর্জ্যতা আনিয়া দিয়াছে, তাহার সহিত নাক্ষিপিত স্বতন্ত্রতা ও ইহলোকের মন্ত্রণের বিরোধ নাই— স্বতন্ত্রতা ও অকৃত্তির অঙ্গুষ্ঠিততা আমাদের আধ্যাত্মিকতায় আনয়ন করিবে ইহাই রবীন্দ্রবাবুর বক্তব্য। অকালগ্রন্থ হইয়া আমরা যে সমাজকে ব্রহ্ম অকর্ষণ করিয়া তুলিতেছি তাহা সত্য। রবীন্দ্রবাবুর দাবী বক্তব্য তাহাও অশৌচিক নয়। হিন্দুধর্মের অকৃত্তিকে নিম্ন স্থান দেওয়া নাই। কবি হিন্দুধর্মের উপর অপমানের কথা প্রতিষ্ঠিত না করিয়া ইংরাজী ধর্মের একটা পুরাতন জঘন্য লাঞ্ছনাকে জড়াইয়া ধরিয়াছেন। দাড়া নিজের কাছে প্রচুর তাহার অজ্ঞ পত্রের কাছে হাত পাতিতে কি জামি কোন বাঙালী এমন একটু মারাজ। কেহ কেহ রবীন্দ্রবাবুর কথা বিবেচীর কলাঘাত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন, কিন্তু আমরা তাহা বন্ধুর তিরস্কার বলিয়া মানিয়া লইলাম।

তারপর রবীন্দ্রবাবু দাবী করিলেন যে গড়িয়া তুলিয়াছেন, সেমন ভাবে চলিলে অকৃত্তিকে অগ্রাহ্য না করিয়া জ্ঞানে নৌড়িতে পারা যায় ও অকৃত্তি ও জ্ঞানে কোন বিরোধ অনুভূত হয় না, তাহা কার্যক্ষেত্রে কতটা সম্ভব এমনও প্রমাণিত হয় নাই।

প্রবাসী বৈশাখ—

“বিবিধ এসঙ্গে” অসীম সম্পাদক মহাশয় লিখিতেছেন “জীবিত লেখকের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম করিতে সচেষ্ট হয় না যদিও তাঁহার অনেক পদ্যরচনা খুব মূল্যবান, অগ্র-বাসেও সমাজদার বিদেশীরাও তাহার মূল্য বুঝিয়াছে। কেননা, বঙ্গদেশে রসিকতাবুদ্ধি জন্ম না করিলে বিজ্ঞ হওয়া যায় না।” লেখকের এ উক্তির মার্ককতা বুঝিয়া পাইলাম না। রবিবাবুকে বোধ হয় এবার চীৎকার করিয়া বলিতে হইবে আমাদের বন্ধুদের নিকট হইতে আমাদের পরিচয় কত। বঙ্গদেশের লোক রবিবাবুকে বুঝেন নাই, বুঝিয়াছেন কেবল অবাসী সম্পাদক! আমরা সম্পাদক মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি—বঙ্গদেশের কোন গ্রন্থকার জীবিতাবস্থায় রবীন্দ্রবাবুর মত এ দেশে সম্মানে লাভ করিয়াছেন কি?

ঐরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পত্রীর উত্তরে এসঙ্গে বলিতেছেন—“পূণ্য আমরা বুঝি, এমন কি আমরা আত্মীয়তার ভাবও আমাদের বেশিকম থাকতে পারে কিন্তু সাধারণ চিত্ত আমরা বুঝিনে এবং এইটে বুঝিনে যে সকলের শক্তির মধ্যে আমার নিজের অজেয় শক্তি আছে।”

“আমার অন্তর এটী যে বাংলাদেশের সেখানে হোক একটি গ্রাম আমার হাতে নিজে ডাকে আত্মশাসনের শক্তিতে সম্পূর্ণ উৎসাহিত করে তুলি।” সে আমাদের রাজ্যঘাট, তার ঘর বাড়ির পারিপাটী, তার পাঠশালা, তার সাহিত্যচর্চা ও আয়োজ্যআয়োজ, তার সৌন্দর্য-পরি-চেষ্টা ও তিকিৎসা, তার বিবাদনিষ্পত্তি অস্তিত সমস্ত কার্যভার সুবিধিত নিঃশেষে গ্রামবাসীদের দ্বারা সাধন করাবার উদ্যোগ আমরা করি। যাঁরা একাজে প্রবৃত্ত হবেন তাঁদের অন্তর

করবার অল্পে আঁপাততঃ কলকাতায় একটা মৈত্রি বিদ্যালয় স্থাপন করা আবশ্যক । এই বিদ্যালয়ে বৈজ্ঞানিক শিক্ষকদের দ্বারা প্রজ্ঞাপনসম্বন্ধীয় আইন, জমি-জরীপ ও রাজস্বাট ড্রেন পুষ্কর ঘরবাড়ি তৈরি, হঠাৎ কোনো সাংঘাতিক অগ্নিশত প্রভৃতির উপস্থিতিতে চিকিৎসা ও কৃষিবিদ্যা প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধে মোটামুটি শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা থাকা কর্তব্য । পান্ডিত্যে দেশে গ্রাম প্রভৃতির আর্থিক ও অগ্রগতি উন্নতি সম্বন্ধে আলোক দিতে সর্বদা উদয় হয়েচে যে সম্বন্ধে সকল প্রকার সংবাদ এই বিদ্যালয়ে সংগ্রহ করা দরকার হবে । পল্লীগ্রামে মানা হাট্টেই দাতব্য চিকিৎসালয় এবং মাইনর এন্ট্রান্স স্কুল আছে । যারা পল্লী-গঠনের ভার গ্রহণ করবেন, তাঁরা যদি এই রকম একটা কাজ মিটে পল্লীর চিত্ত জন্মে উৎসাহিত করার চেষ্টা করেন তবে তাঁরা সহজেই ফললাভ করতে পারবেন এই আমার বিশ্বাস । অকস্মাৎ অকারণে পল্লীর ক্ষয়নের মধ্যে প্রবেশ করা দুঃসাধ্য । ডাক্তার এবং শ্রমিকদের পক্ষে গ্রামের লোকের সঙ্গে যথার্থভাবে পরিচয় করা সহজ । তাঁরা যদি বানসায়ের সঙ্গে লোকহিতকে মিলিত করতে পারেন, তবে পল্লীসম্বন্ধে যে সমস্ত সমস্তা আছে তার সহজ ধীমাংসা হয়ে যাবে । এই মহৎ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে রোগে একমুখ হুবহু প্রস্তুত হতে থাকুন, তাঁদের প্রতি এই আমার অনুরোধ ।”

রবীন্দ্রবাবুর প্রস্তাব দেখা তথা আমরা সর্বাঙ্গীকরণে স্বীকৃতি দিচ্ছি । ইতিপূর্বে বঙ্গদেশে গ্রাম-পঞ্চায়েতি প্রভৃতি বিষয়ে উপলব্ধি করিয়া মানাবিধ গ্রাম-হিতকর পুস্তক হইয়াছে কিন্তু কাগজতঃ বেশী দূরে আমরা অগ্রসর হইতে পারি নাই—আশা করি এখন এমন সময় আসিয়াছে যখন বাক্য ও কার্য সমাপাদক্ষেপে অগ্রসর হইতে পারিবে ।

“স্বাস্থ্যের উন্নতি”র লেখক শ্রীমল্লরতন সরকার । ডাক্তার মহাশয় এট প্রবন্ধে সহজ সরল ভাষায় অনেকগুলি প্রয়োজনীয় কথা বলিয়াছেন । বাংলার সাহিত্য সরকার মহাশয়কে লাভ করিলে পরিপূর্ণ হইবে আশা করি ।

ঐতিহাসিক সত্যনিষ্ঠার প্রণালী নির্ধারণ করিয়াছেন । বাহ্যিক ইতিহাস চর্চা করিতেছেন তাঁহাদের নিকট এ প্রবন্ধ অপরূপ হইবে । ঐতিহাসিক সত্যনিষ্ঠার পরিচয় হইলে তিনটি প্রশ্নের উত্তর জানা আবশ্যক (১) সর্বপ্রথমে কে একাধার দিয়াছে (২) এই সাক্ষ্যটি ঘটনা জামিনবার কি প্রমাণ পাইয়াছে (৩) এই একাধারে তাহার কোন স্বার্থ আছে কি না । আসল গ্রন্থ বর্তমান থাকিতে অনুবাদে উপর নির্ভর করা ভাল । গোপনে অনুবাদ ব্যবহার না করিলে চল না, সেখানে সর্বশেষে গঠিত অর্থ (সর্বপ্রমাণ) বিশুদ্ধ অনুবাদটি অবলম্বন করিতে হইবে । ভিন্ন মত উপস্থিত হইলে তাহার মধ্যে অতি কৌশলে সত্য বাছিয়া লইতে হয় । শুধু রাজা, রাজ্যপরিবর্তন, যুদ্ধবিগ্রহ লইয়া ইতিহাস মনে । ইতিহাস দর্শন নামের যোগ্য ; অতীত যুগের ক্ষয়টি দেখাইতে না পারিলে প্রকৃত ইতিহাস হয় না । ইতিহাসের জ্ঞান জাতীয় উন্নতির প্রথম সোপান । যতদূর নাশা উপাধরণ দিয়া তাঁহার বক্তব্য জলি প্রকাশ করিয়াছেন ।

এই সংখ্যায় ব্রহ্মবাদ ও দাক্ষিণাত্যের দৃষ্টিভঙ্গির বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে চিত্রগুলি বেশ চিত্তাকর্ষক । “অলঙ্কার ওহার কতকগুলি চিত্রও এ সংখ্যায় সংস্থিত হইয়াছে । ফরাসীর অর্থো” ফরাসী ঐতিহাসিক স্কুল মিশনের বিশ্বমানবের গীতা (Bible of Humanity)

সামান্য অভ্যাস প্রদত্ত হইয়াছে। মূল বিষয়ে ভারতকে কি প্রকার ভাবে দেখিয়াছিলেন তাহা এই প্রবন্ধটি পড়িলে বুঝিতে পারা যায়। লেখকের প্রবন্ধ আরও বিস্তৃত হওয়া উচিত ছিল।

“মাত্রাপান” জীবনীজ্ঞানধ ঠাকুরের কবিতা।

“পাখল তোমার সঙ্গিছাড়া হুয়ে

তান দিয়ে মোর বাপের নীশীতে”

অনেকবার অনিরাঙ্কি, কবিতার ভাবের নতনই নাই। তবে ছন্দ ও কবিত্ব মুহুর্তক।

“জনদের আকাঙ্ক্ষিত দেশ” ডব্লিউ. বি. ইয়েটস প্রণীত একটি নাট্যরচনার অন্তর্ভাব। এই জনদের আকাঙ্ক্ষিত দেশে কেউ রক্ত, ধূর্ত অথবা জ্ঞানী হয় না—বৃদ্ধা এবং যুগ্মরাও সেখানে কেউ নেই—সেখানে দৌলতগোঁস জোয়ারের ডাটা পড়ে না। প্রাচ্যের বস্ত্র সেখানে নাই, আর জ্ঞানই সেখানে আনন্দ, কাল অমূল্য গানের মত। অগ্নেবতা একটি বন্ধুকে দেখিয়েছে ভক্তিমান পরিত্রাণার্থে দীক্ষিত ও শাস্ত্র গুরুদেব, প্রেমিক স্বামী ও কবিতা। গৃহস্থীর প্রসারিত আল হঠাতে মুক্ত করিয়া লইয়া খেল। অগ্নেবতাটি গুরু মতে নরকের ভবিষ্যৎ অবিস্মৃতি হঠাতে পারে, চকের নিম্নে তাদের মনের উপর দিয়ে যেমন ভিত্তি বয়ে যায় তারা শুধু তারই দাস। গুরুদেব বলেন—পরমেশ্বর তাদের প্রাণে করবেন, কিন্তু কে জানে হঠাত ভগবান তাদের দেশে হাসবেন আর তাদের সঙ্গে পড় দরজা খুলে দেবেন।” অগ্নেবতা বলে “মল্লী নীশীতে এই স্বর শুনিতে পাই বাতাস যদি ছেলে মর্দন শব্দে পান যায় তবে উদ্যমী জন প্রাচ্যের তারা শুকিয়ে যাবে, আর বাতাস হেঁচক মর্দনশব্দ করে সেই দেশের পান যায় যে দেশে বুদ্ধেরাও মৃত্যুর এবং এমন কি জ্ঞানীরও মজার কথা বলে, তখন পরিত্রাণ (অগ্নেবতার) শুভে পাওয়া।” অন্তর্ভাব সর্বত্র স্পষ্ট নয়। তবুও রচনা প্রশংসনীয়। রচয়িতা প্রচলিত জীব সমাজ পদ্ধতির উপর প্রচণ্ড হঠাৎ বসিয়া বোধ হয়। ইউরোপে এ ভাবের অভাব নাই। আশাভের দেশেও রবীন্দ্রনাথ সে ভাবটা আনিতে চেষ্টা করিতেছেন। সমাজের প্রতি এখন সকলেরই দৃষ্টি পড়িয়াছে—প্রচুর পড়িয়াছে সমস্ত প্রাণে করিবার জন্ত, মনের দৃষ্টি পড়িয়াছে তাহাকে রক্ষা করিবার জন্ত। এখন সমাজের অগ্রগতির দিন আসিয়াছে বলিয়া বোধ হয়।

“অর্থী” জীবনীজ্ঞানধ ঠাকুরের কবিতা। পাখল চাপা ও উগ্রত বহুল বসন্তের প্রতীক না করিয়াই “সবার মাঝে উঠে হেঁচক ঠেলাঠেলি করে” সূচিয়া উঠিল আবার অরুণের মধ্যেই সূচিয়া পড়িল। ইহাও যে অর্থহীন নয় তাহা কবি গুহ্যেরই উপযুক্ত কবিত্বের অভাবে প্রমাণিত করিয়াছেন।

জীবনীজ্ঞানধ মত “ভারতীয় দর্শনে দর্শনশাস্ত্রের বিস্তৃত বিস্তারিত কথা দুঃশাখা তাহা দেখাইয়াছেন। তিনি প্রমাণ করিয়াছেন দর্শন বিজ্ঞানবানী হঠলেও তাহা এক সত্যের নানা দিক দেখাইয়া দেয়। প্রাচীন যুগে নানা মতের সমন্বয়ে তেঁরা হইয়াছিল। আমরা যদি এই সমন্বয়ের ভাবে ভাবিত হইয়া সত্যের অন্তর্ভাবনে প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলে অন্যভাবে প্রবৃত্তিগত কটকিত ক্ষেত্র পরিহার করিয়া সামঞ্জস্যের উচ্চল চূড়ায় আরুঢ় হইতে পারি।

তত্ত্বদর্শনের কারণ বুদ্ধি নয়—বোদি, ব্যক্তিগত বুদ্ধি দ্বারা তর্কবিচার নিষ্পন্ন হয়, কিন্তু বোদি ভিন্ন তত্ত্ব সাক্ষাৎকার হয় না । এমন বিচার তর্কে না বলিয়া মিছাত্তে উপনীত হইতে হইলে অভেদে ভেদ না দেখিয়া ভেদে অভেদ দেখিতে হইবে ।

আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে যে দর্শন শিক্ষা চলিতেছে তাহা সন্তোষজনক নয়, সেই অল্প লেখক বলিয়াছেন—যাঁহান স্বাগমনে ভারতবর্ষের একত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং যিনি ভারতবাসীর স্থাপিত ভাবধারা এবং প্রতিষ্ঠিত চিন্তাপ্রোতকে আবার গতি দান করিবেন, এমন শক্তিমস্ত্রই মহাপুরুষের আশংগে আমরা চাহিয়া আছি । পরিচাণা সম্বন্ধে লেখক বলিতেছেন—সুপ্রাচীনতম যেন বাণিজ্য নিষ্পন্ন হওয়া চুকর, পরিচাণা ভিন্ন সেইরূপ দর্শনও অসম্ভব । সংস্কৃতভাষা দর্শনপরিচাণা সম্বন্ধে সত্যিগত সমৃদ্ধ । অথচ আমরা দেশে গনির গল্পরাখির সন্ধান না করিয়া মনগড়া কিছুতত্ত্বমাকার শব্দের প্রয়োগ করিতেছি ।

লেখক আরও বলিয়াছেন পরিচাণা রচনা ও শব্দমূলী সংগ্রহ করিলেই যথেষ্ট হইবে না, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আটা আদি দার্শনিক গ্রন্থসমূহের অধ্যয়ন করিতে হইবে । মৌলিক গুণও আবশ্যক ।

তারপর লেখক দেখাইয়াছেন—দর্শন ক্ষেত্রে reason'এর জিনিস অনেক আছে । প্রাচীন গ্রন্থের উদ্ধার বিশেষ আবশ্যক ।

হীরেনবাবুর এটি কথাগুলি বিশেষ আলোচনার জিনিস । প্রবন্ধটি ভাবিবার অনেক জিনিস উপস্থাপিত করে । বিশেষতঃ নিকট যাহা অংশ করা যায় এমনকি তাহা আছে ।

ঈশ্বরপ্রদান শাস্ত্রী বাবুলা ভাষা ও সাহিত্যের আলোচনা করিতে গিয়া কিছু হতাশ হইয়াছেন । এই হতাশার কারণ—

(১) বঙ্গ-সাহিত্যে চুটকির প্রচুরতা । চুটকি মন জিনিস নয়, তবে তাহাই সম্বন্ধার্থ হওয়া উচিত নয় । চুটকির চেয়ে কিছু বড় জিনিস চাই । চুটকি মনকার তলনট, বেশী দিন থাকে না ।

দেশের কথাটা সর্বত্র প্রযোজ্য নয় । অনেক চুটকি যে বঙ্গকাল পরিয়া চলিয়া আসি-তেছে, তাহার প্রমাণ নিতে অধিক বিলম্ব হয় না ।

(২) চিন্তাপূর্ণ রচনা ও জীবন-চরিত্রের অভাব ।

(৩) কাব্যের দোষগুণ পরীক্ষার অভাব ।

(৪) সংস্কৃত ও উৎকর্ষের হাতে পড়িয়া বাবুলায় স্বাভাবিকতা ।

আমোঘেনচন্দ্র রায় দেশে বিজ্ঞান বিস্তারের কতকগুলি অন্তরায় নিরূপণ করিয়াছেন । এবং অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আছে । সব কথা সংক্ষেপে বলা চলে না । আমরা পাঠকগণকে এ প্রবন্ধটি পাঠ করিতে অনুরোধ করি । যোগেশবাবুর একটা কথা আমরা উদ্ধৃত করিব—“এই যে অভাব বোধ হইতে গবেষণা তাহাই একত ; অজ্ঞের দোষাদেশি যাহা তাহা ক্রিয়াম ।” আরও দেখিতেছি কুদি ধরিত্তা আর যাবতীয় বিজ্ঞান লিপাইতে পারা যায় । বিজ্ঞানের এমন শাখা নব হইতেছে না যাহা ইচ্ছাতে কিছু না কিছু লাগে । ইহাই ত প্রজ্ঞাপ্রদানের আবশ্যক । বিজ্ঞানের মূল তত্ত্ব একাধিত হইক প্রতিষ্ঠিত কৃষিবার্তার দৃষ্টান্তে প্রচলিত হইক ।”

উপসংহারে লেখক বিজ্ঞানচর্চা সম্বন্ধে একটু বিবেচক হইতে উপদেশ দিতেছেন। সে কালের একাধর অসিয় পরিবর্তে এই যে ইউরোপে শতাব্দী বাণ নির্মিত হইয়াছে, প্রকৃতির উপর আধিপত্য লাভে ইউরোপ ও আমেরিকার ভোখ-প্রকৃতির আকালনে দিপ্ত কল্পিত হইতেছে, তাহা হইতে বিরত হইতে হইবে। * * আমাদের প্রাচীনেরা এ কথা বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন, তাই তাঁহার। বিজ্ঞান ও মর্শন এক করিয়াছিলেন।"

ঐহরপ্রদাদ শাস্ত্রী বাঙ্গলা দেশের কতকগুলি প্রাচীন গৌরবের কথা বলিয়াছেন। তাহা সংখ্যায় বিশটি :—(১) হস্তি-চিকিৎসা (২) নানা ধর্ম-মত (৩) রেশম (৪) বাকলের কাগড় (৫) থিয়েটার (৬) নৌকা ও জাহাজ (৭) বৌদ্ধ শিল্পত্র (৮) বৌদ্ধ লেখক শাস্ত্রিদেব (৯) মাথ পদ্ম (১০) দীপঙ্কর ঐজ্ঞান (১১) অগ্নিদল মহাবিহার ও বিকৃতিচক্র (১২) সুইপাদ ও তাঁহার সিংহাসনাদি (১৩) ভাস্করের কাজ (১৪) বাঙ্গলার সংস্কৃত-চর্চা (১৫) দুহশলিত, ঐকর, ঐনাথ ও রণুদলন (১৬) জ্ঞানশাস্ত্র (১৭) চৈতন্য ও তাঁহার পন্থিকর (১৮) তান্ত্রিকগণ (১৯) বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ (২০) কায়স্থ ও রাজা।

দেশের অতীতের আলোচনা যে কত প্রয়োজনীয় তাহা আজকাল বুঝাইয়া বলিতে হয় না। অনেক কথা শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন তাহা বঙ্গবাসী এতদিন জানিতে পারে নাই। গৌরব বুদ্ধি করিতে হইলে অতীত গৌরবের কথা স্মরণ করিতে হইবে। যিনি অতীতের গৌরব সঙ্গুণে ধরিয়া দেন, তাঁহার নিকট আমাদের কণ অধীকার করা মনুষ্যবশের লক্ষ্য নয়।

শাস্ত্রী মহাশয় "বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্যের গতি" শীর্ষক রচনায় পত সাহিত্য-দশ্মিলনে ভাষায় চুটকির প্রাচুর্যের অন্ত একটু হতাশের ভাব দেখাইয়াছিলেন, তাই কবি ঐসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত একটি অতি দীর্ঘ শব্দবল কবিতায় কতকটা ব্যঙ্গ প্রকাশ করিয়াছেন। কবিতাটিতে * তাঁহার কবিত্বের পরিচয় থাক আর না থাক, তাঁহার অপ্রলুভতার পরিচয় যথেষ্ট আছে।

ভারতী, বৈশাখ—

মাতৃপুষ্ঠের উপরে স্থাপন লিখুপ্তি যে "কলঙ্কের বোকা" ইহা কিছুতেই বুঝিতে পারা যায় না। যদি মাতা বা তাহার শিশু কিংবা ছুইজনের মিলিত ভবিত এমন কিছু থাকিত, ছবির রেখাপাতের মধ্যে কলঙ্কের রেখার কোন আভাস যদি পাওয়া যায়িত, তাহা হইলে চিত্রের প্রশংসা করি বা নাই করি চিত্রকরের নৈপুণ্যের প্রশংসা করিতে পারিতাম। চিত্রকরের মনের ভাব যদি চিত্রে আপনি ফুটিয়া ওঠে তবে সেই পানেই তাহার বাহ্যদ্বি, তাহা না হইয়া যদি চিত্রের বিষয় জ্ঞাপার অক্ষরে লিখিয়া দর্শককে বুঝাইয়া দিতে হয়, তবে সে চিত্রকরের অন্ত শোক প্রকাশ না করিয়া থাকা যায় না। যে কলঙ্ক অমনি বোকা গেল না "কলঙ্কের বোকা" লিখিয়া তাহা না বুঝাইলে চিত্র, চিত্রকর এবং ভারতী সকলেরই উপকার হইত। বর্তমান চিত্র দেখিয়া ও তাহার কয়টি জ্ঞাপার অক্ষর পড়িয়া মনে হয় যে ঐ কয়টি অক্ষর লিখিনার অন্তই চিত্রটি, সেওয়া হইয়াছে। আমাদের অসুমান সভ্য হইলে বড়ই পরিতাপের কথা!

সম্পাদিকা এই মাসে ভারতীয় ভার আত্মীয় ঐমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপর দ্রুত করিয়া বিনায় গ্রহণ করিয়াছেন। গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় সে ভারটা নিতে অক্ষম, সেই জন্য বন্ধু ঐসৌরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কেও বাছিয়া লইয়াছেন। এখন এই দুই বন্ধুই ভারতীয় সম্পাদক।

এ সংখ্যায় ঐহেমেন্দ্রকুমার রায় রূপ ঔপন্যাসিক লিওনিডাশ আক্টিভের একটি গল্প অঙ্কন করিয়াছেন। এক ভরলোক একটি রমণীকে বিবাহ করিতে চায়। রমণী তাহাতে স্বীকৃত না হওয়ায় সে তাহার উপর প্রতিশোধ লইতে চাহিল। তাহার এক বন্ধুকে সে দেখিতে পারিত না, তাহার সহিত বিবাহ হইলে রমণী খুব অল্পে কাল কাটাইবে মনে করিয়া সে দুইজনকে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করিল। যখন তাহাদের বিবাহজীবন খুব সুখকর ছিল, তখন সে প্রতিশোধ চেষ্টার দিকলভায় আকুল হইয়া এক দিন রমণীর স্বামীকে পাপলাখীর ভান করিয়া হত্যা করিল। অল্পবাদ মন্দ হয় নাই। লেখককে আমরা উৎসাহ দান করি।

ঐনবকুমার কবিরত্ন “টিকিমঙ্গল” লিখিয়াছেন। লেখক যিনিই হউন, তাঁহাকে হঠাৎ শিক্ষা হাড়িয়া শিক্ষকের আসনে লক্ষ্য এদান করিতে দেখিয়া আমরা হুঃশিত হইয়াছি। রচনায় কবিই নাই সংঘম নাই। লেখক হয় ত মনে করিতেছেন খুব একটা নাহাছুরি দেখানো হইতেছে। কিন্তু তাহার বন্ধুগণও তাঁহাকে যে অকালপক্ষ বলিবেন, তাহা আমরা তাঁহাকে মনে করাইয়া দিতেছি।

ঐব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বাবরের কল্পা গুলন্তননের কতকটা ইতিহাস সংগ্রহ করিয়াছেন। হমায়ুন-নামার রচয়িতার কথা ঐতিহাসিক মনেই নাই। আমাদের দেশের ইতিহাসের যে অংশগুলি এখনও অব্যক্তে পড়িয়া আছে তাহাদের আলোকিত করিবার চেষ্টা লেখকের আছে।

“অকূলে” একটি ছোট গল্প; লেখক ঐসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়। ছোট গল্প লেখকেরা আজকাল নতুন ষ্ট্রট খুঁজিয়া পান না বলিয়া হুঃশ করেন; কিন্তু এই লেখকটি এক পতিতা নারীর কাহিনী লিখিয়া রটে নতুনই আনিবার চেষ্টা করিয়াছেন। নারীটির প্রতি পাঠকের সম্বাদুর্ভূতি আকর্ষণ করাই বোধ হয় লেখকের উদ্দেশ্য; এই উদ্দেশ্য কার্যে পরিণত করিতে হইলে স্বামী যে নারীটির প্রতি কি দুর্য্যাস করিত তাহা পরিষ্কৃত করা উচিত ছিল। দেশের একটুও কৃতি যশম দ্বিত হইয়া, লেখকেরা যখন শক্তিহীন হইয়া বাহিরের ইঞ্জিয়ায় জ্বলিয়া উঠিতে আদিয়াই খামিয়া যান, অন্তরে প্রবেশ করিতে পারেন না, তখনই খুব, চুপি, ডাকাতি, ব্যভিচারিতা প্রভৃতি পঙ্কের প্রধান বর্ণনীয় বিষয় হইয়া পড়ায়। দুর্য্যাসক্রমে বাঙ্গালার যদি কখনও যে দিন আসে, আমাদের এই লেখক তখন প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারেন। রচনাটি পড়িলে ভাবেন, ভাষণ-এমন কিছুই পাওয়া যায় না, বাহাতে মানব-মনের উত্তরুতি একটুও উদ্ভূত হয়। বর্ণনাশব্দের এক একটি মূল, যন্ত্র লইয়া গল্প রচনা করিতে হইবে এবং সেই রচনার প্রতি পঙ্কতিতে ঐদুর্য্যাস এবং ঐহরি শ্রম করিতে হইবেই এমন কথা আমরা বলি না। দুই চারি জন ফরাসী লেখক চুপি ডাকাতি ব্যভি-

চারকে আখ্যানবদ্ধ করিয়া পর লিখিয়া এসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন বটে তবে সে সমাজ স্বতন্ত্র এবং সে সকল লেখকও অলৌকিক ক্ষমতালালী। রচনার মধ্যে শিল্প-চাতুর্য্য অদ্ভুতি ওপ যথেষ্ট পরিমাণে থাকিলে, আখ্যান বস্তুতে সীমাবদ্ধ অন্তরঙ্গতা ও অসীলতার অপরূপ কতক পরিমাণে মার্জনার হইতে পারে; সে রচনায় সেরূপ কোন গুণই নাই কেবল পাণপক্ষে পতনোন্মুখী রমণীর প্রতিপাদবিক্ষেপের বিস্তৃত বর্ণনায় রচনার একমাত্র প্রশংসাপত্র সেরূপ রচনা সাহিত্যে স্থান পাওয়া অতিশয় অস্বাভাবিক। নূতন সম্পাদকের হাতে আসিয়াই ভারতী মূর্খগণের ‘কলঙ্কের বোকা’ বহন করিয়াছেন, ভিতরেও তাঁহার সে বোকা যখন গুরুতর হইয়া গাঁড়াইয়াছে, তখন এই সহযোগিনীর অল্প শোক-আকাশের দিন বড় দূরে নয় বলিয়া স্ফুটিত হইয়াছে।

ভারতবর্ষ, বৈশাখ—

“যোগ্য না যোগ্য” ঐশ্বর্য্যনাথ রায়চৌধুরীর কবিতা প্রাঞ্জল, তেজঃসম্পন্ন। মহামতি গোপেন্দ্রের উদ্দেশে কবি ভারতবর্ষের প্রাণের সুরে বলিতেছেন—

যুম নয়—যুম নয়—হে ব্রাহ্মণ! এ যে অপরাধ!

অক্ষয় ক’রে যার,—পুনরায় শ্রীত-অবশেষে

তরুনে সাজায় আদি পন্থের অতিরাম-বেশে;—

মৃত্যুর মঙ্গল-ঘটে জীবনের মৃত লক্ষীবন!

সকল জিনিষকে এমন কি ভূগণকেও মঙ্গলরূপে গ্রহণ করিবার ক্ষমতা এ রচনায় দেখিতে পাউ।

“এই যে ভারতবাসী ক্রেটি কঠে এক হাংকায়

মহাস্তমিয়ার বীজ রেপাচ্ছে না এই বীরপুত্র!”

কবিতাটি আরও একটু ছোট হইলে অংশের মধ্যে উপযুক্ত সমতার অভাব ঘটিত না।

ঐদোগীন্দ্রনাথ সমাদর নালান্দার বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে কয়েকটি কথা লিপিত্ব করিয়াছে, দু একটি বৌদ্ধ মূর্তির ফটোও প্রকাশিত হইয়াছে। রচনায় কতটুকু জিনিস আছে, ইতিহাসের পাঠক তাহা বাড়িয়া লইবেন সাহিত্য হিসাবে ইহার মূল্য কম।

ঐতিহ্যগোপাল চট্টোপাধ্যায়ের “সার্থকতা” কবিতাটিতে যথার্থ আছে। ভাবও আছে তবে ভাব প্রকাশ করিবার মৈশূর্য্য নাই। অনর্থক শব্দ-প্রয়োগে অনেক স্থলে তাহা অস্পষ্ট হইয়াছে। ঐন্দ্রিকলাল রায় পঠিত বালকৃষ্ণ ভট্টের বংশ, শিক্ষা, গৃহবর্ষ, সাহিত্য-সেবা, মৃত ও চরিত্রের বিবরণ লিখিয়াছেন। হিন্দী সাহিত্য ও সাহিত্যিকের কথা লিপিবদ্ধ করিয়া ভারতবর্ষ বঙ্গভাষার একটা অভাব মিটাইতে চেষ্টা করিতেছেন সে বিষয় সন্দেহ নাই।” ভূসেব বাবু ও ছেলেরের শিক্ষা” এবং একটি আমরা পূর্বে কোন সময়ে উল্লেখ করিগামি। এই প্রবন্ধে শিক্ষকরূপী ভূসেবের একটি প্রাঞ্জল চিত্র পাওয়া যায়। রচনা স্থানে স্থানে সংক্ষিপ্ত হওয়া আবশ্যিক। “ঐন্দ্রিয়প্রাণ গুণের বাল্যলার ইতিহাসের ভাষ্যংশে টাঙ্গাইল উপবিভাগের ইতিহাস সংগ্রহ করিয়াছেন। ঐন্দ্রিয়প্রাণ গোমের “মধুসূক্তিতে কবির সম্বন্ধে অনেক তিত্তাকর্ষক কাহিনী লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

ঐকালিদাস মল্লিক “পীতাম্বরের আধ্যাত্মিক বাণ্য” লিখিয়াছেন। প্রকৃতির সকল

নিয়মের শ্রেণে সৃষ্টি ও কর্মের অভ্যাসের যে নিয়মের প্রতিবিম্ব দেখিতে পাওয়া যায় তাহা আধ্যাত্মিক । ঈশ্বর্য্য পারদর্শী কোন বিজ্ঞ গাছকার যদি একটি সুচিস্তিত উপক্ৰান্ত রচনা করেন তাহার মধ্যে সজ্ঞানে অথবা অজ্ঞানে তিনি যে তত্ত্ব বিধাস করেন তাহার ভাণ থাকিয়া গাইতে পারে । সুতরাং লেখকের বাধ্য রস রচনা বলিয়া উড়াইয়া দিবার যোগ্য নয় । স্থানে স্থানে কষ্ট কল্পনা অবলম্বন করিয়াও লেখক যাহা লিখিয়াছেন তাহা অসুখবিশেষের জীবন ।

ঐশ্বর্য্যনাথ তর্কভূষণ ঐশ্চর্য্য দেব ও হরিশাসের কাহিনী উল্লেখ করিয়া দেখাইয়াছেন ঐশ্চর্য্যের ভিত্তি বজ্রের চেয়েও কঠোর কুহুমের চেয়েও কোমল ছিল ! রচনা ভূষণা । ঐশ্বর্য্যমোহন স্ক্রবটীর "মহতের আকিঞ্চন" শীর্ষক কবিতায় ভক্তের মহত্ব চুপ্‌বেল রূপমালা চইয়াছে ।

এবার ভারতবর্ষ্য্য অবজ্ঞা-বৈচিত্র্য্য ও সারবান রচনায় মাসিক সাহিত্যে উজ্জ্বল অবিকার করিয়াছে ।

সাহিত্য সমাচার ।

ঐযুক্ত রাগালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের নব প্রকাশিত উপক্ৰান্ত "লশাঙ্ক" মারাটী ভাষায় অনুবাদ হইতেছে ।

ঐযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগচীর একখানি কাব্যগ্রন্থ শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে ।

ঐযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের একখানি কাব্যগ্রন্থ শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে ।

বর্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ ঐযুক্ত বিজয়চন্দ্র মহতাবের যুরোপ-ভ্রমণ ১ম খণ্ড পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে ।

ঐযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের উপক্ৰান্ত 'রত্নদীপ' যাহা ধারাবাহিক-ভাবে মানসীতে প্রকাশিত হইয়াছিল, উহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইতেছে । পুস্তক যন্ত্রণ ।

ঐযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'বোড়শী' ও 'গল্পাঞ্জলি'র নূতন সংস্করণ শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে ।

মানসী--



নিদ্রা-দাহ

!

Anil Chandra Gupta.
43 Chashmalah Street,
CALCUTTA.

মানসী

৭ম বর্ষ
১ম খণ্ড

আষাঢ় ১৩২২ সাল

১ম খণ্ড
৫ম সংখ্যা।

প্রেমের পরশ

ও তুবন
আমি যতক্ষণ
তোমারে না বেসেছি
ততক্ষণ তব আলো
গুঁড়ে গুঁড়ে পায় নাট তার সব পল।
ততক্ষণ
নিখিল গগন
চাতে নিয়ে দীপ তার শব্দে শব্দে ছিল পথ চেয়ে।

মোর প্রেম এল গান
কি যে হল কনোকানি
দিল সে তোমার গলে আপন গলার মালাগানি।
মুগ্ধচক্ষে ভেসে
তোমারে সে
গোপনে দিয়েছে কিছু যা তোমার গোপন সদয়ে
ভাবার মালায় মাঝে চিরদিন রবে গাথা হয়ে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩ বিজেন্দ্রলাল

মেঘলেশটীন স্বচ্ছনীলাবর চইতে অকস্মাৎ অশনিসম্পাত চইলে যেমন সর্কতোভাবে অভিকৃত চইয়া পড়িতে হয়, আজ চই বৎসর পূর্বে এই দিনের এমনি সময় স্বর্গীয় বিজেন্দ্রলালের মারাত্মক ভীষণ পীড়ার সংবাদ বিনামেঘে বজ্রাঘাতের মতই এই মহানগরীর সাহিত্যিক-সম্প্রদায়কে নিরুপায়ভাবে হুঃখাভিভূত করিয়াছিল। স্বহৃদয় বিজেন্দ্রলাল তাঁহার নিজের একটি রচনার ভ্রম সংশোধন করিতেছিলেন, সন্ধ্যার প্রাকালে তিনি অসাধা অপম্মার রোগে অকস্মাৎ আক্রান্ত হন; রোগের পূর্বরূপে কিঞ্চিৎ অসুস্থ বোধ করার তিনি পুত্রের নাম ধরিয়া একবার তাহাকে ডাকিয়াছিলেন,—সেই তাঁহার কণ্ঠোচ্চারিত শেষবাকী! যে কণ্ঠের মধুর সঙ্গীতে তাঁহার বাকবসন্তায় চিরমুগ্ধ ছিল, যে কণ্ঠের মধুরালাপ একবার শুনিলে শ্রোতামাত্রই প্রীত হইত, যে কণ্ঠ হইতে রক্তরস আদর-আপ্যায়ন নিষ্করের স্বচ্ছধারার মত অব্যাহতভাবে অবিরাম করিয়া পড়িয়া তাঁহার চতুর্দিকে নিয়ত এক আনন্দ-বেষ্টনের সৃজন করিয়া রাখিত, সে কণ্ঠ সেইদিন চিরদিনের জন্য স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে! সে মধুরকণ্ঠ “বঙ্গ আমার জননী আমার” বলিয়া দেশ-জনমকে অন্তরের অন্তস্তল হইতে আর ডাকিবে না। চন্দ্রশার গভীর পঙ্ক হইতে উদ্ধার করিবার জন্য “মায়াব আমার নাহি ত মেঘ” বলিয়া সে কণ্ঠ পুরুষোচিত স্পর্শ আর প্রকাশ করিবে না, “মুরজমস্ত্রে”র তাললয়ের সহিত নিমাই কণ্ঠে যেখানে “রঘুনি” “জ্ঞানের বিধান” দিয়া নিখিলার গর্গল খর্ব করিয়াছিল, রাজকীর প্রেমে ননের মালিখ্য ধোত করিয়া চণ্ডীদাস যেখানে প্রেমসঙ্গীতের বলে বিজ্ঞাপতির বিজ্ঞাকে হীনপ্রভ করিয়া দিয়াছিল, সে সকল পূর্বগোরব স্মরণ করিয়া ও করাইয়া যাঁহার কণ্ঠ অপূর্ব গীতলহরীর তালমুচ্ছনায় মুগ্ধিত দেশের চৈতন্য সম্পাদনের চেষ্টায় নিয়ত ব্যাকুল ছিল, তিনি আজ লোকান্তরপ্রাপ্ত। পতিতোদ্ধারিণী জাহ্নবীকে যিনি “বরিশ শান্তি মম শরিত প্রাণে, বরিশ স্তম্ভি মম নয়নে” বলিয়া ডাকিয়া-ছিলেন, তলুতনয়া তাঁহার শরিত প্রাণে চিরশান্তির বিধান করিয়াছেন, তাঁহার নয়নে চিরস্তম্ভি দান করিয়া সমস্ত হুঃখদমনজালা নির্মূলা করিয়া দিয়াছেন। “এই দেশেতে জন্ম যেন এই দেশেতেই মরি” বলিয়া যিনি কায়-মনোবাক্যে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, বিশ্ববিধাতার মহিমায় সিংহাসনতলে সে প্রার্থনা পূর্ত্তিলাভে। বিজেন্দ্র আজ আর নাই, তাঁহার জীবন-স্বর্ণা সমাধা-

গগনে না পহঁ ছিভেই অস্তমিতরীর পরপারে চলিয়া গিয়াছে, জামাদের নয়নের অন্তরালে কোন্ অজ্ঞাত লোকে তাঁহার আজ বসতি হইয়াছে, তাহা সেই লোকেবরই জানেন; জীবনের যাহা কিছু অপূর্ণতা, বার্থতা, নিফলতার বেদনা তাঁহার ছিল, আজ একান্তভাবে কায়মনে প্রার্থনা করিতেছি সে সমস্তই বিদূরিত হইয়া যেন তিনি নবজীবনের নবীনানন্দে চিরানন্দময়ের সান্নিধ্যলাভের চিরসার্থকতার অধিকারী হন। যে যায় তাহার তো নিঃশুষ্টি হইয়াই যায়, যত কিছু হৃৎপি দৈন্ত্র্য অভাবে অপূর্ণতার বার্থতার নিফল জীবনের ভার বহন আর তাহাকে করিতে হয় না, কিন্তু তাহার জন্ত শোক করিতে যাহারা থাকে তাহাদের হৃৎপি যে বড় হৃৎপি! বিশেষতঃ যে হৃৎপি দেশে ছই একটি মাত্র মহাপ্রাণীর দিকে চাহিয়া দেশের লোকে বহু আশা-আকাঙ্ক্ষায় বুক ভরিয়া রাখে, সেই ছই একজননের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে সেই আশার স্বর্ণসৌধ ধূলিশায়ী হইয়া গেলে এক মুহূর্ত্তে সমগ্র দেশ যে বড় নিঃশ্ব, বড় নিঃসহায় হইয়া পড়ে। বিজ্ঞানলালের অকস্মাৎ অন্তর্দানে বঙ্গের আট কোটি নরনারী ভেঁমনি এক নিমেষে অসহায় হইয়া পড়িয়াছে।

বাল্যজীবনেই বিজ্ঞানের প্রতিভার প্রথমালোক দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল। কৃষ্ণনগর স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়িবার সময় চতুর্দশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে তাঁহার ‘আর্য্যগাথা’ প্রথম ভাগ প্রকাশিত হয়। তারপর কিছুদিন বিজ্ঞান গ্রন্থ-রচনার মনোনিবেশের সময় পান নাই, পাঠ্যতত্ত্ব হইয়া একাগ্রমনে সর্বস্বতীর আরাধনায় নিগুণ হইতে হইয়াছে এবং সেই তপস্তার ফলে বাগ্বেদতার তপো-লভা করুণাধারার অজস্র সিঞ্জন তাঁহার মানসভূমি কত যে উর্ব্বর হইয়া উঠিয়া ছিল, তাহার নিদর্শন তাঁহার পরিণত বয়সের রচিত বহুবিধ কাব্য, নাটক, প্রহসন, সঙ্গীত, গীতিকাব্য, প্রবন্ধ, নিবন্ধে পাওয়া যায়। স্বকুমার কৈশোরে বিজ্ঞানলাল রচনা আরম্ভ করেন, আর পঞ্চাশৎ বৎসরের প্রৌঢ় সীমায় তাঁহার রচিত গ্রন্থের শতপারিপাট্য বিধান করিতে করিতে অকস্মাৎ হরারোগা ব্যাধি-গ্রস্ত হইয়া ছই ষষ্ঠীর মধ্যে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া দিব্যধামে দিব্যগতি লাভ করিয়াছেন। হাতের লেখনী হাতেই রহিয়া গেল, মনোমননের প্রস্তুত কুসুমাজলি বাগী-পদারবিলে দিতে দিতেই তাঁহার পার্থিব নয়নের নন্দন নিমেষ-পাত হইয়া গিয়াছে, উত্তান উজাড় করিয়া সবগুলি সুল সর্বস্বতীর রাতুল চরণে নিঃশেষে দিবার অবসরও তাঁহার হইল না—তাবিলে মনে হয় তাঁহার জীবন-ব্যাপী ঐকান্তিক আরাধনায় স্ত্রীত হইয়া মানবের মানসবিহারিণী বীণাবাদন-পরায়ণা মানসী তাঁহার আত্মজীবন তন্ত্রকে মুষ্টিমতী হইয়া গগনপথে দর্শন দিয়া

ছিলেন, তাঁহার ধূম্যময় মধুসঙ্গীতে তুই হইয়া বাহু বাড়াইয়া একনিষ্ঠ ভক্তকে কোলে তুলিয়া আঁরা গিয়াছেন, বৃষ্টিবা এই হৃৎখময় ধরার কটকপথে আর তাঁহাকে বিচরণ করিতে না দিয়া তাঁহার মেহের পুতলীকে নন্দনের হরিচন্দন ছায়ায় তাঁহারি হস্তের বীণা বাজাইবার ভার দিয়া জীবনব্যাপী তপঃকৃচ্ছ্রতার চরমসাক্ষ্যের অধিকারী করিয়াছেন । রোগের যন্ত্রণা তাঁহাকে ভোগ করিতে চয় নাই, বহুবাক্যকে রোগশয্যায় সেবার ক্লেশ তিনি দেন নাই, আত্মীয়-স্বজনের উৎকর্ষায় কালাতিপাত করিবার অবসর হয় নাই, পরপারের আচ্ছাদন দূরগত বংশীরবের মত তাঁহার কাণে আসিয়া যেমন পঙ্ক ছিয়াছে, পারের নোকা ঘাটে আসিয়া যেমন লাগিয়াছে, অমনি তিনি তরী আরোহণ করিয়াছেন, পারের নাবিক বিনাকড়িতেই তাঁহাকে বৈতরণীর পরপারে লইয়া গিয়াছে ।

সর্বতোমুখী প্রতিভা পাইবার মত তপস্বী করিয়া অতি অল্প লোকই ইহলোকে জন্মগ্রহণ করেন ; তাহার অসাধারণ প্রতিভা অনন্তসাধারণ ধীশক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহারাও সকল বিষয়ে সমান মনোযোগ দিতে পারেন না, তাঁহাদের অপূর্ণ প্রতিভার রশ্মি সমস্ত বিষয়কে সমভাবে আলোকিত করে না, বিষয়বিশেষে তাঁহাদের অসামান্য মানসিক সম্পদ পরিপূর্ণ শোভা ও সৌন্দর্য্যে বিকসিত হইয়া উঠে । দ্বিজেন্দ্রলাল সর্বতোমুখী প্রতিভা লইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহার অনন্তসাধারণ ক্ষমতা, উজ্জ্বল প্রতিভা, অসামান্য শব্দসম্পদ যেমন তাঁহার ব্যঙ্গ রচনায়, হাসির গানে প্রকাশিত হইয়া আছে, এমন আর কোথাও কোন বিষয়ে হইতে পারে নাই ।

ব্যঙ্গভাষায় শুচি শুভ্র নির্মল হাস্যরসাত্মক রচনায় দ্বিজেন্দ্রলালের পূর্বে আর কেহ সকলকাম হইয়াছেন কিনা জানি না—দ্বিজেন্দ্রলালের হাস্য নিরাময়, নির্মল, শুভ্র এবং শৈশব-স্বলভ সারল্যে উজ্জ্বল ও মধুর । তাঁহার হাসির রচনায়, শিশুর সরলতা, প্রবীণের বিচার-বিবেচনা, তীক্ষ্ণবুদ্ধি সমালোচকের অদ্ভান্ত দৃষ্টি, জ্ঞানের কশাঘাত ও কল্পনার অশ্রু সবই ছিল । সমাজ ও সমাজের যথার্থ দোষ উদ্ঘাটন করিয়া যে সকল তীব্র বিজ্ঞপাত্মক ব্যঙ্গের রচনা তিনি করিতেন, তাহাতে উপরে হাসির আবরণ ছিল কিন্তু যৎসামান্য অন্তর্দৃষ্টি থাওয়ার আছে তিনিই বুঝিবেন যে, সে হাসিতে আচ্ছাদন করিয়া তিনি অন্তরের গভীরশোক গাহিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহার বিজ্ঞপের লক্ষ্যের সঙ্গে অঙ্গ মিলাইয়া তাঁহার বিজ্ঞপের তীক্ষ্ণবাণ নিজেও বুক পাতিয়া নিয়াছেন—আক্রান্তের সহিত আক্রমণকারীর এ অশ্রু বিসর্জন, এ সমবেদনা সাহিত্যজগতে তুলত সামগ্রী !

বিজেন্দ্রলালের সর্বতোমুখী প্রতিভার আলোক সাহিত্যে প্রায় সকল অংশেই পড়িয়াছিল কিন্তু হাসির গানই তাঁহাকে সার্থক সাহিত্যিক বলিয়া বঙ্গবাণীর ধ্বজ সেবক বলিয়া, তাঁহার যশঃপুষ্পের মনোমদ সৌরভ সর্বত্র ছড়াইয়া দিয়াছে। শেগ জীবনে অর্থাৎ তাঁহার অকস্মাৎ অকালমৃত্যুর পূর্বে তিনি কয়েকখানি ঐতিহাসিক নাটক রচনা করিয়া প্রভূত যশ অর্জন করিতে পারিয়াছিলেন। সে সমস্ত গ্রন্থের উপযুক্ত সমালোচনার কাল আজও আসিয়াছে কিনা বলাও কঠিন, তবে আজ এই প্রাক্কবাসরে সে সময় আসে নাই ইহা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি এবং বর্তমান বক্তার তত্পযোগী যোগ্যতা যে নাই তাহা বলাই বাহুল্য।

আবহমানকাল প্রচলিত প্রথায় তিনি নাটক রচনা করেন নাই, নাট্যকৌতুক পাত্র-পাত্রীর কথোপকথনের মধ্য দিয়া, তাহাদের স্বগত উক্তির ভিতর দিয়া, তিনি চরিত্র বিশ্লেষণের চেষ্টা করিয়াছেন, একথা তিনি তাঁহার রচিত কোন কোন নাটকের মুখপত্রে স্বয়ংই বলিয়া গিয়াছেন; কতদূর কৃতকার্য হইয়াছেন তাহার বিচার-বিবেচনা ভবিষ্যৎ সমালোচকেরা করিবেন, আমি তাহার সম্পূর্ণ অযোগ্য। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ সেকেন্দর শাহ ভারত আক্রমণের কাল হইতে ঔরঙ্গজেব বাদশাহের সময় পর্যন্ত কতকগুলি ঐতিহাসিক ঘটনাকে মূল করিয়া তাহার সঙ্গে অপূর্ণ করুণা মিশাইয়া তিনি তাঁহার ঐতিহাসিক নাটকগুলির স্বজন করিয়াছেন। ঐ সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার সময়ে স্বর্গীয় বিজেন্দ্রলালের হৃদয়ে জাতমূল স্বদেশ-প্রীতির উজ্জল চিত্র আমার মানস-নয়নে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিত, অধঃপতিত দেশবাসীর দুর্দশায় তাঁহার অকপট অশ্রু বিসর্জন, তাহাদের চরিত্রের সংস্কারকল্পে কবির একান্ত আগ্রহ ও বিপুল ব্যাঘাত, তাঁহার রচনায় কোন দোষ থাকিলেও তাহা আমার চক্ষুর উপর হইতে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করিয়া দিত, দেশ-জননীর একান্ত ভক্তিপরায়ণ ভক্ত কবির নিকটে আমার মন্তক স্বতঃই অবনত হইয়া পড়িত।

দেশের আপামর সাধারণের মত তাঁহাকেও অর্থোপার্জনের জন্ত আদৌ স্বীকার করিতে হইয়াছিল, কিন্তু সে আদৌ তাঁহাকে মহন্যয়ের উচ্চ স্থান হইতে অধঃপতিত করিতে পারে নাই, আজীবন তিনি আত্মসম্মান রক্ষা করিয়াই তাঁহার পদোচ্চিৎ কর্তব্য প্রতিপালন করিয়া গিয়াছেন। বিজেন্দ্রলালের বন্ধ বলিয়া তাহাদের গৌরব করিবার সৌভাগ্য আছে, তাঁহারা ইজ্ঞানে স্বর্গগত করির হৃদয়ে বহুপ্রীতি কতখানি স্থান অধিকার করিয়াছিল,

আপনগত বন্ধুর উদ্ধারার্থ তাঁহার যেমন অকরণীয় কিছুই ছিল না, যথার্থ বন্ধুর নিকট নিরুত্তিমান আশ্রয়নিবেদনেও তাঁহার সমকক্ষ কেহ ছিলেন বলিয়া আমি জানি না। তাঁহার পরিচ্ছদের পারিপাটা আমি কখনও দেখি নাই, বিজেঞ্জলালের গতিবিধি দেখিলে অপরিচিত ব্যক্তি তাঁহাকে প্রাচীন কলের ত্রাণ-পণ্ডিত বলিয়া বিবেচনা করিত্ত্ব।

বিজেঞ্জলালের মাধুর্য্যময় কণ্ঠস্বরের কথা পূর্বে বলিয়াছি, তিনি সুগায়ক ছিলেন; এই সম্পদ তাঁহার স্বর্গীয় পিতা স্বনামধন্য দেওয়ান কাষ্টিকেশ্বর চন্দ্র রায়ের দান। ঐকাষ্টিকচন্দ্র সুকণ্ঠ ছিলেন, তাঁহার মনোহর কণ্ঠের সঙ্গীত যে শুনিয়াছে সেই মুগ্ধ হইয়াছে—বিজেঞ্জলালের সঙ্গীত-পারদর্শিতা তাঁহার পিতার পরিত্যক্ত সম্পত্তিরূপে উত্তরাধিকারস্বত্বে তিনি পাইয়াছিলেন। বিজেঞ্জলের বাগ-সঙ্গীত অস্বাভিক পরিমাণে ইংরাজি Comic রচনার অনুল্লকরণ, কিন্তু অনুল্লকরণ হইয়াও প্রতিভাশালী কবির চক্ষে উহা স্বকীয় নিজস্ব সম্পদই হইয়া উঠিয়াছে, ইংরাজির অনুল্লকরণে রচিত সঙ্গীতে তিনি বাগলা সুর বড় নিপুণভাবে যোজনা করিয়াছেন—যেন বিলাতি ললনাকে চোলাকলে সমাবৃত করিয়া বস্ত্রের পরীক্ষিতেনে কল্যাণী গৃহলক্ষ্মীরূপে সংসারধর্ম্মে নিয়োগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

বিজেঞ্জলাল শিশুর মত সরল ছিলেন; মিথ্যা, চাটুবাদ, চাটুর্গা, ছলনা তাঁহার স্বভাববিরুদ্ধ ছিল; এই সকল দোষ তিনি যেখানে দেখিয়াছেন খড়গ-হস্ত হইয়া তাঁহার নিবারণ-করে প্রাণপণ করিয়াছেন। অনাচারী সমাজের বাহ্য আড়ম্বরশীল ভণ্ডকে মিথ্যার সেবা করিতে দেখিলে তাঁহার পৃষ্ঠে নির্দম কশাঘাত করিতে তাঁহার বিধা ছিল না; সত্যের সেবায় সর্বত্র জয়লাভ হয়, সত্যকে আশ্রয় করিলে আকাজিক লাভে জয় ও জীবন ধন হয় একথা তিনি সর্বোচ্ছ বিশ্বাস করিতেন এবং সকলকে বিশ্বাস করাইতে স্বতঃপরতঃ চেষ্টার তাঁহার ক্রটি ছিল না।

বঙ্গসাহিত্যের সকল অংশে, প্রায় সর্বত্রই তাঁহার প্রতিভার আলোক বিকীরিত হইয়া অলম্বিতর সাহিত্য-সৌধের সকলগুলি কক্ষই আলোকিত করিয়াছে এবং সকলগুলি রচনার মধ্য দিয়া বিজেঞ্জলালের দেশ-জননী প্রাতি অচলা তত্ত্ব দেশবাসীদিগের জন্ত অকুজিম শ্রীতি প্রকাশিত হইয়া কবিবরের অনাবৃত-অস্তরটিকে লোক-লোচনের সম্মুখে আনিয়া দাড় করাইয়াছে। “বঙ্গ আমার জননী আমার” বলিয়া এমন করিয়া আর কে গাহিয়াছে তাহা ত

জানি না! “সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি!” বলিয়া জন্মের অশ্রুতলগত তক্তি-মন্ডাকিনীর উজ্জ্বলিত জলতরঙ্গে দেশ-জন্যের রাতুল চরণ-পানি কে এমন প্রক্ষালিত করিয়া দিয়াছে বলিতে পারি না। “অতুলন চির বিমোচন তুমি স্বল্পের সুরধাম, শত নিৰ্ঝর-ঝর-ঝকারিত ‘অবিরাম’ বলিয়া দেশজন্যের অতুলন শোভা-মল্লের সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ-মন চটয়া কে আর! এমন করিয়া সকল অস্তর দিয়া গাহিয়া উঠিয়াছে জানি না ত!

হে দারিদ্র্য-পীড়িত দেশের দরিদ্র-সাহিত্যের আনন্দ ভ্রমাল, ‘চাণক্যের উচ্চারিত মহাসিদ্ধ’ পায় যাইবার ইচ্ছা যে তোমারই জগত ইচ্ছা ছিল তাহা কি আমরা জানি! “পতিভেক্ষারিণী গঙ্গা” বলিয়া জন্ম-তনয়াকে এত শীঘ্র যে শক্তি প্রাণে শক্তি বর্ষণ করিতে ডাকিয়াছিলে সে কথা যে আমাদের স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। রক্তকুমার মোরাদের ইন্দ্রিয়-বিমোচনে নিযুক্ত নৃত্য-পরায়ণা নর্তকীর মুখের “এমন চাদের আলো মরি যদি সেও ভালো” সঙ্গীত যে তোমারই অস্তরাত্মার ক্লেশটীন যুত্যাচনা একথা কেহ ত জানিত না। ‘সুরধাম’ ত্যাগ করিয়া তুমি ত আনন্দনামে চলিয়া গিয়াছ, এ নিরানন্দ বেশভূষা শূন্য ফোড় লইয়া আজ কেমন করিয়া বিলাপ করিতেছে তাহা নেখিবার ত কেহ নাই। যে গতি সকলেরই গতি, যে পরিণতি সকলেরই পরিণতি, তাহার জন্ত পেন, আক্ষেপ করিয়া ফল নাই, তবে—

“এ যেন কোড়কনাটো প্রথমাঙ্কে যবনিকা টানি’

নিবাইল দীপালোক, ডনাইল অস্তিমের বাণী!

রঙ্গরসে সারা বঙ্গ মাতাইয়া যেন অর্ধক্ষেপে—

বঙ্গ-বৃন্দাবন-চন্দ্র আরোহিলা অক্ষুরের রথে!”

বলিয়া কবি যেমন রোদন করিয়াছেন আজ তাই বলিয়া আমাদেরও চীৎকার করিয়া কাঁদিতে ইচ্ছা হয় যে!

শ্রীজগদিস্তনাথ রায়

প্রণাম

স্বাকার ভিড় চ'তে একধারে সরে',
 চুপচাপ রয়েছি মাথা নীচু করে',
 করঘোড়ে কোণটিতে মুখে নাই কথা—
 নিতান্ত বাণিত যেন—কি তোর ব্যর্থতা,
 'রে মোর কুণ্ঠিত ভূতা, কিবা তোর নাম ?
 সে কহিল মুহূর্ত্তে, আমি সে 'প্রণাম' !
 দেবতা কহিল পুনঃ—মোর রাজ্যমাঝে
 সহস্র সেবক ফিরে নিতা নানা কাছে
 যার যাচা সাধা-সাধ ; তোর কিসে মন ?
 'শুধু নমস্কার আর পূজা নিবেদন,
 আর কিছু নাহি জানি' সে কহিল কাদি',
 গুনিয়া দেবতা তারে সঙ্গে নিল বাধি'
 পথে শুধাইল হেসে—ভক্ত, কোথা পাম ?
 চরণ ছুঁয়ে সে শুধু করিল প্রণাম ।

শ্রীগভীজমোচন বাগচী

তত্ত্ব ও সাহিত্য

একজনের বা কোন বিশিষ্ট শ্রেণীর সামগ্রী লইয়া সাহিত্য হয় না । আমার স্বথ-ভোগ, আশা-নিরাশার সহিত অস্ত্রের সম্পর্ক নিশ্চয়ই থাকিবে এমন কথা না বলাই উচিত ; তবে কখন-কখন আমার যুগ দিয়া বিশ্বের স্বথ-ভোগ প্রকাশ পায়, আমার বিরত বিশ্বের বিরতকে জাগাইয়া তোলে, আমার আনন্দে বিশ্বমানবের আনন্দ ধ্বনিত হয়, তখনই আমার স্বথ-ভোগ, বিরত-আনন্দ সাহিত্যের জিনিস । টেনিসনের ইন্স মেমোরিয়ন্স যদি ব্যক্তিগত বিলাপ চইত, তাহা হইলে টেনিসন্‌ও হয়ত তাঁহার চ' একজন বন্ধু তাঁহা উপভোগ করিতে পারিতেন* ; কিন্তু এস্থানি শুধু টেনিসনের নয়, সমগ্র বিশ্বের বন্ধু-বিরত-ভোগ ও তাঁহার সাধনার কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছে।

মানব-সংস্কৃতির সচিহ্ন তাহার সম্পর্ক নাই, তাহাকে সাহিত্য বলিতে পারি না। গণিতশাস্ত্র একজনের জিনিস নয়, অনেকের ইচ্ছার সচিহ্ন সম্পর্ক রাখিতে পারে, তবুও ইহাকে সাহিত্য বলিতে পারা যায় না, কেননা গণিতশাস্ত্রের সহিত সকলের সম্পর্ক নাই। আইন, জ্যোতিষ, বিজ্ঞান, মর্শন প্রভৃতির সম্বন্ধে ঐ এক কপাই প্রযোজ্য।

প্রকৃত মানব-জীবন হইয়াই সাহিত্য। মানব-জীবনের সামগ্রী সকলের চইতে পারে। এই যে জীবনের নির্মল নিষ্পন্ন জগন্নি জগতের উপর প্রসারিত রহিয়াছে, তাহাতে প্রতিবিম্বিত হয় না এমন জিনিসের নাম করা সহজ নয়। আকাশ বাতাস, গ্রহ-উপগ্রহ, কুসুম-কানন, নদ-নদী, মহান মটীকৃত হইতে তুচ্ছ তৃণাংশ পর্যন্ত তাহার বৃক রেখাপাত করিয়া যায়।

এই যে বিশ্ব-প্রকৃতি—নাহুৎ শুধু ইহাকে গ্রহণ করিয়াই তৃপ্ত হয় না। প্রকৃতি তাহার সচর, তাহার সুখ-দুঃখ, চর্চ-বিবাদ, তাহার একমাত্র গতি। পৃথিবীতে ভ্রমিষ্ট হইয়াই সে সর্বত্র দিয়া ইচ্ছাকেই আলিঙ্গন করে, আবার শেষ মুহূর্ত্তে তাহার পরম প্রিয় দেহটিকে ইহারই কোলে সঁপিয়া দেয়। প্রকৃতি তাহার “গৃহিণী সচিব: সখী মিত্র: প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ,” প্রকৃতি তাহার জীবন-দেবতা, তাহার মানস-সুন্দরী, প্রকৃতি তাহার বালা-কল্পদ্রুম, যৌবনের সাথী, বার্দ্ধক্যের সাহচর্য, মরণের শেষশয্যা।

আর এক দিক দিয়া ভাবিলে দেখা যায় প্রকৃতি তাহার পরম মিত্র, পরম শত্রু। আজীবন তাহার সহিত প্রণয়, বান্ধবতা, আজীবন তাহার সচিহ্ন কলহ, বিরোধ।

নাহুৎ জন্মগ্রহণ করিল, শুধু রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ, জন্মের পরমুহূর্ত্ত হইতেই তাহার অন্তরে একটা আকুলতা, একটা বেদনার হৃদ্যপাত করিয়া দিল; প্রকৃতি এক দিক হইতে তাহার অভাব মোচনে সম্বৃত্ত হইল, কিন্তু আর এক দিক হইতে তাহার বিরুদ্ধে শাণিত থুঁতা উত্তোলন করিতে বিশ্ব্রুত হইল না। আকাশ, বাতাস, ফুল, ফল উপহারপাত্র পরিপূর্ণ করিয়া তাহার সম্মুখে অযাচিতভাবে আসিয়া পাড়াইল, কিন্তু অনাবরণ, শৈতা, বিলাসিতা ও রোগের কবল হইতে তাহাকে মুক্ত রাখিল না। প্রকৃতির দান গ্রহণ করিতেই হইবে, নচেৎ জীবন ধারণ অসম্ভব, তবে সেই দান গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে একটা সংগামেরও আয়োজন করিতে হইবে; এ সংগামের অন্ত নাই, দিব্যরাজ্য নিরবচ্ছিন্ন রণধর্মের মধ্যে একদিন নির্ধিমেষ জ্যোতিঃহীন নয়ন-

সম্মুখে যত্নের দীপদীপ্তিতে সেই সংগ্রামের মীমাংসা শেষ হইয়া গাইবে,—
এত কথা ভাল করিয়া না ভাবিয়াই মানুষ অন্তরের সন্ধানে গাঢ় আরম্ভ
করিল ।

আনন্দ সান্ত্ত নয়, অনন্ত । অন্তরের আনন্দ মানুষকে অনন্তের পথে
প্রেরণ করিল । দৃষ্টে আর সে মুগ্ধ হয় না, দৃষ্টের মধ্যে অনন্তের পানে
তাহার প্রাণ ছুটিয়া যায়, গন্ধের মধ্যে গন্ধাতীতের জ্ঞান সে ব্যাকুল হইয়া
পড়ে, স্পর্শের মধ্যে অস্পর্শ, শব্দের মধ্যে শব্দাতীত তাহাকে মাতাইয়া তোলে,
রস তাহাকে অরসের আশ্বাস আনিয়া দেয় ।

মান্যের নিবিড় অন্ধকার, ইঞ্জিয়ার রসহীন বিষয়, জড়প্রকৃতির তনোময়
নিদারণ নিষ্পেষণের মধ্যে কবে কোন্ মানবপ্রাণ সহসা জাগিয়া উঠিয়া
প্রভাতের সুরে “আনন্দাত্মক পথিমণি তুতানি জাগন্তে” এই মন্ত্র উচ্চারণ
করিয়া সমাগরা ধরিত্রীর একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত আশার বীজ
রোপণ করিয়াছিল বলিতে পারি না, তবে সেই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া আমরা
চুত্থকে ভগবানের দান বলিয়া গ্রহণ করিতে শিখিয়াছি, মান্যের মোহ প্রণয়ের
বন্ধনে পরিণত হইয়াছে, সূর্য্য-চন্দ্রে, গ্রহ উপগ্রহে, নদ-নদী, শৈল কাননে,
পর্য্যন্ত-সাগরে দেবকি অশ্রুভব করিয়াছি, বায়ু ভগত তাহার ইঞ্জিয়-গ্রাহ্য রূপের
অন্তরালে এক অনন্ত প্রাণকে জাগৃত করিয়া আমাদের প্রাণকে আকর্ষণ
করিয়াছে ; আমরা কি এক আনন্দের সচেতন পরিবেষ্টনের মধ্যে একটা
সজ্জান স্বাতন্ত্র্য উপলব্ধি করিয়াছি ; এ স্বাতন্ত্র্য তোমার বা আমার ব্যক্তিগত
নয়, আমাদের ব্যক্তিত্বের ছাপ ইহাতে আছে, কিন্তু এ স্বাতন্ত্র্য মানব-জীবনের,
কেমনা মানব-জীবনের নব্যবিকাশের দ্বারাষ্ট ইহা অঙ্গপ্রাণিত ।

এই যে অন্তর্দৃষ্টি, এই যে বহিরাবরণের নিম্নে ইঞ্জিয়াতীতের অহুভূতি,
ইহা যে আমাদের আধ্যাত্মিকতার চরন শিখরে আনিয়া দিয়াছে, তাহা নয়,
তবে ইহা যে মানব-জীবনের চরন উন্নতির সোপান, সে বিষয়ে সন্দেহের কোন
কারণ আছে বলিয়া মনে হয় না । শুধু অন্ধ ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যকে অবলম্বন
করিয়া সান্ত্ত জড় প্রকৃতিকে অহুধাবন করা নয়, সজ্জান মহত্বজীবনের
অন্তর্নিহিত স্বাতন্ত্র্যকে অবলম্বন করিয়া অনন্ত জ্ঞানাত্মকতা প্রকৃতির অহুসরণ
করাই সাধারণের ধর্ম্ম । এই ধর্ম্মই মানুষকে প্রকৃতির শত্রুতার অন্তরালে
নিবিড় প্রণয়ের আশ্রয় দেখাইয়াছে, এই ধর্ম্মই মহত্ব-জীবনের স্থায়িত্বের
কারণ ।

এই ধর্ম মতে প্রথমতঃ আমরা প্রকৃতির মধ্যে একা গভীর তবের আভাস পাই, তার পর সেই তব আবার প্রকৃতির বর্ণে, গন্ধে, স্বাদে, শব্দে, স্পর্শে নিত্য বিকশিত হইয়া উঠে।

প্রতি জিনিসেরই দুটি দিক আছে—একটি তবের দিক, আর একটি প্রকাশের দিক। আনবিক আকর্ষণ (Molecular attraction) একটি তব, প্রস্তরখণ্ড তাহার প্রকাশ; “যতো দৃশ্যততো জয়ঃ” একটা তব; মহাভারতে তাহাই প্রকাশিত হইয়াছে; অভ্যাস কার্যকে সহজ করিয়া তোলে, এই তবটি আমাদের কার্যেই পরিস্ফুট হয়। এইরূপ অসংখ্য তবের সমন্বয় যদি কোন বিপুল মহান্ তবে সাধিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে এট দিবাট বিখ-প্রকৃতি দিন দিন সেই তবকে প্রকাশ করিতেছে কথং আমরা নিঃসঙ্কোচে বঞ্চিত পারি।

প্রকৃতির মধ্যে যে তবের আভাস পাই, তাহা স্বাদী, নিত্য, সত্য, সারবান্; তবজ্ঞানীর নিকট তাহা স্নানর সরস হইতে পারে, কিন্তু নহস্য-জীবনের নিকট তাহা একরূপ নয়, মাধুর্য তাহার অতি কীর্ণ আভাস মাত্র পাইয়াছে, অনেকে তাহা বুঝিয়া ওঠা অসম্ভব মনে করিয়া তাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করিয়াছে। সুতরাং সেই তবটিকে স্নানর সরস অম্লতব করা তাহার পক্ষে হুঃসাধ্য।

আমরা রূপরসাদিতে পরিতৃপ্ত না হইয়া তাহাদের মধ্যে এই মহান্ তবের অতি কীর্ণ আভাসটুকু লাভ করিয়াছি; যতটুকু কীর্ণ আশা পাইয়াছি তাহার আভাস রঞ্জিত করিয়া বাহ্য প্রকৃতিতে আনন্দ লাভ করিতে চেষ্টা করিয়াছি; সে আনন্দে তৃপ্ত হইয়া কখনও আনন্দের পরিমাণ বর্দ্ধিত করিবার জন্ত তবের আলোক অধিক মাত্রায় গ্রহণ করিয়া আমাদের প্রাণ বাহ্য প্রকৃতিতে পূর্ক্যাপেক্ষা অধিক আনন্দ লাভে সক্ষম হইয়াছে। এইভাবে রূপ হইতে আরম্ভ করিয়া অরূপের আভাস পাইয়া আবার রূপে নূতন আলোক লাভ করিয়াছি। সে আলোক সময়ে যান হইয়া আবার অরূপকে উদ্বোধিত করিয়াছে, এই রূপ অপ্রতিভত গতির সঙ্গে সঙ্গে অসীম সসীমে, নিত্য অনিত্যে, জ্ঞান প্রকৃতিতে ধরা দিয়াছে, নীরস তব সৌন্দর্য্যে সরসতায় ভরিয়া উঠিয়াছে।

আমরা প্রকৃতি লইয়াই কারবার করি, তাহাকে ছাড়িলে আমাদের এক দণ্ডও চলে না। তবজ্ঞানীরাও প্রকৃতিকে বাদ দিতে বলেন না, কেমনা

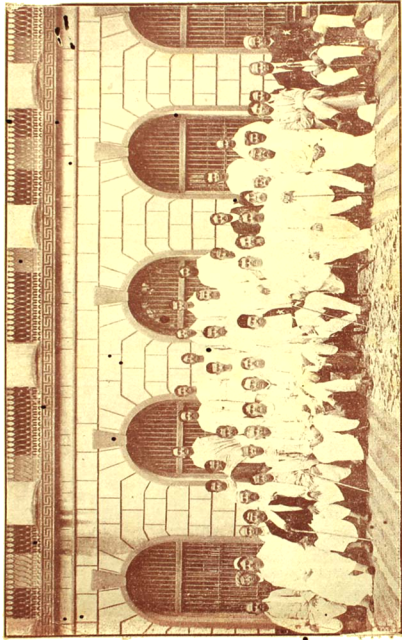
অনাথ প্রকৃতি ভিন্ন আশ্রয়জ্ঞানও অসম্ভব। জড়-প্রকৃতি নয়, জ্ঞানাত্মক প্রকৃতিই আমাদের ইহলোক পরলোক দু'য়েরই সিদ্ধি আনিয়া দিতে পারে।

তবুটি কি তাহা আমরা বলিতে পারি না, তাহাকে একটি হৃদে অথবা একটি এংগে লিপিবদ্ধ করা যায় না। যদি তাহা সৃষ্টিগ্ৰাহ্য হইত, তাহা হইলে মৃত্যু-জীবন বড় আনন্দের হইত না। তাহা অসীম, অব্যক্ত, সেই জগৎই কোন্ অরণ্যভীত যুগ হইতে মানুষ তাহার অধোগে ধাবমান, তাহার ঈশৎ আভাসে পুলকাক্ত হইয়া সে নিরন্তর অক্লান্তভাবে দুঃখদৈর্ঘ্যপীড়িত জীবন বহিয়া আনিতেছে, তাহাকে ধরিতে না পারিয়াও সে বিমুগ্ধ নয়, যেভাবে ছুটিয়া আসিতেছে, দীর্ঘ ভবিষ্যৎ ধরিয়া সেই ভাবেই ছুটিবে। এই তব জ্বলন্ত নয় বলিয়াই মানুষ দীর্ঘ গতির অস্ত্রে বাধাবন্ধনহীন অশেষ অশান্ত দীর্ঘতর দীর্ঘতর গতিকেই বিশ্রাম বলিয়া মানিয়া লইতে পারে।

এই-তব স্বপ্ন, অথচ অতি নিকটে ইহার আভাস পাই, সেই জগৎ ইহা নিরাশা আনিয়া দেয় না, ইহা মরীচিকার মত আমাদের উদ্ভ্রান্ত করিয়া তোলে না, কেননা ইহা আংশিকভাবে আমাদের করায়ত্ত; ইহার সহিত আমাদের সখা নাই, আহার-বিহারে, শয়ন-স্বপনে ইহার সাহচর্য্য আমরা অশুভব করি না বটে, কিন্তু ইহাকে আমরা ভালবাসি, ভক্তি করি, ইহা আছে বলিয়াই বিশ্বপ্রকৃতি আমাদের কাছে আদরণীয়, কেননা ইহাই প্রকৃতিকে ভালবাসিতে শিখাইয়াছে, ইহাই প্রকৃতিতে প্রাণ সঞ্চার করিয়াছে।

আকাশের নীলিমায়, সমুদ্রের গর্জনে, বর্ষাস্তের কুসুমসম্ভারে এই তবের বিকাশ দেখিতে পাই; রমণীর মুখে, শিশুর হাসে, মাতার স্নেহে এই তবই নিহিত আছে; ইহারই প্রেরণায় কালিদাস তপোবনে বিদগ্ধবিমুগ্ধ তাপস সমাজে শকুন্তলার অনিন্দ্যহন্দর চিরন্তন প্রতিমা সংসারের উপযোগী করিয়া বর্ণনা করিতে দ্বিধা করেন নাই; বিশ্বমাতৃকা গৌরীর কর্ণে ও চিন্তায় মানবী নাগিকার হাব-ভাব, আকার-ইঙ্গিত ও হৃদয়ের অথও পূত স্নেহধারা সিকন করিতে সে অকুণ্ঠিত; কোন পুরাতন নাটককার একটি পতিতা রমণীর হৃদয়ে অমৃত প্রণয়ের উৎসটিকে প্রকাশ করিয়া রমণীসমাজের উচ্চ সিংহাসনে তাহার আসন নিদেশ করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই; জয়দেবের কোমলকান্ত পদাবলী, বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের অমৃতময়ী কবিতা এই তবেরই বলে আজও বাঁচিয়া আছে।

মানুষ প্রকৃতির মধ্যে এই তবের ঘটুই আভাস পায় তাহাতেই সে



दक्षिण भारत में हिन्दू धर्म के प्रचार के लिए आये हुए

আপনাকে বেশ একটু নতুন ভাবে গড়িয়া তুলিতে পারে। এই তত্ত্ব তাহাকে অচেতনে চৈতন্য আনোপ করিয়া তাহার অন্তরের ভাবটিকে চানিয়া আনিতে সক্ষম করিয়াছে; ইহারই বলে আমরা নীচ জন্তুর প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করি; দিগন্তের সাকারকরাগে, নিদাঘের দিনাস্ত্রে, প্রভাতের অন্ধনিমায় প্রাণ মন তন্ময় চইয়া যায়; স্নেহের মধো বেদনা, বেদনার মধো আনন্দ, মৃতের মধো প্রাণ, প্রাণের মধো মরণ জাগ্রত হইয়া উঠে।

এই স্তব্ধই জীবনের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে সংবদ্ধ হইয়া যখন প্রকাশ পায় তখন মানুষকে সাহিত্য রচনায় প্রবৃত্ত করে। সাহিত্যিক সৌন্দর্যের তাণ্ডার অধিকার করিয়াছেন বলিয়া তত্ত্বজ্ঞানীদের উপহাস করেন করুন, তাহারাও যে একটা তত্ত্ব প্রচার করিতে বসিয়াছেন সে কথা অস্বীকার করিলে চলিবে না।

এই তত্ত্ব যখন মানুষের অমুভবযোগ্য পণ্ড তত্ত্ব প্রকাশ পায়, তখন বিজ্ঞান, দর্শন, নীতি, অর্থশাস্ত্র, দেহতত্ত্ব প্রভৃতি লিখিত হয়। তাহারা এক দিকে তত্ত্বের বিকাশ, আর এক দিকে তত্ত্বের সমষ্টি; স্মরণ্য তাহাদের নিঃসঙ্কেচে সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। তবে কখনও কখনও এই সব পণ্ড তত্ত্ব, এক জনের এক শ্রেণীর বা এক সম্প্রদায়ের সামগ্রী না হইয়া মনুষ্যজীবনের সহিত সম্পর্ক পাতাইয়া ফেলে, তখন সেই তত্ত্বগুলি সাহিত্যের অঙ্গীভূত হইয়া যায়।

সাহিত্য তত্ত্ব নহে, তত্ত্বের প্রকাশ সাহিত্যে; সাহিত্য মানবজীবনের সহিত সংশ্লিষ্ট; সেই জন্ত ইহার মধো মানুষ জীবনের ক্ষুধার পরিতৃপ্তি আশা করিতে পারে; সাহিত্য শুধু একটা কণিক আনন্দ বা অন্তঃসার বিহীন উপভোগের সামগ্রী নয়, কেন না তাহার মধো একটা মহান তত্ত্ব, একটা মহান সত্য বর্তমান; সাহিত্য নীরস নয়, কেন না ইহার মধো মানব জীবনের নিত্যরূপ সৌন্দর্য বর্তমান।

এই জন্ত মানুষের কাছে তত্ত্ব অপেক্ষা সাহিত্যই চিত্তাকর্ষক হইয়া পড়ে। তত্ত্ব তাহার কাছে নীরস বলিয়া বোধ হইতে পারে, কেন না তাহার জীবনের সহিত ইহার নিত্যসম্পর্ক নাই। কথাটির হ'একটি উদাহরণ দিতে হইবে। তত্ত্বজ্ঞানী বৃকলতাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন “অন্তঃসংজ্ঞা ভবন্তোতে অণু ক্রাঃসমঘিতাঃ।” অনেকে তাহা শুনিয়া, কিন্তু প্রাণ দিয়া অমুভব করিল না, কেন না কথটা তাহার জীবনের সহিত দৃঢ়সংশ্লিষ্ট থাকিতে অক্ষম।

কবি ঐ কথাটাই বলিল—এমন ভাবে বলিল যাহাতে সেটা মনুষ্যজীবনের কাছে অনাস্বীয় আ হইয়া মাহুষের অন্তরে একটা দীপ্তবর্ণের রেখা টানিয়া দিতে পারে, কবি বলিল—

পর্যাপ্তপুষ্পস্তবকস্তনাভাঃ

সূর্যপ্রবালেক্ষমনোহরাভাঃ ।

লতাবৃদ্ধান্তরবাহুপাবাপু

বিনম্রশাখাভূজবক্ষনানি ॥

তব্ধ বলিলেন “হেমস্তে শিশির পতিত হইয়াছে।” কবি সেই কথাটাই মাহুষের অর্থচঃমের সঙ্গে অবিক্রিয় রাখিয়া, তাহার প্রাণের ক্ষুধা মিটাইয়া একটা নূতন স্বরে বলিয়া উঠে—

• হেমস্তের শিশির প্রভাতে

• চল চল করে গ্রাম চুণীনদীতীরে।”

তব্ধজানী বিষবৃক্ষ রোপণ করিতে নিষেধ করিবেন; তাহার কথা, তাহার যুক্তিতর্ক অনেকে শুনিতে পারে, অনেকের নিকট তাহা নীরস; কিন্তু যে সাহিত্যাস্রষ্টা মনুষ্যজীবনের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত করিয়া বিষবৃক্ষকে সহজে সংবদ্ধিত করিয়াছেন, তাহার কলাগমের কাল পর্য্যন্ত যিনি সচকিত থাকিয়া নগ্ন্যসমাজের মধ্যে তাহার বিষময় ফল দেখাইতে একটুও যত্ন ও চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই, তিনি কল্পনার দ্বারা চালিত, শেষ পর্য্যন্ত তিনি তব্ধজের মত একটিও উপদেশ দেন নাই, তবুও তিনি রচনার আনন্দের মধ্যে নির্ঝাঁক মুখে উপভাসের ঘটনাপ্রবাহের ভিতর দিয়া যে অকপিত কথাটি প্রকাশ করিয়াছেন, মাহুষের প্রাণে তাহা ধ্বনিত হইয়াছে, হইতেছে, দীর্ঘ ভবিষ্যতেও সে ধ্বনির বিরাম হইবে না।

কখন-কখন তব্ধগুলিও সাহিত্যের অঙ্গ হইয়া দাঁড়ায়; তখন তাহার নীরস নিস্ত্রাণ হইয়া থাকে না; কথাগুলি তখন এমন কৌশলে উপযুক্ত বক্তার মুখে উপযুক্ত দেশকালে প্রযুক্ত হয় বাজতে তাহা অনায়াসে মাহুষের প্রাণস্পর্শ করিতে পারে।

কথাতাস্তং হৃদয়পনতং হৃদয়েকান্ততো বা

নীচৈর্গচ্ছুতাপরি চ দশা চক্রণেমিক্রমেণ ।

— এই তব্ধট বিদ্যুৎ-গতির মুখে প্রবাসে ভবিষ্যৎপ্রত্যাশিত মিলনের সম্ভাবনার অহুকুল হইয়া মানবমনকে আকর্ষণ করে, দেহীক্লম

স ক্ষত্রিয়স্থানসহঃ সত্যং য

শুংকামুর্কং কর্মসু যন্ত শক্তিঃ।

এই তথ্যকথাটি বক্তার মুখে উপগুরু দেশকালে সপ্রাণ হইয়া উঠিয়াছে, তাই মানবজীবনে ইহা যে অতি যত্ন আঘাত করিয়া যায় তাহা স্বীকার করা চলে না। সাংখ্য, বেদান্ত তথ্যকথায় পূর্ণ, কিন্তু গীতা স্রংখ্য বেদান্তকে সাহিত্যের মত করিয়া তুলিয়াছে, কেন না গীতা উপগুরু বক্তার মুখে উপগুরু দেশকালে কথিত হইয়া প্রাণহীন হইয়া পড়ে নাই; মানবের প্রাণে সাংখ্য, বেদান্ত না পারক, গীতা যে রেখাপাত করিবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

কখন-কখন তত্ত্বগুলি উপগুরু দেশকালে প্রগুরু না হইয়াও অন্তর্নিহিত সত্যের সৌন্দর্য্যে মানবমনকে আকর্ষণ করে। সংস্কৃত সাহিত্যে ইহাদের উদাহরণ বিস্তর দেখিতে পাওয়া যায়। “গুণাঃ পূজ্যস্থানং গুণিস্থং চ লিঙ্গং ন চ বয়ঃ” “বিকারহেতৌ সতি বিক্রিয়ন্তে যেষাং ন চেতাংসি তএব ধীরাঃ” এই সব কথা শুনিতেই তাহার নথো একটা সত্যের আলোক বিকশিত হইয়া আমাদের মুগ্ধ করে। তবে এ সব কথাগুলি উপগুরু দেশকালে প্রগুরু হইলে আরও হৃদয়, আরও চিত্তাকর্ষক হইয়া দাঁড়ায়।

শব্দে অলঙ্কারে রঞ্জিত করিয়া সাহিত্যশ্রেষ্ঠা সময়ে সময়ে তত্ত্বও একটা চিত্রস্থল মূলা দান করেন। ধানশীলের দানজনিত তনিমা শ্রেষ্ঠ ও হৃদয় এই কথাটিকে কবি কতকগুলি সহজ হৃদয় চিত্রে ফুটাইয়া তুলিয়া তাহাকে সরস জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছেন—

মণিঃ শ্যামোন্নীড়ঃ সমরবিজয়ী হেতিদলিতো

নদক্ষীণো নাগঃ শরদি সরিদাশ্রানপুলিনা।

কলাশেষশঙ্করঃ হরতম্বুদিতা বালবনিতা

তনিমা শোভন্তে গণিতবিভবাংগপিম্ব নৃপাঃ ॥

দেশে বিজ্ঞান নাই, দর্শন নাই, অর্থশাস্ত্র, ভূবিজ্ঞা, প্রকৃততত্ত্ব কিছুই বিশেষ-ভাবে উন্নতিলাভ করিতেছে না; তবুও আমরা সময়ে সময়ে বলিয়া থাকি নীরসের আলোচনায় দেশের সরসতাটুকু লোপ পাইতে বসিয়াছে, বাঙ্গালার শব্দশ্রমাল ক্ষেত্র শীঘ্রই তত্ত্বের তত্ত্ব রৌদ্রে মরুভূমিতে পরিণত হইবে। এ দেশে একবার কোন অর্থ নাই, বরং বিংশ শতাব্দীতে এ কথা গাইয়া যদি ইউরোপ আলোচনা করেন, তাহা হইলে কাজটা উপহাস্যাম্পদ হয় না। ইউরোপে কত তত্ত্ব, কত নিয়ম, কত সিদ্ধান্ত দিন দিন আবিস্কৃত হইতেছে।

কবি ঐ কথাটাই বলিল—এমন ভাবে বলিল যাহাতে সেটা মনুষ্যজীবনের কাছে অনাস্বীয় আ চইয়া মানুষের অন্তরে একটা দীপ্তবর্ণের রেখা টানিয়া দিতে পারে, কবি বলিল—

পর্যাপ্তপুষ্পস্তবকস্তম্ভাভাঃ

দুরংপ্রবালোদমনোহরাভাঃ ।

লতাবৃদ্ধান্তরবোধপাবাপু

বিনম্রশাখাভূজবক্ষনানি ॥

তবজ্ঞ বলিলেন “হেমস্তে শিশির পতিত হইয়াছে ।” কবি সেই কথাটাই মানুষের স্বখচ্যপের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন রাখিয়া, তাহার প্রাণের ক্ষুধা মিটাইয়া একটা নূতন স্বরে বলিয়া উঠে—

“* * হেমস্তের শিশির প্রভাতে

ছল ছল করে গ্রাম চূর্ণীনদীতীরে ।”

তবজ্ঞানী বিষবৃক্ষ রোপণ করিতে নিষেধ করিবেন ; তাহার কথা, তাহার গুক্তিতর্ক অনেকে শুনিতে পারে, অনেকের নিকট তাহা নীরস ; কিন্তু যে সাহিত্যপ্রপীড়া মনুষ্যজীবনের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত করিয়া বিষবৃক্ষকে সমস্তে সংবদ্ধিত করিয়াছেন, তাহার ফলাগমের কাল পর্য্যন্ত যিনি সচকিত থাকিয়া - মনুষ্যসমাজের মধ্যে তাহার বিষমর ফল দেখাইতে একটুও যত্ন ও চেষ্টার ক্রটি করেন নাই, তিনি কল্পনার দ্বারা চালিত, শেষ পর্য্যন্ত তিনি তবজ্ঞের মত একটুও উপদেশ দেন নাই, তবুও তিনি রচনার আনন্দের মধ্যে নির্জীক মুখে উপজ্ঞাসের ঘটনাপ্রবাহের ভিতর দিয়া যে অকণ্ঠিত কথাটি প্রকাশ করিয়াছেন, মানুষের প্রাণে তাহা ধ্বনিত হইয়াছে, হইতেছে, দীর্ঘ ভবিষ্যতেও সে ধ্বনির বিগম হইবে না ।

কখন-কখন তবগুলিও সাহিত্যের অঙ্গ হইয়া পড়ায় ; তখন তাহার নীরস নিস্ত্রাণ হইয়া থাকে না ; কথাগুলি তখন এমন কৌশলে উপযুক্ত বক্তার মুখে উপযুক্ত দেশকালে প্রযুক্ত হয় যাহাতে তাহা অনায়াসে মানুষের প্রাণস্পর্শ করিতে পারে ।

কস্তাত্যস্তং স্তবস্পনতং হংগমেকান্ততো বা

নীচৈর্গচ্ছতাপরি চ দশা চক্রণমিক্রমেণ ।

এই তবটি বিম্বহী-বক্ষের মুখে প্রবাসে ভবিষ্যৎপ্রত্যাশিত মিলনের সম্ভাবনার অঙ্কুর হইয়া মানবমনকে আকর্ষণ করে, সেইরূপ

স কজিয়দ্বানসহঃ সতাং ন

সুংকামুকং কর্মসু গচ্ছ শক্তিঃ।

এই তথ্যকথাটি বক্তার মুখে উপযুক্ত দেশকালে সপ্রাণ হইয়া উঠিয়াছে, তাই মানবজীবনে ইচ্ছা যে অতি যত্ন আঘাত করিয়া যায় তাহা স্বীকার করা চলে না। সাংখ্য, বেদান্ত তথ্যকণীয় পূর্ণ, কিন্তু গীতা সংখ্য বেদান্তকে সাহিত্যের মত করিয়া তুলিয়াছে, কেন না গীতা উপযুক্ত বক্তার মুখে উপযুক্ত দেশকালে কথিত হইয়া প্রাণহীন হইয়া পড়ে নাই; মানবের প্রাণে সাংখ্য, বেদান্ত না পারুক, গীতা যে রেখাপাত করিলে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

কখন-কখন তথ্যগুলি উপযুক্ত দেশকালে প্রযুক্ত না হইয়াও অস্বনিহিত সত্যের দৌন্দর্ঘ্যে মানবনকে আকর্ষণ করে। সংস্কৃত সাহিত্যে ইহাদের উদাহরণ বিস্তর দেখিতে পাওয়া যায়। “গুণাঃ পূজ্যস্থানং গুণিসু ন চ লিঙ্গং ন চ বয়ঃ” “বিকারহেতো মতি নিক্রিয়ন্তে যেমাং ন চেতাংসি তএব ধীরাঃ” এই সব কথা শুনিলেই তাহার নদো একটা সত্যের আলোক বিকশিত হইয়া আমাদের মূর্খ করে। তবে এসব কথাগুলি উপযুক্ত দেশকালে প্রযুক্ত হইলে আরও সুন্দর, আরও চিত্তাকর্ষক হইয়া দাঁড়ায়। *

শব্দে অলঙ্কারে রঞ্জিত করিয়া সাহিত্যশ্রষ্টা সনয়ে সময়ে তথ্যও একটা চিরন্তন মূল্য দান করেন। দানশীলের দানজনিত তনিমা শ্রেষ্ঠ ও সুন্দর এই কথাটিকে কবি কতকগুলি সহজ সুন্দর চিত্রে ফুটাইয়া তুলিয়া তাহাকে সরস জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছেন—

মণিঃ শাণোন্নীড়ঃ সমরবিজয়ী হেতিদলিতো

নদক্ষীণে নাগঃ শরদি সরিদাশ্রানপুলিনা।

কলাশেষশৃঙ্গঃ সুরতমুদিতা বাসবনিতা

তনিম্বা শোভন্তে গলিতবিভব্যাংগাধিসু নৃপাঃ ॥

বেশে বিজ্ঞান নাই, দর্শন নাই, অর্থশাস্ত্র, ভূবিজ্ঞা, প্রত্নতত্ত্ব কিছুই বিশেষ-
ভাবে উন্নতিলাভ করিতেছে না; তবুও আমরা সময়ে সময়ে বলিয়া থাকি
নীচদের আলোচনায় দেশের সরসতাটুকু লোপ পাইতে বসিয়াছে, বাঙ্গালার
শস্ত্রশ্রাবল কেন্দ্র শীঘ্রই তথ্যের তত্ত্ব রোদ্রে মরুভূমিতে পরিণত হইবে। এ
দেশে একবার কোন অর্থ নাই, বরং বিংশ শতাব্দীতে একথা নইয়া যদি
ইউরোপ আলোচনা করেন, তাহা হইলে কান্দটা উপঢৌকান পান হয় না।
ইউরোপে কত তথ্য, কত নিয়ম, কত শিক্ষাস্ত দিন দিন আবিষ্কৃত হইতেছে।

বিজ্ঞানের চরম উন্নতির দিনে, পার্থিবতার অদমা মত্ততার মধ্যে, বর্তমান যুগের সভ্যতার পরিবেষ্টনের মধ্যে লালিত, পালিত, ও শিক্ষিত হইয়া সেদিন একজন কবি বীণার তাগে যে আধ্যাত্মিকতার আকুল তান তুলিয়া গিয়াছেন, তাহার মূর্ছনা শুধু ইংলণ্ড নয়, সমগ্র ইউরোপে কম্পিত হইয়া সাগরের পারে এই ক্ষুদ্র ভারতবর্ষেও ভাসিয়া আসিয়াছে। তাঁহার বহুবিশোধের অনির্ভিন্ন গভীর অন্তর্গূঢ় কবণ রস বিজ্ঞানের তীর উদ্ধাপে শুক হইয়া যায় নাই।

আজ এই ইউরোপের মহাসময়ের দিনে অনেকে বিজ্ঞানের প্রতি একটু আধটু কটাক্ষ করিতেছেন না এমন নয়। তাঁহারা নিবৃত্ত হইলেই ভাল হয়, কেন না বিজ্ঞানের দোষ নাই। সে আমাদের অন্ধবিশ্বাস গুচাইয়াছে, অন্ধকারকে আলোকিত করিয়াছে, যাহার ভিত্তি জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল, তাহাকে আবার নূতন দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। বিজ্ঞানের দিনে সাহিত্য নূতন উপকরণলাভ করিয়াছে, বিজ্ঞান হইতে গৃহীত নানা শব্দ, নানা অলঙ্কারে সে সাহিত্যকে পরিপুষ্টই করিতে চায়; তবে যদি তাহা সাহিত্যের পথে একটা চল্লম্বা প্রাচীর তুলিয়া দেয়, তাহা হইলে সেটা বিজ্ঞানের দোষ নয়, সে দোষটা আমাদের। বিজ্ঞানের চক্ষায় মাতিয়া উঠিয়া যদি আমরা পার্থিবতাকে আধ্যাত্মিকতার আসনে বসাইয়া দিই, সে কণ্ঠের প্রায়শ্চিত্ত আমাদেরই করিতে হইবে।

সময়ে সময়ে অনেকে ঠিক বিজ্ঞানের কথাটা না বলিয়া বলিতে চান—তত্ত্বজ্ঞান আমাদের দেশে একটা উৎপাত আরম্ভ করিয়াছে। বাস্তবিক আমাদের দেশ তত্ত্বদর্শী। এই তত্ত্ব আমাদের কোন-না-কোন প্রকার ক্ষতি করিতে পারে একথা সত্য, কেন না ভাল-মন্দের সংমিশ্রণ সর্বত্রই দেখা যায়; কিন্তু এই তত্ত্ব যে আজ পর্যন্ত এত বড় জাতিকে আপনাতর বিশিষ্টতা রক্ষা করিতে শিখাইয়া জীবন-সংগ্রামে বিজয়ী করিয়াই রাখিয়াছে, এই তত্ত্ব যে আমাদের জীবনের সরসতার জন্ত সঙ্গীত, সাহিত্য, বিজ্ঞানের অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায় নাই, এই তত্ত্ব যে বিশ্বসভ্যতার উন্নত উদ্ভাস্ত গতির মধ্যেও ভারতকে জাগ্রত সচেতন করিয়া রাখিয়াছে তাহা ত অস্বীকার করা চলে না।

এ তত্ত্ব তখনও ছিল যখন কালিদাস তাঁহার সরস কবিত্বের স্বাক্ষরে দেশ মুগ্ধ করিয়াছিল, যেদিন ভবভূতি পরিণত প্রণয়ের অপূর্ণ চিত্র আঁকিয়া ছিল, বিভাপতি, চণ্ডীদাসের অব্যক্ত মধুর হৃদ কানের নীতিতর দিয়া মরমে

পশিতে একটুও বাধা পায় নাই ; এই তব তপনও ছিগ, বপন কবির
ভোগবিলাসের বর্ণনায় উচ্ছ্বল হইয়া উঠিত, বপন আদিত্যস্বক শ্লোকের পর
শ্লোক শতকে শতকে দেশময় পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল । এই তবের দিনে যে
কবি ভোগী বিদগ্ননিরত পুরুষের বর্ণনা করিতে গিয়া লিপিয়াছিল—

হেমন্তে দধিভৃঙ্গসপিরশনা মাজিষ্ঠবাসো ভূতঃ
কান্থীরদ্রবসাল্লমিদ্ধবপুশ্চিহ্না বিচিঠৈঃ রতৈঃ
বৃন্তোরন্তনকামিনীজনকৃতান্নেবা গৃহাভ্যন্তরে
তাবূলীদলপুগপুত্রিতমুখা দল্লঃ স্তম্ভঃ শেষতে ॥

সেই কবিই আবার বিদগ্নবিমুগ্ন মুনির বর্ণনায় পূর্ব উদার গম্ভীর স্তরে বলিয়াছে
মহাশয্যা পৃথ্বী বিপুলমুপধানং ভৃঙ্গযত।
বিতানম্ আকাশঃ বাজ্রনমন্তুকুলোহয়মনিলঃ
শরচ্ছজো দীপো বিরতিবনিতাসঙ্গমুদিত
স্বখী শাস্তঃ শেতে মুনিরতমুভূতির্নৃপ ইব ।

ভোগীর চেয়ে মুনিকে উচ্ছ্বাস দেওয়ার জন্ত তব যদি আজ নিমিত্ত চয়, তাহা
হইলে সে নিলা মাথা পাতিয়া লইতে সে একটুও কুণ্ঠিত হইবে না ।

শ্রীস্ববোধেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

মানুষ

পাচনি লইয়া গরুর পালের পিছনে যারা

চ'লেছে দূরের মাঠে ।

ছিয় বপন, নিবারিতে ঘন শ্রাবণধারা,

মাথায় নাহিক আঁটে ।

গাভীর পুচ্ছ ধরি' যারা তরে বর্ষানদী,

ছুটেনা পারের কড়ি ।

হারা বাছুরের সন্ধানে ফেরে সন্ধ্যাবধি

কাদায় কাঁটার পড়ি' ।

সুধার অন্ন, পরণের বাস, বাসের গেহ

তাদের যদি না মেলে,

‘রুগা কি করুণা কোরোনা তাদের করগো মৈহ

তারা মাহুসেরই ছেলে ।

'জ্যোত্স্না'র গলদঘর্ষ, বলদ ল'রে
 চবে যারা রাগা মাটি ।
 কতনা স্বপ্ন, মুঘলের দারা মাথায় ব'য়ে
 ক্ষেত করে পরিপাটি ।
 আশা যার ভাসে আকাশে আকাশে মেঘের বৃক
 ধরনীগর্ভে ধন ।
 বোকামি পড়েনা ছাকামিতে ঢাকা যাদের মুখে
 ধূলা-কাদা আভরণ ।
 অট্টালিকার উপায় থাকিতে ছাকারতর
 যার চালা ঘুচে নাই,
 স্রণা কি করণা কোরোনা তাদের প্রকা কর
 তারা মাছুবেরি ভাই ।

শোভন করিয়া ঢাকিবে নারীর লজ্জাটুক
 ছুটে নাই হেন বাস,—
 তারি খুঁটে গারা পিঠে ছেলে ধৈর্ষে, রক্ত মুখ,
 তুলিছে মাটির রাশ ।
 মান পথে যার শিরে নিজ বোঝা দিতেছে পতি,
 ধাক বা না থাক স্ত্রী,
 স্রণা কি করণা কোরোনা তাদের করণো নতি
 তারা মাছুবেরি স্ত্রী ।

নির্যোধ যারা, ভর্যোধ যারা পল্লীপারে
 অল্লীল যার ভাষা,
 আশী শতাব্দী ধরিয়া যাদের দৈন্য বাড়ি
 চির নাবালক চালা,
 হলের ফলকে লক্ষী উঠিলে করিয়া দান
 ধনসহ নৃপসুতে,
 ছর্ভিকের ভিক্ষার তুলি ভরিয়া, প্রাণ
 দেয় যারা আগে হ'তে,
 বেতনের মত সভ্য শিক্ষা শেখেনি যারা
 হাওয়ার নেশায় মাতি' ।
 বটের মতন পোলা মাঠে আজও রয়েছে খাড়া,
 তারা মাছুবেরি জাতি ।

শ্রীমতীপ্রভাৎ সেন ঙগ

শেষ হিন্দু সাম্রাজ্য ।

(পৰ্তুগীজ পাইসের কাহিনী)

Senior Lopes, who has published these documents (Portuguese accounts) in the original Portuguese in a recent work, (*Chronica dos Reis de Bisnaga*) writes in his introduction "Nothing that we know of in any language can compare with them, whether for their historical importance or for the description given of the country, and specially of the capital, its products, customs, and the like. The Italian travellers who visited and wrote about this country—Nicolo de conti; Varthema, and Fedirici—are much less minute in the matter of the geography and customs of the land, and not one of them has left us a chronicle."

সমুদ্রতীর দিয়া ভারতবর্ষ + হইতে নরসিংহের রাজ্য্যভিমুখে যাত্রা করিলে প্রথমেই শৈলশ্রেণী অতিক্রম করিতে হয়। এই শৈলমালাই সমুদ্রতীরবর্তী অস্তান্ত রাজ্য হইতে উক্ত সাম্রাজ্যকে পৃথক করিয়াছে। এই শৈলরাঙ্গি ভারতবর্ষের সীমানায় বিস্তৃত রহিয়াছে। পর্বতে স্থানে স্থানে যে সকল রক্ত্র আছে তাহাদের ভিতর দিয়া রাজ্যমধ্যে প্রবেশ করিতে হয়। অস্তান্ত স্থানে গিরিশ্রেণী ঘন অরণ্যে সমাকুল। এই সাম্রাজ্যের অধীনে সমুদ্রতীরে অনেকগুলি বন্দর আছে। সে সকল বন্দরের সহিত আমাদের কোন বিরোধ নাই, বরং কতকগুলিতে আমাদের শিল্পশালা বর্তমান আছে। +

এই শৈলমালা অতিক্রম করিলেই সম্মুখে সমতুলক্ষেত্র দৃষ্ট হয়। তথায় কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্বত বর্তমান আছে। ভাটকল হইতে সম্পূর্ণ নগর পর্যন্ত যে রাজবর্ষ বিস্তৃত আছে তাহা সমতল বটে, কিন্তু স্থানে স্থানে বনসমাকীর্ণ পর্বত দেখা যায়। এই পথ ১২০ মাইল দীর্ঘ। পথের ধারে বহুস্থানে গিরিনদী আছে বলিয়াই প্রতিবর্ষে ভাটকলে ৫১৬ সহস্র ভারবাহী ষণ্ড পণ্য বহিয়া আনে।

নরসিংহের রাজ্যের কথা বলি। পূর্বসীমায় অবস্থিত শৈল বনজঙ্গল আছে, অস্তান্ত বনশ্রেণী বিরল। তবে একরূপ আছে যে, কোন কোন স্থানে এক সঙ্গে ৮৯ মাইল পণ্ড সারিবিহীন বৃক্ষের ছায়ায় গমন করিতে পারা যায়। প্রতি

* গোয়া এবং ভরিকটবর্তী স্থান।

+ Amcola, Mingao, Honor, Batecalla, Mangalor, Bracalor and Bacanor.

নগর উপনগর বা গ্রামের পশ্চাৎভাগে বহু আশ্রয় পনস তিস্ত্রীড়ি প্রকৃতি এবং অশ্রুজাতীর বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ কুঞ্জের আকার ধারণ করিয়াছে। এই সকল বৃক্ষকুঞ্জে বনিকগণ পণ্যসম্ভার লইয়া বিশ্রাম করে। রেকালেম্ নগরে আমি একটি এত বড় বৃক্ষ দেখিয়াছিলাম যে, আমার তিন শত কুড়িটি অশ্ব তরিলে স্বচ্ছন্দে আশ্রয় লাভ করিয়াছিল। অশ্বগুলি অশ্বশালায় যেমন সারি বিছান্ন হইয়া অবস্থান করে, বৃক্ষ নিম্নেও তেমনই ছিল।

এই সাম্রাজ্যের ভূমি অত্যন্ত উর্বর এবং সুন্দররূপে কবিত দেখিলাম। দেশে গোমহিষাদির অভাব নাই, পক্ষীর সংখ্যাও বৃহৎ। এই সকল পশুপক্ষীর কতক বা গৃহপালিত, কতক অরণ্য চাইতে সমুদ্রত। এ অঞ্চলে প্রচুর ধাতু, কলাই প্রকৃতি যত প্রকার শস্ত দেখিলাম, সে সমুদয় আমাদের দেশে জন্মে না। শস্ত এত অধিক হয় যে, মহুদ্যের ব্যবহারের জন্ত ব্যব করিয়াও অশ্বাদির খাত্তের জন্ত প্রচুর উদ্ভূত থাকে। এদেশের গোধুম অতি সুন্দর। উহার আবাদও যথেষ্ট আছে।

এই সাম্রাজ্য বহু নগর উপনগর এবং গ্রামে সুশোভিত। সেই সকল নগর উপনগর এবং গ্রাম বহুজনাকীর্ণ। পাছে নগরগুলি শাসনের বাধা ঘটায়, সেই জন্ত, নগর-প্রাকার প্রান্তরে গঠন করিবার আদেশ নাই। রাজ্যদেশে মৃদয় প্রাচীরে নগর বেষ্টিত। * তা সকল উপনগর সীমান্তে অবস্থিত, সেগুলি শৈল-প্রাচীরে পরিবেষ্টিত; কিন্তু নগরসম্মুখে রাজ্যের আদেশ এরূপ নহে। কাজেই উপনগরগুলি কুদ্র কুদ্র ভ্রূর্গে পরিণত হইবার সম্ভাবনা থাকিলেও, নগরে সে সম্ভাবনা নাই।

অত্যন্ত দীর্ঘ হইয়া পড়িবে এই ভয়ে আমি এ সাম্রাজ্যের নগর, উপনগর এবং গ্রামগুলির অবস্থান-কথা বর্ণনা করিব না। কেবল ধারোয়ার নগরের কথাই कहিতেছি। এখানে একটি মন্দির আছে, তাহার তুল্য মন্দির আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ।.....এই গোলাকার মন্দির একটি প্রস্তরে নির্মিত। প্রস্তরের সহিত প্রস্তর জুড়িয়া সিংহদ্বার রচিত। তাহাতে ছায়া-লোকেরই বা কি বিচিত্র লীলা পরিস্ফুট রহিয়াছে! মন্দিরগাত প্রস্তরনির্মিত মূর্তিগণে সুশোভিত। মূর্তিগুলি মন্দির হইতে এক হস্ত পরিমিত উচ্চ। ইহা তরুণ-শিল্পের এতই সুন্দর নিদর্শন যে, উহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট নিদর্শন আর হইতে পারে কিনা সন্দেহ। যে দিক হইতেই দেখে না কেন, মূর্তিগুলির মুখ

অবশ্য প্রভৃতি স্থলরূপে দেখিতে পাইবে। প্রস্তরমুষ্টিগুলি যেন পত্রাচ্ছাদিত কুঞ্জমধ্যে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। সর্কোপরি রোমক স্থাপত্যোক্ত উৎকৃষ্টতর নমুনা। মন্দিরের স্তম্ভগুলি যে পাদপীঠের উপর স্থাপিত, সেগুলি দেখিলে মনে হয় যেন ইটালীতে প্রস্তুত হইয়াছে। স্তম্ভগুলির শিরে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রারতনের শিলান শোভা পাইতেছে। মন্দিরের বীম বর্ণা প্রভৃতি সমস্তই প্রস্তরনির্মিত—কোথাও কাষ্ঠ ব্যবহৃত হয় নাই। কি বাচিরে, কি ভিতরে কি অর্গমেনে—সর্বস্থানেই সেই এক প্রকারের প্রস্তর। মন্দিরের চতুর্দিকে প্রস্তর নির্মিত জাক্রি। উপনগরের প্রাকার অপেক্ষাও সুদৃঢ় প্রাকার মন্দিরটি বেষ্টিত হইয়াছে।

মন্দিরের প্রবেশদ্বার তিনটি। দ্বারগুলি রুচৎ এবং সুন্দর। একটি দ্বার মন্দিরের দ্বারের অভিমুখী। উহার সচিৎ বারান্দা সংলগ্ন রহিয়াছে। সম্মুখাগণ এখানে অবস্থান করে। মন্দির-প্রাকারের মধ্যে লোহিত বর্ণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আরও কয়েকটি দেবালয় আছে। একটি চতুর্দোণ পাদপীঠের উপর অর্ণবপোতের গুণবৃক্ষের জার দীর্ঘ একটি প্রস্তরস্তম্ভ বিদ্যমান আছে। উহা পাদপীঠের উপর হইতেই অষ্টকোণাকৃতি হইয়া উঠিয়াছে। আমি রোম নগরের “সেণ্টিপিটাসের হুচী” দেখিয়াছি বলিয়া এই স্তম্ভ দেখিয়া বিস্মিত হইলাম না; কিন্তু ইহা সেই হুচী অপেক্ষাও অধিক কিংবা তরুণ উচ্চ।

এই মন্দির মধ্যে ইহার দেবোপাসনা করে। দেবমূর্তি নানা প্রকারের ইহার প্রত্যহই দেবতার ভোগ দেয়, কারণ দেবতায় নাকি ভোজন করিয়া থাকেন। তাঁহার ভোজনকালে রমণীগণ নৃত্য করিয়া থাকে। ইহারা সকলেই সেবাকারিণী। দেবতার যখন দাহ্য আবশ্যক, ইহারাই তাহা পরিবেশন করিয়া থাকে।

এই নগর হইতে বিজয়নগর ৫৪ মাইল দূরে। নরসিং-সাম্রাজ্যের বিজয়-নগরই রাজধানী। রাজা এইখানেই থাকেন। ধারোয়ার হইতে বিজয়নগরে যাইতে অনেক উপনগর এবং প্রাচীরবেষ্টিত গ্রাম দেখিতে পাওয়া যায়। বিজয়নগর হইতে ৬ মাইল দূরেই একটি পর্বতমালা। তাহারই রক্ত-মুখে নগরে প্রবেশ করিতে হয়। এই রক্ত-কেই দ্বার কহে। এই দ্বার ভিন্ন নগরপ্রবেশের আর অন্য উপায় নাই। পর্বতমালা বৃত্তাকারে রাজধানীকে বেষ্টিত করিয়া রহিয়াছে। সে বৃত্তের পরিধি ৭০ মাইল। এই বৃহৎ বৃত্তের অভ্যন্তরে যে সকল নৃত্য আছে তাহারাই ক্রমেই আরতনে ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর হইয়াছে। এই সকল বৃত্তের মধ্যে যেখানেই সমতল ক্ষেত্র আছে, সেইখানেই সুদৃঢ় প্রাচীর

গাধিয়া এক শৈলবৃত্ত অপর শৈলবৃত্তের সহিত সংযুক্ত করা হইয়াছে । প্রথম শৈলবৃত্তের দ্বার হইতে যে প্রবেশপথ বহির্গত হইয়াছে কেবল তাহাই মুক্ত রহিয়াছে ।

এই সকল ঘরের নিকট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গছের কাটা রহিয়াছে । অতি অল্প সংখ্যক লোক লইয়াই দ্বারগুলি রক্ষা করা যায় । শৈলমালা এইরূপে বৃত্তাকারে অগ্রসর হইয়া নগরের অভ্যন্তর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে । এই সকল শৈল-প্রাচীর মধ্যে বহু সমতল ক্ষেত্র আছে । তথায় ধানের আবাদ হয় এবং কমলালেবু ও অন্যান্য শাক-শস্ত্রী প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয় । শস্যক্ষেত্রে জল দিবার জন্য বহু জলাশয় বর্তমান আছে । কোথাও বন-জঙ্গল নাই । পর্বতমালা দেখিতে সুন্দর ; মনে হয়, কে যেন ষ্বেত প্রান্তরের উপর ষ্বেত প্রস্তর প্রতিষ্ঠা করিয়া আশ্চর্য্যরূপে সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছে—যেন একের সহিত অন্যের সম্পর্ক নাই, সকলগুলিই শূন্যে ঝুলিতেছে । রাজধানী এই ষ্বেত প্রান্তরমালার মধ্যস্থলে অবস্থিত ।

যাহারা গোয়া হইতে বিজয়নগরে আগমন করে তাহারা যে দ্বার দিয়া প্রবেশ করে, তাহাই প্রথম শৈলপ্রাচীরের রক্তমুখ । উহা পশ্চিমদিকের সর্বপ্রধান প্রবেশপথ । রাজ্যের আদেশে এই স্থানে একটি নগর নির্মিত হইয়াছে ; তাহা প্রাকারে এবং উচ্চ গম্বুজে সুরক্ষিত । তাহার প্রবেশপথ ও প্রাচীর সুদৃঢ় । অভ্যন্তরে সমতল ছাদবিশিষ্ট অতি সুন্দর হর্ম্মাশ্রেণী । বহু বণিক এই স্থানে বাস করে । নগরের জন সংখ্যা অতি বৃহৎ । * রাজ্যের আদেশে ধনী দুানী বণিকগণ এই নগরে যাইয়া বাস করে ।

নগরে পানীয় জলের অভাব নাই । রাজ্য এইখানে একটি সুদীর্ঘ জলাশয় নির্মাণ করিয়াছেন । † হুইট পর্বতের নিকটে এই জলাশয় নির্মিত হইয়াছে

* এই নগরের নাম মাগলাপুর । ইহার বর্তমান নাম হপ্পেট । পর্ভুগীজ সুমিজ বলেন—এই নগরে যে রাজপথ নির্মিত হইয়াছিল তাহা দৈর্ঘ্যে দেড় মাইল এবং প্রস্থে প্রায় ২২৪ ফিট ।

† ইহার ট্রেসে Falcon shot বলিয়া কথিত । Falcon প্রাচীনকালের এক প্রকার কামান । তাহা হইতে পোয়া নিক্ষেপ করিলে উহা গন্তদূর যাইত, এই জলাশয় দৈর্ঘ্যে ততদূর ছিল । সুমিজের বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, এই জলাশয় খনন করিবার জন্য গোয়ার রাজপ্রতিনিধি একজন মন্ত্রী পাঠাইয়াছিলেন । তাহার নাম জোয়াও-দেল্লা-পম্টে । তিনি স্থাপত্যে দক্ষ ছিলেন । আমরা যে পর্ভুগীজের কাহিনী লিখিতেছি তিনি এ বিষয়ে কিছু বলেন নাই । সুমিজের কাহিনী পরে লিখিব ।

বলিয়া উভয় পক্ষত হইতে জলস্রোত নামিয়া জলাশয় পূর্ণ করে। এতদ্ভিন্ন নলসংযোগেও জলাশয়ে জল আসা হয়। বহির্দেশের শৈলরাজির তলদেশ দিয়া চালিত হইয়া এই নল একটি পরিপূর্ণ জলাশয়ের নিকট উপস্থিত হইয়াছে। তথা হইতেই এই দীর্ঘিকায়া জল আইসে।

দীর্ঘিকায়া বৃহদাকারের তিনটি প্রস্তরী স্তম্ভ আছে। স্তম্ভগায়ে আনারূপ মূর্তি খোদিত রহিয়াছে। ইহাদের উর্দ্ধে কয়েকটি নল আছে। সেই নলগুলির সহিত স্তম্ভ তিনটি সংযুক্ত। নলমূলের বাগান এবং দাড়াফেত্র সিক্ত করিবার নিমিত্ত এই সকল নলের সাহায্যে জল লইয়া যাওয়া হয়।

একটি পক্ষত ধমাইয়া এই জলাশয় নিশ্চিত হইয়াছে। ইহা খনন করিতে অল্পমান ১৫১২০ সহস্র লোক একত্র কার্যে নিযুক্ত হইয়াছিল। আমি এত লোককে কাজ করিতে দেখিয়াছি যে, তাহার পিপীলিকাসারির ন্যায় ভূভাগ আচ্ছন্ন করিয়া আপন আপন কর্মে নিযুক্ত ছিল। রাজার আদেশে জলাশয় নানা পথে বিভক্ত হইয়া এক একজন সেনাপতির অধীনে স্থাপিত হইয়াছিল। প্রত্যেকেই আপন আপন অংশ সম্পূর্ণ করিবার জন্য লোকজন লইয়া প্রস্তুত ছিলেন।

দীর্ঘিকা খনন কালে দুই তিথ্যের ভাঙ্গিয়া পড়ায় রাজা পুরোহিতদিগকে কারণ নির্দেশ করিতে আদেশ করিলেন। তাঁহারা বলিলেন, দেবতা অপ্রসন্ন হইয়াছেন! তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার জন্য নর, অশ্ব এবং মহিষ বলির প্রয়োজন। তৎক্ষণাৎ রাজার আদেশে ঘটিসংখ্যক নর এবং কতকগুলি অশ্ব ও মহিষের সঙ্গে দেবমন্দির রঞ্জিত হইয়াছিল! *

কোনও প্রিয়তমা পত্নীর নামে রাজা এই নগরীর নামকরণ করিয়াছিলেন। নগরী সমতল ক্ষেত্রে অবস্থিত। নাগরিকগণ ইহার চতুর্দিকে সুবিধা বুঝিয়া

* হুম্বল একটু বিভিন্ন আকারে এই কাহিনী বর্ণনা করিয়া কহিয়াছেন—রাজার আদেশে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত অপরাধীদিগকে এই কারণে বলিক্রমে প্রদত্ত হইয়াছিল। হুম্বল অশ্ব দানের কোনও উল্লেখ করেন নাই। তিনি লিখিয়াছেন পুরোহিতগণ বলিলেন, দেবতার ক্রোধের জন্য, পুরুষ কিংবা রমণী কিংবা মহিষের সঙ্গে প্রয়োজন। রমণী বলির প্রদত্ত হইতেই অস্থান করা যায় যে হুম্বলের বর্ণনা ঠিক নহে। আমরা বাহার কাহিনী লিপিতেছি, তিনি যুবককে কহিয়াছেন—“of the things which I saw and contrived to learn concerning the kingdom of Nuringa etc.”—সুতরাং ইনি প্রত্যক্ষদর্শী।

বতর উদ্ভান চুচনা করিয়াছে। নগরে একটি দেবমন্দির আছে। মন্দিরে অনেক শ্রীমূর্তি বর্তমান। মন্দিরটি সুগঠিত। মন্দিরে কতকগুলি কূপ আছে। সেগুলিও সুনির্মিত। নগরের গৃহগুলি একতল। ছাদ সমতল। প্রতিগৃহেরই গম্বুজ আছে। আমাদের দেশের ছাদ এ নগরের গৃহগুলি দ্বিতল দ্বিতল নহে। প্রতি গৃহেই শুভ্রাবলী বিরাজ করিতেছে। চতুর্দিকেই নৃত্য। ভিতরে এবং বাহিরে বারান্দা নির্মিত চটয়াছে। তথায় লোকজন বাস করিতে পারে। গৃহগুলি দেখিতে যেন রাজ প্রাসাদতুল্য। এই সকল প্রাসাদ চতুর্দিকে প্রাচীরবেষ্টিত। প্রাকারভাষ্তরে গৃহের পর গৃহের সারি।

রাজপ্রাসাদের চটটি প্রবেশদ্বার। অনেকগুলি রক্ষী দ্বার রক্ষায় নিযুক্ত আছে। সৈন্যদাক্ষণ্য এবং রাজসম্মিধানে যাহাদের প্রয়োজন আছে তাহার। ভিন্ন রক্ষিণ আর কাচাকেও রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিতে দেয় না। এই চটটি দ্বারের মধ্যে একটি প্রকাণ্ড দরবারগৃহ আছে। তাহার চতুর্দিকেই বারান্দা। সৈন্যপতিগণ এবং রাজ্যের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ রাজদর্শনে আসিয়া এইখানে অপেক্ষা করেন।

রাজা দীর্ঘও নরেন শরৎও নরেন—তিনি নখামাকৃতি। তাঁহার বর্ণ উজ্জল, গঠন সৌন্দর্যসম্পন্ন। তাঁহাকে ধরং কলকায়ই বলা যায়;—তিনি কৃশ নরেন; তাঁহার বদননুগলে বসন্তের দাগ আছে। সকলেই তাঁহাকে অত্যন্ত ভয় করে। তিনি সর্বতোভাবে রাজ্যনাম ধারণের উপযুক্ত—সর্বদাই শ্রীতিগ্রস্ত এবং অত্যন্ত আদেয়প্রিয়। বৈদেশিকদিগকে তিনি সম্মান করেন এবং তাহাদিগের সচ্চিত সম্ভাবহার করেন। তাহাদিগের অবস্থা যেরূপই কেন চটুক না, সাক্ষাৎ চটলেই তিনি সকলের সকল তত্ত্ব গ্রহণ করিয়া থাকেন। ইনি একজন শক্তিশালী ছায়পরাগণ শাসনকর্তা তবে কখনও কখনও চটায় ক্রুদ্ধ চটয়া উঠেন। ইহার নাম কৃষ্ণরায় মহাশয় নৃহারাজ, ভারতের রাজপরিমেষ—ইনি সমুদ্রের অধিপতি। এই রাজার সৈন্য সংখ্যা এবং সাম্রাজ্যের বিস্তার সকল নৃপতি অপেক্ষা অধিক বলিয়া তাঁহার এই নাম। তিনি সংস্কারী ও বীর এবং সর্বকাণ্ডে হৃদয়; এত বিভব থাকিতেও মনে হয় তাঁহার যেন কিছুই নাই। তাঁহার মত নরপতির সেনা—এ সাম্রাজ্য আরও অধিক চটলে ভাল চটত।

ইনি উড়িষ্যার রাজার সচ্চিত সর্বদা যুদ্ধে লিপ্ত থাকিতেন। ইহার

বিজয়ী সৈন্য উড়িষ্যায় প্রবেশ করিয়া অনেক নগর ও উপনগর অধিকার এবং ধ্বংস করিয়াছিল। উড়িষ্যার বহুসৈন্য এবং রণচতুর্ দলিত করিয়া তিনি উড়িষ্যার রাজকুমারকে বন্দী করিয়াছিলেন। বন্দীকৃত রাজকুমার বিজয়নগরে আনীত হইয়াছিলেন। সেইখানেই তাঁহার মৃত্যু ঘটিয়াছিল। শান্তিপ্ৰয়াসী হইয়া উড়িষ্যার নরপতি তাঁহার সচিব সন্ধিবন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিলেন এবং আপন কন্যার সচিব তাঁহার বিবাহ দিয়াছিলেন।

কুমারায়ের দ্বাদশটি পত্নী। তন্মধ্যে তিনজন প্রধানা মহিষী। তাঁহাদের পুত্রগণই সিংহাসন লাভ করিবেন। সকল রাণীরই পুত্র থাকিলে একরূপ ব্যবস্থা। কিন্তু যদি একটি-মাত্রই রাজকুমার জীবিত থাকেন তাহা হইলে তিনি যে রাণীরই সম্বান হউন না কেন, সিংহাসন তাঁহার। উড়িষ্যার রাজকুমারী একজন প্রধানা মহিষী; রাজপত্নীদিগের মধ্যে কয়েকজন ঐরঙ্গ-পতনের রাজার কুমারী। ঐরঙ্গপতন-রাজ বিজয়নগর রাজ্যের অধীনে একজন সামন্ত। আর একজন রাণী রাজার যৌবনকালে তাঁহার প্রণয়-ভাগিনী হইয়াছিলেন। রাজা সেই সময়েই প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন যে, সিংহাসন লাভ করিলে তাঁহাকে পত্নীহে বরণ করিবেন। সে প্রতিশ্রুতি রক্ষিত হইয়াছিল, তাঁহার প্রতি প্রেমের নিদর্শনরূপ রাজা এই নুতন নগর নির্মাণ করিয়া তাঁহার নামেই ইহার নামকরণ করিয়াছেন।

প্রত্যেক রাজমহিষীর স্বতন্ত্র আবাসগৃহ, সখী, দাসী, প্রচরিত্রী প্রভৃতি আছে। খোজা রক্ষী ভিন্ন তথায় অন্য কোন পুরুষের প্রবেশাধিকার নাই। রাজার বিশেষ অঙ্গুগছে সম্ভ্রান্ত কয়েকজন বৃদ্ধ ভিন্ন আর কোন পুরুষই রাণীদিগকে দেখিতে পায় না।

রাজমহিষীগণ চতুর্দিকে আচ্ছাদিত শিবিকায় ভ্রমণে বাহির হন। তখন কেহ তাঁহাদিগকে দেখিতে পায় না। তিন চারি শত খোজা প্রচরিত্রী তাঁহাদের সঙ্গে থাকে। তখন রাজপথে অস্ত্রাস্ত্র লোক দূরে অবস্থান করে।

ওনিতে পাই প্রত্যেক রাণীরই বহু ধনসম্পত্তি এবং নান্য বস্ত্রভরণ ও প্রচুর মতি মুক্তা হীরক প্রভৃতি আছে। আরও ওনিতে পাই যে, তাঁহাদের প্রত্যেকের ৬ জন করিয়া সুবতী সখী আছে। তাহারা সকলেই বহুমূল্য রত্নালংকারে—নানা মণি মুক্তা হীরকে সজ্জিতা থাকে। ইহাদিগকে দেখিবার সৌভাগ্য আমার ঘটিয়াছিল। সে কাহিনী পরে বলিতেছি। এই সখীবৃন্দ ভিন্ন রাজাস্তঃপুরে দ্বাদশ সহস্র রমণী বাস করে। জানিও যে,

রমণীরা অসি চালনা করে, চর্মধারণ করে, কেহবা মলমুগ্ধও করিতে পারে। কেহ কেহ ভূমী, ভেটী, বংশী এবং অজ্ঞাত বাস্তব যন্ত্র বাদন করিয়া থাকে। আমাদের দেশে সে সকল বাস্তব যন্ত্র নাই। রাজ্যের যেমন নানা গৃহকর্মের জন্য নানা কর্মচারী আছে, রাণীদেরও তেমনই দ্বী, বস্ত্রদোতকারিণী প্রভৃতি নানা কর্মী-কর্মচারী আছে। পাছে পরম্পরের মধ্যে কলহ হয় সেইজন্য তিন জন প্রধানা মহিষীর জন্তই সমান বন্দোবস্ত আছে। তাঁহারা স্বতন্ত্র ভাবে বাস করেন; কিন্তু পরম্পরের মধ্যে সখীর ছায়া সন্তোষিত বর্তমান। যে প্রাচীরবেষ্টিত স্থানে এতগুলি নারী বাস করে, সে স্থান যে কত বড় তথায় যে, ক্ষুদ্র বৃহৎ কত পথ আছে তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

রাজা প্রাসাদের স্বতন্ত্র প্রকোষ্ঠে বাস করেন। যখন যে পত্নীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা হয় তখন তিনি খোজা প্রহরীর দ্বারা তাঁহার নিকট সংবাদ প্রেরণ করেন। খোজা রাণীর নিকটে গমন করে না, প্রতিহারিণীর দ্বারায় সংবাদ দেয় যে, রাজদূত আসিয়াছে। সংবাদ পাইয়াই রাণীর কোন সখী দূতের নিকট আসিয়া রাজ্যদেশ জানিয়া যায়। হয় রাণীই তখন রাজার নিকট গমন করেন, অথবা রাজাই রাণীর কাছে আসেন। সকলের অজ্ঞাতে তখন রাজা ও রাণী ইচ্ছামত কালকতিপাত করেন। এই সকল খোজা প্রহরীদিগের মধ্যে কেহ কেহ রাজার অত্যন্ত প্রিয়। তাহারা তাঁহার শয়নক্ষেত্রে নিদ্রা যায়। ইহাদিগের বেতন গুরু বেশী।

হর্যোদয়ের পূর্বে রাজা প্রত্যহ অর্ধ পাইন্ট জিঞ্জেলি তৈল (?) পান করেন এবং উহা দ্বারা সর্বাঙ্গ অর্ছলিপ্ত করিয়া ক্ষুদ্র একখানি বস্ত্রে কটিদেশ আচ্ছাদনপূর্বক একটি গদা লইয়া ব্যায়াম করেন। তার পর শরীর বন্দীত না হওয়া পর্যন্ত অসি চালনা করিতে থাকেন। এইরূপে পরিশ্রম করিবার পর তিনি হর্যোদয় পর্যন্ত মুক্ত প্রান্তরে অন্ধানোহণে ভ্রমণ করেন।

হর্যোদয় হইলে অথ চইতে অবতরণ করিয়া তিনি স্নান করিতে গমন করেন। একজন পুরোহিত তাঁহাকে স্নান করাইয়া থাকেন। রাজা ইহাকে প্রকার চক্ষে দেখেন। তিনি রাজার অত্যন্ত প্রিয়পাত্র এবং প্রভূত ধন সম্পত্তির অধিকারী। স্নানান্তে রাজা প্রাসাদসংলগ্ন মন্দির মধ্যে পূজা করিতে গমন করেন।

পূজা সমাপ্ত হইলে তিনি গৃহান্তরে আগমন করেন। উহা প্রাচীরহীন খিলানের দ্বারের দ্বায় বহু স্তম্ভের উপর খিলান তুলিয়া নির্মিত।

স্বস্তাঙ্কলি বস্ত্রাচ্ছাদিত। কক্ষ প্রাচীর স্থচাকরূপে চিত্রিত। উভয় পার্শ্বে হুইট পরমা স্বন্দরী নারী মূর্তি অবস্থান করিতেছে। আধৈশিক শাসনকর্তা এবং অল্প রাজ্যমাতাদিগের সহিত এই গৃহেই রাজা রাজকাৰ্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন। রাজ্যস্থগৃহীতগণ এই স্থানে তাঁহার সহিত কথোপকথন করেন। রাজমন্ত্রী তারেসিরা (শলুভট্টিয় বা টিম্বুরাজা) রাজার বিশেষ অমুগ্রহভাজন। তিনিই রাজপ্রাসাদের কর্তা। অস্তাগ্র সামন্ত রাজগণ ইহাকেই রাজার স্থায় সম্মান করেন।

ইহাদিগের সহিত আগাপ আপায়নের পর, রাজদর্শনার্থী সামন্তগণ এবং সেনাপতিকুল আহুত হন। রাজসমীপে উপস্থিত হইয়াই তাঁহারা অভিবাদন করেন এবং রাজার নিকট চইতে পূরে কক্ষপ্রাচীরের সম্মুখে অবস্থান করেন। তখন তাঁহারা পরস্পরের সহিত গল্প করেন না বা পাণ খান না। তাঁহারা তখন অঙ্গরাখার অভ্যস্তরে করবয় আবৃত করিয়া ভূমিলগ্নদৃষ্টি হইয়া দণ্ডায়মান থাকেন। ইহাদিগকে রাজার কিছু জিজ্ঞাস্ত থাকিলে অল্প ব্যক্তি সে সকল কথা জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন। ইহারা তখন ভূমি হইতে চক্ষু তুলিয়া প্রশংসারীকে উত্তর প্রদানপূর্বক পুনরায় স্বস্থানে যাইয়া অবস্থান করেন। রাজার আদেশ না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহাদিগকে তদবস্থায় রাজসভায় থাকিতে হয়। আদেশ পাইলেই পুনরায় অভিবাদন করিয়া দর্শনার্থীরা প্রস্থান করেন। অভিবাদন করাই সম্মান প্রদর্শনের প্রধান উপায়। বৃক্ষকরু যথাসম্ভব উর্ধ্বে উত্তোলিত করিলেই অভিবাদন করা হয়। ইহারা প্রত্যহই রাজাকে অভিবাদন করিতে আগমন করিয়া থাকেন।

আমরা যখন প্রথমে এদেশে আসিয়াছিলাম রাজ্য তখন এই নূতন নগরেই ছিলেন। আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া ফ্রিষ্টোভাও বা ফিগেইরেনো রাজদর্শনে গমন করিয়াছিলেন। আমরা সকলে স্বন্দর পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া গিয়াছিলাম। রাজা তাঁহার সহিত বিশেষ সম্ভাষণ করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার প্রতি এতই অমুগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, মনে হইয়াছিল যেন, রাজা তাঁহার কোন আপন জনকেই আপায়িত করিতেছেন। ফ্রিষ্টোভাও-এর সহিত যাহারা গমন করিয়াছিল তাহাদের প্রতিও রাজা বিশেষ অমুগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। আমরা তাঁহার এত নিকটে গিয়াছিলাম যে তিনি আমাদিগকে স্পর্শ করিয়াছিলেন।

ফ্রিষ্টোভাও তখন রাজাকে কাপ্তান-মেজরের পদ ও উপঢৌকনাদি প্রদান করিলেন। ব্রহ্মদি দেখিয়া রাজা অত্যন্ত প্রীত হইয়াছিলেন। অর্গ্যাম বাদ্য-

যশ দেখিয়া তাঁহার বিশেষ আনন্দ হইয়াছিল। স্বর্ণ-নির্মিত পুষ্পরাশিখচিত্রিত শ্বেত-বস্ত্রে রাজা-শোভা পাইতেছিলেন। বহুমূল্য হীরকহার তাঁহার কণ্ঠে ভলিতেছিল। গ্যালিসিয়ান্ মুকুটের জায় স্বর্ণখচিত্রিত একটি উৎকৃষ্ট রেশম-মুকুট তিনি শিরে ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার চরণগুণল অনাবৃত ছিল। রাজ্যের সম্মুখে উপস্থিত হইতে চাইলেই নগ্ন চরণে যাইতে হয়। এ দেশের অধিকাংশ অথবা সকল লোকেই নগ্নপদে থাকে। এ দেশের পাদুকার অগ্রভাগ সেকালের পাদুকার জায় সরু ; কোন কোন পাদুকা আবার একপ যো শুধু তলা ভিন্ন আর কিছুই নাই। উপরিভাগে কয়েকটি ফিতা আছে। তাহাদের দ্বারাই পাদুকা চরণসংলগ্ন করা হয়। পুরাকালে রোমকগণ যেরূপ পাদুকা ব্যবহার করিত এগুলিও সেইরূপ। ইটালী হইতে যে সকল প্রাচীন কাগজ-পত্র আইসে তাহাতে অনেক মূর্তির চরণে এইরূপ পাদুকা দেখা যায়। রাজদর্শন শেষ হইলে রাজা ফ্রিটোভাওকে একটি স্বর্ণভূষিত কাবায়া (পরিচ্ছদ) এবং শিরোভূষণ প্রদান করিয়াছিলেন। এই শিরোভূষণ রাজ্যের নিজের শিরোভূষণের জায় ছিল। প্রত্যেক পৃষ্ঠগৌড়কেই রাজা এক একখানি অতি স্থূনর কারুকার্যসমবিত স্বর্ণ-খচিত্র বস্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন। ইহাই এদেশের রীতি। ঘেহ ও সৌখ্যের নিদর্শন স্বরূপ এইরূপ উপহার প্রদত্ত হইয়া থাকে।

(ক্রমশঃ)

ঐরাজেস্ত্র লাণ আচার্য্য

সমস্যা ও সমাধান

১

ভাব্তাম আগে কাব্য লিখা শব্দ নয়ত মোটে,

কাব্যকলার উপযোগী ভ্রব্য যদি জোটে ।

চাঁদের আলো, হেনার গন্ধ, দখিণ হাওয়া বৃহ,

পদ্মপারা মুখটি প্রিয়র রইবে ফুটে' শুধু ;

বইবে জোরার জ্বলন গাঙে, কলম ছুটে'বে জোরে

রং বিরঙে কবির খাতা স্বয়ং উঠ'বে ভ'রে ।

২

উপকরণ জুটলো যদি সময় হয়না আর,
সাত সাগরের ডেউ লেগে যে মনটি তোলপাড় !
কতু সোচাগ, মানের পালা, কখন বিরচ ;
রাগিন্ নেশায় মত্ত, কতু হঃখ হঃসহ !
সাধা কি যে ক্ষণেক তরে চিত্ত করে হির
কল্পনাকে জন্মিয়ে নিয়ে করব কাব্য-কীর ।

৩

পার্শ্বে বসি' মৃচ্ছিকি হাসি' পরিয়া ছ'টি কর
প্রিয়া যখন আবেগভরে ডাকবে "প্রাণেশ্বর,"
স্বর্গ যেন রাগিয়া উঠে ধুলির মরার'পরে,
ইন্দ্রধনুর বর্ণবিভব আকাশ বেয়ে করে !
ভাবসাগরে তলিয়ে গিয়ে আপ'না পাইনে পুঁজে,
—কাব্য লিখা যায় কি তখন, তোমরাই দেখ বুঝে !

• ৪

'বাকিয়ে আনন্' আবার যখন প্রিয়া বসেন্ মানে,
তর্কগুঞ্জে গভীর রোষে বচনের বাণ হানে,
কাদিয়া বলে, "সোয়াস্তি তব আমার মরণ হ'লে,"
—বদিও জানে, মিথ্যা অমন নাই ধরণীতলে—
ফাঁপর হয়ে শব্দা'পরে ছটফটিয়ে মরি,
কবিতা তখন কেমনে লিখি, দেখনা বিচার করি' !

৫

মাসের বাইশে ;—গিমি এসে বলেন, "ওগো কবি,
দিয়েছিলে যা ধরচ পত্রের দুরিয়ে গেছে সবি ।"
কবির মাথায় বজ্রাঘাত, চক্ষে সরসে ফুল ;
"তিরিশ তক্তা চাই যে আরো,"—পায়রা ভেবে কুল ।
কাব্য-জগৎ ব্যাপ্সে আসে, স্বপ্ন বে যায় টুটে !—
তুচ্ছিম পাতে কোমল কুঁড়ি সাধা কি যে ফুটে !

৬

* স্থিতিবা যদি একেলা থাকি' সুবিধা হবে পূব,
কাব্য-গানে যখন খুসি মারিতে পারি তুব ।
এই না ভেবে, যুক্তি করি' অশ্রদ্ধা ভেজে'
প্রিয়র দিহু ঘরে ঠেলে, প্রবাসে গেছ নিজে ।
হায়রে মৃগ্য অন্নদর্শী, বৃদ্ধি কি তোয় বল,
সুকল কাবোর গোড়া কেটে আগায় ঢালিস্ জল !

৭

মেজাজুটা যার বিগড়ে গেছে দুঃখবাসের ফলে,
একলা থাকা পোষায় কি তার লক্ষ্মীছাড়ার দলে ?
জগৎ তেকে বেবাক ফাঁকা, শূন্য দিক্ দশই,
শয্যা যেন কণ্টকিত, তথু যেন শব্দী !
ইচ্ছা করে প্রাণটা জুড়াই গেঁথে মিলের রাশে
আপ্নি গরমিল—মিলের বাধন কোথা হ'তে আসে ?

৮

ছাড়তে হ'ল কাজে কাজেই কবিতার চর্চা ।
ক্রমে, ছেলেপিলের আবির্ভাবে বেড়েও গেল থর্চা ;
সংসারেরি গুণগোলে মুণ্ড গেল ঘুরে'
দণ্ডবিধির কুটতর্ক চক্ষিণ ঘণ্টা জুড়ে' ।
আহার করি, শয়ন করি আপিস করি রোজ ;
—বিসর্জিয়ে কাব্যচিন্তা রূপচাঁদেরি খোজ ।

শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী

স্বগত

নূতন বৎসরে পুরাণ পাতার বুক অঁচড় কেটে, কোনও নূতন কথা
লিপ্তে পারব, এ কথা যদি আমি আশা করি, তাহলে নিরাশ হতে হবে ।

• নূতন আমার মোটেই টানছে না, পুরাণর বাধনে আমি বাধা আছি,
ছাড়তেও চাইনে । স্বপ্ন, আমার স্মৃতি পুরাণকে নিয়েই, গেল বৎসরে যা
আমার হারিয়ে গেল, তা কি সত্যই হারাল, তা কি চিরদিনের জন্য অন্তরে

সম্বন্ধে রইল না? হারিয়ে যা পেলাম, তারি আনন্দ আমার বিচ্ছেদের মধ্যেও সাহসনা দিতেছে। আমি যে সারিধা নিরন্তর অমুভব করছি, যার আকর্ষণ সন্ধ্যায় আমার আগার নির্জন গরের দিকে টেনে আনে, অন্ধকারে নিশ্চরতার মধ্যে নিম্নাঙ্গীন বারিতে যে রেহম্পর্শ আমার আচ্ছন্ন করে রাখে, সে যে সব চেয়ে সত্য, কেননা সে প্রমাণ-নিরপেক্ষ, আমি-তাকে সর্বাঙ্গঃকরণ দিয়ে অমুভব করি। চোখে যা দেখি, হাত দিয়ে যা স্পর্শ করি তার মধ্যে অসম্পূর্ণতার অভাব থেকে যায়, কেননা দৃষ্টি আর স্পর্শ-শক্তি উঠেই সীমাবদ্ধ, মন দিয়ে যা পাই, তাই পরিপূর্ণ ভাবে পাওয়া। তবু এই শরীর দারণ করে আছি বলেই শুধু মনের পাওয়ায় মন মানে না; চক্ষে প্রত্যক্ষ দর্শন, শরীর দিয়ে স্পর্শ, স্পর্শ-অমুভূতির জন্ত নিরন্তর একটি ব্যাকুলতা ছেগে থাকে। সম্পূর্ণ পেয়েছি কেনেও অবিচ্ছেদ্য সঙ্গ অমুভব করেও, দেহবৃত্তি দৃষ্টি ও স্পর্শের সার্বকতা চায়।

হে বন্ধু, হে আমার সঙ্গদয়, তুমি অন্তরে আমার আশ্রয় নিয়েছ জানি, তবু একবার দৃষ্টির ব্যাকুলতাকে চরিতার্থ কর, একবার শ্রবণে পিপাসাকে পরিতৃপ্ত কর, রেচ-স্পর্শ তাও যদি ওল'ত হয়, তবে চোখে একবার দৃষ্টি রাখ, শ্রবণকে একবার প্রিয়সহায়কে মুগ্ধ কর। সারাদিনরাত বীণাতন্ত্রীতে সঙ্গীতের মত আমি তোমায় এই দেহে অমুভব করি, দৃষ্টিতে আলোকের মত তুমি অপ্রত্যক্ষ হয়েও চিরদিন রয়েছ। এক মুহূর্ত্তও যে আমি তোমায় দূরে থাকতে পারিনা, তোমার স্মৃতি নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসের মত সহজভাবে আমার জীবনকে অমুপ্রাণিত করে রেখেছে। আমি শুধু জানতে উৎসুক, তুমিও সেটা অমুভব কর কি না—তুমি আমার সে কথা বুঝিয়ে দেবে না? নিশ্চয়ই দেবে—আমি তদ্বয় হয়ে প্রতীক্ষা করে থাকলেই আকাঙ্ক্ষার সাফল্য অর্জন করব।

আমাকে জানতে চাও বন্ধু, কেমন করে জানবে, অত দূর হতে? আমার পরিচয় আমি কেমন করে তোমায় জানাব? ভাবায় কেমন করে প্রকাশ করব মনে যা শুধু আভাসেই আছে। আত্মপ্রকাশ সে ত আপনার অলক্ষ্যে, “আমি”র অজ্ঞাতেই হয়ে থাকে। যাকে জানতে চাই, তার হাসি, তার কথা কহিবাব ভঙ্গী, তার চোখের দৃষ্টি, তার বিবেচনারহিত তুচ্ছ-কথা, তার সহজ সরল ভাব, তাকে অকস্মাৎ কিংবা সততই প্রচার করতে থাকে। মহাজ্ঞানী জ্যোতির্বিদও দূরবীক্ষণের দ্বারা কেবল মাত্র সুদূর

নক্ষত্রের আকারটুকুই ধরতে পারেন, প্রাণের খবর কিছুই পান না। জানতে চলে, আর্ত্ত করতে চলে—নিরীক্ষণই প্রকৃষ্ট উপায়।

অপরে বানিয়ে বানিয়ে যা বলে, কিংবা ছোড়াতাড়া দিয়ে যা গড়ে তোলে, তার চেয়ে নিজে যা আবিষ্কার করা যায় তাইত অধিক শ্রীতি-কর ও তৃপ্তিজনক। কল কারখানার চেয়ে রহস্যময়ী প্রকৃতি, জীবন চকল মাগুয়ের মন, অলোকদীপ্ত আত্মা কি অধিক জ্ঞানবার মত নয়। আমি নিজের সম্মুখে যা বলবার চেষ্টা করব, তার মধ্যে ঐ চেষ্টার অল্পই একটা কৃত্রিমতা থাকবেই, তাই ভয় হয়, যে নিতান্তই মাটি দিয়ে গড়া, এই পৃথিবীর ধুলির সন্নিহী, তাকে দেবীপ্রতিমা বলে বা পরিচয় দি'—শিব সেখানেও শব যদি দরা পড়ে তাতে কৃতির সম্ভাবনা কম।

নিজেকে অপরের কাছে বাস্তব করব কেমন করে? আমি কি আপনাকে আপনি 'সম্পূর্ণ জানি? আমি শুধু কি অখণ্ড এক? মনের মধ্যে দেখতে পাই শুধু একটি "আমি" নয়—অনেকগুলি, মনের এ ঋতুসংহার করতে পারি কি? তাদের প্রত্যেক কালকে হুটিয়ে তুলতে, সম্পূর্ণ করবার জন্তে যে 'আলো', যে অতাস অবশ্যক, তা আমার আয়ত্তে কোথায়? তবু এক জনের যা' পরিচয় পেয়েছি তাধের কথা। বলতে পারি—আমার মনের মধ্যে এখনও একটি বড় অবৈধা পাগল চকল ছেলেমাধুষ বসবাস করছে।

কল্পনাকে সে একেবারে সত্য বলেই বিশ্বাস করে—সে কল্পনার যা ভাঙে গড়ে, সেই তীর বাস্তব জগৎ; যেতে যেতে কোন্ 'গোলোক' ধাঁধায় গিয়ে পড়বে, কোন্ 'আকাশচর্ণ' তার মাথায় ভেঙে পড়ে তাকে চেপে মারবে, অদূর-দৃষ্টি সেই শিশু তার কিছুই ধারণা করতে পারে না। ভাবে খেলায় যে বয় পেতেছে, জীবন বৃদ্ধি তাই, বৃদ্ধি কেন, নিশ্চয়ই তাই। তার পর যখন গোলকধাঁধার পথ হারায়, সফ্যার 'বাতি' জ্বালা, তার চিরদিনের আশ্রয় নিরালা। পরখানি আর দেখতে পায় না, যখন 'আকাশকুহল' শুকিয়ে ঝরে যায়, 'আকাশচর্ণ' খসে পড়ে' চেপে মারতে চায়, তখন সে হাহাকার করে কঁদে ওঠে, হাত বাড়িয়ে ডাকে ওগো ভূমি বাঁচাও। মনের মধ্যে আবার একজন বড় বিজ্ঞ আছে, সে গভীর স্থির হয়েই আছে, নিবেদিত পূর্ণাঙ্গ সে নিবিড় জানী, আত্ম-অবমাননা মনে করে! তাই যখন অবৈধা শিশু মরুভূমির মরীচিকার দিকে ছুটে চলে, অন্ধকূপে পদার্পণ করে, আবর্ত্তে আপ দিয়ে পড়ে, খাপদ-সঙ্কল অরণ্যের* অন্ধকার নিরাশ্রয়ে

প্রবেশ করে, তখন সে কিছুই বলে না, মানাও করে না, উৎসাহও দেখুনা। তাই বলে' সে উদাসীন নয়, বিপদ যখন ঘনিষে আসে, উদ্ধারের পথ যখন নিতান্ত সঙ্কীর্ণ ও সঙ্কট হয়ে ওঠে, তখন রক্ষা সেই করে, নিরাপদ সেই আনে। অথচ উপদেশ বাক্যের অপব্যয় করে না। ঠেকে শেখা দে সব-চেয়ে সেরা-শেখা, মৌন থেকেও সেই চিরন্তন জ্ঞানই প্রকাশ করে।—এ ছাড়া আরও কত জন আছে, কেউ কবি, কেউ চিত্রকর, কেউ বা সঙ্গীতাত্মরাসী, কেউ সাধক, কেউ প্রেমমুগ্ধ ভক্ত। কেউ বা লোভী, কেউ বা একটু কপটতাপ্রিয়, অহংজ্ঞানে ভরপুর; এ ক্ষণিক “আমি”গুলির সমাবেশে—
যে সমগ্র “আমি” গড়ে উঠেছে, তাকে প্রকাশ করা কি আমার সাধা, বিশেষতঃ ভাষায়! বহুদিনের একত্র বসবাসের ফলে অলক্ষ্যে যে অতি-বাক্তি হয়, সেই যথার্থ জ্ঞান, আর জানা যায় মুহূর্তের মধ্যে ভালবাসার আলোতে। সে চোখে যে আগায় দেখবে, সে হয়ত জানবে! আমি কিন্তু যে কেমন করে আপনাকে কুটিয়ে প্রত্যক্ষ করে তুলব, সে বাছনয় ত আমার জানা নাই—সে বায়াতুলিকাঠি বা আগার আগন্তে কই আছে!

মানসী

অচলালয় .

তোমায় নিয়ে বাঁধব হে ঘর—

এই বাসনা জাগল মনে,

ওগো আমার মানিক, ভাব-সেঁচা দন,

গিরির বুকে, এই ত্রিভুজনে!

যেথায় ধরা ধরতে গিয়ে

উৎলে ওঠে উল্লসিয়ে,

অস্ত্রবিচীন হাত বাড়িয়ে

চায় গো তোমায় পরাণপণে,

তোমায় নিয়ে বাঁধতে বাসা

জাগল আশা সেই গোপনে।

আকাশভরা কেবল তোমার

মহিমার ওই দীপ্তি জলে;

• পূজকভরা বিজয়-গানে যেথায়

• নিরঝর উছলে চলে;

• পানীর মুখে কচিৎ যেথায়
 কারা বৃকে বাজিয়ে দে যায় ;
 হাওয়া চাওয়া নিমেষ নেশায়
 কেবল ছ'চার খবর বলে,
 শূন্য যেথায় পূর্ণ হ'য়ে
 প্ররূপ রূপেই মর্শ্ব ফলে !

• আনন্দের এই বিরাট আধার
 নীল নভসেই আঁকড়ে ধরে ;
 মেঘের মোচন ওই মেখলা
 দিগন্তা যেথায় পরে ;
 কিরণ-বাসে জড়িয়ে দেহ
 তাসে যেথায় মায়ার স্নেহ
 ডালিম-তলায় বাধতে গেছ
 এই এ কোণে' এ অনন্তরে—
 সাধ ভেগেছে আজ গো আমর
 * সাস্ত করি অনন্তরে ।

ভূগের যেমন নিবিড় বাধন
 এই এ মচান অচল সনে,
 তেমনি ভোমার চরণ-তলায়
 বাধব আমার কুটীর-কোণে !
 মিটিয়ে নিয়ে দায়ের ভোগে,
 চুকিয়ে দিয়ে মোচের রোগে
 মিলব আমি অচল গোণে
 তেমনি করেই আপন মনে ;
 ভূগের যেমন অটুট বাধন
 গগনভঙ্গী ভূদর সনে !

শ্রীদেবকুমার রায় চৌধুরী

“লেড্‌কী মর গেয়ী”.

আশী বৎসর পূর্বে মুরসিদাবাদ রাজধানীর এক ক্ষুদ্র গ্রামে, ততোধিক ক্ষুদ্র এক দরিদ্র মুসলমান একপানি ক্ষুদ্র কুটীরে বাস করিত। তাহার নাম ছিল মোবারক আলি মিঞা। মোবারক অতি কষ্টে দিনপাত করিত। সে দরজীর কাজ করিত। বড়লোক আমীর ওমরাহদিগের সহিত তাহার পরিচয় ছিল না, আর সে দরজীর কার্যো ও বিশেষ পারদর্শী ছিল না; হুতরাং সে সাধারণ মুসলমানের পিরিহান, পাগড়ামা প্রভৃতি সামান্য কার্য্য করিয়া মাতা-উপার্জন করিত, তাহাতেই কোন প্রকারে তাহার সংসারমাতা নির্বাহ হইত। সংসারে ছিল তাহার এক ধর্মপরায়ণা পত্নী ও একটি কন্যা। কন্যাটি আমীর ওমরাহদিগের বরের পথ ভুলিয়া এই দরিদ্র দরজীর কুটীরে জন্মগ্রহণ করিয়া-ছিল, পাড়ার সকলেই বলিত যে মেয়ে নয় যেন একটা পরী।^{*} নসিবনের আকর্ষণবিশ্বৃত চক্ষুদ্বয়ের শোভা অপার্থিব ছিল, সে চক্ষুর দিকে চাহিলে লোকে মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারিত না।

নসিবনের বয়স যখন চৌদ্দ বৎসর, তখন কয়েকদিন অরে ভূগিয়া তাহার মাতা পরলোকে চলিয়া গেছেন; মোবারক আলি মিঞা একেবারে অকূল পাথারে পড়িল। সে সাধারণ মুসলমানগণের মত বিলাসী ছিল না; সকলেই তাহাকে বিনীত, পরহুঃখকাতর, ধর্মপ্রাণ বলিয়া জানিত। সে তাহার সেই ক্ষুদ্র কুটীরের দাবাঘ বসিয়া পিরিহান সেলাই করিত; আর মেয়েটিকে লেখাপড়া শিখাইত; কত রাজা বাদশাহ গল্প বলিত, কত সাধু ফকিরের জীবন-কথা বলিত। হজরতের পবিত্র জীবন-চরিত, পীর পরগণ্ধরদিগের অভুলনীর আশ্বোৎসর্গের বিবরণ সে নসিবনকে বলিত; নমাজের সময় সে নসিবনকে সঙ্গে লইয়া বসিত, প্রতিদিন যথানিয়মে পিতা ও পুত্রী পবিত্র কোরাণ সন্নীফের স্বর্গীয় উপদেশাবলি পাঠ করিত। মেয়ে নসিবন কিন্তু ধর্মকথা ও উপদেশ অপেক্ষা রাজা, বাদশাহ, আমীর, ওমরাহদিগের ধন, দৌলত, কোঠা, বালাখানা, আমোদ, আনন্দ, বিলাসিতার কথা শুনিতেই ভাল বাসিত; আর তাহার বাগিকা-প্রাণের মধ্যে ঐ সকল পার্থিব স্বর্থ সন্তোষের জন্ত একটা লালসা বাড়িয়া উঠিত। পিতার ক্ষুদ্র কুটীরের ছিন্ন কছার শয়ন করিয়া সে নবাবজাদীর হৃৎকেননিত শয্যা, আতর ওলাঘের গন্ধ, বহুমূল্য পরিচ্ছদ পরি-হিতা দিলাস-বিক্রময়ী বেগমদিগের স্নেহ ও আরামের কথা চিন্তা করিত,

কল্পনার সে সেই সকল আশ্রম সম্ভোগ করিত। কুটারের দাবার বসিয়া সে সমুদ্রাশ্রিত বন জটিলপূর্ণ স্থানকে নবাবের প্রমোদোদ্ভানে পরিণত করিয়া এক দৃষ্টিতে তাহাই দেখিত; সেই কল্পনার রাজ্যে ভ্রমিয়া যাইত। একটি দরিদ্র দয়াজীৱ চৌদ্ধ বৎসর বয়সেই তনয়ার এ সকল সাধ কেন হইত, ছেঁড়া চটে শয়ন করিয়া সে গাথ টাকার স্বপন কেন দেখিত, যাহার গৃহে কোন দিন পাঁচটি টাকা থাকিত না, সে আসবুতী মোহরের গণনা কেন করিত, তাহা কেমন করিয়া বলিব? হৃদয় গৃহের ভাঙ্গা দর্পণধানিতে সে যখন তাহার অতুলনীয় রূপ দেখিত, তখন তাহার মনে এই সকল কথা জাগিয়া উঠিত; সে হয় ত তাহার সেই সুন্দর মোহিনী রূপ দেখিয়া নিজেই মুগ্ধ হইত, তাহার প্রায়োত্তির যৌবন-শোভা তাহাকে আর এক জগতের সংবাদ দিত, সেখানে নাটীর সান্ধি, টিনের বগনা, মোটা আউস ধানের চাউল, পাকা বেগুনের কাবাব কিছুই অস্তিত্ব থাকিত না; সেখানে সোনার খালায় পোলাও, কালিয়া থাকিত, সেখানে বাঁশীরা চামর ব্যঞ্জন করিত। গরীবের পরমাস্বন্দ্য ময়ের মাথার মধ্যে এই সকল আভ্যুপবি খেলায় কি জানি কেমন করিয়া প্রবেশ লাভ করিয়াছিল! বাস্তব জীবনে যে সমস্ত দুঃখ কোন দিন তাহার চক্ষুচক্ষের গোচর হয় নাই, কল্পনায় সে সেই সমস্ত লইয়া এক নূতন জগৎ নিৰ্মাণ করিয়াছিল।

ময়ের ভাবগতিক দেখিয়া মোবারক মিক্সা বড়ই চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিল। কেনের বিবাহ দিবার কথা যখন তাহার মনে হইত, তখন সে ভাবিয়া কুল কিনারা পাইত না। এমন পরীর মত সুন্দরী, এমন শিক্ষিতা কস্তাকে সে যাহার তাহার হাতে কেমন করিয়া দিবে? আর নসিবন চলিয়া গেলে সে কাহার মুখ চাহিয়া ধরে থাকিবে;—সেই মেয়েই যে এখন তাহার যথাসর্ব্ব্বণ। সেই মেয়েকে সে ত ছাড়িয়া থাকিতে পারিবে না। এক এক সময় সে মনে করিত, একটি শিক্ষিত সচ্চরিত্র ছেলে আনিয়া তাহাকে ঘরকামাই করিবে। কিন্তু তাহার মত অবস্থাপন্ন মুসলমানের গৃহে শিক্ষিত সচ্চরিত্র ছেলে কোথায় মিলিবে? মেয়ের বয়স যে ক্রমেই বাড়িতেছে, তাহার রূপ যে উৎকলিত হইয়া দেখিয়াও মোবারক মিক্সা তাহার বিবাহের কোনই ব্যবস্থা করিয়া উঠিতে পারিল না। ছই চারিটা সখন্ধ যে আসে নাই, তাহা নহে; কিন্তু সে রকম ছেলের হাতে সে নসিবনকে কিছুতেই দিতে চাহিল না। তাহার নসিবনের রূপ দেখিয়া আকৃষ্ট হইয়াছিল, তাহার নসিবনকে সহধর্ম্মিণী না করিয়া বিলাস-সঙ্গিনী করিতে প্রয়াসী। সে সকল ছেলের হাতে সে প্রাণ থাকিতে নসিবনকে

সমর্পণ করিতে পারিবে না। নসিবনকে দেখিয়া পাড়ার কয়েকজন উচ্ছ্বল যুবক তাহাকে কুপথে লইয়া ঘাইবার জন্য উদ্ভিগ্না পড়িয়া লাগিয়াছিল। তাহার পথে ঘাটে অনেক সময় তাহাকে নানা প্রলোভন দেখাইত; নসিবন ইচ্ছাসেৱ অৱস্থা জানিত, ইচ্ছাসেৱ প্রকৃতিও জানিত। সে যে স্বর্ণের কথা ভাবিয়া রাখিয়াছিল, তাহার জন্যে বিলাসিতার যে উচ্চ আদর্শ অঙ্কিত হইয়াছিল, এ সকল যুবক তাহা কোথায় পাইবে? নসিবন ক্রান্তরও কোন প্রস্তাবে কর্ণপাত করিত না। মোবারক মিঞাও মেয়ের বিবাহ দিবান্ব উপযুক্ত বয়স পাইয়া আন্নার উপর নির্ভর করিয়া কিছুদিন সবর করিবারই সম্মত করিয়াছিল।

নসিবনের পিতা সামান্য দরজী, তাহার দাসদাসী রাখিবার সঙ্গতি ছিল না; নসিবনই মায়ের মৃত্যুর পর চইতে ঘর গৃহস্থালীর সমস্ত কাজ করিত; আর অবসর সময়ে আশ্মানে দৌলতখানা বানাইয়া তাহারই মধ্যে নিমগ্ন হইয়া থাকিত। উচ্চ শ্রেণীর মুসলমানগণের মধ্যে পরদার গুব কড়াকড় তখনও ছিল, এখনও আছে। তাহাদের অন্তঃপুরিকাগণ কখনও কাহারও সাক্ষাতে বাহির হন না। কিন্তু যাহাদের অবস্থা মন্দ, যাহাদের দাসদাসী রাখিবার সঙ্গতি নাই, তাহাদের মেয়েরা অবশ্য হাটে বাজারে যান না, কিন্তু পাড়ার মধ্যে বেড়াইয়া থাকেন, গৃহের অদূরবর্তী ক্রীড়া ক্রীড়াশয় হইতে জলও লইয়া আসেন। নসিবনকেও এ সকল কার্য্য করিতে হইত। তাহাদের বাড়ী চইতে কয়েক রাস দূরে একটা কূপ ছিল; নসিবন সর্বদা সেই কূপ চইতে জল আনিত এবং সেই সময়ই পাড়ার যুবকেরা তাহাকে নানা কথা বলিত, নানা প্রলোভন দেখাইত। কিন্তু নসিবন সে সমস্ত প্রলোভনে মোটেই কর্ণপাত করিত না। সে সকল সামান্য প্রলোভন তাহার নিকট অতি তুচ্ছ বলিয়া বোধ হইত। সে চাহে অতুল ঐশ্বর্য্য, সে চাহে বিপুল বিলাস; মুরসিদাবাদের সামান্য মুসলমান-যুবকেরা তাহা কোথায় পাইবে? তাহারা চইত পঁচশত টাকার প্রলোভন দেখাইত; ভাল বাড়ী, অনেক পোষাক পত্র, চই চারিটা দাসী বাদী বা কিঞ্চিৎ আতর ওলাবের কথাই বলিত; কিন্তু মণি মুক্তা হীরা রত্নরাজপ্রাসাদ তাহারা কোথায় পাইবে? বিলাসের সহস্র উৎকৃষ্ট উপকরণ তাহারা কেমন করিয়া এই স্বন্দরীর চরণে ঢালিয়া দিতে পারিবে? সুতরাং তাহাদের অকিঞ্চিৎকর প্রলোভনে নসিবনের মন টলিত না।

এমনই ভাবে কিছু দিন যায়, এমন সময় নসিবন একদিন তাহার মনের মত একটি মাহুকে* দেখিতে পাইল। তিনি মুসলমান নহেন, নসিবনের প্রতি-

বেশীও নহেন,—তিনি জ্ঞাতিতে খুঁটান। তাঁহার নাম মিঃ ফ্রিম্যান। ফ্রিম্যান সাহেবের নাম তর্কন মুরসিদাবাদ অঞ্চলের সকলেই জানিত; তাঁহার মত ধনাঢ্য নীলকর তখন ও প্রদেশে ছিল না। নীলের কাজ করিয়া ফ্রি-মান সাহেব যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করিয়াছিলেন এবং সে অর্থ যে কেমন করিয়া ব্যয় করিতে হয় তাহাও তিনি জানিতেন। তাঁহার প্রকাণ্ড অট্টালিকা, তাঁহার বাগবাগিচা, তাঁহার গাড়ী ঘোড়া,—তাঁচর বহুমূল্য আসবাবপত্র মুরসিদাবাদ অঞ্চলের অনেক লোকেই দেখিত, এবং এই রটলাও-দেশীর সাহেবটিকে সকলেই বিশেষ খাতির করিত।

একদিন অপরাহ্নকালে নসিবন যখন কূপ হইতে জল লইয়া আসিতেছিল, তখন সেই পথে ফ্রিম্যান সাহেব অস্বাস্থ্যবোধে গমন করিতেছিলেন। তাঁহার দৃষ্টি চত্বে নসিবনের উপর পতিত হইল। তাঁহার মনে হইল এমন সুন্দরী তিনি জীবনে কখনও দেখেন নাই। তিনি একদৃষ্টে নসিবনকে দেখিতে লাগিলেন। নসিবনও সাহেবকে আসিতে দেখিয়া পথের পার্শ্বে যাইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সেও একবার সাহেবের দিকে চাহিল; চারি চক্ষুর মিলন হইল। নসিবনের মনে হইল এমন রূপ সে তাহার জীবনে কখনও দেখে নাই। ফ্রি-মান সাহেব তখন সমুদ্রবিশ্রুতি বর্ম্মীয় যুবক; তাঁহার চেহারাও অতি সুন্দর ছিল। সেই দৃষ্টি বিনিময়ের সঙ্গে সঙ্গেই উভয়ের হৃদয়ের মধ্যে একটা বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। এমন ভাবে পথের মধ্যে দাঁড়াইয়া থাকা অসম্মত মনে করিয়া ফ্রি-মান সাহেব চলিয়া গেলেন, নসিবনও ধীরে ধীরে কুটারে ফিরিয়া আসিল। কল্পপুংসব আপনার কার্য শেষ করিয়া স্বস্থানে চলিয়া গেলেন।

তাঁহার পর কারণে অকারণে ফ্রি-মান সাহেব প্রতিদিন সকালে বিকালে নসিবনের বাড়ীর সম্মুখের পথ দিয়া যাতায়াত আরম্ভ করিল। নসিবনও গৃহের সমস্ত কার্যাই করে, অথচ তাহার কাশ থাকে অশ্বপদশব্দের দিকে। দূরে অশ্ব-প্রদর্শন শুনিলে সে তাহাদের গৃহ-প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়ায়। অপ-রাহ্নে যখন সাহেব ঐ পথে আসিবে বলিয়া তাহার মনে হয়, তখন সে কলসী-ভরা জল উঠানের পার্শ্বে ছোট ছোট গাছগুলিতে ঢালিয়া দিয়া জল আনিবার ক্ষুদ্র অঙ্গুরবস্তী কূপের দিকে যায়। যতক্ষণ সাহেবকে দেখিতে না পায় ততক্ষণ মানা অছিল্য কূপের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বা বলিয়া থাকে। প্রথম প্রথম কেবল দৃষ্টি-বিনিময়, তাহার পর ক্রমশঃ হস্ত-বিনিময় চলিতে লাগিল। সাহেব অপ-

রাহ-নমণটা সাফা-নমণে লইয়া ফেলিলেন। নসিবনও তখন স্কুলার অঙ্ককল্প ঘনাইয়া আসিলে জল আনিতে যাওয়া আরম্ভ করিয়া দিল। বেদিন পাখে লোকজন না থাকিত, সেদিন দুই চারিট কথাও হইত। প্রণয়ীসুখলের মধ্যে সে সময় কি কথাবার্তা হইত, তাহা বলিবার বোধ হয় বিশেষ প্রয়োজন হইবে না; গাছারা তুচ্ছভাষী তাহারা যথেষ্ট কথাগুলি ভীষিয়া দিইতে পারেন।

এ সকল ব্যাপার কোন দিনই গোপন থাকে না। বিশেষতঃ নসিবনের প্রণয়প্রাপ্তি উপেক্ষিত সুবকের সংখ্যা কম ছিল না। তাহারা শীঘ্রই সমস্ত কথা জানিতে পারিল—পাড়াহর গোলামগং উঠিল। কথাটা নসিবনের পিতা মোবারক মিঞারও কর্ণগোচর হইল—একটু অতিরঞ্জিত হইয়াই কথাটা তাহার কাণে গেল। এত দিনের মধ্যে সাচের একদিনের জন্তও নসিবনের অন্তর্স্পর্শ করেন নাই। কিন্তু কুৎসাকারিগণের রসনা নসিবনের নৈশ অভিসারের নানাবিধ কল্পিত কাহিনী রচনা করিতে লাগিল। ভাগমাছন মোবারক আসি মিঞা তর্জন গর্জন করিতে জানিত না,—সংসারের সঘন একমাত্র কথা কুপণ-গামিনী হইয়াছে শুনিয়া তাহার অতিশয় মর্শ্বণীড়া জ্বলিল, তাহার হৃদয় অশান্তিতে পূর্ণ হইল বটে, কিন্তু নসিবনকে শাসন করু—“ও আত্মা, তাহা ত আমি পারিব না।” মোবারক মিঞা কথাটা যেন শোনেই নাই, এমনই ভাবে কতকগুলি পত্রিচালিত করিবার জন্ত নানা উপদেশ প্রদান করিতে লাগিল। কথা-প্রসঙ্গে অসতী রমণীদিগের ভবিষ্যৎ ভূগতির কথা বলিতে লাগিল।

স্নেহময় পিতার এ সকল উপদেশের কারণ বুঝিতে নসিবনের বিলম্ব হইল না। তাহার মনে হইতে লাগিল, হয়, এ কি করিতেছি! কিসের জন্ত এমন পিতার, এমন ক্রমাশীল দেবতার হৃদয়ে বেদনা দিতেছি! আমার সমস্ত অপরাধ তিনি ক্ষমা করিয়া লইতে প্রস্তুত; এমন পিতা কি কাহারও ভয়! না না! আমি এমন পিতার হৃদয়ে বেদনা দিতে পারিব না, আমি তাহার হৃদয় অশান্তিপূর্ণ করিতে পারিব না। কিন্তু পরকণ্ঠেই সাহেবের ঘোচন মূর্ধি তাহার হৃদয়পটে প্রতিফলিত হইয়া উঠিত। অতুল ঐশ্বর্য, বিপুল বিলাস-নামগী, অশেষ সুখ সম্ভোগ তাহার চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করিয়া দিত। সে যে আসমানে স্থপের বাসা বাধিয়াছিল, সেথান হইতে সে কেমন করিয়া বাহির হইবে। একদিকে পিতার ঘেহ, পিতার আদর, পিতার ক্রমাশীলতা, পিতার দর্শপ্রাণতা তাহার চিত্তকে বাণিত করিতে

লাগিল,—আর একদিকে কে যেন বিলাস-মোহের তীরে মদিরা তাহার শুককণ্ঠে ঢালিয়া দিতে লাগিল । কিশোরীর হৃদয়ে দেবান্নরের প্রবল বৃদ্ধ আরম্ভ হইল । অবশেষে অশ্রুরেই জয় হইল । নসিবন পিতার রেচ, তাহার আদর, তাহার মনোবেদনার কথা ভুলিয়া গেল ।

একদিন ‘রাত্রিকালে’ ফকিরের ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া পাকী লইয়া পূর্ণ-নিষ্কিষ্ট স্থানে সাড়েৰ আসিয়া ঠাড়াইলেন । নসিবন পিতার হেচ পাশ ভিন্ন করিয়া, ক্ষুদ্র কুটীর ত্যাগ করিয়া সাড়েবের দৌলতখানায় স্থগে স্বচ্ছন্দে জীবন কাটাইবার জন্ত চলিয়া গেল । সাড়েব পূর্ণেই মুরসিদাবাদ হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত ঘোড়া ও পাকীর ডাক বসাইয়াছিলেন । সেই রাত্রিতেই তাঁহার কলিকাতায় চলিয়া গেলেন ।

মিষ্টার ফ্রিম্যান যুবক হইলেও ধর্ম্মভীর ছিলেন । নসিবনকে তিনি রক্ষিতাভাবে রাখিবার অভিপ্রায়ে গৃহবহিষ্কৃত করেন নাই । পণে যাইতে নাইতে তিনি নসিবনকে বুঝাইয়া দিলেন যে, তিনি তাহাকে যথারীতি বিবাহ করিবার জন্তই লইয়া আসিয়াছেন । নসিবন যদি গৃহধর্ম্মে দীক্ষিতা হইয়া তাহাকে বিবাহ করিতে অস্বীকার করে, তাহা হইলে তিনি তাহাকে গৃহে রাখিয়া আসিতে প্রস্তুত আছেন । নসিবনের এত কথা ভাবিবার অবকাশ ছিল না—এসকল বিষয় চিন্তা করিয়াও সে গৃহত্যাগ করে নাই । সাড়েবের এই প্রস্তাব শুনিয়া সে চিন্তিতা হইয়া পড়িল । ধর্ম্মপ্রাণ পিতার কথা তখন তাহার মনে হইল, পবিত্র ইসলাম ধর্ম্মের মহান্ উপদেশাবলী তাহার স্মরণ হইল । এসলমান ধর্ম্মছাগ করিয়া গৃষ্টানের ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে তাহার ইতস্ততঃ হইতে লাগিল । আবালা যে ধর্ম্ম সে যাজন করিয়া আসিয়াছে, সেই ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে চাইবে ? কিম্ব উপায়াস্তর নাই, গৃহে গিরিবার আর পথ নাই—সাড়েবকেও সে ছাড়িতে পারে না । প্রেমের প্রাবল্যের নিকট তাহার চিত্তাচরিত ইসলাম ধর্ম্ম ত্যাগের নিমিত্ত মনের ইতস্ততঃ ভাব অধিককাল স্থায়ী হইতে পারিল না । কলিকাতায় আসিবার অব্যবহিত পরেই বাপ্টিষ্ট চ্যাপেলে নসিবন গৃহধর্ম্মে দীক্ষিতা হইল—তাচার পরেই তাহাদের বিবাহ হইয়া গেল । কুটীরবাসী দরিদ্র দরজী মোবারক আলি মিষ্টার চুক্তিতা নসিবন বিবি মিসেস ফ্রিম্যান হইলেন । সাড়েব নবপরিণীতা পত্নীর মনস্তত্ত্বের জন্ত, তাহার বিলাস-বাসনার পরিকল্পিত জন্ত কয়েক সহস্র টাকা জলের মত ব্যয় করিলেন । মলিনবস্ত্র-পরিচিতি দরজীকণ্ঠা বহুমূল্য বিলাতী

পরিচ্ছদে সজ্জিতা হইলেন। ইংরাজীভাষা ও বিগাতী আদব কাগদা শিক্ষা দিবার জন্য এক বর্ষিদলী ইংরাজ-মহিলা নিযুক্ত হইল। কিছুদিন পরেই ফ্রিম্যান সাহেব মেম সাহেবকে লইয়া মুরসিদাবাদে গমন করিলেন।

মেম সাহেব মুরসিদাবাদে যাইয়া বড়ই বিপদে পড়িলেন। ঘরের বাহির হইতে তাঁহার লজ্জা বোধ হইতে লাগিল—যদি পথে ঘাটে পল্লিচিত কলহরও সচিৎ সাক্ষাৎ হয়। ইতিমধ্যে একদিন মেম সাহেব এক ভৃত্যকে পাঠাইয়া পিতার সচিৎ সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ভৃত্য ফিরিয়া আসিয়া মেম সাহেবকে জানাইল যে, মোবারক আলি দরজী কোথায় চলিয়া গিয়াছে, — তাহার গৃহ শূন্য পড়িয়া আছে। প্রতিবেশীরা বলিল, বেইমান মেয়ের শোকে পাগল হইয়া সে কোথায় চলিয়া গিয়াছে, কেহ বলিতে পারে না। এই নিদারণ বার্তা শুনিয়া মেম সাহেবের চক্ষে জল আসিল—তাঁহার বুক কাটিয়া যাইতে লাগিল—তাঁহার শুধু মনে হইতে লাগিল “হায়! আল্লা, Oh God, কোন্ অপরাধে আমি অমূল্য পিতৃস্নেহে চিরবঞ্চিত হইলাম, আমার কি অপরাধ দেখিয়া পিতা আমার চির দিনের জন্য ত্যাগ করিয়া গেলেন।” দুই চারিদিন কষ্ট হইল, দুই চারিদিন পিতার উন্মত্ততার কথা স্মৃতিপথে উদ্ভূত হইয়া হৃদয় পীড়িত করিল—তারপর কালের প্রলেপে নসিবনের পিতৃ-বিরহের শোক ক্রমে কম হইয়া আসিতে লাগিল, তিনি ধীরে ধীরে পূর্ববৎ স্বামীর সচিৎ সংসার-ধর্মে মনোনিবেশ করিলেন। মিষ্টার ফ্রিম্যানের স্নেহে বহু আদরে তাঁহার হৃদয়কৃত শুক হইয়া গেল—নসিবন পুত্রা মেম সাহেব হইলেন।

এত সুখ এত সৌভাগ্য মেম সাহেবের অদৃষ্টে। অধিক দিন স্থায়ী হইল না,—বিবাহের দেড় বৎসর পরেই সামান্য অরে ফ্রিম্যান সাহেবের মৃত্যু হইল। মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাঁহার সমস্ত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি মিসেস ফ্রিম্যান নামে উইল করিয়া দিলেন,—দান বিক্রয়ের অধিকার পর্যন্ত দিয়া গেলেন।

বিবি ফ্রিম্যান স্বামীর মৃত্যুর পর নিজেই বিষয় রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করিবেন মনে করিয়াছিলেন ; কিন্তু দু' একমাসের পরেই তিনি নিজের অক্ষমতা বুঝিতে পারিলেন। সমস্ত বেচিয়া ফেলিতেও তাঁহার মন সরিল না। দেশীয় কর্মচারীরা তাঁহাকে পরামর্শ দিল—সাহেবের জমিদারী, সাহেবের ব্যবসায় বাণিজ্য সাহেব ছাড়া আর কেহ রক্ষা করিতে পারিবে না। মেম সাহেব তখন কর্মচারীদিগের পরামর্শে মিষ্টার রজার্স নামক এক অজ্ঞাত-কুলশীল সাহেবকে তাঁহার ম্যানেজার নিযুক্ত করিলেন।

ম্যানেজার সাহেব কাজ কর্ত্ত তেমন কিছুই জানিতেন না—কিন্তু তাঁহার দুইটি বিশেষ গুণ ছিল। তিনি খুব সুপুরুষ লোক ছিলেন এবং গান বাজনা, আমোদ আনন্দ কথাবার্ত্তায় বিশেষ হৃদঙ্গ ছিলেন। বিপুল বিস্ত্র-শালিনী উনবিংশ বর্ষীয়া সংসারানভিজ্ঞা যুবতীর অধুগ্রহ লাভের জন্য যে যে গুণের প্রয়োজন, মিঠার রজ্জ্বের তাঁহা সকলই ছিল। মেম সাহেবের পরম-বিশ্বাসভাজন হইতে তাঁহার মাসাদিক কালের অধিক লাগিল না। মিঠার রজ্জ্বস কাজকর্ম্ম অতি সাহায্যই দেখেন; কিন্তু সন্ধ্যা হইলেই বেশভূষা করিয়া মিসেস ফ্রিম্যানের কুঠিতে উপস্থিত হন এবং ‘আজ অনুক মহলের বহুদিনের বিদ্রোহী প্রজাদিগকে দমন করিয়াছি,’ ‘আজ অনুক মহলের আগ বুদ্ধি করিয়াছি,’ ‘আজ অনুকের সহিত বহুদিনের গোলযোগ সরকারের স্বপক্ষে মীমাংসা করিয়াছি’—ইত্যাদি ইত্যাদি মিথ্যা বাহাঙুরি দেখাইয়া মেম সাহেবের মনোরঞ্জন করিতে লাগিলেন; ক্রমে গান বাজনা, খানা-পিনা বহুং চলিতে লাগিল।

এই সময়ে একদিন বিবি ফ্রিম্যানের মনে হটল, দুঃ ছাই এ বিবি-গিরী আর করিয়া কাজ নাই। যে পথে স্বামী গিয়াছেন, সেই পথে সব চলিয়া যাক। তখন তিনি আর একবার পিতার অহুসঙ্কানের জন্য সেই দরিদ্র পরীতে লোক প্রেরণ করিলেন। সে ফিরিয়া আসিয়া মেন সাহেবকে জানাইল মোবারক মিঞার কুটীরখানি ভূমিলাং হইয়াছে, গৃহ-প্রাঙ্গণ জঙ্গলাকীর্ণ হইয়াছে। সে বলিল যে, মোবারক মিঞা একদিন গ্রামে আসিয়াছিল; সারাদিন তাঁহার সেই শূন্য ভিটার বসিয়া ছিল, কাহারও সহিত কোনও কথা বলে নাই; পরদিন হইতে তাহাকে আর দেখিতে পাওয়া যায় নাই।

এ সংবাদ শুনিয়া মেন সাহেবের হৃদয় আকুল হইল। তাঁহার চক্ষু ফাটিয়া জল পড়িতে লাগিল, ইচ্ছা হইল এ সব ছাড়িয়া দিয়া ফকিরী গ্রহণ করিয়া তিনি দেশে দেশে তাঁহার সেই পাগল পিতার অহুসঙ্কান করিয়া ফেরেন, পিতার বেদনাপূর্ণ তপ্ত বুক মাথা রাখিয়া, তাঁহার চরণে অবনত হইয়া এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে করিতে জীবন বিসর্জন করেন। কিন্তু আবার সেই বোহ, আবার সেই বিলাস-বিভ্রম, আবার সেই বিষয় বিভবের তীব্র মদিরা,—যুবতী কিছুতেই এ প্রলোভনের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিলেন না। ভোগ-বাসনা একটা বিকট দানবের মত তাঁহার বক্ষে ভর করিয়াছিল। উহারই মধ্যে কখনও কখনও তিনি একটু নিশ্বাস ফেলিবার অবকাশ পাইতেন। সেই সময়েই তাঁহার দেবোপন পিতা, তাঁহার

শাস্তি ও পবিত্রতাপূর্ণ ক্ষুদ্র কুটার তাঁহাকে ক্ষণেকের অল্প টানিয়া লইত; কিন্তু সে টান বেশীক্ষণ থাকিতে পারিত না; মেম সাহেব এই চতুর ইংরাজের জালে ক্রমেই জড়াইয়া পড়িতে লাগিলেন। এক বৎসর যাইতে না যাইতেই মিসেস ফ্রিম্যান যথাস্থ আচার অহুষ্ঠান করিয়া মিসেস রজার্স হইলেন। সাহেব তখন আর ম্যানেজার রহিলেন না; একেবারে এষ্টেটের সর্বস্ব মর্য্যাদা হইলেন।

এদিকে বিষয়ের আয় ক্রমেই কমিয়া যাইতে লাগিল। মেম সাহেব মধ্যে মধ্যে কর্মচারীদিগকে তলব দিয়া ছই চারি কথা জিজ্ঞাসা করিতেন। তাহারা সাহেবের ভয়ে এবং নিজদের অজ্ঞায় উপার্জনের পথ বন্ধ হইবার আশঙ্কায় সাহেবের ঞ্জগণন করিত। মেম সাহেব কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেন না।

এই ভাবে কিছুদিন গেলে একদিন সাহেব মেম সাহেবকে বলিলেন যে, বিশেষ কার্যোপলক্ষে তাঁহাকে একবার কলিকাতায় যাইতে হইবে— ফিরিতে দশ পনের দিন বিলম্ব হইতে পারে। মেম সাহেব সঙ্গে যাইতে চাহিলেন, কিন্তু সাহেব তাহাতে সম্মত হইলেন না। তিনি মেমসাহেবকে বুঝাইলেন যে, দুইজনই কুঠি ছাড়িয়া গেলে কাজ কর্মের ক্ষতি হইতে পারে; আর দশ পনের দিন পরেই যখন তিনি ফিরিয়া আসিতেছেন তখন এই অল্প সময়ের জন্ত মেম সাহেবের যাতায়াতের কষ্ট স্বীকার করিবার কোনও প্রয়োজন নাই।

মেম সাহেব কুঠিতেই থাকিলেন, সাহেব কলিকাতায় চলিয়া গেলেন। কলিকাতায় গিয়া সাহেব পৌছা সংবাদ পর্য্যন্ত মেম সাহেবকে দিলেন না। দেখিতে দেখিতে পনের দিন চলিয়া গেল—সাহেবের সংবাদ নাই। মেম সাহেব চিন্তিতা হইলেন। আরও সাতদিন অপেক্ষা করিয়া দুইজন কর্মচারীকে কলিকাতায় প্রেরণ করিলেন। তাহারা কলিকাতায় যাইয়া কি অহুসন্ধান করিল তাহারাই জানে—সপ্তাহাদিক পরে মুরসিদাবাদে ফিরিয়া গিয়া বলিল, “সাহেবের কোন খোঁজ পাওয়া গেল না।” সঙ্গে সঙ্গে সাত শত টাকা খরচখরচার হিসাব দাখিল করিল। মেম সাহেবের মনে এতদিন পরে সন্দেহের উদয় হইল। তিনি সমস্ত কাগজপত্র তলব করিলেন। কর্মচারীরা হিসাবপত্রে দেখাইয়া দিল সাহেবের নিকট প্রায় সওয়ালক্ষ টাকা জমা দেওয়া হইয়াছে। মেম সাহেবের তখন চক্ষুরি হইল—এত-

দিন তিনি কিছুই দেখেন নাই—টাকা কড়িরও হিসাব লন নাই, লোহার সিঁজকের চাবি সাহেবের নিকট থাকিত । তখন সিঁজক গুথিয়া দেখা গেল তাতাতে তিন হাজারের বেশী টাকা নাই । তখন মেম সাহেবের কিছুই বুদ্ধিতে বাকী রহিল না । তিনি সংবাদ-পত্রে বিজ্ঞাপন দিলেন, কিন্তু সে বিজ্ঞাপনের কোনই ফল হইল না—রজার্দ সাহেবের কোনও উদ্দেশ্য পাওয়া গেল না । তিনি চারি মাস অপেক্ষা করিয়া মেম সাহেব মিসেস রজার্দ নাম ত্যাগ করিলেন—তাহার পূর্বস্বামীর নামানুসারে তাহার নাম মিসেস ফ্রিমানই বাহাল করিলেন ।

এইভাবে প্রতারণিত হইয়া মেম সাহেব বুদ্ধিতে পারিলেন যে, তাহার দ্বারা বিষয় রক্ষা হইতে পারে না । তিনি যখন সমস্ত বিষয় বিক্রয় করিয়া এ দেশ ত্যাগ করিবার ব্যবস্থা করিলেন, তখন কর্ণচারীর। অনেকেই তাঁহাকে নিবেদন করিতে লাগিল ; কিন্তু তিনি কাহারও কথায় কর্ণপাত করিলেন না । তিনি স্থির করিলেন বিলাতে গমন করিয়া সেখানেই অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করিবেন ।

বিবি ফ্রিমান ক্রীত গমনের জন্ত কলিকাতায় চলিয়া আসিলেন । পাথের হিসাবে কিছু টাকা নিজের কাছে রাখিয়া অবশিষ্ট টাকা ব্যাঙ্কে জমা করিয়া দিলেন । কুক কোম্পানীর বাড়ীতে টাকা জমা দিয়া জাহাজের একটি প্রথম শ্রেণীর কেবিন ভাড়া করা হইল ।

বুধবারে জাহাজ ছাড়িবার কথা, বিবি ফ্রিমান মঙ্গলবার অপরাহ্নকালে কেবিনটি দেখিবার জন্ত জাহাজে গেলেন । দেখা শুনা শেষ করিয়া তিনি যখন হাই-কোর্টের সম্মুখে গঙ্গার তীরে উঠিয়া গাড়ীতে চড়িতে যাইবেন, সেই সময়ে দেখিতে পাইলেন অনতিদূরে এক চানোগালার দোকানের সম্মুখে ছিন্নবেশ, রক্তাক্ত, ধূলিধূসর একটি বৃদ্ধ দাঁড়াইয়া রহিয়াছে । বৃদ্ধকে দেখিবামাত্রই মেম সাহেব স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন—এ যে তাহারই হস্তভাগ্য পিতা । মেম সাহেব তখন আশ্চর্যম্বুত হইলেন—তিনি যে একজন ভদ্র ইংরাজ-গৃহিণী, তিনি যে মেম সাহেব—তিনি যে অতুল বিষয়ের অধিকারিণী—সে সকল কথাই মুহূর্ত্তে ভুলিয়া গেলেন । মেম সাহেব দৌড়িয়া গিয়া বৃদ্ধের সেই ধূলিমলিন হস্ত চাপিয়া ধরিয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন, “মেরা বাপ্‌জান !”

সহসা এইভাবে আক্রান্ত হইয়া বৃদ্ধ একবার মেম সাহেবের নুখের

দিকে চাহিল, তারার পরই সবলে হস্ত ছাড়াইয়া লইয়া বিকটস্বরে বলিয়া উঠিল, “সেলাম, মেম সাহেব ।” তাহার পরই সে উর্দ্ধমুখে দৌড়িয়া রাজ-পথের জনসঙ্ঘের মধ্যে ডুবিয়া গেল ।

মেম সাহেব তখন আশ্চর্য্যে চীৎকার করিতে লাগিলেন “পাক্‌ডো-বুড়টাকে! পক্ষাশ রূপেয়া—খ রূপেয়া—নেহি নেহি পাচশো রূপেয়া বুক্ষিস ।” মেম সাহেবের আকুলতা দেখিয়া পুরস্কার-প্রদৃশী কয়েকজন লোক রাস্তায় ছুটিল, কিন্তু কেহই কোথাও বৃদ্ধকে দেখিতে পাইল না! . যে চান্নাওয়ালার দোকানের সম্মুখে বৃদ্ধ দাঁড়াইয়া ছিল, মেম সাহেবের আকুল আগ্রহ দর্শনে সে দোকান হইতে বাহির হইয়া মেম সাহেবের সম্মুখে আসিয়া বলিল, “ও বুড়টার জন্ত হুজুর অমন করিতেছেন কেন? ও রোজ সন্ধ্যার সময় আমার এই দোকানের পাশে এসে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে । যখন সূর্য্য দরিয়ার ও পাশে ডুবে যায়, আকাশের গা রাঙা হয়, তখন রোজই বুড়টা মাটিতে হাত ছোঁয়াইয়া তিনবার কাহাকে সেলাম করে—তারপর ঐ একটি কথাই রোজ বলে ‘মেরি লেড়্কী!’ মনে হয় বুড়টার লেড়্কী হয় ত মারা গিয়েছে, তারই শোকে সে পাগল হয়েছে । আহা বেচারীর বড় কষ্ট !”

চান্নাওয়ালার এই কাহিনী শুনিয়া মেম-সাহেবের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল, তাহার বক্ষে গেন কে শেলাঘাত করিল । তিনি অতি কাতর স্বরে বলিলেন—“হাঁ, হাঁ, লেড়্কী মর গেয়ী ।”

শ্রীজগদ্বর সেন

পর-পার

গভীর রক্তিম রাগ দিগন্ত সীমায়,
তটিনীর পরপার দেখা নাহি যায়,
দীপ-দীপ্ত তটখানি দিবা সমুজ্জল,
লুপ্ত আঁখি তারি পানে ধায় অবিরল !

জীবনের পর-পার কত বহুদূরে,
আঁখিত যায় না কভু সে অজানা পুরে,
নাহিক আলোক-লেখা, পথ দূরান্তর
অচল আবার-রাশি মিবিড় ছত্তর !*

শ্রীলীলা দেবী

(১)

অর্জুন

(২)

দেবব্রত তাই প্রিয় অগণ্য দেবের
 নিত্য তুমি, বীৰ্য্যমুগ্ধ ক্রান্ত শিবের
 লভিলে অজয় অস্ত্র, অক্ষয় তুণীর
 বরণের, প্রভঞ্জন দিলা তোমা বীব
 জয়শঙ্খ, অগ্নি দিল দীপ্ত স্বর্ণ-রথ,
 • সাধনায় অব্যাহিত রক্ত স্বর্ণ-পথ
 অকালে তেঁনার লাগি' দেবতা কৃপায়
 দীর্ঘ পঞ্চবর্ষ ধরে লভিলে যেথায়
 অমর শক্তির দীপ্তা, আপনি তপন
 পুত্র প্রতিরক্ষী জানি তবু তুষ্ট মন
 পরাইল রতন কিরীট মিত্ররূপে,
 প্রহরী শিবিরদ্বারে জাগিলেন চুপে
 শঙ্খ শূলপাণি, প্রেমে আপনি সারথি
 চতুর্ভুজ, চিরবন্ধু জগতের পতি !

(৩)

সবাসাচী হে কিরীটি, দেবেশ্বতনয়
 যৌবন-সম্ভোগে শুধু তব কীর্তি নয়
 মর্ত্যভূমে, স্বর্গে তুমি উর্ধ্বশী বিমুখী
 তরুণী বিরাটমুখতা সঁপি দিয়া স্থখী
 অভিনয়্য করে, ভাল জান ধনজয়,
 কেবলি এহণে কত মানব-হনয়
 তৃপ্তি নাহি মানে, তাই যুদ্ধলব্ধ তব
 মণি মুক্তা রত্নভার কাঞ্চন বিভব
 মুক্ত হস্তে করি দান ভ্রাতৃ-অভিষেক
 স্থখী তুমি বীর, দরিদ্রে বিপন্ন দেখে
 সাধিয়া উদ্ধার-ব্রত নির্দাসিত তুমি,
 যে দুর্জন দুর্গোদন হুচি অগ্রতুমি
 নাহি দিয়া বাণাইল দ্রুত সমর,
 তারি মৃত্যু ভাবি তুমি করণ্য কাতর ।

ফাল্গুনী সহস্র অঁাখি বাসবতনয়,
 কীর্তি তব অব্যাহিত, যৌবন প্রণয়
 বাধা নহে এক ঠাঁই, লক্ষী-স্বরূপিণী
 দ্রোপদীরে ছাড়ি তাই উলুপী মোহিনী
 নাগপাশে বাধিল তোমারে কোন্ দূরে ;
 নির্দাসন-—তাও ব্যর্থ নয়, মণিপুরে
 চিত্রাঙ্গদা' অশ্বশারী, পুণ্য দ্বারকায়
 মুগ্ধ করি হৃদিকে তুমি সুভদ্রায়
 হরিয়া আনিলে তুমি দীপ্ত দিবালোকে,
 তব বাণ বিদ্ধ ওপ্ত ভোগবতী শোকে
 উচ্ছৃমিত, তৃষ্ণাতুর গঙ্গাহত মুখে
 ঢালি দিল অস্ত্রিম অঞ্জলি, অগ্নি স্থখে
 দহিল খাণ্ডব, ক্ষুদ্র ইন্দ্রপ্রস্থে ময়
 বিরচিল মায়া-সভা অতুল অক্ষয় ।

গুপ্ত-যুগে বঙ্গদেশ ।*

ভারতবর্ষ অতি প্রাচীন কাল হইতেই বহুসংখ্যক পণ্ডরাজ্যে বিভক্ত ছিল । যখন যে পরাক্রান্ত নরপতি—নিজের বাহুবীর্ঘা, মস্ত্রিগণের হস্তবুদ্ধি ও প্রজা-পুঞ্জের অহুসার—এই তিনটিকে অবলম্বন করিয়া, প্রকৃত দণ্ডধররূপে সেই পণ্ডরাজ্যগুলিকে ঐক্য-সূত্রে বন্ধন করিয়া, আশ্বাশানাধীনে রাখিতে পারিয়া-ছেন, তিনিই তখন সম্রাট হইয়া সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠার সমর্থ হইয়াছেন । তাহার বংশধরগণ যতদিন সেই প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্য অক্ষুণ্ণ অবস্থায় রাখিতে পারিয়াছেন, ততদিন দেশ সৰ্ব্ববিষয়ে সমৃদ্ধি-সম্পন্ন ও গৌরবান্বিত থাকিয়াছে । তাহার পর, যখন প্রত্যেক বার সাম্রাজ্যের শেষ নরপাল নিত্য আধিপত্য অপ্রতিহত রাখিতে অসমর্থ হইয়াছেন, তখন শাসন-শৃঙ্খল শিথিল হইয়া, দেশকে পুনরায় স্ব-স্ব-প্রধান অসংখ্য পণ্ডরাজ্যে পরিণত করিতে সহায়তা করিয়াছে । তখন দেশে অরাজকতা, বিপ্লব ও বিগ্রহ উপস্থিত হইয়াছে, দুৰ্গল সবলের গ্রামে পতিত হইয়াছে । যথার্থ দণ্ড প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা উপস্থিত হইলেও, প্রভাব-উৎসাহ নগ্ন-শক্তিসম্পন্ন মার্কান্ডেয় নরপতির মৰ্যাদা লাভ করিবার উপযুক্ত পাতের অভাবে, কিছুকালের জন্য দণ্ড অপ্রণীতই থাকিয়া গিয়াছে । কাজেই তখন—

“অপ্রণীতো হি দণ্ডো মাংস্ত-স্তায়মুদ্যাবয়তি ।

বলীয়ান অবলং গ্রসতে, দণ্ডধরাভাবে ।”

কোটিেলোর এই দর্শন সার্থকতা লাভ করিতে পারিয়াছে । (১)

আর্য্যাবস্তে কলিক-প্রতিষ্ঠিত কুষাণ সাম্রাজ্যেরও এইরূপ সাধারণ পরিণতি ঘটয়াছিল । প্রথম বাহুদেবের দীর্ঘ রাজত্বের অবসানে, সেই সাম্রাজ্য ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে । এই সময়েই আবার দাক্ষিণাত্যের অন্ধ্ররাজ্য ও তক্ষপ অবস্থা প্রাপ্ত হয় । ঐতিহাসিকগণের মতে খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষভাগে ও তৃতীয় শতাব্দীর প্রথমভাগে উত্তরাপথের ও দক্ষিণাপথের এই দুইটি প্রধান সাম্রাজ্যের তিরোত্তাবের মূল কারণ পারস্যের সেসেনীয় [Sassanid] রাজ-বংশের অভ্যুদয় । পারসীকগণের আক্রমণে কুষাণ-সাম্রাজ্য বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল,—ঐতিহাসিকগণের এই অনুমান, এখনও সত্য বলিয়া সপ্রমাণ

* উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলনের অষ্টম অধিবেশনে (১৭ই ফাল্গুন তারিখে) পঠিত ।

(১) অৰ্ণাশা—১ অধিঃ । ৩র্থ অধ্যায় ।

চইতে পারে নাই। তবে পুরাণের মত অহুসরণ করিলেও উত্তরপশ্চিমাঞ্চল চইতে অনার্যগণের আক্রমণকেই ভারতের তদানীন্তন ছরবহার কারণ বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়। তৃতীয় শতাব্দীর শেষ তিন পাদের ও চতুর্থের প্রথমার্ধের ভারতীয় ইতিহাস ঘোর তমসাক্ষর। পঞ্চদশ প্রদেশের কিঞ্চিৎ অবস্থা বাতীত, এই অন্ধকার যুগের আর কিছুই জানা যায় নাই। কুমাণ-সাম্রাজ্যের অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত প্রায় শতবর্ষব্যাপী বিপ্লব (বা মাংস্ত-ভায়া)-যুগের পর, মগধে গুপ্ত-সাম্রাজ্যের অভ্যুত্থান।

চতুর্থ শতাব্দীর প্রথম পাদ চইতে পঞ্চমের তৃতীয় পাদ পর্য্যন্ত, সার্ব্ব শত বৎসর গুপ্ত-সম্রাটগণ মগধ চইতে নিঃসপত্তভাবে সমগ্র আর্য্যাবর্তে শাসন ও পরিচালন করিতে সক্ষম চইয়াছিলেন। এই একচ্ছত্রাধিপত্যের যুগকে পূর্বভাগ ধরিয়া, এই যুগের সম্রাটগণকে “প্রাচীন-গুপ্তরাজ”রূপে অভিহিত করা যাইতে পারে। তৎপর বিদেশাগত আক্রমণকারিগণের প্রভাবে তাঁহাদের প্রবল প্রতিপত্তির হ্রাস চটিলে পর, যে সকল গুপ্ত-বংশীয় নরপতি, ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম পাদ পর্য্যন্ত,— এমন কি স্থানেশ্বরাদিপতি সম্রাট চর্যবর্ত্তনের রাজ্য সময়ে ও তাঁহার তিরোভাবের সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত মাংসা-ভায়া-যুগেও—কেবল মগধে ও তৎসম্বন্ধিত দেশবিভাগে রাজত্ব অপ্রতিষ্ঠত রাধিবাস প্রভেদে চালাইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে “অর্দ্ধপ্রাচীন গুপ্তরাজ”রূপে আখ্যাত করা যাইতে পারে।

ঐতিহাসিক প্রাচীন লিপিমাল্য চইতে জানা গিয়াছে যে মগধের গুপ্ত-রাজ-বংশের প্রথম পুরুষের নাম মহারাজ গুপ্ত। তিনি পাটলীপুত্রের উত্তরে কোনও কূ-পটে [অথবা মহাস্থলে, পাটলিপুত্রেই স্থানীয় খণ্ডরাজ্যের নৃপতিরূপে] রাজত্ব করিতেন। তাঁহার পুত্র ও উত্তরাধিকারীর নাম ঘটোৎকচ। তিনিও কেবল মহারাজ-পদ লাভিত ছিলেন। তাঁহার পুত্র ও উত্তরাধিকারী প্রথম চন্দ্রগুপ্তকে, সর্ব্বত্রই সার্বভৌমত্বকে “মহারাজাধিরাজ”-পদ বিকৃষিত বলিয়া বর্ণিত দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি বৈশালী নগরীর প্রাচীন লিচ্ছবী-বংশীয়া কুমার-দেবী-নারী এক কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। গুপ্ত-বংশীয় নরপতিগণ তাঁহাদের শাসনাদিতে প্রথম চন্দ্রগুপ্তকে “লিচ্ছবি-মৌহিত্র” বলিয়া সগৌরবে বর্ণনা করিয়াছেন। বৈবাহিক-সম্বন্ধজনিত লিচ্ছবিগণের প্রভাবেই তাঁহার প্রতিপত্তির দৃঢ়তা চইয়াছিল,—কিন্তু তিনি নিজ নৃপগুণ-মাঠাখ্যে নিকটবর্ত্তী বৈশালীরাজকে কল্যাণে বাধ্য করিয়া, আত্মপ্রভাব বিস্তারের দৃঢ়তা নিজেই করিয়াছিলেন,—তাহা একটি তর্কসঙ্কুল বিষয়। কিন্তু, সমৃদ্ধি-সোপানে একবার

আরোহণ করিতে আরম্ভ করিয়া, তাঁহাকে আর বেশী দিন স্থানীয় গুপ্তরাজ্যের নরপতিরূপে রাজত্ব করিতে হয় নাই। গুপ্ত বংশীয় প্রথম সম্রাট প্রথম চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যসীমা নির্ধারিত করিতে চইলে, তদীয় পুত্র সমুদ্রগুপ্তের দ্বিধিজয়-বর্ণনা হইতে এইরূপ অল্পমান করা বাইতে পারে যে, তিনি প্রয়াগ চইতে পাটলীপুত্র পর্যন্ত গঙ্গার উপত্যকা-প্রদেশ স্ব-শাসনাধীনে আনিতে পারিয়াছিলেন। বিষ্ণুপুরাণের—

“অচ্যুগঙ্গা-প্রয়াগা মাগধা গুপ্তান্দ ভোক্তান্তি।” (২)

এই বাক্য এবং বায়ুপুরাণের .

“অচ্যুগঙ্গাং প্রয়াগাঃ চ সাক্ষিকং মাগধাংস্থথা।

এতান্ননপদান সর্কান্ ভোক্তান্তে গুপ্তবংশজাঃ ॥” (৩)

এই শ্লোকটি বোধ হয়, প্রথম চন্দ্রগুপ্তের রাজ্য-বিস্তার উদ্দেশ্য করিয়াই রচিত হইয়া থাকিবে। এক মতে ৩২০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার অতিবেক কাল চইতে, অপর মতে সেই বৎসর হইতেই তদীয় রাজত্বের প্রথম বৎসর দাখ্য করিয়া, তিনি “গুপ্ত-সংবৎ” নামে যে নতুন সংবৎ প্রচলিত করিয়াছিলেন, তাঁহার উত্তরাধিকারী প্রাচীন গুপ্তরাজগণ তাঁহাদের রাজ্যকালও এই সংবৎসর পরিমিত করিয়াই গণনা করিতেন। সে যাহা হউক, প্রথম চন্দ্রগুপ্তের সহিত সেকালের বাঙ্গালার প্রত্যক্ষভাবে কোনও রূপ সম্পর্ক ছিল কি না বলা যায় না।

প্রথম চন্দ্রগুপ্ত জীবিতাবস্থায় সিংহাসনের উত্তরাধিকারী নির্বাচন করিয়া গিয়াছিলেন। এই উত্তরাধিকারী তদীয় অল্পতম পুত্র, ইতিহাস-প্রসিদ্ধ জগদ্বিপাতি সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত। পিতা যে সাম্রাজ্য নিকেতনের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন, “পৃথিবীতে অপ্রতিরূপ” পুত্র আশ্চর্য্যপরাক্রমে সেই ভিত্তির উপর স্ববংশীয়গণের ভোগের নিমিত্ত, সর্কার-জন্মের বিপুল-বিভব-পূর্ণ অট্টালিকা নির্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। খৃষ্ট-পূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর প্রথিতযশা, দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী, মৌর্যরাজবংশাবতঃ মহারাজ অশোক প্রায় ছয়শত বৎসর পূর্বে, যে অত্যুচ্চ প্রস্তরস্তম্ভ প্রস্তত করাইয়া তদগারে তাঁহার নীতিবহুল অশ্বশাসন-মালা মাল্যরূপে পরাইয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন, [প্রয়াগে অবস্থিত] সেই পাবাগস্তম্ভে “লিঙ্কবি মোহিত চন্দ্রগুপ্তের” পুত্র সমুদ্রগুপ্তের দ্বিধিজয়-কাহিনীও উৎকীর্ণ হইয়াছিল। “সদ্বি নিগাঢ়িক কুমারামতা মহাদেবায়ক” প্রভৃতি রাজকীর্ত্তন-বিভূষিত মহাকবি

(২) বিষ্ণুপুরাণ, চতুর্থোঃ। ২৪ অধ্যায়।

(৩) বায়ুপুরাণ। অঃ ২২। ৫৮৩ শ্লোক।

হরিবংশের বিরচিত। সংস্কৃতে পঞ্চ-গম্ভময় (৪) প্রশস্তিটি ভারতের প্রাচীন ইতিহাস উপাদানের মধ্যে একটি অতি মূল্যবান বস্তু। এখানে আবিস্কৃত প্রাচীনলিপিতে অল্প কোন সম্রাট বা রাজার দিগ্বিজয়-বার্তা এইরূপ অলস্তুভাবে বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। চতুর্থ শতাব্দীতে সংস্কৃত কাব্যকলা, ব্যাকরণ অলঙ্কার ও ছন্দঃ শাস্ত্র কতদূর উচ্চ পদবীতে পৌছিয়াছিল, তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ-হরিবংশের বিখ্যাত প্রশস্তি। এই কারণে ভারতের নানা প্রাদেশিক ভাষায় ইহার বিস্তৃত আলোচনা আবশ্যিক। “স্বভূজবল-পরাক্রমৈকববু” সমুদ্র গুপ্তের প্রশস্তির সপ্তম শ্লোকে সম্রাটের উল্লিখিত “পুষ্পাঙ্কর-পুর অর্থাৎ পাটলিপুত্র নগর হইতে সম্রাটের রাজ্যশাসন করিবার কথা—অহুমিত হইতে পারে। প্রশস্তির চতুর্থ শ্লোকে মহারাধিরাজ প্রথম চন্দ্র গুপ্ত:কিরূপ অবস্থায়, কি ভাবে, সমুদ্র গুপ্তকে যুবরাজ-পদে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন, তাহার এক অমূল্য বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। কবি নিজ শক্তিতে যেরূপ বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তৎপাঠে অভিধেয়-চিত্রটি পাঠকের নান্দন্যপটে অঙ্কিত হইয়া যায়। সভ্যত্বের রাজপুত্রগণ সকলেই সমাগত, নন্দ্রিগণ উচ্ছ্বসিত—ভয়, কোন অমুপযুক্ত পুত্রের উপর যৌবরাজ্য না অর্পিত হয়,—এমন সময়ে চন্দ্র গুপ্ত তব-দর্শনশ্রী নৈত্রদ্বারা অবলোকন করিয়া পুত্রগণের মধ্যে সমুদ্র গুপ্তকেই আর্ঘ্য গুণালঙ্কৃত মনে করিয়া “পাছেব মুক্ষীমিতি”—“কুমিই নিমিল ধরাকে পালন কর—এই বলিয়া রোমান্বিত-কলেবরে ওঁহাকে আলিঙ্গন করিগা, যুবরাজ পদে অভিষিক্ত করিলেন। অত্যাশ্চর্য পুত্রগণ স্নানবদনে ওঁহার প্রতি চাহিয়া রহিলেন। শ্লোকটি এই:—

“অর্ঘ্যো হীতুাপগুহ্য ভাবপিণ্ডনৈরুৎকর্ণিতৈ রোমতি:

সভোবৃচ্ছসিতেষু ভূল্যাকুলজ্ঞানাননোদীক্ষিতঃ ।

স্নেহব্যাকুলিতেন বাস্প গুরুণা তথৈক্ষিণা চক্ষুশা

য: পিত্রাভিহিতো নিরীক্ষা নিমিলাং পাছেবমুক্ষীমিতি ।”

চন্দ্র গুপ্তের স্বর্গারোহণের পর সমুদ্র গুপ্ত যে ভাবে পৈতৃক সাম্রাজ্য অধিকতর বিস্তৃত করিয়া “আসমুদ্রক্ষিতীশ” হইতে পরিত্যাগ করিলেন, হরিবংশ-প্রশস্তির গভ্যংশে তাহার দেবীপ্যমান পরিচয় পাওয়া যায়। সমুদ্র গুপ্তের সহিত তদানীন্তন বাল্লালা-দেশের কিরূপ সম্বন্ধ ছিল, তাহাও এই প্রশস্তির মর্ম হইতে উদ্ঘাটিত হইতে পারিবে। মালবী আভীর মাত্রক প্রভৃতি স্বাধীন জাতিগণ-এ “সনত-উডাক-কানরূপ—নেপাল—কর্জুপুত্রাদি-প্রত্যন্ত নৃপতি”গণকে তিনি স্বয়ং দেশে

স্বাধীন ভাবে থাকিতে দিয়া নিজকে তাঁহাদের সহিত মৈত্রী-স্বত্রে আবদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহারাও তাঁহার প্রচণ্ড-শাসনকে উদ্ধ করিয়া, তাঁহাকে পরিতুষ্ট করিবার জন্য চারিটি পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। (ক) সম্রাট-উদ্ভাবিত সৰ্ব্বপ্রকার করের দান, (খ) সম্রাটের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করণ, (গ) প্রগতি-বিস্তারন ও (ঘ) সম্রাটের-সাক্ষাৎকার লাভের জন্য আগমন।

এই প্রশস্তি হইতে দেখা যাইতেছে যে সম্রাট, ডবাক, কামরূপ প্রভৃতিকে সমুদ্রগুপ্ত প্রত্যাহ্বান বসিয়া গণ্য করিতেন। পূৰ্ব্বদিকে কতদূর পর্য্যন্ত গুপ্ত-সম্রাটের রাজ্য বিস্তৃত ছিল, ইহা হইতে তাহা প্রতীয়মান হয়। এই সমস্ত দেশ তাঁহার অপরোক্ষ শাসনের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। সম্রাটের সহিত গোণ্ডাবে মৈত্রী-স্বত্রে আবদ্ধ থাকিয়া এই দেশসমূহের রাজগণ প্রত্যন্ত-নৃপতি হইরা, সীমানক্ষয় সম্রাটের সহায়তা সাধন করিতেন। সে যাহা হউক, সন্ধিস্বত্রে মিত্ররূপে বৰ্ত্তমান থাকিয়াও তাঁহারা সম্রাট-বান্ধাবিত সৰ্ব্বপ্রকার কর-দান, তদীয় আজ্ঞা-করণ, প্রণামাঞ্জলি ও সাক্ষাৎকারের জন্য আগমন প্রভৃতি নানা উপায় অবলম্বন করিয়া সম্রাটকে পরিতুষ্ট রাখিতেন, ইহা স্পষ্টাক্ষরেই বর্ণিত হইয়াছে। এখন প্রশ্ন হইতেছে হরিবংশের প্রশস্তিতে উল্লিখিত সেকালের সম্রাট, ডবাক ও কামরূপ বৰ্ত্তমান বাঙ্গালার কোন্ কোন্ বিভাগ? সমুদ্র শতাব্দীর চীন দেশীয় বৌদ্ধ পরিব্রাজক ইউয়ান-চৌয়াঙের ভ্রমতত্ত্বমণ কাহিনী হইতে বাঙ্গালাদেশকে চারিটি বিভাগে বিভক্ত পাওয়া যায়, যথা পুণ্ড্রবর্ধন-কর্ণসুবর্ণ, সমতট ও তাম্রলিপ্তি। গুপ্তযুগের [ষষ্ঠশতাব্দীর মধ্য ভাগের] প্রধান জ্যোতির্বিৎ বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতা নামক গ্রন্থ হইতেও সেকালের বাঙ্গালার কোন কোন প্রদেশের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেই গ্রন্থে পূৰ্ব্ব দিকের প্রদেশ সমূহের মধ্যে মগধ, প্রাগজ্যোতিষ, পৌণ্ড্র, সমতট, বঙ্গ, উপবঙ্গ, সূক্ষ, অঙ্গ, তাম্রলিপ্তিকা, বর্ধমান প্রভৃতির নাম উল্লিখিত পাওয়া যাইতেছে। সমুদ্রগুপ্তের রাজ্য কালের দুইশত বৎসর পরে, বরাহমিহির বাঙ্গালার যে ভৌগোলিক বৃত্তান্ত প্রদান করিয়াছেন, তৎপর্যালোচনা করিয়া বলা যাইতে পারে যে, সমুদ্রগুপ্তের সময়েও পৌণ্ড্র, সূক্ষ প্রভৃতি দেশ তত্তৎ নামেই অভিহিত হইত এবং তাহাদেরও হয়ত পৃথক পৃথক রাজ্য ছিল। কিন্তু হরিবংশের প্রশস্তিতে পূৰ্ব্বদিকে সাম্রাজ্যের প্রত্যন্ত দেশরূপে কেবল সমতট ডবাক ও কামরূপের উল্লেখ দেখিয়া এরূপ অস্বাভাবিক ইতিহাস বলিয়া মনে হইতে পারে যে [তাম্রলিপ্তিসহ] সূক্ষ প্রদেশ, পৌণ্ড্র প্রদেশ ও অঙ্গ,

বর্তমান প্রকৃতি প্রদেশগুলি, সমুদ্রতটের সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়া মগধের অপস্রোক শাসনের অধীন হইত্বাপ্তাছিল। বরেন্দ্র অহুসকান সমিতির সুযোগে সম্পাদক অগ্রজ-প্রতিম চন্দ্র মহাশয়ও তাঁহার (৫) “গৌড়রাজ মালা” এইরূপ অহু-
নানেরই আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। সমুদ্র শতাব্দীর কর্ণস্বর্ণ নামধেয় প্রদেশ, সম্ভবতঃ গুপ্তযুগে বর্তমান বা অতীত কোন প্রদেশের অন্তঃপাতি ছিল। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, বাঙ্গালার কতক অংশ মগধের অন্তর্ভুক্ত থাকার সম্রাটের স্বশাসনে বর্তমান ছিল, এবং সমতট ও ডবাক প্রত্যেকভাবে সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত না থাকিয়া, অনেকটা স্বাধীনভাবে, গুপ্ত-
সাম্রাজ্যের প্রত্যন্ত প্রদেশ রূপে বর্তমান ছিল। সমতটের সীমা লইয়া সবিশেষ গোণযোগ্য নাই। গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের বহীপ অর্থাৎ আধুনিক পশ্চিম বঙ্গের খুলনা যশোর ও পূর্ববঙ্গের করিমপুর, বাথরগঞ্জ, নোয়াখালি ও ঢাকার অংশবিশেষ লইয়া সেকালের সমতট প্রদেশ বুঝিতে হইবে। কিন্তু প্রশস্তিতে উল্লিখিত ডবাক প্রদেশ যে কোন দেশ তাহা লইয়া পণ্ডিত সন্মানে অনৈক্য আছে। সমতট ও কামরূপ এই দুই প্রদেশের নামের মধ্যস্থলে উল্লিখিত হওয়ায় ডবাক প্রদেশকে সাহচর্য্য-বলে এই দুই প্রদেশের মধ্যবর্তী কোন প্রদেশ বলিয়া পরিচিত হইবে বলিয়া বোধ হয়। ভারতীয় প্রাচীন ইতিহাস সকলগ্রন্থে ভিন্‌সেন্ট স্মিথ মহাশয় (৬) সংশয় সহকারে অহুমান করেন যে বর্তমান
• সমতট ৭৩৬ দিনাজপুর ও রাজশাহী জেলাগুলিই গুপ্তযুগের ডবাক প্রদেশ নামে পরিচিত ছিল। এই অহুমান সনীচীন বলিয়া বোধ হয় না—কারণ এই তিন জেলা যে সেকালের পুণ্ড্রবর্ধনের অন্তঃপাতী ছিল তাহাতে ইতিহাসিক যথেষ্ট আপত্তি করেন নাই। পূর্বে বলা হইয়াছে যে পুণ্ড্রবর্ধন সম্রাটের স্বশাসনভুক্ত ছিল বলিয়াই বোধ হয়। নচেৎ প্রমাণতত্ত্ব-লিপিতে পুণ্ড্রবর্ধনের সহিত মগধের সম্বন্ধ লিপিবদ্ধ থাকিত। প্রবীণ ইতিহাসিক ডাঃ ফিট্‌ মহোদয়ও সন্দেহ সহকারে মনে করিয়াছিলেন (৭) ডবাক নামটি বর্তমান “ঢাকা” নামের পূর্বরূপ হইতে পারে কি না? ডবাক “ঢাকা” নামের পূর্ব-
রূপ না হইলেও মনে হয়, কামরূপের দক্ষিণের ও সমতটের উত্তর পূর্বাঞ্চলের

(৫) গৌড়রাজ মালা—৪পৃষ্ঠা ।

*(৬) J. H. A. S. 1897

(৭) Corpus Inscriptionum Indicarum, Vol.

ভূবিভাগই অর্থাৎ বর্তমান ময়মনসিংহ, ঢাকা ও রিপুরা জেলায় অংশবিশেষ লইয়াই সেকালে “ডবাক” প্রদেশের সীমা ধার্য্য করিতে হইবে। ইউয়ান্ চোয়াও, কঙ্ক উল্লিখিত ঐক্যে, কমলাঙ্গ প্রভৃতি দেশগুলিই বোধ হয় সমুদ্রগুপ্তের সময়ের ডবাক হইয়া থাকিবে। কানরূপের সীমাসম্বন্ধেও বড় মতভেদ নাই। এই তিনটি প্রত্যন্ত প্রদেশের মধ্যে গুপ্তসুগের সম্রাট ও ডবাক প্রদেশে যে কোন্ কোন্ রাজা সমুদ্রগুপ্তকে করদানাদি দ্বারা পরিতুষ্ট করিয়া স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিয়াছেন তাহাদের নাম সম্ভ্রান্তি অপরিচ্ছন্ন থাকিলেও ভবিষ্যতে আবিষ্কৃত হইবে বলিয়া আশা করা যাইতে পারে। কারণ, এই সময়েরই কানরূপ নরপতির নাম কালে আবিষ্কৃত হইতে পারিবে, তাহার আশাও ত ছিল না। অর্থাৎ ঐহট্টের পঞ্চগু গ্রামে আবিষ্কৃত সপ্তম-শতাব্দীর কানরূপরাজ ভাঙ্গরবর্ম্মার তাম্রশাসন হইতে আমরা গুপ্তসুগের কানরূপরাজগণের অন্ততঃ নামগুলি প্রাপ্ত হইয়াছি। প্রতিপুরুষের রাজ্যকাল প্রায় পঞ্চবিংশতি বৎসর-ব্যাপী দরিদ্রা লইয়া অল্পমান করিলে দেখা যায় যে, ভাঙ্গরবর্ম্মার উক্ততন দশম বা একাদশ রাজা অর্থাৎ মহারাজ সমুদ্রবর্ম্মা বা পৃথিবর্ম্মাই গুপ্তসম্রাট সমুদ্রগুপ্তের সমসাময়িক প্রত্যন্ত-কানরূপ-প্রদেশের স্বাধীন নরপতি ছিলেন। এই কানরূপেশ্বর সমুদ্রবর্ম্মার যেরূপ বর্ণনা পঞ্চগু তাম্রশাসনে পাওয়া গিয়াছে তাহাতে তিনি যে অকাতরে গুপ্তরাজ সমুদ্রগুপ্তকে রত্নাদি দ্বারা তুষ্ট করিতে পারিয়াছেন তাহার সন্দেহ করিবার কারণ থাকে না। তথাপি সমুদ্রবর্ম্মা এইরূপ ভাবে বর্ণিত হইয়াছেন—

মাংস (স্ত) ত্রায় বিরহিত [:] প্রকাশরত্ন [:] অতো ব (ঐ)রপ-গম্ [:]

পঞ্চম ইব হি সমুদ্র [:] সমুদ্রবর্ম্মাভবত (স্ত) স্ত

সমুদ্র সংখ্যায় চারিটি—এই স্তম্ভ কবি সমুদ্রবর্ম্মাকে পঞ্চম সমুদ্র বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সমুদ্রের ত্রায় তিনিও “প্রকাশ-রত্ন”—অত্যন্ত ঐশ্বর্য্যশালী ছিলেন। সুতরাং সম্রাটকে অর্থদ্বারা তুষ্ট করিবার রত্নের অভাব তাহার কখনও ছিল না। “সমুদ্র” হইলেও তিনি মাংস-ত্রায়-বিরহিত—অর্থাৎ প্রজার প্রতি অত্যাচার-বিরহিত। বাঙ্গালার সম্রাট ও ডবাক প্রদেশের এবং কানরূপ প্রদেশের রাজগণ—“সর্ব্বকরদান—আজ্ঞাকরণ প্রণাম-আগমন” দ্বারা সম্রাটকে পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন বলিয়াই বোধ হয় সমুদ্রগুপ্ত তাহাদের দেশ স্বসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত না করিয়া, প্রণামাজলি এবং

রত্নরাজি উপহাররূপে গ্রহণ করিয়া, তাঁহাদিগকে পূর্বদিকে প্রত্যাহৃত নৃপতি-রূপে স্বরাজ্য চুণাইবার অহুমতি প্রদান করিয়া থাকিবেন। এই প্রসঙ্গে আর একটি গুরুতর প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিতে প্রয়াসী হইতেছি। মহাকবি কালিদাসের বর্ণিত রঘুর দিগ্বিজয়-কাহিনী কোন্ আদর্শে রচিত হইয়াছিল? প্রাচ্য—প্রতীচ্য পণ্ডিতগণ যে যে প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া কালিদাসের অষ্টাদশ-কাল সমুদ্র-গুপ্ত-পুত্র-দ্বিতীয়-চন্দ্র-গুপ্তের সময়ে;—এমন কি তৎপুত্র কুমার-গুপ্তের ও তৎপুত্র স্বন্দ-গুপ্তের সময়েও নির্দিষ্ট করিতে চাহিয়াছেন—তাঁহীর আলোচনা এই প্রবন্ধে করা যাইবে না। কবি কালিদাস রামের পূর্ব-পুরুষ রঘুর দিগ্বিজয় বর্ণনায়, সমসাময়িক দেশের ও জাতির পরিচয় নিজ কাব্যে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। কালিদাসের আবির্ভাবের বহু-পূর্বে রচিত রামায়ণ ও মহাভারত গ্রন্থে ভারতের নানা প্রদেশের যেকোন ভৌগোলিক ও জাতিবিশয়ক বর্ণনা প্রাপ্ত হওয়া যায়, কবি প্রয়োজন সত্ত্বেও সেই সকল প্রদেশের ও জাতির মধ্যে অনেকগুলির নাম পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং যে সকল দেশ ও জাতির সহিত রঘুর কোনরূপ সম্পর্ক থাকিবার কথা নাই, তাহাদের নাম গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা দেখিয়া মনে হয়, কবি নিজ কালের পূর্ববর্তী কোনও দিগ্বিজয়-কাহিনী (৮) অনুসরণ করিয়া রঘুর দিগ্বিজয় বর্ণনে প্রবৃত্ত হইয়া থাকিতে পারেন। সে নরপতি কোন্ নরপতি? (৯) ডাঃ চরণলিঙ্গ মতে সে নরপতি যশোধর্ম-বিক্রমাদিত্য। (১০) ঐতিহাসিক ঐযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের মতে তিনি সম্রাট স্বন্দ-গুপ্ত। কিন্তু হরিবেশের প্রশস্তি ও রঘুবংশের চতুর্থসর্গ একত্র পাঠ করিলে উভয়ের মধ্যে ভাবের, ভাষার, অর্থের ও বিশেষের আত্মরূপা দেখিয়া মনে হয় কালিদাস বর্ণিত রঘুর দিগ্বিজয়, হরিবেশ-বর্ণিত সমুদ্র-গুপ্তের দিগ্বিজয়ের আদর্শে লিখিত হইয়া থাকিবে।

রঘু সর্বপ্রথম পাচ্য ভারত জয় করিবার জন্ত স্বরাজ্য হইতে পূর্ব-সাগর-গামিনী সেনা লইয়া যাত্রা করিলেন। তাঁহার দিগ্বিজয় পথও তিনটি কারণে পরিষ্কৃত হইয়াছিল। (১) তিনি কোন কোন দেশের নরপতিকে নিজ চরণপ্রাপ্তে ঐশ্বর্য্য পুরস্কার দিতে বাধ্য করিয়াছিলেন; (২) কোন

• (৮) Dacca Review, June, 1913

(৯) J. R. A. B. 1960

(১০) Ibid

কোন দেশের নরপতিকে তিনি স্বস্থান চাইতে উৎখাত করিয়াছিলেন, (৩) আবার কোন কোন দেশের নরপতিকে তিনি বহুদা রণে পরাজিত করিয়াছিলেন যথা—(১১)

“তাজিদৈতঃ কলমুংখাতৈঃ ভৈয়চ্চ-বহুদা নৃপৈঃ ।

ততানীভক্ষণো মার্গঃ পাদপৈরিব দন্তিনঃ ॥

চরিত্র-প্রশস্তি চাইতে, সমুদ্রগুপ্ত সম্বন্ধেও আমরা প্রায় তরুণ বর্ণনাই প্রাপ্ত হইয়াছি। তদীয় দিগিজয়কেও রাজনীতিক-সঙ্গ-চিন্তাবে চারিভাগে বিভক্ত করা যাউতে পারে। (১) দক্ষিণাপথের কোমল-কেরল-কাকী কুহলপুরক মচাকাপ্তার বেকী প্রভৃতি প্রদেশের রাজগণকে তিনি সংগ্রামে বন্দী করিয়াও তাঁহাদের বন্ধন মোচন করিয়া দিয়া, তাঁহাদিগকে পরাজে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়া দক্ষিণাত্যে আশ্বপ্রভাব অধিকতর বিস্তার করিয়াছিলেন। (২) আর্ঘ্যাবর্ষের রুদ্রদেব-নাগদন্ত-নন্দি-নাগদেন-অচ্যুত-বলবর্ষ প্রভৃতি রাজগণকে তিনি সমরে সম্মুখে উদ্ধৃত করিয়া তাঁহাদের রাজ্য স্ব-সাম্রাজ্য-ভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন, এবং বিদ্যাটবী-প্রদেশস্থ রাজগণকেও নিজ পরিচারকরূপে নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। আর্ঘ্যাবর্ষের উক্ত রাজগণের প্রদেশগুলিকে তিনি মগধের অধিরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া আপন অপরাধ শাসনের অধীন করিয়া লইয়াছিলেন। (৩) অতিদূরবর্তী সিংহলাদি দ্বীপের রাজগণকে এবং সাহি—সাহাঙ্গসাহি-শক-মুরুগাদি দূরদেশস্থিত ক্ষীণা রাজগণকে সংগ্রামে পরাজিত না করিয়াও তাঁহাদিগকে আশ্বনিবেদন, কৃত্তাদান অর্থদান, বা নিজ নিজ বিষয় ভোগের জন্য সম্রাট পার্শ্বমূলে “গুরুদত্ত” শাসনের ভিক্ষা প্রভৃতি তৃষ্টি-সাধনোপায় অবলম্বন করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন, এবং (৪) মালবদি জাতি মত প্রাচ্যভারতের সম্রাটাদি দেশের রাজগণকে স্ব স্ব দেশে স্বাধীনভাবে থাকিতে দিয়া তাঁহাদের প্রণামাজলি ও অর্থদান লাভ করিয়াই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। রণেও অনেক প্রাচ্য জনপদ আক্রমণ করিয়া তত্ত্ব জনপদের নরপতিগণকে পরাজিত করিয়া তাঁহাদের শাসিত রাজ্য নিজ রাজ্য-ভুক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু যে যে নরপাল উদ্ধৃতা প্রকাশ করেন নাই তাঁহারা রণে অগ্রগ্রে স্বরাজ্য রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন। অনন্তরগণের সমুদ্রভ্রমণ রণে নিকট হুজুরেশীয়গণ [অর্থাৎ বাঙ্গালার রাঢ়দেশবাসিগণ] বৈতঙ্গী বৃত্তি অবলম্বন করিয়া আশ্বরক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন। নৌবল-

বলীয়ান বঙ্গদেশের রাজগণ নৌ-সামান লইয়া রণপুর বিক্রমে সম্বন্ধ চাইলেও রণু প্রথমতঃ তাঁহাদিগকে উৎখাত করিয়া গঙ্গার ধীপপুঞ্জে জয়ন্তজ্ঞাপন করিয়াও, পরে বঙ্গনৃপতিগণ [অর্থাৎ সমতট রাজগণ] বিজীগিব্বর পাদপদ্ম-তলে প্রণতি বিজ্ঞাপন করিয়া অর্ধদানে তাঁহাকে পরিতুষ্ট করায়, তাঁহাদিগকে স্বরাজ্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন যথা (১২)

অনন্নাগাং সমুদ্রকুন্তুম্ভাং সিদ্ধুরগাদিব ।

আত্মা সংরক্ষিতঃ স্তম্ভৈবৃদ্ধিমান্ধিতা বৈতলীম্ ॥

বঙ্গাজংখার তরসা নেতা নৌ-সামানোজ্ঞাতান্ ।

নিচণানে জয়ন্তজ্ঞান্ গঙ্গানোতোহস্তরেন্ সঃ ॥

আপাদ-পদ্ম-প্রণতাঃ কলমা ইব তে রণুম্ ।

কদৈঃ সংবর্দ্ধয়ামাসুঃখাত-প্রতিরোপিতাঃ ॥

এই ত রণুর সহিত বঙ্গের ও স্তম্ভের সম্বন্ধ । সমুদ্রগুপ্তের সহিত বঙ্গের বা সমতটের কি সম্বন্ধ ছিল তাহাও পূর্বে কথিত হইয়াছে । সমতট-রাজ অর্ধদান ও প্রণামাদি দ্বারা গুপ্তরাজকে তুষ্ট করিয়া গুপ্ত প্রভাব মানা করিয়া চলিতেন । পূর্কদিকের ভয়ের পর রণু উৎকল ও কলিঙ্গ জয় করিয়া দক্ষিণের ও পশ্চিমের রাজগণকে লম্বরে পরাজিত করিয়া উত্তর পশ্চিমস্থ হুণ্, কাবোজ, ববন প্রভৃতি অনার্য জাতির সহিত তুমুল যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে পরাকৃত করিয়াছিলেন । তৎপর উত্তর দিক দিয়া অগ্রসর হইয়া লোহিত্য [ব্রহ্মপুত্র] নদ পার হইয়া, তিনি প্রাগজ্যোতিষপুরেশ্বরকে আক্রমণ করেন । কিন্তু কামরূপাদিপতি যে গজবট লইয়া অজ্ঞাত নরপতির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতেন, রণুর পরাক্রম সহ্য করিতে না পারিয়া, তিনি সেই গজবট তাঁহাকে উপহার স্বরূপ প্রদান করিয়া অজ্ঞাত রত্নরাজি দ্বারাও তাঁহার পাদার্চন করিয়াছিলেন । যথা (১৩)

তমীশঃ কামরূপাণামত্যাগ ওল-বিক্রমন্ ।

ভেজে ভিন্ন-কটৈর্নগৈঃ রত্নাহুপকরণোদ যৈঃ ॥

কামরূপেশ্বরস্তস্য ছেনপীঠাদিদেবতাম্ ।

রত্নপুষ্পোপহারেণ ছায়ামানর্চ পাদয়োঃ ॥

সমুদ্র-গুপ্তের প্রশস্তি হঠাৎ তাহার সময়ে কামরূপাদিপতিস্বরূপে বিরূপ অবস্থা ছিল, তাহার কথাও পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে । তিনি বহুরাজ্য উপহার ও প্রাণ-মাদির দ্বারা সমুদ্র-গুপ্তের তুষ্টিসাধন করিয়াছিলেন ।

ভূত্ববলে দিগ্বিজয় করিয়া সমুদ্র-গুপ্ত যে বিপুল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়া-ছিলেন তাহার সীমা নির্দেশ করিতে চেষ্টা, কালিদাসেরও পূর্ববর্তী মহাকবি ভাস্কর্যের রচিত নাটকগুলির ভরতবাক্যটি স্বতঃই মনে উদ্ভূত হয় । যথা (১৪)

“ইমাং সাগরপর্যন্তাং হিমবদ্ভিকাকুণ্ডলান্ ।

মহীমেকাতপত্রাকাং রাজসিংহঃ প্রাপ্ত নঃ ॥”

পূর্ব-পশ্চিম-সাগর-পর্যন্ত-বিস্তৃত, হিমাচল-বিন্ধ্যগিরির মধ্যস্থিত, আশ্বপতিষ্ঠিত আর্ঘ্যাবর্ত সাম্রাজ্য ভোগ করিয়া, সমুদ্র-গুপ্ত চতুর্থ শতাব্দীর শেষভাগে পরলোক গমন করেন । তৎপরে, তদীয় পুত্র ইতিহাসে ও জনপ্রতিভাতে বিরূপাদিত্য নামে প্রসিদ্ধ, দ্বিতীয় চন্দ্র-গুপ্ত পিতৃ সিংহাসনে আরূঢ় হইয়াছিলেন । সমুদ্র-গুপ্ত বহু পুত্রমধ্যে পিতৃপ্রযুক্ত নিয়ম অবলম্বন করিয়া, চন্দ্র-গুপ্তকেই যৌবরাজ্যে অধিষ্ঠিত করিয়াছিলেন । বিরূপাদিত্য-চন্দ্র-গুপ্তের মনয়ের অনেকগুলি প্রাচীন লিপি আবিষ্কৃত হওয়ায়, তাহার রাজ্যকাল সম্যক ভাবেই নির্ধারিত হইয়াছে । তিনি ৪১৩ বা ৪১৪ খৃঃাব্দ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন, তাহার প্রাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় । গুপ্তসংবৎ ৮২ অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় ৪০১—৪০২ সংবৎসরে এই গুপ্ত সম্রাটের কোন সামন্ত নরপাল কর্তৃক বিহিত “দেয়ধর্মের” কথা, (১৫) মধ্যভারতের উদয়গিরির গুহাতে ক্ষোদিত পাওয়া গিয়াছে । ৯৩ গুপ্তাব্দ = সংবৎ ১১৩) সাঁচিতে আবিষ্কৃত অপর একটি প্রস্তর-লিপি হইতে জানিতে পারা গিয়াছে যে, “চন্দ্র-গুপ্ত-পাদপ্রসাদে-অপ্যায়িত-জীবিত-সাধন” ও “অনেক” সময়ে আবাস্ত-বিজয়-যশঃ-পতাক” আশ্বকর্দব নামক কোনও উচ্চ শ্রেণীর রাজকর্ণচৌরী ঈশ্বরবাসক নামক একটি স্থান ও ভিক্ষুগণের ভোজননের ও রত্নগুহের প্রদীপের জন্ত পঞ্চবিংশতি সীনার মুদ্রা, এক মহাবিহারবাসী “আর্ঘ্যসঙ্ঘকে” (১৭) প্রদান করিয়াছিলেন । মহারাজ সিদ্ধিয়ার রাজ্যে অবস্থিত সেই উদয়গিরির অপর একটি গুপ্ত-লিপি হইতে জানা গিয়াছে যে “অদয় প্রাপ্ত-সাঁচিবা” অর্থাৎ বংশাভ্যুত্থান-সাঁচী-পদ-

(১৪) ভাস্কর্য-রচিত; “স্বপ্ন-বাসবদত্ত” নাটক । বটাক ।

(১৫) Fleet's Gupta Inscriptions, no 3.

(১৬) Ibid, No 5.

(১৭) Ibid. No 6.

ধার্মী সাক্ষিবিশিষ্ট পাটলিপুত্র-নিবাসী বীরসেন-নামা মন্ত্রী ভগবান শম্ভুর নামে সেই ওহাটি নির্মাণ করাইয়াছিলেন। এই লিপি পাঠে একটি ঐতিহাসিক বৃত্তান্তও জানা যাইতে পারে। মহারাজাধিরাজ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত “কুব্জ-পৃথ্বী-জয়ার্থে” অর্থাৎ সমগ্র পৃথিবীর বিজয় আকাঙ্ক্ষা করিয়া; রাজধানী পাটলিপুত্র-নগর হইতে সেনা লইয়া বহির্গত হইবার সময়ে, মন্ত্রী বীরসেনকে সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। দ্বিধিভয়ে বহির্গত হইয়া তিনি যে পশ্চিম দিকে মালব, গুজরাট, ও সুরাষ্ট্র পর্ণাত্ত অগ্রসর হইয়া সেই সেই দেশে বহুকাল যাবৎ শাসন-পরিচালন কর্তী সুপ্রতিষ্ঠিত ক্ষত্রগণকে পরাভূত করিয়া সেই সেই দেশ স্বসাম্রাজ্য-ভুক্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, ইতিহাস পাঠক মীত্রেয়ই তাহা সুবিদিত। তবে কি দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত এই দ্বিধিভয় যাত্রার সময়েই প্রাচ্য ভারতেও অগ্রসর হইয়াছিলেন এবং গুপ্ত-প্রভাব হইতে মুক্ত হইয়া সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন হইবার আকাঙ্ক্ষায় উত্তিত বঙ্গবাসিগণকে সমুখ-সমরে পরাভূত করিয়াছিলেন? এই প্রশ্নের মীমাংসায়ও অনেক গোলযোগ আছে—কারণ, মেহরোলির লৌহস্তম্ভে (১৮) প্রাচীন গুপ্তাশ্বক্রে উৎকীর্ণ যে লিপি হইতে আমরা চন্দ্র-নামক কোনও নরপতির বঙ্গ ও কলিঙ্গ দেশ জয় করিবার কথা অবগত হইতে পারিয়াছি, সেই লিপিতে উল্লিখিত “চন্দ্রনরপতি” দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত কি না, তাহাষে পণ্ডিতসমাজে অজ্ঞাপি তর্কের অবসান হয় নাই। হরঞ্জি-শিখ-প্রমুখ প্রধান পান্চাত্য পণ্ডিতগণ কেন যে এই চন্দ্রকে প্রথমতঃ বিক্রমাদিত্য চন্দ্রগুপ্তই মনে করিয়াছিলেন, কেনই বা সম্প্রতি শিখ সাহেব মহোদয় মহামহোপাধ্যায় ক্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়ার পর, তৎপাঠে স্বমত পরিবর্তন (১৯) করিয়া এই চন্দ্রকে গুপ্তযুগেরই প্রথমভাগে বর্তমান রাজপুতনার পোকর্ণ [পুফরগ] নগরের চন্দ্রবর্ষরূপে ধাৰ্য্য করিতে চাহেন, কেনই বা বুদ্ধ ঐতিহাসিক ফ্লিট সাহেবের মতাসূসরণ করিয়া, “ভারতীয় মুদ্রামালার” সংকলয়িতা এল্যান (২০) প্রকৃতি মনীষিগণ এই চন্দ্রকে প্রথম চন্দ্রগুপ্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন এবং কেনই বা শাস্ত্রী মহাশয় ও সিদ্ধান্তবারিদি প্রাচ্যবিজ্ঞানমহর্ষি মহাশয় শুণ্ডনিয়া পর্কতের লিপিতে উল্লিখিত চন্দ্রবর্ষাকে ও এই লৌহস্তম্ভলিপির “চন্দ্রকে”

(১৮) Fleet's Gupta Inscriptions—no 32.

(১৯) Early history of India, 3rd. Edition.

(২০) Catalogue of Indian Coins, Gupta Dynasties, Introduction, pp

একই ব্যক্তি মনে করেন—তাহার বিদ্রুত আলোচনা এই প্রবন্ধে চলিতে পারে না। সে যাহা হউক, প্রাচীন গুপ্তযুগের বিজ্ঞতা-বনা-পরায়ণ চন্দ্রনামক কোনও কুমি-পতি [তিনি মগধরাজ্যই হউন বা পোকর্ণনগরের অধিপতিই হউন] ভগবান বিষ্ণুর ধর্মরূপে এই লৌহস্তম্ভ উত্তোলিত করাইয়াছিলেন। “চন্দ্র” বঙ্গদেশে গেলে পর, তদ্রূপীয়াগণ সমবেত হইয়া তাহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিল সত্য, কিন্তু তিনি আশ্চর্যক্রমে তাহাদিগকে প্রতিরুদ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি, সিদ্ধুর সপ্তমুখ ও উত্তীর্ণ হইয়া বাহ্লিকদেশবাসিগণকে পরাজিত করিয়াছিলেন, এবং দক্ষিণেও সমুদ্রকে নিজ-পরাক্রম-বায়ুতে সৌগন্ধ-যুক্ত করিয়াছিলেন। যথা,

যজ্ঞোদ্বর্তয়তঃ প্রতীপমুরসা শক্রন্ সমেতাগতান্

বঙ্গোদ্বাহব-বর্জিনো ভিলিখিতো খড়্গেন কীর্ত্তিভূজে।

তীর্থ। সপ্ত মুখানি যেন সমরে সিদ্ধোজ্জ্বিতা বাহ্লিক।

যজ্ঞাশ্ব্যপার্বিবাস্ততে জলনিদ্রিবীর্ঘ্যানিলৈর্দক্ষিণঃ ॥

বিক্রমাদিত্য-চন্দ্রগুপ্তের সমসাময়িক শাসনাবলীতে “দীনার” নামক মুদ্রার উল্লেখ প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রাচীন রোম-রাজ্যে ব্যবহৃত দিনেরিয়াস (Lat Denarius) মুদ্রার নামের সহিত, ইহার কোনরূপ সম্বন্ধ আছে কি না তাহা বলা যায় না। কাতায়ন ও বৃহস্পতির মতে প্রতি “দীনার” মুদ্রার মূল্য ৪২ তাম্রকার্ষিক পণ অর্থাৎ প্রায় আধুনিক আড়াই টাকা। যতদূর জানা গিয়াছে তাহাতে এই দীনার মুদ্রা ভারতবর্ষে প্রথমতঃ কুবাণ সম্রাট কর্ণিক কর্তৃক প্রচলিত হইয়াছিল। ষষ্ঠ শতাব্দীর মহাকবি ও আলঙ্কারিক দণ্ডী তাহার “দশকুমার-চরিতে” দীনার মুদ্রার উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—(২১)

“দীনারানসংখ্যান্ রাশীকৃত্য” ইত্যাদি।

দ্বিতীয়—চন্দ্রগুপ্তের রাজ্য সময়েই চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হায়েন [৪০৫-৪১১ খৃঃ অব্দ] প্রাচ্য ভারতে ভ্রমণ করিতে করিতে স্বক্ৰমেণ রাজধানী, সেকালের প্রধান বন্দর তাম্রলিপি নগরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। দণ্ডী দশকুমার চরিতেও এই নগরটি উল্লিখিত আছে। যথা (২২)

“স্বক্ষেপু দামলিপ্তাস্বয়ন্ত নগরন্ত” ইত্যাদি।

দামলিপ্ত ও তাম্রলিপ্ত একই স্থান বলিয়া পণ্ডিতগণ কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে। উড়িষ্যা-নাতিপূর্বোত্তরে বাঙ্গালার স্বক্ৰমেণ। তাহারই রাজধানী ছিল

(২১) দশকুমার-চরিতম্—পূর্ব-পীঠিকা, চতুর্থ উচ্ছ্বাস।

(২২) ঐ —পূর্ব-পীঠিকা, ৬ষ্ঠ উচ্ছ্বাস।

সমুদ্রের নিকটবর্তী কপিলা-তীরে তাম্রলিপ্তি-নগর। বৌদ্ধ শাস্ত্রের অধ্যয়নে পরিভ্রাজক এত নিব্বিষ্টমনা ছিলেন যে, তাম্রলিপ্তির রাজার নামোচ্চারণের কথা শ্রুত থাকুক, সমগ্র আর্ঘ্যাবস্দের সম্রাট মগধনাথ চন্দ্রগুপ্তের নাম পর্যন্ত, তিনি নিজ ভ্রমণ-বৃত্তান্তে সংযোজিত করেন নাই। সমস্ত রাজা সর্ব বিষয়ে সমৃদ্ধি-সম্পন্ন ও সুশাসিত ছিল, এই ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত বাতীত তাঁহার রচিত ভ্রমণ-বৃত্তান্ত হইতে আর অধিক কিছু জানা যায় নাই। শুশ্রূষাশ্রমের মূদায় অধিক চিন্তাদি ও শাসনাদিতে উল্লিখিত বিষয়েই মগ্ন হইতে, এই গুণে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব কমিয়া আসিতেছিল বলিয়া প্রতীয়মান হয়। সম্রাটগণও নিজকে “পরম-ভাগবত” বলিয়া সর্বত্র উল্লেখ করিয়াছেন—সূর্য্য, শার্ঙ্গী, কাষ্ঠিকের, শম্বু প্রভৃতি পৌরাণিক দেবতার উল্লেখ দানাদির উল্লেখ দেখিয়া বলিতে ইচ্ছা হয় যে, বৌদ্ধ পরিভ্রাজক ফা-হায়েন সর্বত্র বৌদ্ধধর্মের যেরূপ প্রাধান্যের কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা বিনা পক্ষপাতে লিখেন নাই। সর্বত্র তিনি বৌদ্ধ বিহারাদির পরিদর্শন করিয়াই সমগ্রাতিপাত করিয়া থাকিবেন, সর্ব-সাধারণের অবস্থার দিকে বড় একটা লক্ষ্য করেন নাই। রাজধানী পাটলিপুত্র নগরের সমৃদ্ধি দেখিয়া, গয়ায় আসিয়া তিনি বৌদ্ধদের এই পরম পবিত্র স্থানকে জঙ্গলময় দেখিতে পাইয়াছিলেন। তত্পর গঙ্গার দক্ষিণ কুলবর্তিনী অঙ্গরাজধানী চম্পানগরী পরিদর্শন করিয়া তিনি স্রদ্ধদেশের তাম্রলিপ্তিনামক রম্যে আসিয়া উপস্থিত হন। এই নগরে তিনি ত্রিঙ্গুণ পরিপূর্ণ ২১টি বৌদ্ধবিহার দেখিতে পান। তিনি লিখিয়াছেন, “বৌদ্ধধর্মও এই স্থানে প্রভাব বিস্তার করিতেছিল।” ইহা দ্বারা ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের প্রভাব থাকাও বুঝা যাইতে পারে। “এই নগরে দুই বৎসর কাল বাস করিয়া তিনি বৌদ্ধ ত্রিপিটকের যে সকল গ্রন্থ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন, তাহার প্রতি-লিপি-প্রস্তুত-করণ-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। প্রতিমার চিত্রাঙ্কণেও তিনি অনেক সময় কাটাইয়াছিলেন। এই “প্রতিমা” শব্দ হইতে আমরা ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের দেবদেবীর মূর্ত্তি চিত্রই কেবল বুঝি না। কারণ—পাটলিপুত্র নগরে প্রতি বৎসর দ্বিতীয় মাসের অষ্টম দিবসে স্বর্ণ, রৌপ্য ও মণিমাণিক্যাদি দ্বারা বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্ত্তি প্রস্তুত করা ইয়া জনসমাজ তাহা লইয়া এক উৎসব যাত্রা [মিছিল] বাহির করিত এই কথা পরিভ্রাজকই (২৩) নিজ ভ্রমণবৃত্তান্তে

উল্লেখ করিয়াছেন পূর্ক-ভারতের বাণিজ্যের কেন্দ্র তাম্রলিপ্তি নগর হইতে চৈনিক পরিব্রাজক বাণিজ্যপোতে আরোহণ করিয়া সমুদ্রপথে করিয়া, ত্রাতি দিন সমানভাবে ছাহাজ চালাইয়া চতুর্দশ দিবসের পর, সিংহল দ্বীপে উপনীত হইয়াছিলেন। গুপ্তযুগে পশ্চিমে সুরাস্ট্রের হুণ্ড-কচ্ছ নগর ও পূর্বে স্কন্ধের তাম্রলিপ্তি নগর—এই দুইটিই উত্তরাপথের প্রধান বন্দর ছিল। এবং সেকালে সমুদ্রযাত্রার এই দুইটিই প্রধান পথ ছিল বলিয়ঃ প্রতীয়মান হয়। গুপ্তযুগেরই কবি কালিদাসের কাব্যে ও নাটকে “চীনাংশুক” প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার হইতেও সেকালের সচিৎ বাঙ্গালার তাম্রলিপ্তি নগর দিয়া সূত্র চীন প্রকৃতি দেশের সহিত বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল বলিয়া অনুমান হইতে পারে।

বিক্রমাদিত্য—দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের পুত্র, মহেন্দ্রাদিত্য-উপাধিক প্রথম-কুমারগুপ্ত ৪১৬৪১। খৃষ্টাব্দে পিতৃরাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১১৭ ওপ্রাদ সংবলিত। কৈফাভাদ জেলাতে অবস্থিত। একটি শিবলিঙ্গের পাতে ক্ষোদিত লিপি (২৪) হইতে জানা গিয়াছে যে মহারাজাদিরাজ দ্বিতীয়-চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী “কুমারামাত্য”-পদবীক শিখর-স্বামীর পুত্র, “কুমারামাত্য”-পদবীক মন্ত্রী পৃথিবীসেন, মহারাজাদিরাজ কুমার-গুপ্ত কর্তৃক “মহাবলাদিক্ত” [সেনানায়ক] রূপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কোন্ কোন বংশে যে মন্ত্রী প্রতিলিপিত পদও পুরুষাত্মক্রে প্রচলিত থাকিত, তাহার প্রমাণ কেবল গুপ্তযুগে কেন পরবর্তী কালে বাঙ্গালার পালরাজগণের সময়েও প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। লাট [গুজ-রাট]-দেশীয় পট্টবস্ত্রব্যবহারের অবস্থা কিরূপ সমৃদ্ধগুক্ত ছিল, তাহার কিছু পরিচয় কুমারগুপ্তের ও তদীয় বন্ধু [মহাট-নিযুক্ত] মালবের দশপুর-নগরীর শাসনকর্তা বজুবস্ত্রীর নামান্বিত একটি দীর্ঘ প্রস্তর লিপি (২৫) হইতে জানিতে পারা গিয়াছে। হুণ্ড-কচ্ছ বন্দর দিয়া লাট-দেশীয় পট্টবস্ত্রব্যবহারের প্রস্তুত পট্ট-বস্ত্রাদি সমুদ্রপথে দ্রব্যবস্তী দেশে রপ্তানি হইয়া বাইত। তাম্রলিপ্তির বন্দর দিয়াও হয়ত, বঙ্গীয় তত্ত্বাবহারগণের সম্মিল্ ও অত্যন্ত “মিষ্ট চক্ৰাদি” দেশ-দেশান্তরে রপ্তানি হইত।

ভারতের নানা স্থানে কুমার-গুপ্ত-নামান্বিত মুদ্রার ও তদীয় রাজ্য-সংবৎ-সংবলিত তাম্রশাসনাদির আবিষ্কার হইতে অস্ব্ষিত হইতে পারে যে, তিনি পিতৃরাজ্য প্রথমতঃ অক্ষর রাধিতে পারিয়াছিলেন। তদীয়—নামান্বিত

অশ্বমেধ-যজ্ঞ-চিত্র সমন্বিত সুবর্ণ-মুদ্রা আবিষ্কৃত হওয়ায়, বলা যাইতে পারে যে, তিনি অশ্বমেধ-যজ্ঞ সম্পাদন করাইয়াছিলেন। বড়ই সৌভাগ্যের বিষয় যে মহারাজাধিরাজ প্রমথ কুমার-জগন্নাথ [১৩৩ খ্রিষ্টাব্দের] বিজয়-রাজ্য-সংবৎ-সংবলিত একখণ্ড অতি জীর্ণ তাম্রশাসন উত্তরবঙ্গের এই রাজসাহী জেলায়ই প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। নাটোর মহকুমার অন্তর্গত খলিসাডাঙ্গা নামক ক্ষুদ্র নদীর তীরবর্তী ধানাইদহ নামক গ্রামে প্রায় পনের শত বৎসর পূর্বের প্রাচীন গুপ্তাক্ষরে উৎকীর্ণ এই লিপিবদ্ধ আবিষ্কৃত হইয়াছিল। সেই স্থানের জমিদার মোলবী এন্সাদ আলি খা চৌধুরী মহাশয় তাঁহার এক প্রকার নিকট হইতে ইহা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বরেন্দ্র অহুসন্ধান-সমিতির প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত কুমার শরৎকুমার রায় ও প্রকাশক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহোদয়ের চেষ্টাতে এই তাম্রশাসনখানি বরেন্দ্র অহুসন্ধান-সমিতির অধিকারে আসিয়াছে এবং ইহা সমিতির সংগৃহীত কীর্তি-কলাপের অঙ্গতমরূপে সমিতির প্রতিমানন্দিরে রক্ষিত হইতেছে। ভারতবর্ষে এযাবৎ আবিষ্কৃত ভূমিদান-বিষয়ক তাম্রশাসনাবলীর মধ্যে কুমারজগন্নাথের সময়ের এই তাম্রশাসনখানিই সর্বাধিক প্রাচীন। প্রত্নতত্ত্ব-পারদর্শী বঙ্গবর শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ মহাশয় অক্ষরবাবুর অহুমতি লইয়া এই তাম্রশাসনের একটি পাঠ বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় (৩৬) ও বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত করিয়াছিলেন। এই প্রবন্ধ লেখা-প্রসঙ্গে, মূল শাসনের সহিত বন্দ্যোপাধ্যায়-মহাশয়-কর্তৃক উদ্ধৃত পাঠ নিলাইতে গিয়া দেখা গেল যে, তাঁহার পাঠ সর্বাংশে মূলানুগত হয় নাই। বারম্বার হইতে মূল শাসন-খণ্ডের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ খাসিয়া পড়ায় এবং তাম্রপট্টখানির জীর্ণতা চেষ্টা অক্ষরগুলি দুগুণপ্রায় হইয়া যাওয়ায়, পাঠোদ্ধার ও ব্যাখ্যাকার্য্য কঠিন ব্যাপার হইয়া পড়িয়াছে। সে যাহা হউক, তাহা প্রবন্ধান্তরে সমালোচিত হইতে পারিবে। বঙ্গালার পোণ্ড-বর্ধনে আবিষ্কৃত, গুপ্তযুগের এই প্রাচীন লিপি হইতে কি কি তথ্য প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে তাহারই চাই একটি কথা বলা যাইতেছে। যতদূর পাঠ উদ্ধৃত হইতে পারিয়াছে, তাহার মর্ম্ম হইতে এই অবগত হওয়া যায় যে, কোনও ব্যক্তি “মহাপুসপার বিষয়ের” মহত্তরদিগের নিকট হইতে সেই বিষয়-স্বত্ব একখণ্ড ভূমি যাক্সা করিয়া লইয়া কটক [রাজধানী বা সেনানিবাস]-বাস্তব্য “ছন্দোগ-ত্রাঙ্গণ” বরাহ দ্বামীকে প্রদান করিয়াছিলেন। প্রতিগৃহীতা “ছন্দোগ” [অর্থাৎ

সামবেদাদায়ী] ব্রাহ্মণ ছিলেন। এই শাসনের আর একটি উল্লেখযোগ্য কথা প্রদত্তভূমির “নীবীধর্ম্য ক্ষয়ের” কথা। কুমারগুপ্ত পুত্র স্বল্পগুপ্তের সময়ের একটি প্রস্তর-স্তম্ভ-লিপি হইতে (২৭) আমরা একটি গ্রামকে “অক্ষয়-নীবী” রূপে অর্থাৎ চিরস্থায়ী দানরূপে প্রদত্ত হইবার কথা পাইয়াছি এবং ১৩১ গুপ্তাব্দ-সংবলিত সঁচিতে আবিস্কৃত পামাগলিপি হইতেও (২৮) আমরা “অক্ষয়-নীবী”রূপে দ্বাদশ দীনার মুদ্রা দানের বিষয় প্রাপ্ত হইয়াছি। এই দ্বাদশ দীনার মুদ্রার তুচ্ছ [অল্প] হইতে প্রতিদিন একটি একটি তিক্তর ভোজনকার্য সম্পাদিত হইত। ইহা হইতে এই বুঝা যাইতেছে যে, মূলদানের নাশ হইতে পারিবে না—ইহাই দাতার ইচ্ছা। ভূমিদান সৎক্ষেত্র আমরা “অক্ষয়-নীবী” শব্দে কি বুঝিব? প্রতিগ্রহীতা ব্রাহ্মণপ্রদত্ত ভূমির আর প্রত্যায়েয় যথেষ্ট ভোগ করিতে পারিবেন মাত্র; কিন্তু মূল ভূমিটা কোনরূপে হস্তান্তরিত বা তাহা বিক্রয় করিয়া “নীবী ধর্ম্যের” নাশ করিতে পারিবেন না। কিন্তু ধানাইদহ তাম্রশাসনে ব্যবহৃত “নীবীধর্ম্যক্ষয় মালভা” এই পদদ্বয় হইতে বুঝা যাইতেছে যে দাতা বা দাতৃগণপ্রদত্ত-ভূমিখণ্ডের এইরূপ ধর্ম্যনষ্ট করিয়াই প্রদান করিয়া থাকিবেন, এবং প্রতিগ্রহীতা তাহার যথেষ্ট ব্যবহার করিতে পারিবেন। কুমারগুপ্তের রাজ্যের সীমা কতদূর পর্য্যন্ত নিশ্চিত ছিল তাহার প্রমাণরূপে আমরা স্বর্জকবি বংশভট্টের প্রশস্তির নিম্নোক্ত শ্লোকটি হইতে অনুমান করিয়া লইতে পারি, যথা—

চতুঃসমুদ্রান্ত-বিলোল-মেখলাং

স্বমেধ-কৈলাস-বৃহৎ-পদোদরাম্ ॥

বনাস্ত-বাস্ত-গুট-প্লহাসিনীং

কুমারগুপ্তে পৃথিবীং প্রশাসতি ॥

কুমার-গুপ্তের রাজ্য সময়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত কোনও ব্যক্তি কার্তিকেয়ের এক মন্দিরে প্রতীক-নির্মাণ, পত্র-স্থাপন : ও প্রস্তর স্তম্ভোদ্যোজন কার্য সম্পাদন করাইয়াছিলেন। সম্রাটের প্রচলিত রোপা মুদ্রার গরুড়ের পরিবর্তে কার্তিকেয়-বাহন মণ্ডলের চিত্রই অঙ্কিত প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহা হইতে কুমার-গুপ্তের সময়ে কুমার-পুত্রের প্রচলন পাকা অনুমান হইতে পারে। বুঝি বা সেই জম্বাই মহারাজ-পুত্রের নামও “স্বল্প-গুপ্ত” রাখা হইয়াছিল। মহারাজাধিরাজ প্রথম

(২৭) Fleet's Gupta Inscription, No 12.

(২৮) Fleet's Gupta Inscriptions No 62

(২৯) Fleet's Gupta Inscription—No 18

কুমারগুপ্ত দীর্ঘকাল রাজ্য ভোগের পর শেষজীবনে রাজ্য-লক্ষীকে বিচলিত অবস্থায় রাখিয়া পরলোক প্রাপ্ত হন। তৎপর পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যভাগে [আনুমানিক ৪৫৫ খ্রষ্টাব্দে] তদীয় পুত্র ও উত্তরাধিকারী পিতৃ-পরিণত-পান-পয়-বস্ত্রী প্রতিভা-মণ্ডিত কুলবলতা গুপ্তবংশকবীর মচারাকাদিলাজ স্বল্পগুপ্ত সম্রাজ্য প্রাপ্ত হন। “কামলক্ষীকে বিপ্লুত নৌথিয়” তিনি ক্রতবেগে শত্রুগণের পরাজয়-সাধন করিবার জন্য রাজধানী হটতে বহির্গত হইয়াছিলেন। পরাক্রমে ও অর্থে বলীমান পুয়ামিত্র নামক এক কাতিল এবং পশ্চিমে হনগণের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া তাহাদিগকে সমরে পরাভূত করিয়া, তিনি বিনয়, বল, ক্রনীতি এবং বিক্রম অবলম্বন করিয়া পুনরায় পিতৃরাজ্যে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। জুনাগড়ের পর্কতগায়কোদিত লিপি (৩০) হইতে জানা যায় যে তিনি হৃণ-স্বেচ্ছ-গণের দেশ পর্বন্ত অগ্রসর হইয়া রিপুকলের দর্প আশূল ভগ্ন করিয়া দিয়াছিলেন। পিতৃরাজ্য “অনদিকৃত-বিলুপ্ত” না হয়—এই কল্প স্বল্পগুপ্ত “স্বল্পখনিরভিলাষ” হইয়া “বিচলিতকুল লক্ষীকে” দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত রাখিতে চেষ্টার ক্রটি করিয়া-ছিলেন না। শত্রুজয়ে বিনির্গত হইয়া তিনি কষ্ট সন্তুষ্টির যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছিলেন।—এই কল্পের সময়ে, তিনি এক নিমীখে ক্ষিত্তিতে শয়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বলা, (৩১)

“বিচলিত কুললক্ষী-স্তম্বনায়োত্তেন

ক্ষিত্তিতল-শয়নীয়ে যেন নীতা ত্রিযাম।”

শত্রুগণের উচ্ছেদ সাধন করিয়া তিনি, স্বরাজ্যের সুশাসনের জন্য—

“সকল্যে দেশেষু বিদায় গোপ্তৃন্। (৩২)

সকল প্রদেশে উপযুক্ত “গোপ্তা” বা শাসয়িতা নিযুক্ত করিতে লাগিলেন। পশ্চিমে হুয়ান্টু দেশ পালনের জন্য তিনি বহু-গুণাধিত মনে করিয়া পর্ণদত্ত-নামক এক রাজ্য-ভারোত্তরন-সমর্থ ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিয়া স্থল হইতে পারিয়া-ছিলেন। অল্প একটি লিপিতে (৩৩) স্বল্পগুপ্ত “ক্ষিত্তিপ-শত-পতি” বলিয়া কীর্তিত হইয়াছেন। পূর্বদিকে ও উত্তরে দেশ রক্ষার্থে, উপযুক্ত “গোপ্তার” নিৰ্ব্বাচন করিয়া, কাচাকে ও সামন্তরাজরূপে নিযুক্ত করিতে হইয়া ছিল কি না, তাহা

(৩০) Fleet's Gupta Inscriptions—No 14.

(৩১) Ibid—No 13.

(৩২) Fleet's Gupta Inscriptions—No 14.

(৩৩) Ibid—No 15.

জানিতে পারা যায় নাই। কুমারগুপ্তের রাজ্যের শেষভাগে সাম্রাজ্যের যে চঃসময়ের হুচনা হওয়ায়, পুত্রকে বিচলিত রাজ্যলক্ষ্মীকে ধ্বনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইয়াছিল, সেই সময়ে বাঙ্গালার সহিত মগধের কিরূপ সন্ধ বর্তমান ছিল তাহার প্রমাণাত্য। তবে ৪৬৫-৬৬ খৃঃ অব্দের (৩৪) এবং ৪৬৭-৬৮ খৃষ্টাব্দের লিপি (৩৫) হইতে অবগত হওয়া যায় যে বঙ্গগুপ্তের বিজয় রাজা উত্তরোত্তর অভিবর্দ্ধমান ছিল। ঢাকা বিভাগের স্কুল ইন্সপেক্টর* টেপলটন সাহেব মহোদয় করিমপুর জেলার কোটালিপাড় নদীক স্থানে বঙ্গগুপ্তের নামাক্তিত মুদ্রার ও ঢাকানগরে পিলখানার নিকটে ও করিমপুরের সেই কোটালিপাড়তেই গুপ্তরাজগণের সময়ে ব্যবহৃত চক্কের মুদ্রার স্থায় মুদ্রার আবিষ্কারের সংগ্রহ প্রদান করিয়া (৩৬) বঙ্গবাসীর রূতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন। মনে হয় পূর্বাঞ্চলের সামন্তগণের সহিত বঙ্গগুপ্তের সন্ধ অক্ষুণ্ণই ছিল, অর্থাৎ বঙ্গের রাজগণ এই সময়েও গুপ্তপ্রভাব মানিয়া লইয়া স্বরাজ্যে স্বাধীন ছিলেন। আনুমানিক ৪৮০ খৃষ্টাব্দে বঙ্গগুপ্ত দেবব লাভ করেন। তিনি আশ্ব-পরাক্রমে হুণদিগের আক্রমণ হইতে সাম্রাজ্য রক্ষা করিতে পারিলেও তাঁহার উত্তরাধিকারী প্রথম-কুমার-গুপ্তের অপরা পুত্র, পুত্রগুপ্তের সময় হইতে [হয়ত বা বঙ্গগুপ্তের রাজত্বের শেষভাগ হইতে?] পশ্চিমাঞ্চলে ক্রমে ক্রমে তাহাদিগের প্রতিপত্তির হ্রাস হইতে থাকে। কিন্তু পূর্বাঞ্চলে কেবল মগধ ও তৎসম্বন্ধিত দেশসমূহ পুত্রগুপ্তের অপরোক্ষ শাসনের অধীন ছিল। পুত্রগুপ্তের পরেও মূলবংশের আরও দুই পুরুষ মগধ-সাম্রাজ্য পূর্ববৎ প্রচলিত রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাহাদের নাম পুত্রগুপ্ত-পুত্র নালন্দ-বিহারে ইষ্টকনিমিত্ত ৩০০ ফুট উচ্চ বৌদ্ধ মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা নরসিং-গুপ্ত-বানাদিত্য ও তৎপর তদীয়-পুত্র দ্বিতীয়-কুমার-গুপ্ত। এই দ্বিতীয়-কুমার-গুপ্তই ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত রাজ্য পরিচালন করিয়া প্রাচীন গুপ্তবংশীয়গণ কর্তৃক মগধ-সাম্রাজ্য-শাসন-কার্যের অবসান আনয়ন করেন।

মগধরাজ নরসিং-গুপ্ত-বালদিত্য ও উজ্জয়িনীর যশোধর্মনামা নরপতি ভোরামানের পুত্র হুণাধিপ মিহিরকুলকে পরাজিত করিয়া হুণগণের দর্প খর্ব্ব করিয়া দিয়া, ভারতবর্ষকে তাহাদের অত্যাচার ও আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়া ছিলেন। বহুপূর্বকাল হইতে অপ্রতিষ্ঠিত সভ্যতার সম্মুখে অসভ্য জাতির

(৩৪) Ibid -No 16.

(৩৫) *Ibid—No 66.

(৩৬) A. S. B.—1910 (vol V).

প্রতিষ্ঠিত রাজ্য যে বহুকাল বর্তমান থাকিতে পারে না তাহা একটি ঐতিহাসিক সত্য । * কাজেই তোরামান প্রতিষ্ঠিত হুণরাজ্য অচিরেই লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল । নরসিংহগুপ্ত ও যশোধর্মের সমবেত চেষ্টায় বা বিভিন্ন সময়ে প্রত্যেকের পৃথক্ চেষ্টায় মিহিরকুল পরাভূত হইয়াছিলেন কি না ; এই বিষয়টি এবং এই বিষয়-সম্বন্ধীয় প্রাচীন লিপির অর্থ লইয়া পণ্ডিতগণ তর্কক্ষেত্র হইতে অজ্ঞ পর্যন্ত ও অবসর লইতে পারেন না । ইউয়ান্ চোয়াঙের ও পরমার্থের বর্ণিত বৃত্তান্ত হইতে এইরূপ একটি মীমাংসা হইতে পারে যে, ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রারম্ভে, মগধরাজ বালাদিত্য-নরসিংহ, সম্ভবতঃ মিহিরকুলের অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া, তাঁহার বিরুদ্ধে মগধরাজ হইয়া প্রথমতঃ তাহাকে অনেকটা পরাভূত করিয়া থাকিবেন ; এবং কিছুকাল পরে, মালবরাজ যশোধর্ম মিহিরকুলকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করিয়া হুণরাজকে “চুড়াপুষ্পোহার” দ্বারা নিজ পাদযুগলের অর্চনা করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন । মন্দোদরী প্রাপ্ত যশোধর্মদেবের রণতন্ত্রে উৎকর্ণ কবি বাহুল্যরচিত প্রশস্তিতে মালবরাজের বাস্তবলে স্বরাজ্য বিস্তারের নিরতিশয় প্রশংসা পরিদৃষ্ট হয় । এই প্রশস্তিতে (৩৭) উক্ত পরাক্রমের কথা ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া ধরিয়া লইতে কোন কোন মনীষী বিধা বোধ করিয়াছেন ; কিন্তু যিনি তোরামান-সাহের পুত্র মিহিরকুলকে পদমুগ্ধ-চূষনে বাধ্য করিতে পারিয়াছিলেন, তিনি যে গুপ্ত নরনাথগণ ও হুণাদিপগণ যে যে স্থান অধিকার করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, সেই সেই স্থানে অপ্রভুত প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবেন তাহাতে সর্বিশেষ সন্দেহ করিবার সম্ভাবনা নাই । এই প্রশস্তিতে আরও বর্ণিত আছে যে যশোধর্ম পূর্বদিকে লৌহিত্য [ব্রহ্মপুত্র] নদ দক্ষিণে মহেন্দ্রগিরি, পশ্চিমে পশ্চিম-সমুদ্র ও উত্তরে হিমাচল—এই চতুঃসীমার মধ্যস্থিত সমস্ত সামন্ত নরপালদিগকে নিজ পদতলে আনত করাইয়াছিলেন । ইহা সত্য হইলে, বাঙ্গালার সামন্ত নৃপতিগণকেও কিছুকালের জন্য তাঁহার প্রভু স্বীকার করিতে হইয়াছিল । মন্দোদরীর অপর প্রস্তর লিপিতেও (৩৮) উল্লিখিত আছে যে বিজুবর্দ্ধন নামক মালব রাজ প্রাচ্য [পূর্বদেশীয়] ও উদীচ্য [উত্তর দেশীয়] নরপতিগণকে সন্ধিসন্ধে ও যুদ্ধে বশীভূত করিয়াছিলেন । হরগলি সাহেব মহোদয় এই যশোধর্ম ও বিজুবর্দ্ধনকে একই ব্যক্তি বলিয়া মনে করিয়াছেন কেন—ইহা লইয়া বাদান্তবাদ প্রশমিত হয় নাই । আমরাও

* (২৭) Fleet's Gupta Inscriptions—No 33-34.

(২৮) Ibid—No 35.

তদালোচনায় প্রস্তুত না হইয়া প্রবন্ধ সংকৃত করিবার চেষ্টা করিতেছি। দ্বিতীয় কুমারভূষণের পর, গুপ্তবংশীয় একাদশ জন নরপতি, মোখরিগণসহ রাজ্যবিভাগ করিয়া লইয়া, ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষাংশ পর্য্যন্ত, এমন কি খ্রীষ্টাব্দের সাম্রাজ্য-সময়েও, রাজ্য পরিচালনা করিয়াছিলেন।

পূর্ববঙ্গের করিমপুর জেলায় ষষ্ঠ শতাব্দীর গুপ্তাকরেণ্ডিখিত চারিখানি তাম্রশাসন প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। (৩৯)। ধর্ম্মদিত্য নামক মহারাজাধিরাজ-পদ-লাভিত সম্রাটের রাজ্যের তৃতীয় সংবৎসরে, বাতভোগ নামক এক ব্যক্তি বিষয়-মহন্তর [মাতঙ্গর] ও গ্রাম-মহন্তরগণের নিকট হইতে “ক্ষেত্রকুলা-বাণজ্ঞ” পরিমিত ক্ষেত্রখণ্ড [অতিকুলা-বাণ চারি দীনার মূল্য হিসাবে] ক্রয় করিয়া ভরদ্বাজ সগোত্র বাজসনের বড়ান্নাধারী চন্দ্রস্বামি-নামক ব্রাহ্মণকে দান করিয়াছিলেন—ইহাই প্রথম তাম্রশাসনখানির উদ্দেশ্য। এই ধর্ম্মদিত্যের রাজ্য-কালে সম্পাদিত দ্বিতীয় তাম্রশাসন হইতে অবগত হওয়া গিয়াছে যে, বাতদেব স্বামি-নামক ব্যক্তি অতিকুলাবাণ ওই দীনার মূল্য হিসাবে, এক ক্ষেত্রখণ্ড একটি মহন্তরের নিকট হইতে ক্রয় করিয়া, লৌহিত্য সগোত্র বাজসনের ব্রাহ্মণ সোম-স্বামীকে প্রদান করিয়াছিলেন। তৃতীয় তাম্রশাসন মহারাজাধিরাজ গোপচন্দ্রের একোনবিংশতি রাজ্য সংবৎসরে সম্পাদিত বলিয় উল্লিখিত আছে। বৎস-পালস্বামি-নামক এক ব্যক্তি পূর্বাঞ্চলে প্রচলিত মূল্য হিসাবে কয়েকজন ভরদ্বাজ ব্রাহ্মণের নিকট হইতে ভূখণ্ড ক্রয় করিয়া ভট্টগোনিদন্ত-স্বামি-নামক ব্রাহ্মণকে প্রদান করিয়াছিলেন। চতুর্থ তাম্রশাসন হইতে জানা গিয়াছে যে স্বপ্রতীক-স্বামি-নামক কোনও ব্রাহ্মণ মহারাজাধিরাজ সম্রাটের দেবের রাজ্যের চতুর্দশ সংবৎসরে ব্রাহ্মণের বিহিত বলি-চক-সত্ৰাদি প্রবর্তনের জন্য ক্ষেত্রকুলাবাণজ্ঞ-পরিমিত ভূমি বিষয়-মহন্তর ও প্রধান প্রধান ব্যবহারীর [ব্যবসায়ীর] নিকট হইতে স্ববাসের জন্য বাচুণ্য করিয়া লইয়াছিলেন। ষষ্ঠ শতাব্দীর বাঙ্গালার “মণ্ডল” ও “বিষয়” কিরূপে শাসিত হইত, কত প্রকার উচ্চ ও নীচ শ্রেণীর রাজকর্ম্মচারী শাসনকার্য্যে নিযুক্ত থাকিত, ব্যক্তিগত, পরিবার গত ও সমগ্র-গ্রামবাসিগত ভূমিস্বত্ব কিরূপে নির্ধারিত হইত, কি রীতিতে কোন ভূখণ্ড হস্তান্তরিত বা বিক্রীত হইতে পারিত, কি ভাবে ভূমির মূল্য নির্ধারিত হইত, কিরূপে ভূমির পরিমাণ নির্দিষ্ট হইত এবং চতুর্থ তাম্রশাসনে উল্লিখিত শুচি-

(৩৯) Vide Indian Antiquary, 1910 and I. A. B. R, 1910 (vol VI) and 1911 (vol vii).

পালিত, বিহিত-ঘোষ প্রিয়-মন্ত জনার্দন-কুণ্ড প্রভৃতি নামের প্রয়োগ হইতে সেকালে জাতিবাচক উপাধির ব্যবহার প্রচলিত ছিল কিনা—ইত্যাদি নানা-বিষয়ক কথা এই তাম্রশাসন চতুষ্ঠয়ের দ্বারা হইতে বারাজ্ঞের পর্যালোচিত হইতে পারিবে। এই সকল তাম্রশাসনে উল্লিখিত মহারাজ্যের কোন সময়ে, কি অবস্থায়, বঙ্গদেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাহাও একটি তর্কসম্মুল বিষয়। তবে অক্ষর হিসাবে তাঁহাদিগের কাল অক্ষাটীন ওপ্তরাজ্যগণের সময়েই নির্দিষ্ট করিতে হইবে বলিয়া মনে হয়।

মগধের অক্ষাটীন ওপ্তরাজ্যগণের মধ্যে সম্রাট শ্রীহর্ষের সমসাময়িক রাজা মাদবগুপ্তের পিতা মহাসেনগুপ্ত, শ্রীহর্ষেরই সমসাময়িক কামরূপাধিপতি ভাস্কর-কর্তার পিতা স্থনিতবন্দ্যাকে সময়ে পরাজিত করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহারই পৌত্র মগধরাজ আদিত্যসেনের আপসত লিপিতে (৫০) উল্লিখিত পাওয়া যায়। উত্তরা-পথের সম্রাট হর্ষবর্দ্ধনের পরলোকগমনের পর এই আদিত্য-সেনই আর্ঘ্যাবর্তের সম্রাট-পদ আকাজ্জল করিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞ পর্য্যন্ত সম্পাদন করিয়াছিলেন। আদিত্যসেনের পর, তদীয় পুত্র দেবগুপ্ত ও তদনন্তর তৎপুত্র বিষ্ণুগুপ্ত এবং সর্বশেষে তৎপুত্র দ্বিতীয়-জীবিতগুপ্ত নামক নরপতি মগধের সিংহাসনে আরুঢ় ছিলেন—এই ঐতিহাসিক বিবরণ দ্বিতীয়-জীবিতগুপ্তের দেববরুণার্ক প্রশস্তি (৪১) হইতে অবগত হওয়া যায়।

শ্রীহর্ষের দেবভলাজের পর মগধের অক্ষাটীন ওপ্তবংশীয় নরপতিগণের সময়ে, বাঙ্গালার পূর্বাঞ্চলের লোকনাথ নামক এক সামন্ত নরপালের [ত্রিপুরায় প্রাপ্ত] তাম্রশাসন হইতে, বঙ্গদেশের ঘেরূপ অবস্থা পরিজ্ঞাত হওয়া যাইতে পারে, আমরা “সাহিত্য” পত্রের বর্তমানসালের [১৩২১] জ্যৈষ্ঠ ও কা্তিক সংখ্যায় তাহার সবিস্তার আলোচনা করিয়াছি। শ্রীহর্ষের পরলোক গমনের সঙ্গে সঙ্গেই অক্ষাটীন ওপ্তবংশীয়গণের মগধরাজ্যেরও তিরোধানের সূত্রপাত হয়। এই সঙ্গেই বঙ্গেও পুনরায় মাৎস্ত-ছায়া-যুগ উপস্থিত হয়, বহুধা অনাথা হইয়া পড়ে এবং এই বিলম্ব-যুগের অন্ধকার ভেদ করিয়াই—

“সেকালে এদেশে জনম লভিয়া পাল-কুলরবি গোপাল বীর,

অনাথ বহুধা সনাথ করিয়া নমিত করিল সকল শির।”

তখন হইতেই প্রাচ্য ভারতে গোড়ীয় পাল-সাম্রাজ্যের অভ্যুত্থান হয়।

সময়াভাবে, ওপ্তযুগে বাঙ্গালার ধর্ম, সমাজ, বাণিজ্য, কথিত ভাষা ও সংস্কৃত রচনায় গোড়ীয় রীতি ও অস্ত্রান্ত্র কমলীয়-কলা-কলাপ সম্বন্ধে কোন কথাই আলোচিত হইতে পারিল না। আপনাদের আশীর্বাদ পাইলে, তাহা পরে আলোচিত হইতে পারিবে। ইত্যলমতি প্রসঙ্গেন।

শ্রীরাধাগোবিন্দ বসাক ।

(৫০) Fleet & Gupta Inscription—No 42.

(৫১) Ibid—No 46.

ব্যাপ্তি

শৈল শিখরের শুভ্র তুষারে,

কুল কুহুম মাখে,

দিগন্তর, তব গৌর অঙ্গের

দিব্য মাধুরী রাজে !

যে নীল স্নহমা নতো নিলীমায়,

মহাসাগরের বুকে,

তেমনি স্ননীল অঁচলে রাধার,

তহু যেরিয়াছে স্নথে !

স্নহুমার শ্রাম নব তর্কামল

বসুধার কলেবরে,

শ্রাম অঙ্গের ললিত চরিত

নিখিলের মন হরে' !

অসিত বরণ নবীন নীরদ

স্নগভীর জল ধারা,

নীরদ বরণী শিবের উরসে

ত্রিতাপ হারিণী তারা !

অরুণ বঁসন ব্রহ্মা প্রজাপতি,

তরুণ উষার রবি,

অরুণ অম্বর নব বিবাহিতা

নবীনা বধূর ছবি !

ভুবন গগন জলদ সাগর

দেবতা মানব আর,

প্রেমে স্নহমায় হেহে করুণায়

মিলে মিলে একাকার !

ঐশ্বর্যদা দেবী

বঞ্চিতা ।

সে বৎসর অতিরিক্ত বর্ষা পড়িয়াছিল, ভাদ্রমাস বাপিগ্রা অনবরত বৃষ্টি হইয়াছে, কিন্তু আখিন মাস হইতেই আকাশের মেঘ ও বাতাসের গুমট কাটিয়া গিয়াছে । প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে স্থলীতল বায়ুর স্বথময় স্পর্শ ও তরল সোণালী রৌদ্রের শোভা মন আনন্দে অধীর করিয়া তুলে এবং স্বচ্ছ নীল প্রশান্ত আকাশের দিকে চাহিলে একটা অবাক গভীর ভাব জন্মের অন্ততল পর্যাস্ত প্রবেশ করে ।

এখনও পূজার দিন দশ বার বাকি আছে, কিন্তু ইহারই মধ্যে শক্তি-পুরের জায় কুহ মফস্বল সহরেও চারিদিকে আয়োজনের ব্যস্ততা দেখা দিয়াছে । বাবসারী পসারীদের নিখাস কেলিবার অবকাশ নাই, শলবাস্তে নৃতন আমদানী মালে দোকান সাজাইতেছে ; এদিকে প্রতাহ খরিদারের সংখ্যা বাড়িয়া উঠিতেছে, বাজারে ইহারই মধ্যে চতুষ্পার্শ্বের গ্রাম্য লোকদিগের সমাগম আরম্ভ হইয়াছে । সহরে যে দুই চারিজন ভদ্রলোকের বাড়িতে পূজা হইবে তাহাদের তো কথাই নাই, কর্তাগৃহিনী হইতে আরম্ভ করিয়া সাত বৎসরের গৃহিণী পর্যাস্ত প্রভাব হইতে রাত্রি পর্যাস্ত ফরমাস খাটাইতে বা খাটিতে বাস্তব । আমাদের সাব্‌ডিভিশনাল কাছারিগুলিতে রাত্রি পর্যাস্ত বাতি জ্বালাইয়া কার্য আরম্ভ হইয়াছে, কারণ, যে ছুটির পূর্বে হাতনাগাদ কার্য তুলিয়া দিওঁ না পারিবে তাহার ছুটি পাওয়া হকর হইবে ; আমলারা নিজ নিজ দেশে যাইবার জন্ত প্রস্তুত হইতেছে, হাকিমশ্রেণির যে দুই চারিজন এখানে আছেন তাঁহারা পরস্পরের সতিত সাক্ষাৎ হইলে “কি হে এবার ছুটিতে কোথা যাক্” “কবে গাওয়া ঠিক করলেন”, “সাহেবের স্বকুম এল” ইত্যাদি প্রশ্ন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন ।

এখানে আমি ও পরেশ এই দুইজন সাব্‌ডেপুটি । ছুটিতে এক সময়ে আমাদের দুইজনের কর্মস্থল হইতে অল্পপরিমিত কর্তৃপক্ষের অভিপ্রেত নহে । পরেশ এবার পূজার ছুটিতে বাট যাইবার অল্পমতি প্রার্থনা করিয়াছে সুতরাং আমাকে থাকিতে হইবে ; কিন্তু চারিদিকে ব্যস্ততা ও উৎসবের আয়োজন দেখিয়া বাট যাইবার জন্ত আমার মনটা বড়ই উতলা হইয়া উঠিয়াছে ; স্থির করিয়াছি আমাদের সাব্‌ ডিভিশনাল অফিসার বিজয় বাবুকে অল্পরোধ করিয়া যাহাতে পরেশ আটদিন ছুটি পায় এবং আমি বাকি চারদিন পাই,

তাহার চেষ্টা করিব। এই উদ্দেশ্যে একদিন রবিবার প্রাতে বিজয় বাবু, বাসায় উপস্থিত হইলাম।

বিজয় বাবু তাঁহার বৈঠকখানায় বারান্দায় একখানা চেয়ারে বসিয়া ক্ষৌরি চইতেছিলেন; আমাকে ভিতরে ঘাইয়া বসিতে বলিলেন। বিজয় বাবু লোকটি বড় ভাল, তাঁহার বেঁটে নাচশ গুহুশ কাল চেহারা, তাঁহারি ভারি মুখ ও ছোট চোপ দেখিলে তাঁহাকে নিরীহ ও দুর্বলবৃত্তি বোধ হয়; কিন্তু তিনি বর্ণচোরা অন্ন, প্রকৃত পক্ষে বিলক্ষণ তীক্ষ্ণবুদ্ধি, সরকারি কার্যে বিচক্ষণ, আইন কাহুন ও নজির তাহার নখাগ্রে, ঘীবে ঘীবে কথা বলেন, কিন্তু তাহাতে মধো মধো রসিকতার বিভাৎ খেলিয়া যায়, এজলাসে বসিয়া গম্ভীর মুখে এমন একটি কথা বলেন যে, তাহাতে হাসির রোল উঠিত হয়, গল্প বলিয়া লোকের মনোরঞ্জন করিবার তাহার বিশেষ ক্ষমতা আছে। আমরা তাঁহার কাছে কোঁঠ ভাতার জায় ব্রেড ও বকুল জায় বাবড়ার পাই, তিনি যে আমাদের উপরওয়ালা ভাতা তিনি জানিতেই দেন না।

ক্ষৌরিকার্য্য সমাধা চইয়া গেলে বিজয় বাবু বৈঠকখানায় আসিয়া বসিলেন, চাকরে গুড়গুড়ির উপর কলিকা বসাইয়া দিয়া গেলে, তিনি গুড়গুড়ি টানিতে টানিতে বলিলেন “আজকাল সকাল বেলাটা কেমন পুছো পুছো মনে হয়, দেখেছ?”

আমার বক্তব্য উত্থাপন করিবার সুবিধা পাইয়া বলিলাম “হাঁ, আর পুছো তো এসে পড়ল।”

“ভাল কথা, ছুটির ভিতর কোন্ কোন্ দিন হৈজরি পোলা থাকবে বল তো, আমি ভুলে গেছি। আমি সেই বুকে—”

এমন সময় পুলিশ ইন্স্পেক্টর হুসেইন সিংহের সহিত উচ্চৈঃস্বরে কথা বলিতে বলিতে পরেশ আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়াই আমার ছুটির কথা বলিবার আশা অন্তহিত হইয়া গেল, কারণ তাহার সাক্ষাতে সে প্রস্তাব উত্থাপন করিলে সে তো উড়াইয়া দিবেই, উপরন্তু আমাকে কটু কাটবা শুনাইয়া দিবে।

পরেশ ঘরে প্রবেশ করিয়াই কলরব করিয়া বলিল “দেখুন মশাই, পুলিশের ফুলাম দেখুন, আপনি আমাদের উপরওয়ালা, আপনার কাছে আপীল করছি।”

বিজয় বাবু। “বস বস, এস মিষ্টার লাগান্ বস। ব্যাপার কি?”

পরেশ। দেখুন *দেপি মশাই, সিগি বলে কি না আজই কলমপুরের

দ্বারপিঠের মামলার তদন্ত করতে যেতে হবে। এখনও রাত্তায় এক হাঁটু কাদা, আমি সেই কাদা ভেঙ্গে দশ ফোশ গিয়ে পকাশজন মিথ্যাবাদীর সঙ্গে বকাবকি করে রবিবারটা মাটি করব ?

বিজয় বাবু হাসিতে হাসিতে প্রব্রহ্মচক দৃষ্টিতে হরেন্দ্র সিংহের দিকে চাহিলেন। স্ত্রে চসমা মুছিতে মুছিতে বলিল “কয় দিন হতে কেস্টা পড়ে আছে, হুই পক্ষই পরস্পরের সাক্ষী ভাঙ্গাবার চেষ্টা করছে, সে জ্ঞাত্তি তনিকে বলেছি যে আজ রবিবারটা আছে, হাস্যম নিস্পত্তি করে আসুন। এইতে তিনি পুলিশ আর ডিট্রিক্ট বোর্ডকে সমভাবে গালাগলি করছেন আর ফাল পাড়ছেন।” ইন্সপেক্টার ফরিদপুর জেলার লোক, ভাষায় ও কথার টানে এখনও তার কিছু কিছু চিহ্ন আছে।

বিজয় বাবু। বাস্তবিক, কেস্টা আর ফেলে রেখ না পরেশ! জান ত কি রকম জেনের মামলা, শেষকালে সাহেবের কাছে হরত দেরি হচ্ছে বলে নালিশ করবে; তখন মুছিল হবে।

পরেশ হতালের ভান করিয়া বলিয়া উঠিল “ভাল ভাল করে গেলুম কেলোর মার কাছে—”

আমরা হাসিয়া উঠিলাম। এমন সময় বিজয় বাবুর আরদালি পোষ্ট-আফিস হইতে তাঁহার ডাক আনিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া গেল। বিজয় বাবু একবার চিঠিগুলোর উপরটা দেখিয়া লইয়া আবার রাখিয়া দিলেন। তাহার মধ্যে একপানা পুস্তক দেখিয়া পরেশ জিজ্ঞাসা করিল “ওখানা কি ক্যাটালগ নাকি?” বিজয় বাবু বলিলেন “না, ওখানা মানসী।” “মানসী? একবার দেখতে পারি কি?”

উপরের মোড়ক ছিঁড়িয়া ফেলিয়া মাসিকপত্রখানির পাতা উন্টাইতে উন্টাইতে পরেশ বলিল “এবার প্রভাত মুখ্যোর একটা গল্প আছে দেখছি।”

বিজয় বাবু। রত্নদীপ ছাড়া আর একটা গল্প?

পরেশ। হ্যা, “লেডি ডাক্তার” নামে একটা আন্ত গল্প।

বিজয় বাবু আগ্রহের সহিত বলিলেন “বটে, তা পড় না হে, শোনো যাক।”

আমরা নিজ নিজ সুবিধা মত বসিলে পরেশ ‘লেডি ডাক্তার’ গল্পটি পড়িতে আরম্ভ করিল।

গমটি শেষ হইয়া গেলে সকলে কিছুক্ষণ নিরুৎসাহ হইয়া রহিলাম, পরেশ তাহার স্বভাবসিদ্ধি কি একটা রসিকতা করিল; কিন্তু তাহাতে কেহ মনোযোগ করিল না। দেখি বিজয় বাবু অগ্রমনক ভাবে একদিকে তাকাইয়া আছেন, তাহার মুখে হাসির রেখা, গুড়গুড়ির নল মুখে তুলিতে অর্ধপথে থামিয়া গিয়াছে। কণেক পরে তিনি নলটি মুখে লইয়া টানিতে টানিতে আমাদের দিকে ফিরিয়া বলিলেন “দেখ, আমি যখন চাটগায়ে ছিলুম তখন একজন লেডি ডাক্তার নিয়ে এক কাণ্ড হয়েছিল। সেও একটা বলবার মত ব্যাপার।”

পরেশ বলিল “হুম, আজ লেডি ডাক্তারের জয় অয়কার দেখছি, আপনি বলুন, আমরা অবহিত চিত্তে শ্রবণ করি। আজ আর শরী তদন্তে যাচ্ছেন না, আপনি যাই বলুন।”

অরেন্দ্র সিংহ হঠাৎ গাড়াইয়া উঠিয়াছিল “আমি তা হলে এখন যাই, অনেক কাজ আছে। বেলা ১০টা বাজে।” তাহার স্বভাবই এই; বেশ নিশ্চিন্ত চিত্তে পাচছনের সঙ্গে গল্প করিতেছে, এমন সময় যদি কেহ এমন কোন কথা উপাধন করে বাহা বলিয়া শেষ করিতে দিশ পনের মিনিট সময় লাগিতে পারে, তাহা হইলেই তাহার যত কার্যের কথা মনে পড়িয়া যায়।

বিজয় বাবু বলিলেন “বস না চে, এত কি কাজ? না হয় তোমার ডায়ারিতে লিখো আজ সকালটা আমার এখানে কাটিয়ে গেছ।”

পরেশ গম্ভীরমুখে বলিল “ওকে ছেড়ে দিন মশাই। একজন আসামীর সঙ্গে ওর বন্দোবস্ত হয়েছে আজ সাত্বে দশটার সময় সে ওর ছেলের পাণ খাবার জন্তে কিছু দিয়ে যাবে। সময়ে না গেলে ফেরে যেতে পারে।”

ইন্সপেক্টর অগ্রসর মুখে আবার বসিয়া পড়িল। পরেশ হাসিয়া বলিল “আপনি তাড়াতাড়ি আরম্ভ করুন বিজয় বাবু, লেডি ডাক্তারের কাহিনী শুনে পুণা অর্জন করবার জন্তে মন বড় ব্যাকুল হয়ে উঠেছে।”

গুড়গুড়িতে দীর্ঘ টান দিয়া বিজয় বাবু বলিলেন “শোন তবে।”

(২)

আমি চাটগায়ের দিনহাটা সাব ডিভিশনের চার্জে ছিলাম জান ত? দিনহাটার একটি কুবে জেনানা হাসপাতাল আছে। হাসপাতালটিতে একজন মাত্র লেডি ডাক্তার আছে—তাহাড়া অবস্থা ভাল দাই টাই আছে।

সেখানকার এসিষ্টেন্ট সার্জন হাসপাতালের সুপারিন্টেন্ডেন্ট, প্রায়ই হাসপাতালে গিয়ে দেখে শুনে আসে, আর সাব-ডিভিশনাল অফিসার হলেন হাসপাতাল কমিটির প্রেসিডেন্ট অর্থাৎ জেনানা হাসপাতালের বড় কর্তা ।

আমি যখন দিনহাটায় যাই, তখন মাস চারেক আগে একজন নতুন লেডি ডাক্তার এসেছে, তার নাম মিস্ কুদীবালা বিশ্বাস, জাতি খ্রিষ্টান, বাড়ি কলকাতার দক্ষিণে কোন্ গ্রামে । খোঁজ নিয়ে জানলুম ইনি ক্যাথলিক পাস ; আগে অল্প চর্চার জায়গায় কাজ করেছেন, দিনহাটায় ইতিমধ্যেই কাছে বেশ সুনাম কিনেছেন ।

দিনকতক পর থেকেই কিছু লেডি ডাক্তারের সম্মুখে একটা কাণামুণা শুনেতে লাগলুম । আমি প্রথমে কথাটায় বড় কাণ দিই নি, কারণ ব্রাহ্মিকা কি বাঙ্গালী, খ্রিষ্টান খ্রীলোকের নামে মিথ্যা-কলঙ্ক রটান রোগ যে আমাদের ভিতর কি রকম প্রবল, তা আমি বিলক্ষণ জানতুম । কিন্তু যখন পাঁচ সাত জনের কাছে ঐ ভাবের কথা শুনলুম, তখন হাসপাতাল কমিটির প্রেসিডেন্ট হয়ে আর কি করে চুপ করে থাকি ? ব্যাপারটা কি জানবার জন্তে একটু খোঁজ নিতে হল । তার ফলে এইটুকু জানতে পারলুম যে, মিস বিশ্বাস পুরুষদের সঙ্গে মেলামেশা করেন, এমন কি কেউ কেউ তাঁর বাসায় যাতায়াত করে, কিন্তু কি ভাবে আর কার সঙ্গে মেলামেশা করেন সেটা কেউ বলতে পারলে না । মোটের উপর সত্য সত্য কোন দৃশ্য ঘটনা কি অজ্ঞার আচরণের কথা শুনেতে পেলুম না ।

একদিন এসিষ্টেন্ট সার্জন প্রমথ বসুর সঙ্গে দেখা হলে জিজ্ঞাসা করলুম “ঈ্যা প্রমথবাবু, আপনাদের লেডি ডাক্তারের নামে এসব কি শুনেছি ?”

ডাক্তার বসু “আপনিও যেমন, কতকগুলো লোক আছে অসভ্য খ্রীলোকের নামে বদনাম দিতে ভারি মজবুৎ । আমি মিস্ বিশ্বাসের সঙ্গে চার পাঁচ মাস কায করছি, তাঁর বাসাতেও মাঝে মাঝে যাই, আমি বলতে পারি তিনি খুব ভাল লোক ।”

প্রমথ বসু লেডি ডাক্তারের বাসায় যাতায়াত করেন শুনে আমি আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম, কারণ তিনি বেঙ্গাল গোর্ডা হিন্দু, আর খ্রী-শিক্ষা আর খ্রী-স্বাধীনতার নাম স্তনলে তেলে বেঙনে অলে উঠেন, সে কথা-লোকের মুখেও শুনেছি । আর একদিনের ঘটনায় নিজেও দেখেছি । আমি বলে উঠলুম “আপনি যে বড় ‘স্বাধীন-জেনানা’র সঙ্গে মেশেন ? এই না সে দিন আপনি খ্রীস্বাধীনতার কল বিষয় হয় বলে বেচারাম বাবুর সঙ্গে তর্ক করছিলেন ?”

ডাক্তার প্রথমটা পতমত পেয়ে গেলেন, তার পর বলেন, “আমার মত যা তাই আছে, কিন্তু সেটা একেত্রে পাটে না। মিস্ বিশ্বাসের সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করে তাঁকে আর এমন পর বলে মনে হয় না।” আমি তাঁকে দিদি বলে ডাকি। তা ছাড়া তিনি এক বৃদ্ধি পিসির সঙ্গে এখানে থাকেন; বিশেষতঃ মিস্ বিশ্বাস বড়ই সরলা, দুই একজন এর মধ্যে তার advantage নেবার চেষ্টা করেছে। আমি না থাকলে তাঁকে বেগু পেতে হত।”

শেষ কথা কয়টি ডাক্তার বেশ গুরুত্ব দিয়ে বলে। তার কৈফিয়ৎ আর রকম সৰু আমার মোটেই ভাল লাগল না। আমি মনে মনে ঠিক করলুম দুই এক দিনের মধ্যে জেনানা হাসপাতাল দেখতে গিয়ে সুবিধামত মিস্ বিশ্বাসকে একটু সাবধান করে দিয়ে আসব।

এই ভেবে একদিন হাসপাতাল দেখতে উপস্থিত হলুম। মিস্ বিশ্বাসের বিষয়ে শুজব শুনে তার চেহারা সপক্ষে আমার মনে একটা ধারণা হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তাকে চোখে দেখে বড়ই নিরাশ হয়ে গেলুম। দেখলুম তার বয়স আন্দাজ ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বছর হবে, শরীর দোহারা বলা যেতে পারে, রং ময়লা, মুখেরও কোন চটক নাই, বিশেষতঃ মধ্যে গরুর মত বড় বড় ভাবহীন চোখ। দেখা ফ্রিটান জীলোকেরা যেমন সাড়ির সঙ্গে জুতো মোজা জ্যাকেট পরে, সেই রকমের গোষাক, তবে তাতে কোন রকম বাহারের চেষ্টা নেই, নিতান্ত সাদাসিধে ধরণের সাজসজ্জা।

পরেশ বলিয়া উঠিল “আরে রামঃ, আর আমার শোনবার ইচ্ছে নেই, আপনি তাড়াতাড়ি গল্প শেষ করুন।”

বিজয়বাবু বলিতে লাগিলেন “তাকে দেখে প্রথমটা আমার মনটাও কেমন দমে গিয়েছিল, কিন্তু তার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলার পর আর সে ভাবটা রইল না। তখন আর মানুষটাকে নিতান্ত খারাপ লাগল না, তার চোখ মুখে একটা শান্ত মাধুর্যের ভাব দেখতে পেলুম, বোধ হল তার প্রকৃতিটি বেশ নরম, আর মনে মারামমতা বেশী।”

পরেশ বলিল “আমরা মনে করি আপনি Tenancy Rightsএর হিন্দী আর Sericulturএর তত্ত্ব নিয়েই থাকেন, আপনি যে আবার physiognomyর চর্চা করে থাকেন, তা ত জানি না।”

বিজয়বাবু বলিলেন “কেন, এ আর আশ্চর্য্য কি। কোন কোন লোকের সঙ্গে ছ দণ্ড কথা বললে মনে হয় না যে এ লোকটি বড় ভাল মানুষ, কি এ

ভারি ফিচেল, কি 'মাহুঘটার' নিশ্চয় নিষ্ঠুর স্বভাব । মিস্ বিশ্বাসের সঙ্গে খানিক কথাবার্তা বলে আমার সেই রকম একটা ধারণা হ'ল । হাসপাতাল দেখা হয়ে গেলে বলুম 'চলুন না আপনার খাস কামরায় বসে একটু গল্প শুন কনা থাক ।' তারপর সেই ঘরে গিয়ে নিরিবিগি পেয়ে ছ চারটা বাজে কথার পর সাবধানে খুসিয়ে ফিরিয়ে আমার বক্তব্যটি বলে ফেলুম ।

আমার কথা শুনে কিছুক্ষণ অধোবদনে থেকে আস্তে আস্তে সে বলে "মিষ্টার গাম্বুলি, আপনি আমাকে যে উপদেশ দিলেন, তার জগে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি । বুঝতে পারছি আমার ভালর তত্ত্বেই বলছেন, কিন্তু আমি সত্যি সত্যি বলছি যে, আমার সাবধান হবার কিছু নেই । অপরাধের মধ্যে অন্যার পরিচিত ভদ্রলোকেরা মাঝে মাঝে আমার বাসায় গিয়ে অহুগ্রহ করে দেখাওনা করেন । আপনিই বুঝে দেখুন, আমাদের সমাজের ভ্রীলোকেরা পর্দানশীন নয় ; তার পর আমি যে কাজ করি, তাতে পর্দানশীন হলে চলেও না । তা ছাড়া আমি একলা থাকি না, আমার পিসিমা সঙ্গে আছেন । এ অবস্থায় আমার বন্ধুরা আমার ওখানে গেলে কি দোষ হয় বুঝতে পারি না । ভদ্রলোক বাড়ীতে গেলে ত তাঁদের অপমান করে তাড়িয়ে দিতে পারি না ।"

আমি একটু বিরক্ত হয়ে বলুম, "অপমান করে তাড়িয়ে দিতে হবে কেন ? এখানকার কোন লোক আপনার আত্মীয় ফি আগেকার পরিচিত নয় ত, আপনি এখানে আসবার পর তাঁদের সঙ্গে আলাপ হয়েছে । তারা শুধু শুধু আপনার বাসায় যাতায়াত করে কেন, তার অবশ্যই কারণ আছে । তারা আর কারুর বাড়িতে এত খন খন যাতায়াত করে কি ?"

কথাটা বড় রুচ হয়েছিল—হাকিমি মেজাজ কি না, তাঁবেদারের মুখে প্রতিবাদ শুনেই অলে উঠেছিল । আমার কথা শুনে মিস্ বিশ্বাস উত্তেজিত হয়ে বলে "আপনি পাকে প্রকারে বলছেন যে, আমি তাঁদের আসতে বলি, কিংবা গায়ে পড়ে তাঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করি, তাই তাঁরা আসেন ! আপনি ভুল বুঝেছেন মিঃ গাম্বুলি ! আমি আকারা দেওয়া দূরে থাক, অনেক সময় তাঁদের আনাগোনার বিরক্ত হয়ে পড়ি ।"

আমি বলে উঠলুম "এই না আপনি বলছিলেন তাঁরা অহুগ্রহ করে দেখাওনা করতে আসেন, আবার এখন বলছেন তাঁদের আনাগোনা আপনার বিরক্ত হন !"

তার কথায় অবিস্বাস করছি দেখে এবার মিস্ বিশ্বাসের সত্য সত্য ধৈর্য্য-চ্যুতি হল, বেশ গরম হয়ে বলে "যাঁরা বলেন যে তাঁরা আমাদের খোজ খবর

নিতেই আসেন, তাঁদের কি বলা যায় 'আপনারা আর আসবেন না, আপনাদের আনাগোনার আমরা বিরত হয়ে উঠেছি?' আমি কখনও কল্কর মুখের উপর কিছু বলতে পারি না, বিশেষতঃ গধন কেউ ভাল উদ্দেশ্যের দোহাই দিয়ে একটা অজায় করে ফেলেন, তখন ত আরও চূপ করে যাই। এই দেখুন না, আপনি ঘণ্টাখানেকের পরিচয়ে আমার সঙ্গে যেভাবে কথা বলছেন, তাতে আমার আপত্তি করা উচিত, কিন্তু আপনার উদ্দেশ্য ভাল জেনে কি করে আপত্তি করি? আপনি আমার বিরত হওয়ার কথাটা বিশ্বাস করছেন না, কিন্তু সব কথা শুনে বিশ্বাস না করে থাকতে পারবেন না। কোন কোন ভদ্রলোক আছেন, দিন নেই তপসু নেই আমার বাসায় উপস্থিত চন, কেউ কেউ আবার দিন ছুবেলা তিনবেলা আসেন, একবার এলে সহজে যেতে চান না। বেশি কি বলব, দু একজন ভদ্রলোক আমার কাছে বিয়ের প্রস্তাব পর্যন্ত করেছেন।" এই কথা বলতে বলতে মিস্ বিশ্বাসের চোখ দিয়ে টপ্ টপ্ করে জল পড়তে লাগল।

আমি ত অপ্ৰস্তুতের একশেষ। শশবাস্তে কমা চেয়ে তাকে সাধনা করতে প্রবৃত্ত হলাম। আমি মনে করলাম আমার কথাতোই বৃষ্টি অপমান বোধ করে কেঁদে ফেলেছে, কিন্তু পরে বুঝতে পেরেছিলাম তা ছাড়া আরও একটা বড় কারণ ছিল। যাই হ'ক, মিস্ বিশ্বাস তখনই চোখ বুজে আমার কাছে মাপ চেয়ে অহুতপ্ত স্বরে বললে "ছি ছি, রাগের মাথায় এসব কি কথা বলে ফেলুম? আপনি দয়া করে এ কথা গুলি ভুলে যেতে চেষ্টা করবেন মিঃ গান্ধীলু" দেখলাম সে সত্য সত্যই ভারি লজ্জিত হয়েছে।

আনার অপ্ৰস্তুতের ভাবটা কেটে গেলে মনে মিতা তোলাপাড়া আরম্ভ হল। লোকের এর কাছে আসবার ভয়ে এত লালসারিত হবার কারণ কি? এর না আছে রূপ, না আছে বয়স, গুণও যে তেমন বিশেষ কিছু আছে তা বোধ হল না। তবে কি দেখে লোকে এমন মোহিত হতে যাবে যে, একে দিনের মধ্যে দু-তিনবার না দেখে থাকতে পারে না, আর একে বিয়ে করার ভয়ে ঘেপে উঠবে? আমি ভেবে কিছুই ঠিক করতে না পেরে হির করলাম যে মিস্ বিশ্বাস হয় দারুণ মিথ্যাবাদী নয় তার পাগলামীর ছিট আছে।

তখন নতুন পথ ধরলাম। গভীর সহানুভূতি দেখিয়ে বললাম "তাই ত, বিনা অপরাধে আপনাকে আচ্ছা নিগ্রহ ভোগ করতে হচ্ছে ত? কে কে আপনাকে এ রকম করে বিরক্ত করে বলুন ত, আমি তাদের দেখে নিচ্ছি।"

মিস্ বিশ্বাসের মুখ শুকিয়ে গেল, সে কাতর স্বরে বলে উঠল “না না মিষ্টার গান্ধুলি, সে কিছুতেই হতে পারে না । দোহাই আপনার, এ কথা নিয়ে গোলযোগ করবেন না । আমি কারুর নাম বলতে পারব না, আমার মাপ করুন ।”

তার রকম দেখে আমার সন্দেহ হল, তার নির্দোষীতার কথা সর্ব্বৈব মিথ্যা, আসল কথাটা জানবার জন্তে আরও জেদ বেড়ে গেল । আমি বলুম “দেখুন মিস্ বিশ্বাস, আপনার নামে পাঁচজনে পাঁচ কথা বলছে, তার উপর আপনি নিজে আলাতন হয়ে উঠেছেন, “এর” একটা বিহিত করতেই হবে । আর যখন এখানে আপনার কেউ অভিভাবক নেই, তখন আমাকেই এ কাজের ভার নিতে হবে ।

আপনি যাতে লক্ষ্য কি কষ্ট পান তেমন তাবে আমি কাজ করব না ; আর আপনার মত না নিয়ে কাউকে কিছু বলব না, তা আমি প্রতিজ্ঞা করছি । কিন্তু কি ভাবে চলতে হবে তা ঠিক করতে হলে কি ধরনের লোক আপনাকে আলাতন করে সেটা জানতে হবে তো ? আপনি অন্ততঃ একজনের নাম বলুন না—কোন ভয় নেই, আমার দ্বারা তার কোন অনিষ্ট হবে না ।”

একটু ইতস্ততঃ করে, তর্জনী দিয়ে টেবিলের একটা জায়গা ঘসতে ঘসতে মিস্ বিশ্বাস আস্তে আস্তে বলে “এই আপনারদের ডাক্তার বাবু একজন ।”

আমি তো অবাক । মিস্ বিশ্বাসের সম্বন্ধে প্রথমথাবুর সন্দেহজনক কথা-বার্তা মনে পড়ায় ভাবলুম মিস্ বিশ্বাসের কথাটা তো তা হলে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না । যুতই ভাবি ততই আশ্চর্য্য বোধ হয় । প্রথমথাবুর মত লোক কিসের ভুলত্রুটি এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করবে । এরহস্ত ভেদ করবার জন্তে আমার ভাবি ঝোঁক হল । সোজা ভাবে যখন হল না, তখন কৌশলে ভিতরকার কথাটা জেনে নেব ঠিক করে মিস্ বিশ্বাসের কাছে বিদায় নিয়ে চলে এলুম, বলে এলুম আমি এর পরে যা হয় একটা উপায় স্থির করব ।

ভেবে চিন্তে এই মংলব করলুম যে, কোন বিশ্বাসী লোককে মিস্ বিশ্বাসের সঙ্গে ছুচারদিন ঘনিষ্ঠভাবে মিশতে বলে দেব, তার পর কৌশলে তার কাছ থেকে এ ব্যাপারের আসল হাল জেনে নেব । একবার মনে হয়েছিল নিজেই মিস্ বিশ্বাসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করে ব্যাপারখানা বুঝে নি; কিন্তু আমার সে সময়ও নেই, আর কাজটা আমার পদমর্য্যাদার উপযুক্ত হবে না বুঝে সে মংলব তখনই ত্যাগ করলুম ।

আমার আফিসে ইবন্ আহম্মদ বলে একজন আধাবয়সী মুসলমান ছিল । সে আফিসের কাজে যেমন অকর্ম্মণ্য ছিল, আরেসের সুখটুকু তার বোশ আনা

ছিল। যতক্ষণ আফিসে পাকত ততক্ষণ গল্প গল্প করত, সেরিভ্যানার খাটিয়ে জাম নিলে, এই থরমে কি কাজ করা যায়, চেয়ারে ডয়ানক ছারপোকা, টিফিনের পরে পাখার দরকার ইত্যাদি। লোকটা কিন্তু বাজে দরমাস খাটতে ভারি মজবুদ; আর সেই গ্রাণে উপরিওয়ালাদের সুদুর্ভাগ্যত, কোন ডাকিম মুরগীর ডিম পান, ইবন্ আহম্মদ সত্যায় কিনে এনে দেবে; কারুর বাড়িতে রুগীর জন্তু স্বকর দরকার, ইবন্ আহম্মদকে বলেই চল; কারুর গরহজম হয়েচে, ইবন্ আহম্মদ বাড়ি থেকে সরবতে নীলুফা আনতে ছুটল, এই রকম। তার আর একটা গুণ ছিল; সব রকম লোকের সঙ্গে সহজে আলাপ করে লম্বাচোড়া কথা বলে অল্প সময়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা করে নিতে পারত।

এই ইবন্ আহম্মদকে গোয়েন্দা করব ঠিক করে ডাকিয়ে বল্লন “সেপ, মুলি সাচেব, একটা ভারি গোপনীয় ব্যাপারে ডিক্‌ক্‌টিভগিরি করবার জন্তে একজন বুদ্ধিমান আর বিশ্বাসী লোক চাই। তা তুমি ছাড়া সে রকম লোক আর দেখতে পাচ্ছি না। কাজটা পারবে কি?” দে তো অগ্রপশ্চাত্ত না ভেবেই বলে উঠল “আলবৎ পারবে।” ত ন আমি বল্লন “আমাদের সন্দেহ হয়েছে লেডি ডাক্তার মিস্ বিশ্বাসের বাসায় ফুটে ছনকতক লোক পোলিটিকাল চক্রান্ত করেছে। তোমাকে মিস্ বিশ্বাসের সঙ্গে আপস করে দেখে আমরাই হবে সেখানে কে কে যায় আসে, তারা কি করে, কি রকম কথাবার্তা বলে, আর মিস্ বিশ্বাস তাদের সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করে। তিন দিন পরে এসে আমার কাছে রিপোর্ট করবে এ বিষয়ে তুমি কি লক্ষ্য পেলে। এ তিন দিন তোমাকে কাছারিতে আসতে হবে না।”

পরেশ বলিয়া উঠিল “আপনি ত বেশ লোক, একজন ভদ্রমহিলার উপর অন্যায়সে চর লাগালেন?”

বিজয় বাবু বলিলেন “তুমি ভুল বুঝেছ। আমি মিস্ বিশ্বাসের দোষ ধরব বলে এ কাজ করিনি, তাকে এই অভ্যাচার আর বদনাম থেকে রক্ষা করব ভেবেই করেছিলুম। আমার ধারণা হয়েছিল সে কতক ভালমাহুঘীর জন্তু আর কতক লজ্জার খাতিরে এই উপদ্রব সহ করেছে। আমি সাপও মরে লাঠিও না ভাঙ্গে এই ভাবে তাকে উদ্ধার করব। অবশ্য কেবল এই সদিচ্ছার জন্তু এতটা করতুম না। কিসের আকর্ষণে লোকে তার দল চায় সেবিনয়ে পুর কোতুল হয়েছিল বলেই সদিচ্ছাটা কাজে পরিণত করবার জন্তে উঠে পড়ে লেগেছিলুম, তা স্বীকার করছি। দ্যাক ইবন্ আহম্মদ

একটা মস্ত কাজের ভার পেয়েছে মনে করে অচকারে বুক গুলিয়ে বলে গেল যে তিন দিনেই সে কাম ফতে করে ফেলবে ।

চারিদিন গেল, ইব্ন্ আহম্মদের নেপা নেই । পাঁচদিনের দিন সকাল বেলা আমি বাড়ির ভিতর থেকে আমার বৈঠকখানায় এসে দেখি ইব্ন্ আহম্মদ বসে আছে । খবর কি জিজ্ঞাসা করতেই সে উত্তেজিত ভাবে বলে উঠল “ভাগো অত্যাচারে পাঠিয়েছিলেন হুজুর, তা না হলে একজন বেকসুর আদমি মুদ্রিলে পড়ে যেত । কোন্ সময়তীন আপনাকে বলেছে যে বিশ্বাস-নেম সাহেবের কুঠিতে পোলিটিকাল বৈঠক হয় ? তিনি কি, যে সে আদমি, যে খালাব কামে হাত দেবে ? তার কি মিঠা তবিরৎ, কি সনিক্ দিস্, কি উমদা সিকৎ ? তিনি একটা ঔরৎ, ঔরৎ (রমণীরত্ন) ।”

যে ইব্ন্ আহম্মদের মুখে কখনও কারো ভাল শুনিনি, তার মুখে এই প্রশংসার কোম্বারা শুনে তারি আশ্চর্য্য হয়ে গেলুম । বাপারটা পরিষ্কার হওয়া দূরে থাক আরও জরুরী হয়ে উঠল । আমি বল্লুম “আচ্ছা মিস্ বিশ্বাস গুব ভাল লোক তা যেন বুললুম, কিন্তু তার বাসায় অনেকে আড্ডা দেয়, তা সভা নয় কি ?”

“অড্ডা দেওয়া কথাটা ঠিক নয় হুজুর, কতকগুলো নিকাখা আদমি মেমসাহেবকে সিধাসাধা পেয়ে তার কুঠিতে চড়াও হয়ে দিনরাত বসে থাকে, তাদের নিম্নে মেমসাহেবের যে কত তকলিফ হয় তা বলবার ঘো নেই । কিন্তু তার তাকুব সাবর, (সহ্যগুণ) চাসিমুখে সমস্ত বরদাস্ত করেন । এ সব বদমাসদের হাত থেকে মেমসাহেবকে বাঁচাবার জন্তে আমি একরোজ সারা রোজ তার কুঠিতে থাকতাম, মনে করেছিলাম হুঁচোর রোজ এ দ্রকম চেপে থাকলেই তারা ভাগবে । এই জন্তেই আমার রিপোর্ট করতে ছ’রোজ দেরি হয়ে গেছে ।”

ইব্ন্ আহম্মদের নিঃস্বার্থ পরোপকারের কথা শুনে হেসে উঠলুম, স্পষ্টই বুঝতে পারলুম এও মিস্ বিশ্বাসের গোলাম বনে গেছে । কে কে সেখানে যায় জিজ্ঞাসা করতে ইব্ন্ আহম্মদ বলে “ঐ সব বেদাদবদের নাম পুছা দরকার মনে করিনি । ভাল কথা, আমাদের ডাক্তার বোস সাহেব সেখানে আনাগোনা করেন দেখলাম, তিনি ত আপনার দোস্ত বলেই হয় ; আপনি তাঁকে সমঝিয়ে দিতে পারেন না কি যে, ওরকম করলে মেমসাহেবের বদনাম হতে পারে ।”

আমি বিব্রত হয়ে বলুম “সেকথা তোমার ভাববার দরকার নেই, তুমি এখন যাও।” মনে মনে ভাবলুম এর মত লোককে এ রকুন কাজে পাঠানই ভুল হয়েছিল।

চাটগা সহরটা ফিকে, মেটে, কাল, হরেক রকম ফিরিসি আর দেশী ক্রিষ্টানের রাস্তা, প্রায় সব কাছারিতেই ছাঁচার জীন ফিরিসি আছে, আমার আফিসেও ফেগেডো নামে একজন বড়ো কাল ফিরিসি ছিল। সে এ পর্য্যন্ত বিয়ে করেনি, তাই ভাবলুম এ কাজের পক্ষে এই উপযুক্ত লোক, কেন না যে এতদিন পর্য্যন্ত জীর অভাব বোধ করেনি, সে বড়ো বয়সে জীলোকের মায়ায় বশীভূত হবে না। তাকে ডেকে পাঠিয়ে ইবন্ আহম্মদকে যে পোলিটিকাল চক্রান্তের তদন্তের কথা বলেছিলাম সেই কথা বলে, তিন দিন পরে রিপোর্ট করতে বলুম।

তিনদিন পরেই ফেগেডো ফিরে এল বটে, কিন্তু তার মুখে একটা অগ্রস্ততের ভাব দেখে আমার মনে আগে থাকতেই সন্দেহ হল। সে বলে যে, মিস্ বিশ্বাসের বাঙ্গলোতে পোলিটিকাল চক্রান্তের কথা যে কেবল সর্কেক্স মিথ্যা শুধু তা নয়, মিস্ বিশ্বাসের charus এ (মোহিনী শক্তিতে) আকৃষ্ট হয়ে এক পাশ বদমায়েস তাঁর বাঙ্গলোতে জমায়েৎ হয় বটে (a pack of Scoundrels had together) কিন্তু তার ক্ষেত্রে মিস্ বিশ্বাসকে দায়ী করাও যা, আর একটি সুন্দর গোলাপ ফুলের চারিদিকে মোমারি জুটলে সেজন্তে গোলাপ ফুলকে দোষী করাও তাই; মিস্ বিশ্বাস একজন পূরম গুণবতী মহিলা (a lady of the highest quality) এমন কি তাকে একটি এঙ্গেল বলেও অত্যাতি হয় না।

আমি ভাবলুম “যেহেঁচো রে, এটাও জালে পড়েছে দেখছি।” লোকটাকে ভাঁড়াভাড়ি বিদায় করে হাল ছেড়ে দিয়ে বসে রইলুম, ভাবলুম দূর হোক গে ছাই, এ নিয়ে আর মাথা ঘামিয়ে কি হবে?

এই সকল কথা ভাবছি এমন সময় আফিসের ভিতর থেকে একটা টেচামেচি গুনতে পেলুম, একটু পরে দেরিভাদার এসে বসে ইবন্ আহম্মদ আর ফেগেডো আফিসের ভিতর ঝগড়া করছে, তাদের পামাতে পারা যাচ্ছে না; ঝগড়ার কারণ দুজনের কেউ স্পষ্ট করে বলছে না, তবে তারা ঝগড়া করতে করতে মখে মখে কে মিস্ বিশ্বাস আর মেমসাহেবের নাম করছে। আমি ভাবলুম আরে মোলো, শেখকালে আফিসের ভিতর

হুন্ উপস্থানের যুদ্ধ ! দুজনকে ডাকিয়ে আচ্ছা করে ধমকে দিতে তবে তারা নিরস্ত হয় ।

আমি মনে মনে মিস্ বিশ্বাসকে যগেট বাটাভুরী দিলাম ; ভাবলাম যে খ্রীলোক কুঞ্জী চয়েও সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির দুজন পরিণত বয়সের লোককে তিন দিনে এমন বশ করতে পারে, জীর ক্রমতা বড় সাধারণ নয়—কিন্তু এ ক্রমতার মূল কোথায় ঘুরে ফিরে সেই পুরাণ কথাতেই এসে উপস্থিত হলাম । মনে করেছিলাম এ ব্যাপার নিয়ে আর গাঁটাধাটি করব না ; কিন্তু সেনেগেডোর আর ইরন্ আহম্মদের ঝগড়া দেখে আমার কোঁড়হল দশগুণ বেড়ে উঠল, মনে চল এ রচনা ভেদ না করতে পারতাম কিছুতেই নিশ্চিত হতে পারব না ।

এই সময় চঠাং মনে হল, বোধ হয় মিস্ বিশ্বাসের অনেক টাকাকড়ি আছে, আর বোধ হয় সেই সন্ধান পেয়েই গুড়ের গন্ধে মাছির ঝাঁকের মত চারিদিক থেকে তাৎ অসুগত ভক্ত এসে জুটছে । অফসার ঘরে ইলেকট্রিক আলো জ্বলে যেমন ঘরের সমস্ত জিনিসের চেহারা চোখে হঠাৎ উদ্ভাসিত হয়ে উঠে, তেমনি এই কথাটা মনে হওয়ায় এ ব্যাপারের যা কিছু রহস্য সমস্তই মুহূর্তে পরিষ্কার হয়ে গেল, আর এই সোজা কথাটা এতদিন কেন মনে হয়নি তাই আশ্চর্য্য বোধ হতে লাগল । মনে একটা ভারি আরাম বোধ হতে লাগল বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আনার থিওরিটা সত্য কিনা তার প্রমাণ পাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলাম । কোন রকমেই কিছু বুঝতে না পেরে শেষে ঠিক করলাম যে নিজেই অনুসন্ধান করব । তারপর একদিন বৈকালে কাছারি থেকে ফিরে কাপড় চোপড় বদলে বেড়াতে বেড়াতে মিস বিশ্বাসের বাসায় উপস্থিত হলাম । আমাকে দেখে মিস্ বিশ্বাস ভারি ব্যস্ত হয়ে যৎপরোনাস্তি আমার অভ্যর্থনা করে তার বৈঠকখানায় নিয়ে গিয়ে বসালে । তার আন্তরিক খাতির যত্নে আমি সত্য সত্যই খুসী হলাম ।

মিস্ বিশ্বাসের বাগলা খানির সামনে একটা বারান্দার উপর দিয়ে বৈঠকখানায় আসবার সময় দেখি সেখানে জন তিন চার লোক বসে চা খাচ্ছে । আমি বুঝলাম এরাই মিস্ বিশ্বাসের ডক্টরবৃন্দ, কিন্তু বারান্দা দিয়ে চলে আসবার সময় সন্ধ্যার আবছায়ায় তাদের কাউকে চিনতে পারলাম না । আমি বাইরের আলো থেকে আসছি বলেই বোধ হয় তাদের ভাল দেখতে পেলাম না, তারা কিন্তু সম্ভবত আমাকে চিনতে পেরেছিল, কারণ আমি বৈঠকখানায়

বসতেই দেখি তারা একটির পর একটি হুড় হুড় করে সরে পড়ল। তাদের চিনতে পারলাম না বলে ভারি আপশোষ হতে লাগল।”

মিস্ বিশ্বাস ভাড়াভাড়ি বাড়ির ভিতর থেকে তার পিসিকে ডেকে নিয়ে এল, দেখলাম তাঁর ধরণ ধারণ ঠিক আমাদের ঘরের বিধবার মত। সমস্ত দিনের খাটুনির পর এতখানি হেঁটে আসতে আমার কত কষ্ট হয়েছে বলে আক্ষেপ করে তিনি আমার বারণ অগ্রাহ্য করে একপাশা হাতপাশা এনে আমাকে বাতাস করতে করতে করুণামাথা স্বরে বল্লেন “তোমার মুখ যে শুকিয়ে গেছে বাবা! বলতে ভরসা হয় না, যদি কোন আপত্তি না থাকে একটু চা টা পাওনা।” ঠালা অকপট যন্ত্র আমার ভারি ভাল লাগল, পছন্দ “খাওয়া দাওয়া সবকিছু আমার কোন কুসংস্কার নেই, তবে বাড়ি থেকে জলটল খেয়ে বেরিয়েছি, এখন আর কিছু খাব না।”

চাকরে আলো দিয়ে গেলে দেখলাম যে ঘরের আসবাবপত্র বেখান্ধা সাহেবি-দানা কি বাহারের চেষ্টা নেই, অথচ আরাম সুবিধার হিসাবে যা কিছু দরকার সবই আছে। সমস্ত জিনিসপত্রের এমন পরিপাটি গোছগাছ আর চারিদিক এমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন যে দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। ঘরটিতে বসে আমার বড়ই আরাম আর তৃপ্তি বোধ হতে লাগল, মনে মনে মিস্ বিশ্বাসের রুচির প্রশংসা না করে থাকতে পারলাম না।

আমার উদ্দেশ্য, কিছুকণ কাটিয়ে দেখা, যদি কিছু খেই পাই স্নতরাং মহা-গল্প জুড়ে দিলাম। ঘণ্টাখানেক পরে বাহিরে ভারি ঝড় উঠল, সঙ্গে সঙ্গে সুবলধারে বৃষ্টি। মনে করলাম বৈশাখী ঝড় একটু পরেই থেমে যাবে, কিন্তু যখন আধ ঘণ্টা কেটে গেল, তবু পামবার কোন চিহ্ন দেখা গেল না, তখন মিস বিশ্বাস ধরে বলল সে রাতে সেখানেই খাওয়া দাওয়া করে যেতে হবে। এ অসুস্থরোধ আমি প্রথমে উড়িয়ে দেবার যথেষ্ট চেষ্টা করলাম, কিন্তু তার আগ্রহ দেখে শেষকালে রাজি হতে হল। মিস বিশ্বাস ভারি খুশী হয়ে বলে গেল “আপনি পিসিমার সঙ্গে কথাবার্তা বলুন, আমি ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আপনার খাবার তৈরি করে দেব।” আমি মনে করলাম মন্দ কি, যত বেশীকণ থাক। যায়, যার জন্তে এসেছি তার মীমাংসা হওয়ার সম্ভাবনা ততই বেশি। আমার অজ্ঞাতসারে সে মীমাংসার যে কত কাছে এসে পড়েছি তা বুঝতে পারিনি।

যথাসময়ে খাবার ডাক পড়তে ভিতরে গিয়ে দেখি ‘ঠাইয়ের’ কি পরিপাটি বন্দোবস্ত! আগুনের মত পরিষ্কার চক্চকে সিমেন্ট করা মেজের উপর ছাঁটা

পশনের দুখ পূর একখানি আসন পাতা, তার সামনে সাদা পাথরের থালা বাটি, রেকাবি প্রভৃতি সাজান, পাতের চারিদিকে চারটি সামান্যনে মোমবাতি জ্বলছে, দুধারে দুটি বেলাগ্যারি সুলদানে ফুলের তোড়া তার মাঝখানে আবার দুটি জ্বলন্ত ধূপ বসান, ঘরের এককোণে একটা টিপাঘের উপর টুং টাং করে একটা কলের অর্গান বাজছে, সামনেই খোলা জানলা দিয়ে হাঙ্গ-নো-হানার গন্ধ এসে ঘরটি আনন্দ করে তুলেছে। সাদা পাথরের আর তোড়ার পবিত্র শোভা, ধূপের আর ফুলের গন্ধ; আর অর্গানের মিঠা আওয়াজে মন একটা মৃদু পবিত্র কুঁস্থিতে ভরে উঠল, আসনের অতি নরম স্পর্শ যেন কার আদরের স্পর্শ বলে মনে হতে লাগল। একসঙ্গে রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ দিয়ে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তির আয়োজন এই নতুন দেখলাম।

ফলমূলগুলি এমন সুন্দর কারিগরি করে সাজান, যে তাতে হাত দিতে মারা হতে লাগল। বেদানার দানার পদ্মফুল, বাদামের নক্ষত্র, কিসমিসের পিরামিড, আন্ডুরের রসম, শস্যের ঘুড়ি, কলার থান, আক্টোর রেলিং, মাধনের সুলদারকণা ইত্যাদি। আবার কতকগুলি ফলমূল নতুন কায়দায় অতি উপদেশ ঠাণ্ডা করা, তালশাসের ভিতর কেঁওয়ার সরবৎ, লিচুর ভিতর আঁটির জায়গায় সুগন্ধি পাতলা কীট, গোলাপজামের ভিতর গোলাপী সিরাপ, কাল-জামের ভিতর ছানার ছোট-ছোট গুলি আর চাকির ভিতর নেবুগন্ধ চিনি ভরা, এই রকম কত কি। এক একটি জিনিষ মুখে দিতে মিত খাওয়া বন্ধ করে প্রশংসা কষ্টবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠতে লাগল!

খেতে খেতে ভাবতে লাগলাম ফলমূলগুলি এমন তরিবৎ করে তৈরি করতে যে রকম পরিশ্রম আর সময় লেগেছে, দেখছি তাতে বোধ হয় রাগা বাগা বিশেষ কিছু করতে পারে নি। পাত্রে প্রথম লুচি আর শাকভাজা দিতে সে ধারণা আরও বন্ধমূল হল। কিন্তু ক্রমে দেখলাম তা নয়, সমস্ত জিনিষগুলি গরম গরম দেবে বলে এক একটি করে পরিবেশন করছে। জোয়ানের লুচি আর ভিনিগার না সন্ দেওয়া শাকভাজা এমন সুখরোচক লাগল যে, পেলে বোধ হয় তাই দিয়েই পেট ভরিয়ে ফেলতুম; তারপর ইঁচড়ের ডালনা, কপির ছোঁকা, মটর স্নটির ঘুগনি, আরও কি কি—অতি ভোজ্য রাগা—যেটা খাই সেইটাই মনে হয় আগের চেয়ে এইটাই ভাল। ক্রমে তিন রকম পোলাও, একটিতে জুঁই ফুলের গন্ধ, একটিতে চিড়ের মত কুচি কুচি মাছ দেওয়া, আর একটির প্রত্যেক দানা সোণালি অথবা রূপালি রঙের; তার সঙ্গে রকম রকম মাছ আর মাংসের তরকারি,

বড়া ইত্যাদি; কোনটা বাঙ্গলা, কোনটা মোগলাই, কোনটা বা সাহেবি, তার মধ্যে কতকগুলি জিনিস আগে কখনও খাই নি; আর যেগুলি খেয়েছি তার প্রত্যেকটিতে এমন একটা কিছু নতুনত্ব বা বিশেষত্ব ছিল যার জন্য এতদিন পরেও সেগুলি ভুলিতে পারিনি। আমি সকাল বেলা কি দিয়ে ভাত খাই রাত্রে তা মনে থাকে না, কিন্তু সেদিন কি কি খেয়েছিলুম তা আজও মনে আছে, এই থেকেই বুঝতে পারবে যে কি রকম রাজা। বরফির আকাল, কীসের তার, কমলা লেবুর গন্ধ আর মাখমের মত মোলায়েম দুইএর, ফুগা ঢাকা খেজুর খোবানি জরদাআলু মেশান লাগ রঙ্গের সরের মত জিনিসের ঠাণ্ডা পুড়িংএর, আর অতি ফিকে টক রস আনারসের কালাকন্দের দুল মাধুর্য্যকে যথাক্রমে মিষ্টায় রাজ্যের ললিত, সাহানা আর বেহাগ রাগিণী বলা যেতে পারে।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এতগুলি জিনিসের কোনটিকে ফাষ্টফ্রাসের নীচে স্থান দেওয়া যায় না। আমি এই বয়সে অনেক বড়লোকের বাড়িতে নিমন্ত্রণ খেয়েছি, পাকা রাধুনীর হাতের রাজা খেয়েছি, হোটেলেও বড় কম খাইনি, কিন্তু প্রত্যেক জিনিসটি এমন উৎরাণ, আর কি কি খাওয়াতে হবে, আর কোনটার পর কোনটা দিতে হবে তা ঠিক করতে এমন নিপুণ বিচ্যরশক্তি আর কোথাও দেখিনি।

অক্ষরের মাখায় মাত্রা না দিলে যেমন সেটা সম্পূর্ণ হয় না, তেমনি আমার মত চুপট ডানাকথোরদের স্বথ বা আয়েসের সময় একটু ধোয়াযুথ না করলে পুরা তৃপ্তি হয় না। তাই আঁচাবার সময় লেডির ঘরে ধূমপান নিষেধ ভেবে মনে মনে চুঃখ হচ্ছিল যে, এমন খাওয়াটা অস্বহীন হল, আর ক্রিষ্টানের বাড়ি পানপানি পাওয়া যাবে না বলে মনটা খুঁত খুঁত করছিল; কিন্তু বৈঠকখানায় এসে যখন দেখলুম আমার চেয়ারের পাশে একটি টিপায়ের উপর রেকাবিত্তে সাজা পান, ভাজা মসলা, চিকিণ্ডপানি, চুপট আর দেশলাই রয়েছে, তখন অবাক হয়ে গেলাম। আমি তখন তাঁর রাজার ও অজ্ঞাত বাবহারের যথেষ্ট প্রশংসা করলাম।

আমার প্রশংসা শুনে তার মুখে একটা সলজ্জ আনন্দের ভাব ফুটে উঠল, সে বলে “আপনি কি বলছেন তার ঠিকানা নেই, আপনার মত লোক আমার রাজা খেয়ে তৃপ্ত হয়েছেন এই আমার যথেষ্ট। আমার ত আর কিছু গুণ নেই, এই বিজ্ঞাতুক দিয়ে যদি লোককে খুসি করতে পারি তা হলে বড় আনন্দ হয়।”

মিদ্‌ বিশ্বাসের পিঙ্গি বলেন “হ্যাঁ বাবা, ওর সখের মধ্যে ঐ এক লোক

খাওয়ান সখ আছে । ছেলেবেলা থেকে ওর রান্নার উপর ভারি ঝোঁক, বাবুর্চি-দের খোসামোদ করে নতুন নতুন রান্না শিখত, বড় হয়ে পরমা দিয়ে শিখত ; নানান রকম বাজলা আর মোগলাই রান্না শিখবে বলে দিনকতক সখ করে মিশনারিদের সঙ্গে মিশে জন কতক-বান্ধালি বাবু আর মুসলমান ভদ্রলোকদের বাড়ি সেলাই শেখাতে যেত ; আবার ইংরিজি বাংলা রান্নার বই কতকগুলো কিনেছে । এমন বাই কখন দেখেছ বাবা ?”

আমি বল্লম “তা যেন বুঝলুম, কিন্তু আমি যে খাব তা তো আপনারা জানতেন না, এরকম নানান রকম ফলমূল আর উপকরণ মায় অসময়ের কপি কড়াইস্ট্রে এসবই বা কোথা পেলেন আর এত অল্প সময়ের ভিতর এত জিনিসই বা কি করে তৈরি হল ? এ তো আমার ভৌতিক ব্যাপার বোধ হচ্ছে ।”

পিসি একটু স্নান হাসি হেসে বলেন “আশ্চর্য্য হবার কথা বটে, পাগল মেয়ের ধরন ত জান না । বাড়িতে হঠাৎ কেউ এলে তাড়াতাড়ি পাঁচ রকম রোঁধে দিতে পারবে বলে সাহেবদের মত ছটা ফোকরওলা উছন্ন তৈরি করেছে, তা ছাড়া ই যে বুড়ো বেহারটাকে দেখলে, ও এসব কাজে খুব তৈরি, সেই ক্ষণে আরও লিগ্‌গির হয় । আর জিনিসপত্রের কথা কি বলছ, মেয়ের ভাঁড়ারে দেখবে সব রকম মালমসলা মায় রিলিভি আমদানি টিনে ভরা মাছমাংস তারি তরকারি কল সব সময় মজুদ থাকে, আবার সারা বছরের যত রকম তরকারি শুকিয়ে শুকিয়ে রেখে দেয় । ও যা কিছু রোজকার করে সমস্তই এইতে খরচ করে । বাড়িতে যে আসবে সে যদি মিঠাবান হিঁদ না হয় তা হলে তাকে কিছু না খাইয়ে ছাড়বে না, সাহেবই হক, মুসলমানই হক, আর যে ইহক, যে যেমন, তাকে তেমনি রোঁধে পাওয়াবে, নিদেন চা কি জলখাবার খেয়ে যেতেই হবে ।”

এতক্ষণে সমস্ত ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে গেল । যে মিস্ বিশ্বাসের বাড়িতে আসে সেই কেন তার গোলাম হয়ে যায়, লোকে কেন এত ঘন ঘন এখানে যত্নোন্নত করে তা এইবার ভাল করে বুঝতে পারলাম ।

কিন্তু এই রকম যাকে তাকে সেধে খাওয়ান আমার চোখে বড় ভাল ঠেকল না, মনে হল এটা বাহবা মেবার বড় বাড়াবাড়ি নেশা । তাই একটু না টুকে থাকতে পাললাম না, বললাম “আখীরবাজনকে খাইয়ে তুষ্ট করা খ্রীলোকের পক্ষে খুব প্রশংসার কথা বটে, কিন্তু এমন করে পাঁচ ভূতকে খাইয়ে পরমা নষ্ট করা কি উচিত ? এতে ভাল ত হয়ই না, উপরন্তু খুব খারাপ ফল হয় । আপনাদের উচিত নয় কি ওকে বুঝিয়ে নিরস্ত করা ?”

গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে মিস্ বিশ্বাসের পিসি বলেন “সে অনেক কথা বাবা। বাছা আমার বড় অস্তাগী। একটা ছেলের সঙ্গে ওর বিয়েও সম্বন্ধ করেছিলাম, অমন ছেলে হয় না, যেমন রাজপুরের মত চেহারা তেমনি ভাল স্বভাব, বেশ ভাল চাকরিও করত। বিয়ের কথাবার্তা ঠিক হয়ে গেলে কুতুর সঙ্গে চেনা পরিচয় করে দেবার জন্য তাকে মাঝে মাঝে নিমন্ত্রণ করতাম। তাইতে তখনই গুব ভাব হয়েছিল। সে বলত “পিসিমা, আপনার ভাইয়ের হাত পুণিবীতে কেউ রাঁধতে পারেন, আমার ইচ্ছা করে পুণিবীত লোককে ডেকে এনে ওর রান্না খাওয়াই।” মাসখানেক বাদে বিয়ে হবে, আমি এক এক করে ওদের ঘর-কন্নার তিনিস পত্র গোছাচ্ছি, এমন সময় ছেলেটার গলায় বা হয়ে শব্দশাস্ত্রী হয়ে পড়ল, তার বাপমা তিন মাস ধরে কত চিকিৎসা করালে, কিছুতে কিছু চল না। আমি মাঝে মাঝে কুতুর নিয়ে তাকে মেথতে যেতাম একদিন বড় ছোট গট করছে দেখে জিজ্ঞাসা করলুম ‘কি কষ্ট হচ্ছে বাবা?’ সে বলে “পেট ভুলে যাচ্ছে পিসিমা, অথচ কিছু পুবার জো নেই এ বড় বয়স।” আর একদিন কুতুর বলে “সেপ, বড় ইচ্ছা করছে তোনার চাতের রান্না পেট ভরে খাই, আমি যদি ভাল হই একদিন ভাল করে রেঁধে খাইও।” বাছার সে সাধ আর মিটল না, না মেতে পেয়ে ধড়ফড় করে তার প্রাণ বেরিয়ে গেল।” বলতে বলতে বুড়ির চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে জল-পঁড়তে লাগল। চেয়ে দেখি মিস্ বিশ্বাস উঠে গিয়ে জানলার কাছে আমাদের ঘিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে বাইরের দিকে চেয়ে আছে, ভাবে বোধ হল কান্দছে।

একটু সামলে নিয়ে ভান্সা গলায় পিসি বলতে লাগলেন “সে অনেক দিনের কথা। তারপর আমরা ওকে কত বুঝিয়েছি যে কত লোকের ও রকম হয়, তারা আবার সময়ে শোক ভুলে গিয়ে ঘরকন্না করে—আর মেয়েমাছুষ, বিয়ে না করলেই বা চলবে কি করে? কিন্তু ও সেই থেকে সব স্বপ্নে জলাঞ্জলি দিয়েছে, চিরকাল স্বাধীন থাকতে পারবে বলে ভক্তগণি শিখে চাকরি করেছে। এত কষ্টে রোজকার করা পরমা পরকে খাইয়ে নষ্ট করে বলে আমি প্রথম প্রথম বুঝতে না পেরে ওকে বকতাম, কিন্তু যেদিন আমায় বলে তোমার পারে পড়ি পিসিমা আমার এ কাজটিতে বাধা দিও না, আমি তাঁর কথা ভেবে পাঁচজনকে খাইয়ে তৃপ্ত হই সেদিন থেকে ওকে তো কিছু বলিই না, বরং ও সুখী হয় কেনে ওকে এ বিষয়ে সাহায্য করি।”

আমার চোখ জলে ভরে গেল, এহেন সত্যের সম্বন্ধে অস্তায় সন্দেহ করেছিলাম

বলো লজ্জায় আর দুর্গায় নরমে মরে গেলাম, ইচ্ছা করতে লাগল মিস্ বিশ্বাসের
পায়ের ধূলা মাথায় নিয়ে ধস্ত হই ।

বিজয়বাবুর গল্প শুনিয়া আমাদের মনে যে ভাবের উজ্জ্বল হইয়াছিল, পরেশ
তাহা একেবারে ম্রাটি করিয়া দিল । কেয়েক মুহূর্ত্ত নিশ্চল থাকিয়া একটা ছোট
দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া সে বলিল “মশাই একথানা ফুলদ্রাপ কাগজ দিন ত ।”

“কাগজ কি করবে হে ?”

“চাটগায়ে বদলি দ্বার দরখাস্ত করব ।”

শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

নির্মল

(একটি ক্ষুদ্র শিশুর প্রতি)

তে নির্মল ! হে নিম্পাপ ! শুকু তারকার রশ্মিমালা
ডুব দিয়া, চুপে চুপে, আনন্দের স্বপনের ঘোরে,
হইয়াছ বৃক্ষি হেন অপরূপ ! বাধি বাহু ডোরে,
রাঙা উষা প্রাইয়াছে চুম্বা বৃক্ষি তোর কচি গালে ?
‘অশোক-আবির ছিল মোহনীয়া বাসন্তীর গালে ;—
তাই বৃক্ষি মাথিয়াছ গালে মুখে ? হেন ক্ষুদ্র চোরে,
কে আঁটিবে ? স্বকারণিয়া ক্ষুদ্র অলি মধু লয় হ’রে,—
‘আনো লও’ বলি পদ্ম মাধে সেই চরস্ত ছালালে ।
হে সরল ! আঁখি ছুটি, ছুটি স্বচ্ছ মোহন মুকুর,
তুমি অস্তরালে আছ—তবু এই নির্মল দর্পণে
তোমার বিমল রূপ প্রকাশ পাইছে তরপুর !
‘নিকুঞ্জ-আরসী যথা অচঞ্চল সরসী বদনে
লাবণ্যের অঞ্চলের নিধিধনে পূর্ণিমার চাঁদে
গোরবে প্রকাশ করে,—মুগ্ধ কবি যে বরণা ছাঁদে ।

শ্রীদেবেপ্রসাদ সেন

তপঃসিদ্ধি

ছিন্ন শুক ধূলিমান বসন্তের বল্লরী-বিতান,
 হিল্লোলিত মলয়ের কোথা কোনো নাহিক সন্ধান ;
 কলকণ্ঠ কোকিলের বাণী
 নাহি শুনি, ওগো ধরা রাণী,
 মালধ-অঞ্চল-স্তনে,
 সাক্ষ্য, উষা শিশিরের জলে
 মল্লিকা মালতী আর ফুটিয়া না ওঠে,
 মধুলোভে অলি নাহি জোটে ;
 বনজীর,
 নিকুঞ্জ-লক্ষ্মীর,
 জদিস্থিত বেদনার মত
 ফুটিয়া ওঠেনা আর অশোক কিংগুক আদি যত ;
 নারী-মুগ-মদিরার বাস
 করি উপভাস,
 বৃষ হ'তে আপনি টুটিয়া ,
 ছায়াচ্ছন্ন তরুণে বকুলতো পড়ে না লুটিয়া ।
 হে ধরণী-রাণি,
 স্রব তব বিহঙ্গ-কুঞ্জন-বাণী,
 পীত-শোভা বসন্তের সাজ
 দ্রু করি আজ,
 অনিন্দ্য-স্নানর অভিনব,
 যৌবনের পূর্ণ তহু তব
 ঢাকিয়াছ পর-স্বর্ণ-গৈরিক-কিরণে ;
 একমনে
 কি সিদ্ধির লাগি,
 হৃদ্রে তেরাগি
 বসন্ত-বাসরে আজ
 কুসুমের সাজ ?

হোমানল

আলিয়া প্রবল,

কোন্ অভিলাষে

অপিতেছ ইষ্টমন্ত্র নির্ণয়েম রহি রুদ্ধবাদে ?

কোন্ এক গন্তযুগে হিমশৈলনন্দিনী পার্শ্বতী,

মহেশে মাগিয়া পতি,

তাপসের অসাধা সাধন,

না শুনি বারণ

সেধেছিল, একাএ অস্তরে

বাএ আশা বহি বক্ষ'পরে ।

দুট চন্দ্র-গ্রহ-তারা,

সন্ধ্যাকাশে সূর্যোদয় পারা,

যৌবনের নব আগমনে

দূর করি'ভূষণে রতনে,

বাকল বসন পরি,

চোলাকল দূরে পরিহরি ।

ভ্রমরের পদভার

সহেনাকো যার,

পেলব শিরীষ ফুলে

পতঙ্গী পড়িলে

যে দারুণ বেদনা তাহার,

বাকল বসনে তাই ঘটেছিল নন্দিনী উমার ।

বসন্তে সহায় করি

সাজাইয়া কুসুম্বে বলরী,

হিমাত্রির বোগাভ্রমে,

বিলাসে বিভ্রমে,

বালসূর্য্যাকর উপহাসে,

চীনাংগক বাসে

আবরিয়া তুলত্যাটরে,
 ধীরে ধীরে,
 সকারিণী পল্লবিনী লতার মতন
 * করিয়া যতন,
 হরযোগভঙ্গ আশে,
 মনোজের পাশে
 চলেছিল পর্কতকুমারী,
 ঘোবন-আমল-বিভা চৌদিকে সকারি ;
 মদনের দহু-গুণসম,
 গতিলোল কাকি অহুপম,
 এক করে
 যথ্যস্থানে বিনিবেশ ভরে
 করিয়া যতন
 অহুক্ষণ,
 অস্ত্র করে
 জীলা পদ্ম ধরে .
 মুখপদ্মভ্রমে ভ্রাস্ত পূর করি ভ্রমরপঙ্ক্তিরে
 চলেছিল ধীরে অতি ধীরে । *
 কোথা দূর কোথা সন্মোহন !
 হরনৈত্র অনলের প্রলয়-দহন
 মন্থরের সনে
 ভগ্নশেষ করেছিল পার্শ্বভীর হৃৎসাধ মনে ।

ফাল্গুনের ফুলশয্যা পরিহারি, তুমি যার তরে,
 একাগ্র আগ্রহ ভরে,
 ঘোড় করে,
 ব্যাকুল অস্তরে,
 উর্দ্ধে চাহি জপিতেছ নাথ,
 অবিরাম,
 ,

রথচক্রধ্বনি যার

শুনিবার

একান্ত আশায়,

ব'সে আচ্ছ জড় প্রাণটীন পামাগ-প্রতিমা প্রায় ।

তোমার সে মৈব বন শ্রাম

অতিরাম,

স্নিগ্ধ কান্ত সুন্দর শোভন,

য়েহাতুর নয়ন-শোভন,

আসিতেছে মিশ্রনের মধুসে

তব বাসে ।

শেষ করি বিশ্বজিৎ যাগে,

অমুরাগে,

সব তব কর সমর্পণ,

ছন্দয় তর্পণ,

যাচিয়া মেহের ধার,

সার কর করুণা তাহার ।

হে মেদিনি, ওগো মহামুক

কতু তুমি হবে না বিষ্মত ;

বৃন্দস্তর মালতী-মঞ্জরী

পড়িয়াছে করি.

নাহি খেদ তার তরে,

আঘাতে আগ্রহভরে,

কুটিবে আবার

কুটজ কুম্ভের ভার,

কদম্বের পুলক আকুলে,

যাবে ভুলে

বিগত বেদনা তব,

হবে অভিনব

যৌবন সঞ্চায়,

অকল তোমার

ভরিবে আবার

অগ্রদ্বোধিত শিশিরের সুধাগন্ধ শেফালি সস্তার ।

নিদ্রাভের সব নিষ্ফলতা.

মিটিবে তা.

সুন্দর সে শ্রাম শোভা জলধের রেহনার দানে

• প্রান্তরের রাত্রি দিনমানে ।

শ্রীজগদিস্তনাথ রায়

বাঙ্গালার ইতিহাস ।

(সমালোচনা ।)

স্বনামপ্রসিদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নব-প্রকাশিত “বাঙ্গালার ইতিহাস” [প্রথম ভাগ] অতি অপূর্ণ গ্রন্থ । তিনি এই গ্রন্থে অসাধারণ পরিশ্রম স্বীকার করিয়া, প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া মুসলমান বিজয়ের পূর্ব সময়ের বাঙ্গালার ইতিহাসের সম্বন্ধে যে কিছু উপাদান এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার বিবরণ সঙ্কলন করিয়া-ছেন । এই সঙ্কলন-কাণ্ডে তিনি বিরূপ পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন, “গুপ্তাধিকারকাল” নামক চতুর্থ পরিচ্ছেদে তাহার সম্যক পরিচয় পাওয়া যায় । গুপ্তরাজ্যগণের কোন মুদ্রাটি কোথায় আবিষ্কৃত হইয়াছে, কোথায় তাহার পরিচয় প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার ত ঠাই ঠিকানা দেওয়া হইয়াছেই, কোন সালে যে মুদ্রাটি আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তাহারও যথাসম্ভব উল্লেখ করা হইয়াছে । বাঙ্গালার ইতিহাসের প্রতি বাঙ্গালীর অহুরাগ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে । এই সময় একরূপ গ্রন্থ ইতিহাস-অহুরাগীর বিশেষ উপকার-সাধক হইবে । অধিকাংশ শিক্ষিত বাঙ্গালী দরিদ্র । কলিকাতা ভিন্ন বাঙ্গালার অন্যান্য সহরে যে সকল পুস্তকালয় আছে, তাহা ততোধিক দরিদ্র । যে সকল ভ্রমূলা এবং ভ্রলভ গ্রন্থে বাঙ্গালার ইতিহাসের উপাদান নিবদ্ধ আছে, কলিকাতার বাহিরে, (শ্রীযুক্ত কুমার শরৎকুমার রায়ের প্রতিষ্ঠিত রাজসাহীর বরেন্দ্র অল্পসন্ধান-সমিতির পুস্তকাগারে ভিন্ন) আর কোথাও সেই সকল গ্রন্থ যে বড় বেশী দেখিতে পাওয়া

যায়, তাহা মনে হয় না। কলিকাতায় গিয়া ঐ সকল গ্রন্থ দেখিয়া আসা যাইতে পারে। কিন্তু কলিকাতায় যাইয়া গবেষণা করিবার সময় ও সামর্থ্য কয় জনের আছে? আর থাকিলেও উপযুক্ত পথ-প্রদর্শক ভিন্ন সেই গ্রন্থাংগণে পথ চিনিয়া লওয়া সুকঠিন। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিজ্ঞানমহার্ণব মহাশয় তাঁহার “বিশ্বকোরে” এবং “বঙ্গালার জাতীয় ইতিহাসে” মকঃস্বলবাদী ইতি-বৃত্ত-সেবকের এই অভাব দূরীভূত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার কুলশাস্ত্রের প্রতি অচলা তন্ত্রির ফলে, তাঁহার গ্রন্থসমূহে সমসাময়িক দলীল দত্তা-বেত্তের গোরব রক্ষিত হয়-নাই; সমসময়ের প্রশস্তিকারকে এবং চরিতকারকে আধুনিক কুলজ্ঞের পাছে পাছে চলিতে হইয়াছে। রাখালবাবুর “বঙ্গালার ইতিহাস” বাঙ্গাল-সাহিত্যের এই অভাবটি সুন্দররূপে পরিপূরণ করিয়াছে। শিলালিপি, তাম্রশাসন, মুদ্রা, হস্তলিখিত গ্রন্থের পুস্তিকা প্রভৃতি বাঙ্গালার ইতিহাসের যে কিছু উপাদান আবিষ্কৃত হইয়াছে, রাখালবাবু অতি যত্ন সহকারে এই ইতিহাসের মধ্যে তাহার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। শুব অল্পই বাদ পড়িয়াছে। অবশ্য সে পরিচয় অনেক স্থলেই সংক্ষিপ্ত। এই অল্পায়তন গ্রন্থে সংক্ষিপ্ত পরিচয় ভিন্ন আর অধিক কিছু দেওয়া অসম্ভব। রাখালবাবুর জ্ঞান যাহার সহায় সম্পদ আছে, এ কার্য তাঁহার পক্ষেই সম্ভব, অজ্ঞের পক্ষে সম্ভব নয়। রাখালবাবু তাঁহার স্বদেশী বিদেশী সহায়কগণের সহায়তার এবং কলিকাতার মিউজিয়ামের এবং এসিয়াটিক সোসাইটির সম্পদরশ্মির সমুচিত ব্যবহার করিয়া বাঙ্গাল সাহিত্যের সম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছেন এবং ইতিহাসাহ-রাগী বাঙ্গালী মাত্রেই চির আশীর্বাদ অর্জন করিয়াছেন।

এই “বাঙ্গালার ইতিহাস” সকলনে রাখালবাবু যে অধু শ্রমশীলতার পরিচয় দিয়াছেন তাহা নহে, তিনি ইহার পত্রে পত্রে সত্যায়ত্তাংগের, নিরপেক্ষতার এবং উদারতারও যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। স্বয়ং বন্দ্যোপাধ্যায় কুলীন সন্তান হইরাও, তিনি আদিশূরের এবং গ্রামল বর্ণীর তথা কুলপঞ্জিকার ঐতিহাসিকতার আলোচনা করিতে গিয়া, আশ্চর্য্য সত্যনিষ্ঠা এবং উদারতা দেখাইয়াছেন। ঈশ্বর কৃত বৈদিক-কুলপঞ্জিকার প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিজ্ঞান-মহার্ণব মহাশয়ের ইতিহাস আলোচনার রীতির রহস্তোদ্ধাটম রাখালবাবুর একটি অমূল্য কর্ম। বটুভট্ট-রচিত “দেববংশ” প্রসঙ্গে তিনি মহামহো-পাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের মতের তীব্র সমালোচনা করিতেও কুণ্ঠিত করেন নাই। তাঁহার গ্রন্থে দেবপালের ইতিহাসে লাউসেনের কাহিনী

হান লাভ করে নাই, অথচ ডিন্সেন্ট স্মিথ (শাস্ত্রী মহাশয়ের অনুল্লসরণ করিয়া) নারায়ণ পালের তাম্রশাসনের উৎকলাধীশের এবং কামরূপাধীশের বিজয়ী বলিয়া কণিত জয়পালকে ইতিহাসের পৃষ্ঠা চইতে বিদায় দিয়া, তাঁহার আসনে লাউসেনকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এই মূল্যবান গ্রন্থে যে সকল চিত্র সম্ভবিষ্ট হইয়াছে, তাহা ইহাকে অমূল্য করিয়া তুলিয়াছে। এই চিত্রনিচয় মধ্যে পালনরপালগণের সময়ে লিখিত এবং নেপাল হইতে সংগৃহীত চতুর্লিখিত পুস্তকের পুস্তিকার প্রতিকৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গ্রন্থপত্রের ক্ষুদ্র আয়তনের হিসাবে দেখিতে গেলে চিত্রগুলিকে সূক্ষ্মসম্পাদিত বলিতে হয়। কিন্তু এই শ্রেণীর সচিত্র গ্রন্থের আয়তন আরও বড় হওয়া উচিত ছিল অস্তুতঃ ডিমাई ৮ পেজি হওয়া উচিত ছিল। তাহা হইলে চিত্রগুলি আরও সূক্ষ্ম হইতে পারিত।

রাখালবাবুর গ্রন্থে যে সূখ বাঙ্গালার ইতিহাসের উপাদানের সংকিশ্ত পরিচয়ই প্রদত্ত হইয়াছে তাহা নহে, তিনি এই গ্রন্থের মান রাখিয়াছেন 'ইতিহাস'। গ্রন্থকার যে আদর্শ লক্ষ্য করিয়া গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, গ্রন্থ কি পরিমাণে সেই আদর্শের অনুরূপ হইয়াছে তাহা নিরূপণ করাই সমালোচকের প্রধান কর্তব্য। যে দিকে গ্রন্থকারের লক্ষ্য ছিল না, সে দিক উপেক্ষা করা স্তায় 'হউক আর অস্তায় হউক, সমালোচনা কালে তাহা লইয়া অজ্ঞযোগ বা "অভিযোগ" করিয়া কোন লাভ নাই। - রাখাল বাবুর গ্রন্থের নাম "বাঙ্গালার ইতিহাস" হইলেও "বাঙ্গালীর ইতিহাসের" অনেক দিকই এই গ্রন্থে উপেক্ষিত হইয়াছে। এষ্ট গ্রন্থে যে ঐতিহাসিক বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে তাহা ধারাবাহিক কথার আকারে নিবদ্ধ হয় নাই; গ্রন্থের ছত্রে ছত্রে প্রমাণের উল্লেখ আছে, পত্রে পত্রে বিচার আছে। এই বিচারে রাখাল বাবু স্থায়পরতার যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার নিজের মত যাহাই হউক, তিনি পরের মতের উল্লেখ করিতে বিশ্বস্ত হইয়ে নাই, এবং পাঠকগণ যাহাতে স্বাধীনভাবে মতগঠন করিতে পারেন, নিরপেক্ষভাবে তদুপযোগী উপকরণ উপস্থিত রাখিয়াছেন।

প্রথম পরিচ্ছেদে প্রাগৈতিহাসিক যুগের কথা আলোচিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে বাঙ্গালাদেশে বা তাহার আশে পাশে পুরাতন প্রস্তর-যুগের, নব্য প্রস্তর-যুগের এবং তাম্রযুগের যে সকল অস্ত্র পাওয়া গিয়াছে রাখালবাবু জীমুক্ত কগিন্ ব্রাউনের এবং জীমুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্তের সাহায্যে তাহার একটা তালিকা প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু যে সকল মাহুষ এই সকল অস্ত্র ব্যবহার

করিত, তাহার কাহার, বিভিন্ন প্রকারের শিলানিশিথ অস্ত্রের স্থিতি-স্থানের স্তরভেদ পর্যালোচনা করিলে পুরাতন প্রস্তরযুগের মানবের কোনও সম্বন্ধের পরিচয় পাওয়া যায় কিনা, অর্থাৎ নবা প্রস্তরযুগের মানবের পুরাতন প্রস্তর-যুগের মানবের বংশধর না আগন্তক,—আবার তাম্রযুগের মানবের নবা প্রস্তর-যুগের মানবের বংশধর না বিদেশাগত, পাঠকের এই সকল বিষয়ের কোড়চল চরিতার্থ করিবার কোন ব্যবস্থাই রাখালবাবু করেন নাই। এই সকল বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া এখনও অসম্ভব। তথাপি বিশেষজ্ঞগণ এই সকল বিষয়ে কি মনে করেন, রাখালবাবু তাহার উল্লেখ করিলে পাঠকগণের এই প্রাচীন পান্যের কথা বুঝিবার সুবিধা হইত।

রাখালবাবুর ইতিহাসের দ্বিতীয় অধ্যায়ের নাম, “বঙ্গালার আদিম অধিবাসী ও আর্গ্যাবৃত্ত”। এই অধ্যায়ের পরিশিষ্টে তিনি লিখিয়াছেন,—“এসিয়াটিক সোসাইটীর সহকারী সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচিত Bengal, Bengalees, Their Manners, Customs and Literature” নামক প্রবন্ধ অবলম্বনে এই প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে। তাই বলিয়া রাখালবাবুর এই পরিচ্ছেদ সম্বন্ধে কোন নায়িত্ব নাই এই কথা স্বীকার করিতে পারি না। ইতিহাসে প্রত্যক্ষ, অমুমান, এবং উপমান এই তিন প্রকার প্রমাণের স্থান আছে, “শব্দ” বা “অনুবাক্য” (হরপ্রসাদ রচিত পুস্তকের বাক্য) রূপ প্রমাণের কোন স্থান নাই।

রাখাল বাবু শাস্ত্রী মহাশয়কে অমৃতসরণ করিয়া বঙ্গালার জাতিতত্ত্ব সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন ১৩১১ সালের অগ্রহায়ণের সাহিত্যে (৬১২—৬২০) পৃঃ আমি তাহার আলোচনা করিয়াছি। স্তূপেরা এখানে তাহার পুনরুল্লেখ নিম্নয়োজন। রাখাল বাবু দশ বৎসর পরিশ্রম করিয়া যে উপদেশ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাহার মধ্যে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের দ্বায় গদ্য-কল্পিত রচনা দেখিয়া বিশেষ চমকিত হইলাম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের উদ্ভট জাতিতত্ত্বের প্রস্তাব তৃতীয় পরিচ্ছেদেও কণকিত লক্ষিত হয়। নন্দ মহাপদ্ম কর্তৃক সাম্রাজ্য স্থাপন সম্বন্ধে রাখালবাবু লিখিয়াছেন, “মগধে শূদ্রবংশের অকৃত্যন, ও আর্গ্যাবৃত্ত পুনর্বার নিঃকৃত্রিয়করণের প্রকৃত অর্পবোধ হয় যে, এই সময়ে বিজিত অনার্যগণ অবসর পাইয়া পুনরায় মন্তকোত্তলন করিয়াছিলেন (২২ পৃঃ)।” মহাপদ্মনন্দের সময়ে কৃত্রিয়-শূদ্র ভেদ অসম্ভব ছিল, কিন্তু আর্গ্যের এবং অনার্যের মধ্যে যে জাতিগত ভেদবোধ এবং বিদ্বেষ ছিল তাহার প্রমাণ কি? পাণিনির মতে আর্গ্যশব্দের অর্থ শাস্ত্রী (প্রকৃত)

এবং বৈজ্ঞ। মহাপদ্মনন্দের সময়ে এই অর্পই বোধ হয় প্রচলিত ছিল। সুতরাং সেই সময় আর্যের এবং অনার্যের জাতিবোধের অবকাশ কোথায়? মহাপদ্মের অভ্যুত্থানকে শূদ্রজাতির (অতএব অনার্যের) জাতীয় অভ্যুত্থান মনে করিবার কোন কারণ নাই। মহাপদ্ম মগধরাজ মহানন্দীর ঔরসে শূদ্রের গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। মহানন্দী শৈবভক্তনাগবংশের শেষ রাজা। পুরাণে শিবনাগবংশীয় নৃপতিগণকে “কুব্জবক্ষুঃ” বা ছীন ক্ষত্রিয় বলা হইয়াছে। স্মৃতি-শাস্ত্র মতে শূদ্রগর্ভজাত মহাপদ্ম অবশ্যই মাতৃজাতীয় অতএব শূদ্র। কিন্তু তাই বলিয়া ক্ষত্রিয় পিতার সিংহাসনে অধিকারী মহাপদ্ম যে পিতার কুলমর্য্যাদার কিছুমাত্র দাবী না করিয়া নিম্নলি শূদ্রজাতির সহিত মিশিয়াছিলেন; তাহার প্রমাণ কি? প্রবাস অহুসারে মৌর্যরাজগণও শূদ্র ছিলেন। “বুভ্রাক্ষস” নাটকে মৌর্যচন্দ্রগুপ্তকে বৃষল বা শূদ্র বলা হইয়াছে। দিব্যাবদানের একটা উপাখ্যানে অশোক বলিতেছেন, “অহং রাজা ক্ষত্রিয়ো মূর্ধাভিমুক্তঃ (৩৭০ পৃঃ)।” সুতরাং মহাপদ্মও হয় ত নিজেই “অহং ক্ষত্রিয়ো মূর্ধাভিমুক্তঃ” মনে করিতেন। মহাপদ্মের অভ্যুত্থানকে মগধের শূদ্রগণের অভ্যুত্থান মনে না করিয়া সমগ্র মগধবাসীর অভ্যুত্থান মনে করাই যুক্তিযুক্ত মনে হয়।

মহাপদ্মের বা তাঁহার উত্তরাধিকারীর সম-সময়ের, পাণ্ডিত্য ভগতে গও-রিডই নামে পরিচিত, বঙ্গালার রাজ্যের কথা লইয়া বঙ্গালার ইতিহাসের সূত্রপাত। এইখান হইতে রাখালবাবুর ইতিহাসেও প্রত্যেক কথার প্রমাণ প্রয়োগ এবং প্রত্যেক মতের বিচার দেখিতে পাওয়া যায়। পাঠকগণ ইচ্ছা করিলে এই সকল মত গ্রহণ করিতে পারেন, কিম্বা নাও করিতে পারেন। রাখালবাবু কোন কোন স্থলে আমার মত গ্রহণ করিয়া আমাকে বিশেষ সম্মানিত করিয়াছেন, আবার কোন কোন স্থলে আমার মতের প্রতিবাদ করিয়াছেন। এইরূপ অধিকাংশ স্থলেই আমি তাঁহার প্রতিবাদের যুক্তিযুক্ততা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। কিন্তু তাই বলিয়া রাখালবাবুর গ্রন্থের সমালোচনা করিতে বসিয়াছি বলিয়াই যে তাঁহার প্রতিবাদের প্রতিবাদ করিতে হইবে তাহা আমি মনে করি না। মতামত বা সিদ্ধান্ত প্রমাণ সকল একত্র গাথিয়া পাঠকের সমক্ষে উপস্থিত করিবার সূত্র মাত্র। আমি যদি আমার মতের অমূলক এবং প্রতিকূল সকল প্রকার প্রমাণ উপস্থিত করিয়া থাকি, তবেই আমার কর্তব্য শেষ হইয়াছে মনে করিতে হইবে। কোন্ মতটি অধিকতর যুক্তিযুক্ত সেই বিচার পাঠকগণ করিবেন। যেখানে মতভেদের অবকাশ আছে সেখানে

বাদ প্রতিবাদ বিফল । কিন্তু রাখালবাবু এই গ্রন্থে স্থানে স্থানে একরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন, যাহা অসমাপ্ত অধ্যায়ী বা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না । “রাখালবার ইতিহাসে” নিবন্ধ এই শ্রেণীর কয়েকটি সিদ্ধান্তের আলোচনা করা আবশ্যক বোধ করি ।

রাখালবাবু সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, বাণভট্ট কথিত গোড়াধিপ এবং ইউয়ান চোয়াং কথিত কর্ণসুবর্ণের অধিপতি শশাঙ্ক “মগধের গুপ্তবংশজাত ছিলেন এবং মহাসেনগুপ্তের পুত্র অথবা ভ্রাতৃপুত্র ছিলেন (৮৩ পৃঃ) ।” এই মতের অল্পকালে তাঁহার একটি যুক্তি, “শশাঙ্কের অপর নাম নরেন্দ্র গুপ্ত । হর্ষচরিতের একখানি পুথিতে নরেন্দ্রগুপ্ত নামের উল্লেখ আছে । এতদ্ব্যতীত হর্ষচরিতের টীকাকার ষষ্ঠ উজ্জ্বাসের টীকায় এই কথা স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন (৮২ পৃঃ) ।” “হর্ষ চরিতের” একখানি পুথিতে শশাঙ্ককে নরেন্দ্র গুপ্ত বলা হইয়াছে, একথা বুলার লিখিয়া গিয়াছেন । তার পূর্বে এবং পরে হর্ষচরিতের অনেক পুথি আবিষ্কৃত হইয়াছে । কিন্তু অত্র কোন পুথিতে নরেন্দ্র গুপ্ত নাম দেখা যায় নাই কেন ? ইহাতে কি মনে হয় না, লিপিকরের প্রমাদ বশতঃ একখানি পুথিতে নরেন্দ্রগুপ্ত নামটি সংযোজিত হইয়াছিল । “ঐনরেঙ্গদিতা” নামাক্রিত, শশাঙ্কের মুদ্রার অঙ্করূপ, একটি সুবর্ণ মুদ্রা শশাঙ্কের একটি মুদ্রার সহিত যশোহর জেলার মফসসদপুরে পাওয়া গিয়াছিল । শ্রীযুক্ত জন এলেন (John Allan) মনে করেন এই “ঐনরেঙ্গদিতা” নামাক্রিত মুদ্রাটি ও শশাঙ্কের মুদ্রা এবং বুলারের পরীক্ষিত “হর্ষচরিতের” পুথির প্রকৃতপাঠ “নরেন্দ্রগুপ্ত” না হইয়া “নরেন্দ্রাদিতা” হইবে । একখানি মাত্র পুথির “নরেন্দ্র গুপ্ত” লইয়া এত বাদ বিতণ্ডা নিম্নয়োজন । “হর্ষ-চরিতের” টীকাকার ষষ্ঠ উজ্জ্বাসের টীকায় কোথাও স্পষ্ট বা অস্পষ্টাকারে গোড়াধিপকে নরেন্দ্রগুপ্ত বলেন নাই । তিনি এইটুকু মাত্র বলিয়াছেন, “শশাঙ্ক নামা গোড়াধিপতিঃ ।” “হর্ষ-চরিতের” ইংরেজী অঙ্কবাদক কাউয়েল এবং টমাস দেখাইয়াছেন, বাণভট্ট একস্থলে স্নেহোপমার ছলে শশাঙ্কের নাম করিয়াছেন । শশাঙ্কের কান্যকুব্জ আক্রমণের সময় গুপ্ত নামক কুলপুত্র কর্তৃক কুশস্থল বা কান্তকুব্জ আবিষ্কৃত হওয়ার কথা আছে বলিয়াই বা শশাঙ্ককে গুপ্তবংশীয় মনে করিতে হইবে কেন ? গুপ্তনামক কুলপুত্র হইয়া শশাঙ্কের একজন সেনানায়ক ছিলেন । সুতরাং শশাঙ্ককে গুপ্তবংশীয় মনে করিবার কোন কারণ নাই ।

* John Allan's Catalogue of the coins of the Gupta Dynasties and of Sasanka, King of Gauda, London, 1904, p. 131v.

পক্ষান্তরে শশাঙ্ককে গুপ্তবংশীয় মনে না করিবার কারণের অভাব নাই। কোনও গুপ্তরাজকে গোড়াধিপ নামে কথিত হইতে দেখা যায় না। কর্ণস্বৰ্ণ যে কোনও কালে গুপ্তবংশের রাজধানী ছিল তাহার কিছুমাত্র প্রমাণ নাই। মগধের কোনও নগর, হয়ত পাটলীপুত্র, স্বরাবর গুপ্তরাজগণের রাজধানী ছিল। শশাঙ্ক আদৌ মহাসামন্ত ছিলেন, পশ্চাৎ মহারাজাদিরাজ হইয়াছিলেন, একথা সকলেই স্বীকার করেন। তিনি যদি গুপ্তবংশীয় মগধবাসী হইতেন, তাহা হইলে গুপ্তবংশের প্রাচীন রাজধানী চাতছাড়া করিয়া কখনও বাঙ্গালার আসিয়া কর্ণস্বৰ্ণে নতুন রাজধানী স্থাপন করিতেন না। মগধে শশাঙ্কের পূর্ণবন্দ্য নামক মৌর্যবংশীয় একজন প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল, একথা ইউগান চোয়াং উল্লেখ করিয়াছেন। শশাঙ্ক মগধের গুপ্তবংশীয় হইলে তাঁহার শক্তির কেন্দ্র কখনও মগধ হইতে তুলিয়া আনিয়া গোড়ে স্থাপন করিতেন না। এই যুক্তির প্রতিবাদে বলা যাইতে পারে, শশাঙ্ক প্রতিদ্বন্দ্বিগণের ভয়ে কর্ণস্বৰ্ণে আসিয়া রাজপাট স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু যিনি কান্তকূজ পর্য্যন্ত অধিকার করিবার উচ্চাভিলাষ ছন্থরে পোষণ করিতেন, তিনি মগধ ছাড়িয়া আরও পূৰ্ব-দিকে সরিয়া আসিবেন কেন? এই সকল কারণে অস্বাভাবিক হয়, কর্ণস্বৰ্ণে যে প্রাচীন সামন্তরাজবংশ ছিল, শশাঙ্ক সেই বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া পরে স্বযোগ বৃত্তিয়া সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠার সচেষ্ট হইয়াছিলেন। রাখালবাবু লিখিয়াছেন, “তাঁহার (প্রভাকর-বর্দ্ধনের) মৃত্যুর পরে, উপযুক্ত অবসর বিবেচনা করিয়া, দক্ষিণে দেবগুপ্ত ও পূর্বে শশাঙ্ক প্রাচীন গুপ্তরাজবংশের অতীত-গৌরব উদ্ধার করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। এতদ্বাতীত গোড়েশ্বর শশাঙ্ক নরেন্দ্র গুপ্তের, হাবীশ্বর-রাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার অপর কোন কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না” (৮৫ পৃঃ)। সমুদ্র গুপ্তের পক্ষে দিগ্বিজয়যাত্রার, ধর্মপালের পক্ষে কাণ্যকূজ বিজয় যাত্রার প্রাচীন বংশগৌরব উদ্ধার করা ভিন্ন যদি অন্য কারণ থাকিয়া থাকে, তবে শশাঙ্কের পক্ষে অন্তরূপ কারণ থাকা অসম্ভব বিবেচিত হইবে কেন, তাহা বৃত্তিতে পাওয়া যায় না। স্বর্গীয় ডাক্তার ব্রক ১৯০৮-৯ খালের আর্কিওলজিকেল বিভাগের দার্ষিক কার্য-বিবরণীতে প্রকাশিত “বোধগয়া” নামক প্রবন্ধে মগধের তৎকালীন ইতিবৃত্ত-সম্বন্ধে এবং শশাঙ্ক কর্তৃক বোধিবৃক্ষ ধ্বংস সম্বন্ধে যে সারণ্য মন্তব্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, রাখালবাবু তাহা লক্ষ্য করেন নাই। ডাক্তার ব্রক লিখিয়াছেন, শশাঙ্কের বোধিবৃক্ষনাশের চেষ্টা বৌদ্ধবিশেষমূলক নহে, পূর্ণ বন্দ্যার সহিত বিরোধমূলক (১৪১ পৃঃ)।

গৌড়াধিপতি ধর্মপাল বঙ্গচন্দ্রনীর সর্বশ্রেষ্ঠ সম্ভান । পূর্বে বা পরে আর কখনও বাঙ্গালাদেশে এতবড় লোক প্রাচুর্য হইয়াছেন বলিয়া মনে হয় না । রাখাল বাবু তাঁহার ইতিহাসের সপ্তম পরিচ্ছেদে ধর্মপালের সময় লইয়া সুদীর্ঘ বিচার করিয়াছেন, কিন্তু রাজা ধর্মপালের ইতিহাসের যাহা প্রধান কথা এবং পালযুগের বাঙ্গালার ইতিহাসের যাহা প্রধান কথা, তাহার উল্লেখ করিতে বিন্দুত হইয়াছেন । ধর্মপালের খালিমপুরের প্রাপ্ত তাম্রশাসনে প্রশস্তিকার লিখিয়াছেন—

“সীমান্তদেশে গোপগণ কর্তৃক, বনে বনচরগণ কর্তৃক, গ্রহিসমীপে জনসাধারণ কর্তৃক, [গৃহ] চক্রে ক্রীড়াশীল শিশুগণ কর্তৃক, প্রত্যেক ক্রয় বিক্রয় স্থানে বণিক সমূহ (৩) কর্তৃক এবং বিলাসগৃহে পিঞ্জরহিত শুকগণ কর্তৃক গীতমান আশ্রয় প্রদান করিয়া, [এই নরপতির] বদনমণ্ডল লজ্জাবশে নিয়ত ঈষৎ বক্রভাবে বিনম্র হইয়াছে (গোড়লেখমালা, ২২ পৃঃ) ।”

প্রশস্তিকারের এই স্তুতিবাক্য অক্ষরে অক্ষরে সত্য না হউক ইহার মধ্যে ধর্মপালের শাসননীতির মূল সূত্র স্বন্দর প্রকটিত হইয়াছে। সেই মূল সূত্র প্রজারঞ্জন । দেব পালের যুগেরে প্রাপ্ত তাম্রশাসনের আর একটি শ্লোকে ধর্মপাল প্রবর্তিত পালশাসন-নীতির মূলসূত্র কথিত হইয়াছে ; যথা—

“যে রাজা শাস্ত্রার্থের অতীবলী শাসন-কোশল [শাস্ত্রশাসন চাইতে] বিচলিত [ভ্রাক্ষাদি] বর্ণসমূহকে স্ব স্ব [শাস্ত্রনির্দিষ্ট] ধর্মে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছিলেন, ধর্মপাল নামক সেই রাজাকে পুরস্কৃতি লাভ করিয়া, গোপালদেব পরলোকগত শিশুপুরুষগণের অগজাল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন (গোড়লেখমালা, ৪২ পৃঃ) ।”

এই শ্লোকে দেখা যায়, ধর্মপালাদি নরপালগণ বৌদ্ধ হইলেও এখনকার ভাষায় যাহাকে “অহিন্দু” বলে, তাহা ছিলেন না । তাঁহারা বর্ণাশ্রম-ধর্ম প্রতিপালন করিতেন, এবং বর্ণাশ্রম প্রতিপাদক শাস্ত্রানুসারে রাজ্যশাসন করিতেন ।

রাষ্ট্রকূট-রাজ তৃতীয় গোবিন্দ ৮১৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং ধর্মপাল তাঁহার ২১২ বৎসর পূর্বে শিশুসিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন “গোড়রাজ-মালায় (২৩ পৃঃ)” এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলাম । রাখালবাবু এই মতের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন (১৬২ পৃঃ) । এ ক্ষেত্রে, অর্থাৎ ৮২৭ খ্রীষ্টাব্দকে তৃতীয় গোবিন্দের মৃত্যুকাল এবং তৎপূর্ব্ব প্রথম অমোঘবর্ষের রাজ্যারম্ভ কাল ধরিয়া লইয়া ভুল করিয়াছি । এই ভুলের কারণ প্রথম অমোঘবর্ষের

সিরারে প্রাপ্ত তাম্রশাসন সম্বন্ধে ডাক্তার ফিল্টের মত লক্ষ্য করিয়াছিলাম না। এই লিপি অমোঘবর্ষের রাজত্বের দ্বিপঞ্চাশৎ বৎসরে, (ফিল্টের গণনা অনুসারে ৮৬৬ খৃষ্টাব্দের ১৬ই জুন) সম্পাদিত হইয়াছিল। সুতরাং ফিল্ট মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে এই লিপির কালাভ্রুসারে স্থিলাব করিলে ৮১৪ বা ৮১৫ খৃষ্টাব্দে প্রথম অমোঘবর্ষের রাজ্যারম্ভ স্থির করিতে হয় (*Epigraphia Indica*, vol. vii, p. 201)। প্রথম অমোঘবর্ষের একখানি তাম্রশাসনে যখন কথিত হইয়াছে ধর্মপাল এবং চক্রাযুগ তৃতীয় গোপবিক্রম নিকট “উপনত” হইয়াছিলেন, তখন মনে করিতে হইবে, তাহার পূর্বে ধর্মপাল কর্তৃক কাঞ্চকুন্ডের সিংহাসন হইতে ইন্দ্রাযুগের বিচ্যুতি ও চক্রাযুগের প্রতিষ্ঠা ঘটিয়াছিল। সুতরাং ধর্মপালের রাজ্যারম্ভকাল ৮১৪ খৃষ্টাব্দেরও কয়েক বৎসর পূর্বে পিছাইয়া নিতে হইবে। কিন্তু তাই বলিয়া ৮২৫ খৃষ্টাব্দে ধর্মপালের মৃত্যু এবং ৮২৫ হইতে ৮৬৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দেবপালের রাজত্ব স্বীকার করা অসম্ভব। তাহার পরাধীন স্তম্বলিপি ৮৬১ খৃষ্টাব্দে সম্পাদিত হইয়াছিল সেই রাষ্ট্রকূট রাজ পরবলকে সকলেই দেবপালের মাতামহ বলিয়া স্বীকার করেন। মাতামহ জীবমানে নৌহিত্রের ৮২৫ হইতে ৮৬১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অর্থাৎ ৩৭ বৎসরকাল রাজত্ব অহুমান করা অসম্ভব, কেন না সচরাচর এরূপ দেখা যায় না। দেবপালের পিতা ধর্মপাল অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিলেন এরূপ কোন প্রমাণ থাকিলে না হয় রাখালবাবুর সিদ্ধান্ত স্বীকার করিতে পারিতাম। কিন্তু ধর্মপাল যে অন্ততঃ ৩২ বৎসর কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন খালিমপুরের তাম্রশাসনই তাহার প্রমাণ। সুতরাং দেবপাল ৮২৫ খৃষ্টাব্দে পিতৃ-সিংহাসনে আরোহণ করিয়া মাতামহ পরবলের সঙ্গে সঙ্গে ৮৬১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়া ৮৬৫ খৃষ্টাব্দে বার্ককে পরলোক গমন করিয়াছিলেন, এ কথা অহুমান করা সুকঠিন। প্রত্যক্ষ প্রমাণ অর্থাৎ সমসাময়িক লিপির সাধ্যা ভিন্ন এইরূপ একটা অসাধারণ ঘটনা বিশ্বাস করা যাইতে পারে না। সুতরাং যতদিন না এই প্রকার কোন লিপি পাওয়া যায়, ততদিন আমরা অহুমান করিতে বাধ্য, ধর্মপাল তাহার মৃত্যুর পরবলের সমসময় অর্থাৎ ৮৬১ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি সময় পর্য্যন্ত গোড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ধর্মপাল জীবিত থাকিতে প্রতিজারাজ কাঞ্চকুন্ড অধিকার করিতে পারিয়াছিলেন, একথা রাখালবাবু স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন বলিয়াই বোধ হয় ৮২৫ খৃষ্টাব্দে ধর্মপালের মৃত্যু কল্পনা করিয়াছেন। কিন্তু ধর্মপাল জীবনের শেষভাগে ও মৃত্যুকাল পর্য্যন্তও, যে প্রবল শত্রুর সহিত

বিরোধে ব্যাপ্ত ছিলেন, নারায়ণ পালের তান্ত্রশাসনের একটি শ্লোকে তাহা কথিত হইয়াছে । * যথা—

“তন্মাত্রেপেক্ষচরিতৈ তর্জগতীং পুনানঃ

পুত্রো বহুব বিজগী জয়পালনামা ।

* ধর্মদ্বিষাঃ শময়িতা গুণি দেবপাল

“যঃ পুত্রংজৈঃ ভুবনরাজা-স্বখাচ্ছান্নবীং ৷”

এখানে শ্লোচপদমা আছে । জয়পাল সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—উপেক্ষ [বিষ্ণু] যেমন অশুরবর্গের দমনকারী [ধর্মদ্বিষাঃ শময়িতা] এবং যুদ্ধে (অশুরগণকে পরাভূত করিয়া) অগ্রজ দেবরাজ দেবপাল ইন্দ্রকে ত্রিভুবনের রাজ্যস্বত্ব ভোগ করাইয়াছিলেন, জয়পালও তেমনই ধর্মদ্বিষিগণকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়া অগ্রজ দেবপালকে ভুবন রাজ্যস্বত্বের অধিকারী করিয়া দিয়াছিলেন । “গোড়-লেখমালায়” এই শ্লোকের বঙ্গানুবাদের টীকায় (৬৬ পৃঃ) শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় লিখিয়াছিলেন, “জয়পাল-পক্ষে কাহারো ‘ধর্মদ্বিষী’ বলিয়া সূচিত হইয়াছে, তাহা অত্যাধি নির্ণীত হইতে পারে নাই ।” তিনি এখন বলেন জয়পাল পক্ষে “ধর্মদ্বিষী” অর্থ ধর্মপালের শত্রুগণ । ধর্মপাল জীবিত থাকিতেই জয়পাল ধর্মপালের শত্রুগণের সহিত যুদ্ধে ব্যাপ্ত ছিলেন, এবং ধর্মপালের মৃত্যুর পর সেই শত্রুগণকে পরাভূত করিয়া তিনি দেবপালের রাজ্য নিষ্কটক করিয়াছিলেন । জয়পাল-পক্ষে “ধর্মদ্বিষাঃ শময়িতা” বিশেষণের এই অর্থই যে সমীচীন সেই বিষয়ে আর কোনও সন্দেহ হইতে পারে না । এখন জিজ্ঞাস্য, ধর্মপালের এই শত্রুগণ কাহারো, যাহাদিগকে পরাভূত না করিতে পারিলে, ধর্মপালের উত্তরাধিকারীর রাজ্যস্বত্ব ভোগই ঘটিত না ? এই প্রশ্নের একই মাত্র উত্তর সম্ভবে । সেই উত্তর এই—ধর্মপাল শেষ বয়সে গুর্জর-প্রতীহার-রাজ মিহিরভোজের সঙ্গে যোগদান যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন । এই যুদ্ধের উপক্রমেই হয় ত মিহিরভোজ কাণকুজ অধিকার করিয়াছিলেন । তখন প্রতীহার-রাজের গতিরোধ করিবার জন্ত জয়পাল নিযুক্ত হইয়াছিলেন । ১২০৮ সালে সায়নাথ খনন কালে আবিষ্কৃত একখানি শিলালিপি পাঠে অবগত হওয়া যায়, জয়পাল এক সময়ে পাল-প্রতীহার রাজ্যের সীমান্তে, বারাগসীতে, অবস্থান করিয়াছিলেন । এই লিপিকথানিয় সুগন্ধে রাখালবাবু কোন কথাই বলেন নাই । সুতরাং আর্কিয়োলজিকেল বিভাগের ১২০৭-৮

সালের বার্ষিক কার্যবিবরণী হইতে স্থান অনু মার্চেল ও ডাক্তার টেন কনোক্ত পাঠ (৭৫ পৃঃ) প্রদান করিতেছি—

“বিশ্বপালঃ ॥”

দশ চৈত্যাংগ যৎপুণ্যং কারত্বিভার্জিতং ময়া (১)

সৰ্বলোকে ভবেত্তেন সৰ্বজ্ঞঃ করুণাময়ঃ ॥

ঐজয়পাল * * * এতাহুজিহ্বা কারিতমমৃত পালে [ন]”

“বিশ্বপাল ॥ আমি দশটি চৈত্যা নির্মাণ করাইয়া যে পুণ্য উপার্জন করিয়াছি তাহার ফলে সকল লোক সৰ্বজ্ঞ এবং করুণাময় হউক । ঐজয়পাল এই চৈত্যা উদ্দেশ্য করিয়া অমৃতপালের দ্বারা.....করাইয়াছেন ।”

মার্চেল ও টেনকনো অন্তিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, এই লিপির অক্ষর খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দের অক্ষরের মত, এবং এই জয়পাল সম্ভবতঃ পালরাজবংশীয় জয়পাল । এই অনুমান সত্য্য হইলে, মনে করিতে হইবে, জয়পাল ধর্মপালের (পরে দেবপালের) *পরগণকে বাধা দিবার জন্য বারাগনীতে প্রেরিত হইয়াছিলেন ; এবং সেইখানে অবস্থানকালে, সারনাথে দশটি চৈত্যা এবং লিপিতে কথিত আরও একটা কিছু (যাহার নাম লিপিতে পড়া যায় না তাহা) অমৃতপালের দ্বারা নির্মাণ করাইয়াছিলেন । কাছকুজ যখন প্রতীহার-রাজ ভোজের হস্তগত হইয়াছিল, তখনই অবশ্য সীমান্ত রক্ষার জন্য বারাগনীতে বিশেষ বন্দোবস্ত করিবার প্রয়োজন হইয়াছিল । ধর্মপালের সময়েই কাছকুজ প্রতীহার-রাজ ভোজের হস্তগত হইয়াছিল । আমাদের হাতে যে কিছু প্রমাণ আছে, তাহার বলে অল্প কোনরূপ অনুমান করা যাইতে পারে না । ধর্মপালের রাজত্ব মোটামুটি ৮০৫ হইতে ৮৬০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দূরা যাইতে পারে ।

ধর্মপালের সময়ে গৌড়, রাষ্ট্রকূট, এবং গুজর-প্রতীহার এই তিনটি মহাশক্তির মধ্যে যে বন্দ চলিতেছিল রাখালবাবু তাহার রহস্য উদ্ঘাটন করিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না । রাজপুতানার মাড়োয়ারের অন্তর্গত তিনমল (তিলমল) নগর গুজর-প্রতীহার রাজ্যের আদিম রাজধানী ছিল । দক্ষিণাত্যের মতারাষ্ট্র দেশ রাষ্ট্রকূট রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল । গুজর রাজ্য এবং রাষ্ট্রকূট রাজ্য এতদ্ভূয়ের মধ্যে লাট ও মালব দেশ অবস্থিত ছিল । লাট এখন গুজরাট নামে পরিচিত । তৎকালে রাজপুতানাকে গুজর বলিত । ৭৮৩ খৃষ্টাব্দে

* নোথ হয় কোম দেবতার নাম । ঐদ্রুত অক্ষরকুমার যন্ত্রের মহাপ্রণয় মনে করেন “বিশ্বপাল” কেবলপাল নামক দেবতাকে বুঝাইতে পারে ।

বঙ্গরাজ গুর্জরেন অধীশ্বর ছিলেন, ধুবরাজ রাষ্ট্রকূটরাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন এবং ইন্দ্রাশুধ কাঞ্চকুন্ডের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন । গুর্জরপতি বঙ্গরাজ গোড়বঙ্গ আক্রমণ করিয়া গোড়পতির এবং বঙ্গপতির রাজছত্রদ্বয় কাড়িয়া লইয়াছিলেন । ভিনসেণ্ট শিখ অচ্যুমান করেন, এ সময় পালকুলের প্রতিষ্ঠাতা গোপালদেব গোড়ের অধীশ্বর এবং বঙ্গের অধিরাজ । বঙ্গরাজ্যের এই দিগ্বিভূত ব্যাপারে রাষ্ট্রকূটপতি ধুবরাজ ৭৭৫ চইতে ৭৯৩ খৃঃ) ব্যস্ত হইয়া উঠেন এবং অতুল পরাক্রম সেনাবলের সাহায্যে বঙ্গরাজ্যকে অচিরাতঃ চর্গম করুনমধ্যে আশ্রয় লইতে বাধ্য করেন । প্রশান্তিকারের এই উক্তি অমূলক না হইলেও ধুবরাজ যে গুর্জররাজ বঙ্গরাজ্যকে একেবারে দমন করিতে পারিয়াছিলেন, এমন মনে হয় না । ধুবরাজের উত্তরাধিকারী তৃতীয় গোবিন্দ (রাজত্ব ৭৯৫ চইতে ৮১৫ খৃষ্টাব্দ) গুর্জরপতির গতিরোধ করিবার জন্ত কনিষ্ঠ ভ্রাতা ইন্দ্ররাজকে লাট দেশের বর্ধমান গুজরাটের) মহাসামন্তের পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন । জেজের পুত্র ককরাজ নাগাবল্লোক নামক নৃপতিকে পরাজুত করিয়া, তাঁহার রাজ্য বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন । ককরাজের পুত্র পরবলের সময়ে, ৮৬৯ খৃষ্টাব্দে, পথারী তত্ত্বলিপি সম্পাদিত হইয়াছিল । ১১১১ সালের ইতিহাস এটিকোয়েরী পত্রে প্রকাশিত (১০৯—২৪০ পৃঃ) একটি প্রবন্ধে ক্রীযুত দেবদত্ত রামকৃষ্ণ 'ভাণ্ডারকার মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, জেজের এই অগৃহীতনামা লাটবিজয়ী অগজ ইন্দ্ররাজ ; এবং জেজের পুত্র ককরাজ যে নাগাবল্লোককে পরাজুত করিয়াছিলেন তিনি গুর্জর-প্রতীহাররাজ দ্বিতীয় নাগভট (বা নাগভট্ট) । দ্বিতীয় নাগভট্ট যে নাগাবল্লোক নামেও পরিচিত ছিলেন, তাঁহার সম্ভাবজনক প্রমাণ আছে । রাখালবাবু ভাণ্ডারকারের এই প্রবন্ধের উল্লেখমাত্রও করেন নাই । আমার নিকট ভাণ্ডারকারের সিদ্ধান্ত গুক্তিস্বস্ত বলিয়াই বোধ হয় । তৃতীয় গোবিন্দ গুর্জরপতির গতিরোধ করিবার জন্ত এক ভ্রাতা ইন্দ্ররাজকে লাট দেশে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন এবং আর এক ভ্রাতা জেজকে মালবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন । পথারী প্রাচীন মালবের সীমার মধ্যে অবস্থিত । পরবলের পিতা ককরাজ তৃতীয় গোবিন্দের সাক্ষ্য করিতে গিয়াই সম্ভবতঃ নাগাবল্লোক বা দ্বিতীয় নাগভট্টকে পরাজুত করিয়াছিলেন । দ্বিতীয় নাগভট্ট যখন রাষ্ট্রকূটরাজ্যের সহিত বিরোধে ব্যাপ্ত সেই সুযোগে ধর্মপাল চক্রাধ্বকে কাঞ্চকুন্ডের সিংহাসনে স্থাপন করিয়া উত্তরা-পথে দ্রাব্য প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন । রাষ্ট্রকূটের বঙ্গের প্রশান্তিকারগণ

তৃতীয় গোবিন্দ কর্তৃক গুর্জরপতি দ্বিতীয় নাগভটের পরাজয় সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা অনেকটা বিশ্বাসযোগ্য । কিন্তু তাঁহার তৃতীয় গোবিন্দের উত্তরাধিকার অভিযান সম্বন্ধে আর যাহা লিখিয়াছেন তাহা অতিশয়োক্তি পরিপূর্ণ । যথা—

(১) রাষ্ট্রকূট মহাসামন্ত কর্কে'র বরোদায় প্রাপ্ত তাম্রশাসনে তৃতীয় গোবিন্দ সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে, তিনি গঙ্গা এবং যমুনানদী জয় করিয়া, এই দুই নদীর চিল ধারণ করিয়াছিলেন । (Indian Antiquary, XII, p. 159)

(২) প্রথম অম্মদাবর্গের নিলগুণ্ডে প্রাপ্ত তাম্রশাসনে কথিত হইয়াছে, তিনি কেরলের, মালবের, গোড়ের, গুর্জরের, চিত্রকূট নামক গিরিভূর্গের অধিবাসিগণকে এবং কাঞ্চীর অগ্নিপতিগণকে বদ্ধ করিয়া কীর্তি নারায়ণ নামে পরিচিত হইয়াছিলেন (Epigraphia Indica, Vol. VI, pp. 102-103) ।

(৩) প্রথম অম্মদাবর্গের একখানি অপ্রকাশিত তাম্রশাসনে উক্ত হইয়াছে, গোবিন্দের অধগণ তিমালয় পর্বতের নিবাসীদের জয়লাভ করিয়াছিল এবং ধর্ম (পাল) এবং চক্রবর্ত্ত স্বয়ং তাঁহার নিকট নতশির হইয়াছিলেন (রাণালবাবুর “বাঙ্গালার ইতিহাস,” ১৩৩ পৃঃ, ৬৭ নং টীকা) ।

গোড়বাসিগণকে বদ্ধ করার কথায় সহিত গোড়াধিপ ধর্মপালের তৃতীয় গোবিন্দের নিকট বেচ্ছায় নতশির হওয়ার কথায় নিতান্ত বিরোধ লক্ষিত হইবে । তৃতীয় গোবিন্দ যদি গোড়াগণকে বদ্ধ অর্থাৎ পদানত করিয়া থাকেন, তবে ত গোড়াধিপ সেই সঙ্গে সঙ্গেই বদ্ধ হইয়াছিলেন; তাঁহার স্বয়ং উপনত হইবার অবকাশ ছিল না । প্রতীহার বংশের লিপিনিচয় পাঠে জানা যায় তৃতীয় গোবিন্দের আক্রমণের ফলে গুর্জর প্রতীহার রাজা ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিল না, বরং ক্রমশঃ উন্নতিলাভ করিয়াছিল । রাষ্ট্রকূট প্রশস্তিকারগণ যেমন তৃতীয় গোবিন্দের পক্ষে গুর্জর এবং গঙ্গাযমুনার তীরবর্ত্তী প্রদেশ জয় করিবার দাবী করিয়াছেন, মিহিরভোজের গোয়ালিয়রে প্রাপ্ত শিলালিপিতে প্রতীহার বংশের প্রশস্তিকারও দ্বিতীয় নাগভটের পক্ষে অনর্থ (লাট—বর্ত্তমান গুজরাত) মালব, তুরক, বংশ মংশ, প্রভৃতির দেশের রাজগণের গিরিভূর্গ অধিকার করিবার দাবী করিয়াছেন । পাল, প্রতীহার, এবং রাষ্ট্রকূট এই তিনপক্ষের প্রশস্তিকারগণের স্তুতিবাক্যের সমন্বয় করিতে গেলে, এই ইতিহাস পাওয়া যায়,—রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দ গুর্জর-প্রতীহার-রাজ নাগভটকে পরাজিত করিয়া লাট এবং মালব হস্তগত রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন । রাষ্ট্রকূট-রাজও যেমন গুর্জর-প্রতীহার-রাজের শত্রু ছিলেন, গোড়াধিপ ধর্মপালও তেমনি

গুর্জরপ্রতীহার-রাজকে দমন করিবার জন্য পরম্পরের সহিত সন্ধিহুত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। এই সন্ধির ফলেই সম্মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে দ্বিতীয় নাগভটের পুত্র ও উত্তরাধিকারী রামভদ্র বিশেষ কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই। পালও রাষ্ট্রকূটের এই সন্ধির অত্যন্তম ফল সুস্বভাবতঃ ধর্মপাল কর্তৃক রাষ্ট্রকূট পরবলের ভূতিতা রক্ষাদেবীর পাণিগ্রহণ। পাল-রাষ্ট্রকূটের এই সখা যে প্রথম অমোঘবর্ষের সময় পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল তাহারও প্রমাণ আছে। প্রথম অমোঘবর্ষের শিজেয় প্রাপ্ত লিপিতে কথিত হইয়াছে,—

“বঙ্গদ্রমগধুমালববেদিশৈরর্জিতাতিশয়ধবলঃ ।”

“অতিশয় ধবল” প্রথম অমোঘবর্ষের নানান্তর। মালবপতি এখানে রাষ্ট্রকূট পরবলকেই বলা হইয়াছে। পরবল অবশ্যই রাষ্ট্রকূট অধিরাজ অমোঘবর্ষকে অর্চনা করিতেন। কিন্তু বঙ্গদ্রমগধপতি অর্থাৎ গোড়পতি সন্ধিতে “অর্চনার” অর্থ “সখা” মাত্র বুঝিতে হইবে।

ধর্মপাল এবং তাঁহার কাল সর্বদা এই স্বদীর্ঘ আলোচন্য করিয়া আমরা যে ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত উদ্ধার করিতে সক্ষম হইলাম তাহার সার কথা এই—আহমানিক ৮০৫ খৃষ্টাব্দে ধর্মপাল পিতৃসিংহাসন লাভ করিয়া, উত্তরাপণের সার্বভৌম পদলাভের জন্য, কানাকুজ আক্রমণ করিয়াছিলেন; এবং কানাকুজপতি ইন্দ্রায়ুধকে পরাজিত করিয়া, ভোজ মন্ত্র-কুর-যজ্ঞ-যবন-অবন্তী গান্ধার কীর প্রভৃতি দেশের সামন্ত শ্রেণীর নরপালগণের সম্মতি অহুসারে, অহুগত চক্রায়ুধকে কানাকুজের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। ইহার ফলে গুর্জর প্রতীহার-রাজ দ্বিতীয় নাগভটের সহিত ধর্মপালের এবং তাঁহার অহুগত চক্রায়ুধের বিরোধ উপস্থিত হয়। প্রতীহার রাজের প্রশস্তিকার মতে এই বিরোধে দ্বিতীয় নাগভট জয়লাভ করেন। ভিনদেশে শিপের মতে দ্বিতীয় নাগভট হয়ত কানাকুজ ও অধিকার করিয়াছিলেন। এই শেষোক্ত সিদ্ধান্ত যে অসমীচীন তাহা “গোড়রাজমালায়” প্রদর্শিত হইয়াছে (২৬-২৭ পৃঃ)। আর একদিকে লাট এবং মালব লইয়া প্রতীহার রাজ দ্বিতীয় নাগভটের সহিত রাষ্ট্রকূট-রাজ তৃতীয় গোবিন্দের বিরোধ উপস্থিত হয়। তৃতীয় গোবিন্দ তাহা ইন্দ্ররাজকে লাটে এবং লেকজকে মালবে প্রতিষ্ঠিত করেন। তখন প্রতীহার রাজের সহিত বিরোধে ব্যাপ্ত ধর্মপাল তৃতীয় গোবিন্দের সহিত এই সখ্যার দ্বারা কালক্রমে পরবলের ভূতিতা রক্ষাদেবীর পাণিগ্রহণ করেন। আহমানিক ৮৪০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ধর্মপাল একরূপ নিরীক্ষরোধে সার্বভৌম পদ উপভোগ করিয়াছিলেন। তৎপর দ্বিতীয়

নাগভটের পৌত্র মিহির-ভোজ গুর্জর সিংহাসন লাভ করিয়া গোড়াধিপের সহিত বিরোধে প্রবৃত্ত হইলেন এবং অল্পকালের মধ্যেই কাঞ্চকুস্ত্র আধিকারে সমর্গ হইলেন। ধর্মপাল ভগ্নম মিহির-ভোজের গতিরোধ করিবার জন্য অন্যতম পুত্র জয়পালকে বায়ণসীতে প্রেরণ করেন। কানাকুস্ত্রে প্রতিষ্ঠিত প্রতীহার রাজের সহিত বিরোধের অবসানের পূর্বেই উত্তরাপথের শেখ সার্কভৌম নরপাল, বসুমাতার শ্রেষ্ঠ সন্তান, মহারাজাধিরাজ পরম ভট্টারক পুরস্কেশ্বর ধর্মপালে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ

মেঘের প্রতি

ওগো বরষার নীল নব ঘন

দুর্দিশস্ত চারী

ধরণীর ধ্যান ধারণার ধর্ম—

নিখিল চিন্তা হারী

স্বিষ্ট শ্রামল মূর্তি ধরিয়া

এসগো গগন ছেয়ে

অতপ-তাপিত এ ধরণী* দেখ

আছে তব পথ চেরে ।

কুনাও মস্ত্রে আশ্বাস বাণী—

যাবে গো দুঃসময়,

এত তপস্তা বিখে কখন

বার্থ নাহিক হয় ।

শান্তি-সলিল ধারায় ধরার

সস্তাপ যাক্ ডাসি,

ছুটিয়া উঠুক অধরে আবার •

স্বথ সোহাগের হাসি ।

২

ওগো মেঘ, এই পরণীর মত
 যাচার জন্ম তলে,
 চিরদিন শুধু . . . তৃপ্তি-বিচীন
 তাঁর তিগ্রাষা মলে,
 কোথা আছে চির ব্যক্তি তাঁর—
 সন্ধান নাহি জানে ।
 চির প্রতীক্ষা লইয়া বকে
 চাহি' সুদূরের পানে
 হেথা দুলিতলে বিরহ-শয়নে
 আছে নিশিদিন জাগি,
 ওহে দূরগত, আশার ব্যস্ততা
 এনেছ কি তার লাগি' ?
 কোন্ বরষার বরষণে তার
 জুড়াবে তাপিত প্রাণ,
 চির জন্মের ব্যাকুল বিরহ
 কবে হবে অবসান !

শ্রীরমণীমোহন ঘোষ

উল্কা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

৬

সে দিন বাড়ী ফিরিয়া অবশিষ্ট গীতাপাঠ, পূজা, জপ, ও হস্ত তত্ত্বানুসন্ধান-
 সকল পূর্ণ বেগে আরম্ভ করিয়া দিলাম । আমি দেবদেবীর বড় ভক্ত ছিলাম
 না । আসল কথা মূর্তি পূজারূপ প্রথমাবলম্বন আমার জ্ঞান নয় । শিক্ষানবিশী
 কাল আমার বিগত জন্মের সহিত গত হইয়া গিয়াছে, এ বিষয়ে আমার আদৌ
 সন্দেহ ছিল না ; কিন্তু আজকাল স্ত্রী-দেবতার পূজা করিতে ভাল লাগিত ।
 দেবীর মুখের পানে চাহিতে গিয়া দেখি—সেই লক্ষ্মী-মোহেটিরই মুখ । বড়

বিপদেই পড়িয়া গেলাম । শেষে চঠাং একদিন মনে চইল যে, সে বোধ হয় কোন মানবী নয়—মানবী-রূপিনী অবিদ্যার বিকার । যেমন-জগৎ-প্রপঞ্চ মায়ার বিকার, বস্তুত এই জগতের যথার্থ কোন সত্তা নাই, তেমনি আলৌকিক লাবণ্যবতী লক্ষ্মীর বস্তুতঃ কোন সত্তা নাই, সে কোন মায়ারূপিনী ছায়া মাত্র ।

কিন্তু ভায়রে নাহুয়ের মোহভরা মন ! • মায়ার বিকার শুনিয়া সে শিচরিত্তা সরিয়া পলায়ন না করিয়া, বরং ভুই বাস্ত গেলিয়া সেই যুগত্বিকার দিকে ছুটিতেই চায় ।

একদিন চঠাং শৈলেন খণ্ড করিয়া জিজ্ঞাসা করিল “তোমার ‘কি মন্তু ?’ আমি চকিত হইয়া উঠিলাম “কট, কি হয়েছে ?”

“না সত্যি, কেনে কেনে । আরত সঙ্গ শরীরের অদ্যুত কার্যকলাপ সংক্ষেপে আলোচনাই কর না । যদি মনে কোন নূতন ভাব জেগে থাকে, আমার কেন লুকোও, খুলেই বল না ভাট ?”

আমি হাসিবার চেষ্টা করিয়া উত্তর দিলাম “আমার মন সেই পুরাণকেলে আদিম যুগের মতই আছে ; নূতনত্বের দার দিয়েও সে চলে না । সে জন্ত তুমি কিছু ভেব না ভাই ।”

শৈল গেন আমার কথাওলা বিশ্বাস করিল না । সে আমার মুখের দিকে চাহিয়া একটু হাসিল । আমি সে হাসি দেখিলাম, কিন্তু কিছু জিজ্ঞাসা করিলাম না ।—কেন, কি জানে ঈশং লজ্জা বোধ চইল । এ আবার কি নূতন বালাই ! লজ্জার কি কাজ করিয়াছি যে, কাহারও কাছে লজ্জিত হইব । দোষীই ত লজ্জা পায় জানি ; আমি ত কাহারও কাছে কোন দোষে দোষীই নই ।

এমন সময় ভড়িতা হাসিয়া সহাস্য মুখে জিজ্ঞাসা করিলেন “তোমাদের গল্পের মতো আমার একটু স্থান হইবে ? কিন্তু দোহাই তোমাদের, যদি আপাততঃ তোমরা ‘ম্যাটার’ ‘ফোর্স’ ‘হিট’ অথবা ‘স্পিরিট’ ইত্যাদি অবোধা কঠোর বিষয় সকলের আলোচনায় বাস্ত থাক,—তবে আমার কাজ নাই ।”

শৈলেন স্ত্রীর দিকে অতি কোমল সপ্রেম চক্ষে চাহিয়া মুহূ হাস্য করিয়া তাহাকে কাছে ডাকিল ; বলিল “না, না, যাবে কেন, এস । তোমার স্থান কোথায় নাই ভড়িৎ ? আমার সর্বত্রই ত তুমি ভরিয়া আছ ।”

কথাটা কি প্রকৃত ? শৈলেনের উচ্চারণভঙ্গি ও কণ্ঠস্বরে সে বিষয়ে একতিলও সন্দেহ মনের কোণে কে স্থান দিতে পারে ? কিন্তু আনার কাণে আবার কেমন সঙ্গী সেই সাগ্রহে অতিব্যক্তি বাজিয়া উঠিল—

“আমি তোমায় সেই প্রথম দিন হইতেই ভালবাসিয়াছি..... ।”

মুখ চইতে একটু বাজের বা অবিবাদের হাসি ফুটিয়া থাকিবে, কারণ আমার মুখের দিকে চাহিয়াই শৈল ও তৎক্ষণাৎ হাসিয়া বলিল “কেন মহু, কি এমন অজায় বলিলাম ? আচ্ছা, ইলেকট্রিসিটির সর্বব্যাপকত্ব জানিতে ত ?”

বোধ হয় তাহার ঐ উচ্চারিত “ইলেকট্রিসিটির” নামটা শুনিতে পাইয়াই তাহার স্ত্রী ভয় পাটয়া গিয়াছিলেন, কেন না তিনি যে রীতিমত একটু বাজ চইয়া উঠিয়াছেন, সেটুকু ঠিক তাহার সেট মূর্খের উচ্চারিত কণ্ঠস্বরেরই বৃত্তিতে পারা গেল। আচ্ছা বেচারী বজবজ ! তাহারই তোমায় বিদেশী মাজনে মাজিয়া তুলিতে চেষ্টা করুক, তথাপি তোমার চিরভাষ্য ধর্ম তুমি ত্যাগ করিবে কেমন করিয়া ? শিক্ষা, সংসর্গ যেটুকু পায়, সেই টুকুই তুমি গ্রাভ করিয়াছ ! —এই যেমন পাউডার রক্ত মাখা, একটুখানি টানা হুয়ে কথা কহা, কেদারা পাতিয়া বসু এবং ছিল-হু পায়ের দিয়া সামনে ঝুঁকিয়া চলা ইত্যাদি । যদি পড়া-শুনা করিলে, ত বড় জোর দু পাতা টেনিসনের কবিতা, না হয় খানকয়েক “সোসাইটি মডেলস্ ।” যদি দেখিলে তাহাদের মধ্যে কোনখানায় ধর্ম সঙ্কীর্ণ বা প্রজাপতি-জীবনের বিরুদ্ধে চুটো কথা লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে, অমনি সেখানা তোমাদের তাক্য চইয়া গেল । বিজ্ঞা ও ব্যবহার বিষয়ক জ্ঞানত এই ; কলাবিদ্যা সপক্ষে, কার্পণ্যে ফুল কাটা ও কাগজে রংএর চুইটা আঁচড় দিয়া নিজেকে স্নায়ুফেলের যন্ত্র-স্থানীয়া অহুভব করা । কোন উচ্চ উদার অথবা জটিল ভাব সূক্ষ্মে ইচ্ছাদের আগ্রহ অধিকাংশেরই প্রবেশ শক্তি একরূপ নাই বলিলে অত্যুক্তি চইবে না ।

ঐ দেখ ! যাচা ভাবিতেছিলাম, ঠিক তাছাই কি না ? আমার চিত্তাশ্রোত কোন্ পথবাচিনী তাহা দরিয়া ফেলিবার শক্তি কি আর এই সভ্যজগতের নবানারীষ্মের মধ্যে বর্তমান থাকিতে পারে ? যাচার সঙ্ক্ষে আমি এত বড় একটা অভাব অহুভব করিতে পারিয়া তাহার এবং তাহার জাতির আর আর সকলের জন্যই মনে মনে সহায়ত্বিত্তি বোধ করিতেছিলাম, সেই তিনিই সহসা সেই আমাকেই অত্যন্ত রূপাহঁ বোধ করিয়া বলিলেন “আচ্ছা ঠাকুরপো, তোমার কি হয়েছে, আমায় বলত ? ক’দিন থেকে তোমায় যেন সদাসর্বকণ অনামনা দেখতে পাই ।”

“ঐ শোন মহু ! যার যার চোক আছে, সবাই এটা দেখতে পায়, একা তুমিই দেখতে পাচ্ছ না । আমায় ত তোমার আদিমকালের মনের গ্যারাণ্টি

দিয়ে সেয়ে দিলে, কিন্তু এইবার—কণা বা'র না করে নিয়ে ওকে তুমি কিছু-তেই ছেড়ে দিও না তড়িৎ ! নিশ্চয় নতুন কোন ভাবনা-ওর মনের মধ্যে প্রবেশ লাভ করে লক্ষ্যের সঙ্গে কৃষ্টি লাগিয়ে দিয়েছে । আবাত বলা হয়, ওর আদিমযুগের মন নতনের দার দ্বারে না ।”

শৈলেন শোণ বৃষ্টিয়া কোপটা দিল মন্দ নয় । আমার মুখের চেহারা-পানাত আনি স্বচক্ষে আর দেখিতে পাইলাম না ; কিন্তু সেখানে যে পূর্ব একটা সন্দেহজনক প্রমাণ আমার বিচারকগণ লিখিত দেখিতে পাঠিয়াছিলেন, তাহার স্পষ্ট প্রমাণ আমার নিজের চোকেই ওঁহাদের মুখে পুষ্টিয়া পাইয়াছিল ! তখনে পরস্পরের সহিত দৃষ্টি বিনিময় করিবার পর শৈল বাক্য করিয়া বলিল “তোমার ঠাকুরপো যাকবাক্যের কটতর অথবা স্বপ্ন-শরীরের ‘প্রত্নতর’ গবেষণায় দিন দিন অমন স্বপ্ন-শরীর লাভ করছেন, জান তড়িৎ !”

তড়িৎও তাহার চামোর সহিত যোগ দিয়া তাহার দিকে কৃত্রিম কোপ-কটাক করিয়া কটিয়া উঠিলেন “আচ্চা কি স্বপ্ন-বিচারক গো ! ‘প্রত্নতর’ না ‘প্রেতিনি-তর’ ! তোমরা ওর বিয়ে দিচ্ছ না, তাতে আর ভাবনা হবে না !”

“হ্যাঁহে সত্যি না কি ? তবে যে বলেন, ভীষ্মের মত চিরকুনার থাকবেন । আনরা এখন কি করব বল ? আমাদের কি আর অসাদ ! উনিই যে ধর্ড্রপ পণ করে বসে আছেন । দেখে শুনেই ত ভাল ছেড়ে দেওয়া গেছে । কিছুতেই যখন বিয়ে করবে না, তখন আর উপায় কি ? যাক, অভাগা এ জন্মের মত পৃথিবীর একটা শ্রেষ্ঠতম সুখে বঞ্চিতই না হয় রয়ে গেল । একটা গান ওকে শুনিয়ে দাও ত তড়িৎ, বেচারী আজ যেন মূরড়ে পড়েচে ।”

মনে মনে অকস্মাৎ তাঁর ক্রোধের উদ্বেগ হইল । ইচ্ছা করিতেছিল সেট মূর্খেরে পাড়াইয়া উঠিয়া গলা ছাড়িয়া চেঁচাইয়া উঠি ; বলি “ওরে নির্দোষ ! অর্ধাটীন ! তোর মত বড় প্রকাণ্ড গাধা ভূভারতে আর কোথাও নাই !” কিন্তু কেনই বা রাগ করিব ? কেনই বা গালি দিব ? কিসের জন্য এমন একটা হেতু-ভিত্তিবিহীন আক্ষেপ চিন্তকে এমন অনর্থক ক্ষিপ্ত করিয়া তুলিতে চাহিল ? নিজেরই নিকট যেন ইহা একটা হেয়ালিরই মত আশ্চর্য্য ঠেকিতে লাগিল । সত্যিই ত—বিবাহত করিবই না ! কে বলিল আমার বিবাহে ইচ্ছা আছে ? কখনও না—কিছুতেই না । এমন স্ত্রণের দ্বাধীনতাও অলাভলী দিয়া স্বৈচ্ছায় নিজেকে শূন্যলিত করিব, এমন আত্মশ্রক আনি নই—তা হউক না কেন স্বর্ণশ্রুত ! তবে আবাত

উল্টিয়া এ ক্রোদ কিসের ? বাস্তবিক, মাহুদের মনকে চিনিয়া উঠা চুকন—তা কি পরের আর কি নিজের ! এই মানসিক স্থলভব বিষয়ে একটা প্রবন্ধ লিখিতে হইবে । বিষয়টীত মন নয় ! বেশ চইবে।—তাছাড়া অতি সুন্দর সুন্দর সব ছোটল তবের কথা দেওয়া থাকিবে । বিস্তর দেশী বিদেশী মত উদ্ধৃত করিয়া দেপাটব, এবং পরের মনের মতট নিজের মনও যে মাহুদের নিজেরই অবোধা, এট নতুন তত্ত্ব তাছাড়া প্রমাণে প্রয়োগ সহিত প্রদত্ত চইবে । এর পূর্বে বোধ হয় আর কোন ক্ষণি বা জগুন, ফেঞ্চ, ইংরেজ, আমেরিকান পণ্ডিত এই স্থল তবের আবিষ্কারে সমর্থ হ'ন নাই । এ আমারই প্রথম আবিষ্কার !

বৌদিদি কোন সময় পিয়ানোর নিকট উঠিয়া গিয়াছিলেন চাটিয়া দেখি নাই, —একবারে গান আরম্ভ চইয়া গিয়াছে জানিতে পারিলাম গান ! তা গান ভিনিষটা অপছন্দ ভিনিষ নয় । ওটা আমিও একটু একটু পছন্দ করি । কিন্তু মেয়েমারীমদের যেমন সকল তাতেই একটা তুচ্ছ করা স্বভাব, নষ্ট করিয়া ফেলা অভ্যাস, এখানেও সেট ন্যাতাজোবডান অপচয়-নীতির বাতিক্রম ঘটতে বড় দেখা যায় না । পুরাতন সঙ্গীতশাস্ত্র—সে যে কি গভীর, কি গভীর—অতলস্পর্শ ভাব মন্থের রত্নাকর—কি অপচর নীরদী, যাছারা ভাল করিয়া এই শাস্ত্রের আলোচনা করিবার সুযোগ পাইয়াছেন তাঁহারাষ্ট বলিতে পারেন । আমি অবশ্ব চাত্তকলনে শিক্ষা করি নাই, কিন্তু যেটুকু চ একজন ভাল ভাল ওস্তাদের কাছে শুনিয়াছি তাছাড়াই বৃষ্টিতে পারি নারীচক্ষে এই সেবারাধনার বস্ত্র প্রায় শিশুর ঘুম পাড়ানির্দী-চড়ায় পরিবর্তিত চইয়া আসিয়াছে । যেমন চিত্রে তেমনি সঙ্গীতে এই নারী তানসেনগণ শ্রুত, বহু বাতিরেকে খেয়ালমুসারে বর্ণপরিচয় মাত্র করিয়া থাকেন এবং সেট অল্প বিজ্ঞাই তাঁহাদের পক্ষে “ভয়ঙ্করী” চইয়া দাঁড়ায় । বাজনার উপর আত্মলগুলি কেমনভাবে ক্রীড়া করিলে দর্শকের চোখে সুন্দর ঠেকিবে, এ ভিন্ন সেই মৃদু বসন্তার চাইতে তাঁহাদের বিশেষ প্রভেদ দেখা যায় না । অবশ্ব কোথাও ইহার বাতিক্রম হয় না, এ কথা জোর করিয়া বলিতে পারি না । তবে সে কচিং !

আমার মনে হয় একমাত্র রজন-কার্ণাট ভিন্ন, মেয়েমাহুদে ঠিক ভাল করিয়া আর কোন কাজই যথার্থতঃ করিতে পারে না । বাবুর্জি, বা রহুইয়া বাবুন অনেক স্থলে অবশ্ব পূর্ব ভাল রান্নার প্রশংসাপত্র পাইয়া থাকে, কিন্তু সেখানেও পুরুষের পক্ষে এটা ব্যতিক্রম মাত্র, সচরাচর নয় । প্রায়ই মেসের বামায় বা নারীবর্জিত গৃহস্থালীতে এই বাবুন-ঠাকুরদের নিজস্ব প্রদত্ত

পেটেন্ট ফোল চড়চড়িতে হতভাগা ভোক্তাগণের চাকের জল বর্ধিত হইয়া উঠে। তাই আমার মনে হয়, যাহারা যে বিশেষ শক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহাদের নিকট হইতে সেই ক্ষমতা কাড়িয়া লইয়া যাহার মধ্যে যে জিনিষ নাই তাহাকে কৃত্রিম উপায়ে সেই জিনিষে পরিণত করিবার চেষ্টা করা মহা অপরাধ। যাহার মধ্যে যাহা নাই, সে কেমন করিয়া তাহা পাইতে পারে? কৃষ্ণেই চেষ্টা সম্পূর্ণ সফল হয় না, বিফল-হইয়া উঠে। মেয়েরা যখন জামন স্ক্যানি, বন্ট, চচ্চি ও কালিয়া রঞ্ধিতে পারে, তখন ছপানা কালিঘাটের পুট আঁকিতে অথবা তাল মানের সপক্ষ-বিহীন ছইটা কবিতা আওড়ানগোছ গান গায়িতে নানা জানিলেই কি আর তাঁহারা লক্ষ্য হইতে পারেন না। আমিতো বলি এক ভাঁড় জলো চুপ না লইয়া একটুখানি নির্জলা খাঁটি চুপ হয় সেই ভাল।

আমি যদি কখনও বিবাহ করিতো মত্ত বড় রাঁধুনী দেখিয়া বিবাহ করিব। লক্ষী হয়তো খুব ভাল রঞ্ধিতে পারে। কারণ সে পট আঁকিতে কবিতা পড়িতে এবং 'টেমপেইম' বাজাইতে জানে না। এই সকল গুলির জন্মই শুধু লক্ষীকে আমার গৃহলক্ষী করিতে লোভ হইতেছে। তা ছাড়া আর কোন কিছুই না।

ক্রমশঃ

শ্রীঅক্ষরূপা দেবী।

শ্রুতি-স্মৃতি

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

অনেক উৎকট ব্যাধি পরজীবনে আমার হইয়াছে, সে সকল রোগযুক্তির পর পরমানন্দে আমার মন ভরিয়া গিয়াছে, হৃদয়ের মধ্যে অনির্বচনীয় পুলক সঞ্চার হইয়া জীবন বড় মিষ্ট লাগিয়াছে; কিন্তু অন্ধ বালক নয়ন পাইয়া যে আনন্দের সাফাৎকার লাভ করিয়াছিল, যে পুলকোচ্ছ্বাসের উন্মাদনায় অধীর হইয়া উঠিয়াছিল তাহার সঙ্গে কিছুই তুলনা হয় না; আমার শিশুদেহের শিরায় শিরায় তরল শোণিতের কি খরশ্রোত তখন বহিতে আরম্ভ করিয়াছিল, তাহা এক মুখে কি বলা যায়? অকারণে কত কপাই তখন অনর্গল বলিয়া যাইতাম, অপ্রয়োজনে কতবার তখন ঘর বাহির করিতাম, ভবানীপুরের জীর্ণ বাসার, উপর নীচে অহেতু তখন কতই যে দৌড়িয়া বেড়াইতাম তার সীমালেশ নাই। এক-

খান্নি নীর্ণ অপূর্ণ শিশুদেহের মধ্যে যেন লক্ষপ্রাণের জীবনীশক্তি সঞ্চারিত হইয়াছিল। আমি তাহারই উন্নততায় দিবাগাত্রি অধীর হইয়া ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতাম। ভবানীপুরের ক্ষুদ্র বাড়ীটি আর আনন্ধ্য ধরিয়া রাখিতে পারেন না—স্বাস্থ্যের উন্নতি হইলে চক্ষুর পীড়ার উপশম হইবে বলিয়া ডাক্তার সাহেবের অভিমত অনুসারে প্রতিদিন গঙ্গার দ্বারে এবং গড়ের নাঠের খোঁ লা হাওয়ার বেড়াইবার নিমিত্ত কুক কোম্পানীর আড়গড়া হইতে আমার জন্য ফিটন্ আর জুড়ি ডাড়া করা হইয়াছিল। একাল পঞ্চাশ প্রতিদিন বেড়াইতে গিয়াছি, গঙ্গা কেমন বা গড়ের মাঠই বা কেমন তাহার কোন দারগাহই এক বালকের হয় নাই আজ যখন দৃষ্টি মূলিল তখন এই জন-কোলাহল-পরিপূর্ণ কলিকাতা নগরী আমার নিকট ইঞ্জের অমরাপুরী বলিয়া মনে হইতে লাগিল। এককাল ইডেন্ গার্ডেনের ইংরাজি বাগ্জ কাণে শুনিয়াছি, বাগানের কিছুই দেখিতে পাই নাই, আজ যখন দীপ্ত আলোকমালায় উজ্জলিত ইংরাজ বালবৃদ্ধ যুবক-যুবতীর হস্ত কলরবে সুগঠিত, বৃক্ষ লতা মূলপল্লব-সজ্জিত টেডেন গার্ডেন দেখিলাম, সে যে কি অভিনব অপূর্ণ দৃশ্যই দেখিলাম তাহা আমার বয়সের বালকের পক্ষে বর্ণন করা অসম্ভব। যে দিকেই দৃষ্ট-নিক্ষেপ করি, চক্ষু আর কিরাইতে পারি না জাহাজে জাহাজে গঙ্গা নদীর বুক ঢাকিয়া ফেলিয়াছে, সে কি প্রকাণ্ড জাহাজ! নৌকা অর্ন্ত বড় হইতে পারে, তাহা কি জানি? নাস্তল রশা রশি আকাশ ছাইয়া ফেলিয়াছে। ছই বৎসরের ও অধিককালব্যাপি অন্ধতার পর চক্ষু পাইয়া এই বহুধরার যে কোন বস্তুর উপরেই দৃষ্টি আমার পড়ে নয়ন আর ফেরে না, কলিকাতা সহরের অতি জীর্ণ ক্ষুদ্র খোলার বাড়ীর ঢালাখানার দিক হইতেও চক্ষু ফিরাইয়া নেওয়া দুঃসাধ্য। পরজীবনে চিত্তিকপীড়িতকে আহ্বান করিতে দেখিয়াছি; সে যেমন একহাতে পাইয়া তৃপ্তি বোধ করে না আমিও, তেননি আমার একটি চক্ষু দিয়া এ সহরের সব দেখিয়া তৃপ্ত হইতে পারিতেছিলাম না, মনে হইত আরও ছই চারি দশটি চক্ষু আমার থাকিলে এতদিনের দৃষ্টিহীন জীবনের ক্ষতিপূরণ করিয়া নিতে পারিতাম। আজ বৃষ্টিতেছি গাছা দেখিতে চাই, ঘাছা আমার প্রিয়দর্শন, তাহা সহর চক্ষু দিয়া দেখিয়াও তৃপ্তি হয় না, গানে, নননে, নয়নে যত প্রকারেই দেখি না কেন, আকাঙ্ক্ষা রহিয়াই যায়, তৃপ্তি আর হয় না—তখন ঠিক এমন করিয়া বৃষ্টিবার বয়স ত নয়, তাই মনে হইত, প্রত্যাদিক চক্ষু থাকিলে দেখিয়া বৃষ্টি আশ মিটিত। সেই আশ মিটাইবার জন্য কলিকাতা সহরের

যতগুলি দর্শনীয় স্থান আছে, সব একে একে দেখিয়া নিলাম, তার পর আমার সেই চিরপরিচিত পরীভবনের জন্ত মন বড় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। দীর্ঘদিন হইয়া গিয়াছে না, ভগিনী, দিদিমা, ঠাকুরমা প্রভৃতি কাহাকেও দেখি নাই, খেলার সঙ্গী, পুত্রের সহপাঠিদিগের সঙ্গে অনেক কাল সাক্ষাৎ নাই, যে মাঠে খেলা করিয়াছি, মানজুরী খাঁপাই পাড়িয়া গে পুকুরের জল খোলা করিয়া দিয়াছি, যে গাছ হইতে আম, পেয়ারা, জাম প্রভৃতি ফল পাড়িয়া খাইয়াছি সেই সমস্ত আশেপাশে পরিচিত বাগানীয়ার রঙ্গভূমি মাঠ ঘাট পুকুর পুকুরীর সঙ্গে, ফিরিয়া পাওয়া নতুন চক্ষু দিয়া নতুন পরিচয় স্থাপন করিবার জন্ত মন বড় ব্যগ্র হইয়া উঠিল। কবে বাড়ী ফিরিয়া যাওয়া হইবে বলিয়া বুদ্ধ দেওয়ানের নিকট সন্ধ্যা সকাল দরবার আরম্ভ করিয়া দিলাম। সঙ্গীয় লোকজনও বহুকাল বাড়ী ছাড়িয়াছে, প্রবাসীর মন গৃহস্থিত আপনার জনের জন্ত যেমন করিয়া টানে তাহাদের জন্য তেমনি করিয়াই বাড়ীর দিকে টানিতেছিল বোধ হয়, কারণ আমার অনেক প্রার্থনা পূর্বে ইহারা বালকের অছায় আবদার বলিয়া অগ্রাহ্য করিয়াছেন, কিন্তু এহি বাড়ী ফিরিবার প্রস্তাবটিকে তাহারা সকলেই (বুদ্ধ দেওয়ান মহাশয়ও) তীক্ষ্ণবুদ্ধি বালকের জ্ঞান্য প্রস্তাব বলিয়া শিশুর প্রস্তাবে সম্মতি দিতে বেশী বিলম্ব করিলেন না, অবিলম্বে বাড়ী যাওয়া হইবে ইহা স্থির হইয়া গেল।

পূর্বে বলিয়াছি আসিবার সময়ে পাখী নৌকা প্রভৃতি নানা বান বাহনে রেল ধরিতে হইয়াছিল; যাইবার সময়ে সে সব আপদ বাল্যাই ছিল না, কলিকাতায় রেল আরম্ভ, দামুকদিয়া গিয়া পদ্মাতীরে পারবাটার সীমান, তারপর পদ্মা পার হইয়া সাঁড়া ঘাট হইতে রেল আরম্ভ, নাটোর ষ্টেশনে রেলগাড়ীর বিশ্রাম। ৪।৫ দিনের স্থানে ৫।৬ ঘণ্টায় তখন বাড়ী যাইবার সুবিধা হইয়া গিয়াছে। ইহা হইতে আমার পাঠক পাঠিকাগণ অল্পমান করিতে পারিবেন যে কতকাল আমাকে চক্ষু রোগের চিকিৎসার জন্ত কলিকাতায় থাকিতে হইয়াছিল, রেলের সান্তা প্রস্তুত হইয়া রেলগাড়ী যাত্রীসহ গমনাগমন করিতে কত দীর্ঘ সময় লাগে তাহা সকলেই জানেন, আমি আসিবার সময়ে যেখানে রেলগাড়ীর আবির্ভাব স্বপ্ন সমান ছিল সেখানে সত্যিকার এঞ্জিন ধুম উদ্দীর্ণ করিতে করিতে নিত্য চই সন্ধ্যা গমনাগমন করিতেছে। এত সুদীর্ঘ প্রবাসের পর সঙ্গীয় লোকেরা যে গৃহ প্রত্যাগমনের জন্ত ব্যাকুল হইয়া শিশুর

বাগ্মতাকে সঙ্গত বলিয়া অঙ্গুমোদন করিবে, তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কি আছে ? বালক বৃদ্ধ প্রৌঢ় যুবা সকলেরই যেখানে একমত সেখানে কার্য্যের অহুষ্ঠান হইতে বিলম্ব হইল না—সঙ্গীয় লোকের মধ্যে কেবল দুইজনের বাড়ী ফিরিতে অমত হইয়াছিল—একজন আমার সেই রামলাল দাসা, আর অপরা আমার মার পুত্রাতন ঐ বামা দাসী ওরফে আমার “বামা দিদি ।” ইহাদের অন্তরে আমার জ্ঞান অপরিবর্ত্তন্য রহে সন্ধিত ছিল, আমার একটা চক্ষু মাত্র তখন দৃষ্টিক্রম হইয়াছে, অপরটাকেও যে কোন উপায়ে আরোগ্য করিয়া তাহাদের বড় রেহের “নিখুঁত কুবেরকে” নিখুঁত করিয়াই বাড়ী লইয়া গাইবার তাহাদের ইচ্ছা ছিল এবং সেই জ্ঞান এটাই দুই মেহ পুরায়ণ বৃদ্ধ বৃদ্ধা বিস্ত্রোহের স্বর সুর করিয়াছিল, কিন্তু দশচক্রে তাহাদের ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হইতে পারিল না, একচক্ষু লইয়াই আমার বাড়ী ফিরিতে হটল । সে চক্ষু আমার আজও আরোগ্য হয় নাই, সেটা দ্বারা আমার আলো এবং অন্ধকারের অল্প জ্ঞান হয় মাত্র, কোন কাজ তাহা দ্বারা নিষ্পন্ন হইল না । আমার ভ্রমণ ভোজন ধাবন উপবেশন পঠন পাঠন সবই এই একমাত্র বামচক্ষুদ্বারা নিষ্পন্ন হইয়া আসিতেছে, এবং আমার শেষ অবসানের দিনে ঐ একটি চক্ষুর নিমেষ বন্ধ হইয়া গেলেই এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড আমার পক্ষে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে, দুই চক্ষু বৃদ্ধিয়া যাইবার অপেক্ষা আমার করিতে হইবে না । জন্ম, দুঃখ, দৈন্ত, জরা, মৃত্যু লইয়াই মানবের জীবন (যতটা আমরা দেখিতে ও বুঝিতে পারি) স্তব্ধতা অল্পবিস্তর সকলেই মনে করে এ জীবন ব্যর্থ হই গেল, আমিও তাই ভাবি । এই ব্যর্থজীবনেও আর সকলের দর্শনীয় যাহা তাহা তাহারা দুই চক্ষু ভরিয়া দেখিয়া জীবনকে কথঞ্চিৎ সার্থক করিয়া নিতে পারে—আমার দেখিবার সামগ্রীটি দুই চক্ষু ভরিয়া দেখিতে পাইলাম না স্তব্ধতা অল্পের অপেক্ষা অর্ধেক দেখিয়াই আমাকে তৃপ্ত থাকিতে হইতেছে । সে জ্ঞান আক্ষেপ করি না, অন্ধতা যে আমার চিরস্থায়ী হয় নাই এক চক্ষু দিয়াও আমার একান্ত আকাঙ্ক্ষার দর্শনীয় সামগ্রীর অসম্পূর্ণ দর্শনও পাইতেছি সেই রূপাটুকুর জ্ঞান জগতের কার্য্য কারণের নিয়ামক যদি কেহ থাকেন তাহাকে বার বার নমস্কার করি ।

• বাড়ী ফিরিবার দিন স্থির হইয়া গেল, একটি চক্ষু যে ব্যাধিগ্রস্ত থাকিয়াই গেল তাহাতে আমার মনে কোনরূপ দুঃখই ছিলনা, একে তখন আমি বালক, সে বয়সে কোন রূপ দুঃখ কষ্টই মনের উপর কোন স্থায়ী ক্রিয়া করিতে পারেনা,

দ্বিতীয়তঃ বহুকাল অন্ধ হইয়াছিলাম, পরের সাহায্য বাতীত দিনের নিত্যকৃত্য গুলির কোনটাই নিজে নিম্পন্ন করিতে পারিতাম না, সেইবুলে অপরের বিনা! সাহায্যে সব কাজই করিতে পারি, সুতরাং দক্ষিণ চক্ষুর অভাব আবার নিকট অভাবই নহে, সেজন্য তখন মনে কোন দুঃখই ছিলনা বরং বহুকাল পরে গৃহে ফিরিতেছি, জননী, ভগিনী, খেলার সঙ্গী সকলকেই আবার দেখিতে পাইব, চির-পুরাতন পরীক্ষিতনের সুখস্বপ্ন পরিপূর্ণ তুচ্ছতম জিনিস গুলির সঙ্গে আবার আমার মিলন সংঘটন হইবে সেই আনন্দেই আমার দেহমন পুলকিত, একটা ঢঙ্ক যে দৃষ্টিহীন রহিয়া গেল সে কথা আমার বালকমনে তখন একবারও উদয় হয় নাই ।

বাড়ী আগিলাম, বিদেশে যাইবার সময়ে যে সকল মেহশীল আত্মীয় স্বজনকে ছাড়িয়া যাইতে হইয়াছিল তাহাদের সকলকেই আবার দেখিতে পাইলাম, কিন্তু আমার জনক যিনি সম্ভানের প্রতি স্নেহাদিক্যপ্রযুক্ত জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে বলিয়া আমার চিকিৎসার জন্য কলিকাতা যাইবার বন্দোবস্ত অনেকের মতের বিরুদ্ধে করিয়া দিয়াছিলেন, যাহার নিঃস্বার্থ চেষ্টা বাতীত নবমবর্ষ বয়ঃক্রম হইতে আজ পর্যন্ত চির-অন্ধতা লইয়া আমার দুর্ভাগ্য জীবনভার আমাকে চঃসহ চঃখের মধ্যেই বহন করিতে হইত, একমাত্র যাহার প্রসাদে এই বিচিত্র সৌন্দর্য্য সম্ভারে ঐশ্বর্য্যশালিনী বহুধরার অপরূপ রূপ আজ আমার চক্ষুগোচর হইতে পারিতেছে যাহার রূপায় শৈল-মাগর-সরিং-শোভিতা বনকাননকাণ্ডারসমগ্ৰিতা ধরণীর অপূর্ণ-শারদ-সৌন্দর্য্য ও বাসস্তীভূষমা আমার নয়নমনের তৃপ্তি বিধান করিতেছে সেই প্রত্যক্ষ ভূদেবতা স্বরূপ আমার মেহশীল পিতৃদেবকে আর দেখিতে পাইলাম না । তাহার হতভাগা সম্ভান প্রজনাথ যখন তাহার পুনঃপ্রাপ্ত চক্ষুদ্বারা তাহার পাদপদ্মের সন্ধান ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছে তখন তাহার পরম মেহময়ী জননীর রিক্ত প্রেক্ষাণ্ড এবং সাক্ষনের প্রজনাথকে বলিয়া দিল যে পিতৃপাদবন্দনার সৌভাগ্য তাহার চিরদিনের জন্য অন্তহিত হইয়াছে ।

এতদিন পর্যন্ত বাড়ীতে যে সকল চাকরবাকর দাসদাসী ছিল, তাহাদের আত্মীয় স্বজনের মৃত্যুর কথা শুনিয়াছি কিন্তু সে সকল মৃত ব্যক্তিকে তাহাদের জীবিতকালে কখনও দেখি নাই, সুতরাং মাহুষের মৃত্যু হইলে তাহার অভাব-জনিত ক্রেশ যে কি তাহার কোমল ধারণাই আমার শিশুমনের ধারে কাছেও ছিল না, এই প্রথম চিরপরিচিত আপনাদের জনের মৃত্যু-সংবাদে বাধা আমার অন্তরে আদিয়া বাজিল । পিতৃদেবকে প্রতিনিয়তই যে দেখিতে পাইতাম

তাহা নহে, যখন দেখিতাম, তখনও কতক ভয়ে কতক সঙ্কোচে অধিককাল তাহার সাহচর্য্য ইচ্ছা করিয়াই করি নাই, তাহার মৃত্যুর সময়েও উপস্থিত ছিলাম না। মাত্রুম কেমন করিয়া মরে, মরিলে তাহার দেহাবশিষ্ট লইয়া জীবিতেরা কি করে, যে গৃহে মন্ত্রণ-দেবতা আদিয়া গৃহস্থ কাহাকেও হরণ করিয়া নিয়া যায়, তাহার পরে সে গৃহের অবশিষ্ট লোকদিগের চিত্তে শ্মশান-বৈরাগ্য, ক্রুর পুত্রবৎ কতখানি সঞ্চার করিয়া দিয়া সংসারে কি প্রকার বীতশ্রদ্ধা জন্মাইয়া দেয়, সে সকলের কোন ধারণাই আমার তখন হয় নাই, কিন্তু পিতার সম্বন্ধে প্রশ্ন করিবার পর জননী যখন আমাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া নীরবে অশ্রুপাত করিতেছিলেন তখন আমার শিশু-মনে কি ভাবের উদয় হইয়াছিল, তাহা আজ বর্ণন করিতে পারিব না ; কিন্তু শোকাভূরা জননী অস্তর-বেদনা ছদয়ের অলঙ্কা-তাড়িত প্রভাবে আমার বক্ষে সঞ্চারিত হইয়া আমার শিশু-মনে অনমৃতত্বপূর্ণ এক শোকের শূভ্রতা জন্মাইয়া দিল, এবং সমাক উপলক্ষি না হইলেও সেই দিন বুঝিলাম মৃত্যুকেবল যাহাকে হরণ করিয়া লইয়া যায় তাহারই পক্ষে ভীষণ নহে, তাহার জীবিত স্বজনগণের পক্ষেও তাহার মৃষ্টি ভয়ানক এবং বেদনা স্বতঃসহ।

(ক্রমশঃ)

শ্রীজগদীশনাথ রায়

গ্রন্থ সমালোচনা

প্রাচীন ভারতে লৌহ—

অধ্যাপক শ্রীমুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিত। তিনি নানা উপায়ে দেশমধ্যে বিজ্ঞানালোচনার প্রদার বৃদ্ধির চেষ্টা করিতেছেন। রমায়ণ শাস্ত্র স্বত্বীয় মৌলিক গবেষণা-সূত্রে তাহার একাদিক প্রবন্ধ ইতিপূর্বে প্রকাশিত হইয়াছে। কিছু দিন হইল তিনি *Iron in Ancient India* নামক একখানি পুস্তক লিপিগ্রাহ্যে। এই পুস্তক-খানি *Indian Association for the Cultivation of Science* কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে ; এই পুস্তকখানির সমালোচনাই বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

পুস্তকখানির মূল্য ২।০ ৬ ইয়ার পত্র-সংখ্যা ৭৮। লেখক ভূমিকাত্তে জানাইয়াছেন যে ১৯১৪ খ্রষ্টাব্দের ৭ই জানুয়ারী *Indian Association for the Cultivation of Science* গৃহে এক সভা হয় ; সেই সভাতে এই প্রবন্ধ গঠিত হয় ও এই পুস্তক সেই প্রবন্ধের বিস্তৃতাকার (in an enlarged form)। পঞ্চাননবাবুর পূর্ববর্তী অনেক লেখক ভারতবর্ষের লৌহ সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন ; সেই হেতু এই পুস্তকে

সেই অসুসজ্জিতদের পবেষণার ফলেওও উল্লেখ পাওয়া সম্ভবপর ও বাঞ্ছনীয়। পকাননবাবু রায়ের লাত্রে বিশেষভাবে পারদর্শী, সুতরাং এই পুস্তকে তাঁহার নিজের পবেষণার ফলও অনেক লিপিবদ্ধ আছে বলিয়া আমরা স্বভাবতঃই আশা করিতে পারি।

গ্রন্থখানি ৭ অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম তিন অধ্যায়ে লৌহের প্রভুত্ব আলোচিত হইয়াছে ও শেষ ৪ অধ্যায়ে লৌহের সাময়িক তত্ত্বের অনুসন্ধান করা হইয়াছে। পকাননবাবু কোনও দিন প্রভুত্বের আলোচনা করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না সুতরাং এই তিন অধ্যায়ে তাঁহার নিজস্ব কিছু না থাকিবরই কথা। এই তিন অধ্যায় মূলতঃ সম্বলন, কিন্তু তথাপি তিনি যে যে স্থলে নিজ মত প্রকাশ করিতে পিয়াছেন তাহাদের অধিকাংশ স্থলেই ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি :—

‘Ethnographers usually divide the age of using implements of warfare into principally three divisions, viz stone age, bronze age and iron age. Such a division might be tenable in the case of European countries but hardly applicable in the case of India which was colonized by the Aryans possessing a very high order of civilization at a very early age’ (পৃঃ ২)।

এই কথার তাৎপর্য গ্রহণ করিতে পারা খেল না। যে বর্ণের লোক প্রথমে অস্ত্র ব্যবহার করিতে পারিত তাহার অর্থ্য না হইতে পারে—কিন্তু তাহারা ভারতবর্ষেই বাস করিত ও তাহাদের সংস্পর্শগতের মধ্যে কেহ কেহ এখনও ভারতবর্ষেই আছে। সুতরাং পকাননবাবুর এই মত গ্রাহ্যের প্রভুত্বের ক, নষ্ট জাতির তাঁহাদের হস্তক্ষেপাদন করিবে। বৈদিক সাহিত্যে সৃষ্টি প্রভৃতি অস্ত্রের উল্লেখ আছে—এই সংবাদ নতুন নহে। কতকগুলি বৈদিক বাক্যের ইংরেজী অর্থ পকাননবাবু তাঁহার পুস্তকের পাদটীকাতে দিয়াছেন। এই সমস্ত টীকা কাহার, তাহা উল্লিখিত পাকা উচিত ছিল। অনধিকার-স্বার্থে অনেক আলঙ্কার আছে। পকাননবাবুর পুস্তক সমালোচনা করিতে করিতে Vincent Smith বলিয়াছেন :—

‘His (পকাননবাবুর) essay, as it stands, gives an impression of rather hasty production. It is not permissible to assume that the so-called “Soinenath gates” stored in the Fort at Arra may be “authentic” (p. 32). They are purely Muhammedan work, and bear an Arabic inscription in the Kufic character relating to the family of Sabukirgin, for whom prayers are offered by the writer (Ann. Rep. Arch. Surv. Ind. 1913-4, p. 17; Horovitz, Epigraphica Indo-Moslemica, no 3, p. 38, Calcutta, 1912).’

টিবেনডেলিতে অনেক লৌহাস্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। মিঃ Rea ইহার বিস্তৃত বর্ণনা প্রকাশ করিয়াছেন। এই সমস্ত আস্ত্র সম্বন্ধে পকাননবাবু লিখিয়াছেন :—

‘The nature of the iron has not been determined. Southern India was famous from remote times for its steel called “wootz,” and it would not be a surprise if this very remarkable collection of ancient weapons and implement turn out on examination to be specimens of wootz, though the chances are that these weapons were made of wrought iron’ (পৃঃ ১০)।

পকাননবাবুর নিকট হইতে এই প্রশ্নের এইরূপ উত্তর আশা করা যায় না। তাঁহার

কর্তৃদ্বারা ছিল এই সমস্ত লৌহ পরীক্ষা করা কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই ।

আবুর লৌহস্তম্ভ সম্বন্ধে পঞ্চাননবাবু বলেন :—

"The iron of the pillar has not yet been under examination, but I have little hesitation in concluding that the pillar is made of wrought iron in a similar manner as the Belhi and Dhar pillars." (পৃঃ—৩১) ।

আবুর ও ধারের লৌহস্তম্ভের লৌহের ক্ষেদ্রনই বিশ্লেষণ এ পর্যন্ত হয় নাই । সুতরাং উক্ত মত বিজ্ঞানানুযায়ীমিত কি না তাহা বিবেচ্য ।

এই পুস্তকের অপর স্থানে পঞ্চাননবাবু বলেন :—

"However, the Asoka foundation of the stupa, on excavation, has yielded a piece of iron slag, which has been preserved in the Calcutta Museum. This piece of iron slag is, I believe, the most ancient archaeological evidence of a historical nature of the manufacture of iron in India as early as the third century B. C." (পৃঃ ১৭) ।

ভারতবর্ষে লৌহখনির অভাব নাই । সেগুলির সহিত তুলনা না করিয়া হঠাৎ এত বড় মিছামিছে উপনীত হওয়া সমীচীন হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না ।

শিল্পীর লৌহস্তম্ভের উল্লেখ করা হইয়াছে ও Johnston Hoffmann কর্তৃক সংগৃহীত এক আলোকচিত্র ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে । এই লৌহস্তম্ভের অবশিষ্টাংশে কিছুই নৃতনব্দ নাই । পঞ্চাননবাবু Sir Robert Hadfield-এর রাসায়নিক বিশ্লেষণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ও বলিয়াছেন :—

"The low proportion of sulphur shows that the fuel employed must have been charcoal and that the ores must also have been pure" (পৃঃ ১২) ।

• এই মতটীতে নৃতনব্দ কিছুই নাই । ইহা Hadfield-এর লেখনীগ্রন্থত । এই লৌহস্তম্ভ সম্বন্ধে পঞ্চাননবাবু কৃত্রিমকালে লিখিয়াছেন :—

"As regards the solution of the problem how these pillars have so long withstood the rusting influence of wind and rain, my idea is that "low manganese with low sulphur and high phosphorus" in the composition of the iron has something to do with the "corrosion-resistance" capacity of wrought iron" (পৃঃ vi) ।

পঞ্চাননবাবু যে বড় কথাটিকে my idea বলিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার নিজস্ব কিছুই নাই । Sir Robert Hadfield-এর অব্যক্ত পার্থক্যের পর সেই অব্যক্ত সম্বন্ধে যে আলোচনা হইয়াছিল, তাহাতে Dr. Cushman এই মত প্রকাশ করিয়াছেন ।—পুস্তকের মধ্যে পঞ্চাননবাবু Dr. Cushman-এর উল্লেখ করিয়াছেন :—

The author agrees with Dr. Cushman when he suggests that probably "low manganese with low sulphur and high phosphorus would lead to high corrosion resistance" in iron (পৃঃ ৫০) ।

কৃত্রিমকালে তিনি এই কথাটি যে ভাবে লিখিয়াছেন তাহা বোধ হয় ঠিক হয় নাই—কারণ এই কৃত্রিম পাঠ করিলে সাধারণের মনে এক ভুল ধারণা থাকিয়া যাওয়ার আশঙ্কা আছে । পঞ্চানন বাবুর কখনই এরূপ অভিপ্রায় হইতে পারে না ।

পকানন বাবু বলেন যে Dr. Cushman বর্ণিত কারণ ব্যতীত আরও এক কারণে, এই সমস্ত লৌহ এত কাল ঠিক ভাবেই আছে ।

"I also suspect that the pillars and beams were originally painted" (p. vi)

এই মত স্বত্বাধীন পকানন বাবু কোনও প্রমাণ দেখান নাই । এই লৌহের যে বিশ্লেষণ Sir R. Hadfield কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতেও কোনও প্রকারের রং (paint) আছে বলিয়া মনে হয় না । সুতরাং প্রত্যক্ষ প্রমাণের অভাবে এইরূপ কথা বলি দুর্ভাগ্যবশত হইয়াছে কিনা তাহা পাঠকগণ বিবেচনা করিবেন ।

আর অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই । এই পুস্তকে যে যে বৈজ্ঞানিক কথা আছে সেগুলির অধিকাংশই Sir Robert Hadfield এর প্রবন্ধ হইতে সংগৃহীত ; অথচ পকানন বাবুর প্রবন্ধ যখন প্রথম প্রস্তুত হয় তখন পকানন বাবু Sir Robert Hadfield এর প্রবন্ধের কথা জানিতেন নী । এইরূপ অজ্ঞতা মার্জ্জনীয় কিনা তাহা বিবেচনা । এই প্রসঙ্গে V Smith বলেন :—

It would have been better if the author had deferred publication until he could have made full use of Sir Robert Hadfield's Treatise on Sienhalese Iron and Steel of Ancient origin in the Journal of the Iron and Steel Institute, 1912, and had studied more thoroughly the history of the ancient use of metals in Egypt, Babylonian and other countries. He has merely incorporated Hadfield's analysis of Ceylon iron and obviously is not deeply read about the archaeological subjects on which he touches.

এই পুস্তকে একটা বিষয়াক্রমিক স্থগী থাকি উচিত ছিল । লেখকের প্রমাণ যে নাই তাহাও নহে । আরও অনেক অনেক বিষয়ে পুস্তকদ্বারা অসম্পূর্ণ ।

এই পুস্তক ইংরেজীতে লিখিয়া বিশেষ কিছু ফল হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না । ইংরেজী ভাষাতে অভিজ্ঞ যে সমস্ত পাঠকের জন্য এই পুস্তক লিখিত, তাহাদের নিকট ভ্রম্যক্রম পাঠের ও কোনারকর প্রাসঙ্গিকতা হইতে প্রাপ্ত লৌহের বিশ্লেষণ ব্যতীত পকানন বাবুর সকলনের মধ্যে নতুন কিছুই নাই । পকাননবাবু বাঙ্গালা বেশ ভাল লিখিতে পারেন । তিনি যদি এই পুস্তকদ্বারা বাঙ্গালা ভাষাতে লিখিতেন তাহা হইলে বাঙ্গালা সাহিত্যে একধালা নতুন ধরনের পুস্তক হইত । কিন্তু তিনি যাহা করিয়াছেন তাহাতে বোধ হয় যেন তাহার পরিশ্রমই সারা হইয়াছে ।

শাইবানী ।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা ।

নারায়ণ, বৈশাখ—

বঙ্কিমচন্দ্র চৈত্রমাসে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছিলেন । সেই জন্য 'নারায়ণের এই সংখ্যার নাম "বঙ্কিম স্মৃতি-সংখ্যা" । এই সংখ্যার সব প্রবন্ধগুলিই বঙ্কিমচন্দ্রের বিষয়ে লিখিত । সম্পাদক মহাশয় কাঞ্চন্যের প্রবন্ধবৈচিত্র্য নষ্ট করিয়াও মৃত মহাত্মার প্রতি সম্মান দেখাইয়াছেন ।

“বন্ধিমচন্দ্র কঠাপলপড়ায়” শীর্ষক অবলম্বিত জীবনসঙ্গীত নামক লিপিভেদন :—“বাক্সালার তিনি কীর্তনের বড় সঙ্গীতগী ছিলেন * * * পানের উপর তাঁহার বেশ ফোঁক ছিল । তিনি কয়েক বৎসর ধরিয়া যুক্তটের নিকট পান নিদিতেন । * * * বাক্সালার কবিতা-গুলি একত্র করিয়া ছাপাইয়াও ছিলেন । * * * কাবোয় চেয়ে ইতিহাসেই তাঁহার বেশী মগ্ন ছিল । * * * তাঁহার নিত্য ইচ্ছা ছিল তিনি বাক্সালার একদানি ইতিহাস লিখিয়া যান । সেই উদ্দেশ্যে তিনি “বাক্সালীর উৎপত্তি” সম্বন্ধে বহুদর্শনে সাতটি প্রশ্নক লিখিয়াছিলেন । * * * বঙ্গদেশে অর্থাৎ অসম্ভাব্যগণের বাস সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিয়া গিয়াছেন, তার চেয়ে এগরিও কেহ বেশী কিছুই লিখিতে পারেন নাই ।” এতদ্ব্যতীত সুনির্দিষ্ট, ভবে লেখক নিজের কথায় ও অনাবল্যক বাহুল্যে ইহার কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছেন ।

শ্রীপাঠকজি বন্দ্যোপাধ্যায় আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরাণী ও শীতারামকে “বন্ধিমচন্দ্রের এলী” বলিয়াছেন । লেখক বলিতে চান এই তিনটি উপস্থানে বন্ধিমচন্দ্রের একটা উদ্দেশ্য স্পষ্টীকৃত হইয়াছে । লেখক আরও বলেন—“তিনি সমাজকে ইউরোপের আদর্শে ডাকিয়া ছুরিয়া পড়িতে কর্ণনট চেষ্টা করেন নাই । * * * বন্ধিমচন্দ্র বুঝিয়াছিলেন যে, ইংরেজি শিক্ষা ও সভ্যতার সম্বন্ধে বাক্সালার হিন্দু-সমাজে আচার-বাস্তবায়নত পরিবর্তন অবশ্যস্বাভাবিক । সেই পরি-বর্তনকে বেশের ও জাতির প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত করিয়া পরিচালিত করা এতোক দেশ-হিতৈষীরই কর্তব্য । তিনি প্রায়ই বলিতেন * * * আমাদের জাতীয় বিশিষ্টতা ইংরেজি শিক্ষা এবং সভ্যতা সত্ত্বেও অক্ষুণ্ণ থাকিবে । সুতরাং যে উপায়ে জাতিকে পরিণত পারি, জাতির নিয়ন্ত্রণগুলিকে টানিয়া সঙ্গে করিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারি, সেই উপায়েই আমাদের অনলখনযোগ্য ।”

“বন্ধিমচন্দ্র বাক্সালার আদৈশিকতার ভাবটা সর্বপ্রথমে ফুটাইয়া তোলেন * * * “বন্দেমন্তরম” বাক্সালার পান, সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে । এই তিনখানা উপস্থানে কেবল বাক্সালার বাক্সালীর কথা আছে । * * * এই তিনখানা উপস্থানে বাক্সালীর প্রকৃতির আধারে বন্ধিমচন্দ্র সমষ্টি, ব্যক্তি এবং সমবয়সের অন্তর্ভুক্তপদ্ধতি পরিষ্কৃত করিয়াছেন । আনন্দমঠে সমষ্টি বা সমাজের ক্রিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন । দেবীচৌধুরাণীতে ব্যক্তিগত সাধনার উদ্বেগ-প্রকাশ বুঝাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন । শীতারামে সাধক সম্বন্ধিত হইলে কেমন ক্রিয়া একটা মূল্য বা সত্যবাদন সৃষ্ট হইতে পারে তাহার পর্যায় দেখাই-য়াছেন । বাক্সালীর প্রকৃতিগত, জাতিগত এবং সংস্কারগত সোবে বা হ্রাসিত ফলে কেমন ক্রিয়া আদর্শ সৃষ্ট হইল না, তাহাও তিনি অপূর্ণ চরিত্রোন্মেষ সাহায্যে দেখাইতে চেষ্টা করেন নাই ।”

বন্ধিমবাবুর তিনখানা উপস্থানের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা করিয়া পাঠকজিবাণু দেখাইয়াছেন বন্ধিমবাবুর গ্রন্থাবলীর উপযুক্ত সমালোচনা এখনও হয় নাই এবং সে সমালোচনার ভার তিনি যে গ্রহণ করিতে সক্ষম তাহাও আনন্দ বুঝিয়াছি । দায়বোধের এ প্রবন্ধটি পাঠ করিতে আমরা সকলকেই অনুরোধ করি ।

জীবনেশ সমাজপতির “দৈকালের কথা” হইতে বন্ধিমচন্দ্রের একটি উক্তি উদ্ধৃত করি-

লাম :—খুব পরীক্ষা, অথচ পড়িতে জানে, পড়িতে চায়; এমন লোকের সংখ্যা এখনও এ দেশে অত্যন্ত কম। আমাদের দেশে সাধারণের শিক্ষার ব্যবস্থা নাই; তাই শিক্ষিতের সংখ্যা বড় কম, Cheap literature এর এখনও সময় হয় নাই। ইহার মত কারণও আছে। সকল জিনিষ সকলের হাতে দেওয়া উচিত নয়। সকল বই সাধারণে না পড়িলেও ক্ষতি নাই। কতকটা গড়াগড়া থাকিলে যে সব জিনিষ পড়া চলে, খুব অল্পশিক্ষিতের পক্ষে সে সব বই পড়িলে হিতে বিপরীত হইতে পারে। দেশের অবস্থার সঙ্গে Cheap Literature এর মন্বন্ধ আছে।”

ঐশ্বরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের “বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যকথা” তুলপাঠ্য। এবাবে বালক বঙ্কিমের একটি কল্পিত চিত্র আঁত্মকল্পিত হইয়াছে। কয়েকটি কথা আমরা উদ্ধৃত করিলম—

(১) “বঙ্কিমচন্দ্র ভিন্নকালই বাঁড়পত্র ইত্যাদি দেখিলে সরিয়া যাইতেন। যই যাত্রা চাপে উঠিতে পারিতেন না, সঁতার জানিতেন না, একজন ভাল Executive Officer ছিলেন, তথাপি ছোড়ায় চড়িতে পারিতেন না। * * * * আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ইন্দ্রি বাল্যকালে একদিন ডাকাতদের ভয় করেন নাই, কৈশোরে মনীষকে পড়ুড়ুলাসে ভয় করিতেন না, আর দৌরবে গুলিভরা শিশুল গ্রাহ্য না করিয়া একজন সাহেবকে খেণ্ডায় করিয়াছিলেন।”

ইহাতে আশ্চর্য্যোৎকারণ আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু এরূপ উদাহরণও বিরল নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের এই ভীরণতা ও নির্ভীকতার সামঞ্জস্য বিধান করা লেখকের উচিত ছিল, কেননা একজা উদাহরণ পক্ষে সঙ্গ, তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের অনেক পররই ত জানেন।

(২) একবার বঙ্কিমচন্দ্রের নৌকা কুমারার মধ্যে মাঝির দিক্-প্রম হওয়ায় বিপথে ডালিয়া যায়। এই ঘটনা অবলম্বন করিয়াই কপালকুণ্ডলার আরম্ভ। মাঝারও গ্রাম জাহানাবাদ ও বিষ্ণুপুরের মধ্যস্থিত। বঙ্কিমচন্দ্র শুনিয়াছিলেন যে উড়িয়া হইতে পাঠাসেনা মাঝারও গ্রামের জমিদারের পুরী লুটপাট করিয়া উাহাকে ও উাহার স্ত্রী ও কন্তাকে বন্দী করিয়া লইয়া যায়, রাজপুতকুলভিলক কুমার জগৎসিংহ উাহাদিগের সাহায্যার্থে প্রেরিত হইয়া বন্দী হইয়াছিলেন। এই ঘটনা অবলম্বন করিয়াই দুর্গেশনন্দিনী রচিত হয়। কোন দরিদ্র গৃহস্থের বধূ যৌবনারত্রে কুলভাগিনী হইয়া কোন বন্যাত্য যুবকের রক্ষিতা হয়। পাঁচ ছয় বৎসর পরে হঠাৎ একদিন স্বামীকে দেখিয়া সে পাপপথ ত্যাগ করিতে সংকল্প করিল। সুবার বনসম্পত্তি ত্যাগ করিয়া সে এমন স্থানে বাসা লইল, সাহায়ে অতিদিন সে স্বামীর দর্শন লাভ করিতে পারে। দিবসিদি নিদিয়া অভাগিনী যৌবনেই প্রাণত্যাগ করে। এই ঘটনাটি বঙ্কিমচন্দ্রকে মতিবিবির চরিত্র অঙ্কিত করিতে প্রলুব্ধ করিয়াছিল।

“ঐতিহাসিক গবেষণায় বঙ্কিমচন্দ্র” ঐরাণালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনা। গদ্য ইতিহাসের বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা আরম্ভ হয় নাই, তখনও বঙ্কিমচন্দ্র ইহাতে যে প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা একাধি করাই লেখকের উদ্দেশ্য। বঙ্কিমচন্দ্র উাহার উপন্যাসের মধ্যে ইতিহাস-সম্বন্ধীয় অনেক ভ্রমকে প্রায় দিয়াছেন, সেই ভ্রম ইতিহাসে যে উাহার কোন জ্ঞান ছিল না একথা অস্বীকার করা উচিত নয়। রাখালবাবু এই প্রবন্ধে দেখাইয়াছেন—বঙ্কিমবাবু ইতিহাসে ভ্রণ্ডিত বলিয়া পরিচিত না থাকিলেও অল্পত প্রতিভাবলে তিনি ভ্রণ্ডিতের মতই অশীশনার মন্তব্য একাধি করিতে পারিতেন।

ঈহরপ্রসাদ শাস্ত্রীর “বঙ্কিমবাবু ও উত্তরচরিত” বঙ্কিমবাবুর উত্তরচরিতের সমালোচনা । বঙ্কিমবাবু উত্তরচরিতের যে একটি দোষ দেখাইয়াছেন, এই অবশ্যে তাহা নষ্টন করিতে লেখক বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন । তাহার দৃষ্টি গ্রহণ করিয়াও আমরা বলিব, রামের ক্রমশঃ বাহলা আছে—তাঁহাকে ক্রমশঃ চেয়েও যত্ন করিয়া আঁকিতে কবি যতটা যত্ন প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার তিনটুকু বলের মত কঠোর করিয়া আঁকিতে ততটা দরের পরিচয় পাওয়া যায় না । রামচন্দ্রকে যতটা কাঁদানো হইয়াছে, তাহা না করিলেও তাঁহার অন্তর্গত কল্পনার সেরা মাত্রা অনুভূত থাকিত । লেখক উত্তরচরিত সম্বন্ধে হু একটি নূতন কথাও বলিয়াছেন ।

“বঙ্কিম-প্রসঙ্গে” ঈহরেন্দ্রনাথ দত্ত গীতাসম্বন্ধে বঙ্কিমবাবুর যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা আমরা উদ্ধৃত করিলাম—“বঙ্কিমবাবু বলিলেন যে, তাহার ধারণা এই যে গীতার শেষ ৪য় অধ্যায় পরবর্তী কালের মৌলানা । তাহার মৌলিক গীতার অন্তর্গত নহে । * * * শেষ ছয় অধ্যায়ের ভাষার ভঙ্গী দেখিলে এ সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে না ; বিশেষতঃ বিবর্তনপন্থী গীতার পরিসমাপ্তি হওয়া উচিত । * * * তদাশীতল ভারতীয় স্মৃতিসমাজে কৰ্ম্মবাদ, জ্ঞানবাদ ও ভক্তিবাদ নামে যে বিভিন্ন সাধনপ্রণালী প্রচলিত ছিল, গীতাকার অন্তত প্রতিভাবলে তাহার অনুরূপ সামঞ্জস্য বিধান করিয়াছেন ।”

বঙ্কিমবাবুর এই উক্তি সহিত লেখকের মতসাদৃশ্য প্রায় সর্বত্রই আছে । লেখক এক স্থলে বলিতেছেন “বঙ্কিমবাবুর মতে এই আমি প্রথম গীতার সময়বাদের সন্ধান পাইলাম । পরবর্তী কালে আমি ইহার যথেষ্ট সম্ভারণ করিয়াছি । কিন্তু এ বিষয়ে আমার আদিম উপদেশটা বঙ্কিমচন্দ্র ।”

ঐতিহাসিক পাল বঙ্কিমচন্দ্রের চরিতচিত্র লিখিয়াছেন । চরিতচিত্রটি যতটুকু প্রকাশিত হইয়াছে তাহা উগ্ৰচেহা ; চরিতচিত্রের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে করিতে লেখক বলিতেছেন—“প্রকাশের ভিতরে বস্তুর বাহিরটাই দেখা যায় । * * * বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-সৃষ্টি দেখিয়া তাঁর সম্বন্ধে যে জ্ঞানলাভ হয়, তাহা অনুমানের উপরে প্রতিষ্ঠিত । * * * অনুমানের উপর একান্তভাবে নির্ভর করা যায় না । * * * বাঙ্গালার লক্ষ লক্ষ লোকে সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্রকেই কেবল একটু একটু চিনে, মাত্রমাত্র বঙ্কিমচন্দ্রকে চিনে না । অথচ সেটিকে না চিনিলে, তাঁর সাহিত্য-সৃষ্টির মিস্ত্র এবং যথার্থ মর্ম্মও গ্রহণ করা সম্ভব নয় ।”

আমরা বলি—প্রকাশের ভিতরে যদি বস্তুর বাহিরটাই দেখা যায় তাহা হইলে সংসারের বহুবিধ সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র কখন কোন্ দৃষ্টি ধারণ করিতেন তাহা অবগত হইলেও অকৃত বঙ্কিমচন্দ্রকে আদিতে পারা যায় না । সংসারে বা বস্তুসমাজে মানুষের বিকাশ সম্পূর্ণ নয় ; সাহিত্যক্ষেত্রে প্রসঙ্গ—সেখানে সমাজ বা সংসারের বহন দাঁড়িয়া মানুষ যখন সমগ্র দেশ বা পৃথিবীর বিকট আত্ম-প্রকাশ করে, তখনই তাহাকে পূর্ণভাবে দেখিতে পাই । সেই বিকাশই মানুষকে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতে বোহিত করিয়া রাখিতে পারে । অনেক সময় লেখকের দৈনিক জীবনের কথা আলোচনা করিতে গেলে নিরাশ হইতে হয় ।

সাহিত্যিকের চরিত্র-কথা সাহিত্য বুদ্ধিতে সহায়তা করে সত্য, কিন্তু তাহা না জানিলে সাহিত্য বোঝা সম্ভব নয়, এ কথা আমরা মনেতে পারিলাম না ।

শেষ কয় পৃষ্ঠায় একাধিক বঙ্কিমচন্দ্রের হস্তলিপি চিত্রাঙ্কিত ।

‘সাহারাগণ’ের বঙ্কিম-স্মৃতিসংখ্যা সুন্দর, সুগপাঠ্য । অবশ্য-পৌরোদেও ইহা মনে বঙ্কিম সব্বন্ধে অনেক নতুন কথা এ সংখ্যায় সংগৃহীত হইয়াছে ।

ভারতবর্ষ, জ্যৈষ্ঠ—

ঐনিবারণচন্দ্র দাশ গুপ্তের “বর্তমান দর্শন ও বিজ্ঞান সাহিত্যে তাহার ঐতিহ্য” শীর্ষক প্রবন্ধটি মুদ্রিত ; আমাদের সাহিত্যে দর্শন ও বিজ্ঞানের অভাব কিরূপ, তাহা আলোচনা করিয়া লেখক দর্শন ও বিজ্ঞানের ধারা কিরূপে আমাদের সাহিত্যে প্রতিপুষ্ট হইতে পারে তাহার হুঁচি উপায় নির্ধারণ করিয়াছেন—(১) বিশ্ব-বিদ্যালয়ে বঙ্গভাষায় লিখিত দর্শন ও বিজ্ঞান-বিষয়ক গ্রন্থের অবদান । (২) বাঙ্গালার মাসিক ও সাময়িক পত্রসমূহে দর্শন ও বিজ্ঞানবিষয়ক প্রবন্ধের সংখ্যা বৃদ্ধি । উপসংহারে লেখক বলিয়াছেন—“বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনকে নতুনভাবে সজীবিত, নতুন পথে প্রধাবিত এবং অগতের বর্তমান যুগের শিক্ষা ও শিক্ষার উপযোগী করিতে হইলে, বঙ্গসাহিত্যকে বর্তমান দর্শন ও বিজ্ঞানসুপ্রাণিত করিতে হইবে ।” কথাটা অগৌলমিক নয় । তবে দর্শন ও বিজ্ঞানবিষয়ক প্রকাশনোপায়া প্রবন্ধ আমাদের দেশে এত অল্প লিখিত হয় যে মাসিক-পত্রের সম্পাদকেরা অনেক সময়ে তাহাদের ইচ্ছা কাঁধে পরিণত করিতে পারেন না ; বিশ্ব-বিদ্যালয়কেও দোহা দেওয়া যায় না, কেননা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে পাঠ্যোপযোগী গ্রন্থের সংখ্যা খুবই অল্প ।

সেপ অবতুল করিম “বঙ্গসাহিত্যে চট্টগ্রাম” শীর্ষক প্রবন্ধে বলিতেছেন—“চট্টগ্রামের পল্লীতে পল্লীতে প্রাচীন তুলট কাপড়ে লিখিত অসংখ্য পুঁথি বিস্ময় করিতেছে * * * বিলুপ্তপ্রায় প্রাচীন সাহিত্যের উদ্ধারকল্পে চট্টগ্রামে অদ্যাপি দীর্ঘতম কোন চেষ্টাই হয় নাই ।” লেখক এই প্রবন্ধে নিজের দে মন প্রাচীন পুঁথি আলোচনা করিয়াছেন, তাহা হইতে ১৭ জন হিন্দু ও ৯০ জন মুসলমান কবি ও তাহাদের গ্রন্থের নাম উল্লেখ করিয়াছেন । চট্টগ্রামের প্রাচীন পুঁথির উদ্ধারের জন্য লেখক যে চেষ্টা আজ পূর্ণাঙ্গ করিয়াছেন, তাহার জন্য তিনি বহুবাদ্যই । যে সব হিন্দু ও মুসলমান কবির ও গ্রন্থের নাম উল্লিখিত হইয়াছে, আমরা লেখকের নিকট তাহাদের বিশেষ বিবরণ আশা করি ।

ঐন্দ্রদীপোগোপাল যজ্ঞমহারি গুপ্তিপাড়ার কয়েকজন প্রখ্যাতনামা পণ্ডিতের সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশ করিয়াছেন । বঙ্গদেশে অনেক প্রতিভাসম্পন্ন পণ্ডিত অগ্রয়গ্রহণ করিয়াছিলেন যুগের বিশ্ব তাহাদের কথা অনেকই জানেন না । তাহাদের জীবনী সংগৃহীত হইলে বঙ্গসাহিত্যের একটা অভাব যে পূর্ণ হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই ।

“প্রাচীর সহিত উদ্ভিদের সম্বন্ধ ও সাদৃশ্য বিচার” প্রিয়ান্বিতা দেববর্মার প্রবন্ধ ; রচনা বাঙ্গালায় লিখিত, কিন্তু বাহাঙ্গা ইংরাজী প্রাণীভাষ্য মা জানেন তাহারা কলমই এ প্রবন্ধ বুদ্ধিতে পারিবেন না । প্রবন্ধে লেখকের নিজস্ব কিছুই নাই । কতকগুলি ইংরাজী গ্রন্থ হইতে তিনি রচনার বিষয় সংগ্রহ করিয়াছেন, কিন্তু বঙ্গভাষা ও বঙ্গীয় পাঠকের উপযোগী করিয়া তাহা গুচ্ছাইতে পারেন নাই ।

ঐক্যবিহারী গুপ্তের “প্রাশিকার কথা”য় সাময়িক সমস্তার কথা আছে । সাময়িক কথার আলোচনার সময় আসিয়াছে । আজকাল অনেক লিখিত লোক এমন সব সমস্তার পুরণ করিতে যান্ যাঁহা আমাদের সমাজে এখনও আবির্ভূত হয় নাই । লেখক কিন্তু তাহাদের পথ অবলম্বন করিয়া শুধু একটা পাণ্ডিত্য প্রকাশের অবসর খুঁজিয়া লন নাই । তাহার লেখার একটা সারস্বা হুঁচিয়া উঠিয়াছে, একটা সমস্তার মীমাংসা করিয়া চেষ্টাও সর্বত্র এ পরিপুষ্ট । * আরও একটি প্রশংসার বিষয় এই যে তিনি নিজের যাহা অন্তরে অন্তরে

অভূতব করিয়াছেন, তাহাই একাল করিতে গিয়াছেন, কাহারও দ্বারা সবলে পরিচালিত হইয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না ।

ঐজলধর সেনের “অমণ-কাহিনী” লিখিবার নৈপুণ্য “সাগরসঙ্গমে শীর্ষক অবধি একাল উপায়াছে । সরস বর্ণনা ও রচনা-ভাণ্ডার্য এই অবধিটিকে যমোরম করিয়া ফুলিয়াছে । তবে লেখক উপসংহার কিছু তাড়াতাড়ি করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় ।

অস্ত্রাঙ্ক অবধি চিত্তাকর্ষক বিষয় আছে, কিন্তু বিশেষভাবে উত্তেজিত করা যায় এমন কিছু খুঁজিয়া পাইলাম না ।

প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ—

ঐকন্যাকুমার রায়ের “ভাঙ্গার সত্যাতার” অবধি কিছু শীর্ণ হইতেও আমরা সানন্দে ইহা পাঠ করিয়াছি । লেখকের রচনা সুন্দর, ভাষায় সহজ পতি আছে, চিত্তাঙ্গীলতার পরিচয়ও অনেক স্থলে পাওয়া যায় ।

ঐকন্যাকুমার হালদার বাঙ্গালার শিল্পসম্বন্ধে আপনুর অভিমত একাল করিয়াছেন । তাঁহার কতকগুলি কথা বিশেষ অসুখাবস্থার যোগা যেন করিয়া আমরা উদ্ধৃত করিলাম—
“আমাদের আত্মীম কালের পটায় আঁকা পোটোদের চিত্র দেখলে দেখা যায় যে তাতে যোগল প্রকৃতি ভারতবর্ষের অস্ত্রাঙ্ক স্থানের শিল্পীদের মত বর্ণসাজনা বা রেশমি সহজ ও সরল পতির সুভাষ নেই । * * * আধুনিক যুগের আমাদের দেশে এই রূপ অজ্ঞানতার প্রচলন একেবারেই নেই বললে ভুল বলা হয় । কেন না বিংশ শতাব্দীর ইংরেজি শিক্ষার পৌরবাচিনীদের চক্ষুর অন্তর্গত কলকাতা সহরের এক প্রান্তে কালিঘাটে এগনও সেটরূপ পদ্ধতিতে আঁকার প্রচলন আছে । * * * আমাদের শিল্পের অননতির কারণ বিশেষ শিল্পী । * * * আমাদের গদি অজ্ঞাত প্রকৃতি আত্মীম চিত্র, বরজুঘরের মূর্তি প্রকৃতি দেশীয় শিল্পের সঙ্গে * * * পাঠ্য পুস্তক প্রকৃতির মারকতে শৈশবাবধি পরিচয় থাকত তবে আমরা ইংরেজি শিক্ষার দ্বারা বিশেষরূপে গঠিত দেশের শিল্পের বিচার করতে যেতুম না ।” তাঁহার পর বঙ্গশিল্পের প্রকৃতি, বিশেষত ও প্রকৃতি নির্দেশ করিয়া লেখক বলিতেছেন—
“আমাদের দেশে সামান্য ক্রিয়াকর্ম, উৎসবে গৃহস্থালির মধ্যে যে সকল শিল্প এবং সৌন্দর্য্য বৈবাহিক পরিচয় গৃহস্থের ঘরে ঘরে দেখা যেত, আজকাল তারও লোপ হবার সূচনা দেখা দিয়েছে * * * কলার্কেট গদি বসতে হয় তবে দেশী মজার হওয়া চাই । * * * পোড়ের যে সব অতিমিত্রতা রক্ষা করে পুষ্টি (low relief) আত্মীম শোভিত চিত্র পাওয়া যায় সেগুলির ভঙ্গী ও গঠন-সৌন্দর্য্য ভারতের যে কোন মূর্তির চেয়ে হীন ত ময়ই বরং দেশী গৃহস্থ । চুপের বিষয় এই ভাঙাচুরা চক্কা বাঙালি নেই । অবশ্য কৃকনগরের কাছে পুষ্টি বাতীর মূর্তি এবং প্রতিকৃতি গঠনের চেষ্টা কুমোদ-পরিবারের মধ্যে আজও প্রচলিত আছে, কিন্তু তারা তাদের আত্মীমতা একেবারে হারিয়ে ফেলেছে এবং আজকাল বিভিন্ন অল্পকমে প্রকৃতির ছব্ব মকল করার প্রাণশ চেষ্টায় আছে । * * * আমাদের দেশের আধুনিক শিল্পীদের খোড়া থেকেই ধ্যানধারণা হয় রায়ফেল বা মাইকেল এঞ্জেলোর মত শিল্পী হয়ে ওঠবার ; তাঁদের পোটো বললে তাঁরা ছুর হন—আটটি বলে তাঁদের অভিহিত করতে হয় । এটা যে ভারতশিল্পীদের কতদূর অপৌরব ও বাসহামিকর বিষয় তা বোঝবার শক্তি আমরা হারিয়েছি । অবশ্য আমরা আমাদের দেশের আত্মীম কালটাকে আঁকড়ে ধরে চিত্রকাল কৃকনগর একতানে বসে থাকতে বলছি না । আমাদের দেশের বিশেষ রীতিটাকে অবলম্বন করে অন্যে অগ্রসর হতে হবে ।” লেখক শিল্পের দিক দিয়া দেখাইয়াছেন ইউরোপীয় শিক্ষার গর্ভে আমাদের দেশ কতটা অধিকারীকর বসবসী হইয়া আস্তাস্থান বিপর্য্যন করিয়াছে । আমরা যে সর্ব্বতোভাবে বিদেশীয়তার দিকট নিজেদের বাচিয়া বিকায়িয়াছি, তাহা সাহিত্য, দর্শন ও বর্ষের দিক দিয়াও দেখানো যায় ।

এখন এই রূপ অবস্থার সংখ্যা বাড়িয়া যাওয়া উচিত, তবে হয় ত কিকুদিন পরে আম্বাদের মতি পত্তি নিশ্চিত পাবে।

ঐশ্বর্যবান দেবীর “অবশেষ” নামক ছুজ কবিতাটি উদ্ধৃত করিলাম—

“সকল আকাশ ভাঙি যে পরশ। এল আমি

ছনছ ছন্দার, •

অরণ্যে জাঘাতে তারে নাই কোথা একেবারে

কোন চিহ্ন তার :

কেবল কমল-দলে দুই চারি পিঙ্গু জলে

কাঁপিতে করুণ স্তম্ভিত মুকুট। আকাশ।”

এটি এবারকার প্রবাসীর কাব্যসম্পদ।

ঐশ্বর্যবান দেবীর “বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের প্রকৃতি” শীর্ষক প্রবন্ধে সব কথাটি আর সংকলিত, তবে বঙ্গভাষায় ইহার আদর চাইবে। রচনার একটি গুণ এই যে ইহাকে যতটা সরল করা সম্ভব লেখক তাহা করিতে যত্নের একটিও ত্রুটি করেন নাই।

ঐশ্বর্যবান দেবীর “শিক্ষকের আশা ও আশঙ্কা” শীর্ষক প্রবন্ধে বলিয়াছেন যে বাঙালার সাহিত্যিকের মধ্যে অনেকেরই শিক্ষক। শিক্ষকের সাহিত্যচর্চার পক্ষে কত বিষয় তাহার মোটামুটি একটা হিসাব করিয়া ত্রিনি বলিতেছেন—“যদি প্রকৃতপক্ষে দেশে বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, ঐতিহাসিক প্রবেশনা ও সাহিত্যচর্চার পথ সুগম করিতে হয়, তবে শিক্ষকশ্রেণীর মধ্যে এক সম্ভ্রমগকে leasured classএ অর্থাৎ অবকাশভোগী সম্ভ্রমগে পরিণত করিতে হইবে। • • দেশে প্রকৃত জ্ঞানচর্চার প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে বাহিরে Endowed Research chairs অর্থাৎ প্রবেশনা-রুতি স্থাপন করা সর্বপ্রয়োজনে কর্তব্য। অবশ্য এগুলি যে শিক্ষকশ্রেণীর একচেটিয়া হইবে এমন কথা বলিতেছি না।” অবশ্যও ললিতন্যাসের সহিত একমত হইয়াই বলিতেছি প্রস্তাবিত উপায় অবলম্বন করিলে মোটের উপর বেশী কাজ হইবে।

হিন্দুর মূল আরম্ভের কথায় ঐচ্ছরপ্রসাদ শাস্ত্রী দুগাটয়াছেন—হিন্দুরাও ইতিহাস লিখিতে উদারীম নয় হিন্দুর দিক হইতে মালমসল সংগ্রহ করিয়া আরম্ভের একটা ইতিহাস লেখা যায়। অবশ্যই ইতিহাসলিখাতর আদরনীয় হইবে মনেহন্দাই।

“হারামনি” শীর্ষক বিভাগে যে গান দুটি সংগৃহীত হইয়াছে তাহার রস বুঝাইবার নয় বুঝিবার, তাহাতে শব্দভঙ্গর বা ক্রিয়মত্তা নাই, তাহা শ্রুণের সরল উজ্জ্বল।

সবুজপত্র, বৈশাখ—

“যারে বাইরে” ঐশ্বর্যবান দেবীর উপস্থাপন : এই সংখ্যায় ইহার আরম্ভ। যে ভাবে লেখক রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহা হইতে অনেক জিনিস অনুমান করা যায়, কিন্তু বেশী কথা বলিবার প্রয়োজন নাই। আমরা সাংগ্রহে উপস্থাপনটি পড়িতে আরম্ভ করিলাম—দময়ে আমাদের বক্তৃতা একশেষ করিব। এই আরম্ভভাগ ভাবে, ভাষায় কবিবে অপরূপ, স্বানে স্বানে এমন এক একটি স্বলোকর অসম্বদ্ধ বাক্য আঁকে, তাহা পাঠবার অন্তরে রেণাপাত করিয়া যায়।

এ সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের দুটি কবিতা আছে। “আমার গান” শীর্ষক কবিতাটি পড়িয়া বুঝিলাম—লেখকের গান অতল নয়।

“মূল নাই ফুল আছে শুধু গাভা আছে

আলোর অন্ধল নিগে জলের তরঙ্গে এরা নাচে।”

বর্ষার দিনে তাহা উদ্ভাস, চকল হইয়া, বজ্রার ধারার পথ হারাইয়া “দেশে দেশে দিকে দিকে যায় ভেসে ভেসে।” এটি দেশের কথাটা নড়ই অল্পট, তাহাটা ফুটিয়াছে কি।

“ভূমি আমি” কবিতাটিতে লেখক বুঝাইয়াছেন ‘আমি’কে লইয়াই “ভূমি”র আন্তরিকতা, কবিতাটি অমরা বুঝিয়াছি। তবে ইহার রসের মধ্যে ভক্তের আভাস নাই, ভক্তের মধ্যে রসের আভাস আছে। কবিতার মধ্যে রসকে নিরূপণ দেওয়ায় কবির একটা উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে, কিন্তু কবিতা লেখা হয় বলিয়াত মনে হয় না।

“ভাগ্যবির”র ভূমিকাংশ প্রবীণনাথ ঠাকুর লিখিতেছেন “আমাদের চাকলাই যে যৌবনের একমাত্র লক্ষ্য তাহা নহে, তাহার সঙ্গে লিখাদের গাঢ়তাও আছে। * * * যৌবনের প্রথম মাথোঁষে কিছু একটা করিবার জন্ত যখন আমাদের মধ্যে বেদনা জাগে, অথবা যখন কিছু একটা করিবার অস্বীকৃতিও নাই উপকরণও নাই, কেবলমাত্র করিবার উদ্যম আছে—সেই সময়ে নতুন দাঁতের শেপার হাত পা ছেঁড়ির মত আমাদের কথা এবং কাজে আত্মপ্রকাশ প্রকাশ পাইয়া থাকে। * * * আমাদের দেশে যৌবনের উদ্যম বিধতো দিয়াছেন, কিন্তু কাজের ‘লম্বা’ মাপানে তৈরি করে নাট।” একটি পুরাতন ডায়েরীর কলেক পাতা লেখা একাল করিয়া লেখক দেখাইতে চান—যে শক্তি খড়ানতই ব্যক্তির দিকে সার্থকতা পৌঁছে, তাহা প্রতিহত হইয়া নিজের মধ্যে পাক পাইয়া বেড়ায়। আমাদের দেশের যুবকদের এই রূপ এবং এই বিপদ। উদ্ধৃত ডায়েরীর মধ্যে লেখকের গভীর চিন্তাশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়।

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবীর “সখা” শীর্ষক প্রবন্ধটির রচনারীতি কল্পন, কথোপকথন এবং অনর্থক বাহুল্য বা অনাবশ্যক আড়ম্বরের উপাধরণ নাই। যে কথা তিনি বলিয়াছেন তাহাতে সত্য আছে, লেখিকার শৈল্পিকতার পরিচয়ও অনেক স্থলে পাওয়া যায়।

“অরুণা”র টাইপ ভেট, আমাদেরও দৃষ্টিশক্তি কিছু কম—সেই জন্ত ইহার ভাষা ও ভাব দুটিতে পার্থক্য নাই।

সাহিত্য-সমাচার ।

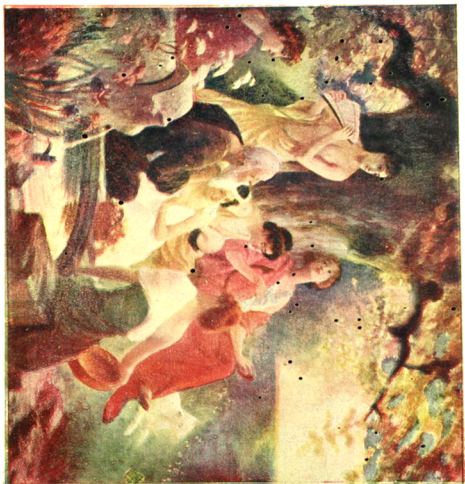
শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাস ‘রত্ন-দীপ’ পুস্তকাকারে এই সপ্তাহের মধ্যেই বাতির চটবে। “রত্নদীপ” এবং প্রভাতবাবুর “গল্পাঞ্জলি” এই দুইখানি পুস্তকের প্রচলনী অম্বুবাদ-অধিকার, এলাহাবাদের ইণ্ডিয়ান প্রেস প্রকাশকের নিকট ক্রয় করিয়া লইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায়ের ‘উকাত-ভাক্তার’ নামক রক্ত-লচরীর নবম উপন্যাস যন্ত্র, নীচই প্রকাশিত হইবে।

শ্রীযুক্ত ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘বাল্যকাল বেগমের’ ইংরাজী অম্বুবাদ সম্বন্ধেই প্রকাশিত হইবে।

শ্রীযুক্ত জলধর সেনের ‘কিশোর’ আগামী ১লা জুলাই বহুচিত্র শোভিত হইয়া প্রকাশিত হইবে।

শ্রীযুক্ত ফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘পরিকণা’ ছাপা শেষ হইয়াছে, ছই এক সপ্তাহের মধ্যেই প্রকাশিত হইবে।



মানসী

৭ম বর্ষ
১ম খণ্ড

শ্রাবণ ১৩২২ সাল

১ম খণ্ড
৬ষ্ঠ সংখ্যা

সন্ধান

তোরা আমার বসিনে কেউ

বসিনে তার নাম,

তারে আমি আপনি জ'ব গুঁহে—

কোন্ থানে তার বৈশা কাটে

কোথায় বসত-গ্রাম,

অমন করে' দিগ্গে কাণে

যেমন করে' তল্লা-ঘোরে

স্বপ্নে পেয়ে ভগ,

জননী তা'র ব্যাকুল-

অন্ধকারে শয্যা' পরে

বন্ধে টেনে লয়,

হাত্‌ড়ে-পাওয়া, হারিয়ে-বাওয়া ছেয়ে—

ভেমনি ক'রে গুঁহর তারে

অন্ধ অহরাসে,

স্বপ্ন মনের গভীর নাড়ীর টানে,

• তল্লা-ঘেরা অন্ধকারে

শকা যদি জাগে

গুঁহর তারে অন্ধর মাঝখানে

গুঞ্জর আমি আপন চোখে,
 বুঝব আপন কাণে,
 পরণ করে' পরণ করে' হাতে,
 বৃন্দ আলো অককারণে
 বৃন্দ আপন প্রাণে
 জ্বলন্ত মোড়ে জ্বলন্ত বেদনাতে ।
 বারেক গগন পেয়েছি তার
 গোপন পরিচয়
 বারেক গগন সুলিয়েছে মোর মন,
 তখন আমি যাবই কাছে
 যেমন করেই হয়,
 জীবন মরণ দটল আমার পথ !
 দেখি কেমন ঠেকিয়ে রাখে
 কি দিয়ে আজ মোরে,
 ভুলিয়ে কেমন দেয় সে আমার কৃপা,
 কেমন করে' লুকিয়ে থাকে
 'দেখি কেমন করে'
 মনোবনের পালিয়ে-নাওয়া পাণী ।
 'কি শু তোরা বলিস্ নাক
 কি সে পাণীর নাম,
 তারে আমি আপনি লব গুঞ্জে—
 সেট ত আমার গর্ল, তাহার
 কোথায় গোপন ধাম
 আপনি যদি চিন্তে পারি বুঝে ।

শ্রীমতীজমোহন বাগচী

বাইস্পত্য-দর্শন বা নাস্তিবাদ । *

গদি ও শাস্ত্রসমূহের মিলন অথবা মিলিত শাস্ত্রসমূহ, সাহিত্য শব্দের ব্যুৎপত্তি-পতা অর্থ, তথাপি, দীর্ঘকাল হইতে কাব্য ভাষ্যেই সাহিত্য শব্দ ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে । “সাহিত্যরহিতঃ পদুঃ” “সাহিত্য স্বকুমারবস্ত্রনি ভূষণায় এতিলে” ইত্যাদি শ্লোকাংশে সাহিত্য শব্দ কব্যার্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে । সম্ভবতঃ ইহার কারণ এই যে, কাব্যগ্রন্থে সকল শাস্ত্রেরই সম্মিলন থাকে, তদ্বিধান কাব্যকেই সাহিত্য বলে । অথবা “সাহিত্য” একটি পারিভাসিক শব্দ নহন করিয়া, কেবল কাব্যই সাহিত্য নামে অভিহিত হয় । প্রকৃতপক্ষে, সাহিত্য শব্দের যোগার্থানুসারে পুরাণাদিও সাহিত্য শব্দবাচ্য হয় ; কিন্তু সাধারণতঃ, লোকে পুরাণাদিকে সাহিত্য বলে না । মহাকবি শ্রীহর্ষ, সাহিত্য ও পুরাণকে বিভিন্ন শাস্ত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন । তিনি, নৈমদ-চরিতের দশম সর্গে সরস্বতীর বর্ণন-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন, “ঐশ্বরী ভূতবলী বিভঙ্গা, সাহিত্যানির্লঙ্কিত-দৃকুত্তরঙ্গা ।” “সপলবৎ ব্যাসপরাশরাত্মাঃ শ্রীমত ভাবাত্মদীপবিন্দু । তদ্ব্যস্তপদ্মপলক্যমাণঃ যৎ পাদিগুণঃ বহুতে পুরাণম্” । এই শ্লোকে প্রতীত হইতেছে যে, শ্রীহর্ষের মতে পুরাণ সাহিত্য নহে । অনেক টীকাকারও “সাহিত্যানির্লঙ্কিতদৃকুত্তরঙ্গা” এই শব্দের “সাহিত্যেতান কাব্যোন” এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন । সাহিত্য শব্দের অর্থ মিলিত শাস্ত্রসমূহই হউক, আর কেবল কাব্যই হউক, সমাক্রমে সাহিত্য পাঠের উদ্দেশ্য সকল করিতে হইলে, আশ্রয়-জ্ঞান লাভের চেষ্টা করা অবশ্য কর্তব্য এবং অধ্যাত্ম-শাস্ত্রের অমুশীলনই তাহার একমাত্র উপায় । কাব্যশাস্ত্রের চতুর্বর্গ সাধনত্ব-বিষয়ে দর্পণকার বিশ্বনাথ, প্রদর্শন করিয়াছেন যে, “চতুর্বর্গগণপ্রাপ্তিঃ স্বধাধর্মদিয়ামপি । কাব্যাদেব যতন্তেন তৎস্বরূপং নিগদ্যতে ।” “ধর্মার্থ-কাম-মোক্ষেষু বৈচক্ষণ্যং কলাম্ চ । কলোতি কীর্তিং শ্রীতিঞ্চ সাধুকাব্যানিমেবণং ।” এই চতুর্বর্গ মধ্যে অপবর্গাপর-নামধেয় বোদ্ধরূপ ফলই সর্বপ্রথম । আশ্রয়ত্বপরিজ্ঞান ব্যতিরেকে মোক্ষলাভ হয় না । সর্বধর্মমোহী চার্লক হইতে একদত্তী, বেদান্তী পরাশর, কি শ্বেতাশ্বর, কি দিগম্বর, কি যোগাচার, কি দোক্তাস্ত্রিক, কি বৈভাসিক, কি মাধ্যমিক, সমস্ত দর্শনকারই সমন্বরে বলিয়াছেন, আশ্রয়ত্ব-জ্ঞান ব্যতীত মুক্তি লাভের সম্ভাবনা নাই ।

আত্মা দুই প্রকার; পরমাত্মা ও জীবাত্মা । পরমাত্মাই জৈবর । এতদ্বিষয়ে প্রতিতে উক্ত হইয়াছে যে,

“বেদাহ মেতং পুরুষং প্রধানং আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরম্ব্যং ।

তমেত্ৰ বিদিত্যতিমুত্থামেতি নীল্যুঃ পদ্মা বিদ্যতেহয়নার ॥”

জীবাত্মজ্ঞানবিষয়ে “আত্মা জাতবো ন স পুনরাবর্ততে” ইত্যাদি বহুতর প্রতি পরিগমিত হয় । লৌকে যাহাকে তত্ত্বজ্ঞান বলিয়া থাকে, তাহার অর্থও ঐ আত্মতত্ত্ব জ্ঞান । সেই আত্মতত্ত্বজ্ঞানোদয়েই মিথ্যা জ্ঞানের অপায় হয়, মিথ্যা জ্ঞানের অপারে রাগ-দেব-মোহাদ্বয়ক দোষের নিবৃত্তি, দোষের নিবৃত্তিতেই প্রবৃত্তি বা প্রগতি-সাধন-দর্শাদ্বয় বিলুপ্ত হয় । দর্শাদ্বয়ের বিলোপে পুনর্জন্মের নিবৃত্তি, পুনর্জন্মের নিবৃত্তিতে সর্বভুতের অবসান হয় ; এই ভুতের অবসানই অপবর্ণ নামে অভিহিত ।

এতদ্বিষয়ে অক্ষপাদ-দশনের দ্বিতীয় হস্তে লিখিত আছে যে, “হুংখ ‘জন্ম’ প্রবৃত্তি ‘দোষ’ মিথ্যা জ্ঞানমুক্তরোত্তরাপায়ে তদনন্তরাপায়া দর্পবর্গঃ ।” শঙ্করাচার্য্য বেদান্তভাবে সমন্বয়াদ্বয়ের প্রথম পাদের প্রথমেই “তথাচাচার্য্যপ্রণীতং জ্ঞানোপনৃহিতং বাক্যং” এই বলিয়া পূর্বোক্ত জ্ঞানহস্তটী উদ্ধৃত করিয়াছেন । বিশেষ এই যে, দেহাদ্বয়বাদি নিবন্ধন পুনর্জন্মাতাববাদী চার্ব্বাকাদির মতে তত্ত্বজ্ঞানের পর, কারণক্রমে মিথ্যা জ্ঞানাদির অভাব বশতঃ ইহ জন্মেই জন্মবৃত্তির অভাব নিবন্ধন স্মৃত্তরূপ প্রতীকসিদ্ধ, সকল হুংখ নিবারণের নিদানীভূত মুক্তি লাভ হয় । এ মতে, হুংখনিবৃত্তি মুক্তির অবাস্তব ফল । পারতত্ত্বা নিবৃত্তি ও স্বাতন্ত্র্যই মোক্ষের মূখ্য ফল । • অস্তান্ত মতে দেহপাতের পর অস্তান্ত হুংখ নিবৃত্তি রূপ পরমমুক্তি লাভ হয় । কোন কোন মতে হুংখাতাবের পরও • আনন্দাভিব্যক্তিরূপ মুক্তি লাভ হয় । সকল মতেই মুক্তিলাভের সাক্ষ্য কারণ তত্ত্বজ্ঞান ।

দর্শনকার বিশ্বনাথ, কাব্যশাস্ত্রের মোক্ষোপযোগিতা বিষয়ে দেখাইয়াছেন যে, “মোক্ষপ্রাপ্তিঃ চৈতজ্ঞত্বকর্মফলানুসঙ্গানাং, মোক্ষোপযোগিবাক্যো নৃৎপত্তাধারকস্বাক্ষ । যদিও ভগবদ্গীতাতে “বুদ্ধঃ কর্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তি মাগ্নোতি নৈষ্টিকীঃ ।” “যোগিনঃ কর্ম কুর্ষন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাশুশুভয়ে ইত্যাদি বাক্য আছে, তথাপি বিশ্বনাথ-প্রদর্শিত প্রথম হেতুটী গ্রহণ করিতে পারা যায় না । কারণ, কাব্যশাস্ত্র পাঠে রামাদির চরিত্রজ্ঞান প্রভাব, তদনুকরণে লোকের অপ্রভাৱ করিলে তচ্ছনিত পুণ্য চিত্তশুদ্ধি হইবে, তৎপরে বেদান্তাদি

শাস্ত্রাধায়েন অধিকার জন্মিবে, তারপর যোগাভাসাদির অনন্তর মোক্ষ হইবে ; এত দূরবর্তী ফল শাস্ত্রের প্রয়োজন হইতে পারে না । দ্বিতীয় ছেতুটি কথকিং গৃহীত হইতে পারে বটে, কিন্তু কাব্যশাস্ত্র পাঠ, মোক্ষপ্রতিপাদক শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভের উপায় বলিয়া মোক্ষের হেতু, ও কাব্যশাস্ত্রের উদ্দেশ্য মোক্ষলাভ, এ কথাও সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না । “কাবাং যশসেহর্থা কৃত্যে বাবহারমিদে শিবেতরক্তয়ে । সদাঃপরান্নিবৃতয়ে” ইত্যাদি বাক্যে কাবোর সাক্ষাৎমুক্তি কারণতাই প্রতিপাদিত হইয়াছে ; অতএব, কাব্যশাস্ত্র পাঠানন্তরই জীবাত্ম-পরমাত্মত্বের শাস্ত্রজ্ঞান হইয়া থাকে, ইহা বলিলে বাক্য অসত্য হয় না । “যদি প্রবোধচন্দ্রোদয়নাটক ও বিদ্যোদত্তরঙ্গিণী প্রভৃতি গ্রন্থ, কাবোর মধ্যে পরিগণিত হয়, তবে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, কাব্যাদীন আত্মতত্ত্বজ্ঞান হইবে । কালিদাসের কুমারদম্ভব, শ্রীহর্ষের নৈষধচরিত প্রভৃতি পর্ণ্যালোচনা করিলেও দেখা যায় যে, তদ্ব্যধোও গূঢ়রূপে আত্মতত্ত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে ; এই জন্ত জ্ঞানচাৰ্য্য জগদীশ তর্কালঙ্কার “শ্রোতব্যঃ প্রতিবাক্যোক্তো মন্তব্যঃশোপপত্তিভিঃ । মন্ত্যচ সততং ধ্যেয় এতে দর্শনহেতবঃ ।” এই বাক্যের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, স্তূতাজ্ঞপ্রমীলনস্ববোধক প্রতিশব্দ এখানে প্রমাণ শব্দরূপে গ্রহণ করিতে হইবে ; অজ্ঞা নিরান্দষ্টে কর্ত্তনাপত্তি দোষ হয় । অর্থাৎ, যে কোন শব্দদ্বারা আত্মতত্ত্ব শ্রবণ করিলেই, তাহা তত্ত্ব-সাক্ষাৎকারের উপযোগী হয় । কাব্যশাস্ত্রে তাহা প্রচুর পরিমাণে বিস্তৃত আছে ; তবে আত্মতত্ত্ববোধক কাব্যে ব্যুৎপত্তি লাভ করিবার জন্ত দর্শনশাস্ত্রের সহায়তা আবশ্যক ।

কাব্যচম্পিকার ঢীকাকার রাজসাহী পুটিয়ার স্বর্গগত ৬৬শানচন্দ্র বিজ্ঞাবাগীশ মহাশয় আভাসে এই বিষয়ের অবতারণা করিয়া গিয়াছেন ।

দর্শনশাস্ত্রের কথা, কোন দিন বঙ্গভাষাতে স্থান পাইবে, আমাদের একদম বিশ্বাস ছিল না । ২৪ পরগণার এডেঁদহ নিবাসী ৬কাদীনাত্ম তর্কপকানন মহাশয়, বড় বৎসর পূর্বে, বিশ্বনাথকৃত ভাষাপরিচ্ছেদের বঙ্গভাষায় অম্বুবাদ প্রসঙ্গে সংস্কৃতদর্শনের নানাবিধ কথার উল্লেখ করিয়া “পদার্থকৌমুদী” নামে বঙ্গভাষায় একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত করিয়াছিলেন ; ঐ গ্রন্থ নুদ্রিতও হইয়াছিল । গ্রন্থের মুখবন্দে গ্রন্থকার বলিয়াছিলেন ;—

“ভাবিলে ভাবনা যাবে

অন্ধকারে আলো হবে

দৃষ্টিব্রাত পদার্থ-কৌমুদী ।

“পরম ঈশ্বরের ভাবি

কহে কালীনাথ কবি

• উপনাম তর্কপঞ্চানন ॥”

গ্রন্থখানি পর্যালোচনা করিলে কবির বাক্য সত্য বলিয়াই প্রতীত হয়। তিনি যেক্ষেপে পারিভাষিক ভটিল শব্দময় ন্যায়শাস্ত্রের তাৎপর্গ্য, তৎকালের ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন, ঈশ্বরের অসুগ্রহ বাতীত তাহা অসম্ভব। পদার্থ-কৌমুদী দৃষ্টিমাত্রেই যে ন্যায়শাস্ত্রের পদার্থ-তত্ত্বে অভিজ্ঞতা লাভ হয়, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। তৎপরে বিষয় এই যে, ঈদৃশ উপদেশ গ্রন্থে বঙ্গ-সাহিত্যসমাজে সমাদর লাভ না করিয়া বহুশী প্রচার প্রাপ্ত হয় নাই, এবং বর্তমানের বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে। পুস্তকখানি একবার মাত্র মুদ্রিত হইয়াছিল। এক্ষণে ঐ পুস্তক কোন কোন স্থানে পাওয়া যাইতে পারে।

তৎপরে রাজসাহী বাহুদেবপুরের ঐতিহাসিকশোর তর্কবাগীশ মহাশয়, “জায় পদার্থতত্ত্ব” নামে একখানি ছায়দর্শনের দোষপত্রিক বঙ্গাহুবাদ বর্তমান বঙ্গভাষায় প্রচার করেন, সে গ্রন্থেরও বঙ্গসাহিত্যসমাজে সমাদর লক্ষিত হয় না। ছায় পদার্থ তত্ত্বে জ্ঞাতি-সাক্ষর্গ্য প্রভৃতি অতি চক্ৰহ বিষয়ের অতি সরল ব্যাখ্যা ও দোষপত্রিক উদাহরণ প্রদর্শিত হইয়াছে; তথাপি সে গ্রন্থের সমাদর হইল না দেখিয়া আমরা হতাশ হইয়াছিলাম; কিন্তু গত বৎসর কলিকাতা নগরীর সাহিত্য সন্মিলনীতে, মহামহোপাধ্যায় কবিসম্রাট, বারেন্দ্র পণ্ডিত কুলচূড়ামণি শ্রীযুক্ত যাদবেন্দ্র তর্করত্ন মহাশয় লিখিত প্রবন্ধে কাব্যশাস্ত্র পড়িতে হইলে দর্শনশাস্ত্র জ্ঞান আবশ্যক, তৃত্ত্ব, মূর্ত্ত্ব উপাধি বা জ্ঞাতি এবং অভিহিতান্দ্রবাদী নীমাংসক ও অধিতাতিধানবাদী নীমাংসক ইত্যাদি শব্দ উল্লিখিত হইয়াছিল। সুযোগা “নান্দী”-সম্পাদক মহাশয় নিরতিশয় আগ্রহের সহিত ঐ প্রবন্ধটি স্বসম্পাদিত পত্রে প্রকাশিত করিয়াছেন। তৃত্ত্ব, মূর্ত্ত্বের জ্ঞাতিতা, সাক্ষর্গ্য দোষপ্রযুক্ত নৈয়ায়িকগণ স্বীকার করেন না। ন্যায়ের ভাষায় সাক্ষর্গ্য দোষের উল্লেখ করিতে হইলে স্বসামান্যাদিকরণ, স্বাভাববদন্তিত্ত্ব, স্বসমান্যাদিকরণ্যভাব প্রতিবোধিত, এতদ্রিত্য সম্বন্ধে জ্ঞাতিবিশিষ্টত্ব এইরূপ বলিতে হয়। একখাটি ন্যায়শাস্ত্রের প্রথমপাঠীর ভাষায় বলা হইল। বিতুক্ত ন্যায়ের ভাষায় বলিতে হইলে, গাছাদের ন্যায়শাস্ত্রে গভীর জ্ঞান আছে, তাঁহারা বাতীত কেচ এই সাক্ষর্গ্য দোষ বুঝিতে পারেন না। সাক্ষর্গ্যদোষ প্রযুক্ত তৃত্ত্ব, মূর্ত্ত্ব এই উভয়কে উপাধি স্বীকার না করিয়া একটিকে জ্ঞাতি ও অপরটিকে উপাধি স্বীকার করিলেই হইতে পারে, এই পূর্ব্বপক্ষ দীর্ঘকাল হইতে নৈয়ায়িক-সমাজে প্রচলিত

আছে। গদাধর ভট্টাচার্য্য মহাশয় অস্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক মূর্ত্ত্বের
সাক্ষ্যবিষয়ে অনেক বিচার করিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত তর্কবাণীশ মহাশয়
জ্ঞান-পদার্থতত্ত্বের সাক্ষ্যের জাতিবোধকতা বিষয়ে সরল যুক্তি ও মানচিত্র
দ্বারা সাক্ষ্যের স্বরূপ প্রদর্শন করিয়াছেন। নৈয়ায়িকচূড়ানবি সর্ব্বলোকপূজ্য
মহামহোপাধ্যায় রাখালদাস জায়রাম মহাশয় স্বরচিত্ত “তিনবিধ বিচার”
নামক গ্রন্থে সোপপত্তিক মতমাণ ভূতত্বের উপাধি ও মূর্ত্ত্বের জাতি
প্রতিপাদন করিয়াছেন। তথাপি নৈয়ায়িক-সমাজে উহা লইয়া বিচার
অভাব নাই। যে সকল ব্যক্তি নিম্নত দর্শনধাত্মের অস্বাভাবিকতা করেন,
মধ্যেও অনেকেই প্রত্যক্ষের অধিতাভিধান বোধশক্তির অভাবে, পুস্তকের
যে যে অংশে অধিতাভিধানবাদ লিপিবদ্ধ আছে, তদনুসারে বাদ দিয়া
অধ্যাপনা করান। এক্ষণে বিবেচনা করুন, যে সকল বিষয় কালীনাথ তর্কপঞ্চানন,
প্রচ-
লিত বঙ্গভাষায় বিশদ ব্যাখ্যা করিলেও এবং তর্কবাণীশ মহাশয় সমুদ্রিত
বঙ্গভাষায় ব্যাখ্যা করিলেও, আর রাখালদাস জায়রামের মত লক্ষপ্রতিষ্ঠ
পণ্ডিতে নীমাংসা
করিলেও অবোধা ও অমীমাংসা বলিয়া লোকের ধারণা আছে, সেই
বিশুদ্ধকর
অধিতাভিধানবাদের ও চর্চাধা জাতিসাক্ষ্যের নামত উল্লেখমাত্র
করিয়া
তর্করত্ন মহাশয় খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। ইহাতে, আমরা আশাবিত
হইয়াছি
যে, এখন আমাদের এমন শুভদিন উপস্থিত হইয়াছে যে, দার্শনিক
পারিভাষিক
শব্দগুলি ক্রমশঃ বঙ্গভাষায় প্রবেশাধিকার লাভ করিবে, সুতরাং
হিন্দুদর্শন শাস্ত্র
মাত্রই বঙ্গভাষায় ব্যাখ্যাত হইতে পারে, এই সাহসেই আমরা
অন্য বিশুদ্ধকর
বার্হম্পত্য-দর্শনের কঠিন তাৎপর্য্য বঙ্গভাষায় বিবৃত
করিতে সম্মত হইয়াছি।

বার্হম্পত্য দর্শনের কোন বিশেষ পুস্তক আর দেখা যায় না।
মাধবাচার্য্যের “সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহে” চার্কাকদর্শন নামে যে বিস্তৃত
সংগ্রহ আছে, তাহাই এখন বার্হম্পত্য দর্শন বলিয়া প্রসিদ্ধ।
বার্হম্পত্য মতাবলম্বী দার্শনিকদিগকে চার্কাক,
লোকায়ত বা লোকায়তিক শব্দে অভিহিত করা হইয়া থাকে।
পণ্ডিতগণ, চার্কাক শব্দের বিবিধ অর্থ করিয়া থাকেন। চার্ক
বাক্ বাহাদুর এই বহুব্রীহি
সমাসে পুণ্যদ্রাবি প্রযুক্ত চার্কাক পদসিদ্ধ। এইরূপ
ব্যুৎপত্তিবাদীরা বলেন যে,
নার্হম্পত্য মতাবলম্বিগণের বাক্য অতি
সুন্দর। পারলৌকিক
অদৃশ্য জগতের
জ্ঞান দৃষ্ট কঠোর কারণীভূত
উপবাসাদি করিও না, অহিংসারূপ
পরমার্থ আচরণ
কর, আত্মনির্ভরতা
অবলম্বন কর। কাপুরুষায়মান
অকর্ম্মদিগের “আমি

কাঠপুতলিকার গ্রাম কিছুই নহি, আবার উপরে অদৃশ্য ঈশ্বরনামে এক কঠোর আছেন ও কঠোর অহুচর বসবস দেবতা আছেন, সেই কঠোর বা কঠোর অহুচর-বর্গ, আনাকে যে পথে প্রেরণ করেন, আমি সেই পথেই প্রেরিত হই ; আমি কিছুই নহি" ইত্যাদি আত্মানন্দরূচক উপদেশের বশবর্তী হইও না । স্বয়ং স্বাভাব্য অবলম্বন কর, স্বাভাব্যই পরমসুখ, পরমশান্তি, চরম চঃখাভাবের কারণ । এই জ্ঞাত স্বাভাব্যই মুক্তি বা পরমসুখার্থ বলিয়া অভিহিত হয়, ঈশ্বর প্রতিমধুর অমৃতাত্মনাম জ্ঞান বাস্তব উপদেশেই বলিয়া 'চার্লস' এই নাম হইয়াছে ।

* কেহ কেহ বলেন, 'অর্কান্ট' শব্দের আদিতে চকারাগম ও অন্তে অকারাগম ও চকারস্থানে ক করিয়া প্ৰযোদনাদিপ্রযুক্ত চার্লস পদ দিক । ইহাদের মতে চার্লস শব্দের অর্থ অর্কান্দর্শী; অর্থাৎ ইহারা ইঞ্জিয়জ্ঞানমাত্র স্বীকার করেন, অথবা ইহাদের তাদৃশজ্ঞানমাত্র আছে । ইহারা প্রত্যগাত্মা ও প্রত্যগ্দর্শন স্বীকার করেন না । করেন না । প্রতিতে ও 'পরাক্রিয়ানি বাতৃণাৎ স্বরভূতশ্চ' পরাক্ষ পশ্চতি নাস্তরায়ন্ । এইরূপে ইঞ্জিয়ের ও ইঞ্জিয়জ্ঞান মাত্রের প্রামাণ্যবাদিগণের নিন্দা পরিলক্ষিত হয় । এই পরিদৃশ্যমান লোকে নান্য আশ্রয় অর্থাৎ বিপ্লব বা বিজ্ঞান আছে, কেবল তদ্বিষয়ক জ্ঞানবান্ বাজি-রাই লোকায়ত বা নোকারিত্ত্ব নামে আখ্যাত হ চার্লসগণ কেবল প্রত্যক্ষের প্রামাণ্য বাস্তব অস্বমানাদির প্রামাণ্য স্বীকার করেন না ।

মহাভারতেও 'চার্লস' শব্দ উল্লিখিত আছে । মহাভারতকার, চার্লস কোন ব্যক্তিবিশেষের নাম বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন । মাদবাচার্য্যও "বৃহস্পতি মহামুসারিণা নাস্তিক শিরোনামিনা চার্লসকেন" এইরূপ শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন । তাঁহার এই লিপিতত্ত্বিতেও চার্লস ব্যক্তি বিশেষের নাম বলিয়াই বোধ হয় । মহাভারতের চার্লস ও মাদবাচার্য্যের চার্লস এক ব্যক্তি বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে কেহ কেহ চেষ্টা করেন, কিন্তু অপক্ষপাতে পর্যালোচনা করিলে দেখা যায়, মহাভারতের চার্লস ও দার্শনিক চার্লস সম্পূর্ণ বিভিন্ন ব্যক্তি ।

বাইস্পত্য-দর্শনের এতদৃশ ক্ষীণপ্রচারের কারণ কিছুই উপলব্ধ হয় না । কেহ কেহ বলেন, বাইস্পত্য দর্শনে নাস্তিকতা, বেদনিন্দা ও পন্থাচার প্রভৃতির বিপ্লব বিবরণ বিজ্ঞান পাকাতাই ঐ শাস্ত্র বিপ্লব হইয়াছে ; একথা সমাক্ষ বিশ্বাসযোগ্য বোধ হয় না । কারণ, বৌদ্ধেরাও বেদনিন্দক, জৈনগণও বৈদিক ধর্মের বিরোধী । হিন্দু পুরাণাদিতে ও সংহিতায় বৌদ্ধ ও জৈনগণের অনেক প্রকার নিন্দা আছে এবং তাহাদিগের দর্শকে পান্ড ও তাহাদিগকে পান্ডী

বা পাশ্চাত্য প্রভৃতি ধর্মাবলম্বী শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে । তবে, ব্রহ্মসংহিতাকুল ২১১টা শ্রুতি যেমন বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম গ্রহণ করিয়াছেন, চার্মাক দর্শনেও তদ্রূপ অষ্টকুল শ্রুতি পরিগৃহীত হইয়াছে ।

এই আপত্তিতে অনেকে সিদ্ধান্ত করেন যে, বর্তমানযুগে কিছু দিবস পূর্বে, যেক্রপ, ইংরেজী পড়িলেই বালকগণ পৃথান হইবে, এষ্ট নাস্তিক বশবর্তী হইয়া গ্রাম্যলোকে সম্ভ্রানগণকে ইংরেজী পড়িতে দিত না, ক্রমে শিক্ষার আলোকে যোকেব্দ ছন্দ উদ্ভাসিত হইলে, সেই ভ্রম অপনীত হইয়াছে ; তদ্রূপ শিক্ষার স্বল্পপ্রচার সময়ে বেদনিন্দাকল্পে বাহ্যস্পত্য-দর্শন প্রবীত হইয়াছিল বলিয়া, তাহা সকলে গ্রহণ করেন নাই । শিক্ষার স্রোত ভারতভূমিতে প্রবাহিত হইবার সময়ে বৌদ্ধ ও জৈন প্রভৃতির ধর্মপ্রচার ও ধর্মগ্রন্থাদির প্রণয়ন হইয়াছিল ; তদ্ব্যতীত বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম এবং তদীয় ধর্মগ্রন্থের বহুলপ্রচার দেগিতে পাওয়া যায় এবং অন্য ধর্মাবলম্বীরাও বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিয়া থাকেন ।

বাহ্যস্পত্যদর্শনের মতাবলম্বি-পণ্ডিতগণ নাস্তিক নামে অভিহিত হয় । মনু প্রভৃতি সংহিতাকারগণ নাস্তিকতাকে উপপাতকমধ্যে পরিগণিত করিয়াছেন । “পাতকেভ্যঃ পরং নাস্তি পাতকং নাস্তিকগ্রন্থাদিত্যাশি” বচনে চরক-সংহিতাতেও নাস্তিকতার নিন্দা থাকায় এবং বৈদিক-ধর্মপ্রচুর দেশে বাহ্যস্পত্য মতাবলম্বিগণ নাস্তিক বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করায় তাহাদের ধর্ম ও গ্রন্থ সূত্রপ্রচারিত হয় নাই ; যাহা কিছু ছিল, তাহাও বিলুপ্তকর হইয়াছে । এই কথাই উপরও সম্যক বিশ্বাস স্থাপন করা যায় না ! “যোহনদীত্য দ্বিজোবেদমন্ত্রা কুরতে শ্রমঃ । সম্ভবয়েব শূদ্রশ্রমশ্চ মাশু গচ্ছতি সাধরঃ ।” এই মনুবচনের ব্যাখ্যায় অনেক টীকাকার বলিয়াছেন, যাহারা বেদবিরুদ্ধ পাশ্চাত্য (বৌদ্ধাদি) শাস্ত্র অধ্যয়ন করে, উহারাই শূদ্র প্রাপ্ত হয় ; সুতরাং কেবল বাহ্যস্পত্য মতাবলম্বিগণকেই, বৈদিক সম্প্রদায় ঘৃণা করিত এমন নহে ; বৌদ্ধাদিকেও ঘৃণা করিত ।

নাস্তিক শব্দের প্রকৃত অর্থ নিরূপণ করিতে গেলে, ‘মাম্যামিক শ্রেণীর বৌদ্ধই প্রকৃত নাস্তিক হইয়া পড়ে । অমরসিংহ বলিয়াছেন, “মিথ্যাদৃষ্টিগাতি-কতা” তাহার এই বাক্যানুসারে যদি, যথাকথঞ্চিৎ মিথ্যাদৃষ্টিকে নাস্তিকতা বলা যায়, তবে এক প্রভাকর-মতাবলম্বী পণ্ডিত বাতীত অন্য সকলকেই নাস্তিক বলিতে হয় । নৈয়ায়িকেরা বলিয়া থাকেন, ‘মিথ্যাজ্ঞানাহিতা বাসনাই সংসারের মূল’ সুতরাং তাহাদের মতে মিথ্যাজ্ঞান-স্বীকার আছে । সাংখ্যপাতঞ্জলও অবি-

দাদি পুঙ্খ ক্রেশ স্বীকার করিয়া “অবিদ্যাক্ষেত্র সুত্তেরমাং” ইচ্ছা দ্বারা প্রকারান্তরে সংসারের অবিদ্যামূলকত্বই স্বীকার করিয়াছেন। অবিদ্যাক্ষেত্র অর্থ ধরিলে মিথ্যাজ্ঞানই পর্য্যবসিত হয়। বৌদ্ধদর্শনেও সংবৃতি নামক পদার্থ স্বীকৃত আছে। সংবৃতি শব্দের অর্থ করিতে গেলেও মিথ্যাজ্ঞানই উপলব্ধ হয়। বেদান্তদর্শনে অদ্বৈত বা অবিদ্যা বলিয়া যে পদার্থ স্বীকৃত আছে, তাহার অর্থও মিথ্যাজ্ঞান। জৈন-দর্শনে স্পষ্টই উক্ত হইয়াছে, “মিথ্যাজ্ঞানবিরহিত্য প্রমাদকরায় যোগাঃ পঞ্চ বক্রহেতবঃ।”

জৈমিনিদর্শনের ব্যাখ্যাভূষণ, বিশেষতঃ প্রভাকর, তান্ত্রিজ্ঞান স্বীকার করেন না, হুতরাং তাঁহাকে নাস্তিক বলিতে হয়; কিন্তু অন্যান্য দর্শনকারগণ, প্রভাকরকে নাস্তিক বলিয়া বাস্তব বিজ্ঞপ করিতে ক্রটি করেন নাই। এমন কি কুমারিল ভট্টকেও অনেকে নাস্তিক বলিয়া বাস্তবিক করিয়াছেন।

তবে যদি নাস্তিক শব্দের এরূপ অর্থ ধরিয়া লওয়া যায় যে, যাহারা সর্বপা মিথ্যাশ্রুতি অর্থাৎ যাহাদের মতে কোন বস্ত্তবিষয়ক জ্ঞানই অর্থার্থ জ্ঞান নহে, তবে মাধ্যমিক বৌদ্ধই নাস্তিক পদবাচ্য হয়। কারণ, মাধ্যমিক বৌদ্ধেরা ভগবতের কোন বস্ত্তরই পরমার্থসত্তা স্বীকার করেন না। উৎতারা বলেন, “শূন্যং তৎ ভাবো বিনশ্রুতি, বস্ত্তদর্শনাদ্ বিনাশক্য।” কাদম্বরী এত্রে উজ্জয়িনী-বর্ণন-প্রস্তাবে মহাকবি বাণভট্ট, “বৌদ্ধেনেব সর্বদানাস্তিবাদশূনঃ” এই শ্লিষ্ট প্রয়োগ দ্বারা অর্থাৎ বৌদ্ধবৎ সর্বদা নাস্তিবাদশূন আর সর্বদানে অস্তিবাদশূন, এতদ্বর্গে বৌদ্ধকে নাস্তিক বলিয়াছেন।

বিষয়োদত্তরঞ্জিকার চিরঞ্জীব কবি, চার্লস এবং সকল শ্রেণীর বৌদ্ধও জৈনকে নাস্তিক বলিয়াছেন। মহানহোপাধ্যায় পণ্ডিত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয় বলেন, “পাণিনির অস্তিনাস্তিদিষ্টং মতিঃ” এই হুতরের ব্যাখ্যাভূষণের ব্যাখ্যা ভাৎপর্ঘ্যে নাস্তি পরলোকঃ ইত্যোবং মত্ব্যস্যা স নাস্তিকঃ, এইরূপ ভাৎপর্ষি অনুসারে, জৈনেরা যখন পরলোক স্বীকার করেন, তখন তাঁহারা নাস্তিক হইতে পারেন না।

বৌদ্ধগণ পরলোক স্বীকার করেন কি না করেন, ইহার একতর পক্ষের অজ্ঞাপি নিশ্চয় হয় নাই; তজ্জন্ত তাহাদিগের সম্বন্ধে কিছুই বলা যায় না। হুতর নাস্তিক শব্দের নিরপেক্ষ ভাবে একটা আলোচনা আবশ্যক। ন শব্দের অর্থ অভাব, আর অস্ পাতুর অর্থ সত্তা, তি প্রত্যয়ের অর্থ আশ্রয়, ইহার মিলিত অর্থ এতরূপ হয় যে, অভাব রহিয়াছে আর কিছুই নাই।

নৈয়ায়িকগণ বলেন যে, এক্ষণ একটা প্রতীতিই চাইতে পারে না। “অভাব” শব্দটা সূক্ষ্ম শব্দ, সুতরাং অভাব বলিলে কাহার অভাব, এইরূপ অপেক্ষা করে। অতএব অভাবজ্ঞান প্রতিযোগিসাপেক্ষ। যে বস্তু, আমি কখনও জানি না, তাহার অভাব বিষয়ে আমার জ্ঞান হইতে পারে না। জ্ঞানদর্শনের ভাষ্যকার ভূমিকাতেই ইহার হুচনা করিয়াছেন, যথা “সংসদিতি গৃহমাণং যদাত্তমবিপরীতং তৎ ভবতি। অসচ্চাসদিতি গৃহমাণং যদাত্তমবিপরীতং তৎ ভবতি, কথনুত্তরং প্রমাণেনোপলব্ধিরিত্যিত্যুপলভ্যনানে তদন্তপক্ষে: প্রদীপবৎ, যদা দর্শকেন দীপেন দৃষ্টে গৃহমাণে তদবিব যদ গৃহতে তদ্রাস্তি, যন্ত-ভবিষ্যৎ ইন্দ্রিমিব বাজ্ঞাত্ত, বিজ্ঞানাত্তাবাং নাস্তীতি।” হুচকার বলিয়াছেন, যে প্রমাণ দ্বারা যে বস্তুর উপলব্ধি হয়, তাহার অভাব সেই প্রমাণদ্বারা ই গৃহীত হয়। “নাহুমীয়মানন্ত প্রত্যাক্তোহন্তপলব্ধিভাবহেতুঃ।” এতদন্তপক্ষে উদগম কুহুমাজ্জগিতে বলিয়াছেন, “নোগাদৃষ্টি: কুতোহযোগো প্রতিবন্ধি: কুত-ত্তরাং। কাযোগাং বাধাতে শৃঙ্গ কাহুনানমনাস্তরাং। এই কারিকার দ্বারা তাৎপর্য এই যে, যে বস্তু দর্শনের যোগ্য, তাহারই অজ্ঞান অধিকরণবিশেষে তাহার অভাব সাধক হয়। শব্দশৃঙ্গ, আকাশকুহুম প্রভৃতি পদার্থ, জ্ঞানের বিষয়ীভূত নহে, সুতরাং তাহার অভাবজ্ঞানও হয় না। তবে যে শব্দশৃঙ্গ নাই, আকাশকুহুম নাই, ইত্যাদি বাক্য ব্যবহৃত হয়, তাহার অর্থ শব্দকে শৃঙ্গের অভাব আছে এবং আকাশে কুহুমের অভাব আছে। ইহাই পাতঞ্জল-দর্শনোক্ত “শব্দজ্ঞানাহুপাতী বস্তুশৃঙ্খো বিকল্পঃ” এই বিকল্পাত্মক চিত্তবৃত্তির উদাহরণ হইতে পারে। বিকল্প শব্দের অর্থ, শব্দ আছে, তাহার অর্থ নাই, অথচ লোকে তাহার ব্যবহার করিয়া থাকে। “নাধামিক প্রভৃতি দার্শনিকগণ অলীক প্রতিযোগিক অভাব স্বীকার করিয়া, আকাশকুহুমের অভাব, জ্ঞানের বিষয় হয় এই কথা বলিয়া থাকেন। এতদ্বিষয়ে অহুভবই সাক্ষী, অহুভবের অপলাপ বা ব্যবহার-বিষয়ে অজ্ঞ প্রমাণ নাই! অহুভাবকের অন্তঃকরণই তাহার ব্যবহাপক ও প্রমাণ। তজ্জন্ত আমরা এখানে আর এবিষয় বিবৃত না করিয়া নীরব रहিলাম। জৈনাচার্য্য বিজ্ঞানস্বয়ং আত্মপরীক্ষাপ্রাপ্তে “নাস্পৃষ্ট: কন্দর্ভি: শব্দদ্বিধদ্ব্যাত্তিকন্দন” এই উপক্রমে বৈশেষিকসিদ্ধ ঈশ্বর নিরাকরণ করিয়া পরে “এতেনৈব প্রতিবৃদ্ধ: কপিলোহন্তপ্রদেশক:। স্ফানা-দর্শাস্তরত্বা বিশেষাং সর্কধা স্বত:।” এই উপক্রমে সাংখ্যসিদ্ধ কপিলের আদিবিজ্ঞত ও তত্ত্বোপদেশক নিরাকরণ করিয়া “সুগতোহপি ন নিরূপ মাগন্ত প্রতীপাদক:। বিশ্বত্বজ্ঞতাপায়াং ত্বত: কপিলাদিবৎ।”

এই উপকরণে বোঝেরা সঙ্কল্প নিরাকরণ পূর্বক "যন্ত সংবেদনান্দৈবঃ পুরুষাঈষতমেবতং । সিদ্ধে স্বতোহনাথাবাপি প্রমাণং স্বেষ্টহানিতঃ ।" এই উপক্রমে অদৈবতবাদী একদতীর মত খণ্ডন করিয়া পরিশেষে মীমাংসক, ভট্ট ও প্রভাকরের মত খণ্ডন করিয়াছেন, কিন্তু পূর্বোক্ত বাদিগণকে নাস্তিক শব্দে অভিহিত করেন নাই ।

- "নাস্তিকানাঞ্চ নৈবাস্তি প্রমাণং" তন্ত্রিরাকৃতো । প্রাণ্যমাত্রকং তেষাং
- না বচেরং মহাত্মনাম্ ।" এই কান্তিকার ব্যাখ্যা "যেষাং প্রত্যক্ষম্বেবপ্রমাণং নাস্তিকানাং, এই কথা বাহ্যস্পতা-নতাবলম্বী চার্লসকদিগকে বিদ্যানন্দ ও নাস্তিক বলিয়াছেন । সে বাহ্যই হউক, নাস্তিক শব্দের ব্যুৎপত্তি যেকোন হউক, বাহ্যস্পতাদেশের দেহাত্মবাদ, আত্মতত্ত্ব-জ্ঞানের চরম সিকান্ত বিষয় না হইলেও তাহা যে প্রথম সোপান তদ্বিষয়ে মতদৈব নাই । "যথামুজ্জাদিশিষ্টৈক-বমাশ্বাক্ষ্য সনুজুতঃ" ইত্যাদি বাক্যই তাহার প্রমাণ । বেদান্তের অনেক গ্রন্থকার বলিয়াছেন, বহুকে অরুদ্ধতী দর্শন করাইতে হইলে প্রথমে তৎসমীপ-বর্তী স্থল নক্ষত্র দর্শন করাইয়া, ক্রমে স্থল, স্থলতর, স্থলতম নক্ষত্র দর্শন করাইয়া পরে অতিস্থলতম অরুদ্ধতী দর্শন করাইবে ; সেইরূপ আত্মানাত্ম-বিবেকশূন্য নিত্যত্ব ভড়তাভাপন ব্যক্তির, দেহ ইঞ্জিয়, মন প্রভৃতিতে প্রথম আত্মবুদ্ধি উপস্থিত করাইয়া পরে দেহেন্দ্রিয়াদি বাতিরিক্ত আত্মার উপলব্ধি করাইবে, ইহা সর্ববাদিসিদ্ধ । দেহাত্মবাদ যদি অতি বাস্পচ্ছেদ্য ও অপ্রয়োজনীয় হইত, তবে প্রত্যেক দর্শনকর্তাই দেহাদির খণ্ডনের এত প্রয়াসী হইতেন না । জ্ঞানদর্শনের প্রথমে "দর্শনস্পর্শনাভ্যা মেকার্থগ্রহণাং" ইত্যাদি সূত্রদ্বারা ইঞ্জিয়াত্মবাদ খণ্ডন করিয়া পরে দেহাত্মবাদ খণ্ডন ও তৎপরে মনের আত্মত্ব খণ্ডন করিয়াছেন । শঙ্করাচার্য্য ও বেদান্তসূত্রে প্রথমেই দেহাত্মবাদীর মত পরে ইঞ্জিয়াত্মবাদীর, তৎপরে মন-আত্মবাদীর মত উদ্ধৃত করিয়া চার্লস-দর্শনের অস্তিত্ব ও কার্য্যকারিতার প্রমাণ দেখাইয়াছেন । সাংখ্যাদি দর্শনেও চার্লস-দিগের দেহাত্মাদিবাদের উল্লেখ দেখা যায় । ঈদৃশ উপযোগী শাস্ত্রের বিলোপ একেবারে অসম্ভব নহে ।

চাণক্যের বিষয় এই যে, মীমাংসক শ্রীহর্ষ নৈষধচরিতের সপ্তদশ সর্গে চার্লস মতের বিশেষ বিবরণ দিয়াছেন, অথচ সরস্বতীর অঙ্গরূপে চার্লস মত গ্রহণ করেন নাই । বৌদ্ধদের শূন্যাত্মতাবাদ কণিকাত্মতাবাদ, সাকারজ্ঞানবাদ, সমস্তই সরস্বতীর অঙ্গরূপে উৎপ্রেক্ষিত হইয়াছে ।

আমরা নানা স্থানের নানা গ্রন্থকারের উদ্ধৃত চার্লসকম্বের পাঠগুলি
নইয়া চার্লসক দৰ্শনের পুনঃপ্রচার বিষয়ে যত্ন করিতেছি, তাহারই কিয়দংশ পঠিত
হইবে। আমরা চার্লসকদৰ্শনের ও অন্যান্য দৰ্শনের তাৎপর্য যাচা অবগত
হইয়া নাস্তিক ও আন্তিক শব্দের অর্থ এবং নাস্তিকতা ও আন্তিকতার উৎপত্তি
হেতু বুঝিতে পারিয়াছি, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত করিতেছি।

আমি কে ? কোথা হইতে আসিয়াছি ? আমি পুরাতন সনাতন অথবা
নতন অদ্বন্দ্বন ; আমি আকস্মিক, স্বাভাবিক, কি নৈমিত্তিক ? আমার সহিত
জগতের সম্বন্ধ নম্বর কি স্থিরতর ? এই পরিদৃশ্যমান জগদ্ব্যতীত আমার
গন্তব্য অন্য কোন জগৎ আছে কি না, এই জগৎই আমার কর্মক্ষেত্র ও কর্মফল
ভোগের অধিকরণ ? অথবা অন্য কোন স্থানে নাইয়া এই কর্মফল ভোগ করিতে
হইবে ? আমার জ্ঞাতভূতের বিচারক ও নিয়ন্তা আমি ? অথবা প্রত্যক্ষীভূত
সমাজপতি ও রাজা বা রাজপুরুষ প্রভৃতি, কিংবা অপ্রত্যক্ষীভূত কোন অচিন্ত্য
শক্তি সম্পন্ন বস্তু আছে, যাহার শক্তিতে আমি অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাধ্য হইয়া
বিষ্ট বিষয়েও ইষ্টবৎ আচরণ করিতেছি ; এইবারেই আমার লীলাখেলা সাঙ্গ
হইবে ; অথবা পুনঃ পুনঃ এই জড়জগতে আসিয়া জড়ের সহিত অভিন্নরূপে
প্রতীক্ষমান হইয়া আচার ব্যবহার করিতে হইবে ? এই পরিদৃশ্যমান জগতের
উপাদান প্রত্যক্ষভূত অণু অথবা অণুমের পরমাণু কিংবা তত্ত্বিন্ন অন্য কোন
বস্তু ? এই বিচিত্র জগৎ স্বভাবতঃ জড়ের শক্তিশারা উৎপন্ন হইয়াছে ও
হইতেছে, অথবা কোন অনির্জন্য শক্তিসম্পন্ন সচেতন কারু কড়ক নিশ্চিত
হইয়াছে ও হইতেছে ? কোন মতে জীবমাত্রেয়, কোন মতে প্রাণীমাত্রেয়,
কোনমতে মনুষ্যমাত্রেয়, কোন মতে তীক্ষ্ণদী মনুষ্য মাত্রেয় মন, স্বতঃই উক্ত
প্রকার পর্যাগোচনা প্রবণ হইয়া থাকে এবং স্বতঃই মনে মনে সে সকল
বিষয়ে সিদ্ধান্তও হইয়া থাকে। তদ্বাদো যাহাদের মনে এইরূপ সিদ্ধান্ত
হয় যে, আমি এই জগতে নতন আসিলাম, কিছুদিনমাত্র এই নম্বর জগতের
সহিত আমার নম্বরতর সম্বন্ধ। আমার কর্মক্ষেত্র ও কর্মফল ভোগের ক্ষেত্র এই দৃশ্য-
জগৎ, আমার প্রভু আমি, অথবা দৃশ্যমান রাজাদি, এই জগৎ পরমাণুপুঞ্জের সমষ্টি।
স্রোতকাণ্টিকাবৎ পরমাণুসমূহের যদৃচ্ছাক্রমে সংযোগজনা যুগাকরবৎ জগতের
মধ্যে কোন বস্তু স্বদৃশ্য ও সৌন্দর্য্যসম্পন্ন, কোন বস্তু কুদৃশ্য ও কুংসিতরূপে
স্থিতি হইয়া থাকে ; এই প্রকার সিদ্ধান্তে উপনীত ব্যক্তিগণকে সাধারণে
নাস্তিক বলে। আর যাহারা এইরূপ সিদ্ধান্তে উপস্থিত হন যে, আমি সনাতন ;

শ্রোতবতীর আবর্ত গতিতে কীটবৎ নানা ঘোনিতে পুনঃ পুনঃ পরিভ্রমণ করিতেছি। আমার প্রভু আমি নহি বা দৃষ্টমান রাজাদি আমার কর্তা নহে। প্রত্যেক সম্মতক্ষিপ্সর কোন মহাপুরুষ আছেন, তিনি আমার কর্তা ও প্রভু। আমি দারুণ মূর্খিত্য তাই সেই মহাপুরুষের অধীন; বিষ্টিগৃহীত দাসস্বরূপ তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করিতে বাধ্য। সেই মহাপুরুষই হুঃখের অমানিশার অককারময় জগতে আমার অন্তঃকরণে সময়ে সময়ে সুখখ্যাতিকার আলোক প্রদান করিয়া থাকেন; এই সকল লোককে লোকে আন্তিক বলিয়া থাকে। অরি ঘাহারা মনে করেন, পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচিত বিষয়ের কোন স্থির সিদ্ধান্ত নাই বা হইতে পারে না, তাহারাই আন্তিক শ্রেণীভুক্ত। যুক্তিমাং আন্তিকতা ও নাস্তিকতা, উভয়ই লোকের স্বাভাবিক। উহা প্রকৃতির অঙ্গুগামী। কেহ কেহ বলেন, নাস্তিকতাই জীবের স্বাভাবিক, আন্তিকতা উপদেশ স্মরণে। ইহাদের অভিশ্রয় এই যে, অক্ষুটবাক্য বালক, যে ভাষাভাষীদিগের মধ্যে বাস করে, বৃদ্ধ-ব্যবহার দর্শন নিবন্ধন সেই বালকের সেই ভাষাতেই অধিকার জন্মে। এতদ্বিষয়ে শঙ্করপ্রকাশিকার উল্লিখিত আছে যে, “সম্বৈতন্ত এহঃপূর্নঃ বৃদ্ধস্ত ব্যবহারতঃ। পুশ্চাদেবোপনামাঈশ্বঃ শক্তিযী পূর্নকৈরসৌ।” এই ভাষাশিক্ষা, যেক্রপ, উপদেশসম্পেক হইলেও লৈঙ্গিক সবিশেষ অহংসন্ধান না করিয়া, উহা স্বাভাবিক মনে করে; সেইক্রপ, অজ্ঞাতব্যবহারতঃ বালকে যে ধর্মাবলম্বীদিগের মধ্যে বাস করে, তাহাদের ব্যবহার দর্শনে সেই বালকে তদাচরিত ধর্মই পরমার্থ সং বলিয়া বিবেচনা করে এবং অনালোচিততঃ ব্যক্তিগণ উহা স্বাভাবিক মনে করিয়া থাকে; বস্তুতঃ উহা সাহচর্যের অবিনাশন-উপদেশজনিত।

কেহ কেহ বলেন “অসদেবদনগ্রাসীং” “সবাস্থবৈ পুরুষঃ অগ্নয়সগঃ” বিজ্ঞানগন এবৈতেভ্যো ভুতেভ্যঃ সমুখ্য তাচ্ছবাহু বিনশ্চতি, ন তেভ্যঃ প্রেতচ সংজ্ঞান্তি” ইত্যাদি নাস্তিবাদের মূলমন্ত্র, উপনিষদের মধ্যেই প্রকাশরূপে বর্তমান রহিয়াছে। মহাত্মারতীর হরিবংশ পর্বের মতে, অবোধাধিপতি রজিরাজের পুত্রগণের চিত্তব্রংশসম্পাদনার্থঃ দেবগুরু বৃহস্পতি প্রথমতঃ নাস্তিবাদ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তেভ্যঃ সবুদ্ধিযোহাং মকরোদ্ভিজসন্তমঃ। নাস্তিবাদার্থশাস্ত্রং হি সত্যং বিবেষণং পরং।” ইহাই তাহার প্রমাণ। জৈনদিগের মতে বৃহস্পতি নামক কোন ব্রাহ্মণ নাস্তিবাদ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায় তাহা স্বীকার করেন না। তাহারাই হরিবংশের আচার্য্যিকার তাৎপর্য্য এইক্রপে বর্ণন করেন যে, নাস্তিবাদাবলম্বী পণ্ডিতগণ সময়ে এতদূর প্রাদাভ্যাস

কৰিয়াছিলে, ও নাতিবাদেৰ এত স্পৰ্শহীমাংসা হইয়াছিল সে, অজ্ঞাত নতাবলুই পণ্ডিতগণ তাঁহাদেৰ সৰিত বিচাৰ বিতৰ্কে উপস্থিত হইতঁে সমৰ্থ হইতেন না, হইলেও বিচাৰে পৰাজিত হইয়া লজ্জিত ও অবাধ্য হইতেন এবং ভাৰতেৰ প্ৰাচীন প্ৰথাৰূপে নাতিবাদেৰ পক্ষাবলম্বন কৰিতে বাধ্য হইতেন । „উপায়েন ন যচ্চ ৷ নতচ্চকাং পৰাক্ৰমৈঃ” এই নীতিপথেৰ অচসৰণে পৌৰাণিকেৰা ঐক্লপ আপাতিক৷ রচনা কৰিয়াছেন, অৰ্থাৎ দেবগুৰু বৃহস্পতি ৰাজ্যেৰ পুত্ৰগণকে মৃদ্ধ কৰিবাৰ জন্তু যে মত বিস্তাৰ কৰিয়াছেন, সে মত ত অবশ্যই অণুওনীয় হইবে । যদি সে মত পণ্ডনীয় হয়, তবে সৰ্বশাস্ত্ৰদৰ্শী ৰাজ্যেৰ পুত্ৰগণসকলে সে মতেৰ উপজ্ঞাস কৰিয়া বৃহস্পতি তাঁহাদিগকে স্বীয়মতাবলম্বী কৰিতে সমৰ্থ হইতেন না । এবং বৃহস্পতিৰ উক্তজ্ঞ ও সিদ্ধ হইত না । পৌৰাণিকগণ যে, এইক্লপ কল্পিত আপাতিক৷ দ্বাৰা স্বমত-বিরোধি মত প্ৰবৰ্ত্তক সম্প্ৰদায়কে নিৰস্ত কৰিয়া থাকেন তাহাৰ দ্বিতীয় তৃতীয় উদাহৰণ বৌদ্ধ ও জৈনগণ । শ্ৰীমন্ত্ৰ’গবতে উক্ত হইয়াছে “ততঃ কলৌ সম্প্ৰবৃত্ত সম্ভোহায় স্বৰাধিমাং । বুদ্ধানামাজ্ঞনঃ স্বতঃ কীকটেষ্ণ ভবিষ্যতি । যানি রূপানি জগদ ইন্দ্ৰোমহির্দীৰ্ঘা । •তানি পাপসা মণ্ডানি লিঙ্গং মণ্ডমিহোচ্যতে ।

মৰ্থ ইত্ৰাপদেষ্টে পেশলেণ্চ বাগ্মিণু । প্ৰায়েণ সচ্ছতে দান্ধা নগ্নরক্ত পটাদিষু । তদবজ্ঞং হরেক্লপং জগদজ্ঞানচৰ্চ্ছলাঃ । ইত্যাদি । সেই সময়ে সমালোচনা ও প্ৰচাৰকাৰ্য্য পৌৰাণিকদিগেৰ আয়ত্ন ছিল ; স্বতৰাং বৰ্ত্তমান যুগে যেক্লপ সমাজনীতি, মৰ্থনীতি, শিক্ষানীতি ও রাজনীতি প্ৰভৃতি সংবাদপত্ৰ সম্পাদক মহোদয়গণেৰ আলোচনা ও উপদেশেৰ বিষয় হইয়া পড়িয়াছে এবং সেই বিষয়ে শৈথিলা কৰিণে তাঁহাৰা কৰ্ত্তব্যেৰ অনমুঠান-জ্ঞানিত প্ৰত্যাবৰ্ত্তাঙ্গী বলিয়া জনসমাজে পৰিচিত হন, পূৰ্ব্বকালে পৌৰাণিকদেৰ নেতৃবৰ্গেৰও সেইক্লপ দায়িত্ব ছিল এবং সমাজে প্ৰতিষ্ঠা প্ৰতিপত্তিও প্ৰভূত ছিল । বৰ্ত্তমানে যেক্লপ, কি সাপ্তাহিক, কি দৈনিক, কি মাসিক, সকলপ্ৰকাৰ পত্ৰেৰ সম্পাদকেৰ কথার একটা মূলা আছে, তৎকালেও কি পুৰাণ, কি উপপুৰাণ কি অজ্ঞ প্ৰকাৰ, ঐক্লপ আপাতিক৷ৰ প্ৰবৰ্ত্তকদিগেৰ কথারও মূলা ছিল ; স্বতৰাং তাঁহাৰা যাহা বলিতেন, তাহা সমাজেৰ অস্বতঃ কিয়দংশ লোকে গ্ৰহণ কৰিত এবং কিয়দংশ-লোকে তাহাৰ প্ৰতিবাদও কৰিত । বৌদ্ধদেবাদিৰ সম্বন্ধে সৰ্ব্বতোভাৱে পৌৰাণিকদেৰ মত অবিসংবাদিক্লপে সমাজে গৃহীত হইত না ; “নিমসি বেদবিদে ব্ৰহ্ম শক্তিজাতং, সদগ্ন নিদগ্নদৰ্শিত পশুঘাতং” বৈষ্ণৱকবি জগদেবেৰ এই বাক্যট

তাঁহার সাক্ষী । অধুনাতন শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেরই মত যে, শাস্ত্রসম্পদ, ধনসম্পদ, রাজ্যসম্পদ প্রভৃতি যে কোন সম্পদ বিষয়ে মনুষ্য চরম উৎকর্ষ লাভ করে, সেট বিদ্যেয় অকৃত্রানে শিথিলপ্রবৃত্ত হইয়া সেট সম্পদের অপব্যবহার করিয়া থাকে । রাজত্বের চরমোন্নতির অবস্থায় রাজাশাসন সংরক্ষণে শিথিল হইয়া রাজতন্ত্রের অপব্যবহার করে । এইরূপ অকৃত্রান্ত সম্পদের অপব্যবহার হইয়া থাকে ।

বৈদিকযুগের চরমোৎকর্ষ সময়ে ব্রাহ্মণগণও বেদের অধ্যয়ন অধ্যাপনায় শিথিলবৃত্ত হইলে বৈদিক-বিধির অপব্যবহার আরম্ভ হইয়াছিল । বেদ, সুপুঙ্কর হইলে বেদের নামে অনেক কামনিক স্বত্তি প্রচুরাণ বেদার্থ-সংগ্রাহক বলিয়া প্রচারিত হইত ।

বেদের নামে যে বৃথা স্বত্তি কল্পিত হইত, তৈমিনিদর্শনের ভাষ্যকার শবর-দামী তাহার উল্লেখ করিয়াছেন । একটা শ্রোতবিধি আছে যে, ঔড়ুম্বরীং স্পষ্টে উপ্গায়তে" ইহার প্রকরণাহুগত অর্থ, অগ্নিষ্টোমন্যনিক যজ্ঞে সদোনামক বৈদিসরিধান ঔড়ুম্বরী স্পর্শপূরক উনগাতা সামবেদ গান করিবে (ঔড়ুম্বরী তাম্রময়ী প্রতিমা অথবা গজোড়ুম্বরের শাপা) অপর একটা স্মার্তবিধি আছে যে, ঔড়ুম্বরী বৈ সর্কা বাসন্য বেষ্টয়িতবা ইত্যর অর্থ, সর্কাবয়বচ্ছেদে বস্ত্রদ্বারা ঔড়ুম্বরী বেষ্টন করিবে । এক্ষণে শ্রোতবিধির সহিত স্মার্তবিধির বিরোধ ঘটিল । কারণ, সর্কাবয়বচ্ছেদে ঔড়ুম্বরী স্পর্শ অসম্ভব হয়, সুতরাং স্মার্তের বিরোধিনী স্বত্তি অপ্রমাণ । কোন ঋষিক বস্ত্রলোভে মুগ্ধ হইয়া ঐরূপ স্বত্তি প্রণয়ন করিয়াছেন, এইজন্য ব্রহ্মকারণ বলিয়াছেন “বিরোধে জনপেক্ষাঃ স্তাদসতি হুমুমানং” ইতি ।

স্বত্তিস্বত্তি বিরোধে তু স্মার্তেরই গরীয়সী ইত্যাদি পুরাণবাক্যও বেদ-বিরোধী কল্পিত স্বত্তি রচনার সক্ষে প্রদান করিতেছে । এই কল্পিত স্বত্তি পুরাণাহুসারে সনাজে বেদবিরুদ্ধ বহু কার্য আচরিত হইত । অথবা এক সময়ে যাত্রা অতি সস্তাতার পরিচায়ক ও ধর্মের কারণ বলিয়া সমাজে গৃহীত ও প্রশংসিত হয়, কালচক্রের কঠোর আবর্তনে মানবের মনোভাব পরিবর্তনের সহিত সেই-গুলিই আবার অসম্ভ্যাতার পরিচায়ক ও নিন্দনীয় হইয়া পড়ে । অথমে ধর্মজ্ঞে দীক্ষিত যজমান-পত্নীর স্বামীর সহিত যজ্ঞসভায় উপবেশন এবং যজমান-পত্নীর অঙ্গবিশেষে যজ্ঞাঙ্গ অশ্বের অবয়ব বিশেষের সংযোগরূপ ক্রিয়া কলাপ অতীব পুণ্যের ও প্রশংসার বিষয় ছিল । বৈদিক যুগের অতি সৌভাগ্যবতী কতিপয়



রাজপতীর ভাগ্যে, তাদৃশ পবিত্র কার্য সংঘটিত হইত ; কালক্রমে উক্তরূপ ইতি-
কর্তব্যতা নিত্যস্থ জুগুপ্সাবাজক অশ্লীলতার পরিচায়ক হইয়া উঠিল, তখনই
অশ্বমেধযজ্ঞের বিশাল রঙিল। সৌত্রামণিগাণ্ডে সোমলতার রসপান নিহিত থাকায়
লাক্ষণেরা অত্যন্ত পানাসক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন ; এমন কি “যত্র যত্র সৌমা-
দৃশ্যং তত্র তত্র অশ্বয়বানং ভূয়সেন ত্যাগীযোগাং” ইত্যাদি কল্পিত সিদ্ধান্তে নির্ভর
করিয়া সোমলতারসের অভাবস্থলে অল্প প্রকার স্বরাস বাবদারও আরম্ভ
করিলেন। বাসমেধের মধ্যে দীক্ষিত হইয়া, যথেষ্ট স্রীসংসর্গ আরম্ভ করিলেন।
শ্রাদ্ধে, অভ্যাগতের আগমনে ও গোমেধাদি যাগ উপলক্ষে পণ্ডিত্যের বাড়িবাড়ি
আরম্ভ করিলেন। অভ্যাগতের আগমনে প্রায়ই গোহত্যাতে গোকুল নির্মূল
হইতে আরম্ভ করিলে, ও সর্কসেধযজ্ঞে আবাদিগের অতি বিগর্হিত ব্রহ্মহত্যা
এবং সর্কস্বার যজ্ঞে, আশ্বহত্যা পর্যন্ত ঘটিতে লাগিল। মহাব্রত নামক কার্যে
দীক্ষিত হইয়া ব্রহ্মচারিগণ পর্যন্ত কুলটাসংসর্গে কলঙ্কিত হইতে আরম্ভ করিল।

এইরূপে বেদের অপব্যাখ্যা ও ব্যাখ্যাতারের অযথাচরণ আরম্ভ হইলে,
ধর্মের নামে অধর্মের স্রোতে ভারত প্রাবিত হইতে আরম্ভ করিল। তখন ঐ
স্রোতের নিবারণকল্পে বৃহস্পতি নাস্তিবাদরূপ প্রস্তরপুঞ্জময় দৃঢ় বাধ দিয়াছিলেন।

বৈদিকধর্মের ভিত্তি সন্ধান আশ্বা। বৈদিকেরা বলিতেন, আশ্বা
অনশ্বর, তাহার পুনর্জন্ম আছে ; স্মৃত্ত চকৃত কর্মফলে আশ্বা কখনও স্বর্গগামী,
কখনও বা নিরয়গামী হয়। অতএব দুঃখানবচ্ছিন্ন সুখ স্বর্গ এবং যেহাভে
তাদৃশ সুখ পাওয়া যায়, তাহার নামও স্বর্গ, নিরবচ্ছিন্ন সুখরূপ স্বর্গ কামনার
ধর্মীসুষ্ঠান কর।

বৃহস্পতি নাস্তিবাদে সমর্থন করিলেন যে, অনাদি অনন্ত আশ্বাই আদৌ নাই ;
স্মৃত্তাং তাহার জন্মান্তরে স্থলাভের অল্প কর্মসুষ্ঠান, বক্ষ্যাপ্তের দীর্ঘায়ুট,
কামনার ছায় উপহাসাস্পদ। আহুযজ্ঞিক অস্তিবাদিগণের অত্যাশ্রয় মতও খণ্ডন
করিয়াছেন। কেবল বৃহস্পতিই যে, সেই সময়ে বৈদিক ধর্মের বিরোধী হইয়া
ছিলেন, এমন নহে ; অন্যান্য ঋষিগণও আশ্বার অনশ্বরত্ব স্বীকার করিয়াও
বলিয়াছিলেন, স্বর্গ কর্মফল, কর্মজনিত অদৃষ্টকর্মের সহিত স্বর্গগত জীবের পুনরা-
বৃত্তি হইয়া থাকে ; অতএব স্বর্গ হইতেও শ্রেষ্ঠ, অনশ্বর অপবর্ণ নামক এক
পুরস্কার আছে, তাহার অল্প চেষ্টা করা কর্তব্য। প্রবৃত্তিধর্ম দ্বারা অপবর্ণ
লাভ হয় নাই, নিবৃত্তি ধর্মাবলম্বনে তাহার লাভ হইয়া থাকে। কোন কোন
ঋষি, হিংসাদি দোষ বলিয়া, বৈদিক ধর্মের নিন্দাও করিয়াছেন। পোন্নোণিকেরাও

সময়ের বেগে স্বর ফিরাইয়া বৈদিক ধর্মকে অধর্মসমূহ বলিয়া বর্ণন বা পাপের কার্য মনে করেন নাই ।

দৃষ্টবদ্যাহুপ্রবিকঃ সহবিভুক্তিকর্যাতিশয়যুক্তঃ, তদ্বিপরীতঃ শ্রেয়াম্ নাতুল-
বাতুলজ্ঞ বিজ্ঞানাং । এই ঈশ্বরকর্মের ক্লান্তিকারী টীকায় সর্কটপদতত্ত্ব বাচস্পতি
মিশ্রও বলিয়াছেন, “হিংসাচি পুরুষদোর্মমাবিকরোতি ক্রতোশ্চোপকরিত্যতি ।”
মহাভারতেও উক্ত হইয়াছে, “তন্মাত্ গান্ধার্যঃ তাত ! দৃষ্টে মং ত্রঃখসমিভং ।
ত্রয়ীধর্মমধর্ম্যাচাং ।” ইত্যাদি ।

সুেই যুগে, বেদের অপভ্রাণ্য করণাদির জন্ম করত্নর নামে এক প্রকার গ্রন্থ
রচিত হয় ; সম্মে সম্মে এ কথাটীও প্রচারিত হয় যে, “বেদাদৃতেহপি কর্ম্মণি
কল্লৈঃ কুর্ক্ণন্তি যাত্তিকাঃ । নতু কল্লৈর্বিদ্যা কেচিন্ময় ভ্রাম্ণে*মাত্রকাং ।”
ইহা দ্বারা বেদের বিষয়-সঙ্কোচ করা হইয়াছে । বেদের নাম দিয়া যদৃচ্ছাক্রমে
স্মৃতি রচনার পথ বোধ করিবার জন্ম “ময়র্গ বিপরীতা যা সা স্মৃতির্গে প্রশস্বতে এই
বাক্যটী রচিত হইয়াছিল । মজ্জসংহিতা সকল লোকেরই আদৃত ছিল, মজ্জ
মধ্যে কল্পিত বচন প্রক্ষেপ করা সহজ ছিল না ; অত্যাচ্ছ সংহিতার নাম দিয়া
বচন রচনার পথ, ইচ্ছাতে অবরুদ্ধ হইয়াছিল । পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ বা
কোনো কেহ বা প্রকাশ্যভাবে, বৈদিক ধর্মের স্বরপ্রচারকরণের উপায় বিধান
করিলেও, তাহা ভাষাতেই অলৌচিত হইত, সভাসমিতিতে গগনভেদী শব্দে
ভাষার বিকাশ করিয়া দিগ্‌দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করা হইত ; সমাজে সে মত,
কতদূর আদৃত হইয়াছিল, তাহা অনির্ণেয় । যদি সুধীসমাজের মহাত্মসঙ্গে
সমাজ গঠিত হইতে পারিত, তবে সংসারের চিত্র অল্পরূপ দেখা যাইত । বোধ
হয় পার্শ্বি বয়স সমাজ-সৌন্দর্য্য-সৌষ্ঠব দর্শনে অপার্শ্বি পুণ্যালোকবাসী জনগণও
পার্শ্বি সামাজিক-সুখ কামনা করিত ।

কেহ কেহ বলেন, বার্হস্পত্য নাস্তিবাদের গৃঢ় তাৎপর্য্য অতি উপদেশ হইলেও
সাদারণে সে তাৎপর্য্য অবধারণ করিতে অসমর্থ হইয়া তদীয় অসদর্প গ্রহণ করিয়া-
ছিল ; অর্থৎ পরলোক নাই, অবিদ্যার আত্মা নাই, জীবের পাপপুঞ্জের একমাত্র
শাস্তিকর্তা ও পুণ্যের কলদাতা ঈশ্বর নামে কোন পদার্থ নাই, স্মরণ্য পুণ্যচরণে
কোন ফল বা পাপাচরণে কোন দোষও নাই ।

আর, “সদানপরমায়েষু যথেষ্টং বিচরেনং সদা” ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণীত তারিক-
দিগের মত বার্হস্পত্য-শাস্ত্রে প্রক্ষিপ্ত হওয়ায় বার্হস্পত্য-মতের আরও পূর্ণব্যবহার
হইতে আরম্ভ হইল, তাহাতেই সামাজিকগণ বার্হস্পত্য দর্শনের প্রচার একেবারে

বিগৃহ্য করিয়া দিলেন । সামাজিকগণের যে প্রভূত ক্ষমতা ছিল ও আছে, আমরা বন্ধমোণ করেকটা কথারূপে তাহা সপ্রমাণ করিতেছি এবং সাহিত্য-প্রচারের সঙ্গে সমাজের যে ঘনিষ্ঠতর সূত্র আছে, তাহা দেখাইবার জন্যই বন্ধমোণ প্রবন্ধাংশের অবতারণা করিতেছি, কেহ যেন ধান ভানিতে মহীরাবণের গীত মনে করিয়া কথাগুলির প্রতি অমনোযোগ না করেন ।

শাস্ত্র ও শাস্ত্রীয়মতে বৈধ ও অবৈধ উভয়বিধ ক্রম-রক্ষার ব্যবস্থা এবং ক্রম হত্যার নিষেধ থাকিতেও অনেক স্থলেই দেখা যায়, ঋষিরা গুপ্তভাবে ক্রমহত্যা করা ইয়া ছুঁচারিনী ক্রমঘাতিনীকে সমাজে গ্রহণ করেন, তাঁহারাই সমাজের শিরোমণি বলিয়া আখ্যা প্রাপ্ত হন, আর তদ্বিপরীতবাদিগণ নিন্দনীয় হইয়া থাকেন ।

বর্তমানে, চিকিৎসা-ব্যবসায়ী শুল্কপ্রতিগ্রাহী, শুল্কযাজক, কৃতকাধ্যাপক প্রভৃতি কতকগুলি অপাণ্ডক্তের ব্রাহ্মণ সমবেত হইয়া, সমিতিগঠনপূর্বক শাস্ত্রীয় সনাতন শিক্ষাস্তের বিরোধে অহরহঃ মতপ্রকাশ করিতেছেন । অনেকেই ঐরূপ সমিতির নেতৃবর্গকে সাবিক সাধু বলিয়া প্রশংসা করিয়া থাকেন । ইহা দ্বারা বোধ হয় যে, সমাজের নেতৃবর্গের আজ্ঞার নিকট বেদের আদেশ অকিকিৎসকঃ পূর্ব যুগেও সেইরূপ গটয়াছিল । দার্শনিকগণ যখন বৈদিক অত্যাচারের নিবারণে অক্ষম হইলেন, তখন সমাজের নেতৃগণ যুক্তি-তর্ক নিরপেক্ষ নির্হেতুক এই মত প্রকাশ করিলেন যে, সমুদ্রযাত্রাদি কতকগুলি ঋক্কর্গ্য করিতে পারিবে না ।

কেহ কেহ বলেন সমুদ্রযাত্রাদি নিষেধের ব্যবস্থাপক সমাজপতিগণ, বর্তমান সমিতি-বিশেষের নায়কদিগের ন্যায় মস্তিষ্কশূন্য ছিলেন না, তাঁহার বিচক্ষণ চিন্তাশীল ও দূরদর্শী ব্যবস্থাপক ছিলেন । সময়ের স্রোত লক্ষ্য করিয়া সবিশেষ হেতু পর্যালোচনা পূর্বক তাঁহার তাদৃশ বিধান করিয়াছিলেন । তাই তাঁহাদের ব্যবস্থা অব্যাহত ভাবে বেদের বিরোধেও অস্ত্রাপি চলিয়া অ্যুগিতোঁছে ।

শাস্ত্রবিধির বৈপরীতোও সমাজের নেতৃবর্গের আধিপত্য যে অব্যাহত ভাবে কার্য্যকারী হইত, কেবল তৎপ্রদর্শনার্থই এতদংশের অবতারণা করা হইল ।

বৃহস্পরদীয় পুরাণ ও আদিত্য পুরাণে সমুদ্রযাত্রাদি নিষেধের প্রমাণ পুত্র-লক্ষিত হয় । যথা বৃহস্পরদীয় পুরাণঃ “সমুদ্রযাত্রাস্বীকারঃ কমণ্ডলুবিধারণঃ । দ্বিজানামঙ্গবর্ণাঙ্ক কত্মাহপরমস্তথা । দেবরেন স্মৃতোৎপত্তিমধুপর্কে পশোর্বধঃ । মাংসদানঃ তথাগ্রাজ্ঞে বাণপ্রস্থাপ্রমস্তথা । দত্তাগাষ্ট্চব কত্মাঃ পুনর্দানং বরসাত ।

দীর্ঘকালঃ ত্রকচর্য্যঃ নর্রমেধাশ্বমেধকো । মহাপ্রহ্মানগমনঃ গোমেধক তথামথঃ ।
ইমান্ ধনান্ কলিযুগে বজ্রানাস্থ মনীষিণঃ ।

আখ্যাত পুরাণে উক্ত আছে যে, দীর্ঘকালঃ ত্রকচর্য্যঃ ধারণক কমণ্ডলোঃ । দেবরেন স্তুতোঃপত্তিন্ ত্রা কস্তাপ্রদীয়তে । কন্যানামসবর্ণানাং বিবাহশ্চ বিজ্ঞাতি-
তিঃ । আততাহি বিজ্ঞাপ্রাণাং গৃহ্মবৃদ্ধেন হিংসনঃ । বৃত্তদ্বাধায়সাপেক্ষমজ
সকোচেনঃ স্তথা । প্রায়শ্চিত্ত বিধামক বিপ্রাণাং মরণান্তিকং । সংসর্গদোষঃ
পুণ্যপুণ্ড্রমধুপার্ক পশোবধঃ । দন্তোরসেতরেবাস্ত পুস্ত্রেন পরিগ্রহঃ । শূদ্রেব
দাসগোপাল কুণমিত্রাকর্দীরিণাং । ভোতযারতা গৃহস্থ তীর্থসেবাতি দূরতঃ ।
অজ্ঞানাদিশু শূদ্রস্য পুরুতাদি ক্রিয়াপিচ । ভৃগ্মপিতনৈকৈব বৃদ্ধাদি অরণং তথা ।
এতানি লোকগুণার্থঃ কলেরানৌ মহাশ্রুতিঃ । নিবর্তিতানি কর্মাণি বাবহূপূর্বকং
বৃধৈঃ । সমব্ধাচাপি সাধুনাং প্রমাণং বেদবদ্ববেৎ ।

বৃহন্নারদীয় পুরাণের “সমুদ্রযাত্রা স্বীকারঃ” এই অংশের কেহ কেহ ব্যাখ্যা
করেন যে, এই বচনবলে •সর্গপ্রকার সমুদ্রযাত্রাই নিষিদ্ধ । রঘুনন্দন-সংগ্রহের
টীকাকার কানীরাং বাচস্পতি প্রকৃতি কেহ কেহ বলেন—বচনের শেষাংশে
“ইমান্ ধনান্ কলিযুগে” এইরূপ লিখিত থাকায়, আখ্যাত পুরাণে ভৃগ্মপিতনের
সাহচর্য্যপ্রযুক্ত সমুদ্রে ধর্ম্মার্থ আশ্ববিসর্জন-নিষেধই বচনের তাৎপর্য্য ।

• কেহ কেহ আবার বলেন যে, “সমুদ্রযাত্রা স্বীকারঃ” এইটা সমস্ত পদ নহে,
পৃথক্ পদ ; সমুদ্রযাত্রা ও স্বীকার অর্থাৎ প্রতিগ্রহ উহার অর্থ । যেক্ষণ সহমরণ-
পদ্ধতির প্রচলন সময়ে অনেক অর্গারনগী সভীত্বযশোলিপ্সায় ধর্ম্মবৃদ্ধির অভাবেও
মৃত পতির অলঙ্কিত্যয় প্রবেশ করিত, সেইরূপ সমুদ্র-মরণ নিরতিশয় গোরবের
কারণ বলিয়া অনেকেই ধর্ম্মবৃদ্ধির ভ্রমবেও সমুদ্রে আশ্ববিসর্জন করিত ; তন্নি-
বারণার্থ সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ হইয়াছে ।

আধুনিক কেহ কেহ এক্রুপ ব্যাখ্যাও করেন যে, “সুদ্রা সহ বর্তমানঃ সমুদ্রঃ”
সুদ্রা শব্দের অর্থ টাকা, স্তত্রাং সুদ্রার সহিত যাত্রা করিবে না । সদন বা
ধনবান্ বলিলে যেক্ষণ স-মিক ধনশালীর প্রতীতি হয়, দাতা বলিলে যেক্ষণ প্রচুর
দাতৃত্বগুণবিশিষ্ট ব্যক্তিকেই বুঝায় ; তদ্রূপ, সমুদ্রযাত্রা বলিলে, যৎকিঞ্চিৎ
সুদ্রসংস্কৃত যাত্রা নিষেধ বুঝায় না, কলিকালে দত্তা তত্ত্বরসমূহ পথে প্রচুর ধন
লইয়া যাত্রা করাই নিষিদ্ধ ।

বচনের শেষে “মনীষিণঃ” এই কথা থাকাতো, “ধনবান্ সুখী” বলিলে যেক্ষণ
ধন-প্রযোজ্যতা স্বথ অস্বকৃত হয়, এখানেও এতাদৃশ ব্যবহা প্রকটনের প্রতি

শাস্ত্রাদেশ-নিরপেক্ষ মনীষা প্রযোজ্যতা বোধ হইতেছে। আদিত্য পুরাণের বচনে “কলেশ্রাদৌ নিবর্তিতানি” এই স্থলীয় কলির আদি পর্যায়ে, নিবৃত্তি বা নিবর্তনে অধ্যয়ের, মতবৈধ আছে। কেহ বা বলেন যে, কলিযুগের প্রথমে এই ব্যবস্থাটা মহাশ্যারা প্রকটিত করিয়াছেন; কিন্তু বাদী ভদ্রনাং পঞ্চতি, সূতরাং প্রতিবাদিগণ বলিয়া থাকেন, কলির আদিতে এই ব্যবস্থার প্রকটন হইয়াছে, যদি একরূপ অর্থ হয়, তবে ঠাহাদের ব্যবস্থা কোন সময়ে খাটিবে, সে কথাই উল্লেখ না থাকায় বচনকর্তার নানাবাদিতা বোধ হয়; অতএব, কলির সন্ধিতে এই সকল কণ্ঠ নিষিদ্ধ হইয়াছে; সূতরাং এক্ষণে ঐ সকল কার্য্য করিতে বাধা নাই।

বচনের শেষে লোকগুণার্থ্য এই হেতুনির্দেশ থাকায় দৌকিক সাধুগণ লোকাচার রক্ষার্থ এই ব্যবস্থা করিয়াছেন, এইরূপ প্রতিপন্ন হইতেছে। এই ব্যবস্থায় ধর্ম্মের কোন সম্বন্ধ নাই।

সাধু ছই প্রকটের হইয়া থাকে; লৌকিক ও বৈদিক। মহাকবি ভবভূতি লিখিয়াছেন, “লৌকিকানাং সাধুনাং অর্থঃ বাগ্ভূধাবতি। কথীনাং পুনরাঙ্কানাং বাচমর্থোহুধাবতি।”

পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, কোন কোন বাখ্যাত্তার মতে সমুদ্রযাত্রা ও স্বীকার পৃথক্ পদ। শাস্ত্রে যচ্চাক্রান্তির নিষেধ থাকিলেও, এবং শ্রাদ্ধান্তে পিতৃসম্মিধান্নে পাঠ্য “মাচ যাচিৎ ককন” ইত্যাদি মন্ত্রে স্পষ্টতঃ যচ্চাক্রান্ত অকর্তব্য প্রতীপাদিত হইলেও ব্রাহ্মণগণের ঐষ্টজীবিকা বলিয়া ঠাহারা ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিলেন, ইহাতে একদিকে কতকগুলি লোক বুদ্ধিমোহাদি সবেও অকর্ণণ্য হইয়া পড়িল, অত্নদিকে আবার তাহারাই গৃহস্থদিগের এক মাছোৎপাদনরূপ হইল, তত্নন্ত স্বীকার বা প্রতিগ্রহ নিষিদ্ধ হইয়াছিল। অস্বং স্বং কুর্কন্ বাপারঃ স্বীকারঃ এইরূপ ব্যংগপত্তিতে স্বীকার শব্দের প্রতিগ্রহরূপ অর্থই প্রাপ্ত। অস্বীকারার্থেও স্বীকারশব্দে প্রযুক্ত হইয়া থাকে, কিন্তু তাহা কেবল লৌকিক ব্যবহার।

ব্রহ্মচারিবর্গ মহাব্রতে দীক্ষিত হইয়া কুলটা সংসর্গ করিত। ব্রহ্মচর্য্য অতি প্রশংসনীয় ছিল বলিয়া ব্রহ্মচারিগণ বিবাহ করিতে প্রবৃত্ত হইত না। অত্নদিকে আবার দশবর্ষ মধো কন্যাদান না করিলে সমাজে কলঙ্কিত হইতে হইত বলিয়া কণ্ডাকর্তাদিগের অশেষবিধ সাহচর্য্য পরিলক্ষিত হইত। এইজন্য ব্রহ্মচর্য্য নিবারণার্থ বিধান হইল যে, কেহ দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্য করিতে পারিবে না, এমন কি ব্রহ্মচারী ও ভিক্ষকের লক্ষ্য পৰ্য্যন্ত কেহ ধারণ করিতে পারিবে না, এইজন্য কমওলুধারণও নিষিদ্ধ হইল।

অসবর্ণবিবাহপ্রথা থাকিতে, সকলেই উৎকৃষ্ট জাতীয় পায়ে কন্যা-সম্প্রদান, স্বীয় গৌরবের ও পুত্রের বিষয় মনে করিয়া, শ্রেষ্ঠ জাতীয় বরকে কন্যাদান করিতেন। ইহাতে উৎকৃষ্ট জাতীয়দিগের কন্যার বিবাহ ও নিকৃষ্ট জাতীয়দিগের বরের বিবাহ হওয়া কঠিন হইত; এইজন্য অসবর্ণবিবাহপ্রথা রহিত করা হইয়াছিল। *

ভারতবর্ষই কর্মভূমি; বিষ্ণুপুরাণে উল্লিখিত আছে, “কর্মণ্যাসক্লিষ্ট তৎফলানি সন্তস্য বিক্ষৌ পরমায়ুৰূপে। অবাপাত্যং কর্মং হীনমন্তে” ইত্যাদি। “কর্মমহীং ভারতবর্ষরূপং” ইতি স্মার্তরত্নমল্লনঃ। এই কর্মভূমি ভারতানিরুক্ত দেশ ভোগভূমি বলিয়া শাস্ত্রে কথিত আছে; “যথা ব্রাহ্মণসকলস্যে হলায়ুধধৃতা স্বতিঃ—পৃথিব্যাং ভারতং বর্ষং কর্মভূমি রদাহতো। জম্বুদ্বীপে মহাপুণ্যে ততো-হন্য ভোগভূময়ঃ।”

মানবগণ, এই কর্মক্ষেত্র ভারতবর্ষেই শুভাশুভ কর্ম্মফলপ্রাপ্তির জন্য পুণ্যপাপের ভাগী হয়। ভারতের বাহিরে যাইয়া বিধি-নিষেধ প্রতিপালন না করিলে কোন দোষ হয় না; শাস্ত্রের সনাতন সিদ্ধান্ত থাকায়, তৎকালের লোকে ভারতের বাহিরে যাইয়া অবাধ-বাণিজ্য করিতে পাইত, বিজ্ঞান শিক্ষা করিতে পারিত। “অর্থং কৃত্বাত্ম শমেন যঃ করোতি প্রদক্ষিণং। প্রদক্ষিণী কৃত্বাতেন সপ্তবীপা বুদ্ধকরা।” ইত্যাদি প্রমাণস্বক পৃথিবী পরিভ্রমণরূপে মহাহুণের অশুষ্ঠান করিতে পারিত। :

ভারতের কর্মভূমির শাস্ত্রে প্রতিপাদিত থাকিলেও বর্তমান যুগের অনেক ব্যক্তি শুনে শিবস্থাপন ও হিন্দু হোটেল প্রভৃতির ব্যবস্থা করিয়া এবং তত্ত্বদেণ-বাসকালীন নিমিত্ত ভোজনাদির দোষপ্রশমনার্থ প্রারম্ভিত ব্যবস্থা করিয়া শাস্ত্রের অপবাধ্যজনিত অনভিজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করিতেছেন কি না, তাহা স্বদী-গণের সবিশেষ মতিস্থার বিষয়।

“বংএব হেতুর্ভবতি পুরুষস্ত জগাবহঃ। পরাজয়ে সএবস্বাৎ” এই ঋষিবাক্য কখনই মিথ্যা হইবার নহে। সময়ে যাহা জগাবহ হয়, সমাজের পরিবর্তনে তাহাই আবার পরাজয়ের হেতু হইয়া থাকে। সমুদ্রযাত্রা অতি মঙ্গলের ও পুণ্যের হইলেও সময়ে তাহার অপব্যবহার হওয়ায় অত্যন্ত অনিষ্টকর বলিয়া বিবেচিত হইল। বর্তমানে মঙ্গলের ধনিগণ, স্ব স্ব আবাসভূমিতে ভোগ-সামগ্রীর অপ্ৰাচুর্য্যনিবন্ধন ও বায়াদিক্য সম্ভাবনার কুলধর্ম প্রতিপালনের অনিচ্ছায় সমৃদ্ধিসম্পন্ন নগরে বাস করিয়া থাকেন, তাহাতে পরীর অবস্থা

শোচনীয়তর হইয়া পড়িতেছে । পূর্বকালেও ভারতের ধনিগণ, ভারতে থাকিয়া ধর্ম্মাচরণ করা কষ্টকর বোধে ভোগভূমিতেই অধিকাংশ সময় বাস করিতেন, এবং কৃষীবর্গ প্রভৃতি শ্রমজীবীর কষ্টার্জিত অর্থ ভারতের বাহিরে লইয়া অপব্যয়িত করিতেন, তাহাতে তৎকালে ভারতের অবস্থাও বর্তমান পল্লীর ন্যায় শোচনীয় হইয়াছিল । তাই বিদেশ-বাসের মূলীভূত সমুদ্রযাত্রার অন্তে সামাজিক-গণ কুঠারাবাস করিয়াছিলেন ।

একণে মুক্তকণ্ঠে* বলা যাইতে পারে যে, ভারতের এমন এক সময় আসিয়াছিল যে, সে সময়ে ছলে, বলে, কলে কোশলে বৈদিক*ধর্ম্মের কতক কতক অংশ রহিত করিবার জন্য ভারতের চিন্তাশীল ব্যক্তিমাতেই বহুপরিকর হইয়াছিলেন, তবে এইবার* প্রভেদ যে, অজ্ঞান সকলে বেরাস্ত ও উপনিষদের বোকাই দিয়া বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের নিষেধ প্রচার করিয়াছিলেন, কেহ বা রাজ-আজ্ঞার ভায়ে বৈদিক ধর্ম্ম সঙ্কোচ করিবার জন্য আজ্ঞাপ্রচার করিয়াছিলেন, আর বৃহস্পতি মুক্তি-তর্কদ্বারা স্পষ্টভাবে বৈদিকবিধির অসংফলত্ব প্রতিপাদন করিয়াছিলেন ।

নাস্তিবাদের স্বস্তত্ব পর্যালোচনা করিলে, ইহার তাৎপর্য্য এইরূপ বৃক্ষিতে পাই। যার যে, যেক্রপ ঐকদেশীয় দর্শনিক-দিগের মতৈ দর্শনশাস্ত্রের উদ্দেশ্য প্রকৃতনমুখ্যফলাভ, সেইরূপ নাস্তিবাদেরও উদ্দেশ্য প্রকৃতনমুখ্যফলাভ । বক্ষ্যমান নাস্তিবাদ, বার্হম্পত্য নাস্তিবাদের ও নাথবাচাৰ্য্যের সর্বদর্শনসংগ্রহে সংগৃহীত বিকৃত চার্কাক-দর্শনের সম্পূর্ণ সংগ্রাহমুবাদ বা প্রকরণ বলিয়া সভ্যমহোদয়গণ নিবেচনা না করিলেই স্থখী হইব ।

তবে, বক্ষ্যমান নাস্তিবাদে, বার্হম্পত্য-নাস্তিবাদের ছায়া যে একেবারে পরিলক্ষিত না হইবে, একরূপ নহে । আন্তিবাদিগণ যেক্রপ জীবনমুক্তি স্বীকার করেন এবং জীবমুক্ত কপিল,নারদ, শুকদেব প্রভৃতির যেক্রপ চরিত্র বর্ণন করেন, তক্রপ সচ্চরিত্রতা লাভই নাস্তিবাদের উদ্দেশ্য ।

প্রকৃত মুখ্যফল লাভ করিতে হইলে, আমি কে ? এই প্রশ্নের মীমাংসা করা আবশ্যক ; আশ্চর্য্যজনক বাতীরেকে তাহা কখনই সম্ভবপর নহে । যাহার উন্নতি-সাধন করিব, সে বস্তুটি কি, তাহা জানা আবশ্যক । এইজন্য শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন “অন্ধং তমঃ প্রাবিশস্তি, যে কে চাচ্ছহনোজনাঃ । অজ্ঞা বর্তমানং তং যোহজ্ঞা প্রতিপদ্যতে ! বিত্তেন নাকুতং পাপং, চৌরেণাশ্বাপহারিণা ।”

হুতরাঃ প্রথমতঃ আমরা আশ্চর্য্য-নিরূপণে প্রবৃত্ত হইব । অনদীত দর্শন-শাস্ত্র ব্যক্তির আশ্চর্য্য বৃক্ষিতে, একটু বেগ পাইতে হইবে, হুতরাঃ আশ্চর্য্যত্ব

- বিচারের সরল ও বিস্তৃতভাবে পর্যালোচনা করা কঠিন। একটি মাত্র প্রবন্ধে তাচা অসম্ভব। সাহিত্যিক মহোদয়গণের উৎসাহ পাটলে আমরা সমগ্রাত্মে তাচা প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব। মোটের উপর কথা এই যে, এই নাস্তিবাদ আন্তরিকগণেরও অকচির বিষয় হইবে না।

পূর্বকালেও গুরুগাঢ়া উদয়ন বলিয়া গিয়াছেন “প্রতিযোগি বিষয়াচাৰ্য্যযোগি বিষয়াচাৰ্য্যব তত্ত্বোক্তজ্ঞঃ।” -“ইতোবাং প্রতিনীতি সংপ্রবজ্জলৈকুয়োত্তিরাফা-
লিতে, যেবাং নাস্পদমাদধাসি হৃদয়ে তে শৌলসারাসয়াঃ।” কিন্তু “প্রস্তুত
বিপ্রতীপ বিধয়ো? পুচ্চেভরচ্ছিত্তকাঃ, কালে কারণিক। অয়েবরুপয়া তে
তারণীয়ানরাঃ।” এতদ্ব্যতীত বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, আত্মা নাই বলিয়া
আলোচনা করিতে হইলেও প্রতিযোগিবিধায় আত্মতত্ত্ব অবগত হওয়া যায়, এবং
ঈশ্বর নাই বলিয়া ঈশ্বরতাবিষয়ের আলোচনা করিলেও, প্রতিযোগিবিধায়
ভগবতত্ত্ব অবগত হওয়া যায়; সুতরাং তাদৃশজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিগণও ভগবানের
রূপাপন্ন হইয়া আত্মতত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হয়। এতদ্ব্যতীত শ্রীমদ্ভাগবতেও
অভিহিত আছে যে,—

নপা বৈরাহুবন্ধেন নর্ত্যাস্তময়তামিহাং ।

নতথাভক্রিয়োগেন ইতিবেশিচ্ছিত্তানতিঃ ॥

কীটঃ পেশস্তারুদ্রঃ কুড্যায়াং তমহুশ্রবন্ ।

সুঃস্বস্তর্যোগেন বিলভে তৎস্বরূপতাম্ ॥

এবং রূক্ষে ভগবতি মায়ামহুজ ঈশ্বরে ।

বৈরেণ পুত্ৰপাশান শুমাশ্রুচ্ছিত্তয়া ॥

শ্রীশ্রীভাষ্যর তর্কালঙ্কার ।

অভিসার

রতি-সুখসারে পত্তমভিসারে

মদনমনোহর লেশম্”—ইত্যাদি

রতি-সুখসার অভিসারে সখি, পরিয়া মদন-মোহন বেশ,

গিয়াছেন হরি, চল ঘরা করি আছেন যেখানে সে ছদয়েশ ।

গুরুভার সখি তব নিতম্ব

অগনি চলিতে হবে বিলম্ব

আর কেন তবে, বৃথা বসি রবে, বাধিলেও এবে চাঁচর-কেশ ।

বহে যেথা ধীর, মলয়সমীর, সেই যমুনার তীরে
পরি বনমালা, কুঞ্জে সে কালা, বাজাইছে অতি দীরে

• রাধা নাম ধরি সকলে পাসরি

সকৈত করি মোহন বাশরী

ই তনু বৃদ্ধি আসে লো ভাসিয়া বাতাসে মৃদল বাশরীরুরেণ ।

বাতাসে যে পুলি কথা তন গায় •

• উড়ে পড়ে তিনি ভাবিছেন তার •

আপনার চেয়ে কত না দয়, হায় কত তাঁক বিরচ-ক্রেণ !

উড়ে যদি পাখী, পড়ে যদি পাতা, তুমি আসিতেছল নানি

সটকিত চিত্তে, চাতি চারিভিতে পাতেন শয়ন পানি

মুখর মুখর যাও পরিহরি

গোপন মিলনে জেনো তারে অরি

পর নীলবাস, চবে না প্রকাশ, অধারেতে সগি মিশিলে বেশ ।

গজমোতিহার শোভিত চরির বিশাল হুণীল বক্ষ

• মনে হয় সারি দিয়া উড়িয়াছে যেবে যেন বক্ষ লক্ষ

তরুপরি তব বিজয়ীর মত •

হেম তরুলতা খেলিবে মতত

লভিবে চরম স্বকৃতির ফল, পূণ্য-পুঞ্জ-ঋণ অশেষ ।

হরি অভিমানী, যেতেছে যামিনী

আর কেন দেরী করলো ভামিনী

কেন আনমনা, কক্ষ কামনা পূরাও তাজিয়া' ভাবনা লেশ ।

শ্রীসতীশচন্দ্র ঘটক ।

বন্ধমান-সম্মিলনে ।

সংখ্যাবাচক অষ্টম শব্দটি বড় যে সে শব্দ নয় । অষ্টমের সবটো ডাল ।
লোকে বলে, অষ্টম গর্ভের সম্মান যদি বাচে তবে সে বস্ত্রভাগা লাভ করিয়া
জনগণপ্রিয় হয় 'ও রাজ-সম্মান লাভ করে । ক্রশাবতারের অষ্টমাবতার
স্বরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, আবার তিনিই দেবকীর অষ্টম-গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন,
কেচ কেহ বুলরামকে লইয়া একটু গোল করেন, তেমন গোল বরিশালের
প্রথম অধিকেশনের কথা লইয়া এ সম্বন্ধে অল্প উঠিতে পারেন, কিন্তু তাহা

কিছু নয়। শাস্ত্র-বাক্য কখন মিথ্যা হইতে পারে না, তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ এবার আপনারা চুপ্চাপে হাতে বলা অপেক্ষা বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের অষ্টম অধিবেশনে বর্ধমানের পাতে পাতে পাইয়াছেন। এবারকার বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনও অষ্টমগর্ভজাত। সুতরাং অধিবেশন চইবার পূর্বে চইতে বহু শাস্ত্রাধ্যয়ন, দৈব কল্লচ প্রকৃতির রীতিমত আয়োজন চলিতেছিল। যাহাতে কোন প্রকার বিপদ, অমঙ্গল বা অন্তর্ভুক্ত না ঘটিতে পারে, একজ্ঞ অষ্টবস্ত্র, অষ্ট-দিক্‌পাল বর্ধমানে বহু পূর্বে হইতে গমনাগমন আরম্ভ করেন ও পাহারায় নিযুক্ত হন। তবে পশ্চিম দিকটি স্বয়ং জলধরদাদা নিজ এলাকাভুক্ত করিয়া দিবারাত্র ঘাটা আগুলিয়া ছিলেন। এবার অভিভাষণ বটাক হইয়াছিল। মূল পুরোহিতের তিনটি ও অবশিষ্ট তিনটি বিভিন্ন শাখা-সভাপতির। মোট কথা, এবার সম্মিলনে অনেকেরই অষ্টসিদ্ধি লাভ হইয়াছে। বর্ধমানের সম্মিলন সম্বন্ধে কবিকণায় বলিলে বলিতে হয়—“কাঠের সেঁউতী মোর হইল অষ্টপদ।”

গত বৎসর যখন বর্ধমানের পক্ষ হইতে সম্মিলনকে বর্ধমানে আহ্বান করা হয়, তখন যশোহর জেলা হইতেও সম্মিলনকে তথায় ডাকা হইয়াছিল, কিন্তু কৈ নাচের নোত অপেক্ষা সীতাতোষি, খাক্সা ও নিহিদানার প্রলোভনটা যে কত বড়—তাহা বলাই বজ্রল্যা। অত্যাশ্চর্য্য বৎসর সম্মিলন কবে হইবে, তাহার সংবাদ অনেকেই রাখে না, সেই সময় সময় একটা কণিক উৎসাহ পরিদৃষ্ট হয়, কিন্তু এবার যখন সম্মিলন রাজ-সম্মান লাভ করিয়া বর্ধমানে আহূত হইল, তখন হইতে সকলেই সঠিক খবর রাখিয়াছিলেন। মাঝে মাঝে সম্মিলন কিরূপ ভাবে হইবে, তাহার অল্পবিস্তর সংবাদ সংবাদপত্রে যখন বাতির হইতে আরম্ভ হইল, চারিদিকে সাহিত্যিক-দলে বেশ একটু সাড়া পড়িয়া গেল। গীহার্য্য কখনও কোন দিন বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনে যোগদান করেন নাই, এবার বর্ধমানে তাহাদের ‘হাতে-খড়ী’ হইয়া গিয়াছে। ইহার উপর যখন নিমন্ত্রণ-পত্রের সজ্জিত একখানি স্বতন্ত্র পোষ্ট-কার্ড আসিল এবং তাহাতে লিখিত আলোচনা সম্বন্ধে তিনটি প্রশ্ন যখন পর্যায়ক্রমে নয়নগোচর হইল, তখন পরীক্ষা-ভয়-ভীত, প্রশ্নোত্তর অপারক সকল সাহিত্যিক-অসাহিত্যিক-কবি, অকবি, রসিক-অরসিক সকলেই নাকি উক্ত প্রশ্নগুলির সত্ত্বত্তর প্রদান করিয়া ব্রাকেটে কম্পিট করিয়াছিলেন। সকলেই ‘ফুল-মার্ক’ পাইয়াছিলেন—একজনও ‘কেল’ হন নাই। কেবল তাহাই নয়—Easter holidayর চারি দিন ছুটি—অনর্গক কেন নষ্ট হয়—এক সঙ্গে ভ্রমণ ও সাহিত্য আন্দোলনা উভয়বিধ

পুণ্যসকল করার সহজ সুযোগটি পরিত্যাগ করা কোন মতে সম্মিলনের কাজ নয়, এ কথাটা অনেকেই উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তাহার উপর অধুনা অনেকেই প্রান্ততত্ত্ববিৎ; যেখানে একটুখানি পুরাতনের গন্ধ আছে, সেখানে গিয়া উপস্থিত হন—তাঁহাদেরও সুবিধা কেননা বন্ধমান যে পাঁচটি পুরাতনই পরিপূর্ণ সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ নাই। তার উপর বন্ধমানের তালপানটি, ইন্ডিয়ান হুগলী প্রাসাদ, মহাত্মা বন্ধিল, রাজোত্তম, গোলকধাঁপা, পদ্মশালা, জামিনার, কুম্ভসার, বিশ্ব-বিপ্লবত সুলক্ষী সম্রাজ্ঞী হুজাহানের প্রথম স্বামী সেপার কবর বন্ধমানেই আছে। আর এই সেদিন যে গণপ্রলয়ের বিভীষিকাময় অভিনয় দায়ীদার প্রদর্শন করিয়াছিল, সেই ভয়াবহ নদটিও বন্ধমানের দুই কোশ দূর দিগন্তে প্রবাহিত। এত সব প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারা বড় সহজ নয়। ইহার উপর আবার শনিবার পড়ায় Week-nding Concasion. স্তুতরাং সকলেই বন্ধমান গিয়াছিলেন, তাহারা কখনও কলিকাতার বাহিরে রাজিবাস করেন না, এমন লোকও অনেক গিয়াছিলেন, কিন্তু সন্ধ্যার গাড়ীতে তাহারা কলিকাতা প্রত্যাবর্তনও করিয়াছিলেন।

সম্মিলন হইবার এক সপ্তাহ পূৰ্ণ হইতে সংবাদ-পত্রে সম্মিলনের বিধি-ব্যবস্থা সম্বন্ধে ও আহাৰ-বিহার-সংক্রান্ত নানাবিধ প্রলোভনীয় সংবাদ প্রকাশিত হইতে লাগিল, তখন ২০শে চৈত্রের চতু প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল।

১৮ই চৈত্র বৃহস্পতিবার মানসী আফিসে আমাদের বন্ধমান অভিযানের বৈঠক বসিল। স্বয়ং সম্পাদক মহারাজ জগদিশ্বনাথ সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। তারপর কোন টেণে, কে কে বন্ধমান যাইবেন, তাহার আলোচনা আরম্ভ হইল। অবশেষে ঠিক হইল, যে সকলের 'এক্সপ্রেস টেণে' যাওয়াই সুবিধা, তাহা হইলে সভার অধিবেশনের অনেক পূর্বেই আমরা সভায় হইতে পারিব। পূর্বেই গুনিয়াছিলাম, ঐ টেণেই নাকি অনেকেই যাইবেন। কথা রহিল, টেসনে সকলে একত্র মিলিব। মানসীর সহকারী সম্পাদক ত্রীভূষণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও আমি হাওড়া হটতে যাইব, জানাবাবু বেলগরিয়া হইতে আসিবেন, মানসীর কর্মকর্তা সুবোধবাবু, সম্পাদক প্রদ্যম্পদ মহারাজার প্রাসাদে গিয়া তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া দুইজনে একত্রে আসিবেন। সম্মিলনের প্রায় সপ্তাহ পূৰ্ণ হইতেই মানসী আফিসে, এই দারুণ গ্রীষ্মের দিনে জলধর-দামার দর্শন চলিত হইয়াছিল। তিনি এই সম্মিলন ব্যাপারে প্রবীণ হইলে কি হয়, বীণাপাণির বয়ে নবযৌবন লাভ করিয়া বিপুল উৎসাহে, সাহিত্যিক

সময়ের জ্ঞান বলবিশ্বাস ও সাহিত্যিকগণের নিমিত্ত বলবৃদ্ধি করিতে বহু পূর্বে হইতে একমাত্র শিবির সংস্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি যাইবার সময় বলিয়া গিয়াছিলেন “তোমরা আসিও ; তোমাদের একসঙ্গে থাকিবার জ্ঞান আমার নিজ ছাউনি ছাড়িয়া দিব।”

ঠিক দশটার সময় বেণ ট্রেন ত্যাগ করিয়া যাইবে। স্মরণ্য প্রভাত হইতে যাত্রার সজ্জা চলিতে লাগিল। দীর্ঘ একবৎসর পরে হরমন্মোহিনী উমার আগমনের মত, তিন দিনের জ্ঞান বাস্তবায়ন মূলকের, বঙ্গবাসীর সেবক-বৃন্দ খেতভূজার পূজামণ্ডপে নানাবিধ পুষ্প চয়ন করিয়া অঞ্জলি প্রদান করিতে জ্ঞানভরে চলিয়াছেন,—দেখিয়া হর্ষে হৃদয় ভরিয়া উঠিতেছিল। যাহারা বাবদরঃ সময়ের সঙ্গে কাজ করা অভ্যাস করিয়া লইয়াছেন, তাহাদের নিকট সময়ে গাড়ী পরিবার জ্ঞান তত বাস্তব হইতে চলে নাই, কিন্তু যাহাদের নিকট সময় তাহার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা এখনও প্রমাণ করিয়া উঠিবার অবসর পায় নাই, তাহাদের অনেকেই সময়মত ট্রেনে পৌছিতে পারেন নাট ; কেহ কেহ যন্ত্রাঙ্কুলেবন হইয়া আসিয়াছিলেন, কিন্তু তখন বংশধরনি করিয়া যাত্রী ট্রেন বস্তুরে চলিয়া গিয়াছে।

বেণা আন্সাজ ১টা ১০ মিনিটের সময় স্ববোধবাবু ও আমি তাড়াতাড়ি হইতে দ্রুত করিলাম। তৃতীয় শ্রেণীর অধ-বাস ১৫ মিনিটের পর অর্ধখণ্ডের আসিয়া উপস্থিত হইল। অগের সঙ্গে কেবল একটি ব্যাগ লইয়াছিলাম, বিছানাপত্র বা নশারি সঙ্গে লই নাট। ট্রেনে যখন উপস্থিত হইলাম, তখন দূর হইতে দেখিলাম যে, মশ নথর ‘প্লাটফর্ম’ সাহিত্যিকগণের যশোভাষিতে সমুজ্জ্বল। হুন্দর-অহুন্দর, সুবা-বুদ্ধ, হুন্দ-বুগ, বহু বাক্তি কুলীর নৃত্যকে তোরঙ্গ, ব্যাগ, বিছানা প্রভৃতি চাপাইয়া প্রতি কামরায় উকি মারিয়া বাস্তবতা সহকারে ফিরিতেছিলেন। সাহিত্যিকগণের মধ্যে এতখানি সজীবতা অত্যন্ত আশ্চর্যকর বলিয়া মনে হইল। তখন ট্রেন ছাড়িতে মাত্র ১৬ মিনিট বিলম্ব আছে। তাড়াতাড়ি স্থানান্তরিত করিবার নিমিত্ত আমরা প্লাটফর্মে গিয়া প্রবেশ করিলাম। এই বাস্তবতার মধ্যে পরিচিতের সহিত সাক্ষাৎ হইবামাত্র চোখে চোখে কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া দক্ষিণে বামে মস্তক নাড়িয়া নমস্কার বিনিময় হইতেছিল। কথা কহিবার অবকাশ নাই। দলে দলে সাহিত্যিকগণ শুভাগমন করিতেছিলেন। সফলের মুখের উপর একটা আনন্দ-দীপ্তি ও উৎসাহ পরিদৃষ্ট হইতেছিল। “রেল-কোম্পানী অনেকগুলি নগরশ্রেণীর গাড়ী দিয়াছিল সত্য, কিন্তু ইতিমধ্যেই সেগুলির

তিতর তিল পরিবার স্থান ছিল না। কিন্তু, সেদিন “বদি ৬ ও স্বজন ভদ্রে তৈতুল”
 পাতায় বিশৃঙ্খল, এই সাধারণ চলিত কথাটির অর্থ সাহিত্যিকগণ উদাহরণ দিয়া
 বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। স্বতরাং একজনের স্থানে চারি জন উপবেশন করিয়াও
 এই দাক্ষণ গ্রীষ্মের দিনে, বাহারা স্মরণীয় উষ্ম সমালোচনার আঁচ পর্য্যন্ত সহ
 করিতে পারেন না, তাহারা আজ অমানবদনে, বাহারা স্থানান্তরে গুরিয়া
 গুরিয়া বেড়াইতেছিলেন তাঁহাদিগকে সম্মিলিত করিয়া ডাকিয়া নৃত্যানের মধ্যে
 স্থান করিয়া দিতেছিলেন। এই খানেই যে মিলন হইতেছিল, তাহা কিন্তু
 দিবসত্রয়ব্যাপী মিলন-মঞ্চে ঘটয়াছিল বলিয়া কিছুতেই বিশ্বাস হয় না।
 সুবোধবাবুকে বলিলাম “আপনি ব্যাগটা লইয়া একটা গাড়ীতে গিয়া উঠিয়া বসুন,
 যেকোন ভীড় তাহাতে আর বিলম্ব করিলে স্থান পাওয়া যাইবে না; আমি
 শীঘ্র টিকিট কিনিয়া আনি।” ছুটিয়া টিকিট-ঘর অভিমুখে রওনা হইলাম।
 সহসা একটি কথা মনে পড়িল। “সে আজ চারি বৎসরের কথা,
 আর একদিন ঠিক এমনই সময় চাওড়া ট্রেন সাহিত্যিকগণের শুভাগ-
 মনে এমনই উজ্জল ও সুগর হইয়াছিল। সে দিন, সাধ করিয়া উজ্জাগ-
 করিয়া “কবিশ্রেষ্ঠ, নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত রবীন্দ্রনাথকে সতর্কনা করিতে
 বোলপুরে যাত্রা করা হয়! টিকিট কালেক্টার, গার্ড, ড্রাইভার, লগেজ-
 পরীক্ষক, ট্রেন-মাষ্টার সকলেই সাহিত্যিকগণের, গতিবিধি বিশেষ মনোযোগ
 সহকারে পরিদর্শন করিয়া বোধ হয় অত্যন্ত আনন্দ প্রসূত করিতে
 ছিল। টিকিট কিনিতে গাইবার পথে বহু সাহিত্যিকবন্ধুগণের সহিত
 দেখা হইল। তাহারা তখন টিকিট-কেনা-রূপ বিষয় যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া
 প্রত্যাবর্তন করিতেছেন, স্বতরাং বিজয়দর্পে পা ফেলিয়া চলিয়াছেন। সকলের
 মুখেই, দেখা হইবামাত্র সেই একই প্রশ্ন “এই যে আপনিও চলেছেন?” প্রত্যুত্তরে
 কেবল হাস্তোজ্জ্বল নয়নের বিনম্র দৃষ্টি আর বন্ধিমভাবে মন্তক হেলাইয়া টিকিট-ক্রয়-
 রূপ যুদ্ধে অগ্রসর হওয়া। তাড়াতাড়ি যেখানে টিকিট কিনিতে গেলাম,
 সেখানে অত্যন্ত জনতা, বহুক্ষেত্রে যদিও বা বাহ ভেদ করিয়া ভিতরে প্রবেশ
 করিলাম, কিন্তু বিকলমনোরণ হইয়া তখনই ফিরিতে হইল। কারণ সেখানে কেবল
 সচরাচর যাত্রাঘাতের টিকিট দেওয়া হইতেছিল—“সংগ্রহ-শেষ-সুবিধা-টিকিট
 অজ্ঞাত” বলিয়া বিরুদ্ধকারিণী বিড়ালানী বিরক্তিসূচক মিহিসুরে চীৎকার করিয়া
 টাকা কয়টা কন্ডাক্টরের উপর নিক্ষেপ করিয়া ফেলিয়া দিলেন। উপায় কি?
 তাহার মুখের দিকে একবার ঈর্ষদৃষ্টিতে চাহিয়া গণে ভঙ্গ দিয়া অজ্ঞাত ছুটিলাম।

এই সময়, দেখি বন্ধুবর জ্ঞানবাবু একটি ম্যাডষ্টোন বাগ হাতে করিয়া পাড়াইয়া—
বলিলাম “টিকিট হইয়াছে?” তিনি উত্তর করিলেন “না, আমার একখানা
নিম” পশ্চাতে দেখা বীরের ধ্বংস নয়—স্বতরাং চলিতে চলিতে বলিলাম,
“আচ্ছা।”

বহু কষ্টে টিকিট চরের নিকট পৌঁছিলে “মহাশয় আমার একখানা, আমার
একখানা” করিয়া আমার হস্তে তম চোরি জন তত্ত্বলোক টাকা গুঁজিয়া দিলেন।
অতঃপক্ষে টিকিট কিনিয়া ফিরিলাম সভা, কিন্তু ঠিক হিসাব করিয়া বাকী পাওনা
ফেরৎ লইতে পারিলাম না। * এইখানে দেখি, মহারাজ নাটোরের আসবাবপত্র
লইয়া পক্ষকেশ আত্মবাবু সাহেব সাজিয়া টিকিটঘরের একপাশে অপেক্ষা
করিতেছেন। তাহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম “মহারাজ কই?” তিনি
উত্তর করিলেন—“আসিতেছেন—তিনি মোটরে যাইবেন।” প্রাটফরমে
আসিয়া স্ববোধবাবুকে গুঁজিয়া বাহির করিতে পারিলাম না। তখন স্থান
সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত সকল গাড়ীর দরজায় ধাক্কা দিয়া ফিরিলাম। সকলেই
বলেন, ‘আমুন, কিন্তু স্থান নাই।’ দ্বিতীয়শ্রেণীর গাড়ীতে অল্পবিস্তর স্থান
ছিল কিন্তু সেখানেও বাঁচা বাছা সাহিত্যিকের দল ধরিয়াছিল। তাহাতে
যদিও তত ক্ষতি ছিল না, কিন্তু আমার টিকিট *য়ে মহামশ্রেণীর! এই সময়
একখানি মহামশ্রেণীর কমিয়ার দ্বারে আসিয়া পাড়াইবানাত্ত ভিতর হইতে
ঐশ্বর্য্য হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ মহাশয় বলিলেন—“উঠিয়া পড়ুন, ঘুরিলে ইহা অপেক্ষা
অধিক সুবিধাজনক স্থান বোধ হয় পাইবেন না।” তাড়াতাড়ি গাড়ীতে
উঠিয়া পড়িলাম। কিন্তু সেটু ন-স্থানের মধ্যে আমার মত একটু স্থান
পাইলাম। তখন দেখি, * অধ্যাপক হরসিক ঐশ্বর্য্য ললিতকুমার
বন্যোপাধ্যায় গাড়িতেই সাহিত্য-সম্মিলন* জমকাইয়া তুলিয়াছেন। তাহার
মুণনিঃসৃত রসবাক্যধারায় সকলে গান্ধীর্থ্যের বাধ ভাঙ্গিয়া ব্যক্তিত্বের
মর্যাদা সূয়ে রাখিয়া হাসির ‘তুফানে হাবুডুবু পাইতেছেন। হেমেন্দ্রবাবু
সে রসসঙ্গীঠে ‘লোহারকি’ করিতেছিলেন। মধ্যে একবার মূগীপ্রবাবুকে
সংবাদন করিয়া তিনি বলিলেন—“কি মহাশয়, আপনি কবি, ওরকম
ধোঁন হ’লে থাকিলে চলিবে কেন?” এইরূপ নানাবিধ হাস্যলাপ ও রঙ্গের
কোরাগার মধ্যে দিয়া দারুণ ঐশ্বর্য্যের তপ্পর বেলা কাটিতেছিল ভাল, অধ্যাপক
বিপিনবিহারী গুপ্ত মহাশয়ও সেদিন এই রস-সভায় ব্যস্ত ছইয়া সকলের
আনন্দবর্দ্ধন করিতেছিলেন। কে বুঝি বলিল, কল্পমতীর সম্প্রদায় শনিবাবু

আমেন নাই কেন—ললিতবাবু উত্তর করিলেন, “নূতন বিবাহ করিয়া তিনি এখন বাস্তব। তাঁর বিবাহে আমি যে ‘স্ট্রীতি-উপহার’ লিপিগ্রাহি, তাহা কি আপনারা কেহ দেখেন নাই?” বিপিনবাবু বলিলেন একপানি আনিলে ভাল হইত সন্মিলনে পড়িলে চলিত। আমার নিকট একপানি ছিল বাহির করিয়া দিলাম। মহানন্দে উচ্চ পঠিত হইল। গাড়ী একেবারে ব্যাঙেলে আসিয়া পামিল। তখন সকলে জন সম্মেলনে বাহির হইয়া পড়িলেন। ব্যাঙেলে যুগের কোর্টের সরকারি উকিল বন্ধুর শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বসুর সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি বলিলেন, “আর সব কৈ? মহানন্দা কৈ?” বলিলান, “শ্রীচরণ মোটরে আসিতেছেন, বর্ধমানে সাক্ষাৎ হইবে।” ব্যাঙেলে আমি গাড়ী বদল করিয়া অল্প গাড়ীতে গিয়া উঠিলাম। এই গাড়ীর মধ্যে সুবোধ-বাবুর সন্ধান পাইলাম, কিন্তু জ্ঞানবাবুকে হারাষ্টলাম। এখানে, কবি অক্ষয়-কুমার বড়াল, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায় ও অম্বাচরণ সেন মহা দরবার করিয়া বসিয়াছেন। এখানে পাণের ‘দানসত্র’ দেখিলাম। আনন্দের বেলা ১২।০ টার সময় আমরা বর্ধমানে আসিয়া পৌছিলাম। গাড়ী থামিতে না থামিতে ইন্সপেক্টরদের বহু প্লাটফর্মেরে নামিয়া পড়িল। সমবেত সাহিত্যিক-মণ্ডলীকে অভ্যর্থনা করিবার জন্ত বর্ধমানের বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। স্বয়ং রাজা বনবিহারী কর্পূর মহাশয় সহস্রা মুখে সকলকে সাধনসম্বোধ ও কুশলপ্রদ করিতেছিলেন। চলধরদাদা যুবকের ‘মত’ সকলের নিকট দৌড়াইয়া গিয়া আপ্যায়িত করিতেছিলেন। এতদ্ব্যতীত বোমকেশবাবু, ললিত বাবু, রামকমল বাবু ও অন্যান্য অনেকেই এই কার্যে ত্রুতী ছিলেন। স্বেচ্ছা-সেবকগণ দলে দলে আসিয়া গাড়ী হইতে জিনিষপত্র নামাইয়া লইতেছিলেন। সে এক অভিনব বিরাট ব্যাপার। স্বেচ্ছাসেবক, পরীক্ষক সে দিন যেন কোন মহামগ্নে অদ্ভুত কর্ণশক্তি লাভ করিয়াছে। যুগা, লজ্জা, মান, অপমান ভুলিয়া একপ্রাণ হইয়া গিয়াছে। এখানে কবি করুণানিধানের সহিত সাক্ষাৎ হইলে তিনি বলিলেন, “আপনারা কোথায় থাকিবেন?” বলিলাম “কি করিয়া বলিব—যেখানে রাখিবে, সেইখানেই থাকিব।” সচরমিক হইতে নত সহস্র নদী যেমন সাগরসঙ্গমে আসিয়া মিলিত হয়, তেমনই আজ বহু দিক হইতে বহু সাহিত্যিক এই মহাসন্মিলনে আসিয়া মিলিত হইতেছি। প্রায় সকলে যখন চলিয়া গিয়াছেন, তখনও আমরা কয়েক জন মাত্র পাটগুম্ফে ইতস্ততঃ গুরিয়া বেড়াইতেছি। স্বেচ্ছাসেবকগণ আশ্বাস

“দিয়া বলিতেছিলেন, “এইবার গাড়ী আসিলেই আপনাদের লইয়া যাইব। তাঁহাদের বিনয়, নম্রতা ও বাস্তবতা দেখিয়া সত্যসত্যই আনন্দে অন্তর তরিয়া উঠিল। স্বৈচ্ছাসেবক বালকবৃন্দের অকলঙ্কমুখের উপর পরসেবার গৌরব, এমন মধুর ও উজ্জল দীপ্তিতে বিকশিত হইয়া উঠিয়া ছিল যে, সেই রোমন্থিত তপ্ত বাতাসের মধ্যে পিণাসা-কাতর ওক রসনাও তাঁহাদের প্রশংসা করিবার নিমিত্ত স্মৃষ্টি করণে রসদারার ভরিয়া আসিতেছিল। এই সময় জনগণনাগা, হাণ্ডাইতে হাণ্ডাইতে, “আসিয়া ডাকিয়া বলিলেন “কৈ আপনারা এখনও যান নাই?” তারপর একজন স্বৈচ্ছাসেবকে ডাকিয়া তাঁহার “জিয়ার” আমাদের গচ্ছিত করিয়া বলিয়া দিলেন। সেদিন বৃদ্ধ জনগণবাবুর মধ্যে যে উৎসাহ, উদ্যম ও কণ্ঠ শক্তির অপরূপ পরিচয় দেখিয়াছি, তাহা বর্ণনা করা অসম্ভব।

একটু পরেই আমার উইলবাড়ী অভিমুখে চলিলান। পথে তুনিলাম, সেটো বাড়ীতে সভাপতি চতুর্দয়ের আবাস নির্দিষ্ট হইয়াছে। তাঁহার গত কলাই আসিয়াছেন। চই তিন দিন পূর্বে হটেতেই “ডেলিগেট” আসিতে আরম্ভ হইয়াছে। ভোজের গাড়ীতে অনেক আসিয়াছেন। বর্ধমান সহর, পশ্চিমের প্রাচীন সহরের ন্যূন দেখিতে। কলিকাতা হটল বর্ধমান তিন ঘণ্টার পথ হটলেও ঐতিপূর্বে এখানে আসিবার কোন সুযোগ হয় নাই। এগানকার পথের দ্বারের বাড়ীগুলিও কলিকাতার বাবসাদারের বিজ্ঞাপনের দ্বারা চইতে নিস্তার পায় নাই। এই সকল বাড়ীর গায়ে অসংখ্য প্লাকার্ড নারিয়া দিয়া গিয়াছে। এক ছায়গায় দেখিলাম, পি এম বাগচীর কালীর বিজ্ঞাপনের পার্শ্বেট এণ্ড ইউলার নীলেট চুণের বিজ্ঞাপন। চুণের পার্শ্বে কালীকে দেখিয়া একটু আশঙ্কা হইল। যাকার বিজ্ঞাপন লাগাইয়া বেড়ায় তাহারা যে একরূপ করিয়া একটা গৌরবের অত্যাশ অপরাধ করিবার উৎসাহ করিয়া বসিয়াছে, বোধ হয় তাহারা এতটা ভাবিবার গত জানী নয়। তাহা চইলে কখন একরূপ করিতে সাহস পাইত না। চইধারে নানাবিধ প্রবোদ দোকান। তখন বেলা আন্দাজ ১১টা; ছোটোছোলেরা বই বগলে লইয়া, ইঙ্গুল চইতে গায়ে ফিরিতেছে। তাঁহাদের নিত্যপরিচিত এই পল্লী-সহরটি আজ অর্কশ্রাং অসংখ্য অপরিচিতের আগমনে তরিয়া উঠিতে দেখিয়া তাহারা বেশ একটু হর্ষাযিত চইতেছিল। সকল ভাড়াটিয়া গাড়ীর গায়ের উপর লাগান নব্ব বড় লাল অক্ষরে, কাগজে চাপা সন্মিলন শব্দটি সকলের কোড়চলপূর্ণ দৃষ্টিকে, অতীতপূর্ণ অশ্রুপানের চিন্তাকে

অধিক করিয়া আকর্ষণ করিতেছিল। বর্ধমানে ইচ্ছা অপেক্ষা অনেক বড় বড় বাপার হইয়া গিয়াছে, ইচ্ছা অপেক্ষা বহু বৃহৎ জনতার অভিজ্ঞতা সচরবাসীর আছে, কিন্তু, এমন সময়ে বঙ্গদেশবাসী ভ্রম, শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত মহোদয়গণের ভ্রাতৃগমন বোধ হয় তাঁহারা এই প্রথম দেখিলেন। স্বয়ং বর্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ বিজয়চন্দ্র মহোদয় অত্যন্ত সুমিত্রিত, সভাপতি। তাঁহার পিতা পঞ্চকেশ বৃদ্ধ রাজা বনবিহারী কর্তৃক স্বয়ং সেই প্রথম রৌদ্রমুখ মধ্যাহ্নে ট্রেনে উপস্থিত থাকিয়া সকলকে মুগ্ধসম্মান ও সমাদর পূর্বক আত্মন করিতেছেন দেখিয়া অনেকের মনে, নবাগত নতন উৎসবটি অতিনব আনন্দের সঞ্চার করিতেছিল। দেখিতে দেখিতে, আমরা ‘উইলবাড়ী’র নিকটবর্তী হইলাম। • সেই সময় দেখি—প্রব্রতনবিদ বন্ধুবর রাণালবাবু সর্বাঙ্গকলেবরে পুলদেহভার লইয়া কর্মকর্তার মত বাস্তবসম্মত হইয়া সেদিকে আসিতেছেন। পশ্চাতে একখানি পালি গাড়ি, তাঁহার অগ্রসরণ করিতেছিল। তিনি হাঁকিয়া বলিলেন, “গাড়ি থামাও, ‘উইলবাড়ী’তে তিল ধরিবার স্থান নাই।”

রাণালবাবু স্বেচ্ছাসেবককে বলিয়া দিলেন, “এদের ছোট-গেও” লইয়া যাও।” তাহাই হইল। সেখানেও সেই দশা। বাপার কি? বঙ্গদেশের কি কোন সাহিত্যিক আসিতে বাকী নাই! • তারপর গাড়ী একদম রাজ-প্রাসাদের অভ্যন্তরে গিয়া প্রবেশ করিল। তখন মহোদয় মন্ত্রিলের সম্মুখ দিয়া গাড়ী চলিয়াছে, এমন সময় একজন বরকন্দাজ আসিয়া প্রশ্ন করিল।

“আপনারা কোথা হইতে আসিতেছেন?”

উত্তর, “কলিকাতা হইতে।”

সে ছুটিয়া চলিয়া গেল। গাড়ী পাড়াইয়া রহিল। স্বেচ্ছাসেবক মুহূর্তে কণ্ঠে বলিলেন, “গাড়ী-বারান্দার নীচে মহারাজা পাড়াইয়া।” এই সময় আর একজন পদস্থ উচ্চকর্মচারী আসিয়া বিনয়মুহুর্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনারা কি ‘ডেলি ডেলিগেট না, এখানে থাকিবেন?”

“আজ্ঞে আমরা থাকিব।” ঠিক সেই সময়ে, সেই দারুণ রৌদ্রের মধ্যে স্বয়ং অধ্যক্ষ সমিতির সভাপতি বর্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ গাড়ীর সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। ছুইটা বড় বড় মণমলের ছত্র যেন কলে ছুটিয়া আসিল। একটা তাঁহার মস্তকের উপর, অপরটা তাঁহার সঙ্গীগণের উপর ঝুত হইয়া। তিনি অত্যন্ত ব্যাকুলভাবে বলিলেন, “আপনাদের সঙ্গে

ভগ্নটিয়ার নাই ?” উত্তর “আজ্ঞে আছে” তখন তিনি তাঁহার প্রতি চাহিয়া বলিলেন, “তুমি ভদ্রলোকদের কেন এই রোঙ্গে কষ্ট দিচ্ছ ? কোথায় লইয়া যাওতে চাইবে, তাহা কি, কেহ তোমায় বলিয়া দেয় নাই ? তুমি কোন ওয়ার্ডের ভগ্নটিয়ার ?”

স্বৈচ্ছাসেবক মহারাজের সহিত কথা কহিবার ভাণ্ডা বোধ হয় এট প্রথম লাভ করিলেন । তিনি সকল প্রশ্ন ভাল করিয়া শুনিয়াছিলেন, কি না, ঠিক বলা যায় ‘না’ । তখন তাঁহার মুখের ভাব দেখিয়া মনে হইল, ভদ্রলোক একটু উদ্ভাস হইয়া গিয়াছেন । তিনি তখন গাড়ী চটতে নামিয়া নীচে দাড়াইয়াছেন । ভয়ঙ্করিতকণ্ঠে বলিলেন, “আমি এদের “উইলবাড়ী” “ছোট-খাট” ছই জায়গায় লইয়া গিয়াছিলাম । সেখানে একটুকুও স্থান নাই ।”

মহারাজা তাঁহার পূর্বদেশ চাপড়াইয়া বলিলেন, “তুমি ভাই এদের বালিকা বিদ্যালয়ে লইয়া যাও । জান ত কোথায় ? সেখানে স্থান না পাও, বেখানে হোক শীঘ্র একটা স্থান করিয়া দাও” কেবল ইহা বলিয়াই মহারাজা নিশ্চেষ্ট হইলেন না । তাঁহার মিত্রের একজন আরদালীকে সঙ্গে দিলেন ও বলিয়া দিলেন, “বাবুদের স্থান হইয়াছে এ সংবাদ শীঘ্র লইয়া আসিয়া আনয়ন দিবে ।” বঙ্গবিদ্যালয়ে এত অধিক ভীড় হইয়াছিল সেখানেও আমাদের স্থান চইল না । তারপর “বড়-খাট” একটা সতর ঘর অন্বেষ্টে ফুটিল, আমরা ত ঈপ্স চাড়াইয়া বাঁচিলাম । আরদালীও মহারাজকে এ সংবাদ দিয়া রক্ষা পাইল । আমরা উপবেশন করিলাম ত ছই তিন জন স্বৈচ্ছাসেবক আসিয়া তিত্তাস করিলেন, “আপনার আহার করিয়া আসিয়াছেন কি ? না, এখানে আহার করিবেন ?” একজন আমাদের নাম লিখিয়া লইলেন, “অপর একজন চা, সরষ, সোডা, গেস্মোনেজ, বরফজল কি আনিবেন, তাহার আদেশ প্রার্থনা করিলেন । এই সময় ক্ষুধাতর উপকার তুলিতে তুলিতে, আমাদের ঘরের সমুখ দিয়া অনেকগুলি স্থলকার ব্যক্তি মন্থরগতিতে চলিয়া গেলেন । ঐশ্বর্য সাহিত্যিক ! সেই মাত্র মধ্যাহ্নভোজন সমাপন করিয়া নীচে চটতে উপরে আসিলেন । উপকারের বচন দেখিয়া আহারের আয়োজন বুঝিলাম । আমরা স্নান করিয়া গিয়াছিলাম স্তব্ধতা কিছু অলখাবার আনিতে বলিলাম । অল্পপরেই কচুরী সিংয়াড়া মিঠাদানা গীতাভোগ সুশীতল বরফজল ও ডাব আনিয়া উপস্থিত করিলেন । আমরা বলিলাম “এত খাবার কি চাইবে ? এ যে ছয় জনের আহার” কিছু ফেরৎ

লইয়া গান ।” উত্তর “না, তাড়া হইবার ঘো নাই ।” ইতিমধ্যেই অনেকে সীতিকা গুঞ্জিয়া সম্মিলনে বাহির চইয়া পড়িলেন । আমরা ঐতটা কর্ম্যভোগের পর সীতাভোগের ব্যবস্থা হুতরাং তাড়াতাড়ি করিবার নোটেই প্রয়োজন অহুভব করি-
লাম না । যিনি “বড়খণ্ডের” তবাবধানে নিগূক্ত ছিলেন, তিনি মহারাজার নিকট আশ্রয় । তিনি স্বয়ং আসিয়া আনাদের মধুরালাপে অস্বাভাবিক করিলেন । কোন প্রকার কষ্ট হইয়াছে কি না ; কোন প্রকার অসুবিধা হইতেছে কি না, পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিলেন । ভঙ্গলোক যেন বিনয়ের অবতার । মহারাজা যেমন সেদিন অক্লান্ত পরিশ্রম স্বীকার করিয়া নিজে ছুটাছুটা করিয়া সকলের সুব্যবস্থা করিতে প্রাণপাত করিতেছিলেন, তাই বোধ হয় বাচিয়া বাচিয়া এই সকল স্থানে আপনার জন নিগূক্ত করিয়াছিলেন । অঙ্গগণপরেই সেই সোমা, শান্ত, পুষ্পকেশ দীর্ঘ-পুরুষ সৌজ্ঞ্য ও শিষ্টাচারের আদর্শমূর্তি রাজা বনবিহারী কর্পূর আসিয়া উপস্থিত হইলেন । তাঁহাকে দেখিলে, সত্য সত্যই ভক্তি হয় । আমরা সমস্ত্রনে উদ্ভিগা পাড়াইলাম । কিন্তু মিষ্টভাষী, নিরহঙ্কার, সদাহাস্যময় অক্লান্ত পরিশ্রমী রাজা অত্যন্ত মধুর সম্ভাষণে বলিলেন, “করেন কি, করেন কি, আপনারা রোদ্রে অত্যন্ত কষ্ট পাইয়াছেন, একটু বিশ্রাম করুন, আপনাদের কোনরূপ কষ্ট না হয় সেই ব্যবস্থা করিতে আসিয়াছি ।” “আমরা বেশ আছি কোনরূপ কষ্ট হয় নাই আমাদের ক্ষুদ্র ভাবিতে হইবে না ।” তিনি বলিলেন “এ আপনাদের নিজের কাচা রুদ্রী হইলে মার্জনা করিতে হইবে ।” নমস্কার করিয়া তিনি চলিয়া গেলেন । আমরাও সম্মিলনে বাই-
বার জন্য উত্তোষ করিতেছি, এমন সময় ভাগলপুর কলেজের অধ্যাপক সাহিত্যিক বঙ্কু ঐক্যবিহারী গুপ্তের সহিত সাক্ষাৎ ঘটিল । আমাদের দেখিয়া তিনি বিশেষ আনন্দ অহুভব করিলেন, বলিলেন, “বেশ হইয়াছে, আপনারা এখানে আসিয়াছেন ? তাহার সঙ্গী অধ্যাপক ঐক্য হরলাল সেনগুপ্তের সহিতও আলোচনা পরিচয় হইল । এই সময় বড় বড় খামে তিনি পানি পত্র আমাদের নানে আসিয়া উপস্থিত হইল । ইহাতে যে একটু আশ্চর্য্যান্বিত না হইয়াছিলাম তাহা বলিতে পারি না । পরে সে দিন সাক্ষা-সম্মিলনে মহারাজা! অন্ত্যগত সাহিত্যিক-
গণকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন । পরের ভিতর এক একটী করিয়া বাস ছিল । কি সুন্দর বন্দোবস্ত ! এতোক বাড়ীতে একটি করিয়া আপিস স্থাপিত হইয়াছে । সেইখান হইতে প্রধান ভাড়া প্রয়োজনীয় প্রবোর আদেশ প্রেরিত হই-
তেছে । বড়খণ্ড ৭৫ জন সাহিত্যিকের বাসস্থান নির্দিষ্ট হইয়াছিল ।

বেলা ২১০টার সময় সভায় উপস্থিত হইলাম। সভামণ্ডপ পূজার দালানের সম্মুখেই স্থাপিত হইয়াছিল। পূজার দালানের উপর সরষৎ, চা প্রভৃতির ব্যবস্থা ছিল। দালান অন্ধকার বলিয়া বস্তু ঝাড়ে দিনের বেলা বাতি জলিতেছিল। বহু অর্থ ব্যয় করিয়া বীণাপাণির পূজামণ্ডপ সুসজ্জিত করা হইয়াছিল। আমরা যখন সভায় উপস্থিত হইলাম, তখন সভা প্রায় লোকে পরিপূর্ণ। প্রথমেই বাণীশ্রোত্র গীত হইল, তারপর মহারাজ বর্জমান সভাপতি প্রস্তাব করিলেন। কার্যাবিবরণীতে উল্লেখ ছিল যে নাটোরসভাপতি মহারাজা শ্রীজগদীশনাথ রায় মহাশয় সভাপতির প্রস্তাব সমর্থন করিবেন। কিন্তু তিনি তখনও আসিয়া উপস্থিত হন নাই। অল্পপন্থি লইয়া অনেকেই একটু আধটু কটাক্ষপাত যে না করিলেন, তাহা বলা যায় না। কেহ কেহ, আমাদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, “কই মহাশয় আপনাদের মহারাজা সম্পাদক কই?” আমি বলিলাম তিনি মোটরে আসিতেছেন বোধ হয়, পথে কোন রূপ কিছু খটিয়া থাকিবে। মহারাজার অল্পপন্থি আমরা বিশেষরূপ অল্পভব করিয়া লজ্জিত হইতে-ছিলাম। বহরনপুরের সুপ্রসিদ্ধ উকিল শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ সেন মহাশয়, মহারাজের পরিবর্তে সভাপতির প্রস্তাব সমর্থন করিলেন। তারপর শ্রীসিদ্ধেশ্বর সিংহ বি, এ, রচিত আবাহন-সঙ্গীত গীত হইল। একটা কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি মহারাজা বর্জমান বলিলেন, মহারাজা কাশিম-বাজার ট্রেন স্টেশন হইয়া টেলিগ্রাফ পাঠাইয়াছেন তিনি আসিতেছেন; বোধ হয় কোন নাল গাড়ীতে চাপিয়াই আসিবেন। আর মহারাজা নাটোর মোটরে আসিতেছেন তার পাইয়াছি। এ কথায় শুধু আমরা অনেকটা আশ্বাস পাইলাম। কিছু দিন পরে কলিকাতায় একদিন মহারাজা নাটোরের নিকট সভায় বিলম্ব বাওয়ার কথা যখন উত্থাপিত করি তখন তিনি সম্পূর্ণ আশ্চর্য্যগিত হইয়া বলিলেন, “কই, আমায় যে সভাপতির সমর্থন করিতে হইবে, এ কথা ত কেহই আমাকে বলে নাই, কার্যাবিবরণীতে যে এরূপ একটা কাজের কথা ছাপা ছিল, তাও এই প্রথম আপনার মুখে শুনিতেছি। তাহাও আমি এখনও চক্ষে দেখি নাই। যদি আমি জানিতাম যে, আমার উপর এত বড় একটা গোরবের কাজ দেওয়া হইয়াছে, বা নির্ধারিত সময় সভায় আমার একটা কর্তব্য রহিয়াছে, তাহা হইলে অবশ্য যে কোন প্রকারে হউক, আমি নির্দিষ্ট সময়ে সভায় উপস্থিত হইতাম, সেই বিষয়ে কোন প্রকার সন্দেহ করিবার কিছুই ছিল না।” “আপনাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া

একটা কাজের ভার আপনার উপর দেওয়া হইয়াছিল, তাহাত আর কেহ জ্ঞানিতে পারিল না ।” মহারাজা বলিলেন, “সেখানে একবার যদি একথা কেহ জিজ্ঞাসা করিতেন বা আমি কার্যাবিসরণীথানি দেখিবার সৌভাগ্য পাইতাম, তাহা হইলে আমার অজ্ঞানকৃত ত্রুটির জন্য সভায় একটা কৈফিয়ৎ দিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিবার সুযোগ পাইতাম ।”

আবাহন-সঙ্গীতের পরই অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি মহারাজা তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন । অল্প কথায় এত সুন্দর, মর্ম্মস্পর্শী খাঁটি কথা ইতিপূর্বে আর কেহ অভ্যর্থনা-সমিতির পক্ষ হইতে বলিয়াছেন, বলিয়া ত মনে হইয় না । অবশ্য মহারাজার অভিভাষণ সকলেই সংবাদপত্রে পাঠ করিয়াছেন । এখানে উদ্ধৃত করা নিম্নয়োজন । তাঁহার রাজোচিত ও পুরুষোচিত কঠোর সমগ্র সভা-মণ্ডপ বিকম্পিত করিয়া সকলের কর্ণকুহরে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল । সকলেই তাঁহার এই ক্ষুদ্র ও শক্তিশালী অভিভাষণ-অন্তরের সহিত অভিনন্দনপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছিলেন । আমাদের পার্শ্বে “প্রবাসী”-সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামানন্দবাবু বসিয়াছিলেন, তিনিও বলিলেন, “বেশ সুন্দর ও ছোট হইয়াছে ।” অনেকেই তাঁহার অভিভাষণের প্রশংসা করিতে লাগিলেন । ইহার পর শ্রুতিবি শ্রীকালিদাস রায় বিরচিত অভিনন্দন অকবি শ্রীযুক্ত বোমকেশ মুস্তাকী মহাশয় পাঠ করিলেন ।

“এস সুধীগণ, মানসমোহন, এসো বাঙ্গালার পূণ্যক্ষেত্রে

চাহ ভারতীর মিলন-ভবনে প্রেম ছল ছল উজ্জল নৈজে ।” ইত্যাদি অভিনন্দন গুণ সুন্দর হইয়াছিল । অন্তঃপর নানা কবিতা পাঠ হইলে, বর্ধমানের পক্ষ হইতে বর্ধমাননিবাসী শ্রুতিবি শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদত্ত মল্লিক বিরচিত, একটি সুন্দর “অভিনন্দন” বোমকেশ বাবু পাঠ করেন । আমরা কবিতার প্রথম কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিবার লোভ সত্ত্বেও করিতে পারিলাম না

“স্বাগত, সব কোবিদবৃন্দ ধন্য কর এসে,
পঞ্চানন্দ, বস্তা, আর ম্যালেরিয়ার দেশে ।

এসো মনে অমল ধবল বিমল বসন পরে,
বর্ধমানের রাজ্যমাটি দেবে রঙিন করে ।

যেহ শ্রীতির কুচুম এ যে পরাগ উল্লাসেরি
যেথায় যাবে সাথে সাথে রইবে সবায় ঘেরি ।

এসো অঞ্জি সুহৃদ বেশে এসো মধুর হেসে,
‘নরজা’ এবং ‘কর্জনা’ ও গর্দান-গারির দেশে ।”

এখানে একটু গোল হইয়াছিল, যে বিদায়-সঙ্গীতটি সভায় গীত হইয়াছিল উহা শ্রীকুমারজ্ঞান মন্ডিক বি এ প্রণীত বলিয়া পুস্তকে ছাপা হইয়াছে । কিন্তু উহা স্ক্রুবি শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় প্রণীত । অতঃপর সভাপতির স্বদীর্ঘ সম্বোধন তাহার মুখ হইতে বড় কেহ যখন ভনিতো শাইলেন না, তখন প্রহৃত্তবিদ্য রাখাল-বাবুকে যদিও উহা পড়িতে দেওয়া হইল, তবুও সম্বোধন গোরবের অগোঁব করিয়া 'পরে ছাপা হইলে পড়িব, বড় গরম, এখন চল' বলিয়া সভাস্থ অনেককেই প্রস্থান করিতে আরম্ভ করিলেন । এই সময় সভায় একটু গোল হইল । তারপর একদিক হইতে মহারাজা কাশিমবাজারকে অভ্যর্থনা করিয়া বর্ধমানাধিপতি সভায় লইয়া আসিলেন । পরমুহুর্তেই পুনরায় সভা একটু চঞ্চল হইলে, সকলে উদ্যত হইয়া দেখিল, অপর দিক হইতে নাটোরাধিপতিকে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া বর্ধমান সভায় পুনঃ প্রবেশ করিলেন । ইহার অল্প পরেই সভা ভঙ্গ হইল । তখন বাহিরে আসিয়া পরস্পর আলাপ পরিচয় হইতে লাগিল । সেখান হইতে অনেকেই মহতাব্ মঞ্জিল পরিদর্শন করিতে গেলেন । অনেকেই সাক্ষ্য-সম্মিলনে যোগদান করিতে চলিলেন । এই অবসরে রাজ প্রাসাদ দেখিয়া লইলাম । ইহা একটি দেখিবার সামগ্রী, অনেক পুরাতন দ্রব্য এখানে সংগ্রহ করা রহিয়াছে । বহুবিধ বহুমূল্য চিত্রে প্রত্যেক গৃহ সুসজ্জিত ; একটি গৃহে পূর্বপুরুষ ও মোগল সম্রাটগণের চিত্র সুশোভিত । কোন গৃহে মহারাজা দরবার করতেন, কোন গৃহে মহারাজ বহুবাকবের সহিত আলাপ পরিচয় করতেন । নাচ-গৃহ, অধ্যয়ন-গৃহ, ভোজন-গৃহ, সকল গৃহই অপূর্ণহৃদয় ও সুশোভিত । একটা কক্ষ একবল বহুবিধ অস্ত্রদ্বারা সুসজ্জিত এবং সেই গৃহটির বিশেষত্ব এই যে গৃহের যাবতীয় দ্রব্য রক্তিম বর্ণ এমন কি, মহারাজার সিংহাসনখানি হইতে সামান্য দ্রব্যটি পর্য্যন্ত অরুণ বর্ণ, এই গৃহটি অত্যন্ত মনোহর । মহারাজার পাঠাগার খুব সুন্দর । সকল গৃহের দ্বারে প্রহরী নিযুক্ত ছিল, কিন্তু তাঁহারা যেন নির্দ্বন্দ্ব নিপ্পন্দ । এই পরিদর্শন কার্যে তাহার যথেষ্ট সাচায়া করিয়া মহারাজার সৌভাগ্য ও ভদ্রতার পরিচয় দান করিতেছিল । এখান হইতে সাক্ষ্য-সম্মিলনে গিয়া উপস্থিত হইলাম । সাক্ষ্য-সম্মিলনে বহু পরিচিত, অপরিচিত, সাহিত্যিকের সহিত আলাপ হইল । এখানেও জলযোগের বিপুল আয়োজন । স্থানে স্থানে নানারূপ সঙ্গীত বাদ্যাদি চলিতেছিল । সোভা, লেমনেড, ডাব, সরবৎ, চা, বিহুট, খাস্তা, গজা, মিহিদানা, সীতাতোণ, পানতুয়া, নামাখি ফলমূল পর্য্যন্ত আয়োজন

করা হইয়াছিল। মহারাজা ঘুরিয়া ঘুরিয়া সকলের সহিত আলাপ-করিতেছিলেন। তাঁহার সৌজন্য ও মিষ্ট ব্যবহারে সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিলেন। আলোকমণ্ডলায় সমগ্র প্রাঙ্গণ উজ্জ্বল হইয়াছিল। সন্ধ্যার পরই বাসার ফিরিলাম। ফিরিয়াই শুনিলাম আনার প্রস্তুত হইতে চাইবে কারণ ৯টার সময় গিয়েটার। সকলের সহিত আহার করা হটল। সে-এক বিপুল ব্যাপার—পোলাও হইতে লুচি, মাচ, মাংস, দই, রাবড়ী, কিছুই বাদ যায় নাই। এই সময় জলধরলাদা আমাদের সন্ধান লইতে আসিয়া দেখিলেন, আমরা বিছানাপত্র কিছুই সঙ্গে লইয়া গাই নাই। তখন তিনি আমাদের তিনটি বিছানার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। বিছানার সমস্ত আসবাব মায় নেটের মশারিট পর্যন্ত নুতন। অনেকের গিয়েটার দেখিতে গেলেন। আমরা ও ক্লকবাবু গল্প জুড়িয়া দিলাম। এই সময় একজন ডাক্তার আসিয়া ‘কেমন আছি’ অঙ্গসঙ্গীত করিয়া লইয়া গেলেন। অনেকরাত্রি পর্যন্ত “সর্বোধন” পড়া গেল, তারপর স্থির হটল যে, প্রভাতে দামোদর দেখিতে যাওয়া যাইবে, পরে ফিরিয়া আসিয়া সভায় যাওয়া চাইবে। অধ্যাপক ক্লকবাবু ও হরলাল বাবু আমাদের সঙ্গী হইবেন, কথা রহিল।

রবিবার প্রাতঃকালে উঠিয়া একজন স্বেচ্ছাসেবককে সঙ্গে লইয়া দামোদর দর্শনে যাত্রা করিলাম। এই স্বেচ্ছাসেবক যুবক যশোদানন্দ গেল, অত্যন্ত উৎসাহ করিয়া আমাদের সঙ্গে চলিল। পাঁচ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া দামোদরের বাধে গিরী উপস্থিত হইলাম। দুর্গপ্রাকারের মত উচ্চ বাধ ভাঙ্গিয়া এই মন্দগতি কীর্ণকার শৃগাল-কুকুরের অনায়াস-অতিক্রম্য নদ, যে কেমন করিয়া একদিন বর্ধমান ও বাঙ্গলার নানাগাম জলময় করিয়াছিল, তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্যম্বিত হইতে হয়। বাধের ধারে ধারে এখনও সশঙ্করী লোক রীতিমত বাধে মাটি দিয়া নদ আরও দৃঢ় করিতেছে। দামোদরের তীরে দুই একগানি বাড়ীও দৃষ্ট হইল। বাধের একস্থানে একটি শিবমন্দির আছে। কিন্তু বাধের পরিসর বৃদ্ধি করিতে গিয়া বুড়া শিবের একরূপ জাতি নষ্ট হইয়াছে। তাঁহার অদৃষ্টে অচিরাতঃ কবর লাভ ঘটবে। ফিরিবার মুখে আমরা দের আকগানের সমাধি-মন্দির দর্শন করিলাম। রাজ-কলেজের অনতিদূরই এই সমাধি-মন্দির। ভগ্ন উদ্যানের ভিতর দুইটি অত্যন্ত সামান্য সমাধি; দেখিলে হুং হুং হয়। আমরা অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম, স্রুতরাং দেখানে বিশ্রামার্থ উপবেশন করিলাম। সমাধির পার্শ্বেই একটি গোপা মূলের গাঁছ, গাঁছ হইতে অনেকগুলি পুষ্প ফরিয়া পড়িয়াছে, সেই গাছে স্থানটি

আমোদিত হইয়া রচিয়াছে । উদ্যানের সংলগ্ন একটা সুন্দর পুকুরিণী । এখানে আসিয়া যেন বেশ একটু তৃপ্তি ও আনন্দলাভ করিলাম । দূর অতীতের অনেক কথাই মনের মধ্যে যেন সম্ভব হইয়া উঠিতে লাগিল । কবরের সাধারণ পাথরগুলি অপসারিত করিয়া সম্প্রতি নৃশন মার্কেল পাথর দিয়া সমাদি চুটটি নিম্মাণ করা হইয়াছে, দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দ হইল ।

বাঙ্গালার শাসনকর্তা সের আফগানের সমাধির উপর নিম্নলিখিত কয়েকটি কথা লেখা আছে ।

“মোহের উরিসা অর্থাৎ পরে যিনি মোগল সম্রাজ্ঞী হুরজাহান নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন, তাঁহার প্রথম স্বামী বর্ধমানের শাসনকর্তা সের আফগানের কবর ।
পৃষ্ঠা ১৬১০ ।” তাহার ঠিক পার্শ্বের কবরের উপর লেখা আছে—

“সম্রাট জাহাঙ্গীরের খাজীপুত্র কুতুবদ্দীন সের আফগানের পত্নী সুন্দরী মোহেরউরিসাকে প্রভুর করতলগত করিয়া দিবে,—এই সপ্তে সম্রাট তাঁহাকে বঙ্গদেশের সুবেদারের উচ্চপদে নিযুক্ত করিবেন, প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন । বীর-প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত যুদ্ধে কুতুবদ্দীন নিহত হইয়া এই স্থানেই সমাধিগ্রহণ করিয়াছিলেন ১৬১০ পৃষ্ঠা ১৬১০ ।” চাই কবর পাশাপাশি—চাই জনেই অজ্ঞ সকল কলট, সকল বিবাদের অস্ত্রে, অনন্ত শান্তিস্থায় চিরনিদ্রায় যথ । সমাধি-মন্দির হইতে বহির্গত হইয়া, আমরা সভায় উপস্থিত হইলাম । তখন সভা চুটুয়ের অধিবেশন আরম্ভ হইয়া গিয়াছে । দর্শনশাখায় সভাপতি শ্রীযুক্ত চীনেরনাথ দত্ত মহাশয় অভিভাষণ পাঠ করিতেছেন ; ভাঙ্গা-হাটের মত সভায় মাত্র জন কয়েক লোক ; তাঁহাদের মধ্যে আবার অনেকেই কবি, অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে তাঁহার চীনেরনাথের অভিভাষণ শ্রবণ করিতেছিলেন ।

• উক্ত সভায় দেখিলাম, কবি শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায়চৌধুরী, শ্রীমণীমোহন ঘোষ, শ্রীমুনীন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীকালিদাস রায়, শ্রীভূজঙ্গর রায় চৌধুরী প্রভৃতি ; তারপর বাহিরে ইতিহাসশাখায় উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, সেখানে সভাপতি শ্রীযুক্ত যতুনাথ সরকার মহাশয় অত্যন্ত ক্ষীণকণ্ঠে তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করিতেছেন, কেহ যে শুনিতেছিল বলিয়া মনে হইল না । সেখানে অনেক সাহিত্যিক জমায়েৎ হইয়াছেন । এই সভার পার্শ্বে পাড়াইয়া শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত বড় ভাল কান্না করিতেছিলেন । আমাদের সহিত তিনি অনেকের আলাপ করাইয়া দিলেন । ইহার পর আমরা সাহিত্য-শাখায় গিয়া উপস্থিত হইলাম । এক হিসাবে এটি দক্ষিণের বড়বৃক্ষ বলিলে অত্যাঁকি হয় না,

কারণ এখান হইতে অজানা শাখা বিস্তৃত হইয়াছে। এখানে প্রধান প্রবীণ-
 যাজ্ঞিক মহামহোপাধ্যায় তরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতি, তাঁহার পার্শ্বে তর-
 ধারকস্বরূপ প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় বসিয়া ছিলেন।
 এখানেও লোকের ভীড় একরূপ ছিল না বলিলে অত্যন্ত হয় না। রাজ-
 প্রাসাদের অন্নদূরে পিয়েটার-প্যাণ্ডেলে বিজ্ঞান-শাখার বৈঠক বসিয়াছিল।
 এখানকার সভাপতি শ্রীযুক্ত গোপেশচন্দ্র রায় মহাশয়। এখানে দেবিলাম,
 জলধর দাদা, জীবোদ্যমকেশ নৃত্যী, জীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, শ্রীবাণীনাথ নন্দী
 প্রভৃতি বসিয়া আছেন এবং প্রবেশদ্বারের নিকট শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যো-
 পাধ্যায় বোধ হয় বিস্তৃত বাবুতে হাঁক ছাড়িতেছিলেন। মহারাজা মাঝে মাঝে
 গাড়ি করিয়া সকলের নিকট হইতে তত্ত্ব গ্রহণ করিয়া ক্রিান্তেছিলেন। এই
 সময় জলধর দাদা বলিলেন, “মহারাজ নাটোর প্রবন্ধ লিখিতেছেন, সেজন্য সভায়
 আসেন নাই, তিনি প্রবন্ধ পাঠ করিবেন।” মহারাজা নাটোর, বর্ধমানের
 মহাভাব মঞ্জিলেই অবস্থান করিতেছিলেন। বেলা আন্দাজ ১১।০টার সময় বাসায়
 ফিরিলাম। তখনও সভা পূরা দমে চলিতেছে। কিন্তু তখন আমাদের
 সকল সঙ্গী ছাড়াছাড়ি হইয়া গিয়াছে। তাঁহারা যে তখন শাখায় শাখায়
 দমণ করিতেছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই; কিন্তু সন্ধান করিয়া বাহির
 করা একরূপ অসাধ্য। জ্ঞানবাবু ও আমি হইজনে বাসায় চলিলাম,
 সুবোধ বাবুকে সম্মিলনে হারাইয়া গেলাম। বাসায় উপস্থিত হইবার
 অল্পক্ষণ পরে সুবোধবাবু, বন্ধুবর জুববি যতীন্দ্রমোহন বাগচী ও
 কালিদাস রায় তথায় উপস্থিত হইলেন। তখন আমাদের কক্ষে সম্মিলন
 বসিয়া গেল। যতীন্দ্রবাবুকে পাইয়া মহা আনন্দ হইতে লাগিল, কৃষ্ণবাবুও
 আসিয়া আমাদের সহিত যোগ দিলেন। যতীন্দ্রবাবু পূর্ব দিন বিশেষ কষ্টোপগম্যে
 দানাপুর গিয়াছিলেন। গাড়ীতে সারা রাত্রি জাগরণ করিয়া প্রভাতে
 তিনি বর্ধমানে উপস্থিত হইয়াছেন। বহুদানে মহারাজের অহুসন্ধান
 করার পর তিনি রাজপ্রাসাদে তাঁহার দর্শন লাভ করেন। সেখানে
 সুবোধবাবুর সহিত সাক্ষাৎ হয়। তিনি তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া আনেন।
 তারপর যে কি হাঁসির রোল ও আনন্দের শ্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল
 তাহার বর্ণনা করিলে একখানি গ্রন্থ হয়। তাঁহাদের জন্ত তৎক্ষণাৎ জল-
 খাবার, চা, সবৎ প্রভৃতি আসিয়া উপস্থিত হইল। কালিদাস বলিল “আমি আর
 কোথাও গাইতেছি না, এখানেই আড্ডা নিলাম।” তখন তাঁহাদের নামও খাতায়

ঐতিহ্য গেল। অতঃপর কবিতাপাঠ আরম্ভ হইল, সঙ্গে সঙ্গে সমালোচনাও চলিতে লাগিল—সে ক্রি আনন্দ, কি উৎসাহ! আমাদের বাণীর দেখিয়া অনেকেই পরিচয় করিতে আসিলেন। ছান-পর্কে, ভোজন-পর্কে, আমরা সর্বজনবিদিত হইয়া গেলাম। আহারের সময় যতীন্দ্রবাবু রসালোপে সকলকে হাসাইতেছিলেন। হুম্মির বেগ সামলাইবার নিমিত্ত বিশেষ ভাবে সংযত হইতে হইয়াছিল। আহারের পূর্বে জলদরদাদা আসিয়া আমাদের সহিত একত্র ভোজন করিয়া মদ্য আনন্দ করিলেন।

বেলা ২টার সময় পুনরায় সভার অধিবেশন, হুতরাং সভায় গিয়া উপস্থিত হইলাম। তখন সাহিত্যসভায় প্রবন্ধ পাঠ চলিতেছে। পূর্ব সামান্ত মাত্র লোক উপস্থিত হইয়াছিল। মহারাজা বাহাদুর যে প্রকার ঘন ঘন আচারের সন্মিলন করিয়াছিলেন, তাহাতে সাহিত্য-সন্মিলন করার শক্তি বড় কাহারও ছিল না। কাহারও কাহারও মধ্যে আচার-আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছিল। বেলা তিনটার সময় নাটোরাদিপতি “সাহিত্যে মানব-জনন” নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। তখন মহারাজা বর্দ্ধমান, ঐশ্বরক দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারি ও হুতপূর্ব হাইকোর্টের জজ ঐসারদাচরণ মিত্র রাজা বনবিহারী, বাবু ইকুন্ত সেন ও অন্যান্য বহু সাহিত্যিক সভায় উপস্থিত ছিলেন। মহারাজার প্রবন্ধ অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে সকলেই শ্রবণ করিয়া যে বিশেষ আনন্দ অসুভব কল্পিতেছিলেন তাহা সকলের মুখের ভাব হইতে এবং ঘন ঘন আনন্দ-প্রকাশ করতালি ধ্বনি হইতে উপলব্ধি করা যাইতেছিল। অনেকেই মহারাজার প্রবন্ধের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছিলেন। মানসীর পাঠক-গণ তাহা ইতিপূর্বে পাঠ করিয়াছেন। মহারাজার প্রবন্ধ পাঠ শেষ হইলে তিনি বর্দ্ধমানের নিকট বিদায় লইয়া নৌটরে বেলা ৪৫টার সময় কলিকাতা যাত্রা করিলেন। ইহার পর বিশ্ব-নির্বাচন-সমিতির সভা হইল। সেখানকার স্থগা সংবাদপত্রেই সুবিদিত আছে। রায়ে থিয়েটারে বর্দ্ধমান মহারাজার লিপিত নাটক অভিনীত হয়। যদিও আমরা থিয়েটার দেখিতে যাই নাট, তনিলাম অভিনয় চমৎকার হইয়াছিল। সমস্তক্ষেপ মহারাজাও সকলের সচিত্র থিয়েটার দর্শন করেন। সন্মিলনের অনেকগুলি আলোকচিত্র গ্রহণ করা হয়। আমরা তাহার মধ্যে এবারও কয়েকপানি দিলাম। সন্ধ্যার সময়—পাটনা কলেজের অধ্যাপক ঐশ্বরক দোগীসেনাথ সনাদ্দার ন্যাজিক লুঠন সাহায্যে পুরাতন আলোচনা করেন। উচ্চ সকলের মনোরঞ্জন করিয়াছিল।

তৃতীয় দিন মহারাজা বর্ধমান অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে যে কয়েকটি কথা বলিয়াছেন, তাহা এখানে উদ্ধৃত করিলাম—

“এই উৎসবে অতিথি-সংকারে যাহা কিছু প্রশংসার বিষয় তাহা অভ্যর্থনা সমিতির প্রাণা এবং যাহা কিছু তেঁাঁর জাহার জন্ত আমিই নিব্বনীয় ও দায়ী। বেচ্ছাসেবকগণ স্কুলের কলেজের বালক ছাত্র—তাঁহাদের প্রতি আপনাদের কৃপা-দৃষ্টিপাতে ক্ষমা করিবেন। উহারা যদি কিছু সেবা-গৌরব লাভ করিয়া থাকে, তাহা আপনারাই গভবাব বজার সময় লিখাইয়া গিয়াছেন। আপনারাদের বালকের নিকটই উহারা শিখিয়াছে।” তিনি আরও বলিলেন “আমাদের গর্ব করিবার আর একটা বিষয় আছে যে, আমরা কুমারখালীর জলদরবারকে টানিয়া বর্ধমানে আনিয়া বর্ধমানবাসী করিয়া লইয়াছি।”

মহারাজার সরল, সুন্দর কথা ও ব্যবহারে সকলে মুগ্ধ হইয়া প্রত্যাবর্তন করেন। আগামী বর্ষের জন্ত সম্মিলন যশোহরে আহত হইয়াছে। সে এখন অনেক দিলয়।

শ্রীফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ।

আষাঢ়ে

শ্রামা মা আমার নাচে !
 নাচে শকর নাচে !
 রিনিকি কিনিকি কনক নুগর
 সঘনে ডমরু বাজে !
 ভালে উজ্জল জাগা,
 চলিছে পাখানাদা,
 বিকৃতি-পরাগে রঞ্জিত দিশি,
 অকাল সন্ধ্যা সাজে !
 ধ্বনিছে রুদ্র তাল,
 ব ব বম্—বাজে গাল,
 নাম পূরিত দিবুখভাগ
 সমীর গভীর গাজে !
 মাহি গধর, কাঁপে অধর
 শ্রামা শকর নাচে,
 আষাঢ়ের মেল মাঝে !

মস্তা রতস-রঙ্গ
 শ্রামা কটাক্ষ হানে,
 উন্মাদ হর হেলে ককর
 নভামরার গীতুন !
 গভীর অটু হাত,
 চঞ্চল-লীলা-লাহ
 ছটা বিজ্ঞারে গরজে গঙ্গা
 উপাম অস্তিমানে !
 অঙ্গ অঙ্গ মিলে,
 শটিক ইন্দ্রলীলে
 রোমকূলে দূটে বিফলিঙ্গ
 প্রেমালিঙ্গন দানে ।
 বম্ বব বব, চলে তাণ্ডব,
 চণ্ড-আসব পানে !
 শ্রামা কটাক্ষ হানে ।
 দুলিছে দীর্ঘ শূল
 ধূসর চক্রবালে !
 হীরবে ঈশান বাজায় বিষাগ,
 শ্রামা নাচে তালেতালে !
 ভীম স্তম্বর ছবি !
 ললাটে রক্ত রবি,
 বিলোল রক্তনা শিখরা দশনা
 করালিনী করবালে ।
 কঙ্কণ কণ কণ,
 হৃদয় ঘন ঘন,
 রুধির পদ্ম শোভিত অঙ্গ
 মণ্ডিত কেশজালে !
 নৃত্য ঠমকে, চঞ্চ চমকে
 রক্ততগিরির ডালে !
 শ্রামা নাচে তালে তালে !

ছায়া-নিমগ্ন বিখ
 রবি মূচ্ছিত লাজে,—
 মেঘ অরণ্যে লীলা লাবণ্যে
 চরণ-কমল ভাজে ।
 জটা বিপ্লবিত জন্মা,
 ঝরিছে ঝলিছে গম্ভ,
 নবদুর্লাভ পুলকাকিতা
 ধরনী তরুণী সাজে ।
 ক্ষম্মরে গিরিকূটে
 কোটা ওঙ্কার কূটে
 মত্ত পবন,— নতি করে বন,—
 পাগল বাদল সূঁঝে ;
 উথল অশ্ব বাজিছে কণ্ঠ
 সিদ্ধ চরণ যাচে !
 গ্রামা শব্দর নাচে !

শ্রীমুকুন্দনাথ ঝোষ

বঙ্গালার ইতিহাস . . .

(সমালোচনা—শেবার্জ)

পৃষ্ঠীয় নবম শতাব্দের উত্তরাংশের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের মূলগ্রন্থ, উত্তরাংশের
 প্রাধান্য লইয়া গোড়জনের এবং গুর্জরগণের অর্থাৎ বঙ্গালীর এবং রাজপুত্রের
 মধ্যে বিরোধ । অষ্টম শতাব্দের শেষভাগে গুর্জর-প্রতীহাররাজ বৎসরাজ গোড়-
 বঙ্গ আক্রমণ করিয়া এই বিরোধের স্তত্রপাত করিয়াছিলেন । রাষ্ট্রকূট-
 রাজের সহিত বিরোধে লিপ্ত থাকায় অষ্টম শতাব্দের শেষ ভাগে এবং নবম
 শতাব্দের প্রথম ভাগে গুর্জরগণ গোড়সাম্রাজ্যের উন্নতির পথে বিশেষ বাধা
 দিতে সমর্থ হইয়াছিলেন না, গোড়াদিগে ধর্মপালকে কাছকুঞ্জের সিংহাসনে
 অন্নগত চক্রাযুধকে প্রতিষ্ঠিত করিবার অবসর দ্রুত বাধা হইয়াছিলেন ।
 ৮১৫ খৃষ্টাব্দে রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দের মৃত্যুর পর রাষ্ট্রকূট-রাষ্ট্রীয়
 শ্রীতির পরিবর্তন ঘটয়াছিল । তৃতীয় গোবিন্দের উত্তরাধিকারী প্রথম অমোঘ-

- বর্ষ উত্তরাপথের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে প্রস্তুত ছিলেন না । হুতরাং গোড়-গুর্জর-বন্দ্য আরও ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছিল । 'গুর্জর প্রতীহার-রাজগণের গোয়ালিয়ের (সাগরতালে) প্রাপ্ত শিলালিপিতে এবং তাঁহাদের সামন্তরাজগণের কয়েকখানি শিলালিপিতে গোড়-গুর্জর-বন্দ্যের গুর্জর পক্ষীয় বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে । গোড় পক্ষের এইরূপ বিবরণ এখনও আমাদের হস্তগত হয় নাই । পালরাজগণের তাম্রশাসননিচয়ের রাজকুলপ্রশস্তি রচয়িতৃগণ গোড়-গুর্জর-বন্দ্য সম্বন্ধে কোন কথাই স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই । নারায়ণ পালের মন্ত্রী 'গুবর্মিশ্রের' গরুড়স্তম্ভলিপির একটি পংক্তিতে গোড়-গুর্জর বন্দ্যসম্বন্ধে গোড়-জনের ঘাড়া কিছু বক্তব্য ছিল, তাঁহার পরিসমাপ্তি হইয়াছে । এই পংক্তিতে দেবপাল সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—

“ধর্মীকৃত-দ্রবিড়-গুর্জর-নাথ-দর্পং” (গোড়লেখমালা, ৩৪ পৃঃ)

“এট মন্ত্রীবরের বুদ্ধিবলের উপাসনা করিয়া গোড়েশ্বর দেবপালদেব... দ্রবিড়-গুর্জর-নাথ-দর্প-ধর্মীকৃত করিয়া দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত মনুজ-মেঘলাভরণা বহুক্ষণ উপভোগ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন ।”

রাখালবাবু গরুড়-স্তম্ভলিপির এই পংক্তির সহিত 'গুর্জর পক্ষের' প্রমাণের সার্বভাসা বিধানের জন্য ৮৬৫ খৃষ্টাব্দে 'গুর্জরনাথ-দর্প-ধর্মীকর্তা' দেবপালের মৃত্যু কল্পনা করিয়া লইয়া গুর্জরপ্রশস্তিনিচয়ের কথিত গোড়জনের পরাজয় দেবপালের উত্তরাধিকারীগণের সময়ে ফেলিয়াছেন । রাখালবাবু দেবপাল কর্তৃক এই-গুর্জরনাথ পরাজয়-প্রসঙ্গ অবিখ্যাস করিতে পারেন নাই । তিনি লিখিয়াছেন, “দ্বিতীয় নরগভট্টের পুত্র রামভট্ট বোধ হয়, দেবপালকর্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন (১৮৩ পৃঃ) ।” তার পর আবার 'গুর্জরনাথকর্তৃক দেবপালের পরাজয় কল্পনা করিতে বাধ্য হইয়াছেন । বলা, “অজুমান হয়, দেবপালদেব ৮২৫ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ৮৬৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন । তাঁহার রাজ্যের শেষভাগে প্রতীহাররাজ রামভট্টের পুত্র প্রথম ভোজ মহোদয় বা কান্যকুব্জ অধিকার করিয়াছিলেন (১৮৯ পৃঃ) ।” দেবপালের রাজ্যের এই “শেষভাগ” বলিতে ৮৪২ খৃষ্টাব্দের পূর্বের কোন সময় বুঝিতে হইবে । গোড়সেনা পরাজিত না করিয়া অবশ্যই প্রতীহার-রাজ ভোজ কান্যকুব্জ দখল করিতে এবং দখলে রাখিতে পারেন নাই । যেহেতু দেবপালের মৃত্যুর অন্ত ২৩ বৎসর পূর্বে কান্যকুব্জ দখল করিয়া 'গুর্জর নাথ' গোড়াধিনাথ দেবপালের দর্প ধর্ম করিয়াছিলেন, হুতরাং নারায়ণ পালের

সময়ে রচিত গুরুত্বস্বল্পলিপিতে দেবপালকে গুরুত্বনাথ-দর্প-ধর্মকারী বলায় মতের অপলাপ করা হইয়াছে, রাণাল বাবুর মতাসূচনা করিতে গেলে একথা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই । রাজকুলের প্রশস্তিকারের উক্তি এইরূপ সংশয়ের চক্ষে দেখা যে অসম্ভব তাহা আমি বলিতেছি না । কিন্তু গুরুত্ব পক্ষের প্রশস্তিকারগণের উক্তি অকস্মেৎ অসম্ভব মত বলিয়া গ্রহণ করিয়া রাণালবাবু গোড়-গুরুত্ব-বংশের এক তরফা ইতিহাস রচনা করিয়াছেন । আমি একে একে এই লিপিশৃঙ্গলির পরীক্ষা করিব ।

(১) রাজপুতানার নাড়োয়ার রাজ্যের রাজধানী যোধপুর নগরের গুটিয়া-গায়ে আবিষ্কৃত একখানি শিলালিপিতে এবং যোধপুর হইতে পশ্চিমোত্তর দিকে ২২ মাইল দূরদানে অবস্থিত বটমাল নামক স্থানে আবিষ্কৃত আর কয়েকখানি শিলালিপিতে একটি স্বতন্ত্র প্রতীহার-বংশের পরিচয় পাওয়া যায় । যোধপুর লিপি প্রতীহার বাউকের প্রশস্তি । + যটমালের কয়েকখানি লিপিই প্রতীহার কক্ককের প্রশস্তি । + বাউক এবং কক্কক উভয়েই প্রতীহার কক্ককের পুত্র । নথা—

পদ্মিনী

হর্ষভদ্রবী ।

বাউক

কক্কক

কক্ককের তিনখানি প্রশস্তিই একদিনে, “সম্বৎ ৯১৮ চৈত্রশুদি ২ বুধে হস্তনক্ষত্রে” সম্পাদিত হইয়াছিল । ডাক্তার কিলহর্ন মন্তব্য প্রকাশ করিয়া গ্রহণ করেন যে এখানে বারে এবং তারিখে ভুল আছে । ‡ ৯১৮ বিক্রম সম্বৎ = ৮৬১-৬২ খৃষ্টাব্দ । বাউকের প্রশস্তির তারিখসম্বন্ধে কিলহর্ন লিখিয়াছেন,—

“If Munshi Deviprasad were right in reading the date of the Jodhpur inscription samvat 940, Kakkuha, whose present inscription contains a date of the year 918, would have to be considered as the predecessor of Banka; but, judging from the rubbing of the Jodhpur inscription, I still believe the date of that inscription to be

* J. R. A. S. 1904, pp. 1—9 E. R. A. S. 1905, pp. 512—521, Biographia Indica, Vol. ix. p. p. 277—281.

‡ J. R. A. S. 1905. p 515,

- * samrat 4, and it therefore remains doubtful which of the two chiefs was the elder brother.*

যোধপুরনিবাসী শ্রীযুক্ত মূলী দেবীপ্রসাদ বাউকের যোধপুর লিপির এবং কক্কের ঘটনালের একপানি লিপির পাঠোদ্ধারাদি করিয়া লিপির ছাপসহ লণ্ডনের রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটির সম্পাদকের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। সোসাইটির সম্পাদক সেই সকল কাগজপত্র সংশোধন করিবার জন্য কিলচর্নকে প্রদান করেন। কিলচর্নকর্তৃক সংশোধিত হইয়া মূলী দেবীপ্রসাদের আবদ্ধ-হয় সোসাইটির জর্ণালে প্রকাশিত হইয়াছে। মূলী দেবীপ্রসাদ বাউকের যোধপুর-প্রশস্তির সংবৎ পাঠ করিয়াছিলেন ১৯০০। কিলচর্ন লিপির ছাপ পরীক্ষা করিয়া সেই স্থলে পাঠ করিয়াছেন “সংবৎ ৪৭” অতীত বাউকের এবং কক্কের মধ্যে কে যে ছোট এবং কে যে বড় সেই সম্বন্ধে কিলচর্ন কোনও অভিন্ন প্রকাশ করিতে পারেন নাই। কেহ কেহ অনুমান করেন, এখানে ৮২৪ সংবৎ (৮৩৭ খ্রষ্টাব্দ) লিপিকরের অভিপ্রেত ছিল। + কক্কের প্রশস্তিতে তাঁহার পিতা কককে “শ্রীশ্রীশ্রীঃ” বলা হইয়াছে। কিন্তু বাউকের প্রশস্তিতে এটীকটি আছে—

- ততাপি শ্রীযুক্ত ককঃ পুরো জাভতা মহামতিঃ ।

যশো মুন্সেফিরোল্লঃ যেন গোড়ঃ সমংগে ॥

*তাঁহার (ভিন্নাধিকার) শ্রীযুক্ত ককনামক মহামতি পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। যিনি মুন্সেফিরিতে গোড়গণের সহিত যুদ্ধে যশো-লাভ করিয়াছিলেন।”

মুন্সেফিরি অবশ্যই মুন্সের। বাউকের প্রশস্তির সময় আমরা জানি না। কক্কের প্রশস্তির লিপিকাল ৮৩১-৮৩২ খ্রষ্টাব্দ। কক্ক তখন রাজপদে প্রতিষ্ঠিত। এই ৮৩১

- --৮৩২ খ্রষ্টাব্দের পূর্বেই অবশ্য কক্কের পিতা কক মুন্সেরে গোড়সেনার সহিত যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছিলেন। প্রতীহারী কক নিশ্চয়ই ভিন্নমতের এবং পরে কানা-কুন্সের প্রতীহারীরপালের একজন সামন্ত ছিলেন। কক পুত্র সম্ভব মিহির-ভোজ কর্তৃক প্রেরিত হইয়া বা মিহির-ভোজের সহিত আসিয়া মুন্সেরের যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিলেন। বাউকের প্রশস্তিতে যে ভাবে মুন্সেরের যুদ্ধের কথা আছে, তাহাতে ইহা অবিশ্বাস করা যায় না। কিন্তু এই যুদ্ধে কোন পক্ষ যে জয়লাভ করিল, তাহার আভাস নাই। সম্ভবতঃ মিহির-ভোজ কককে লইয়া মগধ আক্রমণ করিয়াছিলেন। গোড়সেনার এবং কুন্সেরসেনার মুন্সেরে এক যুদ্ধ হইয়াছিল। এই যুদ্ধে হয়ত, প্রতীহারী-সেনা পরাস্ত হইয়াছিল।

তাই বাউকের প্রশস্তিকার এই যুদ্ধে ককের যশোলাভের কথা বলিয়াই কান্দু হইয়াছেন, সত্যের অল্পগোধে ভয়লাভের কথা বলিতে পারেন নাই। কক্কের প্রশস্তিকার এই ঘটনার উল্লেখনাক্রমে করেন নাই। এই যুদ্ধ অবশ্যই ৮১১ খৃষ্টাব্দের পূর্বে, আমানের হিসাবে দক্ষপালের সময়ে ঘটিয়াছিল। “বাঙ্গালার ইতিহাসে” রাণাল বাবু এই যুদ্ধের “যুদ্ধসংক্ষেপ” নামে লিখিয়াছেন তাহা সকল প্রকার প্রমাণেরই বিরোধী। যথা—

“প্রাচীন মাগধাপুরের (বর্তমান মাগড়ার যোধপুর রাজ্য), প্রতীহারবংশীয় অমিপতি কক্ক গোড়-যুদ্ধে যুদ্ধাধিরাজে অর্থাৎ মুদ্রেন্দ্রে, যশোলাভ করিয়াছিলেন। ককের পুত্র বাউকের একখানি শিলালিপি যোধপুরে আবিষ্কৃত হইয়াছে; ইহাতে এই ঘটনার উল্লেখ দ্রুতিতে পাওয়া যায়। যোধপুরের শিলালিপি ডাঃ বুলারের মতামতানুসারে বাউকের চতুর্থ রাজ্যকে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। কিন্তু পণ্ডিত দেবীপ্রসাদের মতামতানুসারে উহা ৯৪০ বিক্রমাব্দে (৮৮৩ খৃঃ অঃ) উৎকীর্ণ হইয়াছিল। ককের অপন পুত্র কক্কের একখানি শিলালিপি যোধপুর রাজ্যে ঘটয়াল গ্রামে আবিষ্কৃত হইয়াছে; কিন্তু ইহাতে ককের গোড়-যুদ্ধের কোনই উল্লেখ নাই। এই শিলালিপি ৯১৮ বিক্রমাব্দে (৮৬১ খৃঃ অঃ) উৎকীর্ণ হইয়াছিল। সুতরাং ইহা স্থির যে, ৯১৮ হইতে ৯৪০ বিক্রমাব্দের মধ্যে কোন সময়ে কক্ক যুদ্ধাধিরাজে গোড়-যুদ্ধের সহিত যুদ্ধে যশোলাভ করিয়াছিলেন (৯১৬—৯১৭ খৃঃ)।”

রাণালবাবু ভুলিয়া কিলহর্ণ স্থলে বলাভ লিখিয়াছেন। তিনি যদি কিলহর্ণের সংশোধিত “সংস্কৃত ৪” পাঠ অগ্রাহ্য করিয়া মুন্সী দেবীপ্রসাদের পণ্ডিত “সংস্কৃত ৯৪০” বহাল রাখিতে চাহেন তবে তাহা খুলিয়া বলা উচিত ছিল। কক্কের ৩ খানি লিপি ৯১৮ সংবতে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। এই সকল লিপিতে স্পষ্টাক্ষরে উল্লিখিত হইয়াছে, কক্ক তখন একজন প্রসিদ্ধ নরপতি। সুতরাং ৯২৮ সংবতে কক্কের পিতা কক্ক জীবিত ছিলেন, এবং তাহার পরে কোন সময়ে যুদ্ধের যুদ্ধে যশোলাভ করিয়াছিলেন, এরূপ অসম্ভব। প্রতীহার কক্ক যুদ্ধের যে যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিলেন সেই যুদ্ধ ৮৬১ খৃষ্টাব্দের পূর্বে কোন সময়ে সংঘটিত হইয়াছিল, এইরূপ অসম্ভব না করিয়া উপায় নাই।

(২) গোরখপুর জেলার অন্তর্গত কহল নামক গ্রামে গ্রাম্য, সরস্বতীর জীবনস্বরূপ (সরস্বতীর-জীবিতম্) অর্থাৎ অমিপতি বলিয়া বর্ণিত কলচুরি বংশীয় সোড়মেবের ১১৩৪ বিক্রম সম্বতের (১০৭৭ খৃষ্টাব্দের) একখানি তাম্রশাসনে

কথিত হইয়াছে সোড় দেবের অতিবৃদ্ধপ্রতিমাহ গুণাক্তোদিতেন ভোজদেব নামক নরপতির আশ্রিত ছিলেন এবং যুদ্ধে “গোড়লক্ষী” হরণ করিয়াছিলেন । * রাখালবাবু অস্বীকার করেন এই ভোজদেব গুর্জর-প্রতীহার-রাজ মিহির-ভোজ (১২৭ পৃঃ) ।

(৩) রাজপুতানার জয়পুর রাজ্যের অন্তর্গত, জয়পুর নগরের ২৬ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত, চাটুস্থ নামক স্থানে, একটি পরিত্যক্ত মন্দিরের প্রাচীর-গায়ে একটি সুদীর্ঘ শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে । লিপির অক্ষরেক হিসাবে ত্রিযুক্ত দেবদন্ত নামকৃত ভাণ্ডারকার অনুমান করেন, এই লিপি খ্রীষ্ট দশম শতাব্দীতে উৎকীর্ণ হইয়াছিল । আমরা মিবালের গুহিল বা গিহেলাট রাজবংশের ইতিহাসের সহিত সুপরিচিত । উদয়পুরের মহারাণা এই বংশজাত । চাটুস্থর এই শিলালিপিতে স্বতন্ত্র একটি গুহিল রাজবংশের পরিচয় পাওয়া যায় । ভাণ্ডারকার অনুমান করেন, জয়পুরের অন্তর্গত চাটুস্থ চইতে উদয়পুরের অন্তর্গত ডবোক পর্যন্ত এই গুহিলরাজ্য বিস্তৃত ছিল, এবং মেবারের জহাজপুর রাজ্যের অন্তর্গত দোড়নগরে (দিবগঠায়) এট- রাজ্যের রাজধানী ছিল । এট বংশের দনিক নামক সামন্ত নৃপতির ৪০৭ (৪০৭) সংবতের বা ৭০২ খ্রীষ্টাব্দের একখানি লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে । দনিকের পুত্র আউক । আউকের পুত্র রুমরাজ । রুমরাজের পুত্র শংকরগণ সম্বন্ধে শিলালিপিতে কথিত হইয়াছে,

“প্রতিজ্ঞাং প্রাক্করেষ্টটকরিষটাসংকটরণে
ভটং জিহ্মা গোড়কিত্তিপনবনিং সংগরজতাং
বলাক্ষসীং চক্র প্রভুরগণয়ো যঃ প্রণয়িনীং
ততো ভূপঃ সো ভূজিত বহুরগঃ শংকরগণঃ ॥ ১৪ ॥”

“তাহা হইতে (রুমরাজ হইতে) বহুরাজ্যীয় শংকরগণনামক ভূপতি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । তিনি প্রথমতঃ প্রতিজ্ঞা করিয়া (পরে) চক্র করিষটাসংকট রণক্ষেত্রে গোড়কিত্তিপুত্র ভটকে পরাজিত করিয়া (তাহার) রণনিষ্ঠিত রাজ্যকে বলপূর্ব্বক (যৌর) প্রভুর চরণের প্রণয়িনী দাসী করিয়াছিলেন ।”

শংকরগণের পুত্র হর্ষরাজ । এই হর্ষসম্বন্ধে প্রশস্তিকার লিখিয়াছেন—

বীটর সৈন্যগিরিচমুখিনাশ [কুশলৈ হর্ষদ্রিতো— —

— —বারগ বংশজৈ] গিরিশিখরস্থংগৈশ্বদাতৈর্গজৈঃ ।

জিহ্বা যঃ সৰুলাহুদীচানুপতীন্ ভোজায় ভক্ত্যাদদৌ

শক্ত্যৈকতসিদ্ধলংঘনবিদৌ শ্রীবংশজান্ বাজিনঃ । ১৯ ॥

“যিনি শত্রুসেনাবিনাশকুশল বীরগণের.....এবং গিরিশিখরতুলা উচ্চ নদাক্ষ গজনিচয়ের সাহায্যে উত্তরদেশীয় সকল নরপতিগণকে পরাজিত করিয়া ভক্তিসহকারে ভোজকে বালুকাময় স্থান এবং নদীলতায় সনর্থ শ্রীবংশীয় অথ সকল উপহার দিয়াছিলেন ।” *

হর্ষরাজের পুত্র দ্বিতীয় গুহিল । এই দ্বিতীয় গুহিলসম্বন্ধে প্রশস্তিকার লিখিয়াছেন—

শ্রীনোরদৈ রুদংচংকুলিশয়থুরক্কপূক্ষাকিতীতৈঃ

সংগ্রামাজোদি পোতৈ রুদদিতনমহাবাহবংশপ্রসূতৈঃ ।

জিহ্বা গোড়াধিনাথং বিবুধজনবধুগীতসংকীৰ্ত্তি রাজৌ

প্রাচ্যেভ্যঃ পার্থিবেভ্যঃ প্রচুরতরকরং গোপ্রহীং স্বামিনিষ্ঠঃ ॥ ২০ ॥

“বিশালবক্ষা, উর্ধ্বোৎক্লিষ্ট বস্ত্রকঠিন পুরের দ্বারা, পূর্বাঙ্গারের-তীর ধনন-কারী, সমর-সাগরের নৌকারূপ সমুদ্রোপস্থিত মহাতুরগ (উচ্চঃপ্রবার) বংশ প্রসূত অশ্বগণের সাহায্যে, প্রভুভক্ত, দেববধুগীতকীর্ত্তি সেই (গুহিল) যুদ্ধে গোড়াধিনাথকে পরাজিত করিয়া প্রাচ্যদেশীয় নরপতিগণের নিকট হইতে প্রচুরতর কর গ্রহণ করিয়াছিলেন ।”

দ্বিতীয় গুহিলের পুত্র বালাদিত্যের সময়ে এই প্রশস্তি উৎকীর্ণ হইয়াছিল । ভাণ্ডারকার নথ্যই অসুস্থমান করিয়াছেন, এই লিপির হর্ষরাজ উদীচানুপতিগণকে পরাজিত করিয়া যে ভোজকে বাজি উপহার দিয়াছিলেন, তিনি প্রতীহারবংশীয় মিহিরভোজ (৮৫৩-৮৮২ খৃঃ অঃ) । হর্ষরাজের পিতা শকরগণ মিহিরভোজের পিতা রামভদ্রের বা পিতামহ দ্বিতীয় নাগভট্টের, হয়ত উভয়েরই সামন্ত ছিল । শকরগণ যে “গোড়াক্তিপ” ভট্টকে জয় করিয়াছিলেন, তিনি কুব্জই ধর্মপাল । ভট্ট অর্থে যোদ্ধাও হইতে পারে, অথবা ধর্মপালের নামান্তরও হইতে পারে । প্রশস্তিকার যে লিখিয়াছেন, শকরগণ গোড়াধিপকে পরাজিত করিয়া তাঁহার অবনী (রাজ্য), হরণ করিয়া প্রভুর পদানত করিয়াছিলেন ইহা অমূলক স্ততি-বাক্য মাত্র । কেননা এই প্রশস্তিকার পরে শকরগণের পৌত্র দ্বিতীয় গুহিলের গোড় অভিযানসম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার সহিত শকরগণকর্ত্তৃক গোড়পতির

রাজা [অবনী] হরণ-কৃতান্তের সামঞ্জস্যবিধান অসম্ভব। দ্বিতীয় নাগভটের সহিত গোড়-সেনার যে যুদ্ধ হইয়াছিল শতরগণ হরত তাহাতে উপস্থিত ছিলেন, এই পর্য্যন্ত স্বীকার করা যাইতে পারে। শতরগণের পৌত্র দ্বিতীয় গুহিল যে গোড়াধিনাথকে পরাজিত করিয়া স্বীয় প্রচুর জ্ঞাত প্রাচ্য নৃপতিগণের নিকট হইতে প্রচুরতর কর আদায় করিয়াছিলেন, তিনি সম্ভবতঃ দেবপাল। এই দ্বোকে আমরা গোড়াধিনাথের প্রভাবের সম্যক পরিচয় পাইতেছি। গোড়াধিনাথ প্রাচ্য পার্শ্ববর্গের অধিরাজ বা সম্রাট ছিলেন; যিনি গোড়াধিনাথকে পরাজিত করিতে পারিতেন তিনি প্রাচ্য পার্শ্ববর্গের নিকট কর দাবী করিতে পারিতেন। প্রাচ্য নৃপতিগণ গোড়াধিনাথকে কর প্রদান করিতেন। গোড় সাম্রাজ্য বাহুবলে নির্জিত হইয়াছিল না, বরঞ্চাকৃত নির্জাচনের ফলে, যুদ্ধরাজ্যের আকারে আবিস্কৃত হইয়াছিল। ভারতের অন্যান্য সাম্রাজ্য কতক পরিমাণে সম্রাটের কৃত্যগণ শাসিত বৃহৎ রাজ্য ছিল, আর 'গোড় সাম্রাজ্য আদৌ বরঞ্চাকৃত নৃপতিগণকর্তৃক শাসিত রাজ্যসমষ্টি (Federation) ছিল। দ্বিতীয় গুহিলের আক্রমণের সময় যদি দেবপালকে গোড়াধিপ বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে প্রশংসিত যে লিপিয়াছেন, গুহিল গোড়াধিনাথকে পরাজিত করিয়া প্রাচ্য পার্শ্ববর্গের নিকট হইতে প্রচুর কর আদায় করিয়াছিলেন, তাহা বিশ্বাস করা যায় না।

রাখালবাবু তাঁহার "ইতিহাসে" চাটস্থ লিপির উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু প্রথম ও দ্বিতীয় লিপির সহিত পালনরপালগণের প্রশস্তির সামঞ্জস্য বিধান করিবার জন্ত তিনি ৮৬৫ খৃষ্টাব্দে দেবপালের মৃত্যু করন করিয়া লইয়া নারায়ণ পালের দ্বকে পরাজয়ের ফলক-ভার চাপাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। যথা, "অজুমান হর ইহার (নারায়ণ পালের সম্ভবতঃ রাজ্যাক্রম) পরেই মগধ, তীরভুক্তি ও অঙ্গ ভোজদেবকর্তৃক বিজিত হইয়াছিল (১৯৮ পৃঃ)।" গুর্জর প্রতীহার-রাজ মিহিরভোজ যে ৮৪৩ হইতে ৮৮১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কাঞ্চকুজের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন তাহার প্রমাণ আছে। ৮৮১ খৃষ্টাব্দের পরে মিহিরভোজ যে বেনী দিন জীবিত ছিলেন তাহা মনে হয় না। কিন্তু রাখালবাবুর মতামতানুসারে যদি স্বীকার করিতে হয় যে, নারায়ণপালের রাজ্যের ১৭ বছরের পরে মিহিরভোজ অঙ্গ মগধাদি জয় করিয়াছিলেন, তবে অজুমান করিতে হয় যে ৮৮১ খৃষ্টাব্দের কয়েক বৎসর পরে মিহিরভোজ এই পূর্ব দিগ্বিজয়যাত্রায় হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। কারণ ৮৬৫ খৃষ্টাব্দে দেবপালের মৃত্যু, তারপর প্রথম বিগ্রহ

পাল বা প্রথম শূরপালের অন্তে ৩ বৎসরবাগী রাজত্ব—; তার পর নারায়ণ পালের রাজত্বের প্রথম ১৭ বৎসর; তার পর মিহিরভোজকর্তৃক মিথিলা, মগধ অঙ্গ অধিকার । মিহিরভোজের রাজত্বের আয়ুদের জানা শেষ তারিখের (৮৮১ পূঃ অঃ) এবং তাঁহার উত্তরাধিকারী মহেন্দ্র পালের রাজত্বের আয়ুদের জানা প্রথম তারিখের (৮৯৩ পূঃ অঃ) মধ্যে ১২ বৎসরের ব্যবধান^১ তথাপি ৮৬৫ + ৩ + ১৭ = ৮৮৫ খৃষ্টাব্দের পরে যে মিহিরভোজের মগধাদি প্রদেশ জঙ্গল অবসর ছিল, উপস্থিত প্রমাণের বলে তাহা অনুমান করিতে প্রবৃত্তি হয় না ।

রাখালবাবু কেন যে মিহিরভোজকর্তৃক ৮৮৫ খৃষ্টাব্দের পরে মগধাদি অধিকার করিয়াছেন, তাহার প্রধান কারণ নিম্নোক্ত অংশে প্রদান করিয়াছেন—

“প্রথম ভৌজদেবের পুত্র, মহেন্দ্রপাল, পিতার মৃত্যুর পরে প্রতীহার-বংশের বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । মহেন্দ্রপাল দেবের রাজ্যকালে তীরভুক্তি ও মগধ পালরাজগণের হস্তচ্যুত হইয়া প্রতীহার সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল । এই প্রদেশদ্বয়ে মহেন্দ্রপাল দেবের অধিকারহুক একখানি তাম্রশাসন ও কয়েকখানি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে । মহেন্দ্রপাল দেবের অষ্টম রাজ্যকে গয়ার নিকট ফল্গুনদীর অপর পারে রানগয়ার সহদেব নামক এক ব্যক্তি বিষ্ণু নন্দাবতারের একটি প্রস্তরমূর্তির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । ২৫৫ বিক্রমাব্দে (৮২৮ পূঃ অঃ) মহেন্দ্রপাল দেব শ্রাবস্তীভুক্তির অন্তর্গত শ্রাবস্তি, বিহরে একখানি গ্রানি জনৈক ব্রাহ্মণকে দান করিয়াছিলেন^২ গয়া জেলার গুণেরীয়া গ্রামে মহেন্দ্র পালের নবম ও উনবিংশ রাজ্যকে প্রতিষ্ঠিত দুইটি প্রস্তর মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে (২০০—২০১ পূঃ) ।”

প্রতীহার রাজ মহেন্দ্র পালের সময়ে (+৮৯৩ - ৯০৭ + পূঃ অঃ) মগধ এবং মিথিলা (তীরভুক্তি) পালরাজগণের হস্তচ্যুত হইয়া প্রতীহার-সাম্রাজ্যভুক্ত হওয়ার প্রমাণরূপ রাখালবাবু যে তাম্রশাসনখানির উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা সারণ জিলার অন্তর্গত গোপালগঞ্জের দক্ষিণ পূর্বে ৫ মাইল ব্যবধানে অবস্থিত দিখোয়া—তুবৌলী গ্রামে আবিষ্কৃত হইয়াছিল । মহোদয় বা কাভকুজ নগরে এই তাম্রশাসন সম্পাদিত হইয়াছিল ।

“শ্রীমহোদয় সমাবাসিতানেক গোহত্যাখরথপতি সঙ্গায় সন্দাবারং ।”

এই শাসনের দ্বারা যে ভূমি দান করা হইয়াছে তাহা শ্রাবস্তী ভুক্তিতে শ্রাবস্তী-মণ্ডলে অর্থাৎ বর্তমান অবোধা প্রদেশের অন্তর্গত গোড়া জেলার সাহেত-মাহেতের সমীপবর্তী কোনও স্থানে অবস্থিত ছিল । যথা—

“প্রাবর্তী ভুক্তো প্রাবর্তী মণ্ডলাস্ত্রপাতী—বালরিকা । বিষয় সম্বন্ধ পালীয়ক গ্রামঃ ।” •

এই তাম্রশাসন সপ্রমাণ করে, কাক্তকুজ এবং প্রাবর্তী প্রদেশ মহেন্দ্রপালের অধিকারভুক্ত ছিল । কিন্তু মগধ বা মিথিলা মহেন্দ্রপালের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল এ কথাই প্রমাণস্বরূপ কেন যে রাখালবাবু এই তাম্রশাসনখানির উল্লেখ করিয়াছেন; তাহার কারণ নির্দেশ করা কঠিন । অবশ্যই তাম্রশাসনখানি সত্রেণ জেলার দিঘোয়া জুবৌলি গ্রামে মহাবীর পাড়ের নিকট পাওয়া গিয়াছে । কিন্তু তাই বলিয়া কি রাখালবাবু সিদ্ধান্ত করিতে চাহেন এখন যে ভূভাগ সারণ জেলা নামে পরিচিত তাহা মহেন্দ্রপালের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল ? কামরূপ-রাজ বৈশ্যদেবের তাম্রশাসন বারানসীর নিকটে কমৌলি গ্রামে পাওয়া গিয়াছে বলিয়া কেহই মনে করেন না যে বারানসী বৈশ্যদেবের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল । সহস্রাব্দিক বৎসর পূর্বে (৮৯৮ খৃষ্টাব্দে) সম্পাদিত মহেন্দ্রপালের এই তাম্রশাসন প্রাবর্তী হইতে সহস্র উপন্যয়ে সারণ জেলায় আসিয়া থাকিতে পারে । আর যদি স্বীকারও করা যায়, বর্তমান সারণ জিলা প্রতীহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল, তাহাতে মিথিলা বা মগধ প্রতীহার-রাজ্যভুক্ত থাকা হুচিত হয় না । সারণ জেলা গওকনদীর পশ্চিম দিকে অবস্থিত এবং বরঘরা (Gogra) নদীর তীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত । সারণ জেলা যেস্তীরভূক্তির অন্তর্ভুক্ত ছিল তাহারই বা প্রমাণ কি ? সুতরাং দিঘোয়া জুবৌলির তাম্রশাসনের বলে মিথিলা এবং মগধ প্রতীহার সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল বলিয়া মনে করা যাইতে পারে না ।

মগধ প্রতীহাররাজ মহেন্দ্রপালের সাম্রাজ্যভুক্ত থাকার প্রমাণস্বরূপ রাখাল বাবু মহেন্দ্রপালের রাজ্য-সম্বন্ধ সম্বলিত গুপ্তাঙ্গের আবিষ্কৃত তিনখানি মূর্তির উল্লেখ করিয়াছেন । এই মূর্তিট্রয়ে উল্লিখিত মহেন্দ্রপাল যে প্রতীহারবংশীয় মহেন্দ্রপাল তাহার প্রমাণ কি ? গোড়াধিনাথের অধীনে প্রাচ্য ভারতে অনেক নরপতিই ছিলেন । এই মহেন্দ্রপাল তাহাদের অন্ততম হইতে পারেন । রাখাল বাবু তাহার “ইতিহাসে” মহেন্দ্রপালদেবের নাম সম্বলিত মগধে প্রাপ্ত কোন লিপিরই প্রতিকৃতি প্রদান করেন নাই এবং ঐ সকল লিপির অক্ষরের আকার প্রকার সম্বন্ধে কোন কথা বলেন নাই । সুতরাং এই সকল লিপি যে মগধে গুপ্তার প্রতীহাররাজ মহেন্দ্রপালের আধিপত্য হুচিত করে এমন কোন প্রমাণ আমাদের কাছে উপস্থিত করেন নাই । আমার হিসাবে, কাক্তকুজে মিহির

ভোজের এবং গোড়ের দেবপালের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই গোড়-গুর্জর-দ্বন্দ্বের পরিসমাপ্তি, কেন না পরে যে গোড়পতির এবং গুর্জরপতির মধ্যে বিরোধ চলিয়াছিল তাহার কোন প্রমাণ এতাবৎ আবিষ্কৃত হয় নাই । রাধালবাবুর মতে পৃথিবী দশমশতাব্দেও গোড়গুর্জর বিরোধ চলিয়াছিল— (নারায়ণ পালের পোত্র) দ্বিতীয় গোপাল যখন গোড়েশ্বর, তখন মৌর্যপালের (১১১৩—১১১৫ খৃঃ) গুর্জর-সাম্রাজ্যের অধিপতি । ত্রাহিষ্কটবংশীয় তৃতীয় ইন্দ্র যখন (১১১৪—১১১৬ খৃঃ) উত্তরাপথ আক্রমণ করিয়াছিলেন, সেই সময়ে বোধ হয়, গোপালদেবের অপকৃত পিতৃস্বার্থের বিরুদ্ধে (মগধ) উদ্যোগ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন (২০৪ খৃঃ) । আবার গুর্জররাজ মহীপাল বোধ হয়, এই সময়ে (দ্বিতীয় বিগটপাল বরেন্দ্র হইতে কাশ্মীরগণ কর্তৃক বঞ্চিত হইলে) চন্দ্রের বংশীয় যশোবর্মার দেবের সাহায্যে মগধ ও অঙ্গ পুনরধিকার করিয়াছিলেন (২০৬ খৃঃ) । কেন যে রাধালবাবুর এইরূপ “বোধ হইল” তিনি তাহার কোনও আভাস দেন নাই । জৈমিন্যের (বৃন্দাবন) চন্দ্ররাজবংশের এবং (জয়নগরের নিকটবর্তী) ত্রিপুরার কলচুরী (চৈত্র) রাজবংশের অভ্যুত্থানের ফলে দশমশতাব্দে উত্তর পূর্বের বাদ-বিবাদ নূতন আকার ধারণ করিয়াছিল । গোড়নাথ এবং গুর্জরনাথ এই উভয় প্রতিদ্বন্দ্বীই উত্তরাপথে প্রাধান্য লাভের স্বপ্ন বিস্তৃত হইয়া চন্দ্ররাজবংশের এবং কলচুরী বা চৌদ্ররাজের সহিত বিরোধে বাস্তব ছিলেন । চন্দ্ররাজ বঙ্গের ১১৪ খৃষ্টাব্দের খজুরাহোর শিলালিপিতে বঙ্গের পিতা চন্দ্ররাজ যশোবর্মার সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে—

গোড়কীড়ালভাসি স্থলিতধসবলঃ কোশলঃ কোশলানাং

নশংকাম্রীরবীরঃ শিথিলিত মিথিলঃ কালবমার্গবানাং

সীমং সাবন্তচেদিঃকুরুতরুদ্গুরুং 'সংস্রো গুর্জরানাং

তদ্বাং তদ্যাং স জজ্ঞে নৃপকুলতিলকঃ শ্রীযশোবর্মারাজঃ ॥ *

“কঙ্কর গর্ভে হর্ষের নৃপকুলতিলক শ্রীযশোবর্মার জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । এই যশোবর্মার গোড়গণকে লতার ন্যায় হেলায় ছেদনের অসিধরূপ ছিলেন ; বঙ্গ-গণের তুলা বলশালী ছিলেন ; কোশলগণের ধন হরণ করিয়াছিলেন ; কাম্রীর-বীরগণ তাঁহার নিকট বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল ; মৈথিলগণকে তিনি চরু

করিয়াছিলেন মালব-গণের তিনি যনস্বরূপ ছিলেন; নিলজ্জ চেদিগণকে তিনি বিপর্যস্ত করিয়াছিলেন; তিনি কুরু তরুর ঝটিকারূপ ছিলেন; এবং গুর্জরগণের দহনকারী অগ্নিস্বরূপ ছিলেন।”

“গোড়-ক্রীড়া-লতাসি” বিশেষণ চন্দেররাজ যশোবর্মার গোড়সেনার সহিত যুদ্ধ বচিতি করিতে পারে, কিন্তু এই কথার বলে যশোবর্মা কতক গোড়সাম্রাজ্যের অংশবিশেষের অধিকার অর্জিত হইতে পারে না। যশোবর্মা যেমন “গোড়-ক্রীড়া লতাসি” তেমন “সংসার: গুর্জরাণাং” ও ছিলেন। গুর্জর বলিতে তৎকালে কান্তকূষের গুর্জর-প্রভীহার রাজ্যের সেনাই বুঝাইত। হুতরাং যিনি গুর্জরগণের সংসার বা দহনকারী অগ্নি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন, তিনি যে গুর্জর-রাজ মহীপালের পক্ষ অবলম্বন করিয়া মগধ ও অঙ্গ, গুর্জর সাম্রাজ্যের সামিল করিয়া দিয়াছিলেন এরূপ অসম্ভব অসঙ্গত। এই প্রশস্তির আর একটি শ্লোকে (৪০) কথিত হইয়াছে যশোবর্মা গুর্জররাজ হেরম্পাল বা মহীপালের পুত্র দেবপালের নিকট হইতে নিপিতে বর্ণিত মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত বৈকুণ্ঠ(বিষ্ণু) মূর্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। গুর্জরপতি মহীপালের সহিত যে চন্দের রাজের বিশেষ প্রণয় ছিল না রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় কৃষ্ণরাজের ৯৪০ খৃষ্টাব্দে সম্পাদিত কর্ণাট লিপি তাহা সপ্রমাণ করে। যথা—

যন্ত পরমেশ্বিত্তাশিল দক্ষিণদিগদুর্গবিজয়মাকর।

গলিতা গুর্জররাজ্যং কালাংজরচিত্রাকূটাগা (৩০) ॥ •

“তাহার (তৃতীয় কৃষ্ণরাজের) পরব (জেতাবিভ) দৃষ্টির বলেই দক্ষিণ দিকের সমস্ত দুর্গ বিজিত হইয়াছে এই কথা শ্রবণ করায় গুর্জরের হৃদয় হইতে কালাংজর এবং চিত্রাকূট [অর্ধদিকারের] আশা দ্রুতীভূত হইয়াছিল।”

পূর্বোক্ত পঙ্কজবোহর শিলালিপিতে কথিত হইয়াছে চন্দেররাজ যশোবর্মা কালাংজর পর্যন্ত অধিকার করিয়াছিলেন (৩১ শ্লোক)। গুর্জররাজ মহীপাল বোধ হয় যশোবর্মার অধিকৃত কালাংজর এবং চিত্রাকূট দখল করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন এবং রাষ্ট্রকূট তৃতীয় কৃষ্ণরাজ চন্দের রাজের পক্ষ অবলম্বন করায় সেই সঙ্কল্প ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে গুর্জর, গোড়, চন্দের, চেদি এবং রাষ্ট্রকূট এই পাঁচটি শক্তির প্রতিযোগিতার ফলে একটা সাম্রাজ্য উপস্থিত হইয়াছিল। কোন শক্তির পক্ষেই অপর শক্তিকে ধ্বংস করিবার অবকাশ পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। হুতরাং দশম শতাব্দীতে প্রতিযোগী

রাজ্যনিচয়ের মধ্যে যে বিরোধ চলিয়াছিল, তাহার ফলে কেহ কাহারও বিশেষ অনিষ্ট করিতে পারিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না । রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় কুল্লোর কর্হানে প্রাপ্ত তাম্রশাসনে কথিত হইয়াছে তৃতীয় কুল্লোর কর্হান—

“জননীপত্নীভরুপি সহস্রার্জুনো বিজিতঃ (২৫) ।

“জননী এবং পত্নীর গুরুজন সহস্রার্জুন পরাজিত হইয়াছিলেন ।” *

সহস্রার্জুন এখানে সহস্রার্জুনবংশীয় চেদিরাজ ৮ তৃতীয় কুল্লোর পিতা তৃতীয় অমোঘবর্ষ ত্রিপুরার চেদিরাজ প্রথম যুবরাজের কন্যা কুল্লোরবীর পাণি-গ্রহণ করিয়াছিলেন । সুতরাং তৃতীয় কুল্লোর কর্হান পরাজিত সহস্রার্জুন প্রথম যুবরাজ বা তাহার পুত্র এবং উত্তরাধিকারী লক্ষণরাজ হইতে পারেন । চেদিরাজ লক্ষণ [রাজ] কলাণির চালুকরাজ তৈলপের (২৭৩—২৯৩ খৃঃ অঃ মাতামহ ছিলেন । (R) I. VIII. n. p. II p. 7.) পূর্বোক্ত ২৫৯ খৃষ্টাব্দের পছুরচোর বংশালিপি একটি শ্লোকে (২৬) ‘চন্দ্ররাজ যশোবন্তাকর্হক বিণ্যাত-“ক্ষিতিপালমৌলিরচনাবিনাস্তপাদাধ্বজ” “অসংখ্যবল” চেদিরাজের হঠাৎ পরাজয়ের কথা স্বতন্ত্রভাবে উল্লিখিত হইয়াছে । এই বৃত্তান্ত অস্মৃত: চেদিরাজের ও চন্দ্ররাজের মধ্যে বিরোধ স্থচিত করিতেছে । চেদিরাজ লক্ষণরাজদেব সম্বন্ধে কর্হনের গোহরোয়ায় প্রাপ্ত তাম্রশাসনে কথিত হইয়াছে—

বঙ্গালভঙ্গনিপুণঃ পবিত্রতপাভ্যা

লাটেশলুঠনপটুজিত গুরুরেজঃ ।

কাশ্মীর-বীর-যুক্টাচ্চিত পাদপীঠ

স্তেযু ক্রমানজনি লক্ষণরাজদেবঃ । †

“চেদি বা হৈহয় বংশে ক্রমে লক্ষণরাজদেব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । জিন বঙ্গালরাজকে পরাজিত করিতে পটু ছিলেন, পাণ্ডারাজকে পরাজিত করিয়াছিলেন, লাটরাজের (রাজা) লুঠনে পটু ছিলেন, গুরুর রাজকে পরাজিত করিয়াছিলেন, এবং কাশ্মীররাজের যুক্ট তাহার পাদপীঠ অর্জনা করিত ।” যে শ্লোকে এক নিঃখানে ভারতবর্ষের উত্তর সীমান্তস্থিত কাশ্মীর, পশ্চিমসীমান্তস্থিত লাট, দক্ষিণসীমান্তস্থিত পাণ্ডা এবং পূর্বসীমান্তস্থিত বঙ্গদেশ জয়ের কথা বলা হইয়াছে, তাহার ভিতরে বিশেষ কিছু ঐতিহাসিক তথ্য নিহিত আছে বলিয়া মনে হয় না । তবে এই শ্লোকের বলে এই পর্য্যন্ত অহুমান করা যায়, যে

* Epigraphia Indica, vol. iv. p. 284.

† Epigraphia Indica, vol. xi. p. 142.

চেদিরাজ লক্ষ্মণরাজ উজ্জ্বলিয়ারী এবং প্রতিবেশী নৃপতিগণের সহিত বিরোধে লিপ্ত ছিলেন। রাখালবাবুর কর্ণদেবের গোহরোয়া লিপি লক্ষ্য করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। এই লিপিতে কর্ণদেবের পিতা চেদিরাজ গাঙ্গেরদেব কর্তৃক কীর, অঙ্গ, কুন্তল, এবং উৎকল আক্রমণ হুচিত হইয়াছে (১৭ খ্রোক)। পালনরপাল-গণের উদ্ভাষণদে গোড়াধিপ দেবপালের পরবর্ত্তী প্রথম বিগ্রহপাল, নারায়ণপাল, রাজাপাল এবং দ্বিতীয় খোঁপালের যে বিবরণ পাওয়া যায় তাহাতে গুর্জরপতি বা ত্রবিড়পতির সহিত বিরোধের কথা ঘুরে থাকুক, চেদিপতির বা কালাংজর-পতির সহিত বিরোধের কোনও ইঙ্গিত নাই। পক্ষান্তরে চেদিরাজের এবং রাষ্ট্রকূট রাজের সহিত পাল নরপালগণের যে আত্মীয়তা স্থাপিত হইয়াছিল তাহার প্রমাণ আছে। প্রথম বিগ্রহপাল হৈহয় বা চেদিরাজকুমারী লজ্জানু পাণি-গ্রহণ করিয়াছিলেন, নারায়ণপাল চেদিরাজের দৌহিত্র ছিলেন। রাজাপাল রাষ্ট্রকূট কুন্তলের কন্যা ভাগ্যদেবীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, দেবপালের জ্যেষ্ঠ দ্বিতীয় গোপালও রাষ্ট্রকূটবংশের দৌহিত্র ছিলেন। গুর্জরগণের সহিত সাম্রাজ্যের জন্য শতাব্দিক বর্ষব্যাপী বার্ষিক বিরোধের পর গোড়কন বোধ হয় বিশ্রাম উপভোগ করিতেছিলেন। এই সুযোগে কাঞ্চোজগণ আসিয়া গোড় সাম্রাজ্যের কেন্দ্র বরেন্দ্রভূমি অধিকার করিয়া সাম্রাজ্যের অধঃপতনের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিল।

কাঞ্চোজাধরাজ গোড়পতিকর্তৃক বাগনগরে চন্দ্রমৌলির মন্দির নির্মাণের সময় (৯৬৬ খৃঃ অব্দ) আমরা জানি এবং মহীপালের সারনাথ লিপির সময়ও (১০২৬ খৃষ্টাব্দে) আমরা জানি। সুতরাং পরবর্ত্তী পাল নরপালগণের সময় লইয়া বেশী মতভেদের সম্ভাবনা নাই। বর্ষাব্যবসায় এবং সেনব্যবসায়ের কালপন্থকে রাখাল বাবুর অভিমত আমি গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহি। বরেন্দ্র অহুসকান-সমিতির প্রথিতনানা ডিরেক্টর শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত অর্কদকুমার মৈত্রেয় মহাশয় বাঙ্গালার ইতিহাসের এই যুগের সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-কর্তৃক আহ্বত হইয়াছেন। বঙ্গবাসী শীঘ্রই তাঁহার নিকট হইতে পালসাম্রাজ্যের অধঃপতনের যুগের একটি জীবন্ত চিত্র প্রাপ্ত হইবেন। সুতরাং রাখালবাবুর ইতিহাসের নবম হইতে দ্বাদশ পরিচ্ছেদের আলোচনা করিয়া এই প্রস্তাবের কলেবর বৃদ্ধি করা নিঃপ্রয়োজন মনে করি। আমাদের দেশের প্রাচীন ইতিহাসের উপাদান অতি অল্প। অন্য দেশের ইতিহাসিকেরা যেখানে ইষ্টকংসগ্রহ করিয়া প্রাসাদ নির্মাণ করে, সেখানে আমাদের অবলুপ্ত কতকগুলি দলিকণা

মাত্র। এইরূপ যৎসামান্য উপাদান লইয়া ইতিহাস গঠন অতি কঠিন কাণ্ড। অনেক ক্ষেপেই অল্পমানের অশ্রয় ভিন্ন গত্যন্তর নাই। বহু বিচার বিতর্ক ব্যতীত সর্ববাদীসম্মত অল্পমানে উপনীত হওয়া অসম্ভব। “বাঙ্গালার ইতিহাসে” রাখালবাবু দীর্ঘকালব্যাপী অধ্যয়নের এবং চিত্তার ফলে বাঙ্গালার ইতিহাসের উৎকট সমস্থানিচয়ের সমাধানের জন্য বহুশ্রুতিত্বকের অবতারণা করিতে সমর্থ হইয়াছেন। শত মতভেদসম্মেও রাখালবাবুর গ্রন্থ পাঠ করিয়া আমি লাভবান হইয়াছি এবং আমার নিম্নস্ব ইতিহাস-অনুসারী বাক্তিমাটাই এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া লাভবান হইবেন।

ইতিহাস আলোচনার রীতি সৰ্বদে ঐতিহাসিক মতাবলম্বক কণার আবৃত্তি করিয়া এই সমালোচনার উপসংহার করিব। ইতিহাসের উপাদান বা আকর ছই শ্রেণিতে বিভক্ত করা যাইতে পারে, সমসময়ের বা নিকটবর্তী সময়ের লোকের প্রদত্ত বিবরণ এবং দূরবর্তী সময়ের লোকের সঙ্কলিত জনশ্রুতিমূলক বিবরণ। যে জনশ্রুতিমূলক বিবরণ সমসময়ের বিবরণের বিরোধী তাহা অগ্রীক; যে জনশ্রুতিমূলক বিবরণ সমসময়ের বিবরণের বিরোধী নহে তাহাও ইতিহাসরূপে গ্রাহ্য নহে; ভবিষ্যতের অল্পসকানেন্দু ফলে উহার অল্পকূল সমসাময়িক প্রমাণ পাওয়া গেলেও যাইতে পারে এই আশায় উল্লেখযোগ্য নয়। রাখালবাবু কুলপঞ্জিকা প্রভৃতি দূরবর্তীকালে সঙ্কলিত গ্রন্থবন্ধ প্রমাণের সামাগিকতা সৰ্বদে স্পষ্টাক্ষরে সংশয় প্রকাশ করিয়া দেশের যথেষ্ট উপকারসাধন করিয়াছেন।

সমসময়জনের বিবরণও বিনা বিচারের ইতিহাসরূপে গ্রাহ্য নহে। এই শ্রেণীর উপাদানের সম্ভাবহার করিতে হইলে ক্রমশঃ ঐতিহাসিক রেকর্ড প্রবর্তিত এবং সঙ্কল্পনাদৃত ঐতিহাসিক বিচার-প্রণালী (critical method) অবলম্বন করা ক্তব্য। এই বিচার-প্রণালী সৰ্বদে গর্ভ একটু নিখিয়াছেন—

“For the critic is one who, when he lights on an interesting statement, begins by suspecting it. He remains in suspense until he has subjected it to three operations. First, he asks whether he has read the passage as the author wrote.....Next is the question where the writer got his information.....The responsible writer's character, his position, antecedents, and probable motives have to be examined into; and this is what, in a different and adopted sense of the word may be called the higher criticism, in comparison with too servile and

often mechanical work of pursuing statements to their root. For a historian has to be treated as a witness, and not believed unless his sincerity is established. The maxim that a man must be presumed to be innocent until his guilt is proved, was not made for him. (A Lecture on the study of History.)

অর্থাৎ বিচারশীল ঐতিহাসিক কোনও কোতূহলোদ্দীপিত বিবরণ পাইলে তাহা তৎক্ষণাৎ বিশ্বাস করিবেন না, সংশয়াক্রান্ত হইবেন, এবং ঐ বিবরণের আকরকে তিনি প্রকারে পরীক্ষা করিবেন । (১) তিনি অহুসকান করিবেন পাঠোক্তার ঠিক হইয়াছে কিনা ।.....(২) লেখক কোথা হইতে স্বেই বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন, পরে তাহা অহুসকান করিতে হইবে ।.....(৩) লেখকের চরিত্র, পদমর্যাদা, পূর্বকথা, লেখার উদ্দেশ্য ও পরীক্ষা করিতে হইবে । ঐতিহাসিক বিবরণ-লেখককে সাক্ষীর ন্যায় ভেরা করিতে হইবে, এবং যতক্ষণ না তাঁহার অকণ্ঠতা প্রমাণিত হয় ততক্ষণ তাঁহার কথার বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে না । যতক্ষণ না কোন ব্যক্তি দোষী বলিয়া প্রমাণিত হয় ততক্ষণ তাঁহাকে নির্দোষী মনে করিতে হইবে, ঐতিহাসিক বিবরণ-লেখকসম্বন্ধে এই নীতির অহুসরণ করা গাইতে পারে না । যতক্ষণ না কোন ঐতিহাসিক বিবরণ-লেখক মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রমাণিত হয় ততক্ষণ তাঁহাকে সত্যবাদী মনে করা হইবে না, পক্ষান্তরে যতক্ষণ না তিনি সত্যবাদী বলিয়া প্রমাণিত হয় ততক্ষণ তাঁহার কোন কথা মিথ্যা বলিয়া গৃহীত হইবে না ।

তাহাফলকে বা শিলাফলকে উৎকীর্ণ রাজপ্রশস্তি, সমসময়ের কবি-রচিত চরিত্রকথা সম্বলিত কাব্য, এবং পর্ষটকের বিবরণ এই সকল নিম্নমাহুসারে, সাবধানে বিচার করিয়া তবে ঐতিহাসিক বিবরণ সংগ্রহ করিতে হইবে । এই হিসাবে প্রশস্তিকারগণের বিবরণগাথা অনেক সময়ই সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করা স্বকঠিন । উই পৃথক পৃথক প্রশস্তিকারের কথা তুলনা করিয়া যাহা প্রকৃত ঘটনা বলিয়া মনে হয় তাহা গ্রহণ করিতে হইবে । যেখানে উভয় পক্ষের প্রশস্তিকারের কথা তুলনা করার সুযোগ ঘটে না, সেখানে অতি সাবধানে পূর্বাপর ইতিহাস আলোচনা করিয়া প্রশস্তিকারের কথার যে অংশ যুক্তিযুক্ত মনে হয় তাহাই ইতিহাস বলিয়া গৃহীত হইবে ।

এইরূপ বিচারপূর্বক প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া বৈজ্ঞানিক রীতি (inductive method) অহুসারে সিদ্ধান্ত স্থাপন করিতে হইবে । সিদ্ধান্ত প্রমাণের ঠিক

অনুগামী হওয়া আবশ্যক । ধর্মপ্রচারের, অথ, নীতিপ্রচারের জন্য, সমাজ সংসারের জন্ম বা পূর্বপুরুষের গৌরবের কথা ভনাইয়া স্বদেশ প্রেম জাগরিত করিবার জন্য ইতিহাস-রচনার প্রবৃত্ত হইতে হইবে না । ইতিহাসই ইতিহাস আলোচনার লক্ষণ জানিয়া নিকামভাবে ইতিহাস আলোচনা করিতে হইবে । এই ক্ষেত্রেও রেফেই আমাদের গুরু । লর্ড একটন লিখিয়াছেন—

“For his most eminent producers, history was applied politics, fluid law, religion exemplified, or the school of patriotism. Ranke was the first German to pursue it for no purpose but its own.”

শ্রীমতীপ্রসাদ চন্দ ।

মিলন ও বিদায়

(Goethe)

তখন সন্ধ্যার ছায়া ঘনতর করে
 ঘিরিছে ধরণী ;
 চলিছে কম্পিত বক্ষে—দূর গিরি হ'তে
 * নামিছে রজনী ।
 শত কৃষ্ণ চক্ষু মেলি' ঘন অন্ধকার
 বনাস্তর হ'তে
 চেয়ে আছে ; তাল শ্রেণী—অটল প্রহরী
 দাঁড়াইয়া পথে ।

মেঘের শিখর হ'তে স্নান স্পর্শকণা
 চাহে ধরাপানে,
 শুক বায়ু-বিহঙ্গের মুহু পক্ষধ্বনি
 পশে যেন কাণে ।
 সৃজন করিছে নিশা সম্মুখে আমার
 শত বিভীষিকা,
 কি আশ্রয়—কি উল্লাস—তবুও অন্তরে
 কি প্রদীপ্ত নিধা !

ঐতিহাসিক দীর্ঘ পথ—উত্তরিহু যবে
তোমার হুরারে,
দৃষ্টি তব কি আনন্দ-অমৃত ধারায়
সিকিলী আমারে ।
ছুটিল হৃদয় যেন শত বাহু মেলি
বাধিতে তোমায়,
আমার সারাটি প্রাণ একটি নিম্নে
সঁপিলাম পায় ।
দসম্বৎ-শাভার ঘেরা ছেরি নৃপখানি
বিমুগ্ধ নয়নে,
একি পূর্ণফল—একি আশাতীত ফল
আমার জীবনে !

প্রভাতের বায়ু, ছায়, জাগাল হৃদয়ে
বিদায়ের বাণী,
চপনেন তোমার একি মন্দির-আবেশ
নেত্রে আকুলতা ।
ব্যুৎসিহু পথে—জুটি বিষাদ-আনন্দ
জলভরা চোখে
চাহিয়া রহিলে শুধু তুমি মোর পানে
প্রভাত-আলোকে ।

ঐরমণীমোহন ঘোষ

তালাজার গুহা

আমি ঐতিহাসিক নহি এবং প্রত্নতত্ত্ব আলোচনা করার স্পর্শাও আমার নাই । কার্যোপলক্ষে বাহিরে যাইতে হইয়াছিল—যাহা দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি তাহাই লিপিবদ্ধ করিতেছি । তরঙ্গা করি ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিকগণ এই অনধিকারীকে ক্ষমা করিবেন ।

তালাজা ভবনগর গ্রামের অন্তর্গত ও তালাজা নামক ক্ষুদ্র নদীর তীরে অবস্থিত । এই নদী সেরাজী নদীর অন্ততম কয়দু-নদী । তালাজা সহরের কিছু দূরেই সেরাজী নদী সাগরের সহিত মিশিয়া গিয়াছে । অল্পাচ্ছ পাছাডিয়া নদীর

জায় এই নদীর স্রোতের বেগ পূর্ব প্রবল ও সময়ে সময়ে এই নদীতে জল এত বেশী হয় যে, দুই তীর একেবারে ডাসিয়া যায়। কিছু বৃষ্টি হইলে কেহই এই নদীর এক পারে চাইতে অপর পারে যাইতে সাহস করে না। এই স্থানটি বেশ সমৃদ্ধিশালী এবং ভবনগর হইতে কিকি দক্ষিণ দিশ মাইল দূরে অবস্থিত। ভবনগর সহর চত্বরে এই স্থানে গমন করিবার জন্য বেশ সন্ধ্যু এক রাস্তা আছে ও তাপাজ নামক স্থান এক সন্ধ্যু স্থান ও এই রাস্তার পার্শ্বে দেখিতে পাওয়া যায়। ভবনগরের মজারাজা একজন সুপ্রসিদ্ধ শিকারী ও শিকারের উদ্দেশ্যে তিনি মাঝে মাঝে তাপাজে অবস্থান করেন।

তালাজা সহর পাহাড়ের উপর অবস্থিত। এই সহরের পাহাড়ের শৃঙ্গে এক অতি সন্ধ্যু মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে ও অনেক দূর হইতেই এই মন্দির পূর্ণিমের দৃষ্টিপথে পতিত হয় ও সে যে সহরে আগত প্রায় সেই সংবাদ তাহাকে জ্ঞাপন করে। এই মন্দির জৈনমন্দির; ইহাতে পার্শ্বনাথের পূজা হইয়া থাকে। তালাজা জৈনদের এক প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। যে পাহাড়ের মস্তকে এই মন্দির স্থাপিত সেই পাহাড়ে কতকগুলি গুহা আছে। ইহাদের কয়েকটির আলোচনাই বর্তমান প্রবন্ধের বক্তব্য বিষয়।

তালাজার প্রস্তরের নাম বসাল্ট (basalt)। কলিকাতার রাস্তাতে যে পাথরের গোয়া দেওয়া হয় এ পাথরও তাহাই। এই পাথর বেশ নক্ত। সুতরাং ইহাতে গুহা প্রস্তুত করা যে বিশেষ বুদ্ধিভীর পুষ্টিচায়ক তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।—যে সমস্ত পাহাড়ের শিখরদেশে দেবমন্দির স্থাপিত সেই সমস্ত পাহাড়ে উঠিবার জন্য যেরূপ সোপানশ্রেণী থাকে, এ পাহাড়েও ঠিক তাহা আছে। পাহাড়ের উচ্চতাও পূর্ব কম, কয়েকশত ফিট মাত্র। সুতরাং এই পাহাড়ে আরোহণ মোটেই কষ্টদায়ক নহে। এই পাহাড়ের নানা দিকে কয়েকটি গুহা আছে। সমস্ত গুহা দেখিবার সুযোগ আমার হয় নাই, কারণ সময়ের অন্ততা।

এই সমস্ত গুহা সম্বন্ধে ইতিপূর্বে যে সমস্ত বর্ণনা প্রকাশিত হইয়াছে তন্মধ্যে যেগুলি আমি সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি সেগুলি পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে Captain Fulljames সর্বপ্রথম ইহাদের বিবরণ প্রকাশ করেন। (১) তাঁহার প্রবন্ধেরই সাহায্যে একটা বড় এবং আর কতকগুলি ছোট গুহার বিবরণ আমরা জানিতে পারি। তৎপরে Captain Watson কতিপয় গুহার

বর্ণনা প্রকাশ করেন (২) ও বলেন যে আকার ও গঠন-প্রণালীভেদে গুহাগুলিকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা সহজে পারে। এই প্রবন্ধে তিনি ৭টি গুহার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ও বলিয়াছেন যে গুহাসমূহ বৌদ্ধধর্মী দ্বারা নির্মিত। অতঃপর Caplain, Burgeস কয়েকটি গুহার বর্ণনা প্রকাশ করিয়াছেন। ৩

গুহা গুলি পাহাড়ের গায়ে-কোনট উচ্চ বা .অপর কোনটা নিয়ে খোদিত
 চাইয়াছে। কয়েক গ্রাপ সিঁড়ি অতিক্রম করিলেই দুইটা গুহা দেখিতে পাওয়া
 যায়। এই দুইটার মধ্যে যেটা বড় সেটা বামদিকে ও কিছু উচ্চে স্থাপিত।
 এইটিকে দেখিয়া মনে হয় যেন ইহা একটা বারান্দাওয়ালা বড় ঘর। ইহার
 অভ্যন্তরে বেশ বড় এক হল ও সেই হলের দুই দিকে ছোট-ছোট কুঠুরী।
 প্রত্যেক দিকে ৪টা কুঠুরী ছোট ৮টা কুঠুরী আছে এবং ইহাদের বর্তমান অবস্থা
 অত্যন্ত শোচনীয়। এই বৃহৎ গুহার দক্ষিণ দিকেও একটা কুঠুরীর ভগ্নাবশেষ
 দেখিতে পাওয়া যায়। এই গুহা পূর্ব বেনী উচ্চ নহে—৮৭০ ফিট মাত্র। এই
 গুহার ও তদভ্যন্তরস্থ হৈল প্রকৃতির আগ্রতন নিয়ে প্রদত্ত চইল। উভয় দিক
 দিয়া এই গুহাতে প্রবেশ করিতে হয়।

(ক) বারানসী	= ১১৮' × ১৩০'
(গ) চল	= ৪৪২' × ১২৮'
(গ) পূর্বদিকের কুটুরী (৩)	= ১৩২' × ১২৭'
(ঘ) (২)	= ১৩০' × ১২৭'
(ঙ) (৩)	= ১৩২' × ১২৭'
(চ) " " (৪)	= ১২২' × ১২৭'
(ছ) দক্ষিণ-দিকের কুটুরী	১৭০' × ১২২'
(জ) পশ্চিমদিকের কুটুরী (১)	= ১২২' × ১২৮'
(ঝ) (২)	= ১৩২' × ১২৮'
(ঞ) (৩)	= ১১৫' × ১২৮'
(ট) (৪)	= ১১৫' × ১২৮'

এই গুহাতে কি প্রয়োজন সিদ্ধ হইত প্রত্নতত্ত্ববিৎ তাহা স্থির করিবেন। এই গুহার নিয়ে যে গুহা আছে তাহার সম্মুখদেশে অর্ধচন্দ্রাকৃতি এক স্থান ও উপরে ছাদ আছে। এই গুহাতে দুইটা কুটুরী আছে এবং ইহাদের মধ্যে যে প্রাচীর ছিল তাহা এখনও বিদ্যমান আছে।

এই দ্বিতীয় গুহা বামনেশ রাণিয়া ও পাহাড়ের দাঁর দিয়া কিছূদূর অগ্রসর হইলে এই পর্বতস্থ সর্সাপেকা বড় গুহাতে উপনীত হওয়া যায়। এই গুহাতে কোনও কুটুরী নাই এবং ইহার আয়তন ৭৬' (পূ-প) × ৩৯' (উ-দ)। এই গুহার নাম এভাল মন্দির বা এভাল-মণ্ডপ। প্রবাদ আছে যে, এই গুহার সম্মুখদেশে এক সিংহাসন ছিল—কিন্তু পরে সেই সিংহাসনের অন্তর্দান হইয়াছে। এই বৃহৎ গুহার মুখ পশ্চিমদিকে এবং ইহার পুরোভাগে এটা বৃত্তগু (arch) ছিল, তন্মধ্যে ২টা এখনও অতি সুন্দর স্তম্ভদ্বারেই আছে। এই গুহার এটা বৃত্ত ছিল—ইহাদের উদ্ভাবনেষ এখনও বিদ্যমান। এই বৃহৎ গুহার সম্মুখেই ৩টা কুটুরী ও একটা বড় গহ্বর পোদিত আছে এবং এই বৃহৎ গুহা হইতে নিয়ে পাহাড়ের পাদদেশে ঘাইবার অল্প একটা রাস্তার চিহ্ন এখনও দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রবাদ যে রাজসগণ কর্তৃক এই গুহা নির্মিত হইয়াছিল ও এই গুহাতে ওয়ালার (Wala) রাণা এভাল (Ebbhal) ১৬০০ কুমারীর পরিণয় কার্য সমাধা করিয়াছিলেন। সর্সপ্রথমে যে কছার পরিণয় সম্পাদিত হয়, সেই কছার নাম মোবী। এতগুলি বিবাহ অবশ্য অত্যন্ত সমারোহের সহিত নির্বাহিত হইয়াছিল এবং উপরে যে বৃহৎ গহ্বরের উল্লেখ করা হইয়াছে, সেই গহ্বর এই সমস্ত বিবাহের স্মৃতিচিহ্নরূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল ও পার্শ্বস্থিত ৩টা কুটুরীতে নিমন্ত্রিত বাক্সিগণের আহাৰ্য্য প্রস্তুত করা হইয়াছিল। ওয়াটসন ও বার্জেস এই গুহা সম্বন্ধে কিম্বদন্তির উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন—কিন্তু এই সমস্ত কিম্বদন্তির মধ্যে কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে। ওয়াটসনের লিখিত প্রবাদ অনুসারে এই গুহাতে এক সহস্র কুমারীর পরিণয় কার্য সমাধা হইয়াছিল। মিঃ বার্জেস বলেন যে, এই গুহাতে এতল রাজা কেবলমাত্র তাঁহার নিজ কছার পরিণয় কার্য সমাধা করিয়াছিলেন। ওয়াটসন এই মন্দিরের যে আয়তন দিয়াছেন তাহা ঠিক নহে। এই মন্দির ১৭।১৮ ফিট উচ্চ হইবে।

এই মণ্ডপ দেখিয়া, সর্সপ্রথমে যে গুহার কথা বর্ণিত হইয়াছে, সেই গুহার নিকট কিরিয়া আসিতে হয় ও তৎপরে সেই গুহা দক্ষিণে রাখিয়া কিছূদূর উঠিলে পর একটা ছোট গুহা পাওয়া যায়। প্রবাদ যে এই গুহাতে সৌরাষ্ট্র কবি নরসিং

যেটা বিস্তার্বাদিগকে বিস্তাদান করিতেন । এই গুহা অতিক্রম করিলে অপর একটা গুহা দেখিতে পাওয়া যায় । এই গুহাটি অনেকাংশে প্রথমোক্ত গুহার জায় । ইহার ভিতরে ছোট ছোট কুটুরী আছে—কিন্তু সংখ্যাতে একদিকে ৩টা ও অপর দিকে ৪টা । এই গুহার দক্ষিণ দিকে ও পূর্বোক্ত গুহার জায় এক বড় কুটুরীর চিহ্ন বিস্তৃত আছে । এই গুহার সম্মুখে দুইপার্শ্বে বীধান কূপ আছে । প্রবাদ যে দেৱাগী জোঠানি নামক কোনও পরাক্রান্ত ব্যক্তির দুই স্ত্রী এই গুহাতে বাস করিতেন ।

আরও কিছুদূর অগ্রসর হইলে পর দুইটা গুহা দেখিতে পাওয়া যায় । ইহাদের মধ্যে যেটা বৃহৎ সেটির অভ্যন্তরে ৭০ " × ৭০ " × ৩১ " এক বেদী আছে । এই গুহার নাম "হাতিয়া (ড) বড়" এবং প্রবাদ যে এই গুহাতে সিংগিণ তাহাদের হাতিয়াড় প্রভৃতি রক্ষা করিত । এই গুহার আয়তন ৪৬'৩" × ৪১, "। এই গুহা অতিক্রম করিয়া আসিলে একটা ছোট গুহা দেখিতে পাওয়া যায় । এই সমস্ত গুহা বাতীত আরও ২৪টা গুহা এই পাঠাড়ে আছে বলিয়া আমি অবগত হইয়াছি ; কিন্তু সমস্যাভাবে সেগুলি পরিদর্শনের সৌভাগ্য আমার হয় নাই । এষ্ট সমস্ত গুহার উৎপত্তি ও কাল সম্বন্ধে বার্জেস যাহা বলিয়াছেন তাহাই উদ্ধৃত করিয়া এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উপসংহার করিব । বার্জেস বলেন "The...general arrangements of these caves are sufficient indications of their being Buddhist works; and though we have no very definite means of determining their antiquity, yet from the simplicity of their arrangements and—except that already mentioned on the facade of the Ebbal mandap—from the entire absence of sculpture, such as is common in all later Buddhistic caves, we may refer them to a very early age, probably before the Christian era, and possibly even to the age of Asoke or soon after."

ত্রিহেমচন্দ্র দাশ-গুপ্ত ।

সতীন-পো।

গল্প।

(১)

ঘটনাচক্রে তিনিই আমার পাণিগ্রহণ করিলেন ; কিন্তু কত ভাগ্যবিপর্যয়ের পর !

পূর্বের একটু ইতিহাস আছে। জ্ঞান-সঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গেই আমি তাঁহাকে দেখিয়া আসিতেছি। কতবার দেখিয়াছি তাহার সংখ্যা কে করিলে ? তিনি দাদার সমবয়স্ক ও সহপাঠী। উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্বের একটা বন্ধন ছিল। গ্রামের প্রতাপাশ্রিত জমীদার ব্রজমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের একমাত্র সন্তান, আগরের তুলসী হইলেও তিনি আমাদের পর্ণকূটরে প্রায়ই আসিতেন। আমার পিতা দরিদ্র ব্রাহ্মণ, বহু বিষয়ে জমীদার বাবুর অহুগ্রহাভ্যাসী। তিনিই বৃদ্ধ ব্রজমোহন বাবুকে ঘৃণা করিতেন।

দরিত্রের ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম বটে ; কিন্তু সৌন্দর্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী আমার পেছে রূপলাবণ্য না কি অজস্রবারে চালাইয়া দিয়াছিলেন ; অন্ততঃ গ্রামের সকলে সেই কথাই বলিত। তখন রূপের মহিমা বৃদ্ধিবার বয়স হয় নাই। তবে গ্রামের লোক যখন আমার বর্ণরূপ ও অঙ্গসৌষ্ঠবের প্রশংসা করিত, তখন লজ্জায় কুণ্ঠিত হইলেও মনের মধ্যে যে একটা গর্ভভাবের উদয় না হইত, এমন কথা বলিতে পারিব না। বালিকা বয়সে কণ্ঠটা তুল করিয়া বৃদ্ধিতে পারি নাই, কিন্তু এখন বৃদ্ধিতেছি, উহা ন্যূনতমের স্বার্থ।

জমীদার মহাশয় একদিন আমাকে দেখিয়া অনেকক্ষণ আমার দিকে চাহিয়া ছিলেন। তারপর বাবাকে ডাকিয়া বলিলেন ; “ওহে রামগোপাল, তোমার মেয়েটি বড় চমৎকার ত ! ঠিক যেন লক্ষ্মীপ্রতিমা ! ভারি সুন্দর ! আমার বিব্রত সঙ্গে বেশ মানাশ, কেমন নয় হে ?” অনেক দিন আগের কথা হইলেও সমস্তই আমার বেশ মনে আছে। সে প্রশ্নের বাবা কি উত্তর দিয়াছিলেন, তাহা শুনিতে পাই নাই। কারণ তখনই আমি ছুটিয়া পলাইয়াছিলাম। তখন আমার সবে আট বৎসর বয়স ; কিন্তু সেই বয়সেই আমার বৃদ্ধিবার ক্ষমতা যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িয়াছিল।

এই ঘটনার পর আমি তাঁহার সম্মুখে পড়িলেই ছুটিয়া একদিকে পলায়ন করিতাম। বিবাহ জিনিসটা যে কি, সে ধরসে সম্পূর্ণরূপে তাহা বৃদ্ধি নাই।

তবে বিবাহের সঙ্গে যে লজ্জার ঘনিষ্ঠ সংস্রব আছে, কেহ না বুঝাইয়া দিলেও বাঙ্গালীর মেয়ে তাহা জ্ঞান বয়সেই বুঝিয়া লয় ; তজ্জন্ত পরামর্শ দিবার প্রয়োজন হয় না ।

সঙ্গিনীদিগের সহিত প্রতাহই শিবপূজা করিতাম । ঠাকুরের মাথায় পুষ্পাঞ্জলি ও ফলধারা অর্পণ করিবার সময় মনে মনে তাঁহার মূর্তি ও নাম মনে করিয়া বলিতাম, “হে শিব ঠাকুর! ইহার সঙ্গেই ফেন আমার বিয়ে হয় ।” আট বৎসরের মেয়ে স্বামী কামিনা করিয়া শিবপূজা করে, এ কথা শুনিয়া অনেক আধুনিক শিক্ষিত পুরুষ হয়ত ঠনকিলা উঠিবেন, অবিদ্যাসভরে হাসিবেন ; কিন্তু কোন বঙ্গরমণী, বিশেষতঃ পল্লিবাসিনী ইহাতে বিদ্বেষের বিষয় কিছুই পাইবেন না ।

প্রতাহ শিবপূজা করিতাম বটে ; কিন্তু মাটার ঠাকুর বালিকার প্রার্থনা শুনিলেন না । গরীব চুঃখীর কৃপা জগতে কেই বা শুনে ? একদিন শুনিলাম, উনিশ বৎসরের ছেলের সঙ্গে আট বৎসরের মেয়ের বিবাহ হইলে মোটেই মানাইবে না । এত ছোট মেয়ে বধূরূপে গ্রহণ করা আত্মীয় স্বজন কাহারও অভিপ্রেত নহে, বিশেষতঃ গৃহীণীশূণ্য জমিদার-ভবনে বয়স্বী কতাই প্রয়োজন । আসল কথা কি তাই ? এবল প্রতঃপশালী, ধনকুবের জমিদারের একমাত্র বংশধরের সহিত গরীব, হতভাগা রামগোপাল মুখোপাধ্যায়ের কস্তার বিবাহ হইলে যে অবটন ঘটবে ! বোধ হয় সেইজন্তই প্রস্তাব উপেক্ষিত হইয়াছিল ।

অবশ্য আমার পিতামাতা এ সংকটে নন্দীপীড়িত হইয়াছিলেন ; দাদারও মনে আঘাত লাগিয়াছিল । তাহাদের দীর্ঘশ্বাস ও শ্লানমুখ তাহা ব্যক্ত করিয়াছিল । আর আমার কথা ? সে কথা শুনিয়া লাভ কি ? আট বৎসরের মেয়ের মনে একরূপ সংবাদে যেকরূপ ঢাকল্যা হওয়া স্বাভাবিক তাহাত হইয়াছিলই !

যশাসনয়ে অস্ত্র ঠাহার বিবাহ হইয়া গেল । সে বিবাহের নিমন্ত্রণে আমরাও গিয়াছিলাম । নববধূর বয়স চৌদ্দ বৎসর ।

বিবাহের দুই বৎসর পরে জমিদার-গৃহে নবকুনারের জন্মোৎসবের সঙ্গে সঙ্গে শোকের ছায়া ঘনীভূত হইল । পোক্তমুখ দর্শন করিবার কয়েক দিবস পরে বিপরীক বৃদ্ধ জমিদার মহাশয় ইহধাম ত্যাগ করিলেন ।

দারিদ্র্যের সহস্র ভাং গুলি করিয়াও আমাদের একরূপে চলিতেছিল । দাদা তখনও পাঠ্যাবস্থায়, আইন পরীক্ষার গুরুভারে নিপীড়িত । এইরূপে আরও ছয় বৎসর কাটিয়া গেল । শোক কাহাকে বলে জানিতাম না ; কিন্তু প্রলয় ঝটিকার ভায় প্রবলবেগে মহানারী গ্রামের মধ্যে যখন প্রবেশ করিল, তখন

শোকের দাহ কি ভীষণ তাহা বুঝিলাম । ‘পিতৃবিয়োগ শোকে যখন আমার কাतर, সেই সময় তুনিলাম জমীদার বাটার নৃতন গৃহিণীও একমাত্র পুত্র রাখিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন । মহামারী একমাস কাল প্রবল প্রত্যাপে গ্রামের মধ্যে রাজব করিমা অন্তর্হিত হইল । বহু ঘুই খশানে পরিণত হইয়াছিল ।

এতদিন আমার বিবাহের গুল কুটিয়াও কুটে নাই । ‘পুল্লীবের মেয়ের অদৃষ্টে সুপাত্র প্রায়ই কুটে না । পিতার সংকল্প ছিল, আমাদেব মত কোন হতভাগোর হস্তে কন্যা সমর্পণ করিবেন না । হুণী পরিবারের লংখা বৃদ্ধি করিতে তিনি আদৌ সম্মত ছিলেন না । গ্রামবাসীরা এজন্য প্রতিকভাবে না হউক পরোক্ষভাবে কত তীত্র বিক্রম ও কঠোর সমালোচনা করিত ! মা কত কাঁদিতেন । বাবা বলিতেন, ‘কাদ কেন ? আমরাই হতভাগা ; আবার আজীবন নরকফরগা ভোগের জন্য মেয়েটাকে আর এক হতভাগোর স্বন্ধে নিক্ষেপ করি কেন ? অপাত্রে কন্যাদান করিব না । জাত ইচ্ছত যদি ভ্রহ্মতে নাই থাকে, উপায় কি ? একটা জীবনের উপর দিয়াই যাইবে । তাই বলিয়া জানিয়া তুনিয়া মেয়েটাকে জলে ফেলিয়া দিতে পারিব না ।’ কিন্তু কোন সুপাত্র আমার সীমস্তে নাত্মীজাতির শ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ আকিয়া দিবার জন্য অগ্রসর হইল না । সময় কাহারও মুখ চাহিয়া বলিয়া থাকে না ; যা তার অশ্রুজল, বাবার দীর্ঘবাস, আশ্রয় স্বজনের আক্ষেপোক্তি কোনও বাধা না মানিয়া সে যথানিয়মে বড় পুত্র স্ত্রী লইয়া নির্দিষ্ট রাজ্যে চলিতেছিল । আমার দেহও সঙ্গে সঙ্গে পুষ্টিত ও পরমিত হইয়া উঠিতেছিল । দাদাও বাবার চেষ্টায় লেখাপড়া শিখিয়াছিলাম । গৃহকণ্ঠে অফলকেশড়াওনা লইয়াই থাকিতাম । দাদা ভাল ভাল গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া আমার জন্য পাঠাইতেন । কাহারও সম্মুখে বড় একটা বাহির হইতাম না । দরিদ্র বাঙ্গালীর ঘরে কন্যা হইয়া জন্মান যে কত চর্ভাগা তাহা অন্তর্যামীই জানেন ।

পত্নী-বিয়োগের এক বৎসর পরে নবীন জমীদার আবার সুসারী হইবেন ; তুনিলাম বয়স কন্যার সন্ধান চলিতেছিল । শেষে একদিন তুনিলাম, আমাকেই তিনি গৃহলক্ষ্মীপদে মনোনীত করিয়াছেন । মা ও দাদা অবিলম্বেই সম্মতি দিলেন । এ সংবাদে আমার মনের অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল, তাহা প্রকাশ করিবার ভাষা আছে কি ?

(২)

প্রস্তাপতি উভয়ের হস্তে ফুলের বাধন দৃক করিয়া দিলেন । সে দিনের, সে শুভ মুহূর্তের স্মৃতি কি মধুর ! আমার কম্পিত উচ্চ করতল যখন তাহার কর-

‘পল্লবে’ সমর্পিত চাইয়াছিল, তখন জনয়-সময়ে কি আলোড়ন ঘটয়াছিল তাহা চক্ৰভোগী ভিন্ন অল্পে বুঝিবে না । তখন মনে হইয়াছিল, চক্ৰমাশালিনী এই নিশীথিনী অনন্ত সৌন্দর্যময়ী, গ্রামা বহুক্ষণা শুধুই পুষ্পগন্ধময়ী, বিশ্বত্রাজো কেবল আনন্দের মন্ডাকিনীদ্বারা অবিশ্রুত ছুটিতেছে । সারা রজনী শুধু সেই আনন্দপ্রোতে কাসিঘট্টলিয়াছিলাম ।

উত্তেজনা, উল্লীপন এবং আনন্দকম্পন শান্ত হইতে না হইতেই খণ্ডরালয়ে নীত হইলাম । পিতৃগৃহ ত্যাগের সময় কন্যার নয়নে অশ্রুদ্বারা শুকাই না ; আত্মীয়ের পরিচিত ঘর ছাড়ার, প্রেমময়ী জননী, আত্মীয় স্বজন সকলকে ত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণ অপরিচিত রাজ্যে যাইবার সময় প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠে ; কিন্তু সত্য বলিতে কি আমার সে সব কিছুই হয় নাই । আমি যৈ আমার ইষ্টদেবতা, বাহিতের কাছে চলিয়াছি ! জ্ঞানসঞ্চারের সময় হইতে সপ্তদশ বর্ষ বয়স পর্যন্ত তাঁহারই আরাধ্য মূর্তি গোপনে মনের মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া পূজা করিয়া আসিয়াছি । যদি তাঁহার সহিত আজ আমার পরিণয় না ঘটয়া অন্যত্র হইত, বলিতে পারি না জীবন-প্রোক্ত কোন্ পথে চলিত । কিন্তু যাহা ঘটয়াছিল আমি তাহাই বলিতেছি । মনের গতি রোধ করিতে পারে কে ?

আর কয়েক বৎসর পূর্বে যে গৃহ আমার হইতে পারিত, এতদিন পরে ভগবান সেইখানেই আমার পুণ্যঠাইয়া দিলেন । মনে মনে দেবতার চরণে সহস্রবার প্রণাম করিয়া মন আমার হারানিধি আজ ফিরিয়া পাইয়াছি । সাধনার ধন আজ আমার মুষ্টিমদো ! কে বলে বিধাতা নির্দয় ?

আজ পুষ্পবাসর ! জমীদারগৃহে লোকজনের অভাব না থাকিলেও, বনিষ্ট আত্মীয় বড় কেহ ছিলেন না ! মহামারীর প্রকোপে অনেকেই অন্তর্হিত হইয়া ছিলেন । সুতরাং নববধু হইলেও লজ্জা করিবার মত বড় একটা কাহাকেও দেখিলাম না । কিন্তু তথাপি সারাদিনের মধ্যে তাঁহার সহিত আমার ভেদন করিয়া দেখা হয় নাই ।

রাত্রিকালে আহার-শেষে জনৈক দূর আত্মীয় আমাকে নির্দিষ্ট শয়নকক্ষে রাখিয়া আসিলেন । আমার সমস্ত দেহ গম বন শিহরিয়া উঠিতে লাগিল । অসহ আগ্রহভরে তাঁহার প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিলাম । আজ তাঁহার সহিত নির্জনে প্রথম সম্মিলন হইবে ! একটা দুঃসহ স্বপ্নের বেদনা রহিয়া রহিয়া অন্তরে অল্পভব করিতেছিলাম । পুষ্পবাসর !—কাব্যে উপজ্ঞাসে, ইহার কত বর্ণনাই পড়িয়াছি !

অবগুঠন ঈষৎ উদ্ভূত করিয়া চোঁকিতে শরন করিয়া কুণ্ডের চারিদিকে চাহিয়া-
দেখিলাম, চক্ষুগোচরিত লম্বার উপর পুষ্পমালা সঁপেছে রঞ্জিত । টেবিলের উপর
একটি সুদৃশ্য, বৃহৎ ফুলদানীতে প্রকাণ্ড একটি ফুলের তোড়া । ঘরের বাতাস
ফুলের গন স্বগন্ধে মাতিয়া উঠিয়াছিল ।

একটু পরেই তিনি—আমার দেবতা আসিবেন । কিংবালিয়া তাঁহার প্রবেশ
উত্তর দিব ? পৃথিবীর সর লজ্জা নিঃশেষ করিয়া আমারই অন্তর-মন্দিরে কে
স্বপ্নীকৃত করিয়া দিয়াছে ? মাথা তুলিয়া চাহিতে পারিতেছি না—কেন ?

সহসা মূহপদধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে দ্বার রক্ত করিবার লগ কানে গেল । মুহূর্তে
রক্তশ্রোতের দ্রুত সঞ্চারণ শরীর মধ্যে অহুভব করিলাম । লদয়ে তুমুল
আলোড়ন উপস্থিত হইল । মস্তক ধীরে ধীরে আরও অবনত হইয়া পড়িল ।

অকস্মাৎ চিরবাঞ্ছিতের পূর্ণস্পর্শে শিরসিয়া উঠিলাম । ধ্বনিরই সুর
আছে জানিতাম ; কিন্তু স্পর্শেও সে সব থাকিতে পারে তাহা আজ বুঝিলাম ।
আমার সমস্ত ইঞ্জিয় যেন সেই বিচিত্র স্পর্শে ও সুরে মোহবিষ্ট হইল ।

এক হস্তে আমার অবগুঠন মুক্ত করিয়া অর্থাৎ হস্তে তিনি চিবুক তুলিয়া
ধরিলেন । আমি দৃঢ়শক্তিতে নয়ন মুদ্রিত করিলাম । কতক্ষণ এই ভাবে
ছিলাম জানি না । তাঁহার কণ্ঠস্বরে চমক ভাঙ্গিল । তিনিগন “তিনি
বলিতেছেন, “আমার দিকে চাও ।”

হুই চারিবার চেষ্টার পর চাহিলাম । তাঁহার আদেশ অমোঘ করিতে পারি
কি ? উজ্জ্বললোকে তাঁহার নয়নের সচিৎ আমার দৃষ্টি মিলিত হইল । আবার
লজ্জা আসিয়া আমাকে অভিভূত করিল । দেখিলাম, এবদৃষ্টিতে তিনি—আমার
দিকে চাহিয়া আছেন ।

আমার কম্পিত করপুট গ্রহণ করিয়া তিনি মুহূর্তের, মেহকোমলকণ্ঠে
বলিলেন, “স্বপ্না, আমাদের এই পবিত্র মিলনের দিনে, আমি তোমাকে কিছু
উপহার দিতে চাই । আমার বড় আনন্দের, বড় স্নেহের উপহার । লইবে কি ?”

লজ্জার আমি এতটুকু হইয়া গেলাম । তাঁহার প্রদত্ত উপহার আমি লইব
না ? তিনি যে আমার সর্বস্ব ! তাঁহার সামান্য দানও যে আমার মাথার মণি ;
সে কথা বুঝাইয়া বলিবার মত ভাষা ও শক্তি যে আমার নাই । কিন্তু তবু
লজ্জায় আমার মুখমণ্ডল আরক্ত হইয়া উঠিল ।

বোধ হয় তিনি আমায় চকিত দৃষ্টিতে ও ব্যবহারে আমার অন্তরের আগ্রহ
বুঝিতে পারিয়াছিলেন । তিনি বলিলেন, “একটু বস, আমি এখনই আসিতেছি ।”

পদ্মকে বুঝিলাম তিনি বাহিরে যাইতেছেন । অবগুষ্ঠনের পরিসর বাড়াইয়া দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম । বদলন্দন এখনও থামিতেছি না কেন ?

আবার তাঁহার পদশব্দ শুনিলাম । নিকটে আসিয়া তিনি বলিলেন, “এই লও, সুখমা ! আমার বিশ্বাস, এ মেহোপ্কার তুমি সাদরে লইবে ।”

সহসা চমকিয়া উঠিলাম । অবগুষ্ঠনের অন্তরাল হইতে দেখিলাম, একটা বালককে তিনি জোড় হইতে নামাইতেছেন । ও কে ?—বুঝিলাম, বালক তাঁহারই সন্তান, আমার সপত্নী-পুত্র !

জগদমধ্য, জানি না কেন, অকস্মাৎ একটা আঘাত অনুভব করিলাম । কিন্তু ছিঃ ! আমি এত নীচ ? সুহৃৎকে দ্রব্দের গতি রক্ষ করিলাম । এ যে তাঁহারই দান, শ্রেষ্ঠ উপহার । ভগবান ! আমি যেন নারীর দুর্গাদা, মাতৃত্বের গৌরব রক্ষা করিয়া চলিতে পারি !

সাত বৎসরের বালক বিস্মিত ভাবে আমার দিকে চাহিয়া বলিল, “এ কে বাবা ? নতুন বুউ ?”

তিনি কি বলিতে যাইতেছিলেন । সহসা সমুদয় তুচ্ছ লজ্জা তৈলিয়া ফেলিয়া, মৃদুস্বরে বলিলান, “আমি তোর মা ।”

বালক গর্জিত ভাবে বলিল, “তুমি আমার মা কেন হবে ? তিনি যে স্বর্গে গেছেন ।”

• “দ্রব্দের একটা বাপ পুইলাম”; কিন্তু সেই আঘাত সহ্য করিয়া বলিলাম, “তিনি ত তোমার মা; কিন্তু আমিও তোমার মা ।”

• “বালক সন্দেহভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল, “তুমি মার নত আমায় ভালবাস্তে পারবে না ।”

• মাতৃদার সন্তানের কথা সেদিন ভাল করিয়া বুঝি নাই । পরে বুঝিয়াছিলাম বটে । কিন্তু তখন তাঁহার কথায় বিরক্তি জন্মিল । তথাপি প্রসন্নহাস্তে বলিলাম, “ভালবাসো । তুমি আমার কথা শুনবে ?”

বালক বলিল, “কথা আমি কারও শুনি না । কেমন বাবা, না ?”

তিনি দূরে বাতায়ন-সান্নিধ্যে পাড়াইয়া কি দেখিতেছিলেন । দীরে দীরে বালকের নিকটে আসিয়া বলিলেন, “রাত হয়েছে, চল, এবার গিন্না ঘুমাও ।”

(৩)

জ্যোৎস্না-প্রাৰনে জানা যেদিনী হ্রাসিতেছে । ভাস্করের তরলদীর স্তায় আবারও দ্রব্দের আঁজ কূলে কূলে তরিয়া উঠিয়াছে । বহু ভ্রমের পর স্নেহের

আনন্দের সমুদ্রে অবগাহন করিতেছি; অজ্ঞানতার বিধাতার আশীর্বাদ আমার শিরে বর্ষিত হইয়াছে, কাজেই দিন দিন আনন্দের জোয়ার পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছিল। বিবাদের পর ভয়মাস কি ভয়েই চলিয়া গিয়াছে! এখনও চলিতেছে।

পিতৃগৃহে, পর্ণকূটারে কাজের মন ছিল না, তাহাতেই ময় থাকিতাম; দ্বারীগৃহে আসিয়াও কাজ না করিয়া থাকিতে পারিতাম না। কিন্তু দ্বারী অনেক সময় বহু-গৃহকাণী হইতে আমার বঞ্চিত রাখিতেন। দাস দাসী থাকিতে সকল কাজ করিবার প্রয়োজন কি? অনেক সময় তাঁহার সাহচর্যে বাপন করিতাম। নানাবিধ পুস্তক পাঠে দীর্ঘ অবসর চলিয়া গাইত।

দীর্ঘ ঋতুর সন্ধ্যায় নির্জনে বসিয়া কল্পনার রাজ্যে বিচরণ করিতেছি, মচসা পচার মা আসিয়া বলিল, “বড় মজি ছেলে, বাবু! মা, পেমার সপের কাঁচের কলদানিটা ফেলে দিয়ে ভেঙে ফেলেছে, দেখবে এসো।”

খোকার ধোঁরাষা রোচ্চই বাড়িয়া চলিয়াছে। আদরের আতিশয্যে তাহার সব ভাব বিগড়াইয়া গিয়াছে। তাহাকে একটু শাসন করা দরকার।

ভূড়াভাড়ি ছাপ হইতে নামিয়া নীচে আসিলাম। ঘরের মধ্যে খোকা তখনও চুটাছুট করিতেছিল, আমার দেখিয়া সে চুপ করিয়া দাঁড়াইল। গৃহতলে কলদানীর চূর্ণগুগুলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। এতটুকু মনে একটু ক্রোধের সঞ্চার হইল।

“খোকা, এ কি করেছ?”

সে আমার দিকে চাহিয়া বলিল, “হাত লেগে ভেঙ্গে গেছে, কি করবো?”

“তুমি দিন দিন বড় চুষ্ট হচ্ছো, খোকা! এখন থেকে ও রকম চুষ্টামি করতে পাবে না; যা বারণ করে দেবো, তা করো না, বুঝেছ?”

কেন, না?”

বাস্তবিক এমন ভয়লেশশূন্য ছেলে আমি কোপায় দেখি নাই। এখন হইতে তাহার দোষ সংশোধন না করিয়া দিলে, পরিণাম ভাল হইবে না।

আমি বলিলাম, “যা বলি, মন দিয়ে, শোন। মন্দ কাজ আর কখনও করো না। যখন আমি যা বলবো, তা তোমার শুনতে হবে।”

খোকা হির দৃষ্টিতে আমার পানে চাহিয়া বলিল, “ওসব আমার ভাল লাগে নী।”

“তোমার ভাল লাগুক, আর নাই লাগুক, তোমায় যা বলবো তা করতেই হবে, বুঝেছ?”

বোধ হয় আমার কণ্ঠস্বরের তুড়তা ও মুখভঙ্গী দেখিয়া সে বিচলিত হইল। কোনরূপ প্রতিবাদ করিবার আর সাহস রইল না। মুহূর্ত্তে থোকা বলিল, “আচ্ছা, শুনবো।”

আমি তখন থোকার হাত ধরিয়া বলিলাম, “এখন বাইরে যাও, বোধ হয় মাষ্টার মহাশয় এসেছেন। গুন দিয়া পড়া শুনা করগে। পচার মা, থোকাকে সঙ্গে করে নিয়ে যা।”

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে স্বামী কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। থোকা বিরম্বদনে চলিয়া গেল। স্বামী বলিলেন, “কি হচ্ছিল?”

সুলদারীর চূর্ণ নওগুলি তুলিতে তুলিতে বলিলাম, “দেখ না, থোকার কাণ্ড! বড় ভট্ট হচ্ছে।”

কিয়ংকাল নীরবে থাকিয়া তিনি বলিলেন, “বেশ সুখমা, থোকা বেনী আদর পেয়ে সত্যি একটু ভট্ট চরেছে; কিন্তু আমার অহরোধে তুমি তার প্রতি রুচ বা কর্কশ ব্যবহার করো না। কেউ থোকার প্রতি রুচ ব্যবহার করিলে আমি তাহাকে মার্কনা করিতে পারি না।” বলিতে বলিতে তাঁহার কণ্ঠস্বর স্নেহে কম্পিত হইল।

আমার হৃদয়ে কে যেন শেলাঘাত করিল। থোকাকে যে আমি সতীনপোর মত দেখি না, সে যে দীর্ঘে দীর্ঘে আমার হৃদয়ে অধিকার বিস্তার করিতেছে, এ কথাটা তিনি বুঝিলেন না কেঁতু? আমি ত ভ্রমেও তাহার প্রতি বিমাতার মত আচরণ করি না! তুঁবে কেন তিনি আজ আমার হৃদয়ে এ আঘাত করিলেন? নারীর স্বাভাবিক চরিত্র অধিমান মুহূর্ত্তমধ্যে আমার হৃদয় ছাইয়া ফেলিল। এই ভরা যৌবনের বিচিত্র কান্তে; রূপের মোহনিগড়ে যাঁহাকে দাসাশ্রম্যাস করিয়া রাবিবার অধিকার পাইয়াছি, তিনি কি না আজ আমার সম্মুখে এইরূপ মস্তব্য প্রকাশ করিলেন? ইচ্ছা হইল, তাঁহার সম্মুখের উপর যথার্থই বিমাতার প্রভাব বিক্রম তাহা তাঁহাকে দেখাইয়া দেই, প্রতিশোধ লই। কিন্তু শয়তানের সে প্রলোভনে যুগ্ম হইলাম না। যিনি আমার আরাধা দেবতা, আমার সর্গেশ্বর, আমার ইহকাল ও পরকাল, তাঁহাকে নীচতার, কুদ্রতার পঙ্কিল হৃদে ঠেলিয়া ফেলা সহদর্শনীয় কর্তব্য নহে। স্বামীর নৈতিক অধঃপতনে প্রভ্রম দিবার অধিকার গ্রহীত নাই। শয়তান! তুই হও, আমরা হৃদয়ে তোমার স্থান নাই! মনের গতি বন্ধ করিয়া পাপ-কামনাকে হৃদয়ের অন্তঃপুর চাইতে নির্বাসিত করিয়া দিলাম। শান্তভাবে বলিলাম, “থোকা কি আমার মেচের গুন নয়? পাছে সে পারাপ

হইয়া যায়, এজন্য তাহাকে একটু আদর্শ তিরস্কার করি। কিন্তু তুমি যদি অসম্মত হও তবে আর বলিব না।”

স্বামী বলিলেন “তুমি যে তার মঙ্গলের জন্যই তিরস্কার কর, তা কি জানি না, সুখমা? কিন্তু তবু—তুমি বোধ হয় বৃদ্ধিতে পারিতেছ, ঐটুকুই তার শেষ ছিল।”

বুলিলাম, কোথায় তাঁহার বাপা। এতদিন একেদীরেই যে না বুলিয়াছিলাম তাহা নহে; কিন্তু আজ সব ঘোর কাটিয়া গেল। সদয়ে একটা স্ত্রের বেদনা বাজিল। স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধায় হৃদয় আরও তঁরিয়া উঠিল। বহু পূণ্যবতী তিনি, তাই স্বামীর এমন প্রেম লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু আমিও কি কেহ নহি?

স্বামী বলিলেন, “এখানে থোকার লেখাপড়ার সুবিধা হইতেছে না। আমার ইচ্ছা কলিকাতায় গিয়া উহার পড়াশুনার ভালরকম বন্দোবস্ত করিয়া দিই; তুমি কি বল?”

আমি বলিলাম; “এ কথা আমি তোমাকেও বলিব তাবিয়াছিলাম। সত্যি এখানে থোকার লেখাপড়ার সুবিধা হইতেছে না।”

(৪)

সারারাত্রির ঘন বর্ষণে আকাশের মেঘের ঘোর কাঠে নাই। বেলা নয়টা বাজিয়া গেল, তখন বারিপাত হইতেছিল না বটে; কিন্তু আকাশে ত্র্যম্ ত্র্যম্ করিতেছিল। বাল্য বাতাস হ হ করিয়া বহিতেছিল, তখনও শ্রান্ত হইয়া পড়ে নাই। স্বামী দ্বিতলে বসিয়া পড়িতেছিলেন। কলিকাতার রাজপথ, কর্দমাক্ত, পিচ্ছিল, অপরিদর্শন।

থোকা তখনও মার্কেল খেলিতেছে দেখিয়া বুলিলাম, “বেলা হয়ে গেল, স্কুলে যাবে না?”

সে একবার আমার দিকে চাহিয়াই মস্তক নত করিল। “মুহুরেরে বলিল, “আজ বড় বাদল্যা মা!”

“তা হোক! স্নান করে খেয়ে নেও। স্কুল ক্যামাই করা ভাল নয়।”

ইদানীং থোকা আমার বেশ বাধা হইয়াছিল। বাহা বলিতাম তাঁহাতে - অপত্তি কল্পিত না। তাহার একগুঁয়ে ভাবটা অনেক কমিয়া আসিয়াছিল। লেখাপড়ার বেশ মনোযোগী দেখা যাইতেছিল। কলিকাতায় আসিবার পর

হইতে আমি তাহাকে ঘরের নত করিয়া গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছিলাম । অধিকাংশ বিষয়ে সে আমার আদেশ নতশিরে পালন করিত । কিন্তু আজ সে কেবলই আপত্তি করিতে লাগিল । আমি নিজে তাহাকে দান করাইয়া দিলাম । আহাৰাদির পর কাপড় পরাইয়া দিলেও সে বাহানা ধরিল, আজ সে স্নানে যাইবে না । তুহার ভাল লাগিতেছে না । পথে কাদা, দিনটা বিজী ইত্যাদি । আমি তাহাকে বুঝাইয়া দিলাম, স্নান বেশী দূরে নয়, বিহারী চাকর তাহাকে সঙ্গে করিয়া রাখিয়া আসিবে । কিন্তু পোকার আজ যে কি হইয়াছে, কিছুতেই তাহাকে ঘরের বাহির করিতে পারিলাম না । নানা মিষ্ট কথা বলিলাম, আমার দেখাইলাম ; কিন্তু কিছুতেই তাহাকে রাজী করিতে পারিলাম না । এমন সময় স্বামী দান সারিয়া সেই ঘরে আসিলেন । আমি তাহাকে দেখিয়া একটু দৃঢ়বরে বলিলাম “তোমাকে স্নানে যেতেই হবে । যাও, আর দেৱী করো না ।”

আমার দৃঢ়তা দেখিয়া এবার থোকা আর আপত্তি করিল না । ধীরে ধীরে বই খাতা তুলিয়া লইল । বিহারী চাকর তাহার সঙ্গে চলিল । থোকা নত মতকে স্নানে চলিয়া গেল ।

আহার শেষে স্বামী উপরে চলিয়া গেলেন । আমি তাহার পাতে প্রসাদ পাইতে যাইতেছি এমন সময় বাহুরে একটা গোল উঠিল । দ্রুতপদে অন্তঃপুরের দ্বারপথে আসিয়া দাড়াইল ।

তখন আবাক্ষ হুটি পড়িতে আরম্ভ হইয়াছে, বাতাসের বেগও বাড়িয়াছে ।

এ কি ? বিহারী থোকাকে কোলে করিয়া আনিতেছে ; দ্বারখানও তাহার সঙ্গে ছুটিয়া আসিতেছে । আমি ছুটিয়া গেলাম, দেখিলাম, থোকার সর্দাঙ্গ কর্দমাক্ত, লগাটের একপ্রান্তে ও কি ? ক্ষীণ রক্তধারা !

থোকাকে বুক তুলিয়া লইলাম । বিহারী বলিল, “থোকাবাবু হঠাৎ পা পিছলে কুটপাতের উপর পড়ে গিয়েছিল । আমি পেছনে ছিলাম, দরবার আগেই মাথাটা জোরে বাধান পাথরের উপর লেগে কপালের খানিকটা কেটে গিয়েছে !”

হুঃ, কেন বাছাকে জোলা করে স্নানে পাঠালেম । বেদনায় আমার শরীরের সমস্ত শিরা গুলি টন টন করিয়া উঠিল । থোকা বলিল, “মা হঠাৎ পড়ে গিয়েছিলুম, স্নান কামাই হয়ে গেল । তুমি আমায় বন্ধে না, মা ?”

পরম মেহে তাহাকে বুকে চাপিয়া বলিলাম, “কেন বন্ধে বাবা ? হুঁ যে

আমার স্নেহের ধন ।”

“মা, তুমি বড় ভাল । এমন করে কোন দিন তুমি আমায় ডাক নাই । বাবাকে তুমি যেমন করে রোজ আদর কর, আজ আমায় সেই রকম আদর কছো । বড় ভাল মা, তুমি ।”

আমার বুকের মধ্যে ক্রন্দন গুঁমরিয়া উঠিল । তাহা পূর্ণদম্পনিত আনন আমি চুপনে ঢাকিয়া দিলাম । বাবকের অন্তর্কণ দীর্ঘ দীর্ঘ আমার বুক ঢলিয়া পড়িল ।

বোধ হয় গোলযোগ স্বামীর কর্ণে পৌঁছিয়াছিল । তিনি দ্রুতপদে নীচে নামিয়া আসিলেন । থোকাঁকে তদবস্থ দেখিয়া তিনি একবার আমার দিকে উজ্জল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন ; তারপর বাহু বাড়াইয়া বলিলেন, “একে আমার কোলে দাও ।”

আমি বলিলাম, “তুমি উপরে চল । আমি থোকাকে নিয়ে যাচ্ছি ।”

তিনি দৃঢ়কণ্ঠে বলিলেন, “না, আমার দাও ।” বলিয়াই তিনি আমার বাহুবন্ধন হইতে থোকাকে মুক্ত করিয়া ফেঁড়ে তুলিয়া লইলেন ।

আমি যেন এতটুকু হইয়া গেলাম ।

বৈকালে থোকার প্রবল জর হইল । ডাক্তার আসিলেন । তিনি লাল বাহিরে কিছু মেখা না গেলে ওমন্ত্রিকে গোলযোগ ঘটয়াছে । রোগ সাংঘাতিক হইয়া উঠিয়াছে ।

কাহারও কথা শুনিলাম না । রোগশয্যার পাশে স্থায়ী স্থান গ্রহণ করিলাম । আমার বুক ফাটিয়া ঘাইতেছিল—সে কি যন্ত্রণা, ভাবায় তাহা প্রকাশ করা যায় না । থোকা আমার কে ?—সতীন-পো । কিন্তু সে আমার অন্তরতম স্থানের কোন স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছিল, এতদিন আমিও তাহা জানিতে পারি নাই । সে যে কাহার নয়নের মণি, আমার ইষ্টদেবতার স্নেহের ধন, স্তব্ধতা আমারও যে সে কত আদরের, তাহা অন্তর্যামী ছাড়া অশ্রু কি বুঝিবে ? সতীনের কাটা, তুলিয়া ফেলিবার জগুই সকলে বাস্তব হয়; এ কি হইল ? মাড়লের স্থানসিদ্ধ আমার হৃদয়ে উচ্ছ্বসিত, আলোড়িত হইতেছিল, বাহিরের কেহ তাহা জানে না । তিনিই কি জানেন ? আমার হৃদয়ের এ তীব্র যন্ত্রণা, নীরব, ব্যথা লোকের কাছে প্রকাশ করিবার নয় । কে বিশ্বাস করিবে ?

• দুই দিন দুইরাত্রি জরের ঘোরে থোকা অচেতন। তাহার নিকট হইতে আমাকে কেহ এক প্লাও নড়াইতে পারিল না,—তিনিও নহে ।

তখন প্রথম কনকরশ্মি ঘরের মধ্যে খেলা করিতেছিল। থোকা ধীরে-ধীরে নয়ন উন্মীলিত করিল। ক্ষীণকণ্ঠে বলিল, “মা!”

“কি বাবা!”—বাক্যভরে কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল। থোকা আমার হাতখানি লইয়া তাহার বুকের উপর রাখিল। আমার তাহার চেতনা অন্তর্হিত হইল। চোপের পাতা-চুর্কল। বস্তার শ্রোতের বেগ ধারণ করিবার শক্তি কি তাহার আছে?

কলিকাতার বড় বড় ডাক্তার আসিলেন। কিন্তু কেহই আশ্বাস দিতে পারিলেন না।

সামান্য আঘাতে রোগ এমন সাংঘাতিক হইয়া উঠিতে পারে, কে জানিত! সেদিন স্বামীর নয়নে যে দৃষ্টি দেখিয়াছিলাম, জীবনে তাহা ভুলিব না।

চারি দিন পরে থোকা, আমার সোনার যাত্র, আমারই কৈালের উপর শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিল। তাহার জননীর ক্রোড় তাহারই জন্ম অপেক্ষা করিতেছিল। স্বর্গের কুন্তল তাহার নির্দিষ্ট রাজ্যে ফিরিয়া গেল। কিন্তু বুকে যে সে কি দাগা দিয়া গেল তাহা কে বুঝিবে?

• তার পর আরও পঁচ বৎসর চলিয়া গিয়াছে। আমিও এখন দুইটি সন্তানের জননী। তিন সন্তানদিগকে আদর করিতেন বটে, কিন্তু তেমন প্রসন্ন হাসি আর দেখি নাই। ত্রিবাহের পর যেরূপ আবেগ ও প্রেমভরে তিনি আমার সহিত ব্যবহার করিতেন, থোকার মৃত্যুর পর হইতে তেমন ব্যবহার জীবনে আর কখনও পাই নাই। সংসারের দাবিতীয় কার্য তিনি যথানিয়মে পালন করিতেন, তাহাতে কোন ত্রুটি ঘটিত না; সে শুধু শুক, নীরস কঠোর কর্তব্য পালন, তাহাতে উচ্ছ্বসিত রক্তের বিদ্যুৎ অভিব্যক্তি ছিল না। কথাপ্রসঙ্গে তিনি বলিতেন, “এখন আমরা ক্রমশই বুড়া হইতে চলিলাম, ওসব আর এখন ভাল দেখায় না।”

বুঝিয়াছিলাম, তিনি আমার অপরাধ মার্জন্য করেন নাই; বোধ হয় কখনও করিবেন না। মরণভেদী এবং দুঃসহ হইলেও তাহার এই নীরব দণ্ড আমি বিনা প্রতিবাদে মাথা পাতিয়া লইয়াছিলাম। স্বতির পবিত্রতা তিনি রক্ষা করুন। ভগবানের আশীর্বাদে আমিও যেন অকুণ্ঠচিত্তে কর্তব্যপালন করিতে পারি।

ত্রিপুরাজনাথ ঘোষ।

লীলা

মনটি আমার রাতের কঁত আঁধার ;
 সেই আঁধারে একটি গীতিই ওঠে,
 তখন আবার লয়ে' প্রভাত আশার
 —কোমল-কম, কমল সম সোণার,—
 মানসরূপী তমস কোলেটে ফোটে !

(২)

প্রভাত যখন চয়,
 (সোণার) আশার আলোকময়,
 তখন এ মন কেমন করে' একে
 সংখ্যাবিহীন দেখে ;
 কতট না রঙ, কতই যে চঙ, কতট রকম সে গে !
 —বস্তুরূপী সোজ'-
 কাছে আসি' পরশ দিয়ে কতট না ভাব করে
 —সারাটি দিন ছুড়ে ;
 চাসার চাসে, কাদার কাদে, বিরূপ হয়েই মাধে ;
 ওরে, এমনি ফাদে
 নানান্ পাকে জড়িয়ে আশায় নানান্ ছলেই বাধে !

(৩)

তারপরে সেই সাঁঝে,—
 সব কোলাহল যখন কেবল নগীণ ছ'য়েই রাজে,
 নীরবরূপে রুদ্রির রাগে স্বপ্ন-সাগর সঁতুরে ভাগে
 ভাবের রাশি যখন গগন মাঝে ;
 • বাকুল বেগে অসীম পানে দায়গো তাঁরা অধীর টানে ।
 • এক্তারাতে কি গান তখন বাজে ?

সে গান শুনে' ধরার বুকে যতক বিরোধ যায় রে চুকে ;
 ওটিয়ে আসে জালটি তখন ধীরে !
 অঁপিয়ে পড়ে সে গান শুনে', ক্রমে, কুহক-মগ্ন-গুণে •
 অনেক এসে একের তিমির-নীরে !
 অঁপানু এ মোর মনটি তখন যাচে সাধের সাধনার দন ;
 —সে যে কেমন, কেমন করে' বলি ?
 এমনি করে' অঁপনা তুলে' আনন্দেরি ভূষণ তুলে'
 অঁধর-পাণার মদি শুধুই চলি ।
 —কোথায় যে যাই, না পাই দিশা । এমনি করে' দিবস-নিশা
 সুধারি স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে বেড়ায় •
 অধবীচীন, শান্তিহারী • এ রঙ্গ তার কেমন ধারা ?
 দ্বন্দ্বতে গেলেই মুচুকে চেমে' পালায় ! •

শ্রীদেবকুমার রায়চৌধুরী

শ্রুতি-স্মৃতি

(পূর্বানুষ্ঠি)

কয়েক দিন পরে-বাড়ী ফিরবার ন্তনস্থ মন হইতে ক্রমে অপসারিত হইয়া
 গেল, ঘটনাক্রমে দৈনিক বালাজীবনের নিত্যকৃত্যের মধ্যে আবার দিনগুলি
 কাটিয়া যাইতে লাগিল । যন্ত্রিও ছাপার অক্ষর তখন পড়িতে পারি, কিন্তু এক-
 নাত্র চক্ষুদ্বারা সব কাল 'স্ক্রুতিতে' হয় ; সেই জন্ত বিবেচক বৃদ্ধ চিত্তেবিগণ তখন
 • সেই সন্তরোগমুক্ত চক্ষুদ্বারা পড়িওনা করার ভ্রম অসম্ভব হইবে ভাবিয়া
 আমাকে বিজ্ঞাপিকা কষ্ট হইতে কিছুদিনের জন্য অব্যাহতি দিলেন । শেষবে
 এমন জীবন মন নয়—আহার, শয়ন, ক্রীড়া, কোতুক সবই চলিতেছে, কেবল
 শিক্ষকের নিকট পড়িতে যাইতে হয় না, এমন সুখ বোধ করি খুব কম বালকের
 ভাগ্যেই ঘটে, নিজকে বড় ভাগ্যবান বলিয়াই তখন মনে হইয়াছিল । সুখের
 দিন চিরস্থায়ী ত হয় না, আমার শিশুভাগ্য এমন কি প্রায় যে দায়িত্বজনীন জীবন
 চিরকাল কাটাইতে পাইব । কিছু দিবস পরে আবার পূর্ববৎ শিক্ষাকার্যা
 আরম্ভ হইল ;— সেই বেস্ত, সেই বিছুটি, সেই ভীমকল, সেই অগ্নিদাহ, বাকি
 বকেয়া এবং সুদ সমেত আমার ভাগ্যে আসিয়া ফুটিল ! চিরজীবন যে বিছুটির

বিষ এবং অগ্নিদাহের জ্বালা লইয়া আমার দিন কাটাইতে হইবে, তাহা কি তখন জানি ? আজ প্রত্নতাত্ত্বিকে দেশ ছাইয়া গিয়াছে, কত পুরাতন শিলালিপি, কত তাম্রশাসন, কত যুগ যুগান্তের প্রস্তরফলক অনাগ্রাসে পাঠ এবং তাহার অর্থ সংগ্রহ হইয়া গাইতেছে, কিন্তু আজ পণ্ডিত এমন প্রত্নতাত্ত্বিক কেহ হন নাই, যিনি নটীবাসরে ললাটফলকে লিপিত বিধাতার অদৃষ্ট-শাসনের অক্ষয়লিপি পাঠ করিয়া তার অর্থ উদ্ধার করিয়া দিতে পারেন, পারিলে অনেক স্বার্থ আশার হৃৎসহ হৃৎপের হাত হইতে অনেক চতুভাণ্ডা হস্ত উদ্ধার পাইয়া গাইত। থাক সে কথা এখন । বেত, বিছুটি হস্ত করিয়া, বেতন দিয়া, গুরুবহাশ্রমের মন রক্ষা করিবার নানা উপায় উদ্ভাবন করিয়া আশীর বিজ্ঞানিকার উত্তমেনু পঞ্চ দিনগুলি জোনকপে চলিতেছিল, ইতিমধ্যে আমার ভাগ্যে আর এক অভাবনীয় ঘটনা ঘটিল ।

আমাদের দেশ মাল্লেরিয়া-প্রধান, মাসে তিনবার জর ত বাধা কথা, বর্ষার দিনে তারও বেশীবার লোকের জর হয় ; লজ্জন প্রভৃতি রক্তসান্নিধ্য কাহারই আর কষ্টকর মনে হয় না, কারণ মাসে বহুদিন লজ্জনাবস্থায় থাকিয়া অনাচারের রেশ সকলেরই একরূপ গা-সহা হইয়া গাইত ।

দেশব্যাপী মাল্লেরিয়া জরের হাত হইতে আমিও উদ্ধার পাই নাই ; মাদের মধ্যে পনের দিন প্রায় বিছানায় পড়িয়া থাকিতাম । দীর্ঘকাল এইরূপ মাল্লেরিয়ায় ভুগিয়া আমার হুই পায়ে বাতে ধরিল, বসিলে উঠিতে পারি না, এবং ঠাড়াইলে তাড়াতাড়ি বসা আমার পক্ষে ভয়ানক কষ্টকর হইত । মা আমার এ নূতন ব্যাধির সূচনা আমার চলা ফেরা দেখিয়া কতকটা অশ্রুমান করিয়াছিলেন, কিন্তু আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে আমি স্বীকার করিতাম না, পাছে আমাদের গৃহচিকিৎসক ঈশ্বরচন্দ্র কবিরাজ মহাশয় আবার লজ্জনের ব্যবস্থা করেন, কিংবা খেলাধুলা বন্ধ করিয়া দিয়া আমার শরীর আশ্রয় লইতে বলেন । স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করিয়া মাতা যখন আমার নিকট সত্য উত্তর পাইলেন না, তখন তিনি একদিন আমার সমস্ত খেলার সঙ্গীদগকে ডাকিয়া তাঁহার সম্মুখে এমন একটা খেলা করিতে আদেশ দিলেন যাহাতে প্রত্যেক বালককেই তাড়াতাড়ি বারংবার উঠা-বসা করিতে হয় ; আমি তখন প্রমাদ গণিলাম ! কি করি, উপায়ান্তর না দেখিয়া ঐ খেলাতেই সন্তুষ্ট হইলাম, বুঝিলাম, শয্যা ও স্তম্ভ অনুভব ইহার পথ আর আমার রহিল না । পায়ের সমস্ত গিরায় গিরায় যাহার বাতের বেদনা, সে উঠা-বসা করিবে কেমন করিয়া ; হুই একবার চোঁটা করিয়া বসিয়া পড়িলাম, আর আমার উগানশক্তি রহিল নী ।—মা সবই বুঝিলেন, হুই চক্ষু দিয়া তাঁহার অশ্রু

গড়াইয়া পড়িতে লাগিল । যে বলিক অধ হইয়া ছই বৎসর কাটাইল, আবার তাহাকে বাতবাধিতে বৃদ্ধি সমস্ত জীবন ভরিয়া পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয়, এট ভাবিয়া জননীরা মেহবিগলিত অন্তর বৃদ্ধি কাতর হইয়া পড়িয়াছিল । আমাকে কোলে করিয়া প্রাঙ্গন ছইতে বকে নিয়া গেলেন—সেইদিন যে বিজা-
নায় শুইলাম, একাদিক্রমে ছই বৎসর কাল আমার বিনা সাহায্যে পার্শ্ব পরিবর্তন করিবার সাধ্যও ছিল না। কবিরাজ মহাশয় ঔষধ, প্রলেপ, সৈক নানাবিধ বিধানে চিকিৎসা করিতে লাগিলেন ; আর, বাপা কিছুই যায় না, তার উপর পারের ওলফে প্রকাণ্ড ঘা হইয়া আমার যন্ত্রণার নাত্রা আরও বাড়াইয়া দিল । ঠিক সেই সময়ে আমার বড়দিদি অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন । তিনি আমার পিতামহীর নিঃশান্ত আদরের সামগ্ৰী ছিলেন, তাহার রোগ-মুক্তিকল্পে তখন সকলেই ব্যস্ত ; কেবল আমার মা এট ছরস্তু বাধিক্রিষ্ট, উপানুশক্তিরহিত, মরণপথযাত্রী সম্বন্ধকে প্রাণপণে বকে চাপিয়া জীহরিত চরণকমলের রূপাকণা ভিক্ষা করিতেন, আর তাহার অপত্যমেহসমুদিত পবিত্র অশ্রু এ হত-
ভাগ্যের নষ্টকে প্রতি হইয়া শাস্তিফলের ন্যায় আমার রোগ তাপ ক্রমে দূর করিয়া দিতে লাগিল । মাতার মেহানীকাদ এবং তাহার প্রতি দেবতার যে
রূপা ছিল সেই দৈবরূপার বলে* দেবার আনি রোগমুক্ত হইলাম । আমার প্রতি রূপা করিয়া দেবতা আমায় আরোগ্য দান করেন নাই জানি, কারণ দৈবরূপা লাভের বোগীতা আমার কিছুই ছিল না এবং নাই । দেবতার নিকট রূপাভিক্ষাশ্রোচনা জীবন ভরিয়াই করিতেছি, আমার দেবতা, আমার অদৃষ্ট বিধাতা, আমার অন্তরেণ চিরপ্রার্থনা পূরণ করিয়া আনায় কৃতার্থ ত করিলেন না ! এই স্বলীর্ণ জীবনপথে নিঃসঙ্গ-যাত্রার চঃসহ চঃখ দূর করিবার জন্য গলগদীকৃতবাসে অন্তর দেবতার চরণতলে সকাতরে বার বার বহু মিনতি করি-
লাম, দেবতার প্রদত্ত দৃষ্টিপাতে এট নিঃসঙ্গ, নিঃসঙ্গ, নিরাশ্রয় আজও ত কৃতার্থ হইতে পারিল না । আর যে সময় নাই, সনাগত-সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকারে আধিবাদিপূর্ণ জীর্ণ দেহমন যে দশায় লুপ্ত হইয়া পড়িয়াছে, অবশিষ্ট করটা দিনের জন্য চাত দরিয়া পণ দেখাইতে দেবতার রূপা আজও ত স্বর্ণ হইতে পারিল না ; কবে আর মানিবে ? অনেকদিন পূর্ণ একবার চপকীর্জন
ভবিয়াছিল, মধুকন্দন কাসের রচিত একটি গীতের প্রথম ছইটি পদ আমার বড় ভাল লাগিয়াছিল, উহা আমি মুখস্থ করিয়াছিলাম, আজ সেট ছইটি পদ বার বার আমার মনে আসিতেছে ; পদ ছইটি এট,—

“ব’লো তারে কারাগারে, আর ক’তদিন রইতে হবে,

সে দিনের আর ক’দিন বাকি, চিরদিন কি ভ্রমনি যাবে।”

রোগমুক্ত হইলাম বটে, তবে দীর্ঘদিন বাতে ভূগিবার জ্ঞান এবং বিজ্ঞানায় পড়িয়া থাকায় আমার দক্ষিণ পাখানি ঈর্ষা কুইয়া গেল এবং বাতের ক্ষত জ্ঞান চর্কল হওয়ায় দেহভার বহিতে অসমর্থ হইয়া পড়িল । দক্ষিণ চক্ষু আমার দুষ্টিহীন, দক্ষিণ পাখানিও শরীরের ভার বহন করিতে অক্ষম হইল । আমার সমগ্র পাঠক পাঠিকাগণ চিন্তা করিয়া দেখিবেন দ্বাদশ বর্ষীয় বালুক, জীবনের বহুবর্ষ যার সম্মুখে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়া আছে, সে এই অন্ধ-নয়ন ও থলপদ লুইয়া কেমন করিয়া জীবনপনের ঘোড়দৌড়ের বাজিতে দৌড়াইয়া মর্যাদার স্থান লাভ করিবে !

এই দুষ্টিহীন চলন্তজিবিহীন সন্তানকে নিয়ন্ত্রণে আবার বড় বিপদেই পড়িলেন । পিতামহীর জ্ঞানেশ বাতীত আমার চিকিৎসার কোনরূপ ভাল ব্যবস্থাই হইতে পারে না, কারণ পিতামহীই আত্মাদের বাড়ীর সর্বময়ী ক্রীড়া ছিলেন, তার উপরে তিনি আবার আমার মাতার ইষ্টদেবতা ; একে শাওড়ী গুরুজন, তাহার উপর তিনিই আবার আমার মার বৈতরিনী-পারের নৌকার কর্ণধার ; তার আদেশ, অভিপ্রায়, অভিমত না হইলে বাতার মিজের ইচ্ছায় কিছু করিবার সাধ্য ছিল না । আমার পিতামহী তখন আমার বড়দিদির পীড়া লইয়া নিতান্ত ব্যস্ত ছিলেন, অল্প কাহারও প্রতি মনোযোগ দিবার তাহার সময় ছিল না । বড়দিদি আমার পিতামহীর নয়নমণি স্বরূপ ছিলেন, সেই তাহার আনন্দস্থল রোগশয্যায় শুইয়া প্রতিদিন মৃত্যুর অপেক্ষা করিতেছে, সে সময় বুঝার অল্প কাহারও প্রতি দৃষ্টি দিবার কি সময় হয় ? দিদির চিকিৎসার অল্প বনামনা, প্রতিভাগ্রাণা, মুরশিরাবাদের গঙ্গাধর কবিরাজকে আনান হইয়াছিল । আমার মাতা এই সুযোগ বুঝিয়া অশেষ মিথ্যাত পূরক বৃদ্ধ গঙ্গাধরকে আমার রোগের কথা জ্ঞাপন করাইয়া চিকিৎসার ভার তাহাকে লইবার জন্য অতুরোধ করিলেন । বৃদ্ধ কবিরাজ বালকের চঃসহ চঃখে বোধ কমি দ্রবীভূত হইয়া গিয়াছিলেন । তিনি দুই প্রকার তেল ও কয়েক রকম ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন ; সেই ঔষধ সেবন ও তেল মালিশ করিতে করিতে প্রায় ছয় মাসে আমার পা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসিল, এবং ধীরে ধীরে যষ্টির উপর ভর দিয়া আমি দ্বিতীয়বার নূতন কুস্তিয়া পায় চলা শিক্ষা করিলাম । ক্ষতের চিহ্ন আজও আমার পায়ের আছে, দক্ষিণ পাখানি বোধ করি একটু খাটো হইয়াছে, যদিও সামান্য বলিয়া তাহা নোকেস দৃষ্টি তেমন আকর্ষণ করে না, তবে পা সধল হইয়াছে, এবং এক

সময়ে যে-বালক গতিশক্তিহীন পক্ষ হইয়া জীবন কাটাইবে তাবিয়া যেহমরী মাতা চিত্তায় অধীর হইয়াছিলেন, সেই বালক পরজীবনে ঐ পায়ের সাহায্যেই কুটবল, ক্রিকেট প্রভৃতি নানা প্রকার খেলায় বিশেষরূপ পারদর্শী হইয়াছিল এবং আজও তাহার রোগক্রিষ্ট এবং নানা কুরণে দুর্ব্বল দেহভার সেই পায়েই কোন মতে বহন করিতেছে ; কতদিন পারিবে, তাহা আমার দেবতারও যিনি দেবতা তিনিই জানেন ।

কিছুদিন পরে আমার বড়দিদির অকালমৃত্যু ঘটয়া গেল, সেই ঘটনায় আমাদের সমগ্র গৃহ শোকাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল ; আমার মা এবং পিতামহী দুর্ব্বল শোকভারে শয্যা আশ্রয় নিলেন, আমার প্রতি দৃষ্টি দিবার, আমার শিক্ষা দীক্ষার দিকে মনোযোগ করিবার কেহ ছিল না । আমাদের পরম হিতৈষী বৃদ্ধ দেওয়ান যাদবচন্দ্র মৈত্রেয় আমার অবিম্বল কামনায় আমাকে বিদেশে বিজ্ঞা-শিক্ষার জন্য পাঠাইতে সক্ষম করিয়া আমার মার নিকটে সে প্রস্তাব করিলেন ; সমস্ত শোকাভিকূতা জননী তাঁর সেই হৃৎসময়ে আমাকে নয়নস্তিরাল করিতে নিতীন্তই অনিচ্ছুক ছিলেন ; হয়ত তাঁর মনে হইয়াছিল যে, যে বালককে দ্বাদশ বৎসর বয়সের মধ্যেই একরূপ সমস্ত চরারোগী ব্যাধি জনা বৎসর বৎসর পরিয়া পরমুখাপেক্ষী হইয়া ও শয্যা পড়িয়া দিন কাটাতে হইয়াছে, না জানি ভবিষ্যতে তাঁর ভাগ্য আরও কত কি আছে । এমন চরদৃষ্ট বালকের শিক্ষা দীক্ষা বিশেষ কিছু হইবার কোন সম্ভাবনা তাঁহার মনে আসিল না, বরং ভাবিলেন হয়ত নির্ব্বাকব্রূণে, বেহীন অপরিচিতের মধ্যে, রেগিশযায় শুইয়া ব্যাধিক্রিষ্ট দীপ্তিহীন চক্ষু ‘একমাত্র বেহীলানু’ বার্থ অর্থমণে চতুর্দিকে তাকাইয়া হতাশাসের মধ্যে চিরদিনের জন্য মুগ্ধিত হইয়া পড়িবে—কাজ কি ইহাকে দূরে পাঠাইয়া ; কাজ কি ইহাকে কাছ ছাড়া করিয়া ; যাহা হইবার তাহা আমার বেহাকল তলেই হইয়া যাউক ।” বৃদ্ধ দেওয়ান মহাশয়ের নির্ব্বকাতিশয্যে মাতার সে সঙ্কল্প ত্রির পাকিতে পারিল না, বাগ্বেবস্তা সম্মানকে বিজ্ঞাশিক্ষার্থ বিদেশে পাঠাইবার মতি তাঁহাকে দিলেন । আমি ফাল্গুন মাসের এক বসন্ত-প্রভাতে দিবাপতিয়ার রাজা প্রমথনাথ রায় বাহাদুরের দ্বারা নূতন স্থাপিত রাজদাহী কলেজে বিজ্ঞা অর্জুনার্ণ মাতার চরণ বন্দুনা কুরিয়া বিদায় গ্রহণ করিলাম । জননীর স্নেহ-ব্যাকুল বৈঠনের মধ্য হইতে সেই যে বিদায়গ্রহণ করিলাম আর সে পরম প্রাণিত স্নেহতীর্থে তেমন করিয়া প্রবেশভাঙ করিতে জীবনে পারি নাই—সুস্তবতঃ সে মিতান্ত ক্লেশকর হৃৎথের জন্য আমিই দারী—সে ইতিহাস এ জীবন-কাহিনীর

যথাস্থানে বলিবার ইচ্ছা রহিল। আর এক বর্ষ-বৈচিত্র্যময় পুষ্পস্বর্ণা-সমাকুল বসন্তের দিব্যবসনের রক্তিমালোকের মধ্যে আর একটি পুষ্পপেলব জনদের সমগ্র মেহ জন্মজন্মীন্তের পূণ্যফলে নিঃশেষে পাইয়া এ চিরন্তনঃপরম ধনা হইয়াছে, একের দ্বারা তাহার বিশ্বত্ববন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে ; সে মাধুর্য্যময় পয়স পবিত্র দেহসান্নিধ্যের মধ্যে আমার কাণ্ড জীবনের অবশিষ্ট কয়টা দিন কাটিতে পারিবে কি না, আজ তাহা বলিবার কোন উপায় আমার নাই। শৈশবাবধি আজ পর্য্যন্ত কৃতকর্মের বিচিত্র দৃষ্টান্তসমূহ যাহা দেখিয়া আশ্চর্য্যিতছি, তাহাতে আশা করিবার ভরসা আর হয় না ; তবে আমার অদৃষ্ট বীহার দ্বারা নিয়মিত স্ত্রীর অঞ্চল করণার উপরে অটল বিশ্বাস স্থাপন করিয়া, তাহারই ইচ্ছিতের আদেশ মতকে বহন করিয়া পয়স্যায় অবশিষ্ট কয়টা দিন কোন মতে বুক দিয়া তেলিয়া ফেলা ব্যতীত উপায়হীনতায় আর কি গতি আছে ? অম্মনিশিধিনীর গাঢ় অন্ধ-কারের পর রাক্ষাসী যামিনীর জ্যোৎস্নাপ্রাবল, বর্ষগমন হৃদ্বিনের পর শরতের স্বর্ণাভ সন্ধ্যা নিসর্গের অঞ্চলনীয় নিয়ম ; কিন্তু অবস্থা বিশেষে সে সাধনাও বড় ক্ষুদ্র সাধনা ! হুঃসহ হুঃখে নয়নপথে যখন নদী বহিতে থাকে সে বেগের নিকটে সমস্ত বাধাই বলির বাধনের মত হইয়া চলিয়া যায় !

রাজসাহী কলেজিয়েট স্কুলের পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্তি হইলাম। যখন বাৎসর পীড়ায় ছই বৎসর কাল বিছানায় পড়িয়াছিলাম, তখন মা আমার কল্যাণকরে রামায়ণ, মহাভারত পড়িয়া আমায় শুনাইতেন, এবং আমাকে ও পড়িতে বলিতেন, তাহার বিশ্বাস ঈশ্বরবতার শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতির চরিত্রকথা পাঠে এবং শ্রবণে পাপ ক্ষয় হইয়া তাহার সন্তান রোগমুক্ত হইবে। আমিও আমার বালক মনের সবটুকু দিয়া সে কথা বিশ্বাস করিতাম এবং পরম আগ্রহে, পরম নিষ্ঠার সহিত, ঐ সকল গ্রন্থ প্রায় দিবারাত্রই পাঠ করিতাম। সেই পাঠের ফলেই রোগমুক্ত হইল কি না জানি না, তবে আমি ঐ বয়সেই রামায়ণ, মহাভারতের গম্ভীর সব শিখিয়া নিলাম এবং আমার সমগ্র জীবন সতীর্থগণ বাসনাভাসা গতটা জ্ঞানিত আমার তদপেক্ষা কিছু জ্ঞান বেশী হইয়াছিল বলিয়া আমার বিশ্বাস, অন্ততঃ পক্ষে অনেকগুলি শব্দ শিক্ষা করিয়াছিলাম যাহা রচনা দি লিখিবার সময়ে কাজে আসিত এবং যাহার বলে পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট হইতে সাপ্তাহিক পরীক্ষার অধিক নম্বর পাইয়া পাস হইয়া গরু করিবার সুযোগ দিত।

রাজসাহী যাইবার পর মালেরিয়ায় রোগ হইতে রক্ষা পাইলাম। প্রীতা, পাণ্ডু প্রভৃতি গোপাঙ্গাণ্ড হরণ দেখে শোণিত সঞ্চয়ের গন্ধগ দেখা দিল এবং

বিজ্ঞানবিশেষের নূতন সহপাঠী সখাদিগের সঙ্গে হাত, কোড়াক, জীড়া, পাঠ ইত্যাদিতে সময় আবার বেশ কটতে লাগিল । সহপাঠীদিগের অনেকেরই আমি প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিয়াছিলাম, খেলাধুলার উত্তোগ অহুঠানে আমি বিশেষ ক্রীড়ী, পল্লী-নিকিতনে প্রতিপালিত হওয়ায় বৃক্ষ, লতা, জল, স্থলের সঙ্গে আমার পরিচয় কিন্তু ঘনিষ্ঠতর ছিল, সহস্রবর্ষিক বালকদিগের ঘত আমি নিত্য নিরুপায় ছিলাম না ; এই সকল কারণে আমি ঐকরূপ 'সর্দার' হইয়া গোলবের মধ্যেই দিন কাটাইতাম ।

পাঠশালায় অশন বসনের ক্রম ছিল না, একথা বলিতে পারি না, রাজপুত্রের মত দিন কাটাইবার অর্থ বাড়ী হইতে আমাকে দেওয়া হইত না, মধ্যাহ্ন লোকেই সন্তান যেক্রপভাবে পাঠ্যাবস্থায় জীবন অতিবাহিত করে, আমার ক্ষণও প্রায় তরুণ ব্যবস্থাই ছিল । তাহার ফলে শরীর আশ্রয় কষ্টসহিষ্ণু হইয়া পড়িয়াছে ; অনশন, অর্ধাশন, শীত, গ্রীষ্ম, রৌদ্র, জল, ঝড়, ঝড়, বজ্র, বিদ্যুৎ আমার আত্ম বিজীবিলা দেখাইতে পারে না । যে বাড়ীতে আমি বাস করিতাম তাহা একটা ছাত্রনিবাসের মত ছিল, সেখানে আরও অনেক বালক বাস করিত, তাহাদিগের সহিত বাল্যজীবনের সুখ দুঃখ সমান্যে ভাগ করিয়া ভোগ করিতাম, তাহাতে আমার দারিদ্র্যের অভিজ্ঞতাও প্রচুর জন্মিয়াছে । আমি নিজে দরিদ্রের সন্তান, আমার যে বংশে জন্ম হইয়াছিল সে বংশ যে কতকাল গরিয়া গিয়া তাহা কুলজের কুলশাস্ত্রও বোধ করি বলিতে পারে না । বংশপঞ্জ্যরাক্ষত দারিদ্র্যের দোষ ও আমার রক্তের সঙ্গে শিরায় শিরায় বহিতেছে—তাহার দেখে মনে আমি দরিদ্রেরই একজন ; রাজকীয় আহার, আচার আমার আফিসের চোগা চাপকানকে মত, প্রয়োজনের সময়ে উহা পরিয়া লই ; প্রয়োজন সাঙ্গ হইয়া গেলে আমি যে ব্রজনাথ সেই ব্রজনাথ । জগদিস্র আমি নই, উল আনার সংজ্ঞা মাত্র—বিনি সংজ্ঞা লইয়া সুখী তিনি সংজ্ঞাহুখে মহেশ্র, দেবেশ্র, স্বরেশ্র, জগদিস্র বাহী টেকা তালাই হউন, আমি ব্রজনাথ থাকিয়াই চক্ৰ ঘূর্ণিতে পারিলে এবারের মত বাচিয়া যাই ।

(ক্রমশঃ)

ঐজগদিস্রনাথ রায়

জীবনের মূল্য ।

—:~:—

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

অগ্নদর্শন—ভাণ্ডার্য্যবিষয়ক ।

“দাদা—দাদা—ভট্টাচার্য্য দাদা—”

চৈত্রমাস, সেইমাত্র ভোর চইয়াছে । গ্রিবেণী, ভট্টাচার্য্য পাড়ার কোনও গৃহের বহির্দ্বারে দাঁড়াইয়া একজন প্রৌঢ়বয়স্ক ভদ্রলোক উক্ত প্রকারে ডাক্তাডাকি করিতে লাগিলেন । ভোর বেলাটা এখনও একটু শীত শীত করে—শোকটির গায়ে একখানি স্বাসামি শিকের মোটা চাদর জড়ান রহিয়াছে । ইহাবু দেহখানি কিঞ্চিৎ স্থল ও কৃষ্ণবর্ণ, আকৃতি খর্ব্ব, মস্তকের সমুপভাগে টাকপড়া, পশ্চাতে একটি সুপুষ্ট শিখা ঐতিবন্ধ অবস্থায় চলিতেছে । পরিধানে থান ধুতি, পায়ে চট্‌জুতা ।

“ভট্টাচার্য্য দাদা—ও ভট্টাচার্য্য দাদা—” বলিয়া লোকটি বন্ধদ্বারে সঘন কর-সম্বাডন করিতে লাগিলেন ।

ভিতরী চইতে শব্দ আসিল—“কে - ওঁ ?”

“আমি গিরিশ ।”

ভিতর চইতে আবার শব্দ আসিল—“আজ্ঞা ।”

কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই দ্বারটি খুলিয়া গেল । বৃদ্ধ ভট্টাচার্য্য মহালয় কোঁচায় টেপ গায়ে দিয়া নয়পনে বাহির হইলেন । বলিলেন—“গিরিশ তুমি—এস এস । এত ভোরে কি মনে করে চে ?”

আগন্তুক নতদেহে ভট্টাচার্য্যের পদধূলি গ্রহণ করিয়া বলিলেন—“একটা বিশেষ কথা আছে ।”

ভট্টাচার্য্য দেখিলেন, আগন্তুকের মুখে চক্ষে কেমন ঘেন একটা বিহ্বলতার ভাব । শঙ্কিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—“বাড়ীর সব মঙ্গল ত ? কলুকাভায় ছেলেরা ভাল আছে ?”

“আজ্ঞে সে সমস্তই মঙ্গল । বৈঠকখানা খুলুন ।”

“চাবিটে নিয়ে আসি ।”—বলিয়া ভট্টাচার্য্য ভিতরে চলিয়া গেলেন । অন্নকণ পরেই একজন ভূতা আসিয়া বৈঠকখানা খুলিয়া দিল । বলিল—“ঠাকুরমশাই এলেন বলে ।” আগন্তুক, বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়া, জানালাখলা খুলিয়া দিয়া, তক্তপোলের উপরে বসিলেন ।

হইবার নাম গিরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—পুরুষাভূতনে ত্রিবেণী গ্রামে বাস করিতেছেন। বয়স এখন পরিতাম্ভ বৎসর। কিকিৎ জমিদারী আছে—টাকা কর্ত্ত দিবার ব্যবসায়ও করিয়া থাকেন। গ্রামের মধ্যে ইনি একজন সম্পন্ন ব্যক্তি। একে একে দুইবার সংসার করিয়াছিলেন। প্রথম পক্ষের স্ত্রী দুইটি শিশুপুত্র রাখিয়া ভবদ্রাধ পরিত্যাগ করেন। * ছেলে দুইটি এখন বড় হইয়াছে, কলিকাতায় থাকিয়া কলেক্টে পড়িতেছে। দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী, দুইটি ছোট ছোট মেয়ে রাখিয়া অল্প প্রাক্ক এক বৎসর হইল গত হইয়াছেন। গৃহে গিরিশচন্দ্রের পিনিমিত্ত আছে—আর কৈছ নাই—তিনিই কহা দুইটিকে লালনপালন করিতেছেন।

অল্পকণ পরেই ভট্টাচার্য্য মহাশয় বাহির হইয়া আসিলেন। তিনি ইতিমধ্যে মুখ চক্ষু ধোত করিয়াছেন, একটি পিরিহান গায়ে দিয়াছেন। হাতে হুক—কলিকা দিয়া হুঁ নির্গত হইতেছে। ত্রুপোষের উপর মুখোপাধ্যায়ের নিকট বসিয়া বলিলেন—“তারপর, ব্যাপার কি বল দেখি?”—বলিয়া তিনি হুক টানিতে আরম্ভ করিলেন।

মুখোপাধ্যায় বলিলেন—“আচ্ছা ভট্টাচার্য্য দাদা, আনরা যে সকল স্বপ্ন দেখি, সেগুলো কি? আজকালকি কৈভাবে যে লেগে অলীক কল্পনা মাত্র—তাই কি ঠিক?”

ভট্টাচার্য্য ভাবিলেন নিশ্চয়ই এ ব্যক্তি কোনও প্রঃস্বপ্ন দর্শন করিয়াছে—একটা শাস্ত্রার্থ্য্য করাইতে চাইবে। বলিলেন—“কেপেছ? স্বপ্ন অলীক কল্পনামাত্র বৈকি! একবার আমাদের শাস্ত্রগুলো গুলে দেখ দেখি। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণে বড় বড় করেকটা স্বপ্নদর্শন অধ্যায় রয়েছে। তা ছাড়া তোমার গিয়ে দেবীপুরাণে রয়েছে—নবস্তপুরাণে রয়েছে;—বলেই হল অমনি, স্বপ্ন অলীক কল্পনা মাত্র? ও সব পুষ্টানী মত।”—যথায় ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের ক্রয়গুল কুঞ্চিত হইয়া রহিল।

মুখোপাধ্যায় মীরবে চিন্তা করিতে লাগিলেন।

ভট্টাচার্য্য আপন মনেই ধূমপান করিয়া যাইতে লাগিলেন। ক্রিয়ৎক্ষণ পরে হুকটি গিরিশের হাতে দিয়া বলিলেন—“কেন, কিছু স্বপ্ন টপ দেবেছ নাকি?”

মুখোপাধ্যায় হুকটর গোলের ছিদ্রপথে একটি সুদীর্ঘ কুংকার প্রেরণ করিলেন, তাহার পর সে স্থানটাই হস্তদ্বারঃ মার্জন করিয়া, ধূমপান করিতে লাগিলেন।

ভট্টাচার্য্য বলিলেন—“কোনও প্রঃস্বপ্ন দেখে থাকি যদি, তার জন্তে আর চিন্তা

কি ? শাজে বিধান আছে, উপযুক্ত শাস্তিকার্য্য করালেই সব দোষ সব অমঙ্গল থগে যাবে ।”

হুকী নামাইয়া মুখোপাধায় বলিলেন—“ভট্টাচার্য্য দাদা, একটা বড় আশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখেছি ।”

“কি স্বপ্ন ?”

“বাবুপাড়ার জগদীশ বাড়ুঘোর মেয়ে প্রভাবতীকে দেখেছেন কি ? বছর তেরো চৌদ্দ বয়স ?”

ভট্টাচার্য্য বলিলেন—“কে, পটলি ? হ্যাঁ, দেখেছি বৈকি । মেদিনীও ত জগদীশ আমায় বলছিল, ভট্টাচার্য্য মশাই, আপনি পাঁচ জায়গায় যান, আমার পটলি বড় হয়েছে, উঠল, ওর সঙ্গে একটা পাত্রের গুঁজে দিন ।”

গিরিশ আগ্রহের সহিত বলিলেন—“দাদা, তবে আমারই সঙ্গে মেয়েটির সাক্ষাৎ করে দিন ।”

এ কথা শুনিয়া ভট্টাচার্য্য সকৌতুকে গিরিশের মুখের পানে কয়েক মুহূর্ত চাহিয়া রহিলেন । শেষে বলিলেন—“তুমি আবার সংসার করবে ?—উবে গে শুনেছিলাম—”

গিরিশ বলিলেন—“সাত পাঁচ ভেবেই প্রথমে ইতস্ততঃ করেছিলাম । প্রথমবার যখন গৃহশূন্য হলাম তখন ছেলে ছটি অতি শিশু । আমারও তখন বাস অল্প । দ্বিতীয় পক্ষে বিয়ে করে আনলাম, তিনি ছেলে ছটিকে মাছুষ করতে লাগলেন, বেশ মানিয়ে গেল, কোনও গোলা হল না । কিন্তু এবার, ছেলে ছটি দরুন বড় হয়েছে । আজ বাণে কাল তাদেরই বিয়ে দিতে হবে । তাদের ছেলে পিলে হবে । এ সময় যদি আবার বিবাহ করি তবে হয়ত সংসারে একটা অশান্তি উপস্থিত হতে পারে । তাই বিবাহ আর না করাই স্থির করেছিলাম ।”

“কি স্বপ্ন ?”

“শেষরাত্রের দিকে স্বপ্ন দেখলাম যেন আমার প্রথম পক্ষের স্ত্রী—নরেন্দ্রের গর্ভধারিণী—এসে বিছানার পাশে বসলেন । আমার চুলগুলির মধ্যে আঙ্গুল ঢালাতে ঢালাতে বলেন—‘আজও আমি তোমায় ভালতে পারিনি, তাই আবার এসেছি । আমিই জগদীশ বাড়ুঘোর মেয়ে প্রভাবতী হয়ে জন্মেছি । সে বাদ্রে আমার কোনও সাধুই মেটেনি । আমার আবার তুমি বিয়ে কর—আমি এসে নরেন্দ্রের বউ নিয়ে ঘরকরা করি ।’—বলেই অসুস্থকান হয়ে গেলেন ।”

• গির্জাশেতর কণ্ঠস্থরে, তাঁহার মুখচক্ষুর ভাবে, এমন একটা সারল্য ফুটিয়া উঠিল যে, এ সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মনে স্থান পাইল না । তাঁহার দেহ যেন রোমান্থিত হইয়া উঠিল । বলিলেন—“আঁা ? বল কি হে ?”

“আজ্ঞে হাঁ ।”

উভয়েই নিঃশব্দ । • কিছুক্ষণ পরে ভট্টাচার্য্য বলিলেন—“আশ্চর্য্য ত !”

গিরিশ উৎসাহের সঙ্কিত বলিতে লাগিলেন—“আশ্চর্য্য নয় ? হিসেব করে দেখুন, ঠিক পনেরো বৎসর হল নরেন সুরেনের গর্ভধারণী গত হয়েছেন । ঠিক তার বছর-খানেক পরেই প্রভাবতী জন্মগ্রহণ করেছে ।”

ভট্টাচার্য্য বলিলেন—“দেখি পাড়াও । যে বছর আমি বৃন্দাবন গিয়েছিলাম, সেই বছরই তোমার স্ত্রী মারা যান । তুমি তখন শোকে বড় কাতর, তুমিও আমার সঙ্গে বৃন্দাবন যেতে চেয়েছিলে । কিন্তু কি একটা কারণে তোমার গাওয়া হল না ।”

“পিসিমামু ব্যারাম হয়েছিল ।”

• “তাঁ হবে । আমি বৃন্দাবন গিয়েছিলাম কোন্ বৎসর ?”—বলিয়া, মনে মনে হিসাব করিতে করিতে ভট্টাচার্য্য মহাশয় অঙ্গুলি গণনা করিতে লাগিলেন । শেষে বলিলেন—“ঠিক ত । ঠিক পনেরো বছর’ হয়েছে । তার পর, তোমার প্রভাবতী হল কবে ? এগারো মাস আমি বৃন্দাবন ছিলাম—একমাস কানীতে—বাড়ী ফিরে শুশ্রূষা-অগদীশের দ্বীর স্বীতিকার বামো হয়েছে—আমার কাছে কলপড়া নিয়ে যেত । সেই বারই প্রভাবতী জন্মেছে । ভায়া, তোমার হিসাবে ত গোল হয় নি—ঠিকই বলেছি ।—আশ্চর্য্য !”—বলিয়া চিবুকে অঙ্গুলি দিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় বসিয়া রহিলেন ।

• গিরিশ ধীরে ধীরে আরম্ভ করিলেন—“আরও একটা আশ্চর্য্য ঘটনা দেখুন, পুঁটু বৃতির গর্ভধারণী প্রায় একবৎসর কাল গত হয়েছেন ত ? এর মধ্যে কতদিন পিসিমা আমায় বলেছেন—‘বাবা, আমি বড়ো হয়েছি, কবে আছি কবে নেই, তুমি আমার বিয়ে করে সংসারী হও ।’—আমি বলেছি—‘পিসিমা, এ বয়সে আর কেন ? নরেন সুরেন তোমার আশীর্বাদে বেঁচে থাকুক—আমায় আর বিয়ে করতে বোলোনা ।’—পিসি মা বলেছেন—‘আমার মাথার যত চুল, নরেন সুরেনের তত পেরুমাই হোক—কিন্তু বাবা একবছর ছবছর পরে ওদের বিয়ে দিতে হবে ত ? তখন যদি আমি না, পাকি, বউ চুটকে দেখবে, শুনবে, কে ? একটি ডাগর দেখে মেয়ে বিয়ে কর, তোমার সংসার বজায় হোক ।’—পিসিমা

কত করে বলেছেন, কিন্তু তখন তাঁর কথা আমি কাণেই তুলিনি । পঞ্চদিন, বুকেছেন দাদা, বেলা নটার সময় গল্পাখান করে বাবুপাকার মধ্যে দিয়ে ফিরছি, দেখি ঐ প্রভা তাদের বাড়ীর সাননের বেড়াঘেরা বাগানটিতে, একটি ডালা হাতে করে পাতিনেবু পেড়ে বেড়াচ্ছে । অনেক দিন দেখিনি—বেশ ডাগরটি হয়েছে দেপলাম । একখানি কোকিলপেড়ে শাড়ী পরে রয়েছে । রান করেছে—ভিজে চুলগুলি এলিয়ে পিঠের উপর ঝলছে । তারকে দেখেই বুটায় কি রুকম পিসিমার কথাটা আমার মনে পড়ে গেল । ‘এই ত একটি বেশ ডাগর মেয়ে রয়েছে, একে যদি গরে আমি তা হলে বোধ হয় পিসিমা খুসী হন’—এই রকম ভাবতে ভাবতে বাড়ী এলাম । ভোমার কাছে লুকাবনা তটুচাণ দাদা, সম্রাদিনটে মনটার ভিতর কেমন আঁচড় পাঁচড় করতে লাগল । আমি বরং মনে মনে একটু লজ্জিতই হয়েছিলুম—ভাবছিলাম, বুড়া বয়সে এ আবার কি রোগে ধরল ? খালি তাকে মনে পড়ে, খালি তাকে মনে পড়ে । তার পর, ভোর রাতে ঐ স্বপ্ন । এখন না বুঝছি দাদা—হটায় কেন মনটা আমার ও রকম হয়ে গিয়েছিল । নরেন্দ্র স্বপ্নের গর্ভধারিণীই যে প্রভাবতী হয়ে জন্মেছেন তা কি তখন জানি ?”

ভট্টাচার্য্য মহাশয় নিম্নরূপ ভাবে বসিয়া গিরিশের এ কাহিনী শুনিতেছিলেন । শেষ হইলেও কিয়ৎকণ সেই ভাবেই বসিয়া রহিলেন ।

অরুণ অপেক্ষা করিয়া গিরিশ বলিলেন—“এ অস্বাভাবিক এখন আপনি কি পরামর্শ দেন ?”

ভট্টাচার্য্য বলিলেন—“স্বপ্নতত্ত্ব বড় গূঢ়তত্ত্ব । একটু শ্রদ্ধা আমার মনে পড়তে গেল—দেখি পাড়াও ।”—বলিয়া তিনি উঠিলেন, অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

শাস্ত্রব্যাখ্যা ।

এতক্ষণে বেশ ফর্সা হইল । রোদ্র উঠিতে আর বিলম্ব নাই । রাত্রার ধারেই এই বৈঠকখানা—খোলা জানালা দিয়া গিরিশচন্দ্র পল্লের পানে চাহিয়া রহিলেন । মাঝে মাঝে এক আধজন লোক সে পথ দিয়া যাইতেছে । একজন রাখাল-বালক ছইট গুরু তাড়াইতে তাড়াইতে গাছিয়া গেল—

বউরে, মনে পড়ে রে-এ-এ

তোমার আশ্রয় মাথা পা ছাখানি

বউরে-এ-এ—

পথচারী কে একজন বলিল—“হতভাগা ছেলে !”

হাতিমদো ভট্টাচার্য্য মহাশয় ফিরিয়া আসিলেন । তাঁহার বামকক্ষতলে একখানি পুস্তকদক্ষিণ হস্তে ধরিয়া । প্রবেশ করিয়া গিরিশের হস্তে ছ'কাটি দিয়া বলিলেন—“ধরাও ১৫’ —নিজের তক্তপোষের উপর বসিয়া, পিরিহাণের পকেট হইতে চশমাখানি বাহির করিয়া চোখে পরিলেন । বহির্পানির পাতা উন্টাইতে উন্টাইতে ক্রমে একটা স্থানে দৃষ্টিবদ্ধ করিয়া রহিলেন ।

গিরিশ তামাক খাইতে খাইতে সোৎসুক নয়নে ভট্টাচার্য্যের কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন ।

কিয়ৎক্ষণ পরে ভট্টাচার্য্য উত্তেজিত স্বরে বলিয়া উঠিলেন—“আচ্ছা, স্বপ্নটি দেখবার কতক্ষণ পরে তুমি জেগেছ বল দেখি ?”

“প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই । তিনিও অন্তর্দান হলেন আমিও ছেগে উঠলাম । তার পর মূর্থ হাত ধুতে যা দেবী । তার পরই আপনার কাছে এসেছি ।”

ভট্টাচার্য্য মহাশয় কিয়ৎক্ষণ বসিয়া ভাবিলেন, শেষে সুখখানি অত্যন্ত গভীর করিয়া বলিলেন—“গিরিশ—তুমি প্রতিশ্রুত হওণ”

“কি প্রতিশ্রুত হব ?”

“প্রতিশ্রুত হও যে, যদি আমি তোমার এ বিবাহ বটাত্তে পারি—আমায় তুমি ভুলবে না ।”

ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের স্বর কাপিতেছিল । তাঁহার ভাব ভঙ্গি দেখিয়া গিরিশ আশ্চর্য্য বোধ করিলেন ; বলিলেন—“কেমন দাদা, ও কথা কেন বলছেন ? আপনাকে ভুলবে কেন ? আপনার সঙ্গে এতকালের বন্ধুত্ব, আপনাকে হঠাৎ ভুলে যাব কেমন করে ?—বিয়ে হোক আর নাই হোক ।”

ভট্টাচার্য্য বলিলেন—“সে ভোলায় কথা বলছিলেন গিরিশ । যদি এ বিবাহ আমি দেওয়াতে পারি, আর তার ফলটি যদি শুভ হয়, তুমি সে উপকার বিস্মরণ হবে না বল ? আমাকেই এ বিবাহের মূলত্ব জেনে, স্বধামাধ্য আমার উপকার করবে ?”

একথা শুনিয়া গিরিশের মুখ দশহাত হইল । ভাবিলেন, একরূপ বিবাহে নিশ্চয়ই খুব শুভফল শাস্ত্রে লেখা আছে । বলিলেন—“আচ্ছা ভট্টাচার্য্য-দাদা, আমি প্রতিশ্রুত হচ্ছি—আপনাকে ভুলব না ।”

ভট্টাচার্য্য গভীর ভাবে বলিতে লাগিলেন—“কমলা যদি তোমার উপর সদয় হন—সদয় ত আছেনই, যদি আরও সদয় হন, এর চেয়ে দ্বিগুণ বিশুদ্ধ পকাশ-
গুণ সদয় হন—তা হলে তুমি আমাকে দারিদ্র্য থেকে উদ্ধার করবে প্রতিশ্রুত
হও ।”

গিরিশের মাথা ঘুরিতে লাগিল। ইহার অগ্নোক্ষা দম্পত্য, দ্বিগুণ, পকাশ
গুণ !—ব্যাপারখানা কি, তাহাই তিনি ভাবিতে লাগিলেন ।

ভট্টাচার্য্য অসহিষ্ণুভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—“কি বল ?”

গিরিশ সাবধানতা অবলম্বন করিয়া, নিজেকে নির্দিষ্টভাবে বাগবন্ধন করিয়া
বলিলেন—“দাদা, আপনি যৎ রকম বলছেন, যদি আমার উপর কমবার সেই
রকম শুভদৃষ্টিই হয়, তবে আপনার উপকার আমি কখনও বিশ্বস্ত হব না ।
এখন ব্যাপার কি, খুঁজে বুলুন ।”

ভট্টাচার্য্য বলিলেন—“ব্যাপার গুরুতর । এ বিবাহ হলে তুমি রাজা হবে
গিরিশ !”

গিরিশ প্রায় লাফাইয়া উঠিয়া বলিলেন—“কি বলেন—রাজা হবে ?”

ভট্টাচার্য্য গভীর স্বরে বলিলেন—“রাজা হবে ।” তোমার অদৃষ্ট হুপ্রসন্ন ।”

“এই কথা শাস্ত্রে লেখা আছে ?”

“লেখা আছে ।”—ভট্টাচার্য্য মহাশয় হস্তগত বহিধানি আন্দোলিত করিতে
করিতে বলিলেন—“এখানি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ—বে স্মৃতি নয় । এতে কি
লেখা আছে শোন ।”—বলিয়া পাঠ করিলেন—

“দিব্যা স্ত্রী যৎপ্রবদতি মম স্বামী ভবান্ ভব ।

স্বপ্নে দৃষ্ট্বা চ জাগর্তি-স চ রাজা ভবেদ্ ব্রহ্ম ॥”

পাঠান্তে বহিধানি তিনি গিরিশের হস্তে দিলেন ।

গিরিশ, বহিধানি হস্তে করিয়া, চক্ষু হইতে অনেক দূরে দেখানি ধরিয়া,
পড়িতে চেষ্টা করিলেন ।

ভট্টাচার্য্য নিজ চশমাখানি চক্ষু হইতে খুলিয়া গিরিশকে দিলেন । চশমা
চোখে দিয়া গিরিশ য়োকটি ছই তিনবার পাঠ করিলেন—কিঞ্চিৎ সংস্কৃত তিনি
জানিতেন । পাঠ শেষে বলিলেন—“এর মানেটি কি দাদা ?”

“এর মানে বুঝিতে পারলে না ? একন, বেশ ত স্পষ্ট । আচ্ছা ব্যাপার
করিতেছি ।”—বলিয়া ভট্টাচার্য্য সজোরে ছই টিপ নত গাইলেন । শেষে চশমাটি

চোখে দিয়া বহিখানি হাতে করিয়া বলিলেন—“দিব্ বলতে স্বর্গ বোঝায় । তার উত্তর দিগ্ প্রত্যয় করে হুল দিব্য ৭ দিব্য জী—কি না স্বর্গে গেছে এমন যে জী, যৎপ্রবদতি—যাকে বলে, মম স্বামী ভবান্ ভব—তুমি আমার স্বামী হও অর্থাৎ কি না আমার বিয়ে কর, এই রকম্ স্বপ্নে দৃষ্ট—স্বপ্ন দেখে, চ জাগতি—জাগে ওঠে, তাহলে ধ্রুব কি নু নিশ্চিতঃ সঃ রাজা তবেৎ—সে রাজা হবে । ইতি শ্রীপ্রবোধবর্ষ পুরাণে শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ডে স্বপ্নদর্শনোধ্যায় ।”

গিরিশ পুস্তকখানির জুহু হাত বাড়াইলেন । সেখানি লইয়া শ্লোকটি আবার পাঠ করিলেন । অল্পদিকে মুল করিয়া প্রায় এক মিনিট কাল ভাবিলেন । শেষে বলিলেন—“হ্যা ভট্টাচার্য দাদা, দিব্য জী মানে দেবকী নয় ত ?”

ভট্টাচার্য মাথা হুলাইয়া বলিলেন—“জী মানে কজা ?—কোণ্ঠাকীর টোলে পড়েছ তে ?—পাপাষা !”—বলিয়া হাসিতে লাগিলেন ।

মুখোপাধীয়েীর মাথা ঘুরিতে লাগিল । ঢোক গিলিয়া বলিলেন—“যা বলেছ, তা ঠিক হবে ত ভট্টাচার্য দাদা ?”

• ভট্টাচার্য দৃঢ়স্বরে বলিলেন—“হবে না ? হতেই হবে । পুঁথিখানা লিখেছে কে ? রানা নয় শ্রাদা নয় কেঁটা নয়—স্বপ্ন বেদব্যাস । এ কি আর মিথ্যা • হবার খোটি আছে তারা ? বেদব্যাসের কথা যে দিন মিথ্যা হবে সে দিন পৃথিবী উল্টে যাবে ।”

• অতঃপর হুইজনের মুখ্য অমিকক্ষণ ধীরে পরামর্শ হইল । ভট্টাচার্য মহাশয় প্রতিশ্রুত হইলেন অতাই তিনি জগদীশ বন্দোপাধীয়ের কাছে গিয়া কথাটা পাড়িবেন । গিরিশ ভক্তিভাবে তাহার পদধূলি গ্রহণান্তর বিদায় লইলেন ।

(ক্রমশঃ)

• শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

• মাসিক-সাহিত্য সমালোচনা ।

ভারতবর্ষ, আষাঢ়—

ভারতবর্ষের এ সংখ্যাটি সুদৃষ্ট । কাগজ ভাল, ছাপা ভাল, ছবিও—ভাল হোক, মূল্য হোক—সংখ্যায় অল্প নয় । • ছাফিয়ার কালিও তিন চারি রংয়ের । ছুরপা কতাকে বেশ-
• ত্বায় সম্বিস্ত করিয়া অনেক বন্ধকর্তাকে ঠকানো যায়, কিন্তু সাহিত্যের হাটে এ সব কাজ
• চলে না । আমরা সাহিত্যের একটু মূল্য হিসাব করিতে চাই, তাহার বেগুফার-প্রতি
• আমাদের দর্শনোপায় আকৃষ্ট হয় ঘটে, কিন্তু সে আকর্ষণের মূল্য সামান্য বলিয়াই আমরা

বিবেচনা করি। বঙ্গসাহিত্যকে যদি কেহ মনোরম বেশভূষায় সুজ্জিত করেন, তাহা হইলে বঙ্গবাসী নিশ্চয়ই আনন্দিত হইবেন, কিন্তু বেশভূষাই যদি একমুনি অংশবাসী বিপর্যয় হইয়া পড়ায় তাহা হইলে বড়ই দুঃখিত হইতে হয়। ভারতবর্ষের এ সংখ্যাগানি আত্মমাত্র পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিল। ইহার অবস্থা-ধোঁসন বেশভূষায় অসুখাটী হয় নাই। আমাদের দেশের বেশী লোকই সাহিত্য পড়ার চেয়ে সাহিত্য দেখিতে ভালবাসেন। তাঁহাদের মনস্তত্ত্ব সম্পাদন করিতে গেলে বাবসারে কৃতকার্য হওয়া যায়। দেশের কোন উপকার হয় বলিয়া মনে করি না। ভারতবর্ষের কর্তৃপক্ষেরা নিশ্চয়ই সাহিত্যকে, তত্ত্ব দৃষ্ট পদার্থ বলিয়াই ভাবেন না। এই সংখ্যাগানি তৃতীয়-বর্ষের অধ্যবসায় বলিয়া তাঁহারা ইহার বেশভূষায় বসটা মনোনিবেশ করিয়াছেন, ইহার অবস্থান নির্ধারণে তাহার অর্থে পূর্ণিষ্ঠ হইলে তাঁহাদের জমে অনর্থক বাঙলা খটত না।

ঐতিহাসিকের বন্ধোপাধায় "বক্তিমজ্জের আখ্যায়িকা" শীর্ষক গ্রন্থে বাঙালার "নভেল" কথাটির পরিবর্তে "আখ্যায়িকা" নাম প্রচলনের প্রস্তাব করিয়াছেন। "উপজ্ঞান" শব্দটি অপেক্ষা এ কথাটি গৃহীত হওয়া যে গুণিতগুণ সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। তবে কথার মূল অর্থ পরিয়া পিটার করিতে গেলে 'নভেল' ও 'আখ্যায়িকা'র অনেক প্রভেদ দৃষ্ট হয়। ইংরাজী ভাষার সহিত সংস্কৃত নাটকের পার্থক্য অনেক, কিন্তু 'ড্রামা' ও 'নাটক' এই দুই কথার অসুস্থিত অর্থ এক। স্তম্ভ কথ্য মাটেরই নাম নাটক দেখিয়া বাইতে পারে। 'বাংলায় 'নাটক' কথাটি এই অর্থবাস্তি লভে করিয়াই ইংরাজী 'ড্রামা'র প্রতি-শব্দরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। 'আখ্যায়িকা' শব্দটি সংস্কৃত; সংস্কৃত ভাষায় এই নামের সাহিত্য যথোচিত উন্নতিলাভ করে নাই। আজকাল সে'র নভেল রচিত হইতেছে, তাহা নৃতন, পুরাতন আখ্যায়িকার সহিত তাহার প্রভেদ প্রত্যক্ষ, যে সাদৃশ্যই আমাদের নজরে পড়ে না বসিলেও মজা কিসে হয় না। সেই প্রভেদ নভেলের পরিবর্তে 'আখ্যায়িকা' কথাটি জোর করিয়া ব্যবহার করিলে ভাল হইবে না। ললিতবায়ু যাহাছে জাতীয় আত্মসম্মান প্রকাশ পাইবে মনে করেন, তাহাই যদি জাতীয় গোড়ামি বা সংস্কৃতির পরিচয় দেয়, তাহা হইলে তাঁহারা ও আমাদের দুঃখের অবশিষ্ট থাকিলে না।

ঐশ্বর্যশর সাগর "বাক্তিম কি তিরঙ্গি" শীর্ষক গ্রন্থের দারপত্র শেষ অংশে সংক্ষেপে লিখিবদ্ধ হইয়াছে, আমরা তাহা উদ্ধৃত করিলাম— "বাক্তিম এক থাকিলেও সময় সময় মুনাবিক পরিবর্তিত হইতে পারে; এবং সময় সময় এক দেখে বাক্তিমই শ্রুত হইতে পারে। তখন মজা জীবনান্তর দেখে যেনে এটি হইয়া বিভিন্ন ব্যক্তির দ্বারা ব্যবহার করা সম্ভব হয়।" লেখকের বক্তব্য বিষয় অবশেষে আকারের তুলনায় অতি অল্প, তবুও ভাষাটি পুনরুক্তিবোধে দূরিত হয়। তবে ইহাতে আলোচনার জিহ্বাটি বড়ই সামান্য।

ঐশ্বর্যশর বাগ্‌টী একটি করণী প্রথমতঃ অসুখ্যাদ করিয়াছেন। প্রথমতঃ সুনির্বাচিত হইয়াছে। এক অল্প কেমন করিয়া এক অল্প রমণীকে ভালবাসিয়াছিল এবং রমণী দৃষ্টি-শক্তি লভ কল্পিত্য পর কেমন করিয়া তাহাকে তাগে করিয়া যায় তাহার বর্ণনা বেশ চিত্তাকর্ষক। সর্বত্র লেখকের বর্ণনাশক্তি, মনস্তত্ত্ববিদ্যে নিপুণতা ও শিল্পভাবের

অচিরে ঘাওয়া যায়। অস্থবোধ মন্দ হয় নাই। ভাষাটি হুল্লর, তবে হ্রস্বক আয়তায় ভাবটি ঠিক প্রকাশ পায় নাই যেমন,—“সজ্জ, বড় ঢোলকুটি ছিন্ন, আলোহীন, ভাবাহীন—সেই জীবনের কোন আচ্ছাদনে মাড়া দিতে জানে না”, “শাহাদেয় মুক্ত বাত্মস মাহুয়ের ক্ষমকে, ছোট ছোট ভাব থেকে মুক্ত করে দিয়েছে”—এমানের “জীবনে আচ্ছাদন” কথাটি হুস্মায়া, “ছোট ছোট ভাব” কথাটিও তাই।

ঐদেবপ্রবাদ সর্বাধিকারী “দুরোপে তিন মাস” এ সংখ্যায় বেশ উপভোধ্য হইয়াছে। লেখকের ভাষা সহজ, বিস্তৃত। কোথাও তিনি অগম্য, মন্তব্য প্রকাশ না করিয়া বিদেশীয় চিত্তশক্তি লক্ষ্যে অক্ষিপাছেন। প্রবন্ধের অনেক অংশ আশ্রয় অনেকের সহিত পাঠ করিয়াছি।

অজ্ঞাত প্রবন্ধের মধ্যে কতকগুলিতে কোন কোন কিনিষ্ট স্থানের বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে, কতকগুলিতে বিস্তারিত বিবরণের কথা আছে, কতকগুলি পূর্ণ, কখন কোন পাঠকের নিকট হয় তাহাদের আদর হইতে পারে।

ভারতবর্ষে চিত্রিত সংখ্যা অজ্ঞাত কাগজের চেয়ে বেশী আদ্যকাল ভবিষ্যৎ দিলে গ্রাহকসংখ্যা বাড়ি না, গ্রাহকসংখ্যা না বাড়িলে মাসিকের সমাক পরিচালনাও দুঃসংখ্যা। পাঠকেরা চিত্রিত কালবাসেন, তাঁহাদের মনস্তত্ত্ব সম্পাদন করিলে কাগজের অবস্থা ভাল হইবে, সেই অজ্ঞ চিত্রিত চাপিতে পার। তবে অনেকের মধ্যে চিন্তিতে পাঠ—গ্রাহকেরা ভবিষ্যৎ কি মন্দ তাঁহা গ্রাহ্য করেন না, যা তা ভবিষ্যৎ চাপিলেও কতি নাট, ভবিষ্যৎ সংখ্যা বেশী হইলে গ্রাহকের সংখ্যাও বৃদ্ধি হইবে। একজ্ঞ অর্থলিপ্সু ব্যবসাদারেরা বলিতে পারে, মাসিকপত্রের কর্তৃপক্ষের মধ্যে এ কথা মোটেই শোভা পায় না। আমাদের মনে হয়—চল ভবিষ্যৎ উচিত, শাহাদেয় উপলব্ধি নাই গ্রাহকদিগকে তাহাই লাভ করিয়া পরিভ্রম হইবার অবসর দেওয়া নিতান্ত অজ্ঞায়। তাঁহাদের কতি যাহাতে উন্নত হয়, তাহাতে চেষ্টা করাই মাসিকপত্রের কর্তৃপক্ষের একান্ত কর্তব্য। ভারতবর্ষে অনেক লেখকের ভবিষ্যৎ প্রকাশিত হইয়াছে, এই সব লেখকদের মধ্যে অনেকে হয়ত তাঁহাদের ভবিষ্যৎ প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া ভবিষ্যতে লজ্জিত বা দুঃখিত হইবেন। উপযুক্ত নীতিক্রমে সম্মান দান করিলে কতি নাট, বরং লাভ আছে, কিন্তু অস্থগুণ্য লোকের ভবিষ্যৎ প্রকাশ করিলে হিতে বিপরীত হইয়া পড়ায়। হয়ত ব্যবসায় দিক দিয়া ইচ্ছাতে কোন ভবিষ্যৎ বটিতে পারি, কিন্তু—সংস্কৃতি প্রচারের দ্য লোকশিক্ষার ভার লইয়া শুণ্য ব্যবসাদারের মত স্নানহার করিলে ধনী হওয়া যায়, দারিদ্র্যবোধের পরিচয় যে একটুও দেওয়া হয় না এ কথা আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি।

প্রবাসী, আবার—

“ঐতিহাসের ক্রম” ঐতিহ্যশ্রেণী নামের প্রবন্ধ। ঐতিহাসিক ইতিহাসের কথা অলোচনা করিতে বহিরা অক্ষমতার পরিচয় দেন নাই। প্রবন্ধটি উৎকল সাহিত্যসুমায়ে উড়িয়া ভাষায় গঠিত হইয়াছিল। কিন্তু ইহার অনেকগুলি কথা আমরা গত বর্ধমান সাহিত্য

সম্মিলনে ঐকমত্য সাধনের সুখে গুনিয়াছি।" গ্রন্থটির রচনারীতি ভাল বলিয়া বোধ হয় না। বিষয়ের নুতনত্ব ভাষার মাধুর্য্য কিংবা ভাবের সরল সহজ একাংশ চিত্তকে আকর্ষণ করে না।

ঐকালীএদের দামওস্তের "বাজারের দর ও বর্তমান সমস্তা" হুম্মর আলোচনা। এরূপ বর্তমান সমস্তার মীমাংসা করা বিশেষ আবশ্যক। এই সব আলোচনাতে দেশের জীবনী শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। আমাদের দুটি স্বত্বাভ্যন্তর নিকটেই দেখি, বর্তমানের কথাটা গুনিতে বা তাহার ভাবগতিক দেখিবার লক্ষ্য আমরা মোটেই উদ্ভাবন নই। সেই কারণেই আমরা বর্তমানে পথে পথে ঠকি, আর গুরু করি স্বত্বাভ্যন্তর। এমন শোচনীয় অবস্থায় এক সকল আলোচনা যে অত্যন্ত উপকারী সে বিষয়ের সন্দেহ নাই।

‘হারামনি’ হইতে একটি পান উদ্ধৃত করিবার লোচ সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

বাউলের পান

সেদিন জনম সেদিন আমি শীক্ষা পেয়েছি।

এক অক্ষরের মস্ত হয়েছি ভিক্ষা পেয়েছি।

শীক্ষা নিয়া চলে না যে একটি প্রাণের বাস

এই কথাতে গভীর আমার হয়েচে বিশ্বাস

আমি নীর পেয়েছি, ক্ষীর পেয়েছি পরাণ পেয়েছি।

তারি সাথে সাথে মাগের শীক্ষা পেয়েছি।

এই কথাগুলির ভিতর যে কি সরল অথচ গভীর ভাব নিহিত আছে তাহা বিশদ করিয়া লেখা দুঃসাধ্য। এই ছোট পানটির ভিতর বাজাজের প্রাণ, বাজাজের বর্ণভাব কয়েকটি সরল সহজ কথায় বড়ই মধুরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। একগুণ পান খুব অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়।

ঐকমত্যসাধন দস্ত কালের কবি মিস্ত্রালের কয়েকটি কবিতার অনুবাদ করিয়াছেন। কবিতায় ভুল আছে, তবে ভাল হুম্মররূপে একাংশ পাওয়া যায় না। কয়েকটি নূতন কথা উদ্ধৃত করি—

“আমরা শুনি নিশ্চুপের বসি”

“সময়-ঘোড়ার হান, চাবুক”

“তোমার পরশমধু মনের মিতা

কি যে বলিব কি তা?

বুঝি নিবিস বিভা”

উপরে ‘নিশ্চুপেরি’ কথাটি নূতন, ‘সময়-ঘোড়া’ রূপকটি নূতন; শেষের কথাগুলিও নূতন, কেননা তাহার অর্থ বোকা দায়। এই সব সাহিত্যের কত অংশ ভবিষ্যতে টিকিবে বলিতে পারি না। পরবর্তী যুগে যদি এই সাহিত্যের শুধু নূতনত্বটুকুই বাঁচিয়া থাকে ও পাঠকেরা তাহাকে অবলম্বন করিয়াই একটু বিক্ষুণ্ণ হাদি হাদিবার অবকাশ পায়, তাহা হইলে আমাদের যুগের অনেক লোকের বিপুল পরিশ্রমের ব্যর্থতায় আমাদের চক্ষু বেদনার অশ্রুতে ঝিকিই উঠিয়া উঠিবে।

ভারতী, আষাঢ়—

“ভারতবর্ষে অর্থনীতি-অধ্যয়ন” অধ্যাপক রাসেল ও সমাদারের রচিত । লেনকপণ অর্থনীতির আলোচনায় দুই প্রকার প্রতিবন্ধকের কথা বলিয়াছেন—(১) অর্থনীতি সংক্রান্ত ঘটনাবলীর জটিলতা (২) পক্ষপাতিত্ব দোষ । তাই পর কি উপায়ে কোন পথ বরিয়া অর্থনীতির আলোচনা ভরতবর্ষে করিতে পারা যায় তাহাও তাহার উল্লেখ করিয়াছেন । রচনাটিতে চিত্তাঙ্গীলতার বিশেষ পরিচয় নাই তবে বাহ্যিক ভাবে ভারতের অর্থনীতিসংক্রান্ত কথাগুলি আলোচনা করিতে চান, তাহীদের কেহ কেহ এ প্রসঙ্গ পাঠ করিয়া হৃদয় উপকার লাভ করিতে পারেন । দুই অধ্যায়ক একত্র হইয়া যাহা মিলিয়াছেন তাহা দেখিয়া মনে হয় এখানে লক্ষির অপচয় ঘটিয়াছে । লেনকপণ অল্পের জন্য অধিক ব্যয় করিয়া অর্থনীতির মিয়ম নিজেসাই জিজ্ঞাসাছেন ।

জীজ্ঞাসাভিরুদ্ধনাম ঠাকুরের “আধুনিক ভারত” পূর্বাঙ্গরূপি । ভারতীয় অজ্ঞাত প্রবন্ধে কিছু কিছু বৈচিত্র্য সংগ্রহ করা গিয়াছে বীর । উপভোগ্য কল্পিতার জিনিস অতি অল্প । ভারতী ভাষার নমুনা গাছ দেখাইতেছেন, তাহা আর কেহ দেখাইতে পারেন বলিয়া বোধ হয় না । কয়েকটি উদ্ধৃত করিলাম—

“সে উদ্ভাসী হয়ে চলে গেল,—যত ভেঁড়ে চলে গেল—কত অনান্য নদীর পারে পারে, কত অজানা দেশের পথে পথে—একা নির্ভয় ।”

“পাছে পাছে ছাওয়া করা পথ”

(নলিন্দ—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

“আমরা একপ বরিয়া লইতে পারি নে, ভারতবর্ষের অবস্থা এমন নিয়মবিরহিত যে, সাধারণ খতঃসিদ্ধ মুক্তিগুলির কোনই স্থান নাই এবং তৎক্ষণ্ণ অমাত্মনিক পদ্ধতিগুলিতেই আমরা সীমান্ত থাকি ।”

(অধ্যাপক রাসেল ও সমাদার)

“মুখের অত্যন্তকটি রেখা যেন উজ্জীর তিস্তের পড়ার স্থান, মনের পরলতা, সুস্থির তীক্ষ্ণতা, চরিত্রের দৃঢ়তা ডাকিয়া ডাকিয়া বলিয়া দিতেছিল ।”

(শ্রোতের ফুল—চাক্র বন্দ্যোপাধ্যায়)

“ভিতরটা তাহার অক্ষর সাগরে ডুবিয়া গেল ।”

“নবাবের প্রাণশাশা আশার উল্লাসে ন্যাতিয়া উঠিল ।”

(নবাব—জীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়)

“অগ্রভ দেখিল সম্প্রদায়ের চক্ষু কি নির্ভয়ভাবেই অজ্ঞের জঘনের অংগগুলিকে পরণ করিয়া থাকে ।”

(চয়ন—জীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ক্রোবর্তী)

এইরূপ উপাধরণের অভাব নাই । বিলাতী কাগজপত্রে এত ভাল দেখিতে পাওয়া যায় না । বাঙ্গালী মাসিকপত্রে এত ভাল কেন ? আমাদের বোধ হয় ভাষা না শিখিয়া লেখক হইবার সাধ নির্ভর । বাঙ্গালীরই অভাবসিদ্ধ ।

সবুজপত্র, আষাঢ়—

এখনেই জীবনীমুখ্য ঠাকুরের “কবির কৈফিয়ত”। লেখক বাহা এটার করিতে চান। তাহা এই অবস্থে পরিস্ফুট হইয়াছে। “জীবনের মধ্যে বাঁচবার একটা অম্বেষুক ইচ্ছা আছে। * * সেইটো আছে বলিয়া আমরা লড়াই করি, হুংগকে, মানিয়া লই। সমস্ত জোর অবরুদ্ধির শেষে একটা খুসি আছে—তবুও তবুও অগ্নি যাইবার জো নাই, দরকারও নাই। সতরঞ্চ পেলার আগাগোড়াই বেলা, —মানুষের দাবাঝড়ে ঢালাঢালি এবং মহাভাবনা। সেই হুং না থাকিলে পেলার কোন অর্থ থাকে না। অপরপক্ষে পেলার আনন্দ না থাকিলে হুংয়ের মত এমন নিদাক্ষণ বিনামূল্যে আর কিছুই নাই এখন সতরঞ্চ পেলাকে আমি যদি বলি পেলা আর তুমি যদি বল দাবাঝড়ের লড়াই তবে তুমি আমার চেয়ে কম বই বেশী বলিলে এমন কথা আমি মানিব না।” এইরূপে জীবনলীলা ও জীবন-সংগ্রামের স্তব্ধ অর্থ নির্দেশ করিয়া, লেখক এটা ও এতটা মতের সামঞ্জস্য বিধান করিয়াছেন। তিনি বলিতে চান বিজ্ঞানের সহিতও এতক মতের বিরোধ নাই। এই কথাটি একটি মূন্দর উদাহরণের দ্বারা নিবৃত্ত করা হইয়াছে।

“মাহুদের বিজ্ঞান বলিতেছে জগৎ জুড়িয়া অতঃপরমাণুতে লড়াই। কিন্তু আমরা সেই মুছের দিকে ভাকাইয়া দেখি সেই মুছন্যাপার ফুল হইয়া ফোটে, তাম্রা হইয়া অলে, নদী হইয়া চলে, মেঘ হইয়া ওড়ে। সমস্তটার দিকে সমগ্রভাবে যখন দেখি তখন দেখি জুমার ক্ষেত্রে হরের সঙ্গে হরের মিল, রেখার সঙ্গে রেখার যোগ, রঙের সঙ্গে রঙের মালা বদল। বিজ্ঞান সেই সমগ্র হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দলাদলি ঠেলাঠেলি হানাহানি দেখিতে পায়।”

লেখক আরও বলিয়াছেন “জগতে শক্তির লড়াইটাকেই আমরা করিয়া দেখা অবিচ্ছিন্ন দেখা, = আনন্দকে দেখাই সম্পূর্ণক, দেখা। * * * আনন্দই লেখক কখন বন্ধাই জগৎ হুং যখন সহিতে পারে। শুধু তাই নয়, হুংয়ের পরিমাণেই আনন্দের পরিমাণ * * * আনন্দকে স্বীকার করিলে হুংগকে বাদ দেওয়া হয় না।”

এটা শুধু তত্ত্বজ্ঞানের কথা নয়, সংসারের কাজেও ইহার দাম আছে। তবে “শক্তির সমগ্রতার ভারটা মাহুদের মধ্যে আসিয়া ডাকিয়া ছুরিয়া ধেঁছে। তার অব্যবহার মাহুদের নিজের একটা ইচ্ছা আছে, জগতের লীলার সঙ্গে সে সমানভাবে চলে না। ইহাতে মাহুদের কাজে বোঝাবুঝিটাই সব চেয়ে একাশ পাইতে থাকে।

“মাহুদের গলদটা এইখানে যে, পনেরো আনা লোক ঠিক নিজেকে একাশ করিতে পায় না। অর্ধেক নিজের পূর্ণ একাশেই আনন্দ। শুধু, যখন সে শুধু সেখানে তার কাজ যত কঠিনই হোক সেইখানেই তার আনন্দ। যা যেন সে, সেখানেই তার স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য হোক না সেইখানেই তার আনন্দ। যথার্থ আনন্দই, সমগ্র হুংগকে নিজের বিশ্বাসের মত অদায়েণ্ডে আত্মসংকল্প করিতে পারে।”

কিন্তু মাহুদ যে কাজ করে তার অধিকতরই নিজেকে একাশের জন্য নয়। সে হয়

নিজের মনিবকে, নয় কোন প্রবল পক্ষকে, নয় কোন বীধা দম্বরের কর্তৃপ্রণালীকে পেটের দায়ে বা পীঠের দায়ে একাধি করে ।” সন্দেহে কবি বলিতেছেন “আমরা সাক্ষ্য পাড়ীর ঘোড়ার মত লাগাম-বীধা, মরিবার লজ্জা লগ্নাই নাই । * * আমাদের সব চেয়ে বড় আশ্রয় এই যে আবিরাশির্ঘ এলি—কুহ আবি তুমি আমার মনো একাশিত হও । তুমি পরিপূর্ণ, তুমি আনন্দ, তোমার রূপই আনন্দরূপ ।”

এই কথাগুলি সারগর্ভ, রবীন্দ্রবাবু ঈশ্বরীন্দ্রনাথ সাহা লিখিতেছেন এই কথাগুলি তাহা বুঝিতে অনেক সময় সাহায্যতা করিলে হয় করিয়া” আমরা এই প্রবন্ধটিকে সার সংকলন করিলাম ।

“যের দাইরে” উপন্যাসের ঘটনাই এ সংখ্যার একাশিত হইয়াছে, তাহাতে লেখকের মনস্তত্ত্বজ্ঞানের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় । সম্মীপ বাবুও ফেটেরাঙ্গীর দেণা সাক্ষ্য বড়ই উপভোগ্য । এই বর্ণনাই হুটে লেখকের অত্যন্ত শিল্পচাতুর্যের পরিচয় প্রাপ্ত হয় । মেজ ভাটির চিত্তের সংকীর্ণতা—ই একটি কথায় এত উচ্ছল হইয়া পড়িয়াছে, যে তাহার এদিকটি আর হুটাইয়া তুলিবার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না । উপন্যাস অবসরের পাঠ ইচ্ছাই অধিক লোকের ধারণা, রবীন্দ্রবাবু এখন দেখাইতেছেন—উপন্যাসও দর্শন শাস্ত্রের মত সারকথ্য পরিপূর্ণ হইতে পারে । উপন্যাসটি পড়িতে পড়িতে যখন কঠিন মনস্তত্ত্বের দুর্গম গুহার মধ্যে অন্বেষণ করি, তখন কখন কখন পাঠ বন্ধ করিতে ইচ্ছা করে, কিন্তু ইচ্ছাটা আর কার্যে পরিণত হয় না ।

ঐশ্বর্য চৌধুরী “হুটকি” প্রবন্ধে “বীরবল নাম গ্রহণ করিয়াছেন ।” “বিশ্বজ্ঞানালম্বিতসভার কবিত” শীর্ষক প্রবন্ধে নিজের ঠিক নামটিই আছে । হুটি প্রবন্ধেই “বীরবল” নাম থাকিলে ভাল হইত, কেননা হুটি প্রবন্ধেই বীরবলের কীর্তি অকুর রহিয়াছে । একটি প্রবন্ধে, ঐহরপ্রভাস শাস্ত্রী, আর একটিতে ঐশ্বর্যচন্দ্র সরকার বড়ই লালিত হইয়াছেন । সমালোচনার সমালোচনায় এটিই হইবার ইচ্ছা নাই । তবে একটা কথা মনে হয় বঙ্গসাহিত্যের ক্ষেত্রে “আপড়” মন্ত্রে করিয়া বীরবল যদি কেবল “লক্ষ্মী” খেলিতেই চান তাহা হইলে তাহার উদ্দেশ্যের অংশী আমরা কিছুতেই করিতে পারিব না ।

বিশ্বজ্ঞানালের সঙ্গীত সম্বন্ধে ঐশ্বর্য চৌধুরী সাহা বলিয়াছেন, তাহাতে আমাদের কোন আপত্তি নাই । তাহার মত দৃষ্টিযুক্ত মনে করিয়াই আমরা তাহা উদ্ধৃত করিলাম—

“আমার দেশ” এর সুর কিংকিট, কিন্তু এ কিংকিট এবং বাঙ্গলা কিংকিটে তন্ময় এত বেশি যে, অচলিত চোখে এ পান পাঠিতে গেলে এর সুর একেবারে এলিয়ে পড়বে । অথচ “আমার দেশ” এর কিংকিটের সকল সুর বজায় আছে এবং তার তুলণ প্রমাতায় একতারা । অতএব একথা সহিস ক’রে বলা যেতে পারে যে, আমাদের রাগরাগিনী অধিকতর উচ্ছল হাতে বৈকট্যুর খেলতে ভেঙেচুরে যায় নি ।

“সঙ্গীত” প্রবন্ধে ঐশ্বর্যচন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিতেছেন—“আমাদের সাহিত্যচিহ্নে ‘সঙ্গীত’ শব্দটি বাঙ্গলায় এসে পৌঁচেছে । কিন্তু সঙ্গীতে বৌদ্ধাচারি । সেইজন্য আজও সঙ্গীত লগ্নতে দেবী কর্ত্তে । অথচ আমাদের জীবন লগ্নে উঠেছে । সেইজন্য সঙ্গীতের

বেড়া চলমান করচে। একথা বলতে পারব না, আধুনিকের দল পান একেবারে বর্জন করেছে। কিন্তু তারা যে পান ব্যবহার করচে, সে পানে আমল্য পাচ্ছে সে পানি জাত-পোয়ানো পানি। তার শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার নেই, কীভাবে বাড়লে বৈঠকে খিলিয়ে যে জিনিস আজ তৈরি হয়ে উঠে, সে আটারজুই তাকে ওস্তাদের দল নিষ্পন্ন করচে। তার মধ্যোচ্চনীচতা নিশ্চয়ই অনেক আছে। কিন্তু অনিলবীরগতাই যে সব চেয়ে বড় গুণ তা নয়। জ্ঞান-শক্তি শিবের মত অনেক বিন ছন্দ করে ফেলে। লোকের ভাল লাগছে; সবাই শুন্তে ঢাচ্ছে, শুন্তে গিয়ে গুলিয়ে পড়চে না,—গুটী কব, কথা নয়, অর্থাৎ পানের পন্থা। গুলে, চলতে শুরু করল। এখন ঢালটা সর্বাঙ্গসুলভ নয়, তাঁর অনেক ডব্বী হাতকর এবং কুস্তি—কিন্তু সব চেয়ে আবার কথা যে চলতে আরম্ভ করেছে—সে বাক্য মানচে না, প্রাণের সঙ্গে সখ্যই যে তার সবচেয়ে বড় সখ্য, এখার সঙ্গে সখ্যটা নয়, এই কথাটা এগনকার এই পোয়ানো হাওয়ার মধ্যে বেলে উঠেছে। ওস্তাদের কারনামিতে আর তাকে বেঁধে রাখতে পারবে না।”

এ কথার উত্তরে আমরা বলিতে চাই—আমাদের সাহিত্যে তিনে সমুদ্রপারের রাজপুত্র আসিয়াছেন। তিনি আমাদের কাটির স্পর্শে আমাদের জাগিয়াছেন। তিনি আসিতেই উদ্বাহকে আমরা বরণ করিয়াও লইয়াছি। এগনকার সাহিত্যে ও তিনে লইয়া আমরা অনাড় ভাবে একটা গতির প্রতিষ্ঠা করিতেছিলাম—যখনই তাহা আসিল, আমাদের সাহিত্যে ও তিনে উন্নতি পথে যাত্রা করিল। আমাদের দেশে পানের কথাটা কিন্তু স্বতন্ত্র। ওস্তাদ কালোরাভের গুণ হইতে ইহা ক্রমশঃ উন্নতির পথেই চলিয়াছে। কীর্জন, বাড়ল ও প্রতিভাবান্ পায়কের ভাল পানের জীবনী-পটিকে কখনও স্পষ্ট হইতে দেয় নাই, স্তব্রাং পানের ক্ষেত্রে আমরা বিদেশের রাজপুত্রকে বরণ করিতে চাই নাই, সেই ক্ষেত্রে উদ্বাহর সোনার কাটি এখানে আপনার সক্ষমতারই প্রমাণ দিয়াছে। হিজেল্লাল যে ইংল্যান্ডী ভাল বাজালা গানে আসিয়াছেন, তাহাও অদম্যে আসিয়াছে, কেননা দেশ এগনও সে ঢালটাকে অক্ষত করিতে ইচ্ছুক; করিতেছে। আলকাল যে সব পান চলিয়াছে তাহা “আটারজুই” হইতে পারে, কিন্তু তাহারা জাতি পোয়ায় নাই। জাতির সন্ধি প্রাণের স্পর্শ আছে। হিজেল্লালের পান যদি জাতি হারািয়া পুরানস্বর ইংরাজি হইয়া বাইত তাহা হইলে সে পান শুনিবার জন্য বোধ হয় একটুও ইচ্ছা হইত না। আধুনিকের দল শুধু যে আটারজুই পান পছন্দ করে তাহা নয়, ওস্তাদি পানের প্রতি অনেকের ঝোক পড়িয়াছে। লেখক অনেক পানে ওস্তাদি পানের মূর, ভাল, লম্বা অঙ্গীকরণ করিয়াছেন, সেগুলি শুনিতে চায় না এমন লোক বিরল। আধুনিকের দল যে পান পছন্দ করে তাহা সবই সমুদ্রপারের রাজপুত্রের কৃপায় হয় নাই; ওস্তাদি পানের আদর দেশে তিরকালই আছে। যথেষ্ট পানে কথিতাছিল, এখন আবার বাড়িতেছে, সেই জন্য অল্পকাল পরেই পানের প্রাণশক্তি বাড়িয়া উঠিলে কেহ যদি সমুদ্রপারের রাজপুত্রের স্তুতি পান করিতে বসেন, তাহা হইলে উদ্বাহর কাজটা মুক্তিপত্র হইবে না।

দেশে আটারজুই পানের আদর ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে। “লেখকের ভাল লাগে,

- সবাই, শুন্তে চাচ্ছে, শুন্তে গিয়ে গুমিয়ে পড়বে না,—এটা বড় কথা নয়, “চলতে শুরু” করিলেই আশা হইতে পারে, কিন্তু সে আশার সাফল্য অনেক দূরে। সমুদ্রপারের রাজপুত্র গানে আস্তমন, এখানে তাঁহাকে সোনার কাঠি হাতে করিয়াই বসিয়া থাকিতে হইবে, হয় তা কার্ণো অন্তর হইতে তাহার লজ্জা বোধ হইতে পারে।

নারায়ণ, জ্যৈষ্ঠ—

- ঐযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাকি এ সংখ্যায় বক্সিমচন্দ্রের চরিত-চিত্র ২ দফা প্রকাশিত করিয়াছেন। অবশ্যের বক্তব্য বিসয় (১) “অতি সন্তোষবশে বক্সিমচন্দ্রের জন্ম হয়।” এই পরিবর্তে না জন্মিলে বক্সিমচন্দ্র ঠিক বক্সিমচন্দ্র হইতেন কি না, বলা যায় না।” (২) (২) “বক্সিমচন্দ্র তাঁহার চরিত্রের মূল দরজামণ্ডলি তাঁহার পিতামাতার, তাঁহাদের বংশধারার এবং পরিবারবর্গের নিকট হইতেই প্রাপ্ত হন।” (৩) “বক্সিমচন্দ্র মৃত্যুকাল পর্যন্ত নিত্যানুতন জীবনাঙ্কনে মিশ্রিত ছিলেন। (৪) “এখনকার সাহিত্যিকেরা প্রায় অনেকেই হয় স্বয়ংসিদ্ধ, না হয় কৃপা সিদ্ধ বক্সিমচন্দ্রকে কঠোর সাধনা করিতে হইয়াছিল।” এই কয়েকটি সর্বজন-পরিচিত সংবাদ বিপিনবাবু তাঁহার স্বাভাবিক লক-সম্পদের বলে এক ঞ্চুকাও অবশ্যে পরিণত করিয়াছেন। বক্সিমবাবুর জন্মের ইতিহাস এসঙ্গে, তিনি তাঁহার পিতৃপিতামহের চরিত্রের এবং জীবনের রৈশিইগুলি আবাদিগকে বলিয়া দিতে পারিতেন। অথবা বক্সিমবাবুর জ্ঞান-অঙ্কনের অণালীর একটি বিশেষণও তাঁহার পাঠকবর্গকে উপহার দিতে পারিতেন। কিন্তু সে সম্বন্ধ আমাদের অজ্ঞতার গুটাইবার দিকে তিনি মোটেই যত্নবান নহেন। তিনি বক্সিমবাবুর জীবনে কারণ-পুণ্যস্মারার প্রভাব দেখাইতে গিয়া Evolution, Heredity, struggle for existence, Natural selection, Pangenesis, abiogenesis- কর্মবাস science এবং art-এর সংস্ক এবং আশ্চর্য্য মিথ্যাতা, বাস্তবিক প্রভৃতি অনেক বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক তত্ত্বের সাধারণ-মহন করিয়াছেন। জীবনচরিত এবং চরিত্র-চিত্রে আমরা চাই—ইতিহাস ঘটনার সমাবেশ, facts; পাল ভাষণ তাহার পরিবর্তে দিয়াছেন—তাঁহার কল্পনা, অঙ্গনা, ও মিছড়ি! এ অত্যাচার চলিলে কেন?

- একটি কথা জিজ্ঞাসা করি, আশ্চর্য্য যদি নিত্য হয়, তবে সে আবার “ভোগ ও কর্মের ভিতর দিয়া এই সৃষ্টি প্রবাহের মধ্যে আপনাকে প্রাপ্ত হয়” ও “পূর্ণ করে” কি করিয়া? যে অপূর্ণ, যাহার ক্ষয় বৃদ্ধি ও লয় আছে, সে আবার ‘মিতা’ কিসের? পাল মহাশয়ের দার্শনিক মত বিচিত্র। ‘চক্র বী চক্রক’ ঐযুক্ত গিরিজানাথ মুনোপাধ্যায়ের একটি সরস কবিতা। গিরিজাবাবুর হাত বড় মিঠে; তাই এই ভাব-পূর্ণ কবিতাটি, ‘শ্রেয় বর্জিত’ হইলেও, আমরা ‘সরস’ বলিতে বিধা করিব না। ‘চক্রকে’ যে আধ্যাত্মিক কল্পনার বিকাশ দেখিতে পাই, তাহা বাস্তবিকই উপভোগ্য।

অমর বৃত্তান্ত...ঐযুক্ত ধর্ম্মেশ্বরনাথ বিহের একটি সরস রচনা। বর্জমান সাহিত্য-সম্মিলনে সোপান করিতে গিয়া লেখক যে সকল উপকরণ সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন তাহাই বেশ একটি সংগত শুভ হাতরসে বণিত হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে।

“শঙ্করাচাৰ্য্য কৰ্ত্তৃক জৈন মত পণ্ডন” একটি দৰ্শন বিষয়ক রচনা। লেখক জগদীশ বিজয়দাস দত্ত। রচনাটি নবাবাদতত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছে। বাহ্যিক দৃশ্যে অবস্থায় কালে শঙ্করাচাৰ্য্যের সহিত কতিপয় জৈন পণ্ডিতের যে বিতর্ক হইয়াছিল, তাহাই অবলম্বন করিয়া প্রবন্ধটি লিখিত। কিন্তু প্রবন্ধকার “সৰ্ব্ব দৰ্শন সংগ্রহ” হইতে সার্ভিত দৰ্শনের সংক্ষিপ্ত পরিচয়ও পাঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন। পরিশেষে শাস্ত্রীয়ক ভাষায় বিতর্ক অব্যাহতের দ্বিতীয় পাদে—যে স্থলে শঙ্কর মুক্তকণ্ঠ বৌদ্ধদিগের মতের নিরাসন করিয়া মুক্তাখ্য জৈনদিগের মত পণ্ডন কৃত্রিতে প্রস্তুত হইয়াছেন—সে স্থল হইতেও তিনি উদাহার প্রবন্ধের উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। জৈন-দৰ্শন আখ্যাতের বেশী পরিচিত নহে। আমরা শুধু জামিনা হাথিয়াছি যে জৈনদিগের নিকট অহিংসা পূরন ধর্ম। কিন্তু ইহা শুধু জৈনধর্মেরই বসিষ্টা নহে। প্রতিও বলিয়াছেন “যা হিংসার সৰ্ব্ব-ভূতানি”। জৈনদিগের ইঞ্জিয়জগৎ কঠোর সাধনা হিম্মুখেরই প্রেত ফল। সার সত্যের আলোচনায়, আন্তঃস্থাত্মীনলনে জৈনধর্ম কতদূর কৃতকার্য হইয়াছিল, তাহাই বিশেষভাবে অত্মীনলনের বিশেষ অনেক মনে করেন, যে জৈন-দৰ্শন বৌদ্ধ-দৰ্শনের কাণ্ডবিশেষ। প্রবন্ধলেখক শুধু এই পুরণার কথা উল্লেখ করিয়াছেন না, ইহার প্রতিবাদ স্বরূপে তিনি বিশেষ কোনও সুপ্তি অন্তর্ভুক্ত না করিলেও, তিনি যে এই পুরণা অমূলক বলিয়া মনে করেন, তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। বৌদ্ধ ও জৈন মতের মধ্যে কতকটা মিলিত থাকিলেও, অনেক বিপর্য্যে উদাহার পরস্পর-বিরোধী। প্রবন্ধলেখক যদি সান্না ও বিরোধিতাগুলিকে একত্র উপস্থাপিত করিতে পারিতেন, তবে প্রবন্ধের ধোরণ অনেক বৃদ্ধি পাইত। জৈনেরা কবিকবে আত্মবান নহেন। আত্মাকে জৈনেরা নিত্য “দগিয়া” বিশ্বাস করেন। জৈনেরা অশৌচপালনে জাতিভেদ মানেন। তীর্থযাত্রেরা সকলেই কজিয় ছিলেন; সেই জন্য কজিয়ের অশৌচকাল প্রাঙ্গণ অপেক্ষাও অধিক জৈনমতে পুণ্যের জিন পূজার অবিকারী নহে। দিগন্তদিগের মতে ত্রীলোকেরা বোদ্ধের অবিকারিত্বী হয় না। বৌদ্ধেরা ঐকান্তিকতাবাদী (absolutists) জৈনেরা অনৈকান্তিকতাবাদী (non-absolutists)। অর্থাৎ ইহারা কিছুই নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারেন না। কোন বস্তু আছে বা নাহি, ইহার কিছুই নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না।

যটোহস্তীতি ন বস্তুবাং সরেন হি যতো যটঃ

সাত্তীতাপি ন বস্তুবাং বিরোধাৎ লসমত্তয়োঃ ।

যট হয়ত আছে; হয়ত নাই। ইহার নাম “সত্য-বাদ”। তাই অর্থে “হয়ত” অনেকাসম্ভাব্যতাক বা অনিশ্চয়তা বোধক। যটতত্ত্ব জ্ঞানের ব্যাথা এই অনিশ্চয়তা প্রতি-পাদন করাই জৈন দৰ্শনের উদ্দেশ্য। জৈনেরা কৰ্ম্মবলে বিশ্বাস করেন, এবং সেই ফল-ভোগের জন্যই আত্মার নিত্যক বীকাত করেন, বৌদ্ধেরা করেন না। আমরা বোধ হয় এইখানেই বৌদ্ধ-ও সার্ভিত দৰ্শনের প্রকৃত প্রভেদ। জৈনদিগের নিজের বোধ এবং বৌদ্ধ-দিগের সৰ্ব্বলুপ্তময় নির্ব্যাণেও যথেষ্ট প্রভেদ লক্ষিত হয়। এই সকল বিষয় আলোচনা করিলে বস্তুমান প্রবন্ধটি সারবান হইত। তাহা না করিয়া নিত্যক গতাগতবিকার জ্ঞান

- পরিচ্ছাদ্য-কণ্টকিত সর্করশর্নকারকৃত্ত সার সংক্ষেপ মেওয়াতে অব্যক্তি প্রশংসা বা সহজ বোনা হইতে গঠিত নাই। লেখক পণ্ডিত-শাস্ত্রী। তিনি ইচ্ছা করিলেই এসম্বন্ধে অনেক নূতন কথা বিশদভাবে বলিতে পারেন।

ঐযুক্ত জুজয়বর রাধা চৌধুরীর “বৈশাখীতে” ভল্লের কক্ষার আছে, কল্লনার বাহার আছে, ছক্কোবাতা আছে, বৈশাখের মাকের বেলা, ফুছর তান, যেখের মেলা, বরগার গায়া, আর কদম নের (১) ছড়া-মুড়ি আছে; পরিশেষে নায়িকার সংহার (?) এবং “বিশ্বনাথ কাদিতে ছপে”র বারাকৃতিটির উপসংহার হইয়াছে।

ঐযতী জগদম্বা দেবীর “আমার কথা” কিছুই বুঝা গেল না “যেন বুঝি বুঝি, অথচ বুঝি না।” এখানে মনে হয় এটি কৃত্রিম উল্লেখ-প্রেম, আবার মনে হয় কাব্য। কোনও কোনও স্থলে অমিয়াকর কবিতা বলিয়াও ভ্রম হয়। দৃষ্টান্ত দিতেছি:—

তবে যে
আমাদেরও নায়ে খায়ে,
মাথা নীচ,
কাঁচু মাচু
কন্তে সেপ, সে কেবল
নাগের বড় বড়াই
মাগের বড় চাই
তাদের দিকে যে চাই,
সমানৈচাইতে
পারিনে তহিতে ?

অথবা—

মধুমাথা বুলি আমারি
উল যে তখন,
এখন কি বুলি
মধুমাথা নয় বলতে চাও ?

উক্ত বাক্যগুলি আমি পদ্যের আকারে নিম্নন্ত করিয়াছি মাত্র; দাড়ি, কমা পরিবর্তন করি নাই। অনেকবার পড়িয়া শ্রদ্ধা ছিন্ন করিয়াছি, ইচ্ছা হয়ত একটি স্বপ্নতঃ উদ্ভিন্ন ছোট গল্প। কোনও “এক নায়িকার” “দৌবন যেতে যেতে ধমকে দাঁড়াল,” তার পরে “তাহার ‘সঙ্গী চোর’ দৌবনের দশা দেখে, ‘খতবত পেয়ে গেল।’” নায়িকা ও কালে ভয়ে এক আধ দিন প্রাণের দায়ে—যখন নিতান্ত চার। থাকে না,—তখন, ছুরি কল্পিয়া থাকেন। এই কবুল জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে, এই কৃত্রিম গল্পের ঐ পঞ্চকালের উপসংহার হইলে ছিল ভাল। কিন্তু নায়িকা ‘মরিয়া হইয়া’ ‘পেছন, নামজাদা মাথা চোরকে পর্ণান্ত ছুরি শিলাইতে প্রবৃত্ত হইয়া-ছেন। সেই মাথাচোর দৌবনের-লোভে, পড়িয়া আটক হইল। “আজ এখানে দৌবন বাঁধা,—চোর আটক।” এইটুকু বোধ হয় পল্লুর সারাংশ কিন্তু আমি ইচ্ছা-অতি কষ্টে সংকলন

করিয়াছি। জগদ্বাদেশীর উদ্দেশ্য অগ্ররূপ হইলেও পারে। আল কপা, সমস্ত জিনিষটাই একটা নতুন বা প্রাচীন। “নারায়ণ” সম্পাদক এই সকল স্ট্রিট-মোটর রাবিশ পরহ করিয়া কেন যে যুগপৎ শিষ্টতার প্রেত-তর্পণ ও সাহিত্যের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করিতেছেন, তাহা কেহ আবাদিপকে বুঝিয়া দিতে পারেন কি? সমস্ত প্রকৃতির কাছে কেবল বাচালতা, অসারতা আর শিষ্টতার ভ্রাতা! জগদ্বাদেশীর কি এমন ক্রোধান্ড বহু নাই, গিনি ঠাট্টাকে এই অংশেও রমণীভুলভঙ্গ্যবল্লিত, হঃসারসিক রচনা হইতে প্রতি-নিবৃত্ত করিতে পারেন? “মরণে অর” একপানি নাটক। লোক জীবিত সত্যোক্তক গুণ। “নারায়ণের” নাট্যকার সত্যোক্তকের নামের সহিত পাঠকসমীক্ষা বিশেষ পরিচিত নহেন। সাহিত্যের পাঠশালা ঠাট্টাকে অমর্য্য মক্শা করিতে দেখি নাই। ঠাট্টার অকুর্ষ্য প্রতিভা-বলে তিনি একেবারে নারায়ণ-সম্পাদকের সঙ্গে চাপিয়া বসিয়াছেন। নারায়ণ-সম্পাদক যোগ্য ভয় সেই মূল্যের লোক বীহারা বিশ্বাস করেন যে, কবি বা নাট্যকার ‘অপ্রে না, অকপ থেকে পড়ে অগণ’ ক্রি়া হইতে ফুড়িয়া বাহির হয়। যাহা, হউক, আমাদের এই নবীন নাট্যকার নারায়ণ-লিলায় নবরসের যে ফোয়ারা ফুটাইয়াছেন তাহাতে পঠকের ঐতি মুগ্ধনিত হইয়া উঠিয়াছে কিম্বা বলিতে পারি না, তবে অনেক গৃহ-প্রাঙ্গন হইতে এই নাটকের দিগ্ভিষ্ট পরব যে দূর নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, ইহা আমরা বিচ্ছিন্ন স্বরে অবগত হইয়াছি। কি শুনে যে এই অবজ্ঞানামাশি নারায়ণের পৃষ্ঠায় স্থান পায় তাহা বুঝি না। একদল লোক আছেন, যাঁহারা পড়িতে পারেন না, কিন্তু ভাঙ্গিয়া ছুরিয়া খসে করিয়া জগতে একপ্রকার কীর্তি প্রচার করিতে চাহেন। নারায়ণ-সম্পাদক ত সে প্রকৃতির লোক নহেন! তার পরে সাহিত্যে কতকটা স্বেচ্ছাচারিতার আদর্শী করিয়া বিকৃতভিত্তিবিধিধিপের মধ্যে মাসিক-পত্র নামিকে ঢালাইয়া কিছু পরমা করিয়া লগায় ইচ্ছাও জ্বলিতে সত্তবে না। স্তব্ধতা আমরা কিছুতেই বুঝিতে পারিতেছি না যে, বিজ্ঞ সম্পাদক কি ছদ্মনে ফুলিয়া ভাণার উপর, ক্রুর উপর, জনসাধারণের বিশ্বাসের উপর এমনভাবে জীবনরৌলার ঢালাইতেছেন। নক্ষত্রাণ কথা-নাটো কিছুই নাই, তবে খুব মৌলিকতা আছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সে originality পুনঃ পুনঃ ফুটিয়া উঠিয়াছে—ঠাট্টার ক্রটিতে। সীলতার শীমা-লজ্জনে তিনি বিশেষ নিপুণ কারিগর। সকলপ্রকার শিষ্টতার আবরণ পুলিয়া ফেলিয়া কেমন করিয়া বীভৎসতার নগ্নবৃত্তি নিলজ্জভাবে লোকসমক্ষে ধরিতে হয়, সে আটটুকু তিনি বেশ করিয়া আয়ত্ত করিতে পারিয়াছেন। ঠাট্টার আর এক মৌলিকতা চরিত্র-চিত্রণে। শোভনা ফুলবৎ—তাহার মূণে বারাক্কা নাম প্রগল্ভতা পেওয়া হইয়াছে, আর আওর বারাক্কা—তাহাকে গৃহস্থবধূর তেজুবিভা দিয়া সাজানো হইয়াছে। এমন নহিলে মৌলিকতা হইবে কেন? “আবুর বলিডেহে—শশি (হু হু ইকার বোধ হয় কি ঠাট্টাশায়ীর সবেধনে?) তোকে বাটরি বজ্জি—গণন চুখ পায় তৌটে হুটা পুড়ে যায়...তারো কি শান্তি পায় তা? আমি ত বুঝি। এক এক সময়ে মনে হয় তৌটে হাত দিয়ে দেগি তৌটে ফোসকা পড়ল কি না...” অগত পুঁচ বৎসর এই ভাবে কাটিতে কোনও বাধা হয় নাই। এবং সে দিনও রমেন্দ্র-আওরের জ্ঞান জীর্ণ গলা থেকে নেকুলশ জিনাইয়া আনিতে গিয়াছে। “নহিলে

যে আত্মর মন থাকে না !” আত্মর “পাঁচ পাঁচ বৎসর রমেন্দ্রের সঙ্গে থাকিয়া বৃদ্ধিতে পারিয়াছে যে, বাঃ আমি তত তাকে ভালবাসি না । যেমনি দেখা মনে হওয়া অমনি লেকচার—“তোমার টাকা চেয়েছি—তোমায় চাই নি, যাও, যাও আমার সামনে থেকে সরে যাও...অনেক...আজ অনেক বছরের তুল ডেকেছে ।” “আমি জানি কাকে ভালবাসা বলে—আমি ভালবাসি কিন্তু তোমাকে নয়—আমি ভালবাসার মাগুনে জলে মরছি রমেন্দ্র ! রমেন্দ্র ! আমি আর তোমায় রমণী নই ।” আত্মর ভালবাসার আগুনে পুড়িয়া মরিয়াও অহুসারের মততা কটাটাইতে পারিল না । এ মৌলিকতা নয় ত কি ? এর পরে রমেন্দ্রের বাড়ি দিম ও শোভনার হেলো ডায়াটিক উচ্চাস । “তোমার অল্প বৃকের চিকিৎসা পুনে ফেলে এলাম... সর্ষকান্তি নয় করে দিলাম” ইত্যাদি । কন্যাসুহের অপব্যবহারের গানভঙ্গ করিবার অল্প বাসব প্রেরিত কোন উর্ধ্বশ্রেণী যেনক্যুও এমন মিল জুড়াবে আত্ম-নিবেদন করিতে পারিত না । কিন্তু রমেন্দ্রের মন ফুলিল না । সে রূপ, গৌরব, কল লেপকের ভাণ্ডার চটুলতায় রঞ্জিত হইয়াও রমেন্দ্রের নেশা টলাইতে পারিল না । তখন শোভনা আজকালকার নীতি অহুসারে কেরোসিন বস্ত্রে মাগিয়া নিজে জলিয়া মরিল । কিন্তু স্নেহলতাও পর হইতে সে ত আজকাল অনেকই করে । লেপকের মৌলিকতা থাকে কোথায় ? তাই লেপক শোভনার পিতাকেও ঐ সঙ্গে কেরোসিনমাখ করিয়াছেন । বৈজ্ঞানিক শোভনার পোজ লটতে আসিয়াছিল—এই অপরাধ ; লেপকের কবলে পড়িয়া সেও সঙ্গে পুড়িয়া মরিল । এর মধ্যে একটি উড়িয়া চাকরকেও জুটানো হইয়াছে, সেইটাকেও ছত্রি-সংকার করিয়া দিলে চমৎকার হইত । কেন না তাহার জাত বুলি সে লেপকের মগপরে পড়িয়া জুলিয়া গিয়াছে ; যাঁহারা উড়িয়া না জীবেন, তাঁহাদের চোখে মুলি দিয়া লেপক এখানেও অপূর্ণ মৌলিকতার পরিচয় দিয়াছেন ।

এই অপবিত্র, পঙ্কিল, অনিষ্টকর তৃতীয় বা চতুর্থশ্রেণীর রজনীর বিস্তৃত সমালোচনা করিয়া মানসীর পৃষ্ঠা কলঙ্কিত করিবার ইচ্ছা ছিল না । কিন্তু নারায়ণের এই অমার্জ্জনীয় শেজাচারিতা উপেক্ষা করিতে প্রত্যাবর্তন করি হইতে হয় । ইদমেন প্রভৃতি প্রতিভাপন্ন নাট্যকার ছই একমলে ঘাটা করিয়াছেন, তাহার এমন অল্প অল্পকরণ করিয়া বাস্তব ভাষার সঙ্গে আবার কলিলের অধিকার কাহারও নাই ।

প্রার্থনা

(৩গো) . আদ্যে আঁচলে বসাইয়াছিলে

“নিবৃত্ত কুটার-তলে,

“তোমার ছঃখ দিবনা বন্ধ”

ব’লেছ নুয়ন-জলে ;

“মুনে পড়ে কিগো এদোষ-আঁধারে

“প্রান্তর-তরু-মূলে”

জীবন জুড়ানো সুধারসোহাগ

ঢেলেছ পরাণ থলে !

(আর) “জীবনে হবেনা বিরুদ্ধ বেদনা”

এই না অত্যন্ত বাণী

শ্রবণের মূলে রাখিয়া অধর

সুনাতে জীবনরাশি ;

(আজি) গত দিবসের শত বাদাময়

কণিক মিলন তরে

(হায়) দিবস নিশায় প্রদোষে উষায়

কত না অশ্রু ঝরে !

(তুমি) জীবন মরণ বাহা দাও তাই

দিওঁ হে প্রাণের প্রিয়,

(শুধু) শেষ দিনে মোর অবসান স্মারক

হয় সেন রমনীক ।

ডায়েরী

(প্রেরকের পত্র)

মাননীয় মানসী সম্পাদক মহাশয় সমীপে—

সবিনয় নিবেদন,

আমি একজনকে চিনি তাম, তাহার নাম কেহই জ্ঞানিত না, তাহাকে
জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিত তাহার নাম “পাগলু” এই নাম তাহাকে কে
দিয়াছিলেন তাহা সে ভিন্ন আর কেহ জ্ঞানিত না, সে কাহাকেও সে বিষয়ে
কিছুই বলিত না। তাহার চাল চর্চন ভাল ভঙ্গী দেখিয়া এবং দুই একটি কথা
আভাসে মনে হইত, যিনি তাহাকে “পাগলু” নাম দিয়াছিলেন তিনি ভিন্ন সংসারে
তাহার আর কেহ ছিল না। তাহার থাকিবদ্ধও কোন নির্দিষ্ট স্থান ছিল না,
যখন যেখানে সুবিধা সেইখানেই সে থাকিয়া যাইত। পশ্চেক কাজে সময়ক্ষেপ
করা ব্যতীত নিজের জন্ত তাহাকে কোন দিন কিছু ক্ষরিতে কেহ দেখে নাই;
সে একরূপ পাগলই ছিল বটে। এক দিন হঠাৎ সে কোথায় চলিয়া গেল, তদবধি
আর কেহ তার কোন সন্ধান পায় নাই। আমি একদিন এক পুরাতন পুস্তকের
সোঁকানে বই খুঁজিতে ছিলাম, হঠাৎ একখানি ছেঁড়া ডায়েরির মত খাতার
দিকে আমার নজর পড়িল, হাতে নিয়া দেখিলাম—খাতাখানি হাতে লেখা

ডায়ারিই বটে । সব লেখাগুলি স্পষ্ট নহে, অনেক দিনের লেখা, কালির দাগ অস্পষ্ট হইয়া আসিতেছে; এক একটি অধ্যায়ের নিচে নাম লিখিবার স্থানে লেখা আছে “পাগ্লু” আমার সেই পূর্ব পরিচিত পাগ্লুর কথা মনে পড়িল—হানে হানে লেখা পড়িয়া দেখিলাম, পড়িতে ঝড়িতে আমার চক্ষু অনেকবার স্নেহে ভরিয়া আসিয়াছে । “পাগ্লু”ত আর এগানো নাই, বাচিয়া আছে কিনা তাহাও আমি জানিনা; যিনি তাহাকে “পাগ্লু” বলিয়া ডাকিতেন তাঁহার কাছে এ লেখাগুলির মূল্য থাকিতেও পারে—তাহাকে যদি জানিতাম, এ খাতাখানি তাহাকে দিতাম অথবা পত্রিকায় প্রকাশ করিবার জন্ত ইহার কোন কোন অংশ পরিহার করিয়া স্মৃতিয়া পাঠাইলাম, উপযুক্ত গনে হইলে অগ্রগ্রহণ করিয়া প্রকাশ করিবেন । আমার উদ্দেশ্য এই যে, যদি কেহ গোল করেন তবে, তাহাকে এই খাতাখানি দিব—আমার নিরুদ্দিষ্ট বক্তৃতা “পাগ্লু”র প্রেক্ষিত্য তাহাতে তুষ্ট হইতে পারে—এই আমার বিশ্বাস । খাতার যে অংশ প্রকাশ করিবার জন্ত লিখিয়া দিলাম উহা শেষের দিকের অংশ—লেখার ভাবে মনে হয় “পাগ্লু” নিরুদ্দেশ নাত্রার পূর্বে এই অংশে গুলি লিখিয়া গিয়াছে । যিনি তাহাকে “পাগ্লু” নাম দিয়াছিলেন তিনি ইহা পড়িলে বসিতে পারিবেন, “পাগ্লু” কি ছুখে নিরুদ্দেশ হইয়া গিয়াছে ।

ডায়ারিখানি বহির দোকানে কেমন করিয়া আসিল তাহা বলিতে পারি না, বোঝা যায় যাহার ক্রিসংসারে কেহ নাই, তাহার মনের কথা গুলি কর্দমের মধ্যেই নুটিয়া এমনি করিয়াই নীরব হইয়া যায় ।

বশব্দ

শ্রীকান্ত

কোথায় জীবনের আনন্দ, কাহার পদতলে জীবনের চরম সার্থকতা, তাহা বুঝিয়াছিলাম, কিন্তু আমার জীবনোপবনের বসন্ত-লক্ষী আমার বাকুল বাত প্রসারের মধ্যে উন্নয়, তাই যে মালধা নন্দনের শোভা সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতে পারিত তাহা জীবনকাল ধরিয়া কাঁটায় ভরিয়াই রহিয়া গেল । মল্লের মদির নিশ্বাসের মধ্যে এক বর্ণ বৈচিত্র্যময় বিহ্বল বসন্তের স্বথ-বেদনাকুল সন্ধ্যায় জীবন-দেবতার সন্মুখে ক্ষুণ্ণমুখি হইয়া দাঁড়াইয়াছিলাম—সে কি মাহেশ্বর মুহূর্ত ! খাতাস ভরিয়া সাহানার হয়ে বীশরী ঘর্ম্মজিয়া উঠিল, নীলাবরে শুক্লা লগ্নবীর চাঁদ, আর আমার সন্মুখে আমার হৃদয়াকাশের স্তন্যময় পরিপূর্ণ চন্দ্রমা ! চির তৃষ্ণাতুর

আমার ছুটি চকু-চকোর কেমন করিয়া সে চাক্ষুর স্রাব পান করিতেছিল তাহা কি বলিতে পারি ? জলজগের আকাঙ্ক্ষা এক মিনেয়ে মিটাইবার জন্য যে আগ্রহের স্রাব পান তাহা বলিবার ভাষা হয় নাই ; বুঝি হইবেও না । তারপর পাষণ দেবতার তীর্থ-মন্দিরের সোপান-শিলায় শির নোমাইয়া কতই আবেদন, আকাশভরা তেজস্বীকোটি অলীক স্বপ্নের কাছে কতই বৃথা আরাদনা ! তারপর নিয়তি-নির্দিষ্ট নিতানিষ্পত্তির বাধা, বেদনার মধ্যে জীবনপাতের ইতিহাস বিদীর্ণ হিয়ার শোণিত বিস্মৃতিয়া এই কয়টা পাতার মধ্যে লিখিয়া রাখিয়াছি । এখন বুঝি সে লেখারও শেষ হইয়া আসিল, কারণ জীবনের অসংশিষ্ট দিন কয়টার মধ্যে লিখিয়া রাখিবার মত ঘটনা ঘটিবার আর সম্ভাবনা একরূপ নাই । বিনিময় রজনীর পরিগ্রাস্ত দেহ ভ্রম্যনে রাখিয়া চকু মুদিবার পূর্বে একান্ত মনে বিশ্বদেবতার চরণোপালম্ব আর চকু যেন উন্মীলন করিষ্ঠ না হয় বলিয়া যাহাকে প্রতিদিন প্রার্থণা নিষ্ঠার সহিত কামনা করিতে হয়, ডায়রী রাখিবার প্রয়োজন তাহার জীবনে হইবার কি সম্ভাবনা আর আছে ?

“যজ্ঞস্তিতং তদিত্ব নৃততরং প্রয়াতি”

যজ্ঞেতদা ন গণিতং তদিত্বাত্মশক্তিঃ ।”

এ কবির রচনা সে এই কিশলীর গতি ভাল করিয়াই দেখিতে পাইয়া-
হল । আজ আমিও দেখিতে পাইল্লম ; সমগ্র জীবনের সমস্ত কামনা দিয়া যদি
এটুকু বলিয়া জীবনের সবগুলি দণ্ড পল্লীমুহুর্ত, প্রার্থনার ভস্মিয়া রাখি তাহা এক
মিনেয়ে টুটিয়া লুটিয়া ধূলিতলে পড়িয়া যায়, আর যাহার কল্পনার পর্যাণ্ড রূপস্পন্দন
শুক হইতে চাহে, তাহাই মৃতিমান হইয়া নিমেষার্থে জীবনের নন্দন বনকে দখল
গাওবে পরিণত করিয়া দেয় । যে বিশ্ব-দেবতার ইচ্ছায় জগতের বিচিত্র লীলার
জন সে লীলার হৃৎস্থের ভোক্তাও তিনি, ইহা ভাবিতে যদি পারিতাম তবে
হান আপদই ছিল না, তাহা হয় না । জীবনের সহিত জীবন জড়িত হইয়া
গীতাকনের সৌন্দর্য যখন বিকাশ করে সে সমগ্রই আমাদের কৃত ক্রম ভাবিয়া
হামনের আবেশে চকু মুদ্রিত করিয়া অথ কল্পনার নিবিষ্ট হইবার যখন উত্তোগ
করিতেছি তখন মেঘ বিহীন নীলাগর হইতে অকস্মাৎ অশনি সল্লাং তুলা
হৃৎস্থের বজ্রধারে আমার অথ আশার স্বর্ণ সৌধ-চূড়া কুমিসাং হইয়া যায়, চক্ষের
পলে তখন সব অন্ধকার হইয়া উঠে ! ইহাই জগতের স্রষ্টি প্রাচীন এবং অতিবৃ-
হৎ । এই হৃৎস্থের মধ্যেই এ জীবনের শ্রেষ্ঠ কিনা তাহা জানি না, কেহ সে কথা
বলিয়া দিতে পারে না, তবে হৃৎস্থের আশুটিকে একান্ত উপায়হীন শকুন্ত শাব-

কের মত হৃদপিণ্ডের কোমলাবরণের মধ্যে লুকাইয়া নিয়া এই অনন্ত অশ্রুসিক্ত
সাতার দিয়া পার হইতে চেষ্টা করি, ঝড় ঝড়ায় পুনঃ পুনঃ বিধ্বস্ত হইতেছি তবুও
প্রাণপণ উত্তমের বিরতি নাই, হায়রে ! ইচ্ছাই নাম জীবন যাত্রা । সে জীবন
যাত্রা আমিও নির্বাহ করিয়াছি, তুমিই স্কুরাইয়াছ । হে আমার জন্মজন্মান্তরের
চির হৃদয়, অশ্রুসি সন্তোষকরিয়ু, দিক্চক্রবালের অন্তরালে যে নবনন্দন সজ্জিত
হইতে পারে, এ নিরাশ জীবনের অশ্রুতে সন্ধ্যাদীপখানি জালিলার লোকটি যে
আজও আসিতে পারে, দ্বিত্যন্তের শাক্যের স্থালীখানি আমার কোলের কাছে
আঙ বাড়াইয়া দিবার যেহৃৎস্থখানি আমার সেই জীবনাপরাধের জন্ত যে
উৎসুক হইয়া আছে সে ইঙ্গিত তুমি করিয়াছ—সেই ইঙ্গিতের আদেশকে
ঈশ্বরের অব্যক্ত সম্ভাব্য অত্রান্ত দৈববাণী বলিয়া মাথায় নিয়া আমার বন্ধুর
পথের সকল বাধা সমত্তল করিয়া রুদ্ধমাসে যে ছুটিয়াছিলাম, সে আগ্রহের
নিরলস যাত্রা আমার বন্ধ হইয়া পিয়াছে, আজ পথপার্থের ধূস্রিতলে নিতাপ্ত
উপায়হীন ভাবে বসিয়া ভাবিতেছি, এ কি হইল, কেন হইল ? চিরীক্ষকালে আবৃত
অন্তরের মধ্যে মূর্নিদীপখানি জলিয়া কেন আবার নিবিয়া গেল, চিরান্তিলম্বিতের
রাগারাম্পর্শে চিরমুক্তিত চন্দ্রশতদল যদি বিকশিত হইয়াই উঠিল তবে চিরা-
কাজিক্ত দেবতার পাদপীঠ হইবার সৌভাগ্য তাহার হইল না কেন ? প্রাণপাত
খানি অনাস্বাদিতপূর্ষ চিত্তসঞ্চিত অমৃতরসে পরিপূর্ণ করিয়া দেবতার ভোগের
জ্ঞান ধরিলাম, চির কুরুগুর দেবতা আমার মুখ ফিরাইয়া নিলে কেন, জীবনভরা
পূজায় কি ত্রুটি ঘটয়াছে হে জীবন দেবতা ? আজ এই মৃদুয়া মুক ধরণীর জীর্ণ
পথপার্থের পাণ্ডুস্তপের উপর পড়িয়া চিরতৃষ্ণাতুর, চিরবৃক্ষিত, অসহায় মানব-
আত্মা যে বারবার গোক করে বলিতেছে “লও, লও, আমায় লও, ওগো, আমায়
লও” তাহার এই চঃসহ বেদনাতারগস্ত হৃদয়ের আর্ন্ত রোদন বার্থ হইতেছে কি
অমার্জ্জনীয় অপরাধে ? নব নীরদের নীলাঞ্জন ছায়ায় আকাশ ছাইয়া
গিয়াছিল, সিদ্ধ কান্ত হৃদয় সজল জলধর যে ত্বার্ত্ত চাতকীর কাণে বারবার
করিয়া রেহ-গস্তীরসের আশ্বাসের অভয়বাণী শুনাইয়াছে, তারপর এ বজ্রাঘি এ
করকাতিলঘাত, কোন কথ্যহীন পাপের গুর শাস্তি তাহা আমায় কে বলিয়া :

জীবনান্তস্তের একজন, জীবন শেষের একজন, আমার ত্রিভুবনের
একমাত্র জনকে আশ্রয় করিয়া যে তরী ভাসাইলাম তাহাও কুলে উত্তীর্ণ
হইতে পারিল না কেন ? কেন ?—এ ভারতবর্ষে মহুর পদতলে যুগ যুগ
ধরিয়া মানব হৃদয়ের নিভা বলি চলিতেছে—সেই জ্ঞান । নিজে মরিয়া,

অপরকে মারিয়া ছদিনের লৌকিক যশোলাভ করিব, সেই জ্ঞান। সীতা বর্জনের জন্ত অযোধ্যাবাসী একদিন মহা কোলাহল তুলিয়াছিল, যশোলিপু রামচন্দ্র অযোধ্যার সীমাবদ্ধ রাজত্বের লোভে সীতা হৃদয়ের আনন্দময় অপূর্ণ স্বর্গ-রাজ্য বনে বিসর্জন দিয়াছিলেন—অপরিজ্ঞাত সত্যের অবমাননা করিয়া মিথ্যা জনপনাদকে সম্মান দেখাইয়াছিলেন। তারপর জীবন ভগ্নিয়া নির্ধাপ করিয়াছেন, “উদ্বংগে গেছে লক্ষ্মী” বলিয়া যাচাকে কত আদব, কত সৌভাগ্য দেখাইয়াছেন, তিনি যে অগ্নি পরীক্ষোত্তীর্ণ ও নিষ্পাপ এ সর্লজ্ঞন বিদিত সত্যকে প্রচার করিয়া একান্ত আশ্রিতা, স্নেহ-পরায়ণা, তাঁর “নয়নের অমৃতবর্ষি”কে হৃদয়াগ্নিতে রাখিতে সত্যসঙ্গ রামচন্দ্রের সাহসে কুলায় নাই। অন্যের ও যে ঋণের সেই শিকাই পাইয়াছি ; অস্নেহ, স্বার্থপরতা এবং মিথ্যার সম্মান বুদ্ধি করিবার জন্ত রামচন্দ্রের মতই আমরা দৃঢ় হস্তে হুত্বার বোকা প্রিয়জনের মাথায় তুলিয়া দিতে পারি, নিজের তিল তুল করিয়া নিতা মৃত্যুকে বরণ করিয়া নিতে পারি, তবুও এক বৃহত্তর জন্য যে সত্যকে স্বীকার করিতে অন্তরাখ্যা নিরন্তর আদেশ দিতেছে তাড়াতে বারংবার পরাশ্রয় হইয়া জীবনের আনন্দময় পরিণতিকে হৃদয়ে সরাইয়া দিষ্ট। হয় বৃদ্ধ ক্ষমি, তৌনার অহুর্দৈব জন্মের তালপত্রে লিখিত আইন বিশ্ব-দেবতার মানব-হৃদয়ফলকে পৌঁদিহু পরম দাবীরও উপরে উঠিয়াছে !

জীর্ণ ঋণের গুহ নীতিশাস্ত্রে রামচন্দ্র শিক্ষা করিয়াছিলেন “যে আত্মহুণ বিসর্জন দিয়া পরের তুষ্টি সাধন করাই দর্শন। হয়, ঈশ্বরার্বতার দিন। তাঁরও অন্তরে উদয় হয় নাই, যে, সেজ্জায় হুঃসহ হুঃখ কিনি বরণ করিয়া নিতে পারিলেও তার চরুচ ভারে, তাঁচার একান্ত আশ্রিত প্রণয়ীজীবা জানকীকে মৃত্যুর পথে বিদায় দিবার তাঁহার কোন অধিকারই নাই। চির মেহের, অভয়-আশ্বাসের মধ্যে যে নিঃশব্দচিত্তে কালধাপন করিতেছিল সচ্ছা তাহার, চির-নির্কাসনের ব্যবস্থা কোন আর্থনীতির বলে রামচন্দ্র করিয়াছিলেন তাহা তিনিই জানেন, কিন্তু লোকরঞ্জনের প্রলোভনে উহা করিয়াছিলেন সে উদ্দেশ্যও তাঁহার সাধন হয় নাই—আজ তিন যুগ সুরিয়া জগতের যাবতীয় মানব আত্মা এ অবিচারের অনপায়ের কলঙ্ক ব্রহ্মরূপ রামচন্দ্রেরও নামে দিল্পে দ্বিধা করিতেছেন। অপ-ত্তের মনস্তিষ্ঠি ও স্বার্থের জন্য একান্ত নির্ভর-পরায়ণ শরম মেহের জীবন-বাপি নির্গতন ঋণের শাস্ত্রে অহুমানন করিলেও বিধাতার শাস্ত তাহার অহুকুল নয়—জীৱামচন্দ্রের ত্রিকাল-বাপী অখ্যাতিই তাঁহার অকাটা প্রমাণ। যে চির বিশ্বস্ত

নিভর-পরায়ণ শ্রম স্নেহশীল জন-প্রিয় দয়িতের ব্রহ্ম সান্নিধ্যটুকু লাভের জন্য তাঁহার সহিত চতুর্দশবর্ষ বনবাস হুঃখ ভাগ করিয়া নিতে অহুমাত্র কুণ্ঠিত হয় নাই, দশানন কতক অপহৃত্য হইয়া সমুদ্র পারে অসীম হুঃখ ও নির্বাসিত্যের মধ্যে মনোভিরাম রামের অহুকল বার্তার পথ প্রাপ্তি হইয়া হৃদয়কাল অভিবাহিত করিয়াছে, পর গৃহবাসের পুর সর্কজন সময়ে অপ্রতিভতা হইতে যে অহুমাত্র বিধা করে নাই—বহু ভ্রমের পরে আচ্ছাদিত সেই চির ভূখিনী, ঐশ্বর্য প্রত্যাশায় বসিয়া আছে, নিরপরাধে তাহার নির্কাসন যে কত বড় হুঃখ তাহা দেবাংশ সজ্জত ঈশ্বরচরিত্র মনেও আসিল না—অথবা আসিয়াও জনরঞ্জন ততই তাঁহার বড় হইল, এতৎ রামিবার স্থান বর্ণার্থই নাই। প্রজারঞ্জনই যদি একমাত্র জগতের ধর্ম হয়, তবে জানকী কি প্রজা নয়, স্নেহের মনোরঞ্জন কি জনরয়ের সঙ্কল বাড়া ধর্ম নয় ? চির ভূখিনী জানকী যদি বোড়কত্তে সত্যসদ, জনধর্মপরায়ণ, রামচরিত্র সমুদ্রে পাড়াইয়া বলিত, “তবে দণ্ডন, হে আমার রাজ্যমিত্রাজ, জনরয়ের বার্তা সবই তোমার বিদিত, হে সত্য ধর্মপরায়ণ দেবতা আমার, এ চিরভূখিনী দীনাতিদীনা আজ তোমার সিংহাসন তলে বিচার প্রার্থিনী চাইয়া পাড়াইয়াছে, সত্য ধর্মের, নায় ধর্মের, ব্রহ্ম ধর্মের বিচার করিয়া আমার নির্কাসন দণ্ড দিতে হয় দণ্ডি কিম্বা বিচার কর প্রভু,—তখন রামচরিত্র কি করিতেন ?” স্নেহের অমোঘ বলে যে সমস্ত আদেশ দ্বিধাবিহীন চিত্তে মৌল্য করিয়া বহন করে, বিনাপরাধে তাহার আজীবন নির্কাসন ও অরণ্যের মধ্যে অশ্রয় অবস্থায় অকরণ মৃত্যুও রাজধর্ম, গণধর্ম, স্বজনধর্ম, কুলধর্ম, মমুর ধর্ম অহুমোদন করিতে পারে, কিম্বা ব্রহ্মমতা-পরিপূর্ণ মানবের জনধর্ম যে তাহাতে চাহাকার করিয়া উঠে! ব্রহ্মশ্রিতের নায়-সজ্জত দাবীর প্রতি করুণ বৃষ্টিপাত করিয়া রাজ্যভার অপরকে দিয়া উত্তর-প্রাপনের, তুণ্ডীর্ণ তরুণে রাম-জানকীর পৈরমায়ুর অবশিষ্ট কয়টা দিনের দিন-পাত কি হানিয়া হইতে পারিত না ? অযোধ্যার সীমাই পৃথিবীর সীমা নয়, এবং অযোধ্যার জন মণ্ডলীর সংখ্যাই • পরগীর মানব সংখ্যা নহে—একথা একদিন আমাদিগকে বুঝিতেই হয়, সময়ে বুঝিলে স্বর্গের নন্দনকে কেবল মানবের কলনার মধ্যেই পর্য্যবসিত হইতে হইত না।

“ততস্ত কিমপি প্রবাঃ

মোচি যন্ত প্রিয়োজনঃ”

বলিয়া প্রগাঢ় স্নেহের সহিত যাহার কথা ভাবিতে সর্কাজ পুলকাক্ত হইয়া উঠিত,

“অং জীবিতং ত্বনসি মে জনয়ং দ্বিতীয়ং

অং কোমুদীনয়নয়োরমৃতং ত্বমঙ্গং”

বলিয়া কানবার পরমাদরে যাহার প্রতি অঙ্গ সমাজের ও যাহার সর্বেশ্বরীয়
বিশুদ্ধ করিয়া দিতে “ত্বয়া সচ নিকুন্তানি বনেশু মধুগন্ধিনু” বলিয়া যাহাকে
অবশিষ্ট জীবনকালের অবিচ্ছেদ্য মিলনের অপলিঙ্গীম স্নান দিয়াছে,
অশিথিল পরিস্ফুটন মধো সংশ্লিষ্টকপোল হইয়া বিশ্রান্তালাপে সুদীর্ঘ সময়
মুহূর্তের মত যাহার সাহচর্য্যে কাটিয়া যাইতে, তাহাকে এক নিমেষে কেমন
করিয়া ত্যাগ করিলে? একবার মনে চিন্তা কি আসিল না, কেন সেই
অনন্যাতন, নিরন্তর তোমারই প্রেমাস্রিত, তোমারই স্নেহকণিকা একান্ত
কাঙাল, জীহার প্রিয়-সঙ্গ-বিরহিত, নিরাশ্রয় চর্য্য জীবন ভার নির্ভর্য্য অরণ্যের
মধো কেমন করিয়া নড়াইবে? স্নেহাশ্রয় হইতে বিদূত হইয়াই নিরপরাধিনীর
দণ্ডের শেষ হয় নাই, জার্মকীর জয় বুজোর একাধীন প্রজ্ঞা-সাম্রাজ্য রূপে ও
তাহার কোন অঙ্গসন্ধান লন নাই, সে জীবিত কি মৃত সে সংবাদটুকু পর্য্যন্ত
রাখা রাজকণ্ঠবোর মধো পরিগণিত হয় নাই; আজীবনের একনিষ্ঠ প্রণয়ন-কি
এই পুণ্যকার হে বিচারপতি? জনসাধারণ ও স্বজনবর্গের মনস্তত্ত্ব বিধান
করিতে একান্ত স্নেহশীল, আশ্রয়হীন প্রাতি যে নিগ্রহ আচরিত হইয়াছিল
তাহার শোণাগাণা অধি রচনার মধো উচ্ছ্বাস লাভ করার তদবধি আজ পর্য্যন্ত
কত লক্ষ লক্ষ হতভাগের যে স্নেহাশ্রয় হইতে নির্জন নির্ভাসন ঘটিতেছে, সে অশ্রি-
চাদের জন্য একবিন্দু সমবেদনার অঙ্গ বিসর্জন করিবার স্ফুসারে কেহ আছে
কি? ত্রমাসিক ভাগমহিমায় কত লক্ষ শত স্নেহাকুল প্রাণের, অশ্রু মধো
অবদান ঘটয়া যাইতেছে তাহার শেষ নাই, সীমা নাই! হায় রে অসহায় বেহ,
এ ধরায় তোমারই জন্ম সর্বাঙ্গের নিরর্থক, উপায়হীনের বৃকে আসিয়া চির-
তুষার্ত থাকিয়াই তোমার বিদায় লইতে হয়

ওরা আঘাত.

পাণ্ডু

সাহিত্য-সমাচার।

স্বকবি ঐগুরু যতীন্দ্রমোহন বাগচী মহাশয়ের নতুন কবিতাপুস্তক ‘নাগকেশর’ বঙ্গবন্ধু।

ঐগুরু শরীফুল হোসেন, এস, এ বি, এল, সরস্বতী মহাশয়ের নতুন গল্পের বই ‘বারুণী’ প্রকাশিত হইয়াছে।

স্বকবি কালিদাস রায় প্রণীত “বল্লরী” নামক কাব্যগ্রন্থ বাহির হইল। কবির ‘কুল’ ও ‘কিসলয়’ নামক কাব্যগ্রন্থের কতকগুলি কবিতা ইহাতে আছে; বাকী সবই নতুন।

ঐগুরু দীনেশকুমার রায় মহাশয়ের সহস্র-বাহরী উপজাতিসম্মেলার নবম খণ্ড ‘ডাকাত ডাক্তার’ নামক চমকপ্রদ গোয়েন্দা কাহিনী প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার নতুন উপজাতি “চিকিৎসা-সঙ্কট” শীর্ষক প্রকাশিত হইবে।

বিখ্যাত গল্প লেখক ও উপজাতিসক ঐগুরু প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের “গল্পগোষ্ঠী” নামক পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

অবিখ্যাত গল্প লেখক ও উপজাতিসক ঐগুরু হরপ্রসাদ সেন মহাশয়ের ছোটগল্পের গল্পের পুস্তক “কিশোর” এককাল পরে প্রকাশকের কবল নুস্ত হইল। লোকলোচনের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে।

নাট্যের মহারাজ ঐগুরুদিগ্গনানথ রায় ও অধ্যাপক ঐগুরুচরণ দত্তা-ত্বয় মহাশয়ের সম্পাদকতায় “মহাবলী” নামে একপাশি সচিত্র সাপ্তাহিক পত্রিকা শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

প্রসিদ্ধ গল্প-লেখক ঐগুরু সৌরিন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত “মাতৃবর্ণ” উপজাতি প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ঐগুরু ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের “বাল্লরী-বেগমের” ইংরাজী সংস্করণ শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে; এবং ঐগুরুনাথ সংস্করণের দ্বিতীয় সংস্করণ দ্রষ্টব্য।